প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৬০, প্রকাশক হীরক রায়, অনন্য প্রকাশন ৬৮, কলেজ স্ট্রীট (ত্রিতল) কলিকাতা-৭৩, মুদ্রণে মহামায়া প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ৬৬বি, মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। প্রচ্ছদ ঃ ধীরেন শাসমল।

সূচিপত্র

ভূমিকা

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত ইংরেজদেরই পরিকল্পিত ছিলো ব'লে, এবং স্বাধীনতার চল্লিশ বৎসর পরে আজ ইংরেজি-মাধ্যম শিক্ষার অত্যুৎসাহ ও এমন ভয়ংকর রমরমা দেখে, আজকাল হয়তো দুর্ভাবনায় অনেকেরই রাতের ঘুম ও দিনের কাজ মাটি হ'য়ে যায়। সংকট যে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, বিশ্বের বদলে এই অদ্ভুত শিক্ষার প্রকোপ যে ক্রমেই শ্বেতাঙ্গ ইওরোপীয় ও মার্কিন সংস্কৃতিজগতে আমাদের চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণাকে সংকুচিত ক'রে আনছে, আর—কিছুই যে আমরা জানবার চেষ্টা করছি না—কিংবা জানবার সুযোগও পাচ্ছি না, এই দুর্দশা যে ক্রমেই আমাদের 'অশিক্ষিত' ক'রে তুলছে, তা নিশ্চয়ই বিশদ ক'রে বলবারও আর অপেক্ষা রাখে না। ইংরেজি মারফৎ আমরা শ্বেতাঙ্গ ইওরোপীয় ও মার্কিন সংস্কৃতির সঙ্গে যতটা পরিচিত, ততটা এমনকী ইংরেজের প্রাক্তন উপনিবেশগুলির সঙ্গেও নয়। অথচ আফ্রিকা বা পশ্চিম-ইনডিজে কিন্তু ইংরেজির ব্যবহার চলতো, তা যতই অন্যরকম ইংরেজি হোক না কেন। ক্রিকেট বা বিশ্বকাপ ফুটবলের সৌজন্যে আমরা যদি-বা পশ্চিম ইনডিজ, জিম্বাবোয়ে, আফ্রিকার অন্য কোনো-কোনো দেশ, ব্রাজিল, মেহিকো, আরহেনতিনার কথা সামান্য-কিছু জানতেও পেরে থাকি, সে-সব দেশ-মহাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে আজও আমাদের পরিচয় ধিক্কারজনক-ভাবে নগণ্য।

কয়েক বৎসর আগে এই কথা ভেবেই আমরা কিশোরদের জন্যে 'হরবোলা' ১ ও ২ সংখ্যক দুটি সংকলন প্রকাশ করেছিলাম ; তাতে তৃতীয় বিশ্বের ভিন্ন-ভিন্ন দেশের রচনা ছাড়াও পূর্ব-ইউরোপের কোনো-কোনো দেশের নানা ধরনের লেখা সংকলিত হয়েছিলো। এবং সে-সময় সংকলন দুটির যথেষ্ট সমাদরও হয়েছিলো ; কিন্তু নানা বাধাবিপত্তির দরুন তারপর কাজ আর খুব-একটা এগোয়নি। এবার 'জানলা' ১ নম্বর বেরুলো, এই অভিলাষ সমেত যে প্রতি বৎসরই অন্তত এ-রকম একটি সংকলন প্রকাশিত হবে ; তবে 'হরবোলা'র সঙ্গে তার একটা তফাৎও মনোযোগী পাঠকদের চোখে পড়বে ; 'জানলা'র লেখাগুলো শুধুই তৃতীয় বিশ্বের লেখকদের রচিত—তৃতীয় বিশ্বেরই কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এর সম্পদ। প্রধানত কিশোরদের কথা ভেবে সংকলনটি তৈরি হ'লেও বড়োদেরও এর রচনাগুলি উপভোগ করতে কোনো বাধা নেই।

আসলে একটা ক্ষেত্রে, সৎসাহিত্যের প্রসঙ্গে, ছোটো-বড়োর প্রভেদটাও হয়তো দুস্তর কোনো ব্যবধান নয়। শুধু একটা কথা উল্লেখ করি। এখানে এশিয়া, আফ্রিকা, পশ্চিম ইনডিজ, লাতিন আমেরিকার লেখা আছে—সেই সঙ্গে আছে ভারতীয় দেশান্তরী লেখক ফারুক ধন্ধীর দুটি গল্প এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালো আদমিদের লেখা কিছু কবিতা। সত্যি-বলতে, এই লেখকরা হয়তো তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের সঙ্গেই অনেক সহজে ঐক্য ও সহমর্মিতার সূত্রে নিজেদের দায়বন্ধ দেখতে পাবেন। 'জানলা'র ভবিষ্যৎ খণ্ডগুলোতেও এ রকম কিছু-কিছু লেখা থাকবে। তৃতীয় বিশ্বের অনেক শিল্পী-সাহিত্যিককে কর্ম ও জীবিকার সূত্রে পাশ্চাত্ত্য বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয় দীর্ঘকাল কাটাতে হ'লেও তাঁরা হয়তো শেষ অব্দি তৃতীয় বিশ্বেরই লেখক থেকে যান। জর্জ ল্যামিং বা চিনুয়া আচিবি বা হুলিও কোর্তাসারকে অনেক দিনই পাশ্চাত্ত্য দেশগুলোয় কাটাতে হয়েছে। তবু তাঁদের প্রথম পরিচয়, তাঁরা তৃতীয় বিশ্বেরই মানুষ।

কোনো সংকলনই সব পাঠককে সবসময় সন্তুষ্ট করতে পারে না, এমনকী স্থান বা সুযোগের অভাবে সম্পাদককেও অনেক সময় নানাবিধ স্বেচ্ছাপ্রযুক্ত সীমা-সংকোচন মেনে নিতে হয়। আমরা শুধু তৃতীয় বিশ্বের দিকে জানলা খুলে দেবার চেষ্টা করেছি: টাটকা খোলা হাওয়া ঢুকে পড়ুক, পরে নিশ্চয়ই 'জানলা'র পরবর্তী প্রকল্পগুলোয় আরো নানাবিধ রচনার আয়োজন ও উপায় করা যাবে। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের অনুবাদকদের মধ্যে কেউ-কেউ এখন আর বেঁচে নেই, যেমন সমর সেন, শ্রাবণী দে ও মোহিতরঞ্জন লাহিড়ী। যথা সময়ে বইটি প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারলে তাঁরা হয়তো বইটি চোখে দেখে খুশি হতেন। অন্য লেখকদের লেখা নিয়ে সংকলন প্রস্তুত হয় ব'লে সাধারণ ভাবে কোনো সংকলন উৎসর্গ করার রেওয়াজ নেই—কিন্তু এক্ষেত্রে 'জানলা/১' এই তিনজনের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদন করা হ'লো।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সংকলন বিষয়ে

'জানলা'র বর্তমান খণ্ড শুরু হয়েছে এশিয়ার লেখকদের দিয়ে। **হো চি মিন** বা **লু শুন** বাঙালি পাঠকদের কাছে সমস্ত আড়াল সত্ত্বেও আজ বিশেষভাবে পরিচিত। **ইয়ুয়ে চ্যাং কুয়েই** এবং **ওয়াং আন-ইউ** চীনের শিশু পাঠ্য গ্রন্থের প্রণেতা, **আবদুল্লা কাহ্হার** সোভিয়েৎ রুশের এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দেশের লেখক, **সমর সেন** এরকম আরো কিছু-কিছু গল্প তর্জমা করেছিলেন—'হরবোলা'তেও এরকম দুটি গল্প তাঁর অনুবাদে বেরিয়েছিলো। **ওয়ালিদ ইখ্লাস্সির** জন্ম সিরিয়ার আলেসার্কান্দ্রিয়া নগরে, ১৯৩৫ সালে; এখন তিনি আলেপ্পোর বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অর্থনীতির অধ্যাপক। **ফারুক ধণ্ধীর** জন্ম পুনেয়, ১৯৩৮ সালে; এখন ইংলণ্ডে থাকেন, জাতি বৈষম্য রোধ বিষয়ে আন্দোলন করেন; একসময় শ্রীহট্টের দেশান্তরী মানুষদের নিয়ে কতগুলি গল্প লিখেছিলেন—যা থেকে দুটি গল্প অনুবাদ ক'রে দিয়েছেন **সুকুমারী ভট্টাচার্য** ও **শিবানী রায়চৌধুরী**। তাঁর যে-বই থেকে গল্প দুটি অনুবাদ করা হ'লো সেটি কয়েক বৎসর আগে পুরস্কৃত হয়েছিলো। **রজার মেই** জ্যামেকার কবি ও ঔপন্যাসিক—অকালমৃত্যুর আগে তাঁর রচনা পশ্চিম ইনডিজের সাহিত্যে একটা নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলো। **কে. ই. ইনগ্রাম** ও **লুইস সিমসন** পশ্চিম ইনডিজের বিখ্যাত কবি—**লুইস সিমসন** কিছুদিন অধ্যাপনা সূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাটিয়েছিলেন। **এডওয়ার্ড কামাউ ব্রাফেট** বারবেডোসের ঐতিহাসিক ও কবি—একসময়ে আফ্রিকাতেও কিছুদিন অধ্যাপনা করেছিলেন। এখন পশ্চিম ইনডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ান, তাঁর গবেষণার বিষয় 'দাস ও ক্রেয়োল সংস্কৃতি'। তাঁর 'ব্ল্যাক+ব্লুজ' কাব্যগ্রন্থ কুবার কাসা দেলাস আমেরিকাস থেকে পুরস্কৃত হয়েছিলো। **ভিক রীড** পশ্চিম ইনডিজের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক তাঁর এই **কিশোর যোদ্ধা** জ্যামেকার বিদ্রোহী মেরুনদের নিয়ে রচিত। **ভিক রীড** আফ্রিকার নবজাগরণের পটভূমিকাতেও উপন্যাস লিখেছেন। **অরল্যাণ্ডো প্যাটারসন** হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন সমাজতত্ত্ব পড়ালেও জ্যামেকার ঔপন্যাসিক হিশেবেই বিশেষ পরিচিত। **মাইকেল অ্যান্টনি** ত্রিনিদাদের লেখক। **স্যামুয়েল সেলভনের** পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষ থেকে ত্রিনিদাদ-টোবেগো গিয়েছিলেন। **স্যাম সেলভন** এখন ক্যানাডায় থাকেন। **ক্লিফর্ড** ও **মেরীভিস সীরস**—এই দুজনেই পশ্চিম ইনডিজে শিক্ষকতা করেন। সাধারণ পশ্চিম ইনডিজদের

জীবনযাপনের ধরন ও খুঁটিনাটি নিয়ে তাঁরা চাক্ষুষ ও সজীবভাবে চমৎকার কিছু গল্প লিখেছেন। এডগার মিটহোলজার গিয়ানার কথাসাহিত্যিক; জীবদ্দশায় সহজে তাঁর প্রকাশক জোটেনি ব'লে আত্মহত্যা করেছিলেন; এখন তাঁর সব রচনা শুধু-যে নতুন ক'রে প্রকাশিত হচ্ছে তাই নয়, পশ্চিম ইনডিজের অগ্রগণ্য লেখকদের একজন ব'লে তাঁর প্রতিষ্ঠা তর্কাতীত রূপে সুসম্পন্ন। এমে সেজেয়ার মার্তিনিকের কবি ও একসময় রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন; তাঁর 'দেশে ফেরার কথা' কাব্যগ্রন্থ বিংশ শতাব্দীর 'মহত্তম লিরিক স্তম্ভ' ব'লে অভিহিত হয়েছিলো। তাঁর একটি কবিতার বইয়ের ছবি এঁকেছিলেন পাবলো পিকাসো। লিওপোল্ড সিডার সেনঘোর সেনেগলের রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন, কলিঙ্গ পুরস্কার ও কুমারণ আসান পুরস্কার পেলেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি ফ্রান্সে এমে সেজেয়ারের সঙ্গে মিলে 'নেগ্রিচুডে'র ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। সেম্বেন উসমান সেনেগলের সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক; বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে বেশ কিছুবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এতকাল ফরাশি ভাষায় লিখতেন, সম্প্রতি তাঁর মাতৃভাষা য়োলোফে লিখতে শুরু করেছেন। দাভিদ দিওপ অকালে বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ না হারালে সেনেগলের প্রধান কবি হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হতেন। বিরাগো দিওপ সেনেগল ও ফরাশিভাষী আফ্রিকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। সিপ্রিয়েন একোয়েনসি নাইজেরিয়ার কথাসাহিত্যিক; তাঁর রচনার ভাষা ইংরেজি হ'লেও তাঁর রচনায় গ্রামদেশের জীবনযাত্রার ছবিও সজীবভাবে ফুটে উঠেছে। হাভিয়ের এরাউদ ও আন্তোনিয়ো সিসনেরোস পেরুর কবি; ২১ বছর বয়সে পুলিশের গুলিতে হাভিয়ের এরাউদের মৃত্যু না-হ'লে আজ তাঁর রচনার খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তো। মৃত্যুর আগে দেশ থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি পালিয়ে এসেছিলেন ভারতবর্ষে, সে সময়ে কুবা ও সোভিয়েৎ দেশেও তিনি ভ্রমণ করেন। এরনেস্তো কার্দেনাল মুক্ত নিকারাগুয়ার সংস্কৃতি মন্ত্রী ও খ্রীস্টীয় যাজক। তাঁকে লাতিন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন হিশেবে গণ্য করা হয়। রোকে দালতোন এল সালভাদোরের কবি—তাঁরও অকাল মৃত্যু হয় রহস্যময় ভাবে, সম্ভবত হোমগার্ডের গুলিতে। অত্তো রেনে কাস্তিইয়ো গুয়াতেমালার বিপ্লবী কবি—দীর্ঘকাল দেশান্তরে কাটাবার পর দেশে ফেরবামাত্র তাঁরও রহস্যময় মৃত্যু ঘটেছিলো। মধ্য আমেরিকায় ও তার আশপাশে আজ যে আগুন জ্বলছে, এই কবিরা সেই আগুনেই তাঁদের জীবন আহুতি দিয়ে,

প্রমাণ করেছেন যে কবি-শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মীরা জীবনেরই শিল্পী—সুস্থ সংগঠিত জীবনযাপনের উপায় রচনার জন্যই তাঁরা দায়বদ্ধ। কুবার কবি নিকোলাস গিয়েন কেরালার কুমারণ আসান পুরস্কার পেয়েছিলেন, নেরুদা ও ভায়েহোর সঙ্গে মিলে 'লাতিন আমেরিকার কালো হোমার' এই কবি লাতিন আমেরিকার বর্তমান কাব্যধারার প্রবর্তন করেছিলেন। বাংলায় শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে তাঁর 'চিড়িয়াখানা ও অন্যান্য কবিতা' একটা উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এদুয়ার্দো গালেয়ানো উপন্যাস লিখেছেন বটে, তবে তাঁর সবচেয়ে খ্যাতি 'লাতিন আমেরিকার ছিন্ন শিরা' বইটির জন্যে—যা লাতিন আমেরিকার পাঁচশো বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণ ক'রে তার বর্তমান দুর্দশাগুলোর কারণ খোঁজবার চেষ্টা করেছে। সেই বই থেকেই শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান প্রবন্ধটি তর্জমা করেছেন—আশা করা যায় ঃ জানলা'র পরবর্তী খণ্ডে সেই বইয়ের অন্য আরো কিছু অংশ প্রকাশ করা যাবে। লেওপোলদো লুগোনেস কবি, সমাজতাত্ত্বিক ও গল্পকার। আরহেনতিনার এই কবির ওপর নিকারাগুয়ার রুবেন দারিওর প্রভাব পড়েছিলো সর্বপ্রথম। গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস কোলোম্বিয়ার লেখক, সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার পেলেও সাংবাদিক ও চলচ্চিত্র কর্মী হিশেবেও তাঁর খ্যাতি কম নেই। তাঁর দুটি শিশুপাঠ্য ছোটোগল্পের একটি এখানে অনূদিত হ'লো। অন্য গল্পটিও পরবর্তী খণ্ডে অনূদিত হবে। 'ম্যাজিক রিয়ালিজম' ব'লে লাতিন আমেরিকার যে সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত করা হয়, তা যে অহেতুক নয়, তা এই গল্পটি পড়লেই বোঝা যাবে।

এই বইতে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালের লেখকদের রচনা সংগ্রথিত হ'লেও সব ভিন্নতার মধ্যেও নিশ্চয়ই একটি স্পষ্ট সম্পর্কসূত্র বিদ্যমান—আর সেটা মানুষের প্রতি অপরিসীম মমতার বোধ আর শিল্পীর দায়বদ্ধতা। এটা নিশ্চয়ই বলা বাহুল্য হবে যে আমরা সাধারণতঃ ইংরিজি মারফৎ বিদেশের যে সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হই, এই রচনাগুলি তাদের চাইতে অনেক বৈশিষ্ট্যেই আলাদা।

সবিনয় নিবেদন

তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের, সাধারণ পাঠকদের, ধারণা খুব স্বচ্ছ নয়। এর কারণও আছে। তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য তেমনভাবে আমাদের কাছে পৌঁছয়নি। সম্পাদক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য নিয়ে বহুদিন ধ'রেই লিখছেন। তাঁরই পরিকল্পনা—এদেশের পাঠকদের কাছে তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্যকে মেলে ধরা। এই কাজে বহুজন অনুবাদ করে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এঁদের সকলের সহযোগিতা এক জায়গায় মিলিত না হলে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

জানলা ঃ তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য সঙ্কলনের এটি প্রথম খণ্ড। সম্পাদকের পরিকল্পনা আছে এটি আরো কয়েকটি খণ্ডে প্রকাশ করার। বাকি খণ্ডগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রকাশ করার উদ্যোগ আমরা নেব।

হো চি মিন

জেলখানার ডায়েরি

সন্ধ্যার ছবি

গোলাপ ফুটে ওঠে গোলাপ ঝরে যায়
উদাস ঝরে বটে শুকনো গোলাপ
গন্ধে তবুও সে কুঠুরি ভরে যায়
জাগিয়ে কয়েদির মর্মপ্রলাপ।

সকালের ছবি

ভোরবেলা রোজ সূর্যের উঁকি পাহাড়-আড়াল থেকে
গোলাপি আভায় ভরে যায় সব গ্রাম ও গ্রামান্তর।
অন্ধ কারার সামনে কেবল অন্ধকারের ছায়া
রৌদ্রের রেখা ছোঁয় না কখনো কয়েদির অন্দর।

অসুখ

ক্ষীণ হয়ে আছে শরীর চীনের এলোমেলো আবহাওয়ায়
ভিয়েৎনামের চিরযন্ত্রণা অশান্ত রাখে প্রাণ।
জেলে পড়ে থাকা – হায় কী কঠিন তীব্র প্রতীক্ষা এ
চিরকান্নার উৎস যেন-বা, আমি তবু গাই গান।

শারদীয় রাত

রাইফেল হাতে দরোজার কাছে সান্ত্রী দাঁড়িয়ে থাকে।
ছেঁড়া মেঘগুলি ঘুরছে ওপরে চাঁদের সঙ্গে মিলে।
ট্যাঙ্কবাহিনীর মতো সারে সারে খাটিয়ার ছারপোকা।
মশাগুলি যেন বিমানবহর উড়ে আসে ঝাঁকে-ঝাঁকে।
হাজার লী দূরে স্বদেশের দিকে হৃদয় আমার ধায়।

বিষাদের ভারে স্বপ্নগুলিও যেন-বা জড়ানো জট।
কোনো দোষ নেই, একটা বছর বাঁধা তবু শৃঙ্খলে।
বন্দীদশার কবিতা বানাই কালিতে চোখের জলে।

ঝকঝকে দিন

সবই একদিন ঘুরে যায়, জানি প্রকৃতিরই বিধি এই।
বৃষ্টির কাল কেটে গেল, এল ঝকঝকে দিন আজ!
মুহূর্তে মাটি সরিয়ে নিয়েছে সিক্ত আচ্ছাদন;
দশহাজার লী-র ওপরে এখন ছড়ানো জরির কাজ।
রৌদ্রের তাপে স্নিগ্ধ বাতাসে ফুলেরা হাসিতে মাতে;
উজ্জ্বলশাখা বড়ো-বড়ো গাছে পাখির মহড়া-গান।
সবার হৃদয় বিশ্বহৃদয় আনন্দে যায় ভরে
বিষাদের পরে আসে যে মধুর—প্রকৃতিরই এ বিধান।

জেলপ্রাঙ্গণে হাঁটা

এতদিন ধরে অকর্মা থেকে দুটো পা-ই তুলতুলে—
দু-চার কদম হাঁটতে গেলেই টলমল করে ভারি।
তবে তক্ষুনি জেল-ওয়ার্ডার গাঁক-গাঁক করে ওঠে:
'এই-যে, ফেরো হে, জেলের ভিতরে চলবে না পায়চারি!'

বন্দীদশার পর পাহাড়চড়া

পাহাড় জড়ায় মেঘেদের আর মেঘেরা জড়ায় পাহাড়
নিষ্কলঙ্ক আয়নার মতো ঝকঝকে নদী নিচে।
পশ্চিম গিরিতট বেয়ে হাঁটি, ধুকধুক শুনি বুকে
দক্ষিণাকাশে তাকিয়ে ভাবছি গত যত বন্ধুকে।

অনুবাদ: শঙ্খ ঘোষ

লু শুন

গাঁয়ের অপেরা

গত বিশ বছরের হিশেব কষলে, আমি সাকুল্যে মাত্র দু-বার চীনে অপেরা দেখেছি। তার মধ্যে প্রথম দশ বছরে তো একবারও নয়। কারণ, অপেরা দেখার ইচ্ছে বা সুযোগ, কোনোটাই সে-সময়ে হ'য়ে ওঠেনি। যে দু-বার দেখেছি, তা পরের দশ বছরে। তাও সেই দু-দু-বারই বিশেষ-কিছু না-দেখেই বেরিয়ে এসেছি।

গণতন্ত্রের সেটা প্রথম বছর[১]। সবে আমি পিকিঙে এসেছি। সেই সময়েই একবার দেখতে গিয়েছিলাম পিকিং অপেরা। এক বন্ধুপ্রবর এসে জানিয়েছিলেন – পিকিং অপেরা অতীব চমৎকার উপাদেয়, চোখ ভ'রে দেখবার মতো জব্বর এক জগৎ।

ভাবলাম, পালা দেখাটাই তো বেশ আনন্দের। তার ওপর যদি হয় পিকিং অপেরা!

মহা-উৎসাহে এক রঙ্গশালায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম দুজনে। ততক্ষণে পালা শুরু হ'য়ে গেছে, বাইরে থেকেই ঝুমঝাম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঠেলেঠুলে কোনোরকমে ভেতরে ঢুকতেই চোখ ধাঁধিয়ে দিলে সবুজ-লাল আলোর ঝলকানি। তারপর একটু ধাতস্থ হ'লে নজরে পড়লো মঞ্চের নিচে দর্শকদের অজস্র মুণ্ডু। ভালো ক'রে চারদিকে তাকিয়ে দেখি, মাঝখানে তখনও গোটাকয়েক ফাঁকা আসন রয়েছে। চাপাচাপি ক'রে এগিয়ে বসতে যাবো, কে-একজন আমাদের উদ্দেশ ক'রে কিছু ব'লে উঠলো। আমার তখন কান ভোঁ-ভোঁ করছে। অতি কষ্টে তার কথা হৃদয়ঙ্গম করলাম – 'লোক আছে, বসবেন না।' আমরা পিছিয়ে এলাম। এবার খুব চক্‌চকে-বেণীওয়ালা একটা লোক আমাদের অন্য একধারে নিয়ে গিয়ে একটা জায়গা দেখালে। ঐ তথাকথিত জায়গাটা একটা বেঞ্চি ছিলো, কিন্তু তার তক্তাটা আমার উরুর তিন-চতুর্থাংশ চওড়া, আর পায়াগুলো আমার পায়ের চেয়েও দুই তৃতীয়াংশ উঁচু। প্রথমে তো ওটা বেয়ে ওঠবার সাহসই হ'লো না আমার। উল্টে তৎক্ষণাৎ মনে এলো

বে-আইনি অত্যাচারের জন্য ব্যবহৃত সব ভয়াবহ যন্ত্রের কথা। গায়ের লোম খাড়া হ'য়ে উঠলো আমার, পালিয়ে এলাম ভয়ে।

বেশ খানিকটা রাস্তা এসেছি, হঠাৎ আমার বন্ধুর গলা শুনতে পেলাম— 'হ'লো কী তোমার?' ফিরে তাকিয়ে এতক্ষণে বোধগম্য হ'লো যে ওকেও আমার পেছনে বের ক'রে নিয়ে এসেছি। খুব অবাক হ'য়ে জিগেশ করলে সে—'কী হ'লো? বোবা মেরে খালি হেঁটেই চলেছো দেখছি, জবাব দিচ্ছো না যে?' বললাম—'বন্ধু হে, মাপ করো। কান আমার এতই ভোঁ-ভোঁ করছে যে তোমার কথা একেবারে শুনতে পাইনি।'

পরে ব্যাপারটা যখনই মনে পড়তো, খুব আশ্চর্য লাগতো আমার। হয় অভিনয়টা খুব বাজে ছিলো, নয়তো দর্শক-আসনে বসা আজকাল আমার আর ধাতে সইছে না।

কোন বছরে দ্বিতীয়বার অপেরা দেখতে গিয়েছিলাম ঠিক মনে নেই। তবে সে-বছর 'হু-পেই'-তে বন্যা হয়েছিলো এবং তান-শিন-পেই[২] তখনো জীবিত। বন্যাত্রাণের জন্য চাঁদা দেবার পদ্ধতি হচ্ছে দু-ইয়ুয়ান দিয়ে একটা টিকিট কাটা আর তা দিয়ে একনম্বর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখার সুযোগ পাওয়া। অনেক নামীদামি অভিনেতা আসরে নামবেন, তান-শিন পেইও তাঁদের মধ্যে আছেন অবশ্যই। চাঁদা-আদায়কারীর প্রতি ভদ্রতা দেখানোর জন্য একটা টিকিট আমরা কেটে-ছিলাম ঠিকই, তবে একজন 'সর্বঘটে কাঁঠালি কলা' জাতীয় লোক এই সুযোগে আমায় জানিয়ে দিলো যে তান-শিন-পেই-কে না দেখলেই নয়, অনবদ্য তাঁর অভিনয়, ইত্যাদি-ইত্যাদি। সুতরাং কয়েক বছর আগের কান ভোঁ-ভোঁ-করা বিপর্যয়ের কথা ভুলে গিয়ে একনম্বর রঙ্গমঞ্চে হাজির হয়েছিলাম। তবে একটা বড়ো কারণ বোধহয় এটাও যে এত দামি টিকিটটা কাজে না-লাগিয়ে পারছিলাম না। খোঁজ নিয়ে জানা গেলো তান-শিন-পেই মঞ্চে বেশ দেরি ক'রে আসবেন। একনম্বর রঙ্গমঞ্চ নাকি আধুনিক ধাঁচে তৈরি; বসার জায়গার জন্য গুঁতোগুঁতি করতে হবে না। তাই নিশ্চিন্ত মনে ধীরে-সুস্থে ন-টা নাগাদ বেরিয়েছিলাম। হায়! কে জানতো এবারকার অবস্থাও আগের মতোই হবে। লোকজনের এমন ভিড় যে পা-ফেলা দায়। দূর থেকেই লোকের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করতে-করতে দেখতে পেলাম মঞ্চে একজন বুড়ি দান[৩] গান গাইছে। তার ঠোঁটের কোণায় পাকানো দুটো জ্বলন্ত কাগজ, পাশে একজন যমদূতের মতো লোক। বহু ভেবেচিন্তে অনুমান করলাম এ নিশ্চয়ই মৌদগল্যায়নের[৪] মা হবে, কেননা

পরে একজন সন্ন্যাসীও মঞ্চে এলো। কিন্তু উনি কোনো বিখ্যাত অভিনেতা কিনা ঠাহর করতে না-পেরে আমার বাঁ-পাশে চাপাচাপি করা একজন মোটা লোককে সে-কথা জিগেশ করলাম। লোকটা খুব অবজ্ঞা ভরে টেরচা চোখে দেখলো আমাকে, তারপর জবাব দিলো 'গং-ইয়ুন-ফু'৫ ('কুঙ ইয়ুন ফু')।

আমি তো আমার অজ্ঞতা আর অন্যমনস্কতায় ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলাম। মুখ-টুখ গরম হ'য়ে গেলো আমার। সেই সঙ্গে মাথায় এই দৃঢ় সংকল্প খেলে গেলো যে আর প্রশ্নটশ্ন করা নয়। সুতরাং একজন তরুণী 'দান'কে গাইতে দেখলাম, এক বুড়োকে গাইতে দেখলাম, একদঙ্গল লোকের ঝাড়পিট দেখলাম, দু-তিনজন লোকের পারস্পরিক দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখলাম। ন-টা থেকে দশটা বাজলো, দশটা থেকে এগারো, এগারোটা থেকে সাড়ে-এগারো, সাড়ে-এগারো থেকে বারোটা – কিন্তু তান-শিন-পেই আর মঞ্চে এলেন না।

আমি কোনোদিনও কোনো-কিছুর জন্য ধৈর্য ধ'রে এতক্ষণ অপেক্ষা করিনি। তার ওপর পাশের মোটা লোকটা ফোঁস-ফোঁস ক'রে নিশ্বাস ফেলছে। ও-দিকে মঞ্চের ওপর ধুমধাড়াক্কা মারদাঙ্গা, কাঁপা-কাঁপা লাল-সবুজ আলোর ঝলকানি, আর সেই সঙ্গে বারোটাও বেজে গেছে। এ-সবকিছু মিলে হঠাৎ ঠাহর করলাম আর এখানে টেঁকা যাচ্ছে না। তক্ষুনি ঠিক যন্ত্রের মতো উলটো দিকে ঘুরে গেলো শরীরটা। বেশ জোরে একটা ঠেলা দিতেই অনুভব করলাম পেছন-দিকটা তৎক্ষণাৎ ভর্তি হ'য়ে গেলো। বোধহয় সেই স্থিতিস্থাপক মোটা লোকটা ওর ডানদিকের চেপটে-থাকা শরীরের অংশ ফুলিয়ে ভ'রে দিলো আমার ফাঁকা জায়গাটা। আর ফেরার উপায় না-থাকায় আমি কোনোরকমে ঠেলেঠুলে এগিয়ে চললাম যতক্ষণ-না বেরুনোর দরজায় এসে পৌঁছুনো যায়। কেবল দর্শকদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ভাড়া খাটার জন্য দাঁড়িয়ে-থাকা রিক্সাটি ছাড়া রাস্তার ওপর পথচারী বিশেষ ছিলো না। বাইরের দরজায় কিন্তু তখনো জনা তিরিশ-চল্লিশ লোক ঘাড় উঁচিয়ে পালার পোস্টার দেখছে, আর আরেকদল লোক কিছুই দেখছে না। মনে হ'লো এরা সম্ভবত অভিনয় শেষে বেরিয়ে-আসা মহিলাদের দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তান-শিন-পেই-এর আসার নামগন্ধও নেই……।

অবশ্য রাতের হাওয়াটা খুবই ঠাণ্ডা আর তাজা। সত্যিই যেন হৃদয় জুড়োনো। পিকিং শহরে এমন চমৎকার হাওয়া, মনে হয়, এবারই প্রথম পেয়েছিলাম।

সেই রাতেই চীনে অপেরাকে শেষ বিদায় জানিয়েছিলাম। আর কখনো কোনো পালা দেখতে যাবার ইচ্ছে আমার হয়নি। এমনকি কখনো যদি কোনো থিয়েটারের সামনেও গিয়ে পড়েছি, তার কোনো প্রভাবই আমার ওপর পড়েনি। যেন মনের দিক থেকে আমার আর চীনে অপেরার মধ্যে উত্তর আর দক্ষিণ মেরুর ব্যবধান।

সে যাই হোক, কয়েকদিন আগে হঠাৎ জাপানি একট বই চোখে পড়লো। দুর্ভাগ্যবশত বইটি আর তার লেখকের নাম বেমালুম ভুলে গেছি। বিষয়: চীনে পালা। সংকলিত একটি অধ্যায়ের মূল বক্তব্য হচ্ছে—চীনে অপেরায় ভীষণ গুঁতোগুঁতি, চ্যাঁচামেচি, লাফালাফি, সব মিলে দর্শকদের মাথা ঘুরিয়ে ছেড়ে দেয়, বস্তুটা রঙ্গালয়ে মোটেই খাপ খায়না। কিন্তু যদি বিস্তৃত খোলা জায়গায় হয়, দূর থেকে দেখা যায়, তাহ'লে বোঝা যায় তারও একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। তখনি বুঝলাম, ঠিক এই কথাটাই আমার পেটে এসেও মুখে আসছিলো না। কারণ ভালোই মনে আছে ফাঁকা খোলা জায়গায় খুব চমৎকার পালা দেখেছি আমি। পিকিং (বেজিং) আসবার পর যে দু-বার থিয়েটারে গিয়েছি সেও বোধহয় সেই আগেকার পালার প্রভাবেই হবে। কিন্তু কেন জানি না, পালাটার নাম আমার কিছুতেই আর মনে পড়ছে না।

সেই চমৎকার অপেরা-পালাটি অবশ্য সত্যিই অনেক, অনেকদিন আগে দেখেছিলাম। বয়স আমার তখন মাত্র এগারো কি বারো। আমরা যে-শহরের বাসিন্দা, সেই লু-সেনে সে-সময়ে এক সামাজিক রীতি প্রচলিত ছিলো। বাইরে থেকে যে-সব মেয়েরা বিয়ে হ'য়ে আসতো, সংসারের দায়িত্ব না-থাকলে তারা গরমকালটা বাপের বাড়িতে কাটিয়ে আসতো। সে-সময়ে আমার ঠাকুমার স্বাস্থ্য যদিও ভালোই ছিলো, মা তবু সংসারের দায়িত্ব অনেকটাই ভাগ ক'রে নিতেন। তাই গরমকালে বেশি দিনের জন্য দেশে ফিরতে পারতেন না। 'কবর সাফাই'[৬] শেষ হ'লে, অবসর পেয়ে, কয়েকদিনের জন্য দেশে যেতেন। আমিও সে-সময় প্রতি বছরই মা-র সঙ্গ ধ'রে মামাবাড়িতে যেতাম। জায়গাটার নাম পিং-ছিয়াও ছন (শান্তি সেতুর গ্রাম)। সমুদ্র থেকে বেশি দূরে নয়। একদম পাণ্ডববর্জিত জায়গা, নদীর পাশেই গ'ড়ে-ওঠা একটা গণ্ডগ্রাম। সব মিলিয়ে তিরিশঘর বাসিন্দাও হবে কিনা সন্দেহ, তাও সকলেই চাষী কিংবা জেলে। মুদির দোকান মাত্র একটি। তবু আমার কাছে সেই গ্রাম ছিলো যেন স্বর্গ। এখানে শুধু যে খুব যত্ন-আত্তি পেতাম তা-ই নয়,

'সংগীতাঞ্জলি' থেকে পদ মুখস্থ করার হোম-টাস্‌ক্ থেকেও হাঁফ ছেড়ে বাঁচতাম।

আমি অনেক দূর থেকে আসায় গ্রামের ছোটোরা সকলেই বাবা-মা-র কাছে কম-কাজ করার সুযোগ পেয়ে খেলতে আসতো আমার সঙ্গে। ছোট্ট গাঁয়ে কোনো-এক বাড়ির অতিথি প্রায় সার্বজনীন অতিথি ব'লে গণ্য হ'তো। আমরা সবাই সমবয়সী, কিন্তু বংশধারার হিশেব কষলে সকলেই কমসে-কম আমার কাকা-জ্যাঠা, খুঁজলে এমনকি ঠাকুদ্দা বা বড়োঠাকুদ্দা পাওয়া যেতে পারে। এর কারণ গোটা গাঁয়ের সবারই এক পদবি, সবাই এক গোত্রের লোক। কিন্তু আমরা পরস্পরের বন্ধু, এই ঠাকুদ্দাদের সঙ্গে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করায় আমার স্বাভাবিক অধিকার। যদি-বা কারুর গায়ে হাত দিয়েও বসি গ্রামের ছোটো-বড়ো কেউই আমায় 'বেয়াদপ' বিশেষণে অক্ষর সাজাবে না, আর তাছাড়া ওদের শতকরা নিরেনব্বুই জনেরই কোনো বর্ণপরিচয় হয়নি।

প্রায় রোজই আমাদের কাজ ছিলো, মাটি খুঁড়ে কেঁচো বের করা। তারপর তার বাঁকিয়ে তৈরি-করা ছোটো বঁড়শিতে সেই কেঁচো গেঁথে নদীর কিনারায় রেখে চিংড়ি ধরা। চিংড়ি হচ্ছে জলজগতের মহামূর্খ। গোঁয়ারের মতো বঁড়শির মাথাটা দুই দাঁড়ায় ধ'রে মুখে পুরে দেয়। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই বড়ো গামলা ভর্তি চিংড়ি ধরা হ'তো। রীতি ছিলো, এই চিংড়ি সবই আমাকে দেয়া হবে। এরপর সবাই একসঙ্গে গোরু-মোষ চরাতে যেতাম। কিন্তু বোধহয় উচ্চতর শ্রেণীর প্রাণী ব'লেই গোরু-মোষগুলো আমার খবরদারি মানতো না। বলা যায়, রীতিমতো অবজ্ঞাই করতো আমাকে। আর আমিও তাই ওদের কাছে ঘেঁষতে খুব একটা সাহস করতাম না। বন্ধুরা কিন্তু কেউই—আমি কবিতা আবৃত্তি করতে পারি ব'লে—আমায় মাফ ক'রে দিতো না। সবাই মিলে খুব হাসিঠাট্টা জুড়ে দিতো।

ওখানে আমার সবচেয়ে লোভনীয় আকর্ষণ ছিলো চাও চুয়াং, (ঝাও ঝুয়াং,) গিয়ে অপেরা পালা দেখা। চাও-চুয়াং 'শান্তি সেতুর গ্রাম' থেকে পাঁচ-লি তফাতে; তুলনায় একটু বড়ো একটা গ্রাম। 'শান্তি সেতুর গ্রাম' খুবই ছোটো। একটি অপেরা-পালা বন্দোবস্ত করার ক্ষমতাও তাদের ছিলো না। তাই প্রতি বছর কিছু পরিমাণ টাকা চাও চুয়াংকে ধ'রে দিয়ে পালা আয়োজনের শরিক ব'লে মনে করতে নিজেদের। সে-সময় আমি বুঝে উঠতে পারতাম না যে ওরা কেন প্রতি বছরই অপেরার আয়োজন করে। এখন মনে

হয়, বোধহয় বসন্তকালীন প্রতিযোগিতা বা ধর্মীয় উৎসবের অঙ্গ হিশেবেই ঐ পালাগানের আয়োজন করা হ'তো।

আমার এগারো-বারো বছর বয়সের সেই বছরটাতেও প্রতীক্ষিত দিনটি দেখতে-দেখতে এসে গেলো। কিন্তু কে জানতো এ-বছরের পরিণতি হ'য়ে দাঁড়াবে দুঃখজনক। সকালবেলায় নৌকো পাওয়া গেলো না। শান্তি সেতুর গাঁয়ে একটাই বড়ো খেয়া নৌকো ছিলো; সকালে সেটা বেরুতো আর সন্ধেবেলায় ফিরে আসতো। আর সব নৌকোই ছিলো ছোটো। সেগুলোতে কাজ হবে না। পাশের গাঁয়ে খোঁজ নেয়া হ'লো, কিন্তু সেখানেও আগে থেকেই লোকেরা বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছে। খবর শুনে দিদিমা খুব রেগে গেলেন। আগে থেকে ব্যবস্থা করা হয়নি ব'লে বাড়ির লোকদের দোষারোপ ক'রে সুদীর্ঘ বকুনি শুরু হ'লো। মা তখন দিদিমাকে সান্ত্বনা দিয়ে জানালেন, আমাদের লু-সেন (পু-মেন) শহরের পালা ছোট্ট গ্রামের চেয়ে অনেক ভালো, প্রতি বছরই কয়েকটা ক'রে দেখা হয়, আজ না-হয় নাই-বা হ'লো। আমার তো বুক ফেটে কান্না আসছিলো, কিন্তু মা কড়া ধমক দিলেন। হুকুম হ'লো, যেন ন্যাকামি না-করি, তাহ'লে দিদিমা আবার রেগে যাবেন। ওদিকে অন্য অচেনা লোকের সঙ্গে যাবার অনুমতিও দিলেন না, তাতে নাকি দিদিমার দুশ্চিন্তা হবে। তাহ'লে এখানেই সব শেষ! বিকেলবেলা বন্ধুরা সবাই চ'লে গেলো, পালা শুরু হ'য়ে যাবে। মনে হ'তে লাগলো যেন ঝাঁঝর আর ঢোলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। এও বুঝলাম ওরা নিশ্চয়ই মঞ্চের নিচে সয়াবীনের দুধ কিনে খাচ্ছে।

সেদিনটা আমার আর চিংড়ি ধরা হ'লো না। বিশেষ-কিছু খেলামও না। মা খুবই অশান্তি বোধ করতে লাগলেন।

কিন্তু কোনো উপায়ও ছিলো না। রাতে খাবার সময় দিদিমাও শেষ অব্দি ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলেন। আবারও বললেন যে, আমার অখুশি হওয়াই উচিত। এরা অমন কুঁড়ের বাদশা যে অতিথির সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় সে-সহবৎটুকুও শেখেনি। খাওয়া হ'য়ে গেলে পালা-দেখে-ফেরা বাচ্চারা সব একত্র হ'য়ে মশগুল হ'য়ে মনের খুশিতে অপেরা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো। চুপ ক'রে রইলাম একা আমিই। ওরা সকলেই আমার জন্য আফশোশ করলো, সহানুভূতিও দেখালো। হঠাৎ শুয়াং থি ব'লে খুব চালাকচতুর একজন, মস্ত কিছু মাথায় খেলেছে এমনভাবে,

ব'লে উঠলো—'বড়ো নৌকো? হুম্, সোনা দাদুর[৮] ফেরি নৌকোটা ফিরে এসেছে না?' আরো জনা বারো বাচ্চা ছিলো, তাদেরও মাথায় খেলে গেলো ভাবনাটা। তক্ষুনি তাড়াহুড়ো লাগালো সবাই: ঐ নৌকোতে ক'রে আমাকে নিয়ে যাবেই। আমার তো খুব আনন্দ, কিন্তু দিদিমার সে কী ভয়, সবাই ছোটো-ছোটো, এদের ওপর ভরসা করা চলে না। মা আবার বললেন, যেহেতু বড়োদের সবারই সকালে কাজ আছে, তাদের রাত জাগতে বলাটা উচিত হবে না। এই দোটানার মধ্যে শুয়াং-ঘি কিন্তু সমস্ত সুবিধে-অসুবিধেগুলো খুঁটিয়ে ভেবে নিয়েছে; এবার ও চেঁচিয়ে উঠলো—'আমি লিখিত গ্যারান্টি দিচ্ছি! নৌকোটাও বড়ো, সুন ভাইও মোটেই দুরন্ত নয়; তাছাড়া আমরা সকলেই খুব ভালো সাঁতার জানি।'

কথা তো ঠিকই। বারো-চোদ্দজন বাচ্চার মধ্যে সাঁতার জানে না এমন একজনও নেই, কয়েকজন তো আবার জোরালো স্রোতকেও গ্রাহ্য করে না।

দিদিমা আর মা-র এবার বিশ্বাস জন্মালো। ওরাও আর কথাটা উড়িয়ে দিতে পারলেন না। মিটিমিটি হাসলেন কেবল। আমরা তৎক্ষণাৎ তো হৈ-হৈ করতে-করতে বেরিয়ে পড়লাম।

আমার পাথর-চাপা মনটা হঠাৎই হালকা হ'য়ে গেলো, শরীরটাও যেন ছড়িয়ে গেলো বিশাল। বাইরে বেরুতেই চাঁদের আলোয় চোখে পড়লো শান্তি সেতুর নিচে নোঙর করা একটা শাদা ছইয়ের নৌকো। সবাই লাফিয়ে উঠলো নৌকোয়, শুয়াং-ঘি সামনের হাল ধরলো, পেছনের হাল ধরলো আ-ফা। ছোটো বাচ্চারা সব আমার সঙ্গে ছইয়ের ভেতরে ব'সে গেলো।

নৌকোর পেছন দিকে জড়ো হ'লো একটু বড়োরা। আমাদের ছেড়ে দিতে এসে মা যতক্ষণে বলছেন—'সাবধানে যাস', ততক্ষণে আমরা নৌকো খুলে দিয়েছি। পাথরের সেতুতে ঠোক্কর খেয়ে কয়েক ফুট পিছিয়ে গেলো নৌকো, তারপর বেরিয়ে এলো সেতুর তলা থেকে। এবারে প্রতি লি-তে, একবার ক'রে হাত বদলে এক-এক দাঁড়ে দু-জন ক'রে, দুটো দাঁড় জোর চললো। কেউ-বা চ্যাঁচাচ্ছে, আর তার সঙ্গে মিশছে নৌকোর মাথায় স্রোতের ছলকানির শব্দ। দু-ধারে ঘন সবুজ ধান আর গমের খেতের মাঝখানে নদীর স্রোতে আমাদের নৌকো যেন সোজা উড়ে চললো চাও-চুয়াং-এর দিকে।

জলের ওপর কুয়াশার মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে আছে তাজা বীন, গম আর জল-ঝাঁঝির গন্ধ। এই কুয়াশার ভেতর দিয়ে চাঁদটাকে দেখাচ্ছে আবছা, মায়াময়।

বৈচিত্র্যহীন কালো একটানা পাহাড়ের উঁচু-নিচু সারি, দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন নৌকোর পেছনদিক পেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে লৌহ-পশুদের দীর্ঘ মেরুদণ্ড। কিন্তু নৌকোটা বড়োই যেন আস্তে চলছে। অন্তত আমার তা-ই বোধ হচ্ছে। চারবার হাত বদল হ'লো দাঁড় টানার। ধীরে-ধীরে অবশেষে অস্পষ্টভাবে চোখে এলো চাও চুয়াং। সেই সঙ্গে মনে হ'তে লাগলো যেন গানবাজনাও কানে আসছে। কয়েকটা আলোর ফুটকি দেখা গেলো, সম্ভবত মঞ্চের আলো, কিংবা জেলেদের আগুনও হ'তে পারে।

বাজনার সেই আওয়াজটা সম্ভবত বাঁশির। উঁচুনিচু, দীর্ঘায়িত সেই সুর, আমার মনটাকে স্তব্ধ, আত্মহারা ক'রে দিলো। মনে হ'লো যেন সেই সুরের সঙ্গে মিশে এই বীন, গম আর জলঝাঁঝির গন্ধে-ভরা রাত্রির আকাশে ছড়িয়ে পড়ছি।

আলোর ফুটকি ক্রমশ বড়ো হ'তে-হ'তে এগিয়ে এলো; জেলেদের আগুনই বটে। তখনই কেবল বোঝা গেলো যেটাকে চাও চুয়াং ব'লে ভেবেছি সেটা আসলে নৌকোর মুখোমুখি পাইন আর সাইপ্রেসের বন। গত বছরও এখানে এসেছিলাম, চোখে পড়েছিলো পাথরের ভাঙা ঘোড়ার মূর্তি মাটিতে প'ড়ে আছে, ঘাসের মধ্যে হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে একটা পাথরের ভেড়া। সেই বনটা পেরিয়ে নৌকো একটা দু-ভাগ-হ'য়ে-যাওয়া খালের ভেতরে ঢুকলো। আর তখনই সতি-সত্যি নজরে এলো চাও চুয়াং।

প্রথমেই চোখে পড়লো, খেতের বাইরে নদীর ঠিক পাড়েই ফাঁকা জায়গায় একটা মস্ত খাড়া মঞ্চ। চাঁদনি রাতে দূর থেকে ঝাপসা দেখা যায়, কিন্তু কোথায় যে তার শেষ, বোঝা যায় না। মনে হ'লো, ছবিতে যে-মায়াপুরী দেখেছি, তা যেন মূর্ত হ'য়ে উঠেছে এখানে। নৌকো এখন ছুটছে আরো জোরে। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখা গেলো মঞ্চের ওপর মানুষ, লাল-সবুজের আনাগোনা। মঞ্চের কাছাকাছি নদীতে, যতদূর দেখা যায়, পালা দেখতে-আসা লোকেদের নৌকোর কালো-কালো ছই।

'মঞ্চের কাছে জায়গা নেই, আমরা বরং দূর থেকেই দেখি,' —আ-ফা বললে।

ততক্ষণে নৌকোর গতি ধীর হ'য়ে এসেছে। পৌঁছে গেলাম আমরা। যেমনটি ভাবা গিয়েছিলো, মঞ্চের কাছে যাওয়া যাবে না। মঞ্চের ঠিক উলটো দিকে যে-মন্দিরটা ছিলো তার চেয়েও দূরে নৌকো দাঁড় করাতে হ'লো। আসলে আমাদের শাদা ছইওয়ালা নৌকোটা কালো-ছইওয়ালা নৌকোদের সঙ্গে একত্রে থাকতে চাইছিলো না। তাছাড়া ফাঁকা জায়গাও তেমন নেই…

নৌকো থামানোর ব্যস্ততার মধ্যে দেখলাম একজন কালো দাড়িওয়ালা লোক, পিঠে তার চারটে ছোটো পতাকা গোঁজা, বিশাল এক বর্শা হাতে একদঙ্গল খালিহাত লোকের সঙ্গে লড়াই করছে। শুয়াং-যি জানালো ইনিই হচ্ছেন সেই বিখ্যাত লৌহমস্তক বীর। যি নিজেই দিনের বেলা শুনেছে, একাদিক্রমে চৌরাশিটা ডিগবাজি দিতে কোনোই অসুবিধে হয়নি তাঁর।

নৌকোর মাথায় ভিড় ক'রে আমরা লড়াই দেখতে লেগে গেলাম। সেই 'লৌহমস্তক বীর' কিন্তু ডিগবাজি দিলেন না। খালিহাতে কয়েকজন লোক কয়েকবার ডিগবাজি খেলো, তারপর সবাই ভেতরে চ'লে গেলো। তখন বেরিয়ে এলো একজন তরুণী 'দান'। সে এসেই প্যানপ্যানানি সুরে গান জুড়ে দিলো। শুয়াং-যি বললো—'সন্ধের পর দর্শক কম, তাই লৌহমস্তক বীরও ঢিলে দিয়েছেন, ফাঁকা ময়দানে কে আর কেরামতি দেখায়?' কথাটা ঠিক ব'লেই মনে হ'লো আমার, কেননা মঞ্চের নিচে বেশি লোক ছিলো না সে-সময়। গাঁয়ের লোকের সকালে কাজ আছে। রাতে অপেরা দেখতে না-এসে, তাই, বেশির ভাগই ঘুমুতে গেছে। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ওই গ্রাম বা আশপাশের গ্রামের জনা-ত্রিশ-চল্লিশ নিষ্কর্মা। কালো-ছই নৌকোর ভেতরে গ্রামের ধনী পরিবারের লোকজনও অবশ্য আছে। কিন্তু ওরাও পালা দেখছিলো না, বেশির ভাগই মঞ্চের নিচে পিঠে, ফল, কোঁড়া এইসব খাচ্ছে। কাজেই, সব মিলিয়ে, ফাঁকা ময়দানই বলা চলে।

আমার প্রধান উৎসাহ কিন্তু ডিগবাজি দেখায় ছিলো না। শাদা কাপড়ে শরীর ঢেকে দু-হাতে মাথার ওপর গদার মতো সাপের মাথা ধ'রে সর্পরাক্ষস সাজা লোকটার কেরামতি দেখা আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিলো। আর ভালো লাগতো হলদে কাপড়-জড়ানো লাফঝাঁপ দেওয়া ব্যাঘ্রপ্রবরকে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও এ-সব কিছুই দেখতে পেলাম না। তরুণী দান যদিও ভেতরে ঢুকে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলো তরুণ 'শেং'[৯] সাজা একজন খুব বুড়ো মতন লোক। আমার ক্লান্তি এসে গিয়েছিলো। কুই (গুই) শেংকে পাঠালাম সয়াবীনের দুধ কিনে আনতে। ও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ফিরে এসে বললো—'নেই, দুধ-বেচা কালা লোকটাও চ'লে গেছে। সারাদিন ধ'রে ছিলো। আমি দু-বাটি দুধ খেয়েছিলাম। এখন আর কী করবি! কাঠের ভাঁড়ে ক'রে জল এনে দিচ্ছি তোকে।'

আমি জল খেলাম না। প্রায় জোর ক'রেই পালা দেখতে লাগলাম।

তাও কী দেখছিলাম নিজেই বলতে পারবো না। কেবল মনে হ'তে লাগলো অভিনেতাদের মুখগুলি ধীরে-ধীরে কেমন যেন অদ্ভুত হ'য়ে যাচ্ছে। আমার সারা শরীর কেমন অবশ হ'য়ে আসছে ; গ'লে-গ'লে সমতল হ'য়ে যাচ্ছে, সবকিছু উঁচু-নিচু সব একাকার। ছোটো কয়েকজন খুব হাই তুলতে লাগলো, অপেক্ষাকৃত বড়োরাও গল্প জুড়ে দিলো নিজেদের মধ্যে। হঠাৎ একটা লাল জামা পরা বামন ভাঁড়কে একটা কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা লোক থামে বেঁধে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে পেটাতে শুরু করলো। আর তখনই কেবল সবার মনোযোগ ফিরলো ওদিকে, হাসতে লাগলো সবাই। আমার মনে হয় সে-রাত্তিরে এটাই ছিলো সবচেয়ে চমৎকার দৃশ্য।

কিন্তু শেষ অব্দি এক বুড়ি 'দান' মঞ্চে উঠে এলো। বুড়ি 'দান'কেই সবচেয়ে ভয় পাই আমি, বিশেষ ক'রে সে যখন পা ছড়িয়ে ব'সে গান জুড়ে দেয়। তখন সবাইকেই ঝিমিয়ে পড়তে দেখে বুঝলাম, সবারই অবস্থা তথৈবচ। বুড়ি 'দান' প্রথমে ধীর পায়ে এদিক-ওদিক চলতে-চলতে গান করছিলো, শেষে মঞ্চের মাঝখানে রাখা একটা 'জিয়াও'[১০] চেয়ারের ওপর ব'সে পড়লো। আমার ভয়ানক মেজাজ খারাপ হ'লো, গুয়াং-ষিরা তো বিড়বিড়িয়ে গাল পাড়তে আরম্ভ ক'রে দিয়েছিলো। ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করছি ; অনেকক্ষণ পর সেই 'দান' একবার হাত তুললো। ভাবলাম, বুঝি-বা উঠে দাঁড়াবে। কিন্তু হায়! আবার হাতটাকে আগের জায়গায় রেখে আস্তে-আস্তে গেয়েই চললো। নৌকোয় বেশ কয়েকজন দীর্ঘশ্বাস আর চেপে রাখতে পারলো না। হাই তুলতে লাগলো বাকিরাও। গুয়াং-ষি আর সহ্য করতে পারলে না। শেষ পর্যন্ত ব'লেই ফেললো—'ওর গান বোধহয় ভোর অব্দি চলবে। আমাদের এবার ফেরাই ভালো।'—আসবার সময়ের মতোই উৎসাহ দেখিয়ে তৎক্ষণাৎ রাজি হ'য়ে গেলো সবাই। তিন-চারজন নৌকোর পেছন দিকে দৌড়ে গেলো, লগি ঠেলে ত্রিশ-চল্লিশ ফুট পিছিয়ে মুখ ঘোরানো হ'লো নৌকোর। দাঁড় ঠিকঠাক বসিয়ে, বুড়ি 'দান'কে গাল দিতে-দিতে সেই পাইন সাইপ্রেস বনের দিকে এগোলাম আমরা।

চাঁদ তখনো ডোবেনি, বোঝা যায় আমরা খুব বেশিক্ষণ পালা দেখিনি ; আর চাও-চুয়াং ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে চাঁদের আলো ঝলমলিয়ে উঠলো। ফিরে তাকালাম মঞ্চের দিকে। আসবার সময়ের মতোই আবছা মায়াময় সুন্দর দেখাচ্ছে, যেন গোলাপি আলোয় ঢাকা কোনো মায়াপুরীর প্রাসাদ। কানে

এলো সেই বাঁশির আওয়াজ, টানা-টানা সুর। তখন মনে হ'লো, বুড়ি 'দান' হয়তো এতক্ষণে ভেতরে ঢুকে গেছে। কিন্তু কাউকে ফিরে যেতে বলবার ইচ্ছে হ'লো না আর। খুব কম সময়ের মধ্যেই পাইন-সাইপ্রেসের বন পেছনে প'ড়ে গেলো। চারদিকে অন্ধকার তখন আরো মিশমিশে। বোঝা যায়, রাত গভীর হয়েছে। পালা নিয়ে আলোচনা, গালপাড়া, হাসাহাসি, ইয়ার্কি-ফাজলামির মধ্যে—প্রাণপণে নৌকো বেয়ে চলেছে সবাই। নৌকোর মাথায় ঘা-খাওয়া জলের আওয়াজ এখন শোনা যাচ্ছে আরো সুস্পষ্ট। যেন একটা বিরাট শাদা মাছ আমাদের এই নৌকো! একদল বাচ্চাকে পিঠে ক'রে ফেনপুঞ্জের উপরে লাফিয়ে-লাফিয়ে যাচ্ছে। রাতে যারা মাছ ধরে সেই সব জেলেদের কয়েকজন, বেশ বুড়োই হবে, নিজেদের নৌকো থামিয়ে তাকিয়ে দেখতে-দেখতে তারিফ ক'রে উঠলো।

'শান্তি সেতুর গ্রাম' তখনো এক লি পথ বাকি, নৌকোর গতি মন্থর হ'য়ে এলো। দাঁড়িরা সবাই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, কেননা নৌকো বাওয়া হয়েছে খুব দ্রুত। বেশ কিছুক্ষণ যাবৎ পেটে কিছু দানাপানিও পড়েনি। বুদ্ধি বাতলালো কুই (গুই) শেং—"লু হান" বীন খুব ভালো ফলেছে, চ্যালাকাঠও মজুত আছে কিছু। চুরি ক'রে সেঁকে খাওয়া যাক।' সব্বাই রাজি হ'য়ে গেলো তক্ষুনি; আর সঙ্গে-সঙ্গে পাড়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হ'লো নৌকোটা। পাড়ের লাগোয়া খেতেই চক্‌চকে কালো ফলন্ত 'লু হান' বীন।

'ওরে আ-ফা, এদিকটা যে তোদের ক্ষেত, ওদিকটা তো লিউ-ই বুড়োর। কোন দিক থেকে চুরি করবো, বল?'—জিগেশ করলে শুয়াং-ষি। সবার আগে পাড়ে লাফ দিয়েছে সে। ততক্ষণে সবাই লাফিয়ে-লাফিয়ে নেমে পড়েছি পাড়ে। আ-ফা পাড়ে নামতে-নামতে জবাব দিলে—'একটু দাঁড়া, দেখে নিই।' দু-পাশটাই হাৎড়ে-হাৎড়ে দেখে নিলে সে। তারপর সোজা দাঁড়িয়ে বললে—'আমাদেরটাই চুরি কর, এগুলো বেশ বড়ো-বড়ো।' একডাকে সাড়া দিয়ে সবাই আ-ফাদের বীন খেতে ঢুকে পড়লো, দু-হাত ভর্তি ক'রে বীন তুলে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে দিতে লাগলো নৌকোয়। শুয়াং-ষির কিন্তু ভয়, আরো বেশি বীন তুললে আ-ফার মা টের পেয়ে হৈ-হল্লা জুড়ে দেবেন। তাই তার পরামর্শ অনুযায়ী, লিউ-ই দাদুর খেত থেকেও প্রত্যেকেই দু-হাত ভ'রে বেশ কিছু বীন তুলে নিলো।

আমাদের মধ্যে যারা একটু বড়ো ছিলো, তাদের কয়েকজন ধীরে-ধীরে নৌকো বাইতে লাগলো। কেউ-কেউ নৌকোর পেছন দিকে ব'সে আগুন

জ্বাললো। ছোটোরা আর আমি ধানের খোশা ছাড়ানোর কাজে লেগে গেলাম। একটু বাদেই ধান সেঁকাও হ'য়ে গেলো। নৌকোটাকে স্রোতে ইচ্ছেমতো ভাসতে দিয়ে গোল হ'য়ে ঘিরে ব'সে মনের সুখে সেই সেঁকাধান খেতে লাগলাম সবাই। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে আবার নৌকো চালানো আরম্ভ হ'লো। আর অন্যদিকে বাসনগুলো ধুয়ে-ফেলা হ'লো। ধানের খোসাও ফেলে দেওয়া হ'লো জলে। ফলে চৌর্যবৃত্তির আর-কোনো চিহ্নই রইলো না।

শুয়াং-ষির ভয় ছিলো, সোনাদাদুর নুন আর চ্যালাকাঠ ব্যবহার করা হ'লে বুড়োর যা কড়া নজর, নির্ঘাৎ টের পেয়ে যাবেন। কিন্তু সবাই মিলে আলোচনা করার পর ঠিক হ'লো—ভয়টয় করা চলবে না। যদি বুড়ো গালমন্দ করে, তবে গত বছর নদীর পাড় থেকে নেয়া অর্জুন গাছের শুকনো ডালটা বুড়োর কাছ থেকে ফেরৎ চাইবো। সেই সঙ্গে মুখের ওপর ওকে 'ঘেয়ো বুড়ো' ডেকে-ডেকে খচানো হবে।

'সবাই ফিরে এসেছে, আর কোনো গোলমালও হয়নি। আমি তো আগেই বলেছিলাম যে, লিখিত গ্যারান্টি আমি দিতে পারি।'—শুয়াং-ষি হঠাৎ নৌকোর মাথা থেকে চেঁচিয়ে উঠলো।

সেদিকে তাকিয়ে দেখি, শান্তি সেতুর সামনা-সামনি এসে গেছি। সেতুর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন। সে আর কেউ নয়, আমারই মা। আর তাঁরই সঙ্গে কথা বলছে শুয়াং-ষি। আমি সামনের ছই থেকে বেরিয়ে পড়লাম, নৌকোটাও সেতুর নিচে ঢুকে থামলো। আর ঝপাঝপ পাড়ে উঠে এলাম আমরা। লক্ষ করলাম, মা-র বেশ একটু রাগ হয়েছে। বললেন, 'ছ-ঘণ্টা কেটে গেছে, এত দেরি কেন তোদের?' আবার তার পাশাপাশি বেশ খুশিও হয়েছেন বোঝা গেলো। সবাইকে চালভাজা খেতে ডাকলেন।

সকলেই বললো, পেট-পুরে জলখাবার খাওয়া হ'য়ে গেছে, তাছাড়া চোখ জড়িয়ে আসছে ঘুমে, এখন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে পারলেই বাঁচা যায়। এই-রকম ব'লে-ট'লে যে-যার বাড়ি ফিরে গেলো।

পরদিন খুব বেলা ক'রে উঠলাম আমি। কিন্তু সোনাদাদুর চ্যালাকাঠ নিয়ে কোনো ঝগড়া-টগড়া শুনতে পেলাম না। বিকেলে আবার চ'লে গেলাম সেই চিংড়ি ধরতে।

'শুয়াং-ষি, বুঝলি, তোরা সব এক-একটা হাড়-বজ্জাত। আর তুলবি তো

তোল, দেখেশুনে না-তুলে, মাড়িয়ে নষ্ট ক'রে দিয়েছিস বেশ কিছু!' মাথা তুলে দেখি লিউ-ই দাদু, বীন বেচে নৌকো নিয়ে ফিরছেন। পাটাতনের ওপর তখনো একবোঝা বীন।

'হ্যাঁ, করেছি তো। আমরা অতিথিকে খাওয়াচ্ছিলাম। তাও তো প্রথমে ভেবেছিলাম তোমারটা নেবো না। একটু দেখে চলো, নইলে তোমার ভয়ে চিংড়িগুলো পালিয়ে যাবে।'—শুয়াং-ঘির সাফ জবাব।

লিউ-ই দাদু আমায় দেখে দাঁড় থামালেন, হেসে বললেন—'অতিথিকে খাইয়েছিস?—তবে তো ঠিকই করেছিস।' তারপর আমায় বললেন—'স্যুন-ভাই, কাল রাতের অপেরা পালাটা ভালো ছিলো তো?'

আমি মাথা নেড়ে জবাব দিলাম—'খাশা।'

—'বীনের স্বাদ ভালো ছিলো তো?'

আবার মাথা নাড়লাম আমি—'তোফা, চমৎকার।'

অভাবিতভাবে লিউ-ই দাদু ভীষণ বিচলিত হ'য়ে পড়লেন, আঙুল উঁচিয়ে যেন পরমপ্রাপ্তি ঘটেছে এমনভাবে ব'লে উঠলেন—'আসলে বইপড়া শহুরে লোকেরাই জিনিসের আসল কদর বোঝে। বীন বুনবার সময় প্রতিটি দানা আমার বেছে-বেছে নেয়া। গাঁয়ের লোক তো আর ভালো-মন্দর তফাৎ বোঝে না। এরা বলে আমার বীন নাকি অন্যদের চেয়ে মোটেই ভালো নয়। আজই তোর মাকে এগুলো দিয়ে আসবো।'...দাঁড় বেয়ে চ'লে গেলেন সোনাদাদু।

রাতের খাওয়া খেতে মা যখন ডাকলেন, গিয়ে দেখি টেবিলে এক বড়ো বাটি ভাত সেদ্ধ 'লু হান' বীন। লিউ-ই দাদু আমাকে খাওয়াবার জন্য মাকে দিয়ে গেছেন। শুনলাম, শতমুখে আমার প্রশংসা করেছেন মার কাছে—'এত অল্প বয়সেই ঠিক জিনিশ চিনতে শিখেছে, বড়ো হ'য়ে নিশ্চয়ই চুয়াং (ঝুয়াং) ইউয়ান[১১] হবে।'

তবে বীন খেয়ে কিন্তু আমার গত রাতের মতো অত ভালো লাগলো না।

সত্যি-বলতে, আজ এতদিন পরেও বলতে পারি যে, সে-রাতের মতো ভালো বীন তারপর আজ অব্দি খাইনি আর সে-রাতের মতো ভালো অপেরা পালাও আর কোনোদিন দেখিনি।

টীকা :

১। চীনে বছরকাল গোনার এক প্রাচীন পদ্ধতি হ'লো যে-কোনো নতুন রাজত্বকাল থেকে বছরের হিশেব করা। ১৯১১ সালের বিপ্লবে 'গণতন্ত্র'

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। তাই গণতন্ত্রের প্রথম বছর হ'লো ১৯১২ সাল।

২। তান শিন-পেই (তান জিয়াও তিয়ান) ছিলেন তৎকালীন চীনে অপেরার একজন নামকরা অভিনেতা।

৩। চীনে অপেরার একটি বৈশিষ্ট্যময় মহিলা চরিত্র হ'লো 'দান'। তখনকার চীনে পালায় সাধারণত পুরুষরাই মহিলা সেজে 'দান' চরিত্রের রূপ দিতো। আমাদের গ্রাম্য যাত্রাপালার 'বিবেক' জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে চীনে অপেরার এই 'দান' চরিত্রের বেশ খানিকটা মিল লক্ষ করা যায়।

৪। মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন গৌতম বুদ্ধের এক পরম ভক্ত। প্রচলিত গাথা এই যে, তাঁর মা নিজের পাপকাজের জন্যে নরকে গিয়েছিলেন, আর পরবর্তীকালে মৌদ্‌গল্যায়ন মাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসেন।

৫। চীনে অপেরার আরেকজন খ্যাতনামা অভিনেতা।

৬। 'কবরসাফাই': মৃতের সমাধিতে শ্রদ্ধানিবেদনের প্রথা।

৭। 'সংগীতাঞ্জলি': প্রাচীনতম চীনা কাব্য। মূল চীনে পাণ্ডুলিপিতে ঐ কাব্যগ্রন্থ থেকে দুই পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৮। সোনাদাদু: মায়ের অষ্টম কাকা।

৯। শেং: প্রচলিত চীনে অপেরার একটি বিশেষ ধরনের পুরুষচরিত্র।

১০। সম্ভ্রান্ত বংশের চীনে লোকজনদের ব্যবহারযোগ্য এক বিশেষ ধরনের আরামকেদারা।

১১। চুয়াং (ঝুয়াং) ইউয়ান; চীনের উচ্চতর সরকারি পদে নিয়োগ করার জন্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে-পরীক্ষা নেয়া হ'তো, তাতে যে প্রথম হ'তো, তাকে 'চুয়াং ইউয়ান' সম্বোধন ক'রে সম্মান জানানোর চল ছিলো। এই প্রথা বহু বছর ধ'রে চীন দেশে প্রচলিত ছিলো।

অনুবাদ: দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়

[অক্টোবর ১৯২২]

ওয়াং আন-ইউ

তারা তিনজন

চিউ-শান্ বাড়িতে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলো। হঠাৎ কে যেন তার গায়ে চাপড় মারলে। চোখ খুলেই সে দেখতে পেলে তার পেয়ারের বন্ধু তা-মিঙ্ বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। তা-মিঙ্ একফালি হেসে বললে : "আরে বিকেল হ'য়ে গেছে। এত যে ঘুমোচ্ছিস হেদিয়ে পড়ার ভয় নেই তোর ?" চিউ-শান্ চট্‌পট্ উঠে ব'সে জিগেস করলে, "কী ব্যাপার ?" তা-মিঙ্ আর থাকতে না পেরে বললে, "দারুণ খবর আছে।"

"কী দারুণ খবর ?"

"মাও-সাই এইমাত্র আমাকে বললে যে কাল গণমুক্তি বাহিনী আমাদের গ্রামে আসছে যাতে জনগণ তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে পারে। গোটা উদ্যোগ বাহিনী তাদের স্বাগত জানাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। আমার কথা যদি মিথ্যে হয় তা'হলে আমি বাঁদরের মামা।" তাই শুনে চিউ-শান্ হেসে ফেললে। "ঠিক আছে! ঠিক আছে! বড়োরা তৈরি হচ্ছে, আমরা কী করতে যাচ্ছি ?"

"আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে," তা-মিঙ্ উত্তর দিলে। "চল, দেখি তো শিহ্-তৌ কোথায়, ওর সঙ্গে কথা বলি গিয়ে।" চিউ-শান্ সায় দিলে আর এই দুই দস্যিতে মিলে দৌড়ে বেরিয়ে গেলো।

তা-মিঙ্ আর চিউ-শান্ দুজনেই ছিলো গরিব জেলের ছেলে আর দুজনেরই বয়েস চোদ্দ বছর! গত বছর থেকে তারা কী ক'রে দাঁড় বাইতে হয় আর নৌকা চালাতে হয় শিখছিলো। আর তা-মিঙের নেতৃত্বে তারা অবসর সময়ে একটা যুব অনুশীলন সমিতিও গ'ড়ে তুলেছিলো আর স্কুলের ছুটির পর তাদের সময়টা তারা জলজ প্রজনন কেন্দ্রের জন্যে কুচো চিংড়ি ধরতে সাহায্যে লাগাতো। বড়োরা ছোটদের ওপর খুব খুশি হ'য়ে বলেছিলো ওরা কত প্রতিশ্রুতিবান।

সেই শেষ গ্রীষ্মের বিকেলে আকাশ ইতিমধ্যে মেঘে ঢেকে গেছিলো।

বাচ্চাদের মুখে মাঝে মাঝে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিলো। তারা দক্ষিণের রাস্তা ধ'রে কিছুটা গিয়ে অবশেষে একটা বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। দরজাটা ক'ষে বন্ধ। চিউ-শান্ নিজের মুখের ওপর হাত চেপে রেখে, দরজার দিকে মুখ ক'রে দু-বার জোরে প্যাঁচার ডাক ডাকলে। দরজাটা একটুখানি ফাঁক হ'লো। তারপর একটা বাচ্চা ছেলে বেরিয়ে এলো। সে হ'লো শিহ্-তৌ। শিহ্-তৌ-র বাবা, লি-ঝু-চিঙ্ একটা ট্রলারে কারিগরের কাজ করতো। সে তার কাজে খুব পটু ও উৎসাহী ছিলো, কিন্তু তার বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটা বাজে ছিলো। কখনো সে খুবই উষ্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ, এই তাদের গায়ে সস্নেহে চাপড় মারছে বা জড়িয়ে ধরছে, আবার পরক্ষণেই তাদের দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে হম্বিতম্বি ও গালাগালি করছে। তাই শিহ্-তৌ তাকে রাগাতে ভীষণ ভয় পেতো আর সেইজন্যেই ছেলেটা তার বন্ধুদের তাকে বাড়িতে এসে ডাকতে মানা করেছিলো। তারা ডাকার জন্যে একটা গোপন সংকেত ঠিক করেছিলো। তাকে বাইরে বের করে আনতে চাইলে, তারা বাইরে দাঁড়িয়ে প্যাঁচার ডাক ডাকতো আর শিহ্-তৌ চুপিচুপি বেরিয়ে আসতো। তা-মিঙ্ আর চিউ-শান্‌কে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে সশঙ্ক মুখে ফিসফিস করে জিগেস করলে : "কী হয়েছে ?"

তা-মিঙ্ তাকে সুখবরটা দিয়ে বললে, "গণমুক্তি বাহিনীকে স্বাগত জানাবার জন্যে আমার মা ইতিমধ্যেই কিছু খাবার-দাবার তৈরি ক'রে ফেলেছে। চেয়ারম্যান মাও আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে বলেছেন, 'সৈন্য-বাহিনীকে মদত দাও আর জনগণকে মনে রেখো।' আমি তখন ভাবলাম, এই ফাঁকে আমরা আজকের বিকেলটা কাঁকড়া ধরার কাজে লাগাতে পারি। কাল যখন গণমুক্তি বাহিনী এসে পৌছোবে, আমরা তাই দিয়ে তাদের স্বাগত জানাবো। তুই কী বলিস ?"

শিহ্-তৌ তা-মিঙের আসল মতলবে পুরোপুরি সায় দিলে। কিন্তু ব্যাকুল মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে তার বুক দুরদুর ক'রে উঠলো। সে বললে, "আবহাওয়ার অবস্থা ভাখ। তোদের কি মনে হয় সব ঠিক হ'য়ে যাবে ?"

"আমরা তীরের কাছাকাছিই থাকবো," তা-মিঙ্ জবাব দিলে। "যে মুহূর্তে আবহাওয়া বদলাবে আমরা বাড়িমুখো রওনা দেবো।"

"চল, রাও-সাই ভাইকে জিগেস করি গিয়ে", চিউ-শান্ পরামর্শ দিলে।

"যাই হোক আমরা তো সবকিছু খোলাখুলি করছি। সে নিশ্চয় আমাদের মদত দেবে।"

"হ্যাঁ, দেরি হয়ে যাচ্ছে," তা-মিঙ্ অনুযোগ করলে। "যদি যেতে হয় তাহ'লে এখুনি চল্।" তারা শিহ্-তৌ-এর কোনো জবাবের অপেক্ষা না-ক'রেই তাকে টেনে নিয়ে চললো।

তিনটে বাচ্চা বন্দরে গিয়ে পৌঁছোলো। তা-মিঙ্ বন্দরের দলীয় শাখার সম্পাদক চ্যাং মাও-সাইকে দেখতে পেলো, আর তাকে তাদের মনের কথা জানালে। মাও-সাই-এর মনে হ'লো বাচ্চাদের মতলব ভালোই। শুধু আবহাওয়া অত খারাপ ছিলো ব'লে সে তাদের যেতে দিতে একটু ইতস্তত করছিলো। তা-মিঙ্ বললে, "চিন্তা কোরো না, আমরা বেশিদূর যাবো না।" সে জানতো বাচ্চাদের দলটার নৌকা বাইবার কিছু অভিজ্ঞতা ছিলো আর সৈন্যদের ওপরও তাদের ছিলো গভীর ভালোবাসা।

"ঠিক আছে, তাহ'লে। যদি তোরা কাঁকড়া ধরতে যাস।" সে ব'লে দিলে, "গভীর জলে যাস না। আবহাওয়া বদলাতে দেখলেই নৌকা বন্দরে এনে লাগাস।" তা-মিঙ বললে, "আচ্ছা।" আর তিনটে বাচ্চা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দৌড়োলো বন্দরের পূর্বদিকের জেটি লক্ষ্য ক'রে। জলজ প্রজনন বাহিনীর একটা ছোট্ট ডিঙি নৌকো সেখানে নোঙর করা ছিলো। বসন্তকালে কুচোচিংড়ি ধরার কাজে সেটা ব্যবহার করা হ'তো। কিন্তু এখন মরশুম শেষ হ'য়ে গেছিলো। সুতরাং, ছেলেরা সারাদিন ধরে নৌকোটা নিয়ে উপসাগরে দাঁড় বাওয়া আর চালানো অভ্যেস করতে পারতো।

একনজরে সবকিছু ভালো ক'রে দেখে নেবার জন্যে তা-মিঙ্ নৌকোর ওপরে গিয়ে উঠলো। সে চিউ-শান্-এর দিকে ফিরে বললে, "ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি সবকিছু জোগাড়যন্তর করে ফ্যাল।" আধ ঘণ্টা পরে, তা-মিঙ আর শিহ্-তৌ তাদের কাঁকড়া ধরার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বন্দরে ফিরে এলো, কিন্তু চিউ-শান্-এর টিকিটিও দেখা গেলো না। ঠিক যখন শিহ্-তৌ অধৈর্য হয়ে উঠেছে, সে দেখতে পেলে চিউ-শান্ বঁড়শি, চিমটে, পাত্র আর ঝড়- লণ্ঠন নিয়ে আসছে। শিহ্-তৌ চিউ-শান-এর মতো সমুদ্র সম্বন্ধে অতো অভিজ্ঞ ছিলো না, তাই চিউ-শানকে দেখে সে অন্যায় অভিযোগ করলে, "তুই সত্যি কীভাবে সময় নষ্ট করিস ভাখ তো, এদিকে সন্ধে হয়ে গেলো।" "আমার তোর থেকেও তাড়া

বেশি," বললে চিউ শান্। "কিন্তু আমি যতই উদ্‌ভ্রান্ত হচ্ছিলাম ততোই ঝড়-লণ্ঠনটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।"

"কিন্তু আমরা তো আর বাইরে রাত কাটাতে যাচ্ছিনা"; শিহ্-তৌ প্রত্যুত্তর করলে। "তবে আর এই লণ্ঠন নিয়ে কী হবে?"

চিউ-শান্ নৌকোয় উঠে খুব গম্ভীর গলায় বললে, "বড়োরা কী বলেছে ভুলে গেছিস? সমুদ্রে এক-পা বা এক কিলোমিটার যতো দূরেই যাস না কেন, একটা লণ্ঠন, জল আর আগুন সবসময়ে নৌকোয় সঙ্গে নেওয়া উচিত।"

"ও ঠিকই বলেছে," তা-মিঙ্ বললো। "হাজারে একটা বিপদের আশঙ্কা থাকলেও, হাজারটা বন্দোবস্তের একটাও আমাদের ছাড়া উচিত নয়। যদি সত্যিই ঝড় ওঠে তখন আমাদের কী হবে?" সে দেখলো চিউ-শান ততক্ষণে নোঙর তুলে ফেলেছে। সে হাল ধরে দাঁড় বাইতে শুরু করলো।

চ্যাংচিয়া উপসাগরে একটা ছোট্ট বন্দর ছিলো। বন্দর থেকে একশো মিটারেরও কম দক্ষিণে গেলেই উন্মুক্ত সমুদ্র। পুবদিকের সমুদ্র চোরা চড়া, বালিয়াড়ি আর পোড়ো পতিত দ্বীপে ভরা ছিলো। যেহেতু লোকজন ঐসব দ্বীপে যেতে পারতো না, তাই তাদের পাড়ের ফাটলগুলো শুক্তি আর বড়ো লাল দাঁড়াওয়ালা শাঁসালো কাঁকড়ায় ভরা ছিলো।

ছোটো ডিঙিটা যখন উপকূল ছাড়লো, তখন প্রথমে সেটা পশ্চিম থেকে পুবের দিকে প্রধান তীর ঘেঁষে এগিয়ে চললো। দক্ষিণ-পুবমুখো বিস্তীর্ণ পাহাড়ি এলাকা পর্যন্ত নৌকোটা খুব আস্তে-আস্তে গেলো। তারপর নৌকোটা দক্ষিণ সমুদ্রতীর ধ'রে চললো। পাহাড়গুলোর পশ্চিম দিকে একের পর এক চোরা বালিয়াড়ি থাকায় নাবিকদের পক্ষে জাল ফেলা কষ্টকর ছিলো আর নৌ-চালনাও দ্বিগুণ সাবধানে করতে হ'তো। দক্ষিণদিকে পাহাড়গুলোর চূড়ায় নৌকোগুলোকে পথ দেখাবার জন্যে একটা বাতিঘর ছিলো যাতে তারা পথ ভুলে বালিয়াড়িতে গিয়ে ধাক্কা না-খায়। যে-কোনো অবস্থাতেই চ্যাংচিয়া উপসাগরে ঢুকতে হ'লে সমস্ত নৌকাকেই মূল ভূখণ্ডের চারপাশে অনেকটা পথ ঘুরে আসতে হ'তো। তা-মিঙ্ ও অন্যান্যরা বাতিঘরের নিচু পর্যন্ত দাঁড় বেয়ে এসে তারপর উল্টোদিকে উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা ছোট্ট দ্বীপের অভিমুখে যেতে শুরু করলে। যেই তারা খাড়ির জল বেয়ে দ্বীপের মধ্যে ঢুকে পড়লো, তা-মিঙ নৌকো যাতে দ্বীপের সঙ্গে ধাক্কা না-খায় তাই শক্ত হাতে হাল সামলালো আর চিউ-শান্ তীরের উঁচু জমিতে নিরাপদে নোঙর ফেললো। তারপর

তারা কোনোরকমে কষ্টেসৃষ্টে যে-দ্বীপটায় গিয়ে উঠলো সেটা ছিলো একটা বড়ো পাথর—গাছপালাহীন, ঘাস ছিলো না, এমনকি একটু মাটিও না। দ্বীপটার থেকে পুবদিকে তাকালে এক কিলোমিটারেরও কম দূরে ছিলো পাহাড়গুলো; কিন্তু চ্যাংচিয়া উপসাগরের দূরত্ব ছিলো সেখান থেকে তার দ্বিগুণ।

বাচ্চা তিনটে সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে লোহার হুক দিয়ে জল আর পাথরের ফাঁকফোকর থেকে কাঁকড়া ধরতে শুরু করলো। কাঁকড়াগুলো সত্যি খুব বড়ো-বড়ো আর তাদের লাল চকচকে সাঁড়াশির মতো দাঁড়াগুলো ছিলো বুড়ো আঙুলের মতো মোটা। চিউ-শান্ তার জামা খুলে ফেলে কোমরে জড়িয়ে নিয়েছিলো। সে লোহার হুক দিয়ে পাথরের ফোকরগুলো খোঁচাচ্ছিলো আর দু-বার টান আর ঝাঁকি মেরে হঠাৎ হুকটা টেনে তুলতেই তার ডগায় একটা বড়ো বাটির মতো কাঁকড়া ঝুলতে দেখা যাচ্ছিলো। দু-ঘণ্টায় তারা আধ পাত্রেরও বেশি কাঁকড়া শিকার ক'রে ফেলেছিলো। সে নিজেদের সাফল্যে খুশি হ'য়ে পরামর্শ দিয়ে বললে, "চল, আজ রাতেই রওনা হই। প্রথমেই এগুলো লাল টকটকে ক'রে রান্না করবো যাতে কাল যখুনি গণ-মুক্তি বাহিনী এসে পৌছবে, আমরা তাদের সামনে কাঁকড়াগুলো রেখে যেন বলতে পারি, আগে খাও, এই কাঁকড়াগুলোই হ'লো এই এলাকার বিশেষত্ব।"

তা-মিঙ্ আরো বললে, "আমরা নিজেরা এগুলো ধরেছি আর কিনে খাওয়া জিনিশ আর এ জিনিশ এক নয়।"

তা-মিঙ্ ও তার সঙ্গীরা সৈন্যদের জন্যে পাথরের খাঁজে কাঁকড়া শিকারে এমন তন্ময় হয়েছিলো যে আকাশের দিকে তারা একবারও মাথা তুলে তাকায়নি। তাই হঠাৎ যখন তাদের মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ার মতো প্রবল গর্জনে মেঘ ঢেকে উঠলো, তখন তারা সবাই দারুণ চমকে উঠলো। শিহ্-তৌ সচকিত হ'য়ে ওপরে তাকালে। যে আকাশ একটু আগে অত ঝকঝকে পরিষ্কার ছিলো, এখন তা ঘন কালো মেঘে ঢেকে গেছে। একনাগাড়ে মেঘ ডাকছিলো আর মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিলো। শি-তৌ বললে, "এই সেরেছে! সর্বনাশ হয়েছে, দারুণ ঝড় আসছে।" এই ব'লে খাঁড়িতে নোঙর ক'রে রাখা নৌকোর দিকে রওনা হলো। চিউ-শান্ তা-মিঙের দিকে তাকালো। তার হাবভাবে মনে হচ্ছিলো যেন কিছুই হয়নি। সে তার হাতের পাত্রটা নামিয়ে রেখে পাথরের চূড়াটার দিকে এগোলো।

তা-মিঙের এই শান্তভাবের মূলে একটা ঘটনা জড়িত ছিলো। তার

বাবা তিরিশ বছর সমুদ্রে কাটিয়েছে আর যতরকমের ঝড় কল্পনা করা যায় সবরকম সম্বন্ধেই তার অভিজ্ঞতা ছিলো। মুক্তিযুদ্ধের আগে সে এবং আরো দুজন মিলে পাঁচজন জলদস্যুকে খতম করেছিলো। আর একবার ১৯৫৬ সালে যখন সে খোলা সমুদ্রে জাল ফেলার জন্যে তৈরি হচ্ছিলো, তখন ১১-অশ্ব শক্তি সামুদ্রিক তুফানের মুখোমুখি পড়েছিলো। তিনদিন তিনরাত ধ'রে সমানে ঝড় চলেছিলো আর তাদের সেখান থেকে পাঁচশো কিলোমিটারেরও বেশি দূরে উড়িয়ে নিয়ে গেছিলো। তারা সেবার শুধু সেই তুফান থেকেই বেঁচে ফিরে আসেনি, পরে পাঁচ হাজার কিলোরও বেশি মাছও ধ'রে এনেছিলো। ছোটোবেলা থেকেই তা-মিঙ্‌ তার পূর্বপুরুষদের সমুদ্রের সঙ্গে লড়াইয়ের নানান গল্পে মুগ্ধ হয়েছিলো। তাদের কাছ থেকে সে অনেককিছু শিখেছিলো। গত বছর যখন সে বসন্তকালীন কুচোচিংড়ি জোগাড় করছিলো ৬-অশ্বশক্তির ঝড়ের সঙ্গে মোলাকাৎ হয়েছিলো তার। সে যে ছোট্ট নৌকোটাতে ছিলো সেটা চার কিলোমিটার বিপথে ভেসে গেছিলো, তবু সে সেটাকে নিরাপদে কূলে এনে ভিড়িয়েছিলো। সুতরাং তাকে সবাই বাচ্চাদের নেতা ব'লে ধ'রে নিয়েছিলো।

শিহ্‌-তৌ খুব ভয় পেয়ে গেছিলো আর নৌকায় গিয়ে উঠতে চাইছিলো। কিন্তু যেহেতু তা-মিঙ্‌ তখনো তার মত জানায়নি, শিহ্‌-তৌ শুধুই নৌকোর পাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

উত্তরদিকের পাহাড়গুলো ততক্ষণে বৃষ্টি আর কুয়াশায় ঝাপসা হ'য়ে গেছিলো। চূড়ার ওপর হাওয়ার বেগ সম্ভবত কম ক'রেও ৭-অশ্বশক্তির ছিলো, আর হাওয়ার চাবুক খাওয়া সমুদ্র শাদা ফেনায় ভরে গেছিলো। তা-মিঙ্‌ তবুও ধীর স্থির হ'য়ে রইলো। যখন চিউ-শান্‌ তাকে সমুদ্রের পাড়ে নেমে আসতে দেখলো, সে দৌড়ে গিয়ে তাকে জিগেস করলে, "আমরা কী করবো? চ'লে যাবো?"

তা-মিঙ্‌ দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলে, "না! কোনো উপায় নেই। খুব জোরে হাওয়া বইলে গুরুজনেরা নৌকা বাইতে নিষেধ করেছেন, আবার খুব বড়ো-বড়ো ঢেউ থাকলেও নৌকা তীরে ভিড়োতে মানা করেছেন। আমরা এখন যেতে পারি না।"

ঠিক তখনি জোরে হাওয়া বইতে আর বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। মুষল-ধারে বৃষ্টি নামলো। তিনজনেই দ্বীপের ওপর উবু হ'য়ে বসলো। ভিজে

একেবারে জবজবে হ'য়ে। তা-মিঙ্ আর চিউ-শান একে অন্যের দিকে তাকালে। চিউ-শানের চুলগুলো তার মাথার সঙ্গে একেবারে সেঁটে গিয়েছে, তার মুখে একনাগাড়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তা-মিঙের জামাটা তার গায়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। হঠাৎ জামার মধ্যে হাওয়া ঢুকে জামাটা এমন ফুলে উঠছে যে মনে হচ্ছে যেন জামার ভেতর একটা ইঁদুর ঢুকে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাদের দেখে মনে হচ্ছিলো যেন তারাই গন-মুক্তিবাহিনী, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দৃঢ়ভাবে সবকিছু সহ্য ক'রে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি ক'মে এলো আর আটটা নাগাদ থামলো। কিন্তু ঝোড়ো বৃষ্টির পর সবেগে হাওয়া বইছিলো। যতদূর তাদের দৃষ্টি যায় তারা দেখলো সমুদ্র ঘন কুয়াশায় ঢাকা। তারা চ্যাংচিয়া উপসাগরের আলোও দেখতে পাচ্ছিলো না, শুধু উত্তর আকাশে দেখছিলো বিদ্যুতের চমক।—"অবস্থা খুব সঙ্গিন," নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বললে চিউ-শান্। "মনে হচ্ছে এ-বৃষ্টি চলতেই থাকবে।"

তা-মিঙ ঝট করে হাওয়ার গতিবিধি দেখে নিয়ে বললে: "ঠিক আছে, চ'লে যাওয়াই যাক। বাড়ির দিকে দাঁড় বাই, চল!"

বাচ্চা তিনটে সমুদ্রে নেমে এসে আকাশ এফোঁড়-ওফোঁড় করা এক বিদ্যুৎ চমকানির আলোয় নৌকোয় এসে উঠলো। শিহ্-তৌ লণ্ঠনের আলোটা উশকে বাড়িয়ে দিলে। চাউ-শান্ পাত্র তিনটে সামলে রেখে নোঙর তুললো। ছোট্ট নৌকোটা দ্বীপ ছেড়ে ভাসলো। তারা পুবদিকে রওনা হ'লো, তারপর নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিকে দাঁড় বাইতে লাগলো। নৌকোটা ঢেউয়ের চূড়ায় চ'ড়ে একবার ওপরে একবার নিচে ওঠানামা করতে লাগলো। তা-মিঙ্ আর চিউ-শান তাদের সর্বশক্তি দিয়ে দাঁড় বেয়ে চললো আর শিহ-তৌ বিশ্বস্তভাবে লণ্ঠনটা ধ'রে রইলো। কিন্তু তবু তো তারা ছোটো বাচ্চা, তাদের শক্তিও সীমিত, আর আজ তারা রাতের খাবারও খায়নি। তার ওপরে তারা দাঁড় বাইছিলো হাওয়ার প্রতিকূলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চিউ-শান্ এমন ক্লান্ত হয়ে পড়লো যে তার মুখ ঘামে ভিজে চুপশে গেলো আর হাঁপাতে লাগলো। তা-মিঙ্ তা লক্ষ ক'রে শিহ্-তৌ কে চিউ-শান্ এর জায়গা নিতে বললো। শিহ্-তো তাকে লণ্ঠনটা দিয়ে দাঁড় হাতে নিলে। আরো কিছুক্ষণ দাঁড় বাইবার পর তা-মিঙ্ও ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়লো। চিউ-শান্ হাতের লণ্ঠনটা তা-মিঙ্কে দিয়ে তার সঙ্গে জায়গা

বদল করলে। একঘণ্টারও বেশি তারা এইভাবে দাঁড় বাইলো। কিন্তু ছোট্ট নৌকোটা তবু এক কিলোমিটারেরও কম এগিয়েছিলো।

তিনজনে মিলে ঝড় আর ঢেউয়ের সঙ্গে দুঃসাহসের সঙ্গে লড়তে-লড়তে তাদের সর্বশক্তি দিয়ে আবৃত্তি করছিলো : "সাহস রাখো, ধৈর্য ধরো, কোনোরকম ত্যাগ স্বীকারে ভয় পেয়োনা এবং জয়ী হবার জন্যে প্রতিটি বাধাকে অতিক্রম করো।" তারা উত্তরতীরের দিকে যাবার জন্যে জোর হাত লাগালো। হঠাৎ উপকূল থেকে দূরে, বাইরের সমুদ্র থেকে তারা কুয়াশার বুক চিরে আসা কোনো সাবধানী ভোঁ শুনতে পেলো। প্রথমে তারা অতোটা খেয়াল করেনি। কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসতেই তা-মিঙ্-এর নজরে পড়লো যে আপাতত ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাতিঘরের মোটেই আলোটা কাজ করছে না। তা-মিঙ্ পুবদিকে লণ্ঠনের আলো ফেললো। সে শুধু দেখলো, ঘন কালো অন্ধকার সমুদ্রে তাদের সামনে জলে একটা বিশাল মোষের মতো কী যেন উঠে আসছে। সে তার মুখ থেকে ঘাম মুছলো। "ত্যাখ্," সে বললে, "আমরা 'লম্বা গলা'য় পৌঁছে গেছি। আমাদের যতটা যেতে হবে তার তিনভাগের দু-ভাগ পেরিয়ে এসেছি।"

লোকেরা সমুদ্রের তলায় সারিবদ্ধ পাহাড়গুলোর ঘরোয়া নাম দিয়েছিলো "লম্বা গলা।" এখান থেকে বেলাভূমির দূরত্ব এখন এক কিলোমিটারেরও কম। তারা যদি প্রাণপণ দাঁড় বাইতো তাহলে আধঘণ্টার কম সময়ে তীরে পৌঁছে যেতো। বাচ্চারা যখন সেই পাথুরে চরটা দেখতে পেলো, তখনি তাদের মনশ্চক্ষে নিজেদের বাড়ির দরজার ছবি ভেসে উঠলো। কী স্বস্তিই যে পেলে তারা! কিন্তু ঠিক সেই সময় তারা আবার কুয়াশা ভেদ ক'রে আসা জাহাজের ভোঁ শুনতে পেলো। ইঞ্জিনের শব্দটা ক্রমাগত কাছে এগিয়ে আসছিলো। ভোঁ-এর আওয়াজ শুনে তারা বুঝতে পারলো যে জাহাজটা শিগগির পাহাড়ের কাছে এসে পৌঁছোবে। "একটা বিপদ হ'তে চলেছে," তা-মিঙ্ বললে।" আচ্ছা, চিউ-শান্ তোর কি মনে হয় জাহাজটা তীরের পাথরগুলোর সঙ্গে ধাক্কা খাবে?"

চিউ-শানেরও খুব ভাবনা হচ্ছিলো। "সত্যি এ এক বিচ্ছিরি ব্যাপার," সে উত্তর করলে, "তবে আমরা কী করতে পারি?"

তা-মিঙ্ খুব মন দিয়ে ইঞ্জিনের শব্দটা শুনলো। সে খুব দ্রুত মনস্থির ক'রে ফেললো। "চল, তাড়াতাড়ি পুবদিকে ফিরে যাই। নৌকোটাকে পাহাড়ের

নিচ পর্যন্ত নিয়ে চল, যাতে পাহাড়ে উঠে আমরা ওদের বিপদ সংকেত জানাতে পারি।" চিউ-শান তৎক্ষণাৎ রাজি হ'লো আর পেছনদিকে দাঁড় বাইতে শুরু করলে। নৌকোটা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললো, কিন্তু সেখানে পৌছে হাওয়া এমন বেগে সমুদ্রে ঝাপটা মারতে লাগলো যে, বাচ্চারা তিন-তিনবার চেষ্টা ক'রেও তীরে নৌকা ভেড়াতে পারলো না, প্রতিবারই ঢেউয়ের ধাক্কায় পিছিয়ে আসতে হ'লো।

"আমার ভয় হচ্ছে যে যতক্ষণে আমরা পাহাড়ের ওপর গিয়ে পৌছোতে পারবো ততক্ষণে স্টীমারটাও এসে যাবে," শিহ্-তৌ বললে। তা-মিঙ্ আবার ইঞ্জিনের শব্দ শোনার চেষ্টা করলো। শব্দটা সারাক্ষণই কাছে এগিয়ে আসছে। আর ওরা যখন পাহাড়ে উঠতে পারছিলো না জাহাজটা তখনো নিশ্চিন্ত ভাবে এগিয়ে আসছিলো। তা-মিঙ্ লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মুখ ক'রে সেটাকে দোলাতে লাগলো। কিন্তু ওদিক থেকে তার কোনো প্রতিক্রিয়াই বোঝা গেল না।

"লণ্ঠনের আলো দেখেও ওরা থামছে না কেন?" চিউ-শান্ জিগেস করলে।

"ওরা দেখতে পাচ্ছে না," তা-মিঙ্ জবাব দিলে। "পাহাড়গুলো ওদের দৃষ্টিকে আড়াল ক'রে দিচ্ছে। সংকেত দেওয়ার পক্ষে এই জায়গাটা ঠিক নয়।"

"তাহ'লে?" চিউ-শান্ জিগেস করলে। "এখন তবে আমরা কী করবো?"

"আমাদের কী করা উচিত?" তখনি তা-মিঙ্ কোনো উত্তর দিলে না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো—যদি তারা চাইতো যে ওরা লণ্ঠনটা দেখতে পাক তাহ'লে আবার তাদের সেই পাহাড়গুলোর কাছে দাঁড় বেয়ে ফিরে যেতেই হ'তো, ঠিক যেখানে তারা কাঁকড়া শিকার করেছিলো। একজন কম্যুনিস্টের কি কর্তব্য সে সম্বন্ধে চেয়ারম্যান মাওয়ের বাণী তার মনে পড়লো: "বিপ্লবের স্বার্থকে নিজেরই জীবনের মতো ক'রে দেখা।" আর সেই অসংখ্য বিপ্লবীদের কথাও মনে পড়লো তার যারা জনগণের স্বার্থে দৃঢ়ভাবে প্রত্যেকটি বিপদের মোকাবিলা করেছিলো। সে নৌকোটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দৃঢ়সংকল্প হ'লো আর তার সামনে তখন অগণিত ছুরির ফলার উদ্যত বাধা থাকলেও সে তাই করতো। যখন তা-মিঙ্ কোনো উত্তর দিলে না, চিউ-শান্ বললে: "কিছু একটা বল। আমাদের গণ-মুক্তিবাহিনীর মতো যত রকম অসুবিধার কথা ভাবা যায়, সব অতিক্রম করার সামর্থ্য রাখতে হবে।"

তা-মিঙ্ দক্ষিণদিকে তাকিয়ে চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলো, "যেদিক থেকে এসেছি সেদিকে ফিরে চল!"

তার আদেশে চিউ-শান্ আর শিহ্-তৌ তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ ক'রে দাঁড় বাইতে লাগলো। তারা নৌকোটা দ্রুত মুখ ঘুরিয়ে দক্ষিণদিকে রওনা দিলো।

ব্যগ্রতার সঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে দাঁড় বেয়ে আর সেই সঙ্গে অনুকূল হাওয়ার সাহায্যে তারা অচিরেই দ্বীপটায় ফিরে এলো। শিহ্-তৌ লণ্ঠনের আলোটা বাড়িয়ে দিলে আর তা-মিঙ্ পাড়ের পাথরটার গায়ে ধীরে সুস্থে নৌকাটা লাগালে। চিউ-শান্ হাঁফ ছেড়ে লোহার নোঙরটা পাড়ের দিকে ছুঁড়লো। তারা হাঁপাতে-হাঁপাতে কোনোরকমে নৌকো থেকে নেমেই পাহাড়ে উঠতে লাগলে। পুবদিকের সমুদ্রে তারা একটা লাল আলো জ্বলজ্বল করতে দেখলো। সেটা উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের পাহাড়গুলোর উদ্দেশে ছুটে চলে-ছিলো। তা-মিঙ্ তৎক্ষণাৎ শিহ্-তৌ-এর হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে সেটা দুলিয়ে সংকেত দিতে আরম্ভ করলে। এদিকে চিউ-শান্ সমানে, "ওহে শোনো, ওদিকে আর এগিয়ো না! সামনে পাহাড় আছে! সামনে এগিয়ো না!" ব'লে চ্যাচাতে লাগলো। জাহাজের কেউ নিশ্চয় দ্বীপের আলোটা দেখতে পেয়েছিলো, তাই হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হ'য়ে গেল। অল্প কিছুক্ষণ থেমে থাকার পর আবার ইঞ্জিন চলতে শুরু করলো। তিনজন ছেলেই লক্ষ করলো যে জাহাজটা দিক বদলে লণ্ঠনের সংকেত অনুযায়ী দক্ষিণদিকে চলতে শুরু করেছে। প্রায় এক কিলোমিটার পথ যাবার পর জাহাজটা মুখ ঘুরিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে চ্যাংচিয়া অভিমুখে রওনা হ'লো। যখন তারা জাহাজটাকে নিরাপদে বন্দরে ঢুকতে দেখলো, তারা মৃদু হেসে আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। তাদের মুখে কথা সরছিলো না। তারা তাদের ক্লান্তি ভুলে গেছিলো আর শীতও অনুভব করছিলো না। উপকূলে জাহাজটার লাল আলোটা মিলিয়ে যেতেই তারা তাদের ছোট্ট নৌকোর উদ্দেশে রওনা দিলে। কিন্তু সেখানে পৌছে তারা অবাক হ'য়ে গেলো।

"এবার আমরা সত্যিই বিপাকে পড়েছি," শিহ্-তৌ হঠাৎ ব'লে উঠলো। "আমাদের নৌকো হাওয়া।"

তারা জাহাজটাকে সংকেত দেবার জন্যে এমন তাড়াহুড়ো ক'রে দ্বীপে উঠেছিলো যে নৌকোটাকে যথেষ্ট সাবধানে নোঙর করে রেখে যায়নি।

প্রবল হাওয়া নোঙর উৎখাত ক'রে নৌকোটাকে দ্বীপ থেকে বহুদূরে টেনে নিয়ে গেছিলো। নৌকোটা তখন তীর থেকে একশো মিটার দূরে।

মূল ভূখণ্ডের আবহাওয়া থেকে দ্বীপের আবহাওয়া ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। এমনকি গরমকালেও রাত্রিবেলা গায়ে মোটা জ্যাকেট দিতে হয়। আর ছেলেগুলোর গায়ে ছিলো পাৎলা টি-শার্ট। সেগুলোও আবার জলে ভিজে স্যাঁতা আর বাচ্চাগুলোর পেটে তখনো কিছু পড়েনি। একবারে হাঁটাচলা বন্ধ ক'রে তাদের মনে হ'লো যেন তারা বরফে জ'মে যাচ্ছে।

চিউ-শান্ ছিলো সত্যিকারের আশাবাদী। যে-কোনো বাধাই সামনে আসুক না কেন সে কখনো নিরাশ হ'য়ে পড়তো না। যাই হোক, এখন তার এত ঠাণ্ডা লাগছিলো যে সে শীতে ঠকঠক ক'রে কাঁপছিলো। কিন্তু সে তার সর্বশক্তি দিয়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, মুখ দিয়ে একটা টুঁ-শব্দও বের করলে না। শিহ্‌-তৌ জীবনে প্রথম এখন বিপদে পড়েছে আর সে হতাশায় মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে। তা-মিঙ্‌ ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। "আমাদের হওয়া উচিত লাল ফৌজের মতো," সে চেঁচিয়ে উঠলো। "এই সমস্ত অসুবিধের মধ্যে দিয়েই আমাদের অদম্যভাবে রাতটা কাটাতে হবে।"

চিউ-শান সবার আগে সায় দিলে: "ঠিক বলেছিস্! আমাদের গণমুক্তিবাহিনীর মতোই হওয়া উচিত! বাধা-বিঘ্ন যত বড়ো হবে আমাদের জয় করার ইচ্ছেও তত বেড়ে চলবে।" তারা দুজনেই শিহ্‌-তৌ-এর দিকে তাকালো। কিন্তু সে তখনো চুপচাপ। চিউ-শান্ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে নিজের বুক ঠুকলো। "আয়, গান গাই," ব'লে সে চেঁচিয়ে উঠলো।

"ঠিক বলেছিস", ব'লে তা-মিঙ্‌ও তার সঙ্গে যোগ দিলে আর ঝটপট তিনজনেই উঠে দাঁড়ালো। তারা সবেমাত্র একটা স্তবক গাওয়া শেষ করেছে এমন সময় একটা মোটর ইঞ্জিনের শব্দ এগিয়ে আসতে শুনলো। তা-মিঙ্‌ ভাবলো আবার কোনো জাহাজ বুঝি বিপদে পড়তে চলেছে আর খুব চিন্তিত হ'য়ে দূরের দিকে তাকিয়ে রইলো। একটা উজ্জ্বল আলো চ্যাংচিয়া উপসাগর থেকে তাদের ছোট দ্বীপের দিকে এগিয়ে আসছে। শিহ্‌-তৌ-এর চোখ ছিলো খুব ধারালো। সে একটু পরেই চিৎকার ক'রে বললে, "চিউ-শান্! শিগ্‌গির আয়! ছাখ! ওরা আমাদের উদ্ধার করতে আসছে!" তারা নৌকোটাকে চিৎকার ক'রে স্বাগত জানাতে লাগলো আর চেঁচিয়ে তাকে পথ বাৎলে দিতে থাকলো।

"এই যে, এইখানে!"

"আমরা এই দ্বীপে!"

"এইদিকে!"

আসলে যখন তারা তাদের ছোট্ট নৌকো নিয়ে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে লড়াই করছিলো, তখনই তাদের বাড়ির লোকজন সমুদ্রতীর বরাবর তাদের খোঁজ করতে শুরু করে দিয়েছিলো। তারা ভাবেইনি যে বাচ্চাগুলো এত গভীর সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারে। আর এটাও তাদের মাথায় আসেনি যে, বাড়ি ফেরার পথে বাচ্চাগুলো আবার স্টিমারকে পথ দেখাবার জন্যে ফিরে যেতে পারে। প্রথমে, লম্বা গলা থেকে আলোর ঝলকানি নজরে পড়েছিলো, কিন্তু খোঁজ করার জন্যে নৌকোটা সেখানে গিয়ে পৌছোতেই দেখা গেলো সেখানে কেউ কোথাও নেই। যখন তারা অবস্থা জানাতে ফিরে গিয়েছিলো, তখন সকলেই খুব উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠেছিলো।

ঠিক সেইসময়, স্টিমারের ক্যাপ্টেন লি তীরে এসে ভিড়েছিলেন। জাহাজটি কৃষিজাত পণ্যে ঠাসা ছিলো, আর তারা চ্যাংচিয়া উপসাগরেই মালখালাশ করার জন্যে তৈরি হচ্ছিলো। যখন তিনি সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়া সেই তিনজন বাচ্চাছেলের কথা শুনেছিলেন, তখনি তাঁর সেই কুয়াশার ভেতর দিয়ে দেখা আলোর কথাটি মনে হয়েছিলো। তিনি দলীয় শাখার সম্পাদক চ্যাং মাও সাই-এর কাছে গিয়ে উপকূলে ঢোকার সময় কী ঘটনা ঘটেছিলো খুলে বলেছিলেন। "কী সাংঘাতিক বিপদই না হয়েছিলো", মাও-সাই বলেছিলে। তারা অন্দোজ করেছিলো যে আলোটা দ্বীপ থেকেই আসছিলো আর সৌভাগ্যবশত গণমুক্তিবাহিনীর উপকূলরক্ষীরাও পাহারা দেবার সময় আলোর ঝলকানি দেখতে পেয়েছিলো। সেই বাচ্চাগুলোই যে আলোর ঝিলিক দিচ্ছিলো সে সম্বন্ধে সবাই নিঃসন্দেহ হয়েছিলো। তাই চ্যাং মাও-সাই, ক্যাপ্টেন লি ও উপকূলরক্ষীরা আবার তাদের মোটর-চালিত চীনা নৌকাতে ক'রে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েছিলো।

চীনা নৌকোটির আলোগুলো ক্রমশ কাছে এগিয়ে এলো। চিউ-শান্ তৎক্ষণাৎ লণ্ঠনের সাহায্যে সংকেত জানাতে শুরু করলো। যখন চ্যাং মাও-সাই সেই আলো দেখতে পেলো সে খুব খুশি হলো ও স্বস্তিবোধ করলো। "ঠিকই তো" সে হাসলো, "বটে তারাই।"

"এদিকে আমরা এই প্রথম এলাম," ক্যাপ্টেন লি বললো, "আর আমাদের

এখানকার নাব্যতার গলিঘুঁজির সঙ্গে তেমন পরিচয় ছিলো না। আর তার ওপর বেদম কুয়াশা! যদি এই বাচ্চাগুলো না-থাকতো তাহ'লে একটা মারাত্মক বিপদ হ'তে পারতো।

"সবই আমাদের দোষ," মাও-সাই জবাব দিলে। "আমরা ভাবতেই পারিনি যে সংকেত দেখানোর আলোটা ঝড়ো হাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে অচল হ'য়ে পড়বে।"

মোটর-চালিত চীনা নৌকোটি যেই তীরে ভিড়লো অমনি বাচ্চাগুলো হাসতে-হাসতে হৈ হৈ ক'রে পাহাড়ি রাস্তা ধ'রে নেমে এলো। চ্যাংমাও-সাই সর্বপ্রথম তীরে নামলো। "আমার বীর বাছারা," সে বললে, "আজ রাতে তোরা একটা দারুণ কাজের মতো কাজ করেছিস। খুব ভালোই করেছিস। তোরা খুবই প্রশংসা পাবার যোগ্য।"

ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন লি আর গণমুক্তি বাহিনীর লোকেরাও পৌঁছে গেছিলো। ক্যাপ্টেন লি তাদের দেখে শুধু বললেন, "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।" তারপর সে চিউ-শান্‌কে জড়িয়ে ধরলো। তা-মিঙ্‌ আর শিহ্‌-তৌ গণমুক্তি বাহিনীর সবাই এসেছে দেখে এতো খুশি হলো যে তাদের মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছিলো না। তারা ডাকলো "মামা" আর গণমুক্তি বাহিনীর লোকেরা তাদের কোলে ক'রে নৌকোয় তুলে নিলে। সবাই যখন নৌকোয় উঠে পড়লো তখন তারা ছোট্ট জেলে ডিঙিটাকে সেই চীনা নৌকোর পেছনে জুড়ে দিলে।

তা-মিঙ আর চিউ-শান্‌ ছোট্ট ডিঙিটা একবার দেখতে গেলো—লাল দাঁড়াওয়ালা কাঁকড়ায় আদ্ধেক ভরা সেই তিনটি পাত্র ঠিকঠাক ছিলো। কাঁকড়াগুলোর মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছিলো আর এদিক ওদিক চলে বেড়ানোর সময় তাদের দাঁড়াগুলো থেকে স্পষ্ট কড়মড় কড়মড় আওয়াজ হচ্ছিলো। "কাল আমাদের প্রথম কাজই হবে ওগুলোকে বেঁধে ফেলা," চিউ-শান্‌ বললে।

"ঠিক বলেছিস," তা-মিঙ্‌ বললে। "গণমুক্তিবাহিনীর লোকেরা এসে পড়লেই আমরা সবটাই তাদের হাতে তুলে দিতে পারবো!"

চিউ-শান্‌ সে-কথায় সায় দিলে, তখন মাও-সাই তাদের চীনা নৌকোতে গিয়ে উঠতে বললো। মোটর-চালিত নৌকোটা জলপথের সব গলিঘুঁজি দেখানোর আলোগুলো চ্যাংচিয়া উপসাগরের অভিমুখে।

অনুবাদ : প্রদোষ গুহ

ইয়ুয়ে চ্যাং কুয়েই

ভারার দাঁড়

আমাকে পাহাড়ের গভীরে 'সবুজ গিরি' দোকানে একটা চাকরি দেওয়া হয়েছিলো। বাণিজ্যের গ্রামীণ দপ্তর থেকে আমার পরিচিতি পত্র নিয়ে আমি আমার নতুন কাজে যোগ দিতে গেলাম। দোকানের সদর দরজার কাছে হাজির হ'য়ে আমি শুনতে পেলাম এক সুন্দর কণ্ঠ ঘণ্টাধবনির মতো স্বচ্ছস্বরে উঠোনে গাইছে :

'আমার মালগুলো বিকোই আমি পাহাড় ভেঙে উঠে আর নেমে, আমার কাঁধের বাঁক জুড়ে দেয় শহরের সাথে কত গ্রামে।'

দরজা দিয়ে ঢুকে আমি খড়ের টুপি পরা একটি মেয়েকে দেখতে পেলাম যে উঠোনের মাঝখানে হাঁটু গেড়ে ব'সে দক্ষতার সঙ্গে একটা কাঁধের বাঁক সারাচ্ছিলো। আমি এগিয়ে যেতেই সে গান গাওয়া থামিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো আর খড়ের টুপিটা পেছনে ঠেলে দিতে তার দুটো খাটো মোটা বিনুনি দেখা গেলো। মনে হ'লো তার বয়স কুড়ির মতো হবে। লম্বা নয়, কিন্তু সুগঠিত শরীর, চোখদুটো বড়ো-বড়ো, ঈষৎ টেরচা। সে তার যন্ত্রপাতি নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি আমার দিকে এগিয়ে এলো।

"যদি আমার ভুল না-হ'য়ে থাকে, তুমি নিশ্চয়ই কমরেড চ্যাং ইয়েন-চুন, আমাদের নতুন সহকর্মী," ঝকঝকে চোখে সে বললে।

"আর তুমি ?"

"আমি সান-লিং।"

সান লিং ? সে কী ! তাহ'লে তো আমি ওর অধীনেই কাজ করবো। গ্রামে ওরা আমাকে বলেছিলো যে সবুজ গিরি দোকানের নিয়ন্ত্রণভার যার ওপরে সেই সান লি ইং খুবই চমৎকার এক কমরেড। তার কাছে আমার অনেক কিছু শেখা উচিত। আমি তো তাকে একজন অভিজ্ঞা, মধ্যবয়স্কা মহিলা ব'লে কল্পনা করেছিলাম। কিন্তু এ তো একটা কিশোরী মেয়ের থেকে বেশি কিছু নয়।

"আমাকে তুমি কী কাজ দেবে?" আমি সরাসরি প্রশ্ন করলাম।

"তুমি কি এক্ষুনি কাজ শুরু করতে চাও? একটু জিরিয়ে নাও না কেন?" সে তার চোখগুলো সরু করলে, যেন আমাকে মেপে নিচ্ছে। তারপরে আমার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে দোকানের পেছনের উঠোনে আমাকে নিয়ে, গেলো। সেখানে পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখা চারটে চুবড়ি আর দুটো কাঁধের বাঁক। দুটো চুবড়ি ভর্তি চাষবাসের যন্ত্রপাতি আর দুটোতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিশপত্র। আমি হতভম্ব হ'য়ে তার দিকে তাকাতে দেখি সে হাসিভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। তার মুখের ভাব থেকে আমি তার মনের ভাব আন্দাজ করতে পারলাম।

"এটাই কি আমার কাজ?" জিজ্ঞাসা করলাম। সে ঘাড় নাড়লো। আমি চমকে গেলাম। আমার পরিচিতিপত্রে, যেটা তখনো আমার পকেটে, খুব পরিষ্কারভাবে লেখা ছিলো যে আমি একজন "বিক্রির কেরানি।" তার মানে কাউণ্টারের পেছনে থেকে কাজ করা। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে আমাকে এই ভারি চুবড়িগুলো বইতে হবে। আমি আমার সমবয়সী তরুণ অধ্যক্ষের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলাম। আমি কথা বলবার আগেই সে একটা বাঁক তুলে নিয়ে গম্ভীরভাবে সেটা আমার হাতে তুলে দিলে।

"এই যে। এটা তোমার।"

আমি সেটার দিকে একঝলক তাকালাম। হায়! একটা পুরোনো বাঁক যার কিছু অংশ এত ক্ষ'য়ে গিয়েছে যে চক্‌চক্ করছে। দুই প্রান্ত ফেটে যাওয়াতে তার দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এগিয়ে দিয়েও আমি আমার হাত সরিয়ে নিলাম।

আমার দ্বিধা দেখে সে তার ভুরু কোঁচকালো। "কী হ'লো? ব্যাপারটা ভালো লাগছে না?" আমি শুধু নির্বাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম। সে বাঁকটার দিকে তাকালে, তারপরে আমার দিকে। "ইয়েন-চুন, সে গুরুত্ব দিয়ে বললে, "এই বাঁকে যা চোখে পড়ে তার বাইরেও অনেক কিছু আছে। এটা আমাদের সবুজগিরি দোকানের মহান ঐতিহ্যের প্রতীক।"

সে এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে কেন আমি বুঝতে পারলাম না। বাঁকটা নিয়ে আমি দেখতে পেলাম যে সেটার পেছনে "জনগণের সেবা করো" অক্ষরগুলো খোদাই করা আছে। চেহারা থেকে মনে হ'লো যে এটা সম্প্রতি

করা হয়েছে। এই তিনটি কথা আমার হৃদয়ে উষ্ণতার ছোঁয়া লাগালো। বাঁকটা চেপে ধরে আমি ভারি বোঝাটা ওঠালাম। ছোট্ট সানের মুখ খুশিতে ভ'রে উঠলো। আমাকে চেরা চোখে দেখে সে হাসিতে ভেঙে পড়লো, পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ঝরণার মতোই ফটিকস্বচ্ছ সেই হাসি।

ঘুরে ঘুরে ওঠা পথটা ছিলো খাড়া আর পাথুরে। আমার বোঝা নিয়ে একটা পাহাড় বেয়ে উঠতেই আমার পিঠ বেয়ে ঘামের স্রোত নামলো। দম ফুরিয়ে খাবি খেতে-খেতে আর বেজায় গরম লাগাতে, আমার জিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করছিলো। কয়েকবার তো আমি চুবড়িগুলো প্রায় নামিয়েই ফেলেছিলাম। কিন্তু আমার চেয়েও ভারি বোঝা ব'য়ে ছোট্ট সান একভাবে হেঁটে চলেছিলো। তার মাথা তুলে ধরা; তার বিনুনিগুলো প্রতি পদক্ষেপে দুলছে। আর হাঁটতে-হাঁটতে সে গানও গাইছে।

শীগ্‌গীরই আমাদের পথটা নেমে এসে একটা উপত্যকার মাঝ দিয়ে এঁকে-বেঁকে চললো। আমরা দেখতে পেলাম একজন যুবক আমাদের দিকেই আসছে। সে খুবই ব্যস্ত, নিশ্চয়ই কোনো জরুরি দরকারে।

"এই যে, ইয়াং মা! এত তাড়া কিসের?" ছোট্ট সান ডেকে বললে।

"আমি শহরে যাচ্ছি," সে মাথা না-তুলেই জবাব দিলে।

"তাই নাকি! এখন তো সকলেই ব্যস্ত, প্রত্যেকেই দুজনের কাজ করছে। কিন্তু তোমার সময় আছে শহরে গিয়ে খুট্‌খুট্ করবার।"

"কাজ না-থাকলে আমি কখনোই শহরে যাই না, আমাকে তুমি কাঁধে ক'রে ব'য়ে নিয়ে গেলেও না।"

"আজকে তোমার কী কাজ?" ছোট্ট সান শুধালে।

"তোমাকে ব'লে আমার কোনো লাভ নেই!" ইয়াং মা হাত নেড়ে বললে। সে যেতে শুরু করলে কিন্তু তার দুটো চুব্‌ড়ি নিয়ে মেয়েটি তার পথ আটকে দাঁড়ালো। "এভাবে কথা বলার মানে কী?" সে জানতে চাইলো। "তুমি যদি আমাকে না-বলো, আমি তোমাকে পথ ছাড়বো না। তুমি কি কৃষিসরঞ্জামের কারখানায় যাচ্ছো?"

"তুমি কী ক'রে জানলে?" তরুণটি তো অবাক।

"আমি অনুমান করেছিলাম।" সে তার মাথা তুলে হাসলো।" তুমি কি

তোমায় আগাছা নিড়ানির জন্য যন্ত্রাংশ কিনতে যাচ্ছে।"

"কে বললো তোমাকে?" ইয়াং মা ধাঁধায় পড়লো।

"সে জেনে তোমার কাজ নেই।" সে প্রশ্নটায় গুরুত্বই দিলো না "কটা মেশিন বিকল হয়ে গিয়েছে? আর তোমার কি কি যন্ত্রাংশ দরকার?"

"কটা? তুমি জানো না?" তরুণটি চোখ টিপলো।

"আমি ঠিকই জানি।" সে তার আঙুল গুনলো। "তোমার বিগ্রেডে সবসুদ্ধ আঠারোটা আগাছা নিড়ানি আছে। তাদের চারটে বিকল হয়ে আছে। তিনটের দাঁড় ভাঙা, আর একটার অক্ষদণ্ড ভাঙা। আমি ঠিক কিনা?"

তরুণটি হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। "একদম ঠিক! তুমি জানলে কি করে?"

"আমরা যদি পরিস্থিতিটা না জানি, তাহলে অর্থনীতির সম্প্রসারণই বা ঘটাবো কি করে আর সরবরাহই বা ঠিক রাখবো কি করে?" ছোট্ট সান তার চুলগুলো মসৃণ করে পেছনে ঠেলে দিলো, তারপরে তার একটা চুবড়ি থেকে একটা ভারী কার্ডবোর্ডের বাক্স বার করে তরুণটিকে দিলো। "তুমি যা কিনতে চাও তা এতে আছে।"

এগিয়ে এসে আমি লক্ষ্য করলাম যে বাক্সটার ওপরে লেখা আছে: 'নতুন পথ' ব্রিগেড, তিন সেট আগাছার দাঁত আর একটা অক্ষদণ্ড।

বাক্সটা নিয়ে তরুণটি এত খুশী হলো যে কি বলবে ভেবে পেলো না। কিন্তু হঠাৎ সে সেটাকে নামিয়ে রেখে বাঁকটা ছোট্ট সানের কাছ থেকে টেনে নিলো।

"এটা আমাকে তোমার হয়ে বইতে দাও।"

"না। আমরা এক পথে যাচ্ছি না," সে আপত্তি করলো।

"তুমি কি সোনালী উপসাগরে যাচ্ছো না? আমি এখন ব্রিগেডে ফিরে যাবো। একসঙ্গেই যাওয়া যাক।"

তার বোঝা তুলে নিয়ে ছোট্ট সান ক্ষেতের মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে যাওয়া একটা আলপথ দেখালো। "আমরা এই পথে যাবো", সে জানালো।

"মতলবটা কি?" তরুণটি শুধালো, "পথ দিয়ে যাবে না কেন?"

ছোট্ট সান তাকে একটা ঠেলা মারলো। "ঠিক আছে, তোমার কাজ করো গিয়ে। আমাদের তোমাকে পথপ্রদর্শক হিসেবে পাবার দরকার নেই।"

আমি বুঝতে পারলাম যে এই পথ বদলের জন্য মেয়েটার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। সেটা কী তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবার আগেই সে বললো:

"এই পথ দিয়ে গেলে আমরা শস্যগুলোকে দেখে নিতে পারবো। কিছু অনুসন্ধান চালাবো। আমরা বলি না : 'অনুসন্ধান বিনা উপদেশ দেবার অধিকার নেই' ?"

"এখানে অনুসন্ধান চালানোর মত কিছুই নেই," আমি না ভেবেই বললাম। "আমাদের কাজ হলো শুধু মজুত মালগুলো বিক্রী করা।"

"কি বলছো ?" ঘুরে দাঁড়িয়ে সে গুরুত্ব দিয়ে বললো : "তুমি জানো কি ওই বাঁকটা তোমাকে আমি কেন দিয়েছি ?" আমি মাথা নাড়লাম। "সারা দেশের লোক তাচাইয়ের কাছ থেকে শিখছে," সে বলে চললো। "আমরা কি আমাদের মাল বয়ে গ্রামে নিয়ে গিয়ে গরীব আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাষীদের সাহায্য করবার চেষ্টা করবো ? না, বসে থেকে আমাদের দোকানে তাদের আসবার অপেক্ষায় থাকবো ? বাণিজ্যিক কাজে এটা একটা মূল প্রশ্ন। আমরা কিভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে জনগণের সেবা করতে পারি ?" তারপরে সে আমাকে একটা গল্প বললো।

গত বসন্তে উৎপাদন সঙ্ঘগুলো বেশী সার সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শুয়োরের খোঁয়াড়গুলো নতুন করে বানাবে ঠিক করেছিলো। এটা শুনে তার মনে হয়েছিলো যে তাদের সিমেণ্ট লাগবে। তখন তার অফিসে বসে সে কিছু সিমেণ্ট মজুত রাখবার পরিকল্পনা করে ও শহর থেকে কুড়ি টন কিনে আনে। কিন্তু একটা পুরো সপ্তাহ চলে গেলো। সিমেণ্ট কিনতে কেউ এলো না। সে ধাঁধায় পড়লো। কাজেই সে বিভিন্ন সঙ্ঘগুলোতে গেলো আর জানতে পারলো যে তাচাইয়ের স্বনির্ভর বৈপ্লবিক দৃষ্টান্ত থেকে শেখবার ফলে তারা শুয়োরের খোঁয়াড়গুলো পাথর দিয়ে নতুন করে বানিয়েছে, কোন সিমেণ্ট ব্যবহার না করেই।

"আত্মমুখিনতাই আমাকে বিপদে ফেলেছিলো !" ছোট্ট সান আন্তরিক উপলব্ধির সঙ্গে বললো। "জনগণকে সেবা করবার ইচ্ছাই যথেষ্ট নয়। তোমাকে খুঁটিয়ে অনুসন্ধানও চালাতে হবে। নাহলে তুমি তোমার কাজ ভালোভাবে সারতে পারবে না।"

আমরা চলতে চলতেই কথা বলছিলাম আর শীগগিরই কয়েক মাইল পথ অতিক্রম করলাম। হঠাৎ ছোট্ট সান দাঁড়িয়ে পড়লো। "দেখো ! ওই কচি ধানের চারাগুলো হলদে হয়ে উঠেছে কেন ?" সে ধানক্ষেতের দিকে হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। আমি দেখলাম যে সব কচি চারাগুলোই ভরা সবুজ,

শুধু একটা অংশ বাদে। সেটা এতো ছোট যে সতর্কভাবে দেখলে তবেই চোখে পড়ে। "হয়তো ওটাতে সারের অভাব ঘটেছে," আমি বিবেচনা না করেই বললাম।

"হয়তো' কথাটা ব'লো না। লাগলো-তো-লাগলো, না-লাগলো তো-ফস্‌কালো—এই পদ্ধতি কাজ দেবে না।" আমার দিকে সে তাকালো। জুতো খুলে সে ওই কাদায় ভরা ক্ষেতে নেমে গেলো। নীচু হয়ে একটা কচি চারা তুলে আমায় দেখালো। "কমরেড ইয়েন-চুন, তুমি কি বলতে পারো এটায় কি দোষ ঘটেছে?" আমি সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পেলাম যে শিকড় আর কাণ্ডটা সুস্থই আছে। শুধু চারার ডগাটা একটু হলদে, যেন পুড়ে গিয়েছে।

"এই প্রথমবারই আমরা এখানে ধান ফলাচ্ছি," সে চিন্তিতভাবে তার ভুরু কুঁচকে বললো। "আমাদের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। আমরা যদি এটা এক্ষুনি না সাফ্ করে ফেলতে পারি, তবে এটা দ্রুত ছড়াবে। এ বছরের উৎপাদনকেই যে শুধু ব্যাহত করবে তাই নয়, আমাদের পাহাড়ে এলাকায় ধানচাষকে জনপ্রিয় করে তোলবার কাজকেও বিঘ্নিত করবে।"

"আমরা কি করবো?" আমি প্রশ্ন করলাম। ছোট্ট সান নীরব রইলো, কিন্তু যখন সে আবার ধানজমিতে নেমে গিয়ে কিছু কাদা তুলে নিলো, তখন তার কালো চোখদুটো জলে উঠলো। "তুমি আগে তোমার মাল নিয়ে সোনালী উপসাগরে যাও," সে আমাকে নির্দেশ দিলো। "আমি কৃষিপ্রযুক্তি কেন্দ্রে যাচ্ছি।"

আমি মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকালাম। অন্ধকার হয়ে এসেছে। চারদিক থেকে কালো জলভরা মেঘ এসে জমা হচ্ছে। পাহাড়ের চূড়ো এর মধ্যেই কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে। যে কোন মুহূর্তে ঝড় আসবে। "ঝড় থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করো না কেন, ছোট্ট সান," আমি বললাম।

"একটা ঝড় কিছুই না। অসুস্থতা নিবারণ হলো আগুন নেবানোর মতই ব্যাপার। আমরা এক মিনিটও দেরী করতে পারি না।" এই বলে সে কাঁধে তার বাঁকটা তুলে তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলো। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই সে থামলো আর ফিরে এসে আমাকে তার সবুজ বর্ষাতিটা দিতে চাইলো।

"তোমার পেছনের চুবড়ির ঢাকনাটায় ফুটো আছে। ওটার ওপরে আমার বর্ষাতিটা চাপিয়ে দাও," সে চেঁচিয়ে বললো।

"তোমার কি হবে ?"

"মালগুলো বাঁচানোই দরকার· কথার বাকিটুকু মেঘের গর্জনে ডুবে গেলো।

সোনালী উপসাগর গ্রামের নিকটবর্তী হয়ে আমি দেখতে পেলাম যে বৃষ্টি থেকে আশ্রয় নিয়ে কয়েকজন গ্রামবাসী কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। যখন তারা শুনলো যে আমি নতুন বিক্রেতা, তারা ছোট্ট সান কোথায় জানতে চাইলো। আমি মুখ খুলতে পারবার আগেই এক ছোকরা চেঁচালো, "তুমি কি আমাদের ধানের জন্য কীটনাশক এনেছো ?"

আমি লক্ষ্য করলাম যে তাদের হাতেও কিছু কচি চারা। "ধানে কি দোষ ঘটেছে তাই আমি জানি না। কীটনাশক আনবো কি করে ?" আমি উত্তর দিলাম।

"ছোট্ট সান তোমার মত নয়," ছোকরা ফিরে জবাব দিলো। বৃদ্ধ ব্রিগে দলপতি তার দিকে একবার তাকালো। "তোমাকে চটতে হবে না তোমাকে এক্ষুনি এই চারাগুলো কৃষিপ্রযুক্তি কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।"

"ছোট্ট সান ইতিমধ্যেই সেখানে কয়েকটা নিয়ে গিয়েছে," আমি ছোকর চলে যাবার আগেই জানিয়ে দিলাম।

"সে নিয়েছে, নিয়েছে তো ?" বৃদ্ধ ব্রিগেড দলপতির মুখ হাসিতে ভ উঠলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে তার বর্ষাতি খুলে ছেলেটির হাতে দিলো। "চট্‌পট্‌! গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করো।" ছোকরা সঙ্গে সঙ্গে সেই মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই দৌড় দিলো।

ঠিক একই মুহূর্তে আমার বাঁকটা বৃদ্ধ ব্রিগেড দলপতির চোখে পড়লো।

"ওই বাঁকটা !" সে বলে উঠলো। আমার কাছে হেঁটে এসে সে শক্ত করে বাঁকটা ধরলো। তারপরে সেটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো।

"এই বাঁকটায় কি দেখছো, ব্রিগেড দলপতি ?" আমি হাসলাম "এটাতে তো কোন ফুল গোঁজা নেই—। এটার বৈশিষ্ট্য কি ?"

"এটাতে কোন ফুল গোঁজা নেই, ঠিকই। কিন্তু এটা আমাদের পুরোনো দোকানদারের রক্তে ভেজানো।"

"তোমাদের পুরোনো দোকানদারের রক্ত !"

কুয়াশায় ঢাকা দূর পাথরের দিকে চেয়ে সে আমাকে বাঁকটার গল্প শোনালো।

"স্বাধীনতার আগে, এই এলাকার গরীব আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাষীদের কিছু কিনতে হলে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হতো। মুনাফাখোরেরা এই সুযোগে মাল নিয়ে ফাটকাবাজি করতো। আমাদের তাদেরকে এক বাক্স দেশলাইয়ের বদলে আধ কেজি ভেষজ দ্রব্য দিতে হতো। একটা চামড়ায় মাত্র এক লিটার কেরোসিন পাওয়া যেতো। কি নিষ্ঠুরই না ছিলো ওই রক্ত চোষাগুলো!"

"মুক্তির অল্প পরেই, জনগণের আঞ্চলিক সরকার এখানে এই সবুজ গিরি দোকানটা খুললো। প্রথমে দোকানটা ছিলো ছোট, একজন কমরেডই চালাতো। সে ছিলো সেই পুরোনো দোকানদার। সেই-ই, ওই বাঁকটাই কাঁধে নিয়ে, আমাদের কাছে গরীব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত চাষীদের জন্য চেয়ারম্যান মাওয়ের উৎকণ্ঠা পৌঁছে দিয়েছিলো। একই সময়ে, ওই বাঁকের সাহায্যে, সে সমাজতান্ত্রিক মাতৃভূমির প্রতি আমাদের ভালোবাসাও সমতলের বাসিন্দাদের কাছে বহন করে নিয়ে গিয়েছিলো। সবাই দোকানটাকে বলতো "কাঁধের বাঁকের দোকান।" কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু শ্রেণীশত্রু তাকে ঘৃণা করতো। একদিন খুব ভোরে, বুড়ো দোকানদার যখন একটা পাহাড়ী পথে গ্রামবাসীদের কাছে মাল বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো, দুটো বদমাশ বন থেকে হাতে লাঠি আর ছোরা নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলো। হিংস্র নেকড়ের মত তারা বুড়ো দোকানদারের পথ আটকে দাঁড়ালো। ক্রুদ্ধ হয়ে বুড়ো দোকানদার চিৎকার করে বললো, 'তোমরা আমাকে মেরে ফেলতে পারো। কিন্তু এই পথ আটকাতে পারবে না।' বাঁকটা তুলে সে শত্রুদের দিকে তেড়ে গেলো। আমাদের পুরোনো দোকানদার তার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে জনগণের স্বার্থে লড়ে গিয়েছিলো।"

"তার নাম কি ছিলো?" আমি আবেগে প্রশ্ন করলাম।

"সান জু-স্থং। সে ছিলো সান লি-ইং-এর বাবা।"

"কি! ছোট্ট সানের বাবা!" আমি চমকে উঠলাম। বাঁকটা নিয়ে আমি সেটা আমার বুকে চেপে ধরলাম। আমার যা কিছু বলবার ছিলো তার জন্য আমি ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমাকে এই বাঁক দিয়ে, যাতে জড়িত এমন এক মহান ইতিহাস, ছোট্ট সান আমার উপরে বিরাট আস্থা দেখিয়েছে। কিন্তু আমি...আমার চোখ জলে ভরে গেলো। সবুজ দেওদার গাছের ছায়ায় ঢাকা

খাড়াই পথটার দিকে আমি তাকালাম। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে চুড়োয় ওঠা পথটাকে মনে হলো একটা দড়ি যা কিছুতেই ছিঁড়তে পারবে না।"

"বুড়ো দোকানদারই পায়ে চলে এই পথ তৈরী করেছিলো।" আমাকে বৃদ্ধ ব্রিগেড দলপতি অর্থপূর্ণভাবে বললো।

হ্যাঁ! 'অর্থনীতিকে গড়ে তোলো আর সরবরাহ ঠিক রাখো।' চেয়ারম্যান মাওয়ের এই নির্দেশ মেনে আমাদের সেই বিপ্লবী পূর্বসূরী তার দৃঢ় পদক্ষেপে এই বন্ধুর পথ তৈরী করেছিলো। ছোট্ট সান তার বাবার বাঁক উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। একটা ভারী বৈপ্লবিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে ও সাহসের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। এখন বাঁকটা আমার কাঁধে। আমি পথ বেয়ে পুরোনো দোকানদারের পদক্ষেপ অনুসরণ করবার সঙ্কল্প নিলাম। আমি এটা শেষপর্যন্ত অনুসরণ করে চলবো... ।

বৃষ্টি থামলো। পুরো আকাশটাকে দেখাচ্ছিলো একটা চওড়া পুষ্করিণীর মত—বিচ্ছিন্ন মেঘগুলো যাতে ছোট ছোট নৌকার মত ভেসে আছে। সদ্য বর্ষণসিক্ত সবুজ পাহাড় আর গাছ আর লাল ফুলগুলো দ্বিগুণ টাটকা ও সুন্দর হয়ে উঠেছিলো। পাহাড়ের ওপরে মৃদু বাতাস বইছিলো। আমরা ঘণ্টাধ্বনির মত স্বচ্ছ এক গায়ন্ত গলা শুনতে পেলাম যে কণ্ঠস্বর আমাদের সকলেরই পরিচিত ও প্রিয়।

"ছোট্ট সান ফিরে এসেছে!" বৃদ্ধ ব্রিগেড দলপতি দৌড়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলো।

সূর্য আবার দেখা দিলো। আকাশে একটা রামধনু ছড়িয়ে পড়লো ধনুকের মত, যেন উঁচু পর্বতচূড়াগুলোর উপরে এক অত্যাশ্চর্য বহুবর্ণ সেতু। রামধনুর তলায়, ঘুরাল পথে দেখা দিলো ছোট্ট সানের খাটো, সমর্থ দেহ। তার কাঁধের বাঁক থেকে খামারের যন্ত্রপাতি ও কীটনাশকে ভরা দুটো চুবড়ি ঝুলছিলো। তার প্রতিটি পদক্ষেপ দৃঢ় ও শক্তিপূর্ণ। সোনালী সূর্যালোক তার শরীরটাকে পোশাকের মত জড়িয়ে ছিলো, আর তার পায়ের তলায় পড়ে ছিলো দীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন পথ।

অনুবাদ ঃ অনিন্দ্য সেন

আবদুল্লা কাহ্‌হার

দৃষ্টিদান

আর তাই আহমেদ পালোয়ান মৃত্যুর প্রতীক্ষায় রয়েছে। হয়ত বলা উচিত যে মৃত্যু তার প্রতীক্ষায় আছে...পরলোকে যাবার বিন্দুমাত্র বাসনা তার নেই, কিন্তু তার মৃত্যুদণ্ডের ভার যে সর্দারের হাতে তার পাশে বলির পাঁঠার মতন বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে, 'হ্যাঁ' কি 'না' বলার ক্ষমতা তো তার নেই।

জল্লাদ বেঁটেখাটো ষণ্ডাগোছের ছোকরা। সে ঠেলা দিতে লতার মতো দুলে চিৎ হয়ে পড়ে গেল পালোয়ান, পিছনে আড়মোড়াভাবে বাঁধা হাতদুটোয় শরীরের চাপ দিয়ে।

জল্লাদের জবর একটা লাথিতে উঠে দাঁড়াতে হল পালোয়ানকে।

ওঠবার সময় পালোয়ান কাঁধ বাঁকিয়ে দেখার চেষ্টা করল কোনো জায়গা মচকে বা ভেঙে গিয়েছে কিনা, কিন্তু হঠাৎ একটা তিক্ত দৈন্যতার সঙ্গে মনে পড়ল যে এখন ভাঙা বা মচকানোর কোনো মানে নেই তার কাছে।

জল্লাদের আর একটা ধাক্কা, এবার অত জোরে নয়। পালোয়ান ছুটে, বরঞ্চ কয়েক পা লেংচে পৌঁছল মাটির মঞ্চটার একেবারে সামনে। মঞ্চের ওপরে গদীতে শুয়ে আছে দলের পাণ্ডা, কানা কুরবাশি, পরনের ডোরাকাটা পোশাকটা একেবারে তেল চিটচিটে। কুরবাশির ডানদিকে আসীন কুঁজো উলেম তাদের ধর্মগুরু, বাঁ দিকে হলদে মুখ তাবিব—ভারতীয় ডাক্তারটি। পিছনে গৃহকর্তা নিজের জন্য একটা জায়গা করে নিয়েছে। বুড়ো লোকটি ছটফটে প্রকৃতির, দেখতে বাদুড়ের মতো।

এইমাত্র গোটা একপ্লেট পোলাও উদরস্থ করেছে কুরবাশি। গুটিভরা গালে তেলের চকচকে ছিটে, চিরুনি-না-পড়া চাপদাড়িতে চালের শাদা দানা। অন্য যে কোনো সময়ে তার বর্বর দৃষ্টিপাতে অত্যন্ত নির্ভীক লোকেও ভয়ে সিঁটিয়ে যেত, কিন্তু এই মুহূর্তে চর্বচোষ্য ভুরিভোজের ফলে তার পেটটা

বেজায় ভারি, কেমন যেন অসাড় আর ইচ্ছশক্তি বিহীন হয়ে পড়েছে সে। জগদ্দল শরীরের প্রতিটি পেশী অদম্য ঘুমের ঘোরে শিথিল হয়ে আসছে, চাপা ক্রোধের আগুন জ্বালাবার বৃথা চেষ্টা তার।

অতিকষ্টে যে চোখটা ভালো সেটা খুলল সে, সেই মুহূর্তে চোখে বলতে গেলে কিছু দেখল না। বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে যত জোরে পারে হাঁকল কুরবাশি :

'বেটা জাহান্নমের কীট! দোস্তদের নাম শোনার জন্য আর কতক্ষণ সবুর করতে হবে আমাদের?'

আগেকার মতো চুপ করে রইল আহমেদ পালোয়ান। যা বলেছে তার বেশী আর কি বলতে পারে? ইসমাইল এফেন্দিকে সে হত্যা করেছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কুঠার ছাড়া তার তো আর কোনো দোস্ত ছিল না।

ইসমাইলকে নিজের প্রধান সর্দার ভাবত কুরবাশি। সত্যি, শকুনটার ডান পাখার সামিল ছিল এফেন্দি। একবার যখন লাল তারা মার্কা একটি ঘোড়-সওয়ারের গুলি লাগে ইসমাইল এফেন্দির বুকে 'আলকার মাজার' এর কাছে, তখন ঘোর যুদ্ধের মধ্য থেকে তাকে ছিনিয়ে কুরবাশি নিজের ঘোড়ায় চাপিয়ে ঝড়ের মতো নিয়ে গিয়েছিল পাহাড়ে। এত জোরে ওরা পিছু তাড়া না করলে বিশ্বস্ত সর্দারের ক্ষতস্থান বেঁধে দিত কুরবাশি। কিন্তু উঁচু তীক্ষ্ণ হেলমেটে লাল তারা আঁকা ঘোড়সওয়াররা পলাতকদের এত নাছোড়বান্দাভাবে অনুসরণ করে যে, কোনোখানে মুহূর্তেকের জন্য পর্যন্ত থামার প্রশ্ন ওঠেনি।

নিজের দলের ঘোড়সওয়ারদের অর্ধেককে হারিয়ে কুরবাশি যখন আহমেদ পালোয়ানের পাহাড়ি গ্রামে পৌছয় তখন রাত্রি। এফেন্দির প্রচুর রক্তপাত হচ্ছিল, সে বলল তাকে আর নিয়ে যাবার দরকার নেই, কোনো বিশ্বস্ত লোকের বাড়িতে তাকে রেখে যাওয়া হোক।

সে গ্রামে কুরবাশির অত্যন্ত বিশ্বস্ত দু তিনজন সাঙ্গোপাঙ্গো ছিল। কিন্তু তাদের বাড়িতে এফেন্দিকে রাখা যায় না। ওরা সবাই বে। আর কুরবাশির খুব ভালো করে জানা ছিল যে সে সময় সতর্কতার খাতিরে লাল তারা সৈনিকেরা ধনী ও গণ্যমান্য বে'দের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন। কুরবাশির সুবিবে-চনায় এফেন্দির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হল কোনো গরিবের কুঠি, তাই পালোয়ানের দীন কুঁড়েঘরে মুমূর্ষু লোকটিকে রেখে যাবার সিদ্ধান্ত সে করে

কুরবাশির হাত থেকে একেন্দিকে নিয়ে আহমেদ পালোয়ান কথা দিল যে আহতের দেখাশোনা সে শুধু করবে না, শান্তিতে নির্ঝামেলায় তার থাকার ব্যবস্থাও করবে। কুরবাশি ও তার ঘোড়সওয়াররা চলে গেল আরো নিরাপদ স্থানে। রাত্রির ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই নিজের কথা রাখে পালোয়ান।

একেন্দির আরোগ্য লাভ বা মৃত্যুর জন্য সবুর করেনি আহমেদ পালোয়ান। পাছে কুরবাশি ফিরে এসে বন্ধুকে নিয়ে যায় সেই ভয়ে সে আহতকে ভারি কুঠারের এক ঘায়ে শান্তি জোগায়, চিরশান্তি জোগায়।

গভীর একটা গর্তে একেন্দিকে চাপা দেবার সাঁইত্রিশ দিন পরে কুরবাশি আহমেদকে ধরে বেঁধে বস্তার মতো তুলে নিল ঘোড়ায়। গাঁয়ের এক বে তাকে পালোয়ানের কর্মের কথা জানিয়েছিল। ঘোড়ার পিঠে দু দিন এভাবে যেতে যেতে তার শরীর নড়বড়ে। একেন্দির মৃত্যুর ঠিক চল্লিশ দিন পরে তাকে যেতে হল ডাকাত দলের সর্দার, কুরবাশির বিশ্বস্ত অনুচরের রক্তের দাম দিতে।

এখন সে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার আজ্ঞার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

কিন্তু কথা বলল না কুরবাশি। প্রতিশোধের ক্রোধ পুরোপুরি জাগাবার যে চেষ্টা তাকে করতে হয় তাতে তার সর্বশক্তি নিঃশেষ। ঘুম তাকে আচ্ছন্ন করল, মাথাটা ঝুলে পড়ল বুকে, তার নাসিকা গর্জন কানে গেলো কুঁজো উলেমের, হলদে মুখ তাবিবের আর বাদুড় মার্কা ক্ষুদে বুড়োটার।

মঞ্চে বসে বসে উলেম, তাবিব এবং ছটফটে বুড়োটা শঙ্কায় এ-ওর দিকে তাকাচ্ছে। ঘোড়া থেকে নামা, প্রতীক্ষায় তিতিবিরক্ত লোকগুলির আর জল্লাদের দিকে না তাকাবার চেষ্টা তাদের।

অবশেষে সাহস করে কুরবাশিকে ধাক্কা দিল উলেম। থরথর করে কেঁপে উঠে, মাথা পিছনে হেলিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কুরবাশির মনে পড়ে গেল যে, সূর্যাস্তের সময় পাশের একটা গাঁয়ে হামলায় নিয়ে যেতে হবে ঘোড়-সওয়ারদের। সেখানে বিরোধী চাষীদের সঙ্গে একটা হিসেবনিকেশ অনেক দিন করা হয় নি। সূর্য তখন নিম্নগামী, অস্ত যাবে ঘণ্টা দুতিন পর, অতএব কুরবাশি ঠিক করল যে বদমাইশটাকে সাবাড় করার সময় হয়েছে। তার ভালো চোখটা নেকড়ের চোখের মতো জ্বলে উঠে নিবদ্ধ হল পালোয়ানের উপর।

ভয়াল সে চোখের দিকে অবিচলিতভাবে তাকাল পালোয়ান, নিজের ক্লান্ত অথচ দৃঢ় চোখ নামাল না।

খুব জোরে শরীরটাকে সামনে টেনে কুরবাশি গলা ফাটিয়ে চেঁচাল :

'নোংরা কাফের কোথাকার ! তোর কি মনে হচ্ছে—পেছনে জল্লাদ দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছে একটা বা দুটো জিন্দিগী ?'

পেছনে বাঁধা হাতের ফোলা আঙুলগুলো একটু নড়ে উঠল পালোয়ানের, সরাসরি কুরবাশির মুখে তাকিয়ে সে বলল :

'হুজুর ! যা বলার সব বলেছি, আর কিছু বলার নেই। এফেন্দি গরিবদের জান নিত, আমি তার জান নিয়েছি, আর এখন আপনি আমার জান নেবেন··· কিন্তু মারা যাবার আগে আমি এমন একটা জিনিস করতে চাই, যেটাতে আল্লা খুসি হবেন, সেটা করলে আল্লা······

'বুরবক !' চেঁচিয়ে উঠল কুরবাশি। 'আল্লার নাম মুখে আনিস না বলছি !'

হেসে পালোয়ান বলল, 'আল্লাকে অমর্যাদা করার কথা স্বপ্নেও ভাবি কি করে ? না হুজুর, আমার শেষ মুহূর্তে অন্য সব জিনিসের কথা ভাবছি। আপনার কাছে একটা ভিক্ষে চাই, হুজুর। আমাকে একটা কাজ করতে দিন, সেটাতে আল্লা খুসি হবেন, আপনারো উপকার হবে, হুজুর, বিজ্ঞ লোক আপনি !'

কুরবাশি হিংস্রভাবে গর্জে উঠল : 'তুই আমার কী উপকার করতে পারিস ?'

'হুজুর,' পালোয়ান বলল, 'আপনি সিংহের মতন জোরদার, আমি মৌমাছির মতন দুর্বল। কিন্তু জানেন তো, মৌমাছির কথায় কান না দেওয়াতে সিংহের প্রায় সর্বনাশ হতে চলেছিল ? আমাকে অবজ্ঞা করবেন না হুজুর, আপনাকে একটা রহস্য আমি জানাব।'

'তোকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি, কুত্তা কোথাকার।'

'এখন আমাকে দেখছেন এক চোখে, কিন্তু দু চোখে দেখতে হয়ত পারবেন,' আপত্তি জানিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল পালোয়ান আর কুরবাশির মুখে রাগ আর হতবুদ্ধির একটা ভাব দেখে আস্তে আস্তে আরো বললো, 'হুজুর, বাঁ চোখে আপনি দেখতে পারেন না, কালো জল পড়েছিল বলে। কিন্তু আপনার কানা চোখের দৃষ্টি আমি ফিরিয়ে আনতে পারি—অন্ধ লোককে আরোগ্য করার গোপন বিদ্যা আমার জানা।'

'আরোগ্য' কথাটা কানে যাওয়াতে ভারতীয় তাবিব হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে

উলেমকে জিজ্ঞেস করল দণ্ডিত লোকটা কী বলছে। তাবিব উজবেক ভাষা ভালো বুঝত না।

উজবেক ভাষায় আরবী শব্দ এখানে সেখানে ব্যবহার করে, যা বলা হয়েছে তার মর্মার্থ উলেম ব্যাখ্যা করাতে ঔদাসীন্য ঝেড়ে ফেলে তাবিব অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাকাল পালোয়ানের দিকে।

"মিথ্যে কথা বলছে নির্ঘাৎ," সে ভাবল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের সন্দেহকে সন্দেহ করে কঠোরভাবে নিজেকে প্রশ্ন করল: "লোকটার এই বড়ো মিথ্যেয় যদি সত্যের দানা থাকে একটা, তাহলে?"

কুরবাশি হঠাৎ ফিরল তাবিবের দিকে। বলল:

'তাবিব, এ লোকটার গোপন বিদ্যা তোমাকে উপহার দিচ্ছি। রোগ সারাবার গুণ তোমার তো বিশেষ জানা নেই, হপ্তায় তিনবার তুমি এমনভাবে কাঁপো যেন শয়তান পাপীকে ঝটকা দিচ্ছে, নিজের শরীরের রোগ তুমি সারাতে পারো না। অন্ধ লোককে সারাবার গোপন বিদ্যাটা এর কাছ থেকে জেনে নাও, তাহলে তোমার গুণ বাড়বে।'

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে কুরবাশি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুলো। বাড়ির ক্ষুদে ছটফটে কর্তা তাকিয়াগুলো তখুনি সেখানে বসিয়েছিল। ভাগ্যিস তাকিয়া ছিল, নইলে হয়ত হেসে ফেটে পড়ত কুরবাশি এত জোরে ওঠাপড়া করছিল তার বাজখাঁই ভুঁড়ি। কুরবাশির হঠাৎ ফূর্তির ছোঁয়াচ লাগল অন্যদের, এমন কি কঠোর মুখ উলেম পর্যন্ত একটি স্মিত হাসি চাপতে পারল না, আর বাদুড় মার্কা ক্ষুদে বুড়োটা একবার জোরে হেসে উঠল। এই অশোভন ফূর্তিতে যোগ দিল না শুধু তাবিব।

অবশেষে ধাতস্থ হল কুরবাশি।

'বোকাটার নানা গল্প শুনতে আর পারি না।' দম ফিরে আসার পর বলল সে, 'তাবিব তুমি কথা বলো ওর সঙ্গে।'

তাকিয়ায় আরাম করে বসে, রুমাল দিয়ে ঘর্মাক্ত মুখ মুছে কুরবাশি বিদ্বেষের একটা হাসি হেসে আরো বলল:

'এও তো হয় যে ইঁদুর ধরে বেড়াল তখুনি সেটাকে সাবাড় না করে একটু খেলা করে প্রথমে। আমরাও কিছুটা খেলতে পারি...তাই না, তাবিব?'

মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে তাবিব ফিরল পালোয়ানের দিকে। কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করল তাকে:

'কখনো অন্ধ লোকের দৃষ্টি ফেরাতে পেরেছ তুমি ?'

'না,' সহজভাবে জবাব দিল পালোয়ান। 'নিজে কখনো কাউকে সারাইনি, কিন্তু একবার আমার বুড়ো গুরু একজন অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। অন্ধ লোকটি দৃষ্টি ফিরে পেল আর বুড়ো লোকটি নিজে অন্ধ হয়ে গিয়ে মারা গেলেন।'

'মারা গেলেন কীসে ?'

'নিজের দৃষ্টিশক্তি অন্ধলোকটিকে দিয়েছিলেন বলে।'

অসাড় আঙুলগুলোকে আবার বেঁকিয়ে শান্তকণ্ঠে যোগ করল আহমেদ পালোয়ান :

'হুজুরের কানা চোখে নিজের দৃষ্টিশক্তি দিয়ে আমিও অন্ধ হয়ে যাব।'

এ উত্তরে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হয়নি এমন ভান করে তাবিব আরো কঠোর স্বরে প্রশ্ন করল :

'তোমার গুরুর কী নাম ছিল ?'

পালোয়ান বলল, যখন সবাই দেখবে যে সে সত্যি সত্যি একজনকে আরোগ্য করতে পেরেছে, শুধু তখনি গুরুর নাম বলবে।

তাবিব আর একবার মাথা নাড়িয়ে চিন্তামগ্ন হল। তার মাথায় জ্ঞানের চেয়ে কুসংস্কারের বোঝা বেশি, যদিও চিকিৎসা বিদ্যা কিছুটা তার জানা ছিল।

তার মনে হল পালোয়ানের কথাটা অসম্ভব, এমন কি অস্বাভাবিক, কিন্তু অনেকদিন আগে শোনা গুরুদের উপদেশও মনে পড়ল। গুরুরা সর্বদা বলতেন যে, প্রকৃতিতে সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে একটা ভেদরেখা টানা চলে না। তাবিব নিজের ম্যালেরিয়া সারাতে পারে না বটে, কিন্তু তা নিয়ে ইয়ার্কি করতে পারে শুধু কুরবাশির মতো মস্তিষ্কবিহীন লোক। বড় বড় হাকিমেরা পর্যন্ত রোগব্যাধির কাছে মাথা নত করে। কিন্তু যে জিনিস সিদ্ধ লোকের কাছেও অজানা সেটা যেমন-তেমন লোক জানতে পারে কি ?

চকিত দৃষ্টিতে পালোয়ানের দিকে একবার তাকিয়ে হঠাৎ মন ঠিক করে ফেলল তাবিব : যা হবার হোক, এ সুযোগ সে ছাড়বে না।

তার অপরিচিত ভাষায় থেমে থেমে সে পালোয়ানকে জিজ্ঞেস করল কুরবাশিকে সারাবার জন্য কী কী ওষুধ বা গাছগাছড়া তার দরকার।

পালোয়ান জানাল তার দরকার ছটা জিনিস। 'ভুলো-না-কখনো' ফুল, দুটো খুর্মা, একটা ডিম, এক চামচ মধু আর এক চিমটে যোয়ানের বীজ। নিজের বাড়ির

বিষয়ে জাঁকী সেই ছটফটে বুড়ো বে'র কাছে সব ছিল, ফুল বাদে। ফুল আনতে গেল একজন ঘোড়সওয়ার।

'তোমার আরো কিছু চাই নাকি ?' জিজ্ঞেস করল তাবিব।

'হ্যাঁ', বলল পালোয়ান। 'একটা তামার কেটলি আর একটা মোমবাতি।'

বুড়ো জিনিসগুলো আনল। পালোয়ান বলল মোমবাতিটা কুরবাশির কানা চোখের ঠিক সামনে রাখা দরকার। কেটলিটা বসাতে হবে আগুনে, দুটো চায়ের পাত্রে জল ভরে ঢালতে হবে কেটলিতে।

সব কিছু করা হল :

কেটলিতে জল ফুটছে, তখন পালোয়ান তাবিবকে বলল মধুটা জলে গুলে দিতে, ডিমটা ফাটিয়ে তাতে ফেলতে, খুর্মা ও যোয়ানের বীজগুলো জলে ছেড়ে দিতে।

আরো বলল, কেটলির পাশে বসে যে ঘোড়সওয়ারটা মিশেলটা ঘাঁটছে তাকে যেন ফুলগুলো দেয় সেই ঘোড়সওয়ারটি যে ফুল এনেছে। প্রথম ঘোড়সওয়ার ফুলগুলি পাওয়ামাত্র পালোয়ান তাকে হুকুম দিল সে যেন ছটা ফুল গুনে মিশেলে ফেলে দেয়।

তাবিব একবারও সতর্ক দৃষ্টি ফেরায়নি পালোয়ানের উপর থেকে। প্রক্রিয়াগুলির পূর্বাপর মনে রাখার চেষ্টা সে করে চলেছে, কিন্তু তারি সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহে সে জর্জরিত।

"সত্যি যদি লোকটার গোপন বিদ্যেটা জানা থাকে!" এটা ভেবে সে হিসেব করতে বসল গোপন বিদ্যা তার নিজের রপ্ত হয়ে গেলে কত লাভ হবে। প্রথমত, কুরবাশির পৃষ্ঠপোষকতা তার আর দরকার হবে না, অন্য কারোর ছুরি বা গুলির সাহায্য না নিয়েই বিষের দ্রুত মাধ্যমে তাকে সরাতে পারবে। সত্যি, এমন একটা জবর রহস্যের চাবিকাঠি যার হাতে তাকে সম্বর্ধনা করতে পারলে ভারতের যে কোনো সহর কৃতার্থবোধ করবে। তাহলে ডাকাত দলের এই নিষ্ঠুর সর্দারের কৃপা ভিক্ষা সে করবে কেন ? এমনকি সে ফিরে যেতে পারবে নিজের সহরে যেখান থেকে অন্যান্য তাবিবের হীন ষড়যন্ত্রের ফলে জোচ্চোর আর গণ্ডমূর্খ বলে সে নির্বাসিত হয়। বিখ্যাত ও পরাক্রান্ত হয়ে সে যখন ফিরে যাবে, ফিরে যাবে এমন তাবিব হয়ে যার তুলনা পৃথিবীতে কখনো হয়নি, তখন এই সব হীন, আর হিংসুটে তাবিব কী বলবে, কী বলবে উচ্চশিক্ষিত হাকিমরা, কোথায় ঢাকবে নিজেদের লজ্জা ?

কেটলি থেকে ওঠা নীলচে বাষ্পরেখার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে এ ধরনের সব চিন্তা ভিড় করেছিল ভারতীয় তাবিবের মাথায়।

কেটলির দিকে নজর রেখেছিল পালোয়ানও।

নীলচে বাষ্প যখন কুঁকড়ে সাদা হতে শুরু করল তখন পালোয়ান বলল কেটলিটা সরাতে আর এমন সব পাথর আনতে যাদের জল স্পর্শ করেনি কখনো।

'লেয়াও পাথর,' হুকুম দিল কুরবাশি। হঠাৎ তার মালুম হয়েছে যে পাশের গাঁয়ে হামলা চালাবার আগে ঘোড়সওয়ারদের একটা তামাশা দেখিয়ে উত্তেজনা যোগাতে হবে আর তামাশার শেষ করবে সে, স্বয়ং কুরবাশি, শেষ করবে মজার ও রক্তাক্ত একটা কসরতে।

নিজেদের পোশাকের খুঁটে করে তিনজন ঘোড়সওয়ার পাথর এনে আহমেদ পালোয়ানের পায়ের কাছে জড় করল।

পালোয়ান বলল প্রত্যেকটা পাথর তাকে আলাদা করে দেখাতে। শেষ পর্যন্ত তিন সাড়ে তিন সের ওজনের একটা পাথর সে বেছে নিল।

'ঠিক জানি না পাথরটায় কখনো জল লেগেছে কি না', বলে সে ওদের হুকুম করল সেটাকে ঘষে মেজে লাঙলের লোহার ফলকের মতো করে দিতে।

'যা বলছে কর।' আদেশ দিল কুরবাশি। ষণ্ডামার্কা ছোকরা একটি ঘোড়সওয়ার একটা হাতুড়ী নিয়ে কাজ শুরু করল। এরকম হাতুড়ী জাঁতার পাথর তৈরির কাজে লাগে।

পালোয়ান তাবিবের দিকে ফিরে বলল :

'হাকিম! আমার এখন মানুষের রক্ত চাই!

'কোথায় পাবো?' শঙ্কিত কণ্ঠে বলে তাবিব, তাকাল কুরবাশির দিকে।

পালোয়ানের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কুরবাশি।

'আমি দেব রক্ত!' কুরবাশির দিকে ফিরে বলল পালোয়ান। 'হুজুর জল্লাদকে বলুন আমার একটা আঙুল কেটে নিতে!'

নানা কণ্ঠের চাপা আওয়াজ বিরাট উঠোনটায় গড়িয়ে মিলিয়ে গেল।

কোঁকড়ানো দাড়িতে হাত বুলিয়ে কুরবাশি এমনভাবে বলল যেন স্বগতোক্তি করছে :

'তাহলে তো তোর হাতের বাঁধন খুলতে হয়।'

'হুজুর, আপনি তাহলে আমাকে ডরান?' বলে কুরবাশির মুখের দিকে উদ্ধতভাবে তাকাল পালোয়ান।

দাড়ি শক্ত করে চেপে টান দিল কুরবাশি, গাল টকটকে লাল হয়ে উঠল, তাতে গুটিগুলো আরো ফুটে উঠল।

'শুয়োরটার বাঁধন খুলে দে,' চেঁচিয়ে উঠল কুরবাশি। 'শুয়োরটার বাঁধন খুলে দে! দুজনে খোলা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়া ওর দুপাশে। আর জল্লাদ, তুই তলোয়ার খুলে ওর ওপর কড়া নজর রাখ!'

খোলা তলোয়ার হাতে তিনজন ঘিরে দাঁড়াল পালোয়ানকে, ছুরি দিয়ে কাটতে বাঁধনের দড়িটা মাটিতে পড়ে গেল। মাথার উপরে হাত তুলে নাড়াল পালোয়ান।

'একখণ্ড কাঠ আর একটা বাটি নিয়ে এসো!' হাতের কব্জার কড়া ঘষতে ঘষতে হুকুম দিল পালোয়ান।

কাঠ আর বাটি এল। কোথায় সেগুলো রাখতে হবে ইশারায় জানাল পালোয়ান।

'তুমি তৈয়ার হও, জল্লাদ!' শান্ত কণ্ঠে সে বলল। 'যখন চেঁচিয়ে বলব "কাটো" ঠিক তখনি কাটতে হবে কিন্তু!'

বিড়বিড় করে জল্লাদ কী বলল শোনা গেল না।

তাবিবকে ডেকে পালোয়ান বলল, 'হাকিম! এখানে দাঁড়িয়ে বাটিটা ধরুন!'

মঞ্চ থেকে নেমে এল তাবিব, বাটিটা নিয়ে যেখানে তাকে দাঁড়াতে বলা হয়েছে সেখানে দাঁড়াল।

হাঁটু গেড়ে বসল পালোয়ান। বাঁ হাতের চারটে আঙুল চেটোয় মুড়ে কড়ে আঙুলটা রাখল কাঠের উপরে।

ছটফটে বুড়োর বাড়ি আর উঠোনে এত গভীর স্তব্ধতা তখন যে একটি উড়ন্ত প্রজাপতির ডানার ফৎফৎ শব্দ কানে এল স্পষ্টভাবে।

কুঁজো উলেমের হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠল, শাদা হয়ে গেল মুখ, দু হাতে মুখ ঢাকল সে। খুব সম্ভবত 'কাটো' এ চীৎকারটা, বা হাওয়ায় তলোয়ারের শিস তার কানে যায়নি।

যখন সে চোখ খুলল, তখন পালোয়ান একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাবিব রক্তপাত রোখার জন্য ক্ষতস্থানে কী একটা গুঁড়ো ছড়াচ্ছে। পালোয়ানের মুখে ঘামের চকচকে বড়ো বড়ো বিন্দু, সে নিশ্বাস ফেলছে হাঁপিয়ে, সশব্দে।

উলেম আড়চোখে দেখে নিল যে বাটিটা আর শূন্য নয়, কীসে যেন ভরা, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে পালোয়ানের আধবোজা

চোখের পাতা কেঁপে উঠল। হাতের দিকে তাকিয়ে সে দেখল রক্তপাত কমে এসেছে।

'পাথর তৈয়ার ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'পাথর তৈয়ার ?' প্রতিধ্বনির মতো পুনরুক্তি করল কুরবাশি, তারপর হাত নাড়িয়ে অধীরভাবে বলল, 'নিয়ে আয় এখানে।'

সে মুহূর্ত পর্যন্ত কুরবাশির কোনো সন্দেহ ছিল না যে মৃত্যু এড়াবার জন্য পালোয়ান তাকে ধাপ্পা দিচ্ছে। কিন্তু এখন তার প্রায় নিশ্চিত ধারণা যে এই অবোধ্য লোকটা তার কানা চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারে। করুণা বা করুণাজাতীয় কিছুর অস্পষ্ট একটা অনুভূতি তার নিষ্ঠুর বুকে সাড়া জাগিয়েছে। পালোয়ানের দিকে যেভাবে এবার সে তাকাল তাতে ক্রোধের ভাবটা কম।

নানা নির্দেশ দিয়ে চলল পালোয়ান। এমনভাবে সেগুলো পালন করা হল যেন স্বয়ং কুরবাশির নির্দেশ।

লাঙলের ফলার মতো বানানো পাথরটা নিয়ে এল বিরাটদেহী ঘোড়সওয়ার। পালোয়ানের নির্দেশ মতো তাবিব সেটাতে লাগাল কেটলিতে তৈরি মিশেলটা। যে মন্থরগতির জন্য তাবিবের একটা হোমরা-চোমরা ভাব সেটা সে ঝেড়ে ফেলে খুব চটপট ভাবে কাজ করছে, তার আর কোনো সন্দেহ নেই পালোয়ানের সম্বন্ধে, তার বিশ্বাস মহান রহস্যের চাবিকাঠি চলে আসবে তার হাতে, সেই তাবিবের হাতে যে কুরবাশির ডাকাতদলে বিপজ্জনক আর কঠিন কাজে হয়রান হয়ে গিয়েছে।

পাথরটা নিয়ে তাবিব এমন একটা জায়গায় গেল যেখানে হাওয়া খেলে, কেননা পালোয়ান বলেছে যে পাথরটা শুকিয়ে যাওয়া চাই। ঠিক সে সময়ে তার মনে পড়ল পালোয়ান বলেছে যে, অন্ধকে দৃষ্টিদানের শক্তি যার সে নিজে অন্ধ হয়ে যাবে অন্যকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে। এটা মনে পড়াতে তাবিব এত ভয় পেয়ে গেল যে হোঁচট খেয়ে আর একটু হলে পাথরটা ফেলে দিত। কিন্তু আর একটা কথা তার মনে হল।

"আমি শুধু বড়ো লোকেদের সারাব আর এত টাকা হবে যে, যে কোনো ভিখিরি আমার জায়গায় অন্ধ হয়ে যেতে রাজি হবে..."

এটা ভেবে সে তাজা হয়ে উঠল। হাওয়া খেলে এমন একটা জায়গায় পাথরটা রেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল পালোয়ানের দিকে।

'এরপর সব কিছু আমিই করব', বলল আহমেদ পালোয়ান। গুরুতর একটা

কাজ করেছে এমনভাবে মঞ্চে উঠল তাবিব। তার দিকে তাকিয়ে রইল পালোয়ান, কাটা হাতের রক্তপাত তখন বন্ধ হয়েছে। হাতটা কাঁধ বরাবর নামিয়ে, কুরবাশির দিকে ফিরে সসম্ভ্রমে বলল, 'যদি হুজুর অনুমতি দেন তাহলে পাথরটা না শুকোনো পর্যন্ত একটু জিরিয়ে নিই।'

'বোস, বোস!' তাড়াতাড়ি বলল কুরবাশি। আশপাশের লোকে তার কণ্ঠস্বরে হয়তো সদয়তার একটা ছাপ পেত, কিন্তু সে ভাঙা খেঁকী গলায় নরম সুর আনার উপায় ছিল না।

তিনজন রক্ষীর মাঝখানে উবু হয়ে বসে পালোয়ান শ্রান্তভাবে মাথা নোয়াল। হাঁটুর উপরে আঙুল কাটা হাতটা না-থাকলে মনে হত একটা চাষা অল্প জিরিয়ে নেবার জন্য বসেছে, আবার খেতে বা বাগানে কাজ শুরু করবে বলে। মৃত্যু যার অনিবার্য সেই লোকটির অদ্ভুত শান্তভাব দেখে কুরবাশি অবাক, এমনকী শঙ্কিত বোধ করল।

এতদিন পর্যন্ত কুরবাশির ধারণা ছিল মানুষের মনের সমস্ত অলিগলি তার নখদর্পণে। যুদ্ধের সৈনিক, খেতের চাষী সে খুন করেছে, রক্তপাত করেছে ক্যারাভান পথের বালিতে, গ্রামের পদদলিত রাস্তায়, স্ত্রী-পুরুষের জীবন নিয়েছে, অনেক সময়ে ভেবে দ্যাখেনি পর্যন্ত তারা দোষী কী না—এভাবে হাজার-হাজার লোকের জান নিয়েছে কুরবাশি। আজকের এই প্রৌঢ় চাষীটির মতো শত-শত বন্দী দাঁড়িয়েছে তার সামনে, কিন্তু তাদের কয়েকজনকে মাত্র তার মনে আছে, কারণ মৃত্যুর আগে তাকে শাপ ও গালিগালাজ দেবার সাহস দেখিয়েছে কয়েকজন মাত্র।

আর-কোনো কারণে না-হোক, আহমেদ পালোয়ান দুর্বোধ্য এইজন্য যে সে শাপান্ত করেনি, করুণা ভিক্ষা করেনি, বুদ্ধিসংগত ভাবে, খাতির দেখিয়ে যুক্তি করেছে।

কী ধীরস্থিরভাবে বিশ্রামটা উপভোগ করছে দুর্বোধ্য মানুষটা! তা দেখে মন্ত্রণা দেবার যত উপায় কুরবাশির জানা, সব ক-টা সে ভেবে দেখল একবার, কিন্তু এমন একটার কথা মনে এল না যেটা পালোয়ানের অস্বাভাবিক প্রশান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

'শয়তানটার অনুভূতি বলে কিছু নেই। লোকটা আমার ঘোড়সওয়ার দলে যোগ দিলে একাই একশ হত।' ভাবল কুরবাশি আর রাগ ও অস্বস্তির একটা

ভাবে তার বুকটা ভরে উঠল। কেননা সে জানত যে পাথরকে ভাঙা চলে—কিন্তু বাঁকানো যায় না।

দাড়িতে হাত বোলাতে-বোলাতে চিন্তার ভারি জাঁতো এভাবে চালাল কুরবাশি যতক্ষণ-না উলেম তার কাঁধের দিকে ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে বলল :

'সময় কেটে যাচ্ছে হুজুর !'

ঝিমুনো জাঁতিওয়ালার মতো গা নাড়া দিয়ে কুরবাশি হুমকির হাঁক ছাড়ল :

'হেই ! কাজ শুরু করলে হয় না ?'

'আজ্ঞে, হুজুর !' মাথা তুলে শান্তভাবে বলল পালোয়ান। 'পাথরটা, বোধ হয় শুকিয়েছে…এখানে আনুক ওটা।'

বিরাটদেহী ঘোড়সওয়ারটি তাড়াতাড়ি আদেশ পালন করল। তার কাছ থেকে পাথরটা নিয়ে পালোয়ান তেকোনা ধারালো মুখটা আস্তে-আস্তে দেখে নিল আঙুল দিয়ে।

'হুজুর !' পায়ের কাছে পাথরটা রাখতে-রাখতে সে শুরু করল। 'চিকিৎসা আরম্ভ করার আগে জিজ্ঞেস করতে চাই…'

'যে তোকে মারা হবে না, এই তো ?' বাধা দিয়ে কুরবাশি বলে উঠল। ভালো চোখটা জ্বলে উঠল অশুভ জয়ের একটা ঝিলিকে। 'সেটা সম্ভব নয়, শুনছিস ভাঁড় কোথাকার ! সেটা অসম্ভব, কেননা তোর হাতে এফেন্দির খুন লেগে আছে…'

'ঠিক বলেছেন হুজুর !' বিনীতভাবে বলল পালোয়ান, যেন কুরবাশির কথার যাথার্থ্য সে স্বীকার করছে। 'কিন্তু আপনার ডান হাত হবার আগে এফেন্দি কী ছিল বলুন।

'সে ছিল খাঁটি মুসলমান আর মুসলমান শাসকের সৈনিক !' গুরুত্বপূর্ণ ভাবে বেশ ঠাটের সঙ্গে জবাব দিল কুরবাশি।

'তা, শুনেছি,' সহজভাবে মেনে নিল পালোয়ান। 'কিন্তু এও শুনেছি যে বিদেশের সেই শাসককে যখন সমুদ্রতীরের শাদা প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তখন, এফেন্দি স্বদেশে ফিরে যেতে চায়নি।

সতর্কভাবে মাথা নাড়াল কুরবাশি।

ঠিক আগেকার মতো সহজভাবে বলে চলল পালোয়ান, 'এ-রকমটা ঘটে তাহলে। তাহলে নিজের দেশ ছেড়ে এফেন্দি বিদেশে, আমাদের দেশে রয়ে গেল, তাই-না ? আমাদের দেশে কী করল সে ? আপনি আর জবাব দেবেন

না, আপনাকে আমিই বলছি···আপনার পাশে-পাশে ঘোড়ায় চেপে এফেন্দি গ্রামে আগুন লাগাত, খুন করত, লুঠতরাজ চালাত···'

নিজের নিচু জায়গা থেকে কুরবাশির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে বলে উঠল পালোয়ান।

'সেজন্য আমি তার জান নিয়েছি!'

'কুত্তা! শুয়োর কোথাকার!' ভাঙা গলায় চীৎকার করে কুরবাশি ছোরার বাঁট ধরার জন্য আলখাল্লা হাতড়াতে লাগল।

'চিকিৎসার কথাটা···আপনি চিকিৎসার কথাটা ভুলে গিয়েছেন!' বাঁ দিক থেকে আর্তনাদ করে উঠল তাবিব, তার ডান দিক থেকে উলেম হলদে হাতে পালোয়ানকে দেখিয়ে খ্যানখ্যানে গলায় সুর মেলাল:

'হুজুর, আপনাকে ঠকাতে দেবেন না ওকে! দেখছেন না, বদমায়েসটা কি সহজে মরতে চায়!'

'সাচ বাত্, উলেম···তুমিও ঠিক বলেছ তাবিব'···জোরে-জোরে নিশ্বাস ফেলে গরগর করে বলল কুরবাশি। 'কিন্তু ছুরি নিয়ে খেলার বিষয়ে কুত্তাটা যেন হুঁশিয়ার থাকে! কথাটা কানে যাচ্ছে, বেটা শয়তান?'

'যাচ্ছে, হুজুর।' আগেকার মতো, হয়তো বা আগেকার চেয়ে সসম্ভ্রমে জবাব দিল পালোয়ান। 'মাফ করবেন হুজুর, আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম আপনার রাগ এখনো জেগে আছে কি না?'

'সেটা জানায় তোর কী দরকার?' জিজ্ঞেস না-করে পারল না কুরবাশি।

'কারণ আপনার রাগকে আমি যত-না ভয় পাই, তত ভয় পাই আপনার দয়ালুভাবকে···'

আবার কুরবাশি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস না-করে পারল না:

'বুঝলাম না···'

'শীগগিরই বুঝবেন!' বলল পালোয়ান। 'আমি আপনাকে সারাতে চাই, তাই না? তাই আমার ভয়ের কারণ আছে যে যখন আপনার কানা চোখে আলোর ফুলকি জ্বলে উঠবে, তখন কৃতজ্ঞ হয়ে আপনি আমার জান নেবেন না।'

'হুঁ, দেখছি তুই একটা বিদঘুটে ভাঁড়!' রাগত কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল কুরবাশি।

'একটু সবুর করুন, হুজুর আমি এখনো শেষ করিনি···'

'বল কী বলবি, কিন্তু ঘ্যানঘ্যান করিস না!'

'বেশ, হুজুর! এই দেখুন আমার আঙুল-কাটা হাত, আর এই হল এক জোড়া চোখ। চোখের আলো যখন আপনাকে দেব…'

'বুঝেছি,' বাধা দিয়ে বলল কুরবাশি। 'তারপর?'

'আপনি আমাকে বাঁচতে দেবেন সেটা আমি চাই না…বাজারে-বাজারে যাকে ভিক্ষের অন্ন চেয়ে বেড়াতে হয় তার জীবনের কী মানে?'

'বিজ্ঞ লোকের মতো কথা বলছিস বটে,' কুরবাশি হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল:

'কিন্তু তোকে বাঁচতে দেব এ-কথাটা মনে হল কেন?'

এতক্ষণ পালোয়ান উবু হয়ে বসেছিল, এবার দাঁড়িয়ে উঠে কুরবাশির দিকে হাসি মুখে তাকাল।

'আমার সন্দ আছে, হুজুর!' বলল সে।

'না-না, তোর সন্দের কোনো কারণ নেই,' বিদ্বেষপূর্ণ ভরসার সুরে বলল কুরবাশি, 'তুই জানিস যে চিকিৎসা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে তোর জান নেব… সেজন্যই তো চিকিৎসাটা তাড়াতাড়ি সারছিস না, তাই না, ভাঁড়?'

'তা নয়, হুজুর। চিকিৎসা শুরু করতে আমি তৈয়ার, কিন্তু তার আগে আমার নিশ্চিত জানা দরকার…'

'কী জানা দরকার?'

'যে আপনি আমাকে খুন করবেন।'

'তোকে তো বলেছি…'

'শুনেছি, হুজুর…'

'তাহলে তুই কী চাস?'

'আপনার লোকদের দু-একটা কথা বলতে চাই…'

'কেন?'

'আপনাকে রাগাবার জন্য…'

'আমি তো রেগেই আছি…'

'আপনাকে আরো রাগাতে চাই…'

'আর আমার লোকদের যদি বোকা-বোকা কথা তোকে বলতে না-দিই?'

হেসে অন্য-একটা প্রশ্ন করে জবাব দিল পালোয়ান:

'আমার বোকা-বোকা কথাকে আপনি ভয় পান?'

লাল হয়ে উঠে, রক্ষীদের দিকে মাথা নাড়িয়ে চাপা গলায় এমনভাবে কুরবাশি বলল যেন নিজেকে জিজ্ঞেস করছে :

'আর যদি ওদের বলি একটা বোকার মাথায় তলোয়ারগুলো শানিয়ে নে, তাহলে ?'

'আর যদি একটা কানা চোখ চিরকাল কানা থাকে তাহলে ?' জিজ্ঞেস করল পালোয়ান।

তাকিয়ায় লাফিয়ে বসে কুরবাশি তার গর্জনে ভরিয়ে দিল সমস্ত উঠোন :

'শয়তান ! যত তাড়াতাড়ি পারিস তোর নোংরা কথা সেরে নে !'

'বেশ, হুজুর !' তাড়াতাড়ি কণ্ঠস্বরের বেয়াড়া ভাবটা বিনীত করে কুরবাশির সামনে দাঁড়িয়ে চোখ নামাল পালোয়ান।

'আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে না, আমার সঙ্গে না।' গর্জে উঠে কুরবাশি হাত নাড়িয়ে অন্য লোকদের দেখাল। তারা সাগ্রহে ব্যাপারটা দেখছিল।

মাটিতে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা লোকগুলির দিকে ফিরল পালোয়ান। অস্ত সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল তার মুখ ওরা দেখল।

পরিষ্কার জোরালো গলায় পালোয়ান বলে উঠল :

'ভাই সব ! তোমরা আমাকে দেখে দেখে ভাবছ, "বোকা লোকটা নিজের সবচেয়ে বড়ো শত্রুর জন্য, হুজুরের জন্য, হাতের একটা আঙুল দিয়েছে আর এখন নিজের দৃষ্টিশক্তি দেবে।" তাতে অবাক হয়ো না। আমি তো শুধু একটা আঙুল আর দৃষ্টিশক্তি দিচ্ছি আর তোমরা নিজেদের দিয়ে দিচ্ছো যাতে দুশমনটা তোমাদের টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে পারে। নিজের বাপভাইকে যখন তোমরা মারো, নিজেদের গ্রামে যখন আগুন জ্বালাও তখন নিজেদেরই তোমরা মারো। ভেবো না আমি ভয়ে পাগল হয়ে গিয়েছি। ওরা আমার হাড় মাংস আলাদা করুক, জাঁতাকলে গুঁড়ো করে দিক আমার হাড়, যা ইচ্ছে করুক, আমি তৈয়ার যদি আমার কথার সত্যটা তোমরা বোঝো ! আর মিনিট পনেরোর মধ্যে আমি মরব···কিন্তু মরার আগে জানতে চাই কার খাতিরে তোমরা পিঠে রাইফেল ঝুলিয়ে ঘোড়ায় চেপে চারদিক ঘোরো, নিজেদের ভাইদের, তোমাদেরই মতো গরিবদের ক্ষতবিক্ষত করো ? বলো আমাকে, সৎ চাষীর হাল ছেড়ে দিয়ে অসৎ রাইফেল ঘাড়ে নিয়েছ কার খাতিরে ?'

'চোপ রও, আর কথা নয়, বদমায়েস !' ক্রুদ্ধ কুরবাশি তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার

করল। কিন্তু পালোয়ান তার দিকে তাকাল না পর্যন্ত, আরো জোরে, আরো উচ্চকণ্ঠে বলে চলল :

'আমাদের লোকে যখন প্রতিবিপ্লবী ডাকাতদলগুলোকে একেবারে শেষ করে দেবে তখন বড়োলোকরা, ভুঁড়িপেট বে'গুলো ভয় পাবে···কিন্তু তোমাদের তো কিছু নেই, তোমাদের কীসের ভয় ?'

রাগে কুরবাশির মুখ কালো হয়ে গেল, ইশারায় সে জল্লাদকে জানাল তলোয়ারের ভোঁতা দিকটা দিয়ে পালোয়ানকে মারতে। কিছু না-ভেবেই হুকুম পালন করল জল্লাদ। টলমল করে উঠল পালোয়ান, কিন্তু পড়ে গেল না।

তারপর কুরবাশি কাঁধের এক ঝটকায় তাবিবের হাত আর উলেমের থলথলে থাবা ছাড়িয়ে মঞ্চের কিনারায় গিয়ে একেবারে পালোয়ানের মুখে হিসিয়ে উঠল :

'তোর বকবকানি শুনেছি অনেকক্ষণ। এবার আমার কথা শোন্। আগে ভেবেছিলাম তলোয়ারের এক ঘায়ে মরবি, সেভাবে আর মরবি না, বেটা ভাঁড়, মরবি বুনো শুয়োরের দাঁতের মতো ধারালো ছুরির খোঁচায়। কিন্তু মরবার আগে তাবিব তোর গায়ের ছাল আস্তে-আস্তে ছাড়িয়ে নেবে, চামড়াটা লাগানো হবে ঢাকের গায়ে, আমার হাতে ঢাকের বাদ্যি তুই শুনবি, তারপর যে-ছুরিটা দিয়ে জল্লাদ তোর গলা কাটবে সেটা দেখবি। যা বলবার বলেছি। ব্যস, আর কিছু বলার নেই। বকবকানি থামিয়ে এবার নিজের কাজে লাগ!'

নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বাটিটা দেবার ইশারা করল পালোয়ান। ইশারাটা লোকে বুঝল। বাটির জিনিশে পাথরটা ভিজিয়ে নিল পালোয়ান। তার অন্যান্য ইশারা কিন্তু লোকের মাথায় ঢুকল না। বোঝাবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল। বাপান্ত করে কুরবাশি তাকে বলল কী সে চায় কথায় বুঝিয়ে দিতে।

পালোয়ান হুকুম দিল যে খড় এনে সরু আঁটি করতে। তারপর তাবিব আর গৃহকর্তাকে নিজের কাছে ডেকে বলল :

'একটা আঁটি নাও তো কর্তা। আর হাকিম, আপনি পাথরটা ধরুন!'

তার আজ্ঞা পালন করা হল। তখন সে বুড়োকে বলল আঁটিটা জ্বালিয়ে কুরবাশির মুখের কাছে ধরতে।

'তাতে হুজুরের ভালো চোখটা খারাপ হয়ে যেতে পারে!' আপত্তি জানাল বুড়ো।

'ভালো চোখটা একটা রুমালে বেঁধে দাও তাহলে,' হুকুম দিল পালোয়ান।

চোখ বাঁধার পর তাবিব আর বুড়োকে কুরবাশির সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে আদেশ দিল সে।

এবার মোমবাতিটা জ্বালানো হোক। 'দেখতে হবে আলোটা যাতে নিভে না-যায়,' বলল সে।

মোমবাতি জ্বালানো হল। দপদপে শিখার দিকে তাকাল পালোয়ান। তাবিবের দিকে ফিরে বলল :

'হাকিম পাথরের ধারালো দিকটা কানা চোখের দিকে ধরে এভাবে দোলান!'

কী করতে হবে ইশারায় জানাল পালোয়ান। তাবিব পাথরটা কয়েকবার ছুঁড়ে লুফে নিয়ে এদিক-ওদিক দোলাতে শুরু করল।

'আস্তে, আরো আস্তে!' চেঁচিয়ে উঠল পালোয়ান। 'মা ছেলেকে যেমনভাবে দোল দেয় সেটা ভাবুন!'

মনে হল মায়ের দোলানি তাবিব কখনো ছাখেনি, কেননা পালোয়ান বারবার তাকে চেঁচিয়ে বলতে লাগল :

'আস্তে, আস্তে, রয়ে সয়ে…'

তাবিব যতই চেষ্টা করুক, পালোয়ান চ্যাচাতেই লাগল :

'ওভাবে নয়, ওভাবে নয়! আবার শুরু করুন!'

ইতিমধ্যে খড়ের চতুর্থ আঁটিটা ধরিয়েছে বুড়ো, জ্বলন্ত খড়ের ধোঁয়ায় আরোগ্যপ্রার্থী কুরবাশির দম বন্ধ হবার জোগাড়।

শেষ পর্যন্ত তার সহ্যের সীমানা পেরিয়ে গেল। তাবিবের অপটুতায় বিরক্ত হয়ে কুরবাশি হুঙ্কার দিল :

'ওকে পাথরটা দিয়ে দাও, তাবিব! যেভাবে দোলাতে চায় নিজে দোলাক।'

আর কুরবাশির কাঁধের উপর ঝুঁকে উলেম ফিসফিস করে তার কানে কী যেন বলল। খুব সম্ভব সাবধান করল যে প্রভুর হুকুমটা বিপজ্জনক, কেননা কুরবাশি তাকে গালি দিল।

'বেটা গর্ভস্রাব আমার কী করতে পারে!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল। 'জল্লাদ আর তলোয়ার হাতে দুটো লোক তাহলে আছে কেন? ওরা আরো কাছে সরে আসুক, লোকটাকে আনুক এখানে!'

ওরা পালোয়ানকে নিয়ে গেল মঞ্চে। কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল অসিধারীরা।

কুরবাশির সামনে নতজানু হয়ে পালোয়ান বলল :

'হুজুর! উলেমের মনে যাতে কোনো খটকা না-থাকে সেজন্য আমার চোখ বেঁধে দেওয়া হোক!'

ধোঁয়ায় কাশতে-কাশতে কুরবাশি বলে উঠল, 'ওর চোখ বেঁধে-দে।'

চোখ বাঁধার পর পালোয়ান বলল, 'হাকিম, আমাকে পাথরটা দিন।'

তার প্রসারিত হাতে পাথরটা ঠেলে দিয়ে বিব্রতভাবে পাশে সরে দাঁড়াল তাবিব।

'মোমবাতিটা দেখবেন, হাকিম!' বলল পালোয়ান। 'আর দেখবেন ছুঁচলো দিকটা যেন সবসময় কানা চোখের সামনে থাকে। হুজুর, কাজ শুরু করছি!'

...আস্তে-আস্তে, সমানভাবে পালোয়ান সামনে-পেছনে দোলাতে লাগল পাথরটা। দোলানিতে খড় আরো জোরে জ্বলে উঠল, ধোঁয়া উঠল ঘন আরো ঘন হয়ে, ঢেকে গেল আহমেদ পালোয়ান ও কুরবাশির মাথা। দৃষ্টিদাতার পিছনে মোমবাতির শিখা কাঁপছে, দপদপ করছে। তাবিব আর সবাই তাকিয়ে রয়েছে শিখাটার দিকে, সঙ্গে-সঙ্গে নজর রেখেছে পালোয়ানের হাতের উপর।

চোখ বাঁধা সত্ত্বেও সে হাতের গতিবিধি এত নিখুঁত যে, পাথরের ছুঁচলো দিকটা সবসময় কানা চোখের সামনে রয়েছে। লক্ষ্য থেকে পাথরটা একটু সরে গেলে হুঁশিয়ারি দেবার সময় পর্যন্ত পেল না তাবিব, কারণ দৃষ্টিদাতা সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল: 'আলো!' আর তখন নিমেষের জন্য সবাই তাকাল মোমবাতিটার দিকে, তাবিবও।

ঠিক সেই মুহূর্তে পাথরের ছুঁচলো কোণটা ভেদ করল কুরবাশির রগ।

পরমুহূর্তে হাওয়ায় শিস দিয়ে উঠল জল্লাদের তলোয়ার, আর পালোয়ানের মৃতদেহ পড়ে গেল মৃত কুরবাশির উপর।

তলোয়ার মোছবার সময় পর্যন্ত পেল না জল্লাদ, একটি ঘোড়সওয়ারের গুলিতে তার মৃত্যু ঘটল।

প্রথম গুলির পর আর-একটা গুলি, তারপর আর-একটা। কুরবাশির সহচররা এ ওকে হত্যা করতে শুরু করল দারুণ যুদ্ধে। মাঝরাত পর্যন্ত চলল লড়াই।

মাঝরাতে বাদুড়মার্কা খুদে বুড়োর বাড়িটায় আগুন লাগল। আলোর বিরাট একটা শিখা শূন্যে উঠে আশেপাশের গ্রামকে জানিয়ে দিল মরণ ঘটেছে সেই কুরবাশির, যাকে অনেক লোক 'কানা বাঘ' বলে ডাকত।

অনুবাদ: প্রমথ সেন

ওয়ালিদ ইখ্‌লাস্‌সি

মরা বিকেলে

দেয়ালঘড়িতে বাজলো পাঁচটা, আর সেই ঢং ঢং সারা বাড়ি ভ'রে দিলো। আমার জানলা থেকে আমি তাকিয়ে দেখছিলাম সোয়ালোর ঝাঁক: তারা উড়ে যাচ্ছে শহরের আকাশ দিয়ে; হাজার-হাজার সোয়ালো, কালো-কালো কত-যে চলন্ত ফুটকি।

সন্ধ্যা, এর মধ্যেই, একটা নতুন দিনের মধ্যে তার জায়গা দখল ক'রে নেবার জন্য তৈরি।

'আল্লাহ্ যেন ওদের দোয়া করেন,' আমি বললাম নানীকে। নানীর নমাজ শেষ হয়েছে ততক্ষণে।

'বিকেলের নমাজ শুরু করতে দেরি ক'রে ফেলেছিলাম,' নানী উত্তর দিলেন হালকা সুরে।

'তো কী। আরো তো বিকেল হবে।'

নানী কিন্তু আমার কথা শুনতে পাননি।

জানলার কাচে প্রকাণ্ড এক মাছি ব'সে আছে, আমি তাকিয়ে দেখলাম: মনে হ'লো মাছিটা যেন আমাকে মানছে না, অবাধ্য আর উদ্ধত, একেবারে আমার নাকের ডগায় ব'সে আছে যেন।

'এই মাছিটা সারাদিন ধ'রে আমাকে জ্বালিয়েছে,' আমি বললাম, 'আর আমি কিনা এটাকে এখনো খতম করতে পারলাম না!'

নানী কোনো উত্তর দিলেন না: তিনি ততক্ষণে আবার এক নমাজ শুরু ক'রে দিয়েছেন।

সময় কীভাবে কেটে যাচ্ছে, সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আমার ছিলো না: মাছিটাই আমার সময়ের অনেকখানি দখল ক'রে নিয়েছিলো। জানালায় টোকা মেরে-মেরে আমি তাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে তাতে একচুলও নড়েনি। আমার নখগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলাম

সেগুলো বেশ বড়ো হ'য়ে গেছে। একটা কাঁচি নিয়ে এসে আমি নখ ছাঁটতে বসলাম।

নরম অন্ধকারে ঢাকা প'ড়ে যাচ্ছে আকাশ। শুধু আমার নানীর নমাজ পড়ার গুনগুন ছাড়া আর-কোনো শব্দ নেই কোথাও। নানী ব'সে আছেন তাঁর ঘোড়ার চামড়ার আসনে। আর ঢং ঢং ক'রে তারপর বাজলো ছটা।

পাশের ঘর থেকে আমার ছোটো বোন এসে হাজির হ'লো।

'আজ আমরা আখরোট দেয়া কুনাফা খাবো,' সে ঘোষণা করলো।

'কুনাফা আমার ভাল্লাগে না।'

আমার বোন হেসে উঠলো। 'আজ সকালেই তো তুই বলেছিলি তুই কুনাফা খেতে চাস।'

'কুনাফা আমার মোটেও ভালো লাগে না।'

আবার জানলার দিকে ফিরে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে গেলাম : মাছিটা এখনো ঘুমিয়ে আছে।

নানী আমার ছোটো বোনকে আদর ক'রে বললেন : 'রেডিও চালিয়ে দে তো, তাহ'লে ফিরুজকে শুনতে পাবো।'

আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, 'আমরা দুপুরবেলায় ওকে শুনেছি।' বাইরের অন্ধকার সোয়ালোগুলোকে আর দেখতে দিচ্ছে না। তাহ'লে কী হয়, আমার, তবু, ফিরুজের গলা ভালো লাগে।

'আমরা আবার ওকে শুনবো,' বললেন নানী।

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। আমি তখন ঘুমন্ত মাছিটার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবছি।

হঠাৎ এক পিলে-চমকানো ভাবনা খেলে গেলো মাথায় : আমি যখন গভীর ঘুমে তলিয়ে আছি, তখন যদি ওদের কেউ আমাকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাখে, তখন কী হবে?

শুনতে পেলাম, আমার বোন নানীর কাছে আব্দার ধরেছে আজ সন্ধ্যেয় 'গায়ক বুলবুলে'র গল্প শুনবে ব'লে, আর নানী বলছেন, 'সে-গল্পটা তো আমরা কালই শেষ করেছি, করিনি?'

বাচ্চা মেয়েটি ঠোঁট ফুলিয়ে বললে, 'কাল! কাল তো ক-খ-ন শেষ হ'য়ে গেছে!'

'গায়ক বুলবুলের গল্প আর তুমি কোনোদিনও শুনতে পাবে না,' আমি আপন

মনেই ফিসফিস ক'রে বললাম, আর কেমন একটা কষ্টের ভাবে আমার ভেতরটা ভ'রে গেলো।

'আজ তোদের একটা নতুন গল্প বলবো,' নানী বললেন।

'উঁহু, আমরা নতুন গল্প চাইনে,' আমার বোন ব'লে উঠলো।

আমি বোনটিকে মাফ ক'রে দিতে চাইলাম; নানীর কোল থেকে লাফিয়ে নেমে ও ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো; কিন্তু তবু কেমন বিরক্তও লাগলো, আমিও তো সেই পুরোনো গল্পটাই শুনতে চাইছিলাম।

কিছুক্ষণ পরে নানীর কথাই শুনলাম আমি, রেডিওটা চালিয়ে দিলাম, তারপর কোনো-একটা স্টেশন ধরবো ব'লে কাঁটা ঘোরাতে লাগলাম। ঘড়িতে যখন ঢং ঢং ক'রে সাতটা বাজলো, একটা স্টেশন ধরতে পারলাম আমি।

আমি গলার স্বরের ওপর স্তব্ধতার পর্দা চাপিয়ে দিলাম।

'খবরটা শুনতেই দে না,' নানী আপত্তি ক'রে বললেন।

সকালের খবরের কাগজের পাতা ওলটাতে-ওলটাতে আমি বললাম: 'যত বাসি পচা খবর!'

'নতুন-কিছুও তো ঘটতে পারে, বাছা,' বুড়ির গলায় হঠাৎ যেন বয়েসের ছাপ ফুটে উঠলো।

আমি কাগজ থেকে শিরোনামগুলো প'ড়ে শোনালাম: দুপুরবেলাতেও প'ড়ে শুনিয়েছি। এ-সব খবর আর আমাকে ছোঁয় না।

হঠাৎ আমি ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইলাম, কিন্তু কোথায় যাবো? আমার তো যাবার কোনো জায়গা নেই, কাজেই মত পালটে ঠিক করলাম, এখানেই বরং ব'সে থাকি।

বাচ্চা মেয়েটি তার পুতুল নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

'সুজানকে তুমি একটা গল্প শোনাবে?' ও জিগেশ করলো নানীর দিকে তাকিয়ে, তার চোখে কেমন একটা জেদের ভাব।

বুড়ি নানী হেসে উঠলেন।

আমি ফিরে গেলাম জানলায়: সারা আকাশ জুড়ে ঘন হ'য়ে চেপে বসেছে অন্ধকার।

হঠাৎ মনে হ'লো ঘুমন্ত মাছিটাকে চটিয়ে দিলে কেমন হয়। মাছিটার বিরুদ্ধে আর আমার রাগ হচ্ছে না, আমি তার ঔদ্ধত্য বেমালুম ভুলে গিয়েছি।

'বাঃ রে, সুজানকে তুমি কোনো নতুন গল্প শোনাবে না ?' আমার বোন জিগেশ করলো।

সত্যি-বলতে, কোনো গল্পই আমি জানি না। তখন হঠাৎ মনে পড়লো দুপুরবেলায় যেটা রেডিওতে শুনেছিলাম।

'ঠিক আছে,' আমি বললাম, 'তোকে আমি "ভালুক আর মৌচাক"-এর গল্পটা বলবো।'

'বাঃ রে। সে তো কবেকার কোন্ পুরোনো গল্প,' আমার বোন চেঁচিয়ে উঠলো।

কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমি আবার মাছিটাকেই নিরীক্ষণ করতে লাগলাম।

'কী ওটা ?' আমাকে জানলার পাশে বসতে দেখে বাচ্চা মেয়েটি এগিয়ে এলো।

'একটা মাছি—ঘুমোচ্ছে।'

'মাছি—ঘুমোচ্ছে ?' ভুরু কুঁচকে বোন বললো।

'এটা বুঝি তোর নতুন গল্প ?'

'ও ঘুমোচ্ছে, ক্লান্ত কিনা।'

'গল্পটা তুই সুজানকে বলবি ?' ও জিগেশ করলো।

'ঠিক আছে। এই গল্পটাই না-হয় বলবো।'

আমার বোন কাছে ঘন হ'য়ে এলো।

'ও-কিসের দিকে তুমি তাকিয়ে আছো ?' ও জানতে চাইলো।

'আমি মাছিটার দিকে তাকিয়ে আছি।'

একটা চেয়ারের ওপর উঠে ও মাছিটাকে ভালো করে দেখলো। তারপর গম্ভীর সুরে রিনরিনে গলায় ঘোষণা করলো :

'কিন্তু ওটা তো ম'রে গেছে।'

মেয়েটি এখন ঠিক আমার সমান লম্বা হ'য়ে গেছে—দেখে আমার কেমন অস্বস্তি হ'লো।

'না, ঘুমিয়ে আছে।'

'না, মরা !' আমার নির্বুদ্ধিতায় অবাক হ'য়ে আমার বোন বললো।

আমি খুব সাবধানে জানলার পাল্লা খুললাম, তারপর আস্তে ক'রে পাখিটার গায়ে ফুঁ দিলাম : এক নিমেষে কাগজের মতো সেটা প'ড়ে গেলো।

আমার মনে প'ড়ে গেলো কিছুক্ষণ আগেই ও আমার চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছিলো, আরো মনে প'ড়ে গেলো, গোড়ায় ওর ওপর আমার বেজায় রাগ হয়েছিলো, পরে কেন যেন তাকে আমার মনে ধ'রে যায়।

'তুমি কি সুজানকে "ঘুমন্ত মাছি"র গল্পটা শোনাবে না?'

আমি ওকে কোনো উত্তর দিলাম না। আমি তখন শুনছি দেয়ালঘড়ির ঢং ঢং, আর সারা বাড়ি জুড়ে তারই ঝমঝমে প্রতিধ্বনি।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ফারুক ধন্ধী

সাপের লেজে নুন

বাড়ি থেকে ইস্কুলে যাবার একটা ছোট রাস্তাও আছে, আবার একটা ঘোরা রাস্তাও আছে। জলিল লম্বা রাস্তাটাই ধরল, কারণ ও যতক্ষণে ইস্কুল থেকে বেরোল, ততক্ষণে ওদের বাড়ির অন্য যে ছেলেরা ইস্কুলে পড়ে তারা সবাই চলে গেছে। মিস্টার মরিসন ওকে ইস্কুলের পরে ওঁর অফিসঘরে খানিকক্ষণ আটকে রেখে কয়েকটা বই দেখাচ্ছিলেন।

"তোমার ইংরিজিটা নিয়ে কিছু তো করতে হয়," মিস্টার মরিসন বলেছিলেন, "চারটে বাজতে দশ মিনিটের সময়ে আমার ঘরে এস, আমরা দুজনে কিছু পড়ব।"

জলিল আপত্তি করতে চায়নি ; বাড়ি ফেরার জন্যে ওর এত তাড়া কেন তাও সে মরিসনকে বলতে চায়নি। সাধারণত ও পাঁচ-ছজন ছেলের সঙ্গে ফেরে যাদের দেশ এশিয়ায়। এটা পরিকল্পিত নয়, কিন্তু প্রয়োজনীয়। সকলে একসঙ্গে বাড়ি ফিরলে পথে ইস্কুলের সামনে বড় শাদা ছেলেগুলোর জটলাটাকে ওরা নির্ভয়ে পেরিয়ে যেতে পারে। ওরা ছোট রাস্তাটা ধরে ফেরে, ওদের রাস্তার শেষে শাদাদের পাড়ায় যদি দুশ্‌মনি মুখগুলোকে পেরোতে হয় তবে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চললেই হল, ভিড়ের মধ্যে থাকার উষ্ণ আশ্বাসটা তাতে পাওয়া যায়। একা যদি ওদিক দিয়ে যেতে হয়, তাহলে হোয়াইট্‌ চ্যাপেল রোড ধরে ঘোরাপথে ফ্ল্যাটগুলোর সামনে আসতে হয়।

মিস্টার মরিসন্‌ বলেছিলেন, "আমি পাব্লিক লাইব্রেরি থেকে বিশেষ করে তোমার জন্যেই একটা জিনিস এনেছি, জলিল," বলে যুদ্ধবিদ্যার ওপরে একটা বই জলিলকে দেন। মিস্টার মরিসনকে কদিন আগেও বলেছিল এই ব্যাপারটায় সে উৎসাহী। মিস্টার মরিসন বলেছিলেন, "ছবিগুলোর দিকে অমন একদৃষ্টে চেয়ে, থেকো না, খানিকটা পড়তে চেষ্টা করো।"

ও যখন মোটা বইটাকে আঁকড়ে ধরে বাড়ি ফিরল তখন ওর বাবা মিঞাসাহেব বললেন. "যাও, মুখ ধুয়ে নমাজ পড়ো।"

জলিল আপত্তি তুলে বলল, "মস্‌জিদে তো আর এক্ষুনি যাচ্ছি না।" বলে

ভেতরের যে-ঘরে ও আর ওর বোন শোয় সেদিকে এগিয়ে গেল। ওর বাবা এর মধ্যেই শাদা মসলিনের টুপি পরে তৈরি। লক্ষণ ভালো নয়, জলিল ভাবল। এর মানে হল বাবা এখন উপদেশ দেবার মেজাজে আছেন, ওকে নিয়ে পড়বেন খানিকক্ষণ। কড়া সুরে বললেন, "নমাজ শুরু করো। ধার্মিক লোকে জুম্মাবারে যতবার পারবে ততবার নমাজ পড়বে। আল্লাহ্ ছাড়া আমাদের আর কেউ সহায় নেই। কার সঙ্গে বাড়ি ফিরেছ?" জলিল উত্তর দিল না, বিছানায় বসে মিস্টার মরিসনের দেওয়া বইটা খুলল। সাধারণত ও যখন বাড়ি ফেরে, তখন ওর বাবা সামনের ঘরে সেলাইকলে বসে মাইল-মাইল সেলাই করে চলেন অর্ডার দাখিল করবার জন্যে।

জলিল মিস্টার মরিসনকে গোপন কথাটা বলেছিল। কুংফু ও ব্রুস্ লীকে ওর কেন ভালো লাগে তাও বলেছিল। মিস্টার মরিসন বলেছিলেন, "যা ইচ্ছে পড়ো, নেহাৎ যদি চাও তো কমিকও না-হয় পড়ো।" জলিল ভাবল, উনি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেননি, সে-ও তো আর-একধরনের পড়া তৈরি করা। ওর বন্ধু এরোল কুংফুর বিষয়ে জানে, শনিবারে ওর বাড়ি যাবার সময়ে ও বইটা নিয়ে যাবে।

জলিল পাতা ওলটাতে লাগল। ব্রুস্ লী-র পেশীগুলো যেন ফুলে উঠে ফোটো থেকে বেরিয়ে পড়ছে ; আঙুল-মেলা হাতদুটো যেন বাতাস আঁচড়িয়ে কী এক শক্তি টেনে নিচ্ছে। গায়ের লাল চিহ্নগুলো রক্তঝরা ক্ষতচিহ্নই হবে। কিন্তু দেখে মনে হয় যেন নিপুণ নক্শায় খোদাই করা। আর মুখটা, জলিল ভাবল, মুখটায় সাধারণ মানুষেরই প্রবল প্রতাপ। উলটোদিকের পাতার লেখাটা জলিল পড়তে চেষ্টা করল। কথা প্রত্যেকটাই সে বুঝতে পারে, কিন্তু সব মিলে কোনো মানেতে পৌঁছতে পারল না। ছবিগুলো বলে দিতে পারে না কেমন করে সত্যি ওটা প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু একটা কাহিনী ওরা ঠিকই প্রকাশ করে। ব্রুস লী সাধারণ একজন মানুষ, হয়তো প্রথম শুরু করার সময়ে গরিবই ছিলেন। রাস্তার ছোকরাদের মতোই জামাকাপড় পরা, বয়স্ক লোকের থেকে দু-সাইজ ছোট। একটা ছবিতে তিনি শূন্যে যেন একটা হিংস্র জন্তু, পুমার মতো নিচে পড়ছেন, চারজন সন্ত্রস্ত দর্শকের ওপরে।

জলিল বিছানা ছেড়ে উঠে তাকের কাছে গিয়ে আয়না দেখল। ওর মা ঘরে ঢুকে পেতলের পানবাটাটা নিলেন, তার মধ্যে ন্যাকড়ায় ওঁর পানসুপুরি জড়ানো থাকে। "যাও, মুখ ধুয়ে এসো, আব্বা আবার ভীষণ রেগে যাবেন।"

জলিল চোখ ছুঁচলো করে শার্টের তিনটে বোতাম খুলে আয়নার দিকে তাকাল। নিজের চোয়ালের হাড়গুলো ছুঁয়ে দেখল; হ্যাঁ, অনেকটা ব্রুস্ লীর মতনই বটে।

হঠাৎ ওর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "এইসব মূর্তিপুজোর বই তুমি বাড়িতে আনো?" জলিল হাত নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল; ওর বাবা বিছানা থেকে বইটা তুলে নিয়েছেন, প্রবল আপত্তির ভঙ্গিতে পাতা ওলটাচ্ছেন। মিঞাসাহেব গলায় একটা শুকনো ঘড়ঘড়ে আওয়াজ তুললেন যেন ঘেন্না দেখাবার জন্যে থুতু জমাচ্ছেন।

"ওটা ইস্কুলের," জলিল বলল।

"এই সব আধ-ন্যাংটো অভিনেতাদের ছবি দিয়ে কে অল্প বয়সের ছেলেদের মাথা খাচ্ছে? ছোটদের এইরকম লা-পরওয়া করে তুলছে কে?" "আমাকে দাও আমি সরিয়ে রাখছি," বলে জলিল বাবার হাত থেকে নিতে গেল।

"তোমার তো কোরান পড়া উচিত, তবে আল্লাহ্‌কে আমি ধন্যবাদ দেব, যদিও তিনি আমাকে একটা নাস্তিক ছেলে দিয়েছেন। এসব চীনম্যানের কারসাজি পড়ার আগে যে-সব বই পড়লে কাজ দেয় সেগুলোই পড়লে ভালো হয়, বাবা। বাপ কথা বললে আজকাল তার জবাবও দাও না। নয়?"

"প্রশ্নটা কী?" জলিল জিজ্ঞেস করল যেন বাবাকে অন্যমনস্ক রেখে বইটা নিয়ে কোথাও লুকিয়ে রাখতে পারে।

"কার সঙ্গে ইস্কুল থেকে ফিরেছ?"

"এরোল।"

"এরোল? হ্যাঁ? ঐ কালোগুলোর সঙ্গে ঘোরাফেরা ছাড়বার সময় হয়েছে। নিচের তলায় কাজিসাহেবের কাছে আরবি পড়তে শেখা উচিত।"

"কাজির ক্লাসে তো যত ছোট ছেলেরা যায়," জলিল বলল।

"নম্র হয়ে আল্লার কথা শোনা ও শেখার পক্ষে কেউ কখনোই বড় হয়ে যায় না।"

"যাই হোক, আমি তো আরবী জানি, উর্দু জানি⋯আলেফ্, বে পে থে জাল, জিন, সব।"

"উর্দু যেটুকু তুমি জানো তা ঐ সব ছাইপাঁশ সিনেমা থেকে। তোমার কোনো ইজ্জতের জ্ঞান নেই। ঐ সব নোংরা অভিনেতা আর চীনেম্যানের ছবিওয়ালা যাচ্ছেতাই বই বাড়িতে নিয়ে আসো।"

জলিল বলল, "উনি অভিনেতা নন, উনি বাঘ।"

"একটা বাজে কুস্তিগির। বাঘ আর যাই হোক, বোকা জন্তু। আল্লার দয়ার জগতে ঠাঁই নেই ওদের; কয়েকটা ডালপাতা দিয়ে তৈরি গর্তের ফাঁদে পড়ে যায়।"

বাবা যে কখন বাংলাদেশ নিয়ে গল্প ফেঁদে বসবেন তা জলিল ঠিক টের পায়। এই গল্পটা ও বিশবার শুনেছে, সেই যে; ও বাঘটা মনে করত সব-পায়ে হাঁটারাস্তাই ওর থাবা দিয়ে তৈরি, আর যখন দেখল একটা বাঁদর ওর কাটা রাস্তা দিয়ে জলের গর্তের দিকে যাচ্ছে তখন অবাক হয়ে গেল। জলিল ও গল্পটার শেষটা আর শুনতে চায় না। ও ঘুরে রান্নাঘরে গিয়ে বৌদিকে জিজ্ঞেস করল দাদা কখন বাড়ি আসবে।

"ও মিটিং-এ গেছে।"

"ওরা সবসময়ে এই বাজে মিটিং করছে। এই হতভাগা দেশে ওরা আল্লাহ্‌কে ভুলেছে, মনে করে শাদা লোকগুলোর সঙ্গে লড়তে পারবে। কত শাদা লোক আছে, জানো তা?" বাবা রান্নাঘরে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন। বাড়ির মেয়েরা কোনো উত্তর দিল না।

"আমি মিটিংএ যেতে চেয়েছিলাম।"

"ওরা শুধু কথাই বলবে। বাঙালিরা লম্বাই চওড়াই কথা বলতেই ভালোবাসে," বাবা বললেন।

গত সপ্তাহে একটা ব্যাপার হয়েছে। কাজ থেকে ফেরার পথে এক বাঙালির কানে ছোরা মেরেছে; যে শাদারা মেরেছিল তারা দৌড়ে পালিয়েছে। জলিলরা যেবাড়িতে থাকে সেখানকার কয়েকটা ফ্ল্যাটের লোকেরা সমস্ত পরিবারের লোকদের নিয়ে একটা মিটিং ডাকে। জলিলের দাদা খলিল গিয়ে খবর নিয়ে আসে যে তারাবাড়িটার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে। ছোরা মারার রাত্রে বাঙালি তরুণের দল ব্রিক্ লেনের রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়েছিল যে সব শাদারা মারধোর বা অপমান করবে তাদের দেখিয়ে দেবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে। পরদিন একটা একতলার জানলা দিয়ে কে যেন একটা ইঁট ছুড়েছিল। তাই আর-একটা মিটিং ডাকা হয়; এবারে পুরো বাড়িটার সকলকে নিয়েই।

ফিরে খলিল বলল, "ওরা যদি লড়াই চায়তো লড়াই হবে।"

"ভগবানের শুভেচ্ছা জেহাদের সঙ্গে না থাকলে কি আর করবে?"

"ভগবানকে ছাড় তো" খলিল বলল, "আমরা ছাদের ওপরে ইঁট-পাথর

জড়ো করছি। যদি গুণ্ডারা আক্রমণ করতে আসে তো আমরা সকলে ওপরে উঠে লড়তে পারব।"

"সাপ যদি তোমাকে একবার কামড়ায় তো পেছন ঘুরে তো তাকে তাড়া করো না যাতে সে তোমাকে আবার কামড়াতে পারে। ছেড়ে দাও —"। মিঞা সাহেব ছেলেকে বললেন।

"কিন্তু সেটা যদি ঘুরে আবার কামড়ায় তখন কী করো ?"

"তার লেজে নুন দিয়ে দিই।"

উনি সবসময়েই ঐ ধরনের কথাই বলেন, যেন সেগুলো সব দৈব সত্য। কখনও কখনও জলিল ওঁর সঙ্গে তর্ক করতে যায়। বাবার প্রবাদে বাক্যগুলোর মাথামুণ্ডু সে বুঝতে পারে না। বাবা বলেন, চালের প্রত্যেক দানার উপরে যে খাবে তার নাম থাকে। কিংবা বলেন সাপের লেজে নুন দিয়ে দাও, আর সে তোমাকে জ্বালাবে না। আবার একদিন জলিল যখন আলুভাজার ওপরে নুন ছিটোতে গিয়ে রান্নাঘরের মেঝেতে নুন ছড়াচ্ছে তখন বাবা চেঁচিয়ে বললেন যে আল্লার সামনে হাজির হলে জীবনে যত কণা নুন নষ্ট করেছে তার সব কটিই চোখের পাতায় করে তুলে দিলে পর তবে বেহেশতের দরজা খুলবে। সব গাঁজা।

কিন্তু মিঞা সাহেব খুব স্পষ্ট কেজো সুরে কথাগুলো বলেন। এ-সব জীবনের সত্য, যেমন সত্য শুক্রবারে মসজিদে যাওয়া বা বাবা বললে সেলাইকলে বসা।

যখন একটা অর্ডার খুব তাড়াতাড়ি তৈরি করে দিতে হবে শুধু তখনই জলিলকে কলে বসতে হয়। তখন সে ইস্কুল কামাই করে বাবা আর বৌদির সঙ্গে বসে, ওঁরা সারাদিন সামনের ঘরের কলের সামনে থাকেন। অর্ডার জরুরি হলে সেলাইকলের আওয়াজ চলে রাত পর্যন্ত। কলে সেলাই করতে জলিলের ভালো লাগে না, কিন্তু বাবাকে সে সে-কথা বলে না। মিঞাসাহেব বলেন টাকা দু-রকমের হয়, ঘামের আর জলের ; জলের টাকায় একটা পরিবারকে খাইয়ে-পরিয়ে রাখা যায় না। খেতে হলে ঘাম ফেলতে হয়। জলিল কলে সুতো পরায়, নাইলনের গাঁটগুলো গুটিয়ে রাখে, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় সেলাই-করা কাপড়গুলোকে কাটা টুকরো-গুলো থেকে আলাদা করে রাখে, দরকার হলেই চা আনে, জমা দুধ আর সিগারেট কিনতে দোকানে ছোটে।

"সোমবারে ইস্কুল কামাই করে তোমাকে এই আস্তরগুলো করে দিতে হবে," বাবা বলেন।

"শনি-রবিবারে কেন এগুলো শেষ করে রাখি না ?"

"শনিবারে আমরা কাজ করি না" মিঞাসাহেব বলেন "আর রবিবারে জল-মার্কেটে গিয়ে ক-টা চেয়ার কিনতে হবে। তোমার মায়ের জন্যে ক-টা চেয়ার কিনে দিতেই হবে।" "সোমবার আমার ইস্কুলে যেতেই হবে।"

"কিসের জন্যে ?" । লেখাপড়ায় এত মনে তোমার কবে থেকে হয়েছে ?"

"তৃতীয় শ্রেণীর সব ছেলেকে একটা কুং ফু ফিল্ম দেখাচ্ছে" জলিল বলল, "এটা হল কুং ফু-স্টারশক্তির আসল কথাটা নিয়ে। মিঃ মরিসন একটা ছবি নিয়ে আসছেন, তাতে সব বোঝা যাবে।

"সবকিছু কখনোই বোঝা যাবে না," বাবা বলেন "এই সব বাজে কাজে যদি তুমি দিন কাটাও তবে তোমাকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবো। সেখানে ভিখিরি কুস্তিগির হয়ে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বোকাদের লড়াই করতে ডাকবে।"

"কাল আমি কাজ করব,একদিন আমি একশোটা আস্তর তৈরি করতে পারি।"

করে দেবে, ও মনে করল। পুরোনো বাড়িতে থাকতে তখনো একাজে একটা আনন্দ ছিল, আঙুলের ফাঁকে ছুঁচের আনাগোনা। দর্জির কাজে আঙুলগুলো খুব চটপটে হয়, কিন্তু বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আঙুলগুলো যেন যন্তর হয়ে যায়। কুং ফু ওগুলো অস্ত্র করে গড়ে নেন।

এ-সব কথা বাবা বুঝবেন না। 'কালো ড্রাগন ব্রুস্ লী'র বদলা নিল' বলে একটা ছবি দেখেছিল। নায়ক অনেকগুলো বদমায়েসের চোখ উপড়ে নিয়েছিল আর তেমনই নিষ্ঠুরভাবে অন্য অনেকের মুখ ভেঙে দিয়েছিল। শত্রুর মুখের সামনে হাতটা ঘোরাতে হয়, একটা কায়দা আছে। হাত দুটোকে শেখাতে হবে প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে গুণ্ডাদের খতম করতে। একবার ওস্তাদ হয়ে গেলে পর, জলিল ভেবে রেখেছে, ও ওর ছবি তুলতে দেবে। ও ঠিক ঐরকমের বীর হতে চায়। খুব ভালো শিখলে ও মার্শাল আর্টস ও ফিল্ম ফেয়ার পত্রিকায় নিজের ছবি দেবে, এগুলো বৌদি পড়েন। ও হবে বাংলাদেশের প্রথম যুদ্ধবিদ্যাবীর, ওর ছবি রাজেশ খান্নার ছবির চেয়ে ভালো কাটবে, যে রাজেশ খান্নাকে বৌদি পুজো করেন। তখন ও মস্ত শাদা একটা মার্কিন গাড়ি কিনবে। কিন্তু বিখ্যাত হলে পর ফিল্মস্টারদের মতো বোম্বাইয়ের মালাবার হিলসে থাকবে না। ওর শক্তি ও অন্য কাজে খাটাবে, অনেক অন্যায়ের প্রতিকার করবে। লড়াই-করা মানুষদের মস্ত নেতা হবে।

বাবা একবার গল্প করেছিলেন কেমন করে একজন বিচক্ষণ লোক সিলেটের

হুরে গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন। উনি বলেন বুড়ো দস্যুদের আত্মা সদ্যোজাত ছেলের দেহে আশ্রয় নেয় আর সাধুদের পরিবারে স্নেহ নিয়ে ফিরে আসে। জ্ঞান একমানুষ থেকে অন্যমানুষে সঞ্চারিত হয়, বাবা বলেন।' শক্তি ভগবানের দান, তাকে শেষ করা যায় না, এ যেন একটা শিক্ষা যা শুধু পোড়া জ্বালানিই ফেলে রাখে না, তাপও রেখে যায়। জলিল ভাবতে লাগল ব্রুস লী-র আত্মা কোনো উদীয়মান তরুণের দেহে আশ্রয় নেবে কিনা। বাবার এই একটা গল্প ও বিশ্বাস করতে চায়।

গত ক-মাসে মিঞাসাহেব এমন অনেক গল্প বলেছেন। জলিল লক্ষ করেছে যত শাদাদের উপদ্রব বাড়ছে ওর বাবা ততই দার্শনিক হয়ে যাচ্ছেন। নমাজের টুপি মাথায় দিয়ে বাড়ির সকলের উদ্দেশে উনি বিড়বিড় করে বকেন। খলিল আর ওঁর কথায় কোনো কান দেয় না।

খলিল বলে গণ্ডগোল আরও বাড়বে। গরম পড়লে শাদারা খেপে উঠবে, হয়তো বা বন্দুক নিয়ে হানা দেবে। খলিলের সঙ্গীরা বলে ওরা তৈরি থাকতে চায়। কিন্তু জলিল জানে কেমন করে তৈরি থাকতে হবে তা ওরা জানে না। প্রথম কাজই হল বাড়িটাকে রক্ষা করা। এখানে পঞ্চাশটি বাঙালি পরিবার বাস করে, সবাই বাস্তুহারা। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে ওরা বাড়িটাকে দখল করে ঢুকেছে। ক-টি তরুণ বাঙালি প্রথম পবিরার-গুলিকে এনে তুলেছিল। ব্রিক লেন ও তার আশেপাশে খবরটা ছড়িয়ে যায়। অন্যদের মতো জলিলের পরিবারও ওদের আত্মীয়ের বাড়ির পেছনের কামরাটা ছেড়ে নতুন জায়গায় তোশক বাসনপত্র নিয়ে এসে উঠেছিল। নতুন একেবারেই নয়, বলাই বাহুল্য, পুরোনো একটা বাড়ি যা আর কেউই চায়নি। প্রথমদিনটায় প্রচুর আনাগোনা হচ্ছিল, ভ্যানে করে পুলিস আর শাদারা এসে যে তরুণরা সব ব্যাপারটা তদারক করছিল তাদের দু-একজনের সঙ্গে কথা বলে। ওরা ততদিনে পাকাপাকি বাস করতে শুরু করেছে, কিন্তু একমাস পরে গোলমাল শুরু হল। কয়েকজন বাঙালি খুব চড়া মেজাজের। ওরা লড়াই, পরিবার ও আত্মীয়দের রক্ষা করা সম্বন্ধে খুব তেজি বক্তৃতা দেয়। জলিলের বাবা কোনো বক্তৃতা করেননি। অন্তত প্রকাশ্যে নয়। উনি বাড়িতে খলিলের সঙ্গে তর্ক করেন।

খলিল বলত, "এ তো জেহাদ, ধর্মযুদ্ধ। এদেশে থাকতে হলে লড়াই করতেই হবে।"

খলিল কিন্তু চিত্রতারকাদের মতো চুল আঁচড়াত, তার জামাকাপড় পরে বন্ধুদের সঙ্গে হোয়াইট চ্যাপেল ও ব্রিক লেনে বেরোত, ওয়েস্ট এণ্ডে যেত। খলিলও বুঝত না ওদের কী করতে হবে। ব্রিক লেনে ঘোরাফেরা করে কেউ কি শক্তিশালী হয় না, শরীর ওতে গড়ে ওঠে না, ওতে অপদার্থ শাদা-গুলোর আঁতে ভয় ঢোকে না। জলিলের দৃঢ় সংকল্প ও আত্মসংযত ও একচিত্ত হবে, কারণ মিস্টার মরিসন, বলেছেন যে-কোনো ব্যাপারে সুদক্ষ হওয়া কঠিন কাজ। সব শক্তির মূলে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও একচিত্ততা। কিন্তু কেমন করে সেটা হওয়া যাবে? দেয়ালে ও একশোবার চাটি মেরেছে, একশো গুণতে-গুণতে কারণ গুণলে ওর মন ব্যথা থেকে সরে যায়।

যখন বাড়ির ভেতরে বা বাইরের উঠোনটায় এ-বাড়ির ছোটো ছেলেদের সঙ্গে থাকবে তখন ও লাথিমারা অভ্যাস করবে। প্রত্যেকবার হাঁটুটা বেশি-বেশি তুলতে চেষ্টা করবে, পা-টা নিচে থেকে বের করে বিদ্যুদ্বেগে লাথিটা কষাবে। এখনও ও ভারটা রাখার সাধনা করছে। একদিন সফল হবে। কুং ফু ক্লাসে যাবে, ও একদিন কালো বেল্ট জিতে নেবে।

জলিল জানে এরোলও তালিম দিচ্ছে। আর এরোল নম্র হতে শিখেছে। ইস্কুলের খেলার মাঠে ও কখনোই বাহাদুরি দেখাবে না। ঘুসি বা লাথি ও চাবে না। কিন্তু জলিল জানে যে এরোল একাগ্র সাধনায় মুঠিটাকে শক্ত করে তুলেছে, চাইলে এক ঘুসিতে ও কাঠের তক্তা ফাটাতে পারে। ও জলিলকে দেখিয়েছে কেমন করে বাড়ানো হাতের মুঠি মুচড়ে দিতে হয়। এটা ওর একটা গোপন কথা। এ একটা শক্ত সুনিয়ন্ত্রিত ও অনায়াস সুন্দর ভঙ্গি, ঠিকমতো করতে গেলে ভালো করে শিখতে হয়। খুব ত্বরিত গতিতে করতে হয়। ঐ গতি হল আর-একটা গোপন কথা। নীরবতা আর-একটা। অতর্কিত শক্তি অনেক বেশি ভয়াবহ। পুরোহিতের মতো দেখতে হবে আর বাঘের মতো আচরণ। তবেই নির্ভর করা যায়। এরোলে বা আর কারও সামনে যে জলিল তালিম দেয় না তার আর-একটা কারণ হল ওরা তাকে দেখে হাসতে পারে। ওরা হাসলে মনটা সেঁধিয়ে যায়; তখন মুঠিটা যতই কর্কশ আর কঠিন হোক না কেন ওদের চাহনি আর হাসির কাছেই হেরে যেতে হয়। নিজের ভরসাতেই ওদের চাহনি আর হাসিকে হারিয়ে দিতে হবে।

"টুপিটা পরো, নমাজে যাচ্ছি," মিঞাসাহেব বললেন। জলিল কোট পরে

টুপিটা পকেটে নিল ; রাস্তায় সে ওটা পরে যাচ্ছেনা। বাবা আলগা পায়ে সামনে-সামনে হাঁটছেন। ওরা যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুরোনো তোরণটার সামনে এল তখনও দিনের আলো আছে। বাবা বাঁ দিকে এগোলেন। ওরা শাদাদের মহল্লার পাশের রাস্তাটা দিয়ে যাবে। ছোটো ছেলেরা তখনো উঠোনে খেলছে। ওরা জঞ্জালের স্তূপের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ফ্রেম-ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়ে নিচের তলার খালি ঘরগুলোতে আনাগোনা করছে। বাংলা আর চড়া ইংরাজি বুকনি-ভরা ওদের গলার স্বরের প্রতিধ্বনি উঠছে উঠোনটাতে। সেলাইকলের আওয়াজ, মশলাভাজার গন্ধ ভেসে আসছে খোলা দরজা দিয়ে।

"শুনছিস ?" জলিলের বাবা বললেন "ওরা রোজ কেয়ামতের দিনেও কল থামাবে না। ওদের নিজেদের মুসলমান বলা উচিত নয়। ক-টা পেনির আশ্বাসে আমাদের লোকগুলো কী হয়ে যায় দেখেছিস তো ?"

মুখে থুথু জমিয়ে ফুটপাতের ওপরে একদলা ফেললেন! সরু বাঁধানো গলিটায় ওরা হাঁটতে লাগল, তক্তাঘেরা গুদামগুলো পেরিয়ে মসজিদের দিকে। জলিল জানে রাস্তার মোড়ের শাদা মহল্লার ছোঁড়াগুলো এ এলাকাটাকে 'পাকিল্যাণ্ড্' বলে। ঐ নোংরা কংক্রিটের ফ্ল্যাটগুলো পেরিয়ে গেলে তবে ওরা নিরাপদ হবে। তখন নতুন কংক্রিটের জায়গায় দেখা দেবে আধপোড়া ফ্যাকটরি আর বাড়ির একটা জায়গা ; বাবা যাকে বাংলায় শুয়োরের চর্বি বলেন তার জায়গায় এশিয়াবাসীদের পাড়ার চমৎকার ধনে-রসুনের গন্ধ উঠে ঘিরে থাকবে মসজিদের এলাকাকে।

জলিল ওদের দেখতে পেল আর দেখল যে বাবাও ওদের দেখেছেন : ডজন খানেক শাদা ছেলেমেয়ে ওদের এলাকা ঘিরে যে কংক্রিটের রেলিং তাই ধরে বা তার ওপরে ঝুঁকে বসে আছে। জলিলের মনে হল ওদের অন্য রাস্তায় যাওয়া উচিত ছিল। বাবার পাশাপাশি হাঁটবার জন্যে ও পা চালিয়ে দু-পা এগিয়ে এল। ওর বাবা ছোটো ছোটো দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটছেন। উনি সোজা সামনের দিকে চেয়ে হাঁটছেন, ভিড়ের লোকগুলোর চোখগুলো যে ওঁদের আসার অপেক্ষায় আছে তা যেন ওঁর নজরেই আসেনি। জলিলের গলায় যেন একটা দলা আটকে গেল। এখনও ঘুরে অন্যপথে যাওয়া যায়, যদিও তাতে আরো আধ মাইল হাঁটতে হবে। কিন্তু ঠিক এইটেই ওদের করা উচিত নয়। বাবা এমন-ভাবে হেঁটে চলেছেন যেন ও কথাটা তাঁর মনেই ওঠেনি।

ওরা কাছে আসতেই ঐ দলটা নিজেদের মধ্যে কথা থামিয়ে দিলে। চাপা আক্রোশে চুপ করে দাঁড়াল। ওদের কাছ দিয়ে যাবার সময়ে জলিল ওদের পায়ের দিকে দেখল। মুখ তুলে ওদের মুখের দিকে দেখতে চাইল না পাছে তাতে ওরা চটে। আঁটো জামা কাপড়ে ও ছোটো করে ছাঁটা চুলে ঐ শাদাগুলোকে ঠাশা প্রকাণ্ড দেখাচ্ছিল।

"আল্লা পথ দেখাবেন", জলিলের বাবা চাপাস্বরে যেন নিজেকেই বললেন।

ওরা ও-দলটাকে পেরিয়ে যাচ্ছিল এমন সময়ে কে ওদের পেছন থেকে বলে উঠল, "ও-ই পাক্-এ ম্যাক।"

"হেঁটে চল," জলিলের বাবা ওকে বললেন যেন ওদের পা-চালানোটাকে উনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, যদিও ভয়ের চোটে ওদের পা খুবই হালকা চালে চলছিল। জলিল বুঝতে পারছিল, ওর বাবা ভয় পেয়েছেন। হয়তো এই বদমায়েসের দলও ওঁর ফাঁকিটা টের পেয়েছে।

"একটু সবুর করতে পারো না, না?" একটা ছোকরা বলল, "হুড়োহুড়ি করে গিয়ে একটু বাড়তি রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে, না?" এশিয়ার লোকের উচ্চারণের (স্বরাঘাতগুলি) নকল করছে ছেলেটা।

রেলিংএর ওপর থেকে একটা মেয়ে বলল, "ছেড়ে দাও আজ, কোনোদিন এই লোকগুলো তোমাদের ওপর একহাত নেবে।"

"হাসিও না," ছেলেটা বলল, "এ-লোকগুলোর একহাত নেওয়া হল শুধু বিপদে পড়লে খাটের তলায় ঢোকা। শিগ্‌গিরই তাতেও স্থবিধে করতে পারবে না।"

মিঞাসাহেব প্রায় দৌড়ুতে শুরু করেছেন।

"একেবারে জঙ্গল পর্যন্ত দৌড়ুতে হবে তোমাদের।" দলটার একজন চেঁচিয়ে ওদের পেছন থেকে বলল।

জলিলের বাবা বললেন, "দেখলি তো কোরানে কেন আমাদের মদ খেতে বারণ করেছে?"

জলিল কোনো জবাব দিল না।

মসজিদে জলিল নমাজে মন দিতে চেষ্টা করল। তখনও বুক ঢিপঢিপ করছে। কেবলই ভাবতে লাগল ওরা কী করতে পারত। চারপাশে চেয়ে দেখল অন্য লোকেরা হাঁটু গেড়ে নমাজের স্থরের তালে-তালে শরীর নোয়াচ্ছে। জলিল একটা স্বস্তি বোধ করল। এতগুলো লোক, ও ভাবল, এতগুলো লোক।

ওরা আমাদের কোথাও তাড়িয়ে দিতে পারে না। খলিল বলে শাদাগুলো ওদের ভয় পাইয়ে তাড়িয়ে দিতে চায়, রাস্তা হাঁটতেও ওরা তখন এত ভয় পেয়ে যাবে যে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাংদেশে ফিরে যাবে।

বাবার দিকে চেয়ে দেখল। ওঁর আতঙ্ক কেটে গেছে। উনি প্রশান্তভাবে নমাজে ডুবে আছেন, চোখ খুলছেন, বুঁজছেন। ওর মনে হচ্ছিল জীবন শুধু এনে দেবে একটু শাসানি, একটু অস্বস্তি। জলিল ওর বাবাকে চেনে; ওঁর কাছে এটার কোনো গুরুত্ব নেই। হয়তো এই যারা হাঁটু গেড়ে আছে তাদের কারু কাছেই এর গুরুত্ব নেই। এই যে আতঙ্কের শাসানি তাদের জীবনের চারিদিকে উদ্যত হয়ে আছে এ যেন শীতের বরফ-পড়া ও তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যাওয়ার মতোই, যেন ইংল্যাণ্ডের আর-একটা চেহারা মাত্র। বাংলাদেশের গ্রামের আকাশে চিলের মতো, মৃত্যুবাহী মেঘের মধ্যে যে-পঙ্গপাল ঝড়ের মতো এসে শস্য ধ্বংস করে যায়, তেমনই এই 'নচ্ছার' শাদাগুলো (যেমন ওরা বলে), এ-দেশের ভূদৃশ্যের মতো এও মেনে নিতে হবে। কিন্তু জলিলের কাছে এটা অন্যরকম। ছ বছর ও শাদাদের সঙ্গে ইস্কুলে পড়ছে। ওরা যে-ভাষায় কথা বলে তার সব কটি খাঁজ ওর জানা। ওরা যে তামাশা করে তা ও বোঝে। ওদের যুক্তি-কুযুক্তি ও জানে। ওর বাবার কাছে শাদারা মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়। ওদের মন্তব্য যেন সূর্যাস্তে গাছের ডালে কাকের ডাকের মতোই, মানে কিছুই নেই।

মস্‌জিদ থেকে বেরিয়ে জলিল দেখল ওর বাবা দেরি করছেন যাতে বাড়ির অন্যদের সঙ্গ ধরতে পারেন।

"শেয়ালকে কখনও ভরাসনে," উনি জলিলকে বলেন, "ঐ শাদাগুলো যদি আমাকে আক্রমণ করতে বা অন্যকিছু করতে আসত তো আমি আচ্ছা করে ওদের ঠাণ্ডা করে দিতাম।"

"আমাদের অন্য রাস্তা ধরে যাওয়া উচিত," জলিল বলল।

"মোটেই না," বাবা বললেন, "হাঁটবার জন্যেই রাস্তা।" দৃঢ় প্রত্যয়ে উনি থুথু ফেললেন।

"ওরা যখন আমাদের অপমান করছিল তখন ওদের গায়ে থুথু ফেললেই পারতে", জলিল বলল।

"জিভ শুকিয়ে গিয়েছিল, বাবা।"

পরদিন বিকেলে জলিল এরোলের বাড়িতে ছিল। এরোলের ঘরের দেয়াল জুড়ে কুং ফুর ছবি। মিস্টার মরিসন যে-বইখানা দিয়েছিলেন সেটার কথা জলিল এরোলকে বলে।

"ও হল কুংফুর বিষয়, খুব ভারি একখানা বই, ভাই, শুধু কালো কোমরবন্ধ-ওয়ালাই ওসব বুঝতে পারে। এ তো ফুটবল নয়, যা যে-কেউ বুঝতে পারবে। কুং ফু হল ভারি বৈজ্ঞানিক ব্যাপার, যদি একচিত্ততা তোমার না-থাকে তাহলে কিস্‌সু করতে পারবে না।" এরোল বলে।

জলিল যখন বাড়ি ফিরল তখন ওর বাবা আর বৌদি সেলাইকলে বসে। এমনিতে বাবা জলিলকে আসন ছেড়ে দিয়ে উঠে একাই মসজিদে যান, জলিল ঘণ্টা দুই কাজ করে। আজ উনি নড়লেন না। বৌমার দিকে ফিরে বললেন জলিল এসেছে তিনি এখন কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে পারেন। আগের সন্ধ্যার ব্যাপারটা বাবা বাড়ির কাউকে বলেননি।

রবিবারে জলিল বাবার সঙ্গে ডগ্‌ মার্কেটে গেল। খুব ভিড়। দু-পাশে পুরোনো-রদ্দি জিনিশের দোকানের মাঝখানের গলি দিয়ে লোক হাঁটছে। ঐ-সব দোকানে সবজি থেকে পুরোনো গ্রামোফোন পর্যন্ত সবই বিক্রি হয়। বাবা বেশ কয়েকটা পুরোনো মালের দোকানে ঢুঁ মেরে ক-'টা চেয়ারের খোঁজ করলেন।

একটা দোকানের সামনে বসে-থাকা মস্ত ভুঁড়িওয়ালা লোকটাকে বললেন, "চেয়ার খুঁজছি, ভালো চেয়ার।"

"কীরকম চেয়ার?"

"বসবার জন্যে।"

"ভেতরে দেখুন, দাদা, আমার অনেক চেয়ার আছে।"

বাবা ভেতরে ঢুকলেন সেখানে, তোশক, পুরোনো টেবিল, ক্যাম্বিসের চাদর আর ভাঙা আশবাব ঠাশা। স্তূপের ওপর থেকে একটা ভালো চেয়ার তুললেন।

"ওগুলোতে, আপনার সুবিধে হবে না, দাদা, ওগুলো দামি পুরোনো জিনিশ?" লোকটি বলল।

"কত?"

"বলে কী লাভ? যখন আপনি কিনবেন না?"

"আমি নেবো," মিঞাসাহেব বলেন। জলিল বুঝতে পারল, দোকানদার যে ওঁকে অপমান করতে চাইছে তা ওর বাবা বুঝতে পারছেন।

"ঠিক আছে। ধরুন বারো পাউণ্ড করে, ঠিক আছে? খুশি তো?"

মিঞাসাহেব চেয়ারটা স্তূপের ওপরে রেখে দিলেন।

"এদিকে এসে এগুলো দেখুন, আপনাদের মতো জিনিশ। ভালো মজবুত চেয়ার, আপনার ছেলের নাতিরা স্পিটলফিল্ডে যখন ছুটে বেড়াবে তখনও টিকে থাকবে। দু-শিলিং করে।" লোকটা বলল, স্টীলের ফ্রেমে প্ল্যাস্টিক ঢাকা-দেওয়া চেয়ারগুলো এগিয়ে দিতে-দিতে বলল। চেয়ারগুলো ঝেড়ে-মুছে দিল। মিঞাসাহেব টাকা গুনে দিলেন।

"আপনাদের চিনি, দাদা, আপনারা কীরকম জিনিশ পছন্দ করেন, তাও জানি।" জলিল একটা চেয়ার নিল, ওর বাবা একটা নিলেন। ওরা ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এল।

"ন্যায্য দামে কেমন করে জিনিশ পাওয়া যায় তা জানতে হয়। এই বেনেগুলো বেজায় ধড়িবাজ।" যখন ওরা দোকানের গণ্ডগোল থেকে বেরোচ্ছিল তখন জলিলকে ওর বাবা বললেন। জলিল জানে ওদের অপমান করা হয়েছে, ঐ লোকটা ওদের বিদ্রূপ করেছে। ফুটপাথের দিকে চোখ রেখে ও হাঁটছিল। অপমান হজম করে দুনিয়ার দিকে চোখ তুলে চাওয়া যায় না। একদিন, ও মনে ভাবল, একদিন ও প্রস্তুত হবে। সারাক্ষণ এই ভয়ে-ভয়ে পথচলা ও মেনে নেবেনা।

ওরা যখন চিক্স্যাণ্ড স্ট্রীট দিয়ে হাঁটছে, বাড়ির খুব কাছে এসে পড়েছে; প্রতি পদে থামতে-থামতে ও চেয়ারগুলোর বেয়াড়া ভার একহাত থেকে অন্যহাতে নিতে-নিতে, তখন জলিল দেখতে পেল দুজন যুবককে, যারা শুক্রবারের গুণ্ডাদলে ছিল। তারা ফুটপাথের ওপরে দাঁড়িয়ে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে আছে, যেমন সে-রাত্রে ছিল।

"ঐ হতভাগাগুলো ওখানে আছে," ওর বাবা বললেন। "একজন দুজন করে যখন থাকে, তখন ওরা তেমন বেপরোয়া হয় না? আমাকে কিছু বললেই আমি চেয়ারটা ওদের মাথায় ভাঙব।" বেশ সাহসভরে এখন হাঁটছেন উনি।

"মরতে মানুষের যেমন ভয়, মারতেও তেমনি হওয়া উচিত।" বলে উনি মুখে থুথু জমিয়ে ফুটপাথে ফেললেন।

আমাদের ফ্ল্যাটের সামনে থুথু ফেলছ যে বড়ো?" সামনে আসতেই একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল।

"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও," মিঞাসাহেব ইংরাজিতে বললেন।

"ছেড়ে দেওয়া দেখাচ্ছি তোমায়," ওরা পেরিয়ে যাবার সময়ে সামনে এসে বলল ছোকরা।

"চলে চল, ও এগোলে চেয়ারটা সামনে বাড়িয়ে ধরবি।" মিঞাসাহেব বাংলায় জলিলকে বলেন। ছেলেটা সামনে এসে পড়ল। পেছন থেকে খপ্ করে মিঞাসাহেবর কোটের কলারটা টেনে ধরল। উনি চেয়ারটা নামিয়ে রেখে ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করলেন।

ছেলেটা লাল সোয়েটার পরে ছিল, এত এঁটে বসেছে সেটা যে ওর পেশী-গুলোকে ভয়ানক রকমের মোটা দেখাচ্ছিল। ওর মুখে একটা তাচ্ছিল্যের ঝিলিক খেলে গেল।

"ওহে, ঐ থুথুর দলাটা তোমাকে গিয়ে সাফ করতে হবে।"

"না, ধন্যবাদ।" জলিলের বাবা তাড়াতাড়ি বললেন; বাংলায় জলিলকে বললেন "নে, এগিয়ে চল, তাড়াতাড়ি চল তো।"

"ওঃ, ইঙ্গিরি আসে না তেমন, না? কী বলেছি বিলক্ষণ বুঝেছ, এখন এসে এটা সাফ্ করে যাও দেখি!"

অন্য ছেলেটা হেলতে-দুলতে এসে জলিলের বাবার সামনে খাড়া হল।

"কোথাও আর পালাতে পারছনা ওহে বাঁকাটুপি", ও বলল, "আমার দোস্ত যেমন বলেছে তেমনি থুথুটা সাফ্ করে ফ্যাল দিকিন?" যে চেয়ারটা মিঞা-সাহেব নামিরে রেখেছিলেন, সেটা তুলে সে ধপ করে ফুটপাথে রাখল; তারপরে ওটাতে বসে পড়ল।

জলিলের বাবা বললেন, "বুড়োমানুষকে কেন কষ্ট দিচ্ছো?" মিনতি করতে শুরু করলেন যেন। হঠাৎ জলিলের মনে হল সে আর সহ্য করতে পারছে না। বসে-থাকা ছেলেটার কাছে ছুটে এসে ও চেয়ারটাকে ওর নিচে থেকে টান মারতে-মারতে বলল, "ওঠো, এটা আমাদের চেয়ার।"

"ওহে খোকা পাকি, নিজের দাঁতগুলো গিলতে সাধ গেছে নাকি?" ছেলেটা বলল।

"ও নেহাৎ ছোটো ছেলে, একেবারে ছেলেমানুষ," ওর বাবা হাত তুলে যেন হার মানার ভঙ্গিতে বললেন। যেখানে থুথু ফেলেছিলেন সেখানে গিয়ে ফুটপাথের ওপরে জুতো ঘসতে লাগলেন।

"জিভ দিয়ে বলেছি, টেস্‌কো জুতো দিয়ে নয়," ছেলেটা বলল।

যে-চেয়ারটা জলিল নিয়ে যাচ্ছিল সেটা তুলে ও ছেলেটার দিকে দৌড়ে

গেল। ও তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে, হাত থেকে চেয়ারটা ছিনিয়ে নিয়ে, ক'-হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার পর লাফিয়ে জলিলের ওপরে পড়ে ওর দু-গালে হাতের পাঞ্জা দিয়ে চড় মারল; মারের ফাঁকে যখন জলিল ওর ওপরে এসে পড়ছিল তখন তাকে ঠেলে ফেলতে লাগল।

দাঁতে দাঁত ঘসে ছেলেটা বলল, "আমার সঙ্গে বেশি কায়দা করতে আসিসনে।" জলিল আবার ওর ওপরে পড়ল। ছেলেটা জলিলের শার্টের সামনেটা ধরে ঠেলে ধরে ওকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর জলিল যখন নিজের মুখটা চাপা দিতে চেষ্টা করছিল তখন ওর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে লাথি মারতে লাগল।

তখন ও পেছন থেকে বাবার গলা শুনতে পেল, "ঘাট হয়েছে, ঘাট হয়েছে," উনি বলছেন আর তারপরে উর্দুতে বললেন, "সর্বদর্শী আল্লার দোহাই।"

যে-ছেলেটা জলিলকে লাথি মারছিল সে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল।

'আ—হ্! বেজন্মা কোথাকার!' জলিল ওকে বলতে শুনল; ও ফুটপাথে ধপ করে পড়ল যেন কোনো জিনিশ সশব্দে ফেলেছে। জলিলের বাবা চেঁচিয়ে ওকে চেয়ার ফেলে রেখে দৌড়ে পালাতে বললেন। ও কোনোমতে দাঁড়িয়ে উঠে বাবার পেছনে ছুটতে লাগল। ক-সেকেণ্ড পরে অন্য ছেলেটাও ওদের পেছনে ছুটল, তারপর ফিরে সঙ্গীর কাছে গেল; সে ছেলেটা তখনও ফুটপাথে হাঁটু গেড়ে বসে চ্যাচাচ্ছে, যেন সে খুন হতে দেখেছে। জলিল ফিরল না। যতক্ষণ নিজেদের বাড়ির ভাঙা ফটকটার সামনে এল ততক্ষণ ও বা ওর বাবা থামল না।

ওরা যখন ঢুকল তখন খলিল বাড়িতে ছিল।

মা জিগেস করলেন, "চেয়ারের কী হল?" তারপর জলিলের মুখে লাল দাগ দেখে বললেন, "হা ভগবান; তোর কী হয়েছে?"

"চেয়ার পেলাম না, বাবা বললেন।" "আসবার সময়ে জলিল হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিল।"

"না, পড়িনি," জলিল সবাইকে চীৎকার করে বলল, "আমরা ছুটছিলাম..." বলতে যেতেই "বাবাকে মিথ্যাবাদী বোলো না" মিঞাসাহেব বললেন "ভেতরে গিয়ে মুখ ধোও।"

"কেন দৌড়ে আসছিলে?" খলিল জোর করে জিগেস করল, "কে তাড়া করেছিল? মেরেই ফেলব তাকে।"

"আমি মারামারি করার মানুষ নই," বাবা বললেন, "যেমনি আমার ছেলেরা

আমাকে কর্তব্য নিয়ে উপদেশ দিতে আসবে সেদিন থেকে আমি আর বাঁচতে চাই না।'

ই দুরের মতো যদি বেঁচে থাকো তো এখনই তোমার বাঁচা ফুরিয়ে গেছে।" খলিল বলে।

"মুখে-মুখে জবাব দিও না, বাপু, কারু আঘাত লাগেনি, আমরা ভালোই আছি। আল্লাহ্ নিরাপদে আমাদের বাড়ি ফিরিয়ে এনেছেন।"

আল্লার বিরুদ্ধে খলিল কথা বলতে চায় না। ও পেছন ঘুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। চড়ে এবং অপমানে জলিলের মুখ এখনও জ্বালা করছে। কী যে হয়েছিল তা ও মাকেও বলতে পারল না। ওর মনে হল চেয়ারের চেয়ে অনেক বেশিই ওদের ওরা খোয়া গেছে; রাস্তায় হাঁটবার অধিকার খোয়া গেছে। ওদের আত্মসম্মান গেছে। যে-পাদুটো দিয়ে ওর বিপদের মুখে লাথি মারবার কথা সে-দুটো পা একে-একে চালিয়ে ও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছে।

সেরাত্রে ও চিৎ হয়ে জেগে শুয়ে রইল, মনটা অসহায়তার রাগে জ্বলছে। বাড়ি অন্ধকার, আর সকলে ঘুমোচ্ছে। রান্নাঘরে একটা শব্দ শুনতে পেল। কল-খোলার আওয়াজ শুনল, কে যেন পা টিপেটিপে হাঁটছে, তারপর কাঠের মেঝেতে ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ। ও বিছনা থেকে উঠে সামনের ঘর পেরিয়ে আস্তে-আস্তে রান্নাঘরে গিয়ে উঁকি মারল। বাবা অন্ধকারে মেঝের ওপরে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। জলিল আসতে উনি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন।

"ঘুমোতে যাও," কড়া করে উনি বললেন।

বাবার কথা না-শুনে জলিল অন্ধকার দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। রান্নাঘরের মেঝের ঢাকাটা উলটে তোলা, বাবা একটা হাতুড়ি নিয়ে একটা তক্তায় ঘা মারছেন। উনি উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় ফিশফিশ করে বললেন, "দ্যাখ বেটা, চেয়ার যে কেনা হয়েছিল, বা ঐ লোকগুলো যে ইস্তোত পাকিয়েছিল সে-ব্যাপারটা বলিসনে কাউকে, তোর মাকেও না, খলিলকেও না।"

"বলবো না," জলিল বলল। ওরা দৌড়ে পালিয়েছে; ও কাউকেই বলতে চায় না যে ওর বাবা ভিতু; বলল, "ভয় নেই, আমি বলবনা।"

পরদিন সকালে মা একটা শাদামতো পুলটিশ তৈরি করে এনে জলিলের গালে লাগিয়ে দিলেন। জলিল ওটা ধুয়ে ফেলল, চুল আঁচড়ে লম্বা ঘোরানো রাস্তা ধরে স্কুলে গেল।

স্কুলের খেলার ঘরে অন্ধকারে ছেলেরা শিস্ দিচ্ছে। বাহবা দিচ্ছে যখনই ব্রুস লী সিনেমার পর্দায় দেখা দিচ্ছে বা দেওয়াল টপকাচ্ছে, বন্দুকের গুলি এড়িয়ে যাচ্ছে বা জনা ছয়েক শত্রুকে একসঙ্গে সামলে ধরাশায়ী করছে। তারপর ছবিটা রঙিন থেকে শাদাকালো হয়ে গেল। স্যুটপরা এক ভদ্রলোক দর্শকদের সম্বোধন করে বলছেন: "এ-বার আমরা সেই পৃথিবীর দিকে দেখছি যেখানে এই আন্তর্বিশ্ব বীরেরা আছে। আমরা দেখছি কেমন করে এই খেলাটা খেলা হয়, আমরা কুং ফুর ম্যাজিক এবং মোহ দেখছি..." কড়া হাতের পাঞ্জার ঘায়ে লোকে অন্যের মাথা নামিয়ে নিচ্ছে এমন-সব ছবি দেখা গেল। রক্ত ঝরতে লাগল, তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেরা বাহবা দিতে লাগল। শ্বেতাঙ্গটি আবার ছবির পর্দায় দেখা দিলেন। জলিল ভাবল, উনি ব্যাখ্যা করবেন, গোপন সূত্রটা বলে দেবেন। উনি যখন কথা বলছেন তখন ছবিতে দেখা গেল একটা স্টুডিওতে পেছন দিকে জিনিশপত্র গুছিয়ে রাখছে। তারপর যাকে উদ্দেশ করে শ্বেতাঙ্গটি কথা বলছিলেন সেই চীনা লোকটি যে-দেওয়ালের ওপরে বসেছিলেন সেখান থেকে লাফিয়ে নামলেন। নামবার সময়ে হাতদুটো ছড়িয়ে দিলেন। শ্বেতাঙ্গ ভাষ্যকারটি ছবিটা দর্শকদের সামনে তুলে ধরলেন।

"এ-বার তাহলে উলটোদিক থেকে দেখা যাক্," উনি বললেন। ফিল্মের ভেতরের ফিল্মটি উলটোদিক থেকে দেখানো হল, লাফটাও উলটো করে দেখা গেল, যেন চীনা লোকটি লাফিয়ে দেওয়ালে উঠলেন।

জলিল নীরবে দেখল। ছবিটা স্টুডিওর অন্য একটা ঘরে গেল। একজন অভিনেতা নিজের একটা কৃত্রিম মূর্তির পাশে দাঁড়ালেন।

"দারুণ, না?" পাশের একটা ছেলে বলল।

মূর্তিটার মাথা উড়িয়ে দেওয়া হল, রক্তের স্রোত বয়ে গেল। মুণ্ডুটা তুলে দর্শকদের দেখানো হল কেমন করে কলমের সাইজের একটা ক্যাপ্‌সুল্ থেকে রক্তটা ঝরানো হচ্ছে। "এ-সবই সেকেণ্ডে চব্বিশটা হারে সাধারণ ছবিতে দেখানো হয়, যে-সবটা বাস্তব জীবনে ঘটে না। ক্যামেরাটার গতি কমালে কী হয়? চীনা লোকটি অন্য অভিনেতাদের চোয়ালে লাথি মারছেন সে ছবি দেখা গেল। অতি ধীরে যেন ভেবেচিন্তে মারছেন। ছবির নির্দেশক খুচরো অভিনেতাদের দিয়ে বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলছেন। আরো একটা ছবিতে সেই অভিনয়ই অবিশ্বাস্যগতিতে দেখানো হল।

"অতিমানব কুং ফু দৌড়চ্ছেন, লাফ দিচ্ছেন, রেগে প্রচণ্ড বেগে ঘুসি মেরে লড়াই করছেন—এ-সবই রুপোলি পর্দার সৃষ্টি।"

সমস্ত ফিল্মটাই ঐ রকম। যখন বাতি জ্বলল আর মিস্টার মরিসন ঘরের সামনে এসে বললেন টিফিনের ছুটি দশ মিনিট বেশি দেওয়া হবে তখন জলিল এরোলের দিকে ফিরল। অন্যরা বেশিরভাগই যা দেখল সে-সম্বন্ধে উদাসীন।

"মিস্টার মরিসন যে-বইটা আমাকে দিয়েছেন তাতে আছে ব্রুস লী সত্যিই লাফিয়ে দশ ফুট উঁচু দেওয়ালে উঠতে পারেন।"

"ব্রুস লী মারা গেছেন," এরোল বলল।

"আমার মনে হয় এটা একদম বাজে," ঐ লাইনের আর—একটা ছেলে বলল "কুং ফু চীনেদের জন্যে।"

"শাদাগুলো সব মাটি করে দেয়।" এরোল বলল।

বিকেলে জলিল আর স্কুলে দেরি করল না। বাড়ি ফিরে গেল। ছিন্ন-ভিন্ন গোপন সূত্রটা সম্বন্ধে ঠিক কী ওর মনে হচ্ছে তা ও ঠিক করতে পারল না। হয়তো ছবিটা মিথ্যে বলছে, কুং ফুর সবটাই ও-রকম নয়, সবই শুধু কারসাজি নয়।

বাড়ির কাছে এসে জলিল দেখতে পেল তিনটে পুলিসের গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে। উঠোনে পুলিস, ফ্ল্যাটের অনেকে বাইরে তাদের সঙ্গে কথা বলছে। মেয়েরা বাচ্চারা জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছে।

ওদের ফ্ল্যাট থেকে জলিল ঝড়ের বেগে বেরোল। বাবা সেলাইকলে বসে আছেন, নাক থেকে চশমা নেমে এসেছে।

"কী হচ্ছে এখানে? আমাদের বাড়িতে পুলিস কী করছে?"

"সংসারের সব ব্যাপার তোমাকে দেখতে হবে বুঝি? তাহলে তো একলক্ষ জীবন দরকার।"

খলিল বলল, "কাল সন্ধেয় একটা শাদা ছেলেকে রাস্তার মোড়ে কে ছোরা মেরেছে।"

খলিল ওদের জানলা থেকে দেখছিল। "পুলিস খোঁজ করছে ছোটোদের কেউ রাস্তায় ছোরা বা অন্য কিছু পেয়েছে কিনা।"

ছুঁচে সুতো পরাতে-পরাতে বাবা বললে "শাদাদের ঝগড়ায় আমরা থাকতে যাই কেন?"

"শাদা কেউ ছোরাটা মারেনি," খলিল বলল, "মেরেছে কোনো বাঙালি; তারা ফুটপাথে চেল্লার ফেলে এসেছে।"

"আজেবাজে বকিস না, যা মুখে আসে বলে যাস না। আমাদের যা চেয়ার দরকার সে-সবই তো বাড়িতেই আছে।" সোলাইকলে বসেই বাবা বললেন।

তারপর জলিলের দিকে ফিরে বললেন "তু—পাউণ্ড নিয়ে ব্রিক লেনে গিয়ে দর্জির কাঁচি একটা কিনে আন তো। সোজা রাস্তাটা ধরে যাস।"

অনুবাদঃ সুকুমারী ভট্টাচার্য

ফারুক ধন্ধী

মেকাতে এসো

রাগ হলেই সহিদের মাথার ছোটো করে ছাঁটা চুলগুলো ঝগ্‌ড়ুটে মোরগের ঘাড়ের পালকের মতো উঠে দাঁড়াত। সহিদের সেদিন বেজায় রাগ হয়েছিল। আমরা চার-জন কারখানা ছেড়ে রাস্তায় বেরুতেই সহিদ সোজা ওর চাচার বাড়ি যেতে চাইল।

"চাচা গভনরের সঙ্গে ফয়সালা করলেন। আমি ওই শালা রসুলকে দেখে নেব। ভাড়াকরা মেয়েছেলের বাচ্চা কোথাকার! কারখানা থেকে বেরুলেই দেখে নেব।" এই বলে সহিদ ফুঁসছিল।

আমি বললাম, "ছাখ, রাস্তায় গণ্ডগোল করিস না। গভনর তাহলে পুলিশ ডাকবে। চল্, এখান থেকে সরে পড়ি।" তারপর মাস্টারজির বাড়ির দিকে এগোলাম। সহিদের চাচাকে আমরা মাস্টারজি বলতাম। একসময় উনি আমাদের গ্রামের ইস্কুলে পড়াতেন। সহিদ আর কথা না-বাড়িয়ে আমাদের সঙ্গে হাঁটছিল।

"আমি চাকরি যাওয়ার তোয়াক্কা রাখি না। ওই শালা ওর চাকরি রেখে দিক। আমাদের অনেক চাকরি আছে। আমার চাচাতুতো ভাইয়ের কারখানা আছে। আমি তোর জন্যেও একটা চাকরির চেষ্টা করব।" আমাদের একজন বলেছিল। সহিদ ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "আমরা আর কোথাও চাকরি করতে যাচ্ছি না। এই গভনরকে আগে শায়েস্তা করি। আমি যদি কিছু করব বলি তো করেই ছাড়ি। ফরিদকে তুই জিগেস কর।"

মাস্টারজি দরজা খুলতেই আমরা দাঁতে দাঁত চেপে "সালাম্-আলিকুম্" বিড়্-বিড়্ করতে-করতে ঘরে ঢুকলাম। মাস্টারজি ঠাট্টা করে বললেন, "ন্যাজ-আলিকুম-সালাম্," তারপর সহিদ কথার তুবড়ি ফোটাতে লাগল। সেই শুনে মাস্টারজি বললেন: "এক কাপ চা খাও আগে, এখুনি ট্রেন ধরছ নাকি?" কিন্তু সহিদ যখন বলল ওই বেজন্মা গভনরের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করে আমাদের চাকরি গেছে, তখন মাস্টারজির গলার স্বর পালটে গেল "আগে বোসো, তারপর সবকিছু গোড়া

থেকে খুলে বলো দেখি। আর ওসব বাজে কথা গুরুজনদের সামনে ব্যবহার কোরো না।"

সহিদ লজ্জায় জিভ কেটে নিজের দু-গালে আস্তে থাপ্পড় মেরে গল্পটা শুরু করল।

আমরা সে-সময় 'নিউ ল্যাক ফ্যাশনসে' কাজ করছি। সারা বছরটাই কাজ করছিলাম শুধু অফ্‌ সিজন ছাড়া। আমি সহিদ আর দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু একসঙ্গে ইস্কুল থেকে বেরিয়েছি। এক বন্ধুর ভাই আমাদের চারজনকে "নিউ ল্যাকে" নিয়ে গিয়ে ওদের বড়ো কর্তাকে বলেছিল সেলাইকলে কাজের জন্যে চারজন লোক এনেছি।

গভনর আমাদের দিকে একবার তাকিয়েই বুঝেছিলেন আমরা ইস্কুল থেকে সোজা বেরিয়েছি। তার মানে নয় যে আমরা কোনো কাজ জানতাম না। আমাদের প্রত্যেকেই আব্বা আর আম্মার সঙ্গে বাড়িতে কিছু-কিছু দর্জির কাজ শিখেছিল। আর ইস্ট এণ্ডের সকলেই সেলাইকল চালাতে জানত। দশ বছর বয়স হলেই আমরা বাংলাদেশ বিমানে পাইলট হওয়ার কথা ভুলে যেতাম, আর দর্জির কাজের কথা ভাবতে শুরু করতাম। প্রথম-প্রথম অবশ্য আমাদের ইস্ত্রি করা, চা করা কি দোকান থেকে অরেঞ্জ স্কোয়াশ কিনে আনার ফরমাশি খাটতে হত। তবে আমাদের বন্ধুর ভাই বলেছিল 'নিউ ল্যাকে' এত রাশি-রাশি কাজ জমা হয়ে আছে যে গভনর আমাদের সোজা সেলাই কল চালাতে দেবে। গোড়ার দিকে কাজ শিখছি বলে অল্প মজুরি দিচ্ছিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমরা দিনে প্রায় দশটা জামা তৈরি করছিলাম। গভনর এক-একটা কাজের জন্য ষাট পেন্স করে দিচ্ছিল। এদিকে কাটা কাপড়গুলো ঘরের কোনায় আর গভনরের টেবিলের ওপর জমা হচ্ছিল।

কিছু বয়স্ক লোক আমাদের সঙ্গে একই ঘরে কাজ করত। তারা আমাদের দুগুণ এক পাউণ্ড কুড়ি পেন্স করে পেত। আর হিন্দি গানের তালে-তালে খুব জোরে সেলাইকল চালাত, সেই সঙ্গে কাজও তাড়াতাড়ি শেষ করত।

গভনর থেকে থেকেই সহিদের সেলাইকলের পাশে দাঁড়িয়ে বলত, "তুমি এর জন্যে গাধার মাইনে পাবে। কেটে পঞ্চাশ পেন্স করে দেব।" প্রথমদিকে এটা ঠাট্টার মতো ছিল। কিন্তু গভনর যখন রোজই এ-কথা বলতে লাগল তখন ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। আমরা বাড়ি যেতে চাইলেই রেগে উঠত। একদিন বলেই বসল, "এমনকি একটা ছোটো ছেলেও এর চেয়ে

তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে।" সহিদ বলে উঠল, "তাহলে আমার ছোটো বোনকে নিয়ে আসব।"

গভনর লোকটা খুব খারাপ ছিল না। গায়ের চামড়া শাদা হলেও লোকটা একটু-একটু বাঙলা বুঝত। মাঝে-মাঝে আমাদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাসাও করত। বাথরুমে যেতে চাইলেই বলত "তোমরা বাথরুমে অতক্ষণ কী কর? আমাদের কিন্তু অত সময় লাগে না।"

ষাট পেন্সের কাজ কি কেউ পঞ্চাশ পেন্সে করতে চায়। বড়োকর্তা একদিন বলল যে কাজ ঠিক সময় শেষ না-করতে পারার জন্য ওর জরিমানা হয়েছে। এই আল্সে বাঙালিগুলোর জন্যেই ওর ব্যবসা নষ্ট হচ্ছে। আমাদের আব্বা আর চাচারা খালির টাকার কথা ভাবে, আর আমরা কেবল মেয়েছেলের কথা ভাবি। ও আরো বলল একটা জামার মজুরি খালি পঞ্চাশ পেন্স দেবে, আর এক পয়সাও বেশি নয়। বড়োকর্তার মেজাজটা যাচ্ছেতাই। পরের দিন সকালবেলায় সবাই যখন কারখানায় ঢুকছিল ও আমাদের চারজনকে থামিয়ে দিয়ে বলল—"আজ থেকে একটা জামার মজুরি পঞ্চাশ পেন্স। বুঝলে, বাছাধনরা। যদি দিনে পঁচিশটা জামা সেলাই করতে পারো তবেই পুরোনো রেট পাবে।"

আমরা সবাই সেলাই কলে বসে গেলাম। সহিদ বলল আধ পেন্স কমালে ওর জন্যে কি ওর দাদার জন্যেও কাজ করব না। বড়কর্তা রেগে গিয়ে বলল: তোমরা কাগজপত্র নিয়ে এখান থেকে সরে পড়। তোমাদের মতো ছেলেদের রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার কাজ নেওয়া উচিত। যত ইচ্ছে সময় নিয়ে কাজ করতে পারবে।"

সেদিন কারখানার কাজের শেষে লোকটা ওর কোটের পকেট থেকে মোটা মানিব্যাগ বের করে খানকয়েক নোট আমাদের চারজনের হাতে ধরিয়ে দিল। সেই সঙ্গে বলল— "গত দুদিনের টাকা জামা পিছু ষাট পেন্স দিলাম। কাল থেকে আর আসার দরকার নেই।"

পরের দিন আমরা প্রতিদিনের মতোই কাজে গেলাম। সহিদ বলেছিল সেলাইকলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে কিন্তু কাজ শুরু না-করতে। আমরা হাত গুটিয়ে একখানা ঘরের কারখানার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

"ছেলেরা, বেরিয়ে যাও, বলছি। আমি অন্য ব্যবস্থা করেছি। তোমরা নতুন রেটে কাজ না-করলে, কী হবে, আজকাল অনেক লোক কাজের জন্যে ঘুরছে।" বড়োকর্তা এই বলে নিজের কাজে মন দিল। ও তখন ঘুরে-ঘুরে সেলাই-এর কাজ দেখছিল। মাঝে-মাঝে অফিসের খাতায় হিজিবিজি করে কী-সব লিখছিল।

আমরা প্রায় দু-ঘণ্টা সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। দুপুরবেলা বড়োকর্তা স্যাণ্ডউইচ আর বিয়ার খেতে বেরিয়ে গেল। অন্যদিন আমাদেরই একজন রাস্তার দোকান থেকে হুকুম মাফিক কিনে আনত। সহিদ তখন অন্য শ্রমিকদের বাঙলায় কিছু বলল। শ্রমিকদের একজন সহিদকে বলল যে ওরাও অল্প পয়সাতেই কাজ করতে রাজি হয়েছে। আর একটু লজ্জা পেয়ে সেলাইকলে মাথা গুঁজে কাজ করতে লাগল।

সহিদ বলত ওর বয়স ষোলো বছর হলে কী হবে কে সত্যি কথা বলে কে মিথ্যে কথা বলে ও বুঝতে পারে। ও আরো বলত, লোকগুলো পুরুষমানুষ নয়, ওদের চুড়িবালা আর শাড়ি পরে ঘরে বসে থাকা উচিত।

গভনর রসুলকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। রসুলকে আমরা চিনতাম। বাংলাদেশের লোক, বেশ বয়স হয়েছে। চোখ দুটো দেখলেই বোঝা যেত যে লোকটা ধূর্ত। গভনর রসুলকে সহিদের কলটা দেখাতেই রসুল টুলের ওপর বসে পড়ল।

এবার সহিদ জোর গলায় বলল: "রসুল, তুমি তাহলে আমার পেটের ভাত মারতে এলে?"

রসুলটা ভেড়ার মতো সহিদের ফেলে রাখা কাপড়টা তুলে নিয়ে সেলাই কলে চালাতে শুরু করল। সেইসঙ্গে মিন্‌মিনে গলায় উত্তর দিল: "এতটুকু একটা পুঁচকে ছেলের অত বড়ো-বড়ো কথা কিসের।"

তখন সহিদ বলল: "আমার নরম গালে তোমার শাদা দাড়ির চেয়ে অনেক বেশি আত্মসম্মান আছে। যাদের কেউ নেই তারাই শুধু পঞ্চাশ পেন্‌সে কাজ করে।"

রসুল সেলাই কল চালাতে-চালাতে বলেছিল, "আমি যা পাই তাতেই কাজ করি। তুমি যখন তিন ছেলেমেয়ের আব্বা হবে তখন শুঁড়িখানায় যাওয়া আর শাদা মেয়েছেলে নিয়ে ঘুরে পয়সা খরচ করা বন্ধ হয়ে যাবে।"

সহিদ গভনরকে বলেছিল "তোমার মার মত সাদা মেয়ে, বুঝলে?"

শুনেই গভনর বলেছিল: "এবার বেরিয়ে যাও বলছি। যথেষ্ট হয়েছে।" আমি যদি সহিদকে কারখানা থেকে টেনে বের করে না-আনতাম তাহলে রসুলকে ও হয়তো ওখানেই পিটিয়ে ছাড়ত।

• সহিদ চ্যাচাতে-চ্যাচাতে বেরিয়ে এল, "বাইরে বেরুলে দেখে নেব।" আর রসুল হেসেছিল।

মাস্টারজি খুব মন দিয়ে গল্পটা শুনলেন। সহিদ রাগে গজরাতে লাগল: "ওই রসুলটা একটা শূয়রের বাচ্চা!"

মাস্টারজি কোট গায়ে দিয়ে লাঞ্চের সময় আমাদের সঙ্গে কারখানায় গেলেন। অনেক শ্রমিক তখন খেতে বের হচ্ছিল। মাস্টারজি তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। এমনকি তিনজন বয়স্ক শ্রমিককে সেদিন সন্ধ্যায় ওঁর বাড়ীতে আসতে রাজি করিয়েছিলেন। সন্ধ্যেবেলায় আমরা মাস্টারজির বাড়িতে দেখা করলাম। মাস্টারজি বলেছিলেন কারখানায় আমাদের ধর্মঘট ডাকা উচিত, নাহলে গভনর খুন করে পার পেয়ে যাবে। আমরা ক্রীতদাস হতে বিলেতে আসিনি।

একজন বুড়ো শ্রমিক বলেছিল, "আমাদের কথা কেউ শুনবে না। তোমরা তো জানই বাঙালিদের স্বভাব।"

মাস্টারজি বলেছিলেন, "বাঙালিদের নামে আমার সামনে অমন কথা বোলো না। আমার দেশের লোকের সম্পর্কে বাজে কথা আমাকে বোলো না।"

সহিদ বলেছিল, "দেখুন, মাস্টারজি, দেখুন, ওই রসুলটা কেমন লোক। আমি ওকে মেরেই ফেলব।" মাস্টারজি এর উত্তরে বলেছিলেন, "তুমি রুগীকে মারবে না। রোগের জীবাণু মারবে।"

আমাদের ধর্মঘটের ব্যাপারে লোকে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিল। পরের দিন আমরা কারখানার বাইরে বাঙলায় লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম "উপযুক্ত মজুরি দিতে হবে।"

আস্তে-আস্তে অনেক শ্রমিকই আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। ফুটপাথের ওপর বেশ বড়ো একটা দল জড়ো হয়েছিল। আমরা তখন চ্যাচাতে শুরু করলাম। ধর্মঘটের দ্বিতীয় দিনে গভনর পুলিশ ডেকে আনল। সেদিন একজন লোকও কাজে আসেনি। তারপর পুলিশ এল, খবরের কাগজের লোকেরা এল। তৃতীয়দিনে এক বুড়োমতন লোক মাস্টারজিকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। আমরা তখন ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। আমাদের বেশ কিছু বন্ধু-বান্ধবও আমাদের সাহস জোগাতে এসেছিল। বুড়ো লোকটা বলেছিল যে ওর কাজে ফিরে যেতেই হবে।

ওর বিবিজানের অসুখ। তার ওপর ওর অনেক ধার হয়েছে। মাস্টারজি বলেছিলেন লোকটার অবস্থাটা বিবেচনা করে আমাদের ওকে কাজে ফিরে যেতে দেওয়াই উচিত। আর লোকটাকে সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত কাজ করতে যেতে দেওয়াও উচিত। যাতে ও শুক্রবারে মাইনেটা পায়। সহিদ মুখ

ভার করে গজগজ করছিল, কিন্তু মাস্টারজির সঙ্গে তর্ক করেনি। আমরা জানতাম শুক্রবারদিন কী হবে। শুক্রবারে শ্রমিকরা সে-সপ্তাহের দুদিনের মাইনে নেবার জন্যে কাজে ফিরে যেতে চাইবে। ঠিক তাই হয়েছিল। একে-একে সবাই ফিরে গিয়ে কাজ শুরু করল। গভনর দোতলার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমাদের খুব হুম্‌কি দিলেন। আমরা আর উত্তর দিই-নি। সবাই ফিরে গেলে দুপুরের পর ওখানে মাত্র আমরা চারজন ছিলাম।

ঠিক সেদিন দুপুরেই বেটী আর সিলভিয়া কারখানার দরজার মুখে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। দূর থেকে দেখেছিলাম দুজন শাদা মেয়ে ক্যামেরা কাঁধে ঝুলিয়ে অল্ডগেটের দিক থেকে আসছিল। মেয়ে দুটো আমাদের দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল আমরাই ধর্মঘটের কমরেড কি না।

আমি বললাম, "এটা তো ঠিক ধর্মঘট নয়। গভনর মত না পালটানো অব্দি আমরা কাজ করব না।"

আমরা যা বললাম ওরা সব লিখে নিল। বেটী আবার আমাদের একটা ছবি তুললো। আমরা বেশ ভাল করে চুল আচড়ে দাঁড়ালাম। ওরা আমাদের প্ল্যাকার্ডটা উঁচু করে তুলে ধরতে বলল। বাঙলায় লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে ছবি তোলার একটুও ইচ্ছে ছিল না আমার। আমরা পাশাপাশি কাঁধ ধরাধরি করে 'নিউল্যুক' সাইনের ঠিক নিচেই দাঁড়ালাম। বেটী ক্যামেরা নিয়ে রাস্তায় হাটু গেড়ে বসে ছবি তুলেছিল। সেইসঙ্গে রাস্তায় গাড়িগুলোর থামতে হল। বেটী এমন একটা ভাব করছিল যেন ও গাড়িওলাদের চ্যাঁচানি বা হর্ন কিছুই শুনতে পায়নি।

সহিদ আমাকে বাঙলায় বলল, "মেয়েটা ফাজিল, বুঝলি।" দিন কয়েক বাদে আমরা ব্রিকলেনের একটা কাফেতে বসে চা খাচ্ছিলাম। বেকার ছেলেরা সাধারণত এখানকার পাঁচ ছটা কাফেতে ঘোরাফেরা করত আর কাপের পর কাপ চা খেত। কবে কোন চাকরি পাবে সেই আশায় অপেক্ষা করত। আমরা অনেক আগে থেকেই বুঝেছিলাম যে চাকরির মরশুম শেষ হয়ে গেছে। এখন অভিজ্ঞ লোকও কাজ পাচ্ছে না। বেটী কিন্তু কাফেতে ঢুকেই আমাদের চিনতে পারল। ছবি তোলার দিন বেটী জিনস, চামড়ার কোট আর সোয়েটার পরেছিল। সোয়েটারের ওপর কালো মুঠো করা হাতের ছবি। আজকে ও দিব্যি দেখতে একটা জামা পরে এসেছে। মাথার চুলগুলো শ্যাম্পু করে আঁচড়ানো।

বেটী সহিদকে বলল, "আমি তোমাকে খুঁজছিলাম। আমরা তোমাদের বিষয়ে দারুণ লিখেছি।"

তারপর টেবিলের ওপর এক পাঁজা খবরের কাগজ রেখে বেটী একটা কাগজের পাতা ওলটাতে লাগল।

শাদা মেয়েরা এই কাফেতে খুব কমই আসত, এলেও ওদের পুরুষদের নিয়ে আসত। কিছু বাজে মেয়েমানুষ অবশ্য কাফেতে সারা দিন বসে থাকত। অনেক পুরুষরা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করত, আর পয়সা দিলে মেয়েগুলো পুরুষদের সঙ্গে বেড়াতে যেতেও রাজি হত! বাঙালি মেয়েরা কখনোই কাফেতে আসত না, তবে কিছু উগণ্ডার ভারতীয় ছেলেমেয়েরা আসত। আর আসত সাজ-গোজ করা পাঞ্জাবি মেয়েরা। তাদের ছেলেবন্ধু থাকলে বাড়িতে আপত্তি করত না। ওরা ওদের ছেলেবন্ধুর সঙ্গে কাফেতে আসত। ওরা সব ভালো-জাতের মেয়ে, কেউ ওদের নিয়ে বাজে কথা বলতে সাহস পেত না। বেটীও খুব ভালো মেয়ে—ওর ইংরিজি উচ্চারণ শুনেই সেটা বেশ বোঝা যেত। কিন্তু অন্য শাদা মেয়েদের মতো বেটী আদবকায়দা জানত না। কোথায় যেতে হয় কোথায় না-যেতে হয় সে কিছুই জানত না। যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেত, কেউ ওকে কিছু বলত না।

আমরা বেটীকে অসম্মান করতে চাইনি, তাই ওকে আলাদা টেবিলে বসে কফি খেতে বলেছিলাম। আমাদের সঙ্গে যে-ছেলেরা বসত, তারা বেটীর দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে বিচ্ছিরি করে হাসছিল। ছেলেগুলো একেবারে থার্ডক্লাশ ছেলে। কোনো কম্মের নয়, হাড় বজ্জাত! আমরা ওদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলাম। ওরা আমাদের বোঝাচ্ছিল কেমন করে পুরোনো গাড়ি বেচে কিনে পয়সা রোজগার করা যায়। বেটী কিন্তু ঠেশাঠেশি করে আমাদের টেবিলেই বসল। কাগজে আমাদের ছবি দেখলাম। কাগজে লিখেছে "শ্রমিকদের ঘামেভেজা কারখানায় কালোপায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।" সহিদ লেখাটা ঠিক বুঝতে পারছিল না। বেটীকে সেটা পড়ে বুঝিয়ে দিতে বলল।

সহিদ বলেছিল, "আমাদের কারখানায় কোনো কালো লোক নেই। সবই বাঙালি।"

বেটী তখন বুঝিয়ে বলল, "কালো পা মানে যারা শ্রমিকদের আক্রমণ করে। যারা শ্রমিকদের শত্রু।"

সহিদ বলল, "আমাকে কেউ আক্রমণ করলে আমি তাকে এক ঘুষি মারব।"

কাফের অন্য লোকদেরও খুব কৌতুহল হচ্ছিল। সবাই কাগজটার কাছে ভিড় করে দাঁড়াল। লোকের হাতে-হাতে কাগজটা ঘুরছিল।

আমি বেটীকে বললাম ধর্মঘট শেষ হয়ে গেছে। বেটী বলেছিল সেটা খুবই লজ্জার কথা।

সহিদ বলল, "আমার লজ্জা করছে না।"

বেটী খবরের কাগজে কাজ করে আর পাঁচ পেন্সে কাগজটা যে-কোনো লোককেই বিক্রি করতে চাইছিল।

বেটী সহিদকে ডেকে বলেছিল, "আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। তোমাদের ঘামেভেজা কারখানার সব খবর দিয়ে একটা গল্প চাই।"

আমি বলেছিলাম, "আমরা বেশি গল্প জানি না। শুধু বাঙলা গল্প জানি।"

বেটী বলেছিল, "তোমাদের ঘামেভেজা কারখানার গল্প, নিউ ল্যাকের গল্প।" সহিদ বুঝতে পারেনি দেখে বেটী বলল, "তোমাদের কারখানাকে আমরা ঘামে-ভেজা কারখানা বলি। তোমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কারখানাটা তৈরি হয়েছে।"

বেটী আমাদের সব কিছু বোঝাবার জন্য খুব ব্যস্ত হচ্ছিল।

সহিদ বলেছিল, "ঘামলেই আমি চান করি। আমি ইংরেজদের মতো নই।"

বেটী তাই শুনে বলল "তুমি আমার কথা বুঝতে পারো নি। এখানকার সব কারখানাই ঘামেভেজা। তার ওপর নোংরা আর ঘিঞ্জি। পুরো এলাকাটাই নোংরা আর ঘিঞ্জি।"

আমি চটে গিয়ে বলেছিলাম, "আমার চাচাতুতোভাইয়ের কারখানাটা একবার দেখে এসো। খুব পরিষ্কার।"

"তোমার ঠাট্টা রাখো। আমি অনেক কটা কারখানাই দেখেছি।" বেটী বলেছিল।

সহিদ আমার দিকে তাকিয়ে বলল "ও মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা করে না।"

কাফের থেকে বেরিয়ে আমরা সহিদের বাড়ি গেলাম। সহিদ বাড়িতে কাগজগুলোর কথা বলতে বারণ করেছিল। সহিদ কাগজগুলো খুব শক্ত করে পাকিয়ে ওর জামার তলায় ঢেকে রেখেছিল। সহিদ বলেছিল ওর আব্বা কাগজগুলো দেখলেই বলবে ও বাঙালিদের নাম খারাপ করছে। আমরা সারা সন্ধেটা সহিদের বাড়িতে বসে টেলিভিশন দেখলাম। চাকরি না-থাকার জন্যে আমরা এই এক ধরনের মেজাজে দিন কাটাতাম। কোনো-কোনো দিন কমার্শিয়াল রোডে সিনেমা দেখতে যেতাম। সিনেমা থেকে ফিরে আবার টেলিভিশন দেখতাম। আর হাতে পয়সা থাকলে ওয়েস্ট এণ্ডে চলে যেতাম।

অনেক ছেলেই ওয়েস্ট এণ্ডে তাদের অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কথা বানিয়ে-বানিয়ে বলত। কেউ-বা হয়তো একটা কাফেতে গিয়ে শুধু এক কাপ চা খেয়েছিল, অথচ আমাদের কাছে বলত কোনো ক্যাসিনো'তে জুয়া খেলে পঞ্চাশ পাউণ্ড পেয়েছি। কেউ বলত, লেস্টার স্কোয়ারে এক মস্ত নাচঘরে দুজন ভীষণ সুন্দরী ভালোঘরের শাদা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মেয়েদুটোর নাকি ছেলেটাকে খুব পছন্দ হয়েছিল তার চুলের কেয়ারি দেখে। ছেলেটা আরো বলেছিল ও নাকি ওদের সঙ্গে যখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। ইস্কুলে থাকতে আমরা এইসব গল্প বিশ্বাস করতাম আর অপেক্ষা করতাম কবে যে আমাদের দিন আসবে। আমরাও নাচতে যাব আর মেয়েবন্ধু জোগাড় করব। যত দিন যায় লোকে শেখে। সহিদ আর আমি যেদিন ওয়েস্ট এণ্ডে গেলাম, আমাদেরও এক ধরনের অ্যাড্‌ভেঞ্চার হল। কেউ বিশেষ আমাদের সঙ্গে কথা বলেনি। কেবল মারামারি করার ধান্ধায় দু-একজন যেচে ভাব জমাতে এসেছিল। আমরা বাসে করে ওয়েস্ট এণ্ডে যেতাম। মেশিনে বল খেলতাম। কোনো-কোনো দিন কুৎসিত সব সিনেমা দেখতাম। তারপর আইস্‌ক্রীম খেয়ে শেষ টিউব ট্রেন নিয়ে অল্ডগেটে ফিরতাম। পয়সা ফুরিয়ে গেলে হেঁটেই বাড়ি ফিরতাম— প্রথমে হাঁটতাম টেমস্‌ নদীর ধার দিয়ে, তারপর 'সিটী'র পাথরের দেওয়ালে প্রতিধ্বনি শুনতে শুনতে।

আমাদের ভবিষ্যত বলতে কিছুই ছিল না। আমরা একেবারে উদ্দেশ্যহীন-ভাবে ঘুরছিলাম। বেটী আমাদের খুঁজে বের না-করা পর্যন্ত সহিদ অন্তত খুবই উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একদিন রাস্তায় সহিদের বেটীর সঙ্গে দেখা হল। সঙ্গে-সঙ্গেই ও আমাকে নিয়ে বেটীর বাড়ি গিয়ে দেখা করার জন্যে দিন ঠিক করেছিল।

শুনে আমি দাঁত বের করে হেসে বললাম, "কীরে, তোর তো একটা ব্যাবস্থা হয়ে গেল।"

তাই শুনে সহিদ তেড়ে এল, "মেয়েটা খুব ভালো, লেখাপড়া শিখেছে, তোর মতে নয়।"

আমি বললাম, "মেয়েটার বাবা আমাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে লাথি মেরে রাস্তায় বার করে দেবে।"

সহিদ একটু ভেবে বলল, "এ-সব মেয়েদের বাবা থাকে না।"

"তাহলে ওর দাদারা—" আমি জবাব দিলাম।

সহিদ বলল, "চুপ কর্‌। কথা না-বাড়িয়ে আমার সঙ্গে চল্‌।"

পরের দিন আমরা বেটীর বাড়িতে গেলাম। বেটীর ঘরটা আমাদের অদ্ভুত লেগেছিল। আমরা সবাই মেঝেতে বসলাম। ওর একটা সোফা পর্যন্ত ছিল না। বিছানা বলতে গ্রামের লোকেদের মতো মেঝেতে একটা তোষক ফেলা। সারা ঘরে রাশি-রাশি বই ছড়ানো। যারাই ওর ঘরে আসছিল হয় মেঝেতে বসছিল, নয় কুশনের ওপর বসছিল—বইখাতা, চায়ের মগ আর ছড়ানো কাগজপত্রের মধ্যে। এমনকি আলোটা পর্যন্ত একটা কাগজের বাটীতে সিলিং, থেকে মেঝে অব্দি ঝুলছিল। আর রঙিন মোমবাতির মোম সব জায়গায় ছড়ানো।

বেটী আমাদের বলেছিল ও অনুবাদক। কিছু রাশিয়ান আর ফরাশি বই দেখিয়েছিল। সহিদ ওকে রাশিয়ান আর ফরাশিতে কিছু বলতে বলল। বেটী কিছু বলতেই আমরা হেসে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম এর মানে কী। ও বলেছিল, "এর মানে আমি তোমাকে ভালোবাসি।" আমরা সবাই আবার হেসে উঠলাম। বেটী বুঝতে পেরেছিল যে সহিদ ভাবছে বেটী বুঝি ওকেই কথাগুলো বলেছে। তাই বেটী বলল, "যে-কোনো ভাষাতেই এই কথাগুলো বলাই সবচেয়ে সোজা।" তারপর আমি বাঙলায় বললাম। সহিদ সিনেমার ভঙ্গিতে উর্দুতে বলল। বেটী উর্দুটা বলার চেষ্টা করেছিল।

এরপর আমরা যতবারই বেটীর ওখানে গেলাম ও শুধু ধর্মঘটের কথাই জিগেস করেছিল। অথচ প্রথমবারের পর আমাদের আর নতুন কিছুই বলার ছিল না।

বেটী আমাদের বোঝাচ্ছিল আমরা শুধু বাঙালিই নই, আমরা এখানকার শ্রমিকশ্রেণীরও অংশ। তাই আমাদের নিজেদের শুধু বাঙালি মনে করার কথা ভুলে যাওয়া উচিত। আমি বলেছিলাম আমি চিরকাল বাঙালিই থাকব। সহিদ আমাকে বলেছিল আমি বেটী কি বলতে চাইছে সেটা বুঝতে পারি নি।

আমি আবার বলেছিলাম, "শ্রমিক শ্রেণীর লোকরা থার্ডক্লাশের লোক।" বেটী তখন বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে এ-সব আমরা খবরের কাগজ পড়ে শিখেছি। আর খবরের কাগজগুলো শ্রমিকদের বিপক্ষে কথা বলে।

বেটী সবসময়েই আমাদের এইসব কথা বোঝাতে ভালোবাসত। ও খুব আস্তে-আস্তে কথা বলত, তাই আমাদের আর "আবার বলো" বলতে হত না। মনে হত সহিদ বেটীর গলার স্বর শুনতেই খুব ভালোবাসত। যদিও বেটীর অর্ধেক কথার মানে সহিদ বুঝতে পারত না।

সহিদ যেতে চাইত বলেই আমি ওর সঙ্গে বেটীর কাছে যেতাম। বেটী বলত আমরা ওকে এশিয়ানদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য বলেছি। এই বলে ও আমাদের কাছে ওর রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বলতে শুরু করল। ও একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেটা গুপ্ত দল নয়, যে-কেউ তাতে যোগ দিতে পারত।

সহিদ জিজ্ঞাসা করেছিল, "বেটী, তুমি কমিউনিস্ট ?" বেটী জবাব দিয়েছিল, আসলে আমি হচ্ছি সোসালিস্ট। সব শ্রমিকদেরই সোসালিস্ট আর ট্রেড ইউ-নিয়নিস্ট হওয়া দরকার। এভাবেই শুধু শ্রমিকরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। কমিউনিজম্ আসবে এর পরে।"

আমি বললাম, "কমিউনিস্টরা কোনো কাজের নয়। ওরা ভারতবর্ষে রেলগাড়িতে বোমা ফ্যালে।"

সহিদ রেগে গিয়ে বলেছিল, "তুই একটা উজবুক। তুই তো জানিস মৌলানা ভাসানি কমিউনিস্ট ছিলেন। উনি কি কখনো ট্রেন উড়িয়ে দিয়েছিলেন ?"

"উনি তো সাধু ছিলেন।"

"তুই একটা আস্ত বোকা। মাস্টারজি বলেছেন উনি কমিউনিস্ট ছিলেন।"

সহিদ মিটিংএ যেতে রাজি শুনে বেটী খুব খুশী হয়েছিল। সহিদ আমাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। বেটীর হালকা ছাই রঙের চোখ দেখে সহিদ বলেছিল ওর চোখ দুটো বিড়ালের চোখের মতো। শুনে বেটী জানতে চেয়েছিল আমরা বিড়ালকে সুন্দর দেখতে মনে করি কি-না।

সহিদ বলেছিল ওর মতে বিড়ালরা সত্যি খুব সুন্দর দেখতে। আর ওরা বড়ো ইঁদুর ধরতে পারে।

আমাদের সঙ্গে একা থাকলে বেটী অনেক কথা বলত, অথচ মিংটিএ কিছুই কথা বলত না। প্রথমবার যখন বেটী আমাদের মিটিংএ নিয়ে গিয়েছিল, মিটিংটা একটা বাড়িতে হয়েছিল। হিপিদের মত বাউণ্ডুলে লোকরা সেই লাইনের সব বাড়িগুলোই দখল করেছিল। প্রত্যেক মিটিংএ জনা বারো লোক আসত। ওদের নেতা একজন দাঁড়িওলা ভদ্র লোক। উনি কখনোই সবার আগে বলতে শুরু করতেন না। সাধারণত কেউ একজন ওঁকে শুরু করিয়ে দিত। সহিদ জানতে চেয়েছিল উনি ওদের সভাপতি কি না। বেটী বলেছিল ওদের সভাপতি থাকে না, ভদ্রলোক খুব বুদ্ধিমান, আর দলের জন্যে অনেক কাজ করেন। প্রথমবার উনি বেটীকে নিউল্যাকের ধর্মঘটের কথা বলতে বললেন। বেটী যা বলেছিল তাতে আমরাও এক মত ছিলাম। তারপর

ভদ্রলোক আমাদের দিকে ফিরে সোজা বললেন ধর্মঘটে জিততে হলে আমাদের ইউনিয়ন গড়া উচিত। আর একজন বলেছিল যে আমরা আগে বাঙালিদের সঙ্গে ইউনিয়নে যোগ দেবার জন্য কথা বলি। তারপর নিউল্যাকে গিয়ে সেখানকার প্রত্যেক শ্রমিককেই ইউনিয়নে যোগ দিতে বলি। ঘরের প্রত্যেকেই বলল তাই ঠিক, বেটীও তাতে একমত। বেটীর এটা আগেই ভাবা উচিত ছিল। ফেরার রাস্তায় সহিদ মুখটা ভার করে ছিল আর বলেছিল ও বাঙালিদের একটুও বিশ্বাস করে না। বাঙালিরা কিছুতে যোগ দেওয়ার জন্য এক পয়সাও খরচ করবে না। তার ওপর ওদের নেতা ওই দাঁড়িওলা লোকটাকেও এক ফোঁটাও বিশ্বাস করে না। আমি বলেছিলাম আমি কিছুতেই 'নিউল্যাকে' ফিরে যাব না। এমনকি একটা কোটের জন্যে হাজার পাউণ্ড দিলেও না।

পরের দিন যখন বেটীর বাড়িতে গেলাম, সেই দাঁড়িওলা ভদ্রলোকও এসেছিলেন। পরনে তাঁর চেক প্যান্ট। বেটী অন্যদিনের মতো আমাদের সঙ্গে অত গল্প করল না। তাতে সহিদও বেশ হতাশ হয়েছিল। তার বদলে বেটী বলল ওদের পরিকল্পনা হল যে 'নিউল্যাকে'র সমস্ত শ্রমিকদের ওদের দলে ঢোকাতে। আর আমরা বাঙালি বলেই ওরা আমাদের চায়। তারপর দাঁড়িওলা ভদ্রলোক ঘরের ভিতর পায়চারি করে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। সহিদ শুনতে চাইছিল না। বলেছিল ওর আমার জন্য ওকে একবার হেসেল স্টিটে যেতে হবে। বেটী তাও বলেছিল আমাদের বক্তৃতাটা শোনা উচিত। বক্তৃতার শেষে ওকেও কেনাকাটা করতে বাজারে যেতে হবে। ওদের নেতা বলেছিলেন আমরা শুধু 'নিউল্যাকে'র ম্যানেজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছি না, আমরা পুরো একটা 'সিসটেমের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। পুলিশও এই ম্যানেজারের সপক্ষে, সরকারও তাই, এমনকি বাংলাদেশ সরকারও 'নিউল্যাকে'র ম্যানেজারের পক্ষে।

সহিদ ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আপনি কি চীনদেশকে পছন্দ করেন?"

সহিদ কথার মাঝখানে প্রশ্ন করাতে ভদ্রলোক অধৈর্য হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, "চীনের সঙ্গে আমাদের থিওরিটিক্যাল মতভেদ আছে।"

সহিদ তা সত্ত্বেও বলে চলেছিল, "আপনি তাহলে চীনদেশ পছন্দ করেন না। আমার চাচা কিন্তু চীনের পক্ষে।"

"আমরা চীনের সমাজবাদী রাজতন্ত্রবাদের (Social imperalism) সঙ্গে একমত নই। দেখলে না, ওরা চিলিতে কী কাণ্ড করল।"

সহিদ সে-বিষয়ে কিছু জানত না। শুধু বলল ওর চাচার কাছে চীনের

অনেক বই আছে। এঘরে যত বই আছে তার চেয়েও বেশী। তবে বইগুলো সবই বাংলাদেশে পড়ে আছে। ও চাইলে ওর চাচা ওকে কিছু বই ধরে দিতেন। বইগুলো পড়ে ও হয়তো কিছু বুঝতে পারত। সহিদ হার মেনে ভদ্রলোককে এইসব বলেছিল। ভদ্রলোক শুধু বেটীর দিকে ফিরে বলেছিলেন "এ ভাবে কি কোনো কাজ হয় ? এর উত্তরই বা আমি কি দেব।"

বেটী দেখতে পেল আমার অস্বস্তি লাগছে আর সহিদেরও ভদ্রলোকের ওপর রাগ বেড়ে যাচ্ছে।

তারপর খানিকক্ষণের জন্যে সবাই চুপ, তাই সহিদ আর আমি উঠে পড়লাম। বেটী আমাদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে-দিতে বলেছিল, "রজার একটুতেই অধৈর্য্য হয়ে যায়, ও কিন্তু খুব বুদ্ধিমান। আমাদের সঙ্গে কাজ করতে শুরু করলেই তুমি ওর ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।"

তারপর বেটী এগিয়ে এসে সহিদের হাতটা চেপে ধরেছিল। ও আগে কোনোদিন এ-রকম করেনি। সহিদের দিকে হেসে বোঝাতে চেয়েছিল যে ও আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়। সঙ্গে বসে কফি খেতে চায় আর রজারের সঙ্গে এ-রকম গরম আবহাওয়ার সৃষ্টি হওয়াতে ও খুবই দুঃখিত হয়েছিল।

তারপর বেটী বলেছিল "এরপরের মিটিংএ তোমাদের আসতেই হবে। সেটা খুব দরকারি মিটিং।

"আমরা এরমধ্যে তোমাদের একটা ব্যবস্থা করে ফেলব। সেই সঙ্গে সব থিওরিগুলো বোঝার জন্যে তোমাদের একট ট্রেনিং দেব। আমি সত্যি-সত্যি চাই যে তোমরা আমাদের দলটাতে বেশ ভালোমতো যোগ দাও।" সেই সঙ্গে বেটী একটু চোখ টিপে হেসেছিল।

চলে আসার সময় সহিদকে হঠাৎ খুব খুশি-খুশি মনে হচ্ছিল। বেটী যে হাতটা ধরেছিল সহিদ সেটা নাকের কাছে ধরে গন্ধ শুঁকল—যেন ও বেটীর হাতের সুগন্ধটাকে ধরে রাখতে চাইছিল। আমি কিছু বললাম না। কিছু বলারও ছিল না।

আমরা যখন ইস্কুলে পড়তাম আমরা কিছু আজেবাজে শাদা মেয়েকে চিনতাম, কিন্তু কখনো তাদের বাড়িতে যেতাম না। ওদের সঙ্গে কাফতে দেখা করতাম। আর 'জুক বক্সে' হিন্দি গান শুনতাম। 'কভি-কভি' কিংবা সে-সময়কার কোনো চলতি গান। কোনো-কোনো দিন যদি লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারতাম তবে ওরা আমাদের চুমু খেতে দিত। বেটীর মতো কোনো মেয়ের সঙ্গে আমাদের চেনা ছিল না।

সহিদ একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল "বেটীর বন্ধু ওই সিল্‌ভিয়াকে তোর ভালো লাগে ?" আমার সহিদের কথাটা ভালো লাগেনি। মনে হয়েছিল সহিদ যেন আমাকে ওর কাছে সিল্‌ভিয়ার হাত পাততে বলছে।

পরের মিটিংটাতে বেটী আমাদের সঙ্গে বসেনি। ও রজারের পাশেই বসেছিল আর একটা বক্তৃতা দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। বেটী উঠে দাঁড়িয়ে "ন্যাশনাল ফ্রন্টে"র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছিল। 'জু' আর 'এশিয়ান'দের বিষয়েও কিছু বলেছিল। বেটী আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় "বাঙালি" বলেই আমাদের উল্লেখ করত। কিন্তু বক্তৃতার সময় ও 'এশিয়ান' শব্দটা ব্যবহার করত। 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'কে রাস্তায় কাগজ বিক্রি করার জন্যে বেটী যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দিয়েছিল। বেটীকে মুখ খারাপ করতে দেখে সবাই খুব হেসেছিল। এক ঘর লোকের সামনে অমন গালাগাল দেওয়ার ক্ষমতা দেখে সহিদের যেন বেটীর ওপর শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল।

সহিদ আমাকে বলেছিল বেটীর মতো মেয়েরা মুখ খারাপ করলে তাতে দোষ নেই। এতে ওদের পরিবারের নাম খারাপ হয় না। এতে শুধু এইটুকু বোঝা যায়—যে-সব পাজি লোক 'এশিয়ান'দের আক্রমণ করে বেটীর তাদের ওপর অসম্ভব রাগ।

মিটিংএর পর সহিদ বেটীর বাড়িতে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু বেটী রাজি হয়নি। বেটী সামনের শনিবারে মিটিং-এর আগে সহিদকে একবার অবশ্যই আসতে বলেছিল। সহিদ আমাকে বলেছিল এটা এক ধরনের ইশারা। তাই এবার আমার ওর সঙ্গে যাওয়া উচিত নয়। বেটী নাকি ওকে একাই যেতে বলেছে। আমি সবই বুঝলাম।

পরপর তিনদিন আমার সহিদের সঙ্গে দেখা হয়নি। শুনেছিলাম তাড়াতাড়ি কিছু পয়সা কামাবার জন্যে এক বন্ধুর কারখানায় কাজ করছে। শনিবারে মিটিংটা দুটোর সময় শুরু হওয়ার কথা। আমি আর যেতে চাইলাম না। সহিদ আমার ভাইয়ের মতো। সবসময় ওর যাতে সুবিধে হয় সেটাই দেখতাম। তাই "কাবাব মে হাড্ডি" হতে চাইলাম না। মানে সহিদের পথের কাঁটা হওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না।

সকাল দাশটা থেকে আমি রোজকার মতো কাফেতেই বসে ছিলাম। এগারোটার সময় সহিদ এল, ওর মাথার চুল হাওয়ায় উড়ছিল। গায়ে নতুন নীল পুরু ডোরা কাটা সুট। নতুন সার্টের বিরাট কলারটা জ্যাকেটের চওড়া বোতামের পটিটাকে ঢেকে দিয়েছিল। ওর ভ্যাবলার মতো মুখের চেহারা দেখেই

আমি বলে দিতে পারছিলাম ও যেমন ভেবেছিল সেইমতো কিছু ঘটেনি। ওর ডান ব্যাগের তলায় একতাড়া খবরের কাগজ।

কাফের চারদিকে তাকিয়ে দেখল কেউ ওর দিকে তাকিয়ে আছে কিনা, তারপর বলল, "আমার সঙ্গে আয় একটু।" কাফের ম্যানেজার ঠাট্টা করে বলল "তোমার বিয়ে নাকি ?"

"বিয়ে করতে যাব কেন। আমি তোমার মেয়েবৌকে যখন বিনা পয়সায় পেতে পারি।" এই বলে সহিদ বেরিয়ে এল।

আমি বললাম, "এত তাড়া কিসের, যাচ্ছিস্ কোথায় ?"

কাগজের গাদাটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল—

"ওরা আমাকে এগুলো দিল যে।"

আমি বললাম, "তোর আবার ছবি তোলা হল ?"

সহিদের তখন নষ্ট করারমত সময় ছিল না। ও বলেছিল, "আমাকে এগুলো 'এশিয়ান'দের কাছে বিক্রি করতে হবে।"

"বেটী কি ওখানে ছিল না ?"

"বেটী ছিল, ওরা সবাই ছিল। আমাকে মিটিংএর আগে ডেকে সবাইকে বলল আমি ওদের দলের কাজে সাহায্য করতে চাই। শনিবার মিটিংএর আগে সবাই ওর বাড়িতে জমায়েত হয় কাগজ বিক্রির জন্যে।"

"এগুলো বিক্রি করবি কোথায় ?"

"কেন, টাওয়ার ব্রিজে।" সহিদ রাগে ফুঁশছিল আর জোরে-জোরে হাঁটছিল।

"টাওয়ার ব্রিজে আমাদের দেশের লোক কেউ নেই। সবই বিদেশী ট্যুরিস্ট।"

সহিদ ঠোঁট চেপে বলল, "অনেক সময় সিগাল পাখীরা থাকে।"

আমি সহিদকে কথা বলাবার চেষ্টা করছিলাম—

"এ কদিন কোথায় ছিলি ?"

"বোকার মতো পয়সা রোজগার করছিলাম।"

আমরা অল্ডগেটের গোল চত্বরটা ঘুরে এ্যালি স্ট্রীট ধরে গেলাম। শেষকালে সহিদ বলল "আমি বেটীকে মেকাতে আসতে বলেছিলাম।"

"তাহলে তো কিছুদূর এগিয়েছে। তা এত রাগ কিসের ?" এবার সহিদের মুখ খুলল," বেটী সবাইয়ের জন্যে কফি বানাতে রান্নাঘরে গিয়েছিল, আর আমিও ওর পিছন-পিছন গেলাম। আমি ওকে আমার সঙ্গে মেকাতে যাবার জন্য বলেছিলাম। মেয়েটা এত বোকা যে ভাবল আমি ওকে আরবের মক্কার কথা

বলছি। বেটী বলল ও তো মুসলমান নয়। আর আমি কি করতে ধর্মে বিশ্বাস করি। ওর মতে ধর্ম তো নেশাধরা ওষুধের সমান। তাই ওকে খুলে বললাম আমি মেক্কা নাচঘরের কথা বলছি, সন্ধ্যেবেলায় আসার জন্যে। ও ভাবল আমি বাজে সময় নষ্ট করছি।"

"বেটী তোর সঙ্গে যাবে বলেছে? ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাস?"

সহিদ কোনো উত্তর দেয়নি। ততক্ষণে আমরা টাওয়ার ব্রিজে পৌঁছে গেছি। সহিদ আমার হাত থেকে খবরের কাগজের বাণ্ডিলটা নিল। কাগজের সামনের পাতায় প্রথম লাইনে লেখা: "ন্যাশনাল ফ্রন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।" আমরা ব্রিজ ধরে এগিয়ে গেলাম। ব্রিজের মাঝামাঝি যেখানে নদীর জলটা পাথরের থামের চারদিকে পাক খাচ্ছিল, ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে সহিদ কাগজের বাণ্ডিটা ছাইরঙা রেলিংএর ওপর দিয়ে জোয়ারের তোলপাড় জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আমি বললাম, "কী মাথামুণ্ডু করছিস? পুলিশ জলে কাগজ ফেলার জন্যে আমাদের ধরবে না।"

তারপর কাফেতে ফিরে এলাম। কফি খেলাম। আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিলাম সেদিনকার ফুটবল খেলার ব্যাপারে। সেদিন দুপুর দুটোর পর ভ্যালেন্স রোডের মাঠে ওয়েস্ট কেয়ার টীম আর নবীন সঙ্ঘের মধ্যে খেলার কথা ছিল।

বেটী সিল্‌ভিয়ার সঙ্গে যখন কাফেতে এল আমরা নিজেদের কথার মধ্যে ডুবেছিলাম। বেটী সোজা আমাদের কাছে এল ওর দু-হাত ভর্ত্তি কাগজের বাণ্ডিল। বেটী জিজ্ঞাসা করেছিল "তোমাদের কাগজগুলো কোথায়? এত তাড়াতাড়ি কিছুতেই বিক্রি করতে পার না?" সহিদ ওর দিকে একটু তাকিয়ে কোন পাত্তা না-দিয়েই বলেছিল হ্যাঁ বাণ্ডিলটাই বিক্রি করে দিয়েছি।" বেটী বলেছিল "দারুণ ব্যাপার! আমরা তাহলে কালো লোকদের মনে বেশ একটা দাগ কেটেছি। 'এশিয়ান'দের নিয়ে তাহলে কাজ শুরু করা যাক।"

বেটী হাসল। তারপর বেটী আর সিলভিয়া নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল।

সহিদ হঠাৎ বুক পকেট থেকে মানিব্যাগটা টেনে বের করে গোটা দুয়েক পাউণ্ড নোট বেটীর দিকে তুলে ধরল। আর বলল, "তোমাকে তো আমার দাম দিতে হবে, কাগজগুলোর জন্যে।"

অনুবাদ: শিবানী রায়চৌধুরী

ভিক রীড

॥ কিশোর যোদ্ধা ॥

অনুবাদ :

সৌরীন ভট্টাচার্য

আনন্দ—৭

১

প্রশ্ন আর উত্তর

'টমি! এবার উঠে পড়্!' বাবার বাজখাই হাঁক শোনা গেলো।

টমির আধভাঙা ঘুম এবার পুরোপুরি ভেঙে গেলো। গাছের পাতার ভেতর দিয়ে আসা রোদের আলোর দিকে তাকালো সে। তড়াক ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠেই তার ছুরির খোঁজ করলো। ছুরি ছাড়া টমি কখনো ঘুমোতে যায় না। সে তো মেরুনের ছেলে। মেরুন লোকেরা কখনো তাদের ছুরি ছাড়া থাকে না।

'খোকা, উঠছিস?' আবার বাবার গলা।

'এই আসছি, বাবা।' টমি তাড়াতাড়ি জবাব দেয়।

এবার সে তাড়া করলো। আজ তার জীবনের এক মস্ত বড়ো দিন: আজ তার পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উৎরোতে পারলেই সে 'কিশোর যোদ্ধা' হবে। আজ তার জন্মদিনও বটে। আজ চোদ্দ বছর বয়স হ'লো টমির।

সে তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র টানটান ক'রে গুছিয়ে রাখলো। বাবার নিজের হাতে তৈরি করা তাদের এই ছোটো বাড়ি। মোট তিনখানা ঘর তাদের। এই ঘরটা টমির নিজের।

টমি ঘর থেকে বেরিয়েই পাহাড়ের পেছনে ঝিলের দিকে ছুটলো। চটপট জামাপ্যাণ্ট খুলে ঝুপ ক'রে জলে ঝাঁপ দিলো সে।

উঃ, কী ঠাণ্ডা জল! হাত-পা যেন দলা পাকিয়ে যাচ্ছে। বেশি স্নানের সময় নয় আজ। তাড়াতাড়ি উঠে এসে গা-হাত-পা মুছে নিলো ঘ'ষে-ঘ'ষে। আর অমনি বেশ শুকনো ও গরম-গরম লাগছে এখন। সব মেরুন ছেলেরা যেমন চওড়া ট্রাউজার পরে টমিও তাই প'রে নিলো। বুকের উপর দিয়ে বেল্ট ঝুলিয়ে দিলো, তাতে ছাগলের চামড়ার থলে বাঁধা। ঐ থলেয় তার ছুরিটাকে ঠিক খাপে-খাপে ঢুকিয়ে নিয়ে গ্রামের ভেতর ছুটলো টমি।

তাদের গ্রামের নাম পাহাড়চুড়ো। গ্রামের ঠিক মাঝখান ভেতর দিয়ে একটা পথ—তার দুধারে সারি-সারি কুঁড়ে ঘর। এই রাস্তার শেষে মিটিং ঘর।

এই মিটিং ঘর এতই বড়ো যে পাহাড়চুড়ো গ্রামের সব মেরুন এতে একসঙ্গে ধ'রে যায়।

বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হ'লো টমির। ওরাও সব গাঁয়ের মধ্যিখানে গিয়ে জড়ো হবার জন্যে দৌড়ুচ্ছে। সবাই অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে। ওরাও বোধহয় আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে-জেগে পরের দিনের পরীক্ষার কথা ভাবছিলো। সবাই ওরা পরীক্ষা পেরিয়ে কিশোর যোদ্ধা হবে।

গ্রামের মধ্যিখানে প্যারেড-গ্রাউণ্ড। মস্ত একটা খোলা জায়গা। মেরুনদের তীরধনুক খেলা, নাচগান সব এখানেই হয়।

ছেলেরা সব দৌড়ে প্যারেড-গ্রাউণ্ডে গিয়ে জড়ো হ'লো। টমি ছাড়া আরো চারজন ছিলো। ওরা সবাই প্রায় এক-বয়সী। চার্লি কেবল মাস ছয়েকের বড়ো। এ ছাড়া ছিলো ডেভিড আর ইউরিয়া, আর টমির প্রাণের বন্ধু জনি। ওদের চোখেমুখে এখন আর কোনো হালকা ভাব নেই। এই দিনটার গুরুত্ব কতখানি, তা ওরা বোঝে।

প্যারেড-গ্রাউণ্ডে ছেলেরা সব লাইন ক'রে দাঁড়ালো। এক মাথায় দাঁড়ালো চার্লি, অন্য মাথায় টমি। টমির ঠিক পরেই জনি।

সূর্য এখন গাছের মাথায়। গাঁয়ের লোকেরা সব প্যারেড-গ্রাউণ্ডের ধার দিয়ে-দিয়ে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো। মিটিং ঘরের বন্ধ দরজার দিকে যাবার মতো একটা পথের জায়গা খালি রইলো কেবল।

'টমি, ভয় পেয়েছিস ?' জনি ফিশফিশ ক'রে জিগেস করলো।

একটু ভেবে নিলো টমি।

'হ্যাঁ,' সে বললো, 'আর তুই ?'

'আমি তো ভালো তীরধনুক ছুঁড়তে পারি না। বাবা নিশ্চয়ই ভীষণ রাগ করবে।' জনি বললো।

'কিন্তু আরো তো অনেক জিনিস আছে। তুই তো সে-সব ভালো পারিস,' টমি বললো। 'দৌড়ে তো আমাদের মধ্যে তুইই সবচেয়ে ভালো।'

'কিন্তু আমি যদি তোর মতো তীরধনুক ছুঁড়তে পারতুম,' জনি বললো।

'আর আমি যদি তোর মতো দৌড়ুতে পারতুম,' টমি বললো।

মেরুন গাঁয়ের বড়োরা সব হাসছে আর নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলাবলি করছে। কিন্তু হঠাৎ সব চুপ হ'য়ে গেলো। আবেং-এর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

গোরুর শিঙ থেকে বানানো হয় এই আবেং। প্রথমে আওয়াজটা খুব নিচু ছিলো তারপর আস্তে-আস্তে জোর হ'তে লাগলো আবেং-এর আওয়াজ। সমস্ত মেরুনদের এক জায়গায় জড়ো করবার জন্য এই আবেং বাজানো হয়। বেশ কয়েক মাইল দূর থেকেও এর আওয়াজ শোনা যায়।

আবেং-এর শেষ ফুঁ বেজে গেলো। মিটিং ঘরের দরজা এবার খুললো। ঐ তো সর্দারকে দেখা যাচ্ছে।

সর্দারের চেহারা খুব লম্বা, ঘন কালো রং, বেশ সুপুরুষ। তাঁর পরনে শার্ট আর আঁটো ট্রাউজার। অত্যন্ত সবল দুই বাহু। ডান হাতে তাঁর বন্দুক, আর কাঁধের উপর বারুদভর্তি শিং। তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ দু-চোখ একবার বুলিয়ে নিলেন প্যারেড-গ্রাউণ্ডের উপর দিয়ে। গ্রামের অন্য বয়স্ক মানুষেরা সব সর্দারের পেছনে দাঁড়িয়ে।

সর্দার ও তাঁর সঙ্গীরা খোলা পথ দিয়ে প্যারেড-গ্রাউণ্ডে এগিয়ে এলেন। সর্দারের চোখ ঐ ছেলে পাঁচটির দিকে। টমি স্পষ্ট বুঝতে পারছে জনি তার পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

টমি ফিশফিশ ক'রে বললো, 'সাহস কর, জনি। তুই খুব ভালো করবি।' টমি নিজেও অবশ্য জনির মতোই কাঁপছিলো।

সর্দারের যদিও বয়েস হয়েছে তবুও তাঁকে এখনো বড়ো যোদ্ধার মতো দেখায়। ইংরেজ লালকোর্তাদের সঙ্গে তিনি বহু বছর যুদ্ধ লড়েছেন। এই গ্রামের লোকেরা যখন দল বেঁধে শিকারে যায়, তখন বিশ্রামের সময় আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশ ঘিরে ওঁর লড়াইয়ের গল্প এখনো ওদের মুখে-মুখে ফেরে।

সর্দার একটু-একটু ক'রে এগিয়ে এসে ছেলেদের থেকে ঠিক দশ ফুট দূরে থামলেন। চার্লির থেকে শুরু ক'রে তিনি প্রত্যেকের দিকে একে-একে চেয়ে দেখলেন। তারপর তিনি হাত উঁচু করলেন। প্যারেড-গ্রাউণ্ডের সবাই একসঙ্গে চুপ ক'রে গেলো।

তিনি বললেন, 'আমার মেরুন ভাই-বোনেরা! সব্বাইকে নমস্কার।'

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো: 'নমস্কার, সর্দার!'

'আজ আবার আমরা সবাই এখানে এক জরুরি কাজে মিলিত হয়েছি। আমাদের দেখে নিতে হবে যে আমাদের ছেলেদের মধ্যে কেউ "কিশোর যোদ্ধা" হবার মতো তৈরি হয়েছে কিনা।' সর্দার ব'লে চললেন। 'কিন্তু ওদের

শক্তিপরীক্ষার আগে যাচাই করতে হবে ওরা আমাদের ইতিহাসের কতটুকু জানে।'

সর্দার আবার ছেলেদের দিকে তাকালেন।

'তুমিই প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেবে।' ইউরিয়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি বললেন। 'ইউরিয়া, মেরুন কাদের বলে?'

'মেরুনরা হ'লো এক সাহসী জাত যারা তাদের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে।'

ভিড়ের মধ্যে সব লোক সহাস্যে হাততালি দিয়ে উঠলো। ইউরিয়ার বাবার মুখে মৃদু হাসি।

সর্দার ফিলিপ আবার ছেলেদের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ডাকলেন, 'চার্লি!'

ডাক শোনা মাত্র চার্লি লাফিয়ে উঠলো। এপাশে তাকালো। সকালের ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, তবু চার্লি ঘামছিলো। টমি বুঝতে পেরেছিলো চার্লি ভয় পেয়েছে।

'চার্লি, মেরুনরা কোথায় থাকে?' চার্লির মুখ একটু ফাঁক হ'লো কিন্তু কোনো আওয়াজ বেরোলো না। ওর বাবার মুখে রাগ ফুটে উঠছে।

'ভয় পেয়ো না,' সর্দার ফিলিপ অভয় দিলেন। 'বলো, বলো, কথা বলো।'

'প্-প্-পাহাড়ে', চার্লি বললো।

'হ্যাঁ, তা আমরা জানি; কিন্তু পাহাড়ের কোথায়?'

'এ্যা-এ্যা—আকম্পঙে আর ট্রে-ট্রে-ট্রেলনি শহরে,' চার্লি উত্তর দিলো।

'বলো, ব'লে যাও,' সর্দার ফিলিপ আদেশ দিলেন।

'আর ন্-ন্—নানি শহরে।' কাঁপতে-কাঁপতে কোনোমতে জবাব দিলো চার্লি।

'আর কোথাও থাকে না তারা?' সর্দার ফিলিপ জিগেস করলেন।

চার্লি কিছু বলতে পারলো না। ভিড়ের লোকেরা সব হেসে উঠলো।

'তুমি কোথায় থাকো? তুমি কি মেরুন নও?' সর্দার এবার ধমকের সুরে চীৎকার ক'রে উঠলেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও মেরুন।' চার্লি কোনোরকমে উত্তর দিলো।

'তবে তোমার গ্রামের নাম কী? কোথায় থাকো তুমি?'

'পাহাড়চুড়ো।'

'তাহ'লে?'

চার্লি এতক্ষণে কাঁদতে শুরু করেছে। অন্য ছেলেদের খারাপ লাগছে তার দশা দেখে। টমি এবার দেখলো সর্দার ফিলিপ তার দিকে তাকাচ্ছেন।

সর্দার হাঁকলেন, 'টমি!'

'বলুন,' টমি এত জোরে বললো কথাটা যে জমায়েতের সব লোকে আবার হেসে উঠলো।

'মেরুনরা পাহাড়ে থাকে কেন?' সর্দার প্রশ্ন করলেন।

'কারণ, যুদ্ধের সময়ে আমরা বনের গাছের মতো দেখতে হ'য়ে যাই।' টমি তাড়াতাড়ি ব'লে ফেললো।

'কী বলতে চাও, বুঝিয়ে বলো।'

'যুদ্ধের সময়ে আমাদের যোদ্ধারা তাদের গায়ে গাছের ছালের পোশাক পরে।' টমি উত্তর দিলো। এখন সে বুঝতে পারছে যে তার আর ভয় করছে না।

'তা গাছপালার পোশাক পরে কেন তারা?'

'কারণ, ইংরেজ লালকোর্তারা তাহ'লে তাদের আর দেখতে পাবে না। আমাদের যোদ্ধারা ঝোপঝাড়ের মতো দেখতে হ'য়ে যায়। যেহেতু আমরা সংখ্যায় কম, তাই যুদ্ধ জিততে আমাদের কৌশল করতে হয়।'

এবার লোকেরা হেসে-হেসে তাকে উৎসাহ দিলো। টমি দেখতে পেলো তার বাবাও হাসছেন, আর অন্যদের চেয়ে একটু জোরেই।

সর্দার ফিলিপ আবার হাত উঁচু করলেন, আর সবাই একসঙ্গে চুপ ক'রে গেলো। জনির দিকে তাকিয়ে উনি তাঁর হাতের বাজু উঁচু ক'রে দেখালেন। একটা সোনালি ফিতে রোদে চক্‌চক্ ক'রে উঠলো।

'আমার হাতের বাজুতে এটা কী, জনি?'

'স্পেনের রাজা আমাদের জনগণকে যে সোনার ফিতে উপহার দিয়েছিলেন এটা সেই ফিতে।' জনি উত্তর দিলো।

টমি নিজের মনে একটু হাসলো। তার বন্ধু যে মোটেই ভয় পায়নি এতে সে ভারি খুশি।

'স্পেনের রাজা এই সোনার ফিতে আমাদের কেন দিয়েছিলেন?'

'কারণ আমরা সত্যিকার জ্যামেকাবাসী হিশেবে আমাদের দেশপ্রেম দেখাতে পেরেছিলাম। আমরা আমাদের দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলাম।'

'কবে থেকে আমরা যুদ্ধ করতে শুরু করেছিলাম ?'

'১৬৫৫ সাল থেকে।'

'সে কতদিন আগে ?' সর্দার জিগেস করলেন।

'ঐ সময়ে যে-যোদ্ধা জন্মেছিলেন আজ তাঁর বয়স নিশ্চয়ই আশির বেশি।' জনি উত্তর দিলো।

সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো। সর্দার এবার ডেভিডের দিকে ফিরলেন।

'ডেভিড, তুমি বলো, ১৬৫৫ সালে কী হয়েছিলো ?'

ডেভিড সাধারণত গল্প বলতে ভালোবাসে। কিন্তু আজ যে তার কী হয়েছে। সে ভয়ের চোটে যেন দাঁড়িয়েও থাকতে পারছে না।

'ঐ – ঐ বছরে ইংরেজরা এই দ্বীপ স্প্যানিয়ার্ডদের কাছ থেকে জিতে নেয়। তারপর থেকে ইংরেজরাই হ'লো জ্যামেকার নতুন রাজা। কিন্তু মেরুনরা কখনো হার মানেনি এবং আর তারা কখনো এই দ্বীপ ছেড়ে অন্য-কোথাও যায়নি। কাজেই আমরাই সত্যিকার জ্যামেকান।' ডেভিড বললো।

'চমৎকার। চমৎকার!' মেরুনরা একসঙ্গে সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো। হাসতে-হাসতে মাটিতে পা ঠুকে তারা তারিফ জানালো।

সর্দার ফিলিপ হাত উঁচু ক'রে সবাইকে চুপ করতে ব'লে আবার চার্লির দিকে ফিরলেন।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কেউ একজন হেসে উঠলো। চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, তাঁর মুখের রেখাগুলো রাগে টান্‌টান্, চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি। সবাই অমনি চুপ।

'চার্লি!' খুব নরম গলায় তিনি শুরু করলেন। 'পাহাড়চুড়োর মেরুনদের কর্তব্য কী ?'

চার্লি উত্তর দেবার সময়ে শক্ত ক'রে তার দু-হাত শরীরের পাশে চেপে রাখলো। 'আ-আমাদের সর্দারকে আর তাঁর পরামর্শসভার সবাইকে মেনে চলা আর কখনো স্কাউটদের পেছনে রেখে এগিয়ে না-যাওয়া।'

'সর্দার আর পরামর্শসভাকে কেন মেনে চলতে হয় ?'

'কারণ তাঁরাই তো আইন তৈরি করেন। আর আইন মেনে না-চললে কোনো জাতিই বড়ো হ'তে পারে না।'

এবার মেরুনদের ভিড়ের মধ্যে একটু যেন প্রশংসার মৃদু গুঞ্জন শোনা

গেলো। চার্লি এ-প্রশ্নটার খুব লাগসই একটা জবাব দিয়েছে। এখন আর তারা চার্লিকে নিয়ে হাসছে না।

'আর স্কাউটদের পেছনে রেখে এগিয়ে যেতে নেই কেন?'

'কারণ, আমাদের গ্রাম পাহাড়ের ওপর খুব গোপন জায়গায় হ'লেও ইংরেজ লালকোর্তারা সবসময়েই আমাদের তল্লাশ করছে। আর তাই আমাদের স্কাউটরা দিনে-রাতে সবসময়ে তাদের নিজেদের জায়গায় চারদিকে নজর রাখছে। আর লালকোর্তাদের দেখা পেলেই তারা আমাদের সাবধান ক'রে দিচ্ছে।'

চার্লি শেষ করলে সবাই হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানালো। সে যে এবার আর ভয় পায়নি তাতে সবাই খুশি। এমনকি সর্দার ফিলিপও একটু-একটু হাসছেন।

'মেরুন ভাইবোনেরা! আমাদের প্রশ্নের পালা এবার শেষ হ'লো। আমরা এখন আনন্দ করতে পারি যে আমাদের ছেলেরা কেউ ফেল করেনি। আসুন, অন্যান্য পরীক্ষার জন্য মাঠ যতক্ষণ-না তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ একটু গানবাজনা শোনা যাক।'

ছেলেদের মা-বাবারা আর অন্য-সবাই তাদের নাম ধ'রে ডাকাডাকি করছে। সবার মধ্যেই একটা ফুর্তির ভাব। ছেলেরা কিন্তু শান্ত চুপচাপ হ'য়ে আছে। ভালো যোদ্ধার তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ ক'রে শান্ত হ'য়ে থাকবার কথা। যুদ্ধে কিংবা শিকারে ভালো যোদ্ধাকে তো কখনো-কখনো গাছের মতো স্থির হ'য়ে যেতে হয়।

গানবাজনার লোকেরা এবার প্যারেড-গ্রাউণ্ডে ঢুকলো। ড্রাম আর অন্যান্য বাজনা নিয়ে তারা মাঠে ঢুকে আস্তে-আস্তে বাজানো শুরু করলো। ওদের সংগীত এমনিতে বড়ো মিষ্টি, তবে মাঝে-মাঝেই বড়ো করুণ। গানবাজনা যখন চলছে তখন মেরুনদের কেউ-কেউ মাঠের একধারে পরীক্ষার জন্য টার্গেট বসাচ্ছে। বড়ো-বড়ো চারটে কাঠের মধ্যে বিভিন্ন আকারের ফুটো করা হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো ফুটোটা এত বড়ো যে মুঠো-করা হাত অনায়াসে তার মধ্যে দিয়ে গ'লে যাবে। আর সবচেয়ে ছোটোটা এতই ছোটো যে একটা তীরও বোধহয় তার মধ্যে দিয়ে গলবে না।

২

পরীক্ষা

সর্দার ফিলিপের হাতের ইঙ্গিতে গাইয়ের দল গানবাজনা বন্ধ ক'রে আস্তে-আস্তে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। পরামর্শসভার একজন ধনুক ও ছুঁচলো তীর হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে এলেন। সর্দার কথা বলতে আরম্ভ করলে সব একেবারে নিশ্চুপ হ'য়ে গেলো।

'তোমাদের প্রথম পরীক্ষা হবে তীর ছোঁড়া।' সর্দার বললেন। 'চার্লি, তুমিই সবার বড়ো, তুমি প্রথম ছুঁড়বে।'

ধুলোর মধ্যে একটা লাইন টানা হ'লো। চার্লি সেই পর্যন্ত এগিয়ে গেলো। তার পায়ের আঙুল লাইনটাকে একটু ছুঁয়ে আছে। পরামর্শসভার সদস্য তার হাতে তীরধনুক তুলে দিলেন। চার্লি ধনুকে তীর লাগালো। সে টার্গেটের দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে প্রথমে সবচেয়ে বড়ো ফুটোতে ছুঁড়তে হবে, পরে একে-একে অন্য সবগুলোতে।

তৈরি হ'য়ে নিয়ে চার্লি ধনুক তুলে তাক করলো। তীরটা যেন সোজা ছুটে গেলো টার্গেটের দিকে। ফুটোর ভিতর দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে গেলো। এপাশে-ওপাশে একটুও লাগলো না কোথাও।

তীরটা আবার তার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হ'লো। চার্লি একই ভাবে দ্বিতীয় আর তৃতীয় ফুটোর মধ্যে দিয়েও তীরটাকে পাঠিয়ে দিলো। এইবার সেই ছোট্ট ফুটোটা। তীরটা আবার হাওয়ায় ছুটে গেলো। কিন্তু এবার যখন তীর ফুটোটার মধ্যে দিয়ে গেলো আশেপাশের দু-একটা পালক খ'সে পড়লো। তবুও সবাই হাততালি দিলো। কিশোর যোদ্ধাদের মধ্যে কেবল-দু-একজনই মাত্র সব ফুটোর মধ্যে দিয়ে তীর চালাতে পারে। চার্লি যে-ফুটোটা ভালোভাবে পার করতে পারেনি, অনেকেই সেটা পারে না।

ডেভিড আর ইউরিয়াও প্রথম দুটো ফুটোর মধ্যে দিয়ে তীর ঠিকভাবে চালালো। ডেভিড তৃতীয়টা পারলো না, আর জনি আটকে গেলো শেষেরটাতে। এবার টমির পালা।

টমি তীরধনুক নেবার আগে নিজের প্যান্টে খুব ক'রে হাত ঘষে নিলো। তারপর ধনুকের তারে তীর লাগাতে-লাগাতে সে সারাক্ষণ চাঁদমারির দিকে

স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলো। এবার সে সোজা চাঁদমারির দিকে তীর ছুঁড়লো। বাঃ, চমৎকার! আরো দুবার টমি একই ভাবে তীর ছাড়লো। মেরুনরা নিজেদের মধ্যে ফিশফিশ করছে। টমি যেন ঠিক কোনো ওস্তাদ তীরন্দাজের মতোই তীর চালাচ্ছে। টমির বাবা যে ভালো তীরন্দাজ এটা ওরা জানতো, কিন্তু টমি যে এত ভালো তীরন্দাজি শিখেছে এটা ওদের জানা ছিলো না।

এখন বাকি কেবল সেই চতুর্থ ফোকরটা। এখান থেকে ওটাকে দেখাচ্ছে একটা ছোট্ট কালো দাগের মতো। ওর ভেতর দিয়ে তীর চালানো প্রায় অসম্ভব ব'লেই মনে হয়। কিন্তু টমি মেরুনের ছেলে, তাছাড়া বাবার হাতে ও জুৎসই তালিম পেয়েছে। ছোটো ফুটোর জন্যে তৈরি হবার সময়ে ও একবারও ফুটো থেকে চোখ সরায়নি।

টমি আস্তে-আস্তে ধনুকটাকে তুললো। ডান হাতে সে তার টানলো— যতক্ষণ-না ওর বুড়ো আঙুল কানের কাছে ছুঁয়ে যায়। ও বাঁ-চোখ বন্ধ ক'রে চাঁদমারির দিকে তাক করলো। তারপর দ্রুত ডান হাতের আঙুল ছেড়ে দিলো। তীর উড়ে গেলো বিদ্যুৎবেগে।

তীরটা যখন সোজা ফুটোর মধ্যে দিয়ে গ'লে গেলো মেরুনরা সবাই এক প্রচণ্ড চাৎকারে ফেটে পড়লো। কোনো কিশোর যোদ্ধাকে এভাবে তীর ছুঁড়তে ওরা অনেকেই ছাখেনি।

সর্দার ফিলিপ আবার হাত উঁচু করতেই সবাই চুপ ক'রে গেলো।

'এবার ছুরি ছোঁড়ার পরীক্ষা হবে।' সর্দার ঘোষণা করলেন। 'চাঁদমারি তৈরি করো।'

ছুরি নিয়ে দুটো পরীক্ষা ছিলো। প্রথম পরীক্ষায় ছুরি ছুঁড়তে হবে কাঠের চাঁদমারিতে। তার ঠিক মধ্যিখানে থাকবে একটা কালো দাগ। সবাই অধীর অপেক্ষায় তাকিয়ে আছে কে তার ছুরির ফলা ঐ কালো দাগে লাগাতে পারে। ছেলেদের পাঁচজনেই উৎরে গেলো। ওরা সবাই কালো দাগের ওপরেই ছুরি ছুঁড়তে পারলো।

দ্বিতীয় পরীক্ষা আরো শক্ত। একটা গোলাপজাম ছুঁড়ে দেওয়া হ'লো হাওয়ায়। ছেলেরা তাদের ছুরি ছুঁড়লো ঐ ফলের দিকে। চার্লি, ডেভিড এবং টমির ছুরিতে ফলের ছোটো-ছোটো টুকরো কেটে এলো। জনির ছুরি আদৌ ফলের গায়ে লাগলো না। কিন্তু ইউরিয়ার ছুরি একেবারে জামটার মাঝখানে গিয়ে বিঁধলো আর ফলটা ওর ছুরির ডগায় গাঁথা অবস্থায় মাটিতে এসে পড়লো।

'আমার চোখে যদি রোদ না-পড়তো তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে হারিয়ে দিতাম,' চার্লি বললো ইউরিয়াকে। ইউরিয়া ফিশফিশ ক'রে বললো, 'কিশোর যোদ্ধা হবে আর ছুরি ছোঁড়বার সময়ে চোখে রোদ পড়া ঠেকাতে পারবে না, তা তো হয় না।'

সর্দার ফিলিপ ওদের দিকে তাকালেন।

'পাথর ছোঁড়ার পরীক্ষার জন্য তৈরি হও,' উনি আদেশ দিলেন।

ছেলেরা তাদের ছাগল চামড়ার থলে থেকে ছুরিগুলো বার ক'রে মাটিতে নামিয়ে রাখলো। কোমরের বেলট খুললো। বেলটের দুই মাথা এক ক'রে ডান হাতে ধ'রে রাখলো ওরা। পরামর্শসভার একজন ওদের দিকে এগিয়ে এলেন। ও'র দু-হাত ভর্তি বড়ো-বড়ো পাথরের টুকরো। ছেলেদের প্রত্যেকে দুটো ক'রে পাথর তাদের বাঁ হাতে নিলো।

সর্দার ফিলিপ মাথা উঁচু ক'রে একবার চোখ বুলিয়ে একটা লম্বা গাছ পরীক্ষার জন্য ঠিক করেছিলেন। আঙুল দিয়ে গাছের ডগার দিকে দেখিয়ে বললেন, —'দ্যাখো, গাছের ডগায় ঐ ছোট্ট পল্লব। মনে করো ওটা একটা পাখি। দেখি কে ওটাকে পেড়ে আনতে পারো।'

প্রথম চেষ্টা করলো চার্লি। ডানহাতে সে ওর বেলটে ধরলো। বেলটের দু-মুখ ঘুরিয়ে যে-গোল করেছিলো তার ভেতরে নিচের দিকে পাথর রাখলো। তারপর বেলটটাকে বেশ ক'রে কয়েক পাক দোলালো। এইভাবে যখন দোলানি বেশ বেড়ে উঠেছে তখন একটা মুখ আলগা ক'রে ছেড়ে দিলো। পাথরের টুকরো সাঁ ক'রে ওপরে উঠে গেলো, কিন্তু পল্লবের গায়ে লাগলো না। প্রত্যেকেই চেষ্টা করলো পল্লবের গায়ে লাগাতে। ডেভিড প্রায় পেরে গিয়েছিলো। ওর ঢিল পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে-যেতে একটু ছুঁয়ে গেলো পল্লবটাকে।

মেরুনদের সব চোখেমুখে উৎকণ্ঠা। এরা সকলেই চাইছে যে ছেলেদের মধ্যে কেউ-একজন পারুক। কেউই না-পারলে সেটা কিন্তু খুব বাজে ব্যাপার হবে।

এবার শেষবারের মতো পাথর ছোঁড়বার পালা। গাছগুলো হাওয়ায় একটু একটু দুলছে। চার্লি ছুঁড়লো, কিন্তু পারলো না। পর-পর ডেভিড আর ইউরিয়াও চেষ্টা করলো, কিন্তু ওরাও পারলো না। এই সময়ের মধ্যে টমি কিন্তু একবারের জন্যেও তার চোখ গাছ থেকে সরিয়ে নেয়নি। দেখতে-দেখতে সে বুঝে ফেললো গাছটা ঠিক কখন সবচেয়ে বেশি হেলছে।

টমি ভাবলো, 'গাছটা কখন সোজা হয়, সেই অব্দি আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক সময় বুঝে ছুঁড়তে হবে ঢিলটা।'

তার পাশেই জনির বেলট ঘোরাবার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে টমি। বেলট দুলিয়ে ঢিল ছুঁড়ে দিলো জনি। ঢিল খুব কাছ দিয়ে গেলো বটে, কিন্তু ডালের গায়ে লাগলো না।

এবার তার ছাগলের চামড়ার বেলটের মধ্যে ঢিল পুরে নিলো টমি। সে প্রথমে খুব আস্তে দোলালোতার বেলট, আর অপলকে গাছটাকে দেখতে থাকলো। হাওয়ায় গাছ বেশ খানিকটা নুয়ে পড়লো। টমি অপেক্ষা করলো গাছ ঠিক কখন সোজা হ'তে শুরু করবে। গাছটা যখন সবে ফিরতে শুরু করেছে ঠিক সেই সময়ে টমি ঢিলটা ছুঁড়লো। সোঁ ক'রে উঠে গেলো তার পাথরের টুকরো। আর, বাঃ, একেবারে ডালের মধ্যিখানে গিয়ে লাগলো।

মেরুনরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'টমি! টমি!'—'টমির মতো টিপওয়ালা শিকারী থাকতে পাহাড়চুড়োর মানুষদের কখনো খিদেয় কষ্ট হবে না!'

সর্দার ফিলিপ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তোমরা যদি পরীক্ষা শেষ হ'তেই না-দাও, তাহ'লে আর ওকে শিকারী হ'তে হবে না কোনোদিন।'

'চুপ করো, সবাই চুপ! এবার আসছে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা।'

সর্দার ছেলেদের দিকে ফিরলেন। ওঁর মুখ এখনো খুব টান-টান দেখাচ্ছে। তবে ওরা বুঝতে পারছে উনি ভিতরে-ভিতরে খুব খুশি হয়েছেন।

'তোমরা সবাই সত্যিই খুব ভালো করেছো। তবে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা এখনো বাকি। তোমরা কি জানো সেটা কী? বলো দেখি, তোমাদের কী শেখানো হয়েছে।'

'মান-ইজ্জতের পরীক্ষা,' ছেলেরা সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললো।

'কেন? মান-ইজ্জতের কথা আসছে কেন?'

'কারণ, আমরা সবাই একটা ক'রে প্রতিশ্রুতি দেবো। আর মেরুন যোদ্ধারা কখনো তাদের কথার খেলাপ করে না।'

'কী প্রতিশ্রুতি দেবে তোমরা?' সর্দার জিগেস করলেন।

'আমরা এখান থেকে দৌড়ে লুক্‌আউট্ পাহাড় পর্যন্ত যাবো। ওখানে পাথরগুলো সব রক্তের মতো লাল। আমরা না-থেমে সবাই একটা ক'রে পাথর নেবো আর এক দৌড়ে আবার পাহাড়চুড়ো পর্যন্ত ফিরে আসবো। আর ফিরে না-আসা পর্যন্ত আমরা কেউ কিছু খাবোও না।'

'এখন কি তোমাদের খিদে পেয়েছে?' সর্দার জিগেস করলেন।

ঘুম থেকে ওঠবার পরে ওরা কেউ কিছু খায়নি। সর্দারের কথা শুনে ওদের খিদে আরো যেন চেতিয়ে উঠলো।

'হ্যাঁ, এখন আমাদের খিদে পেয়েছে বটে, তবে লুক্‌আউট্‌ পাহাড় থেকে ফিরে না-আসা পর্যন্ত কিছু খাবো না আমরা।' ওরা সবাই বললো।

সর্দার বললেন, 'বেশ কথা! তৈরি হও, আবেং-এর আওয়াজ শুনলেই তোমরা বেরিয়ে পড়বে।'

ওরা দূরে পুবের দিকে তাকালো। ওখানে লুক্‌আউট্‌ পাহাড়ের মাথায় সূর্যের আলো ঝলমল করছে। ঐ পাহাড়টার রং গোলাপি। আশে-পাশের সব পাহাড়ের চেয়ে উঁচু। গতবারের মেরুন যুদ্ধে ঐ পাহাড়ের চূড়ো থেকেই মেরুনরা ইংরেজ সৈন্যদের উপর নজর রেখেছিলো। তাই ওর নাম লুক্‌আউট্‌ পাহাড়। রোদের আলোয় পাহাড়টাকে সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছিলো। কিন্তু টমি এবং অন্যেরা সকলেই জানতো ঐ লুক্‌আউট্‌ পাহাড় পর্যন্ত যাওয়া ও ফিরে আসা কী নিদারুণ শক্ত ব্যাপার। ওদের যে ভয় করছিলো তা নয়, তবে বেজায় খিদে পাচ্ছিলো।

চারদিকে সব চুপচাপ। ছেলেরা অপেক্ষা করছিলো আবেং-এর প্রথম আওয়াজ শোনবার জন্যে। সর্দার ফিলিপ হাত নামালেন আর ছেলেরা দৌড়ে বেরিয়ে গেলো।

ওদের পাঁচজনের মধ্যে জনিই সবচেয়ে ভালো ছুটতে পারতো। গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে আসবার পরেই টমি খুব জোরে দৌড়ুতে আরম্ভ করলো, চার্লি তারও আগে-আগে। জনি টমিকে একটু ঠেকিয়ে রাখলো।

'আমার সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ো তো,' জনি ফিশফিশ ক'রে টমিকে বললো। 'চার্লি এতই জোরে দৌড়ুচ্ছে ও তো চট ক'রেই হাঁপিয়ে পড়বে।'

টমি তারপর থেকে জনির পাশে-পাশে দৌড়ুতে থাকলো। ডেভিড ও ইউরিয়া ওদের একটু আগে, তবে চার্লির মতো অত দূরে নয়।

প্রথম দিকে পথ ছিলো মসৃণ। ওরা লম্বা গাছের সারির মধ্যে দিয়ে দৌড়ুচ্ছিলো। পায়ের নিচে ঝরাপাতায় ঢাকা মাটি নরম-নরম ঠেকছে।

ওরা যখন শুরু করেছিলো তখন গাছের তলা ছিলো ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ। কিন্তু দৌড়ুতে-দৌড়ুতে গা আস্তে-আস্তে গরম হ'য়ে উঠলো। একটু পরেই ওরা বাইরে খোলা জায়গায় এসে পৌঁছুলো। চারদিকে ফলন্ত গাছ। টমি দিব্যি

পাকা ফলের গন্ধ পাচ্ছে নাকে। হলুদ আখে ভরা এক মাঠের মধ্যে দিয়ে ওরা দৌড়ুলো। পাহাড়চুড়োর লোকেরা অল্প পরেই এসে পড়বে আখ কাটবার জন্যে। বড়ো-বড়ো পাত্রে ঐ আখের রস সেদ্ধ হবে। সেদ্ধ রস ঠাণ্ডা হ'লে তার থেকে বানানো হবে চিনি।

পাকা তরতাজা আখ যখন ওরা মাঠে-মাঠে খেয়ে বেড়াতো সেই স্বাদ ছেলেদের মনে এলো। ভাবতে গিয়ে টমির মুখ জলে ভ'রে এলো। ও জনির দিকে তাকালো। জনিরও সেই একই অবস্থা।

'খাবার জিনিসের কথা ভাবা চলবে না এখন।' জনি বললো। টমিও মেনে নিলো।

'ক্লান্ত লাগছে?' জনি জিগেস করলো।

'না, এখনো তেমন-কিছু না।' টমি বললো। 'আমরা তো খুব আস্তে-আস্তে ছুটছি।'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। কিন্তু ফেরবার পথে আমরা ওদের পেছনে ফেলে যাবো।' জনি বললো।

'তুই ঠিক জানিস?' টমি জিগেস করলো। 'কিন্তু ততক্ষণে ওরা হয়তো আমাদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে থাকবে।'

'ডেভিড আর ইউরিয়া বেশ যাচ্ছে। তবে চার্লি বড্ড তাড়াতাড়ি ছুটছে,' জনি বললো।

দৌড়ুতে-দৌড়ুতে ওরা কিন্তু চোখ-কান খোলাই রাখছিলো। কারণ বনের মধ্যে বিপদ-আপদ তো আছেই। বন্য জন্তুর আক্রমণের ভয় রয়েছে, আর তাছাড়া সব মেরুনের মতোই লালকোর্তাদের দিকে ওদের নজর সবসময়ে সজাগ।

পথ আস্তে-আস্তে খাড়াই হ'য়ে উঠলো। পায়ের নিচের মাটি এখন আর তত নরম নয়। এখন মাটি পাহাড়ি এবং আলগা পাথরের নুড়িতে ছাওয়া সারা পথ। এর আগে অনেক মেরুনের পা ভেঙেছে এই পথে।

কিছুক্ষণ পরে টমি ও জনি ঝোপে ঢাকা একটা জায়গায় এসে পৌঁছুলো। ঝোপঝাড়গুলো কখনো-কখনো ওদের মাথা ছাড়িয়ে আরো উঁচু, বুক সমান তো সব জায়গাতেই। খোলা জায়গায় এসে পড়লেই মাথায় রোদ লাগছে দারুণ চড়া। টমি দেখলো যে পথের রঙ একটু-একটু গোলাপি হ'য়ে উঠছে। অর্থাৎ, ওরা লুকআউট্‌ পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পড়ছে।

একটু পরেই পথ এত খাড়া হ'য়ে উঠল যে আর দৌড়ুনো চলে না। ওরা কিছুটা পথ শুধু হেঁটেই পেরুলো। এবার ওরা একটা জায়গায় পৌছলো — চারধারে বেশ কিছু গাছ। জনি টমির কাঁধে হাত দিয়ে একটু খোঁচা দিলো। তুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলো এবং একেবারে চুপচাপ। ডান-দিককার ঝোপের মধ্যে থেকে যেন একটা আওয়াজ আসছে। ওরা কান পেতে শুনলো। বেলটের খোপ থেকে ছুরি বার ক'রে নিয়ে ওরা মাটিতে শুয়ে পড়লো। একটু-একটু ক'রে হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের দিকে এগিয়ে গেলো। ঝোপের কাছে পৌঁছে পাতার ফাঁক দিয়ে টমি ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলো। বিস্ময়ে ওর চোখ বড়ো-বড়ো হ'য়ে উঠলো।

জনির দিকে ফিরে ও ফিশফিশ ক'রে বললো, 'আয়, দেখে যা।'

জনিও হামাগুড়ি দিতে-দিতে চটপট ওর পাশে এসে পড়লো।

'এ কী! এ যে চার্লি!' জনি ফিশফিশিয়ে বললো। টমির মতো তারও একেবারে হতভম্ব দশা।

টমি তার নিজের ঠোঁটে আঙুল রাখলো, 'কিছু বলিসনে।'

চার্লি মাটির উপরে ব'সে ছিলো। ও খাচ্ছিলো আর ওর পাশে তখনো এত-এত ফলের গাদা প'ড়ে রয়েছে। ডেভিড আর ইউরিয়া অন্য পথ ধ'রে গেছে, তাই ওরা ওকে দেখতে পায়নি। টমি ও জনি একটু সময়ের জন্যে চার্লিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো। চার্লি সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে মাটিতে কী যেন খুঁজলো। ও একটা পাথরের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ভালো ক'রে নজর বুলিয়ে দেখলো। পাথরের টুকরোটা ভালো ক'রে মুছে-টুছে পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো। একটা গাছ থেকে কিছু ফল পেড়ে নিয়ে চার্লিও জায়গা ছেড়ে চললো। এ কী! ও যে লুক্‌আউট্ পাহাড়ের দিকে না-গিয়ে পাহাড়চুড়োর দিকে চললো, ।

'ও তো প্রতিজ্ঞা রাখলো না,' জনি বললো।

'শুধু তাই, নয়,' টমি ধীরে-ধীরে বললো। 'ও তো পাহাড় অব্দি না-গিয়েই পেছন ফিরলো।'

'সেইজন্যেই তো পাথরটা কুড়িয়ে নিলো। দেখলি না, পাথরটা লাল রঙের ছিলো, ঠিক যেন লুক্‌আউট্ পাহাড়ের পাথর,' টমি বললো।

'তা, আমরা তাহ'লে কী করবো?' জনি জিগেস করলো।

'জানি না,' টমি বললো। 'কিন্তু আমাদের এখুনি দৌড়ুতে হবে লুক্‌আউটের দিকে, বেশ খানিকটা দেরি তো হ'য়েই গেছে।'

ছেলেরা আবার দৌড় শুরু করলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই সামনে সেই বড়ো পাহাড় দেখা গেলো। ঐ পাহাড়ের চারপাশের মাটি-পাথরের রঙ সব লাল। ছেলেরা কেউ থামলো না, ওরা প্রত্যেকে একটা ক'রে পাথরের টুকরো তুলে নিয়েই আবার পাহাড়চুড়োর দিকে দৌড়ুলো।

ফিরতি পথে দৌড়োবার সময় ওরা চার্লির কথা ভাবছিলো। ওরা কেমন একটু ভয় পেলো, আবার খুব দুঃখও হ'লো ওদের। মেরুনছেলেরা যে এমনি ক'রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এ ওরা কখনো শোনেনি। ওদের তাহ'লে কী করা উচিত?

পাহাড় থেকে নিচে নামছে ব'লে এবার ওদের পক্ষে দৌড়ুনো সহজ হ'লো। টমি বুঝলো জনিই ঠিক বলেছে। যদিও ওর খিদে পেয়েছিলো আর ক্লান্ত লাগছিলো তবুও ও জানতো যে নিজেদের গ্রাম পর্যন্ত ও ঠিক দৌড়ুতে পারবে। গ্রাম থেকে মাইল খানেক দূরে ওরা ডেভিড ও ইউরিয়াকে ছাড়িয়ে গেলো। গ্রামের কাছাকাছি পৌছতেই শুনতে পেলো হৈ-হৈ আনন্দের ধ্বনি। বুঝলো কিসের আওয়াজ। চার্লি তো দৌড়ে জিতে গেছে, কাজেই তাকেই গ্রামের লোকেরা সবাই সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

টমি ও জনি যখন গ্রামে ঢুকলো ততক্ষণে চার্লি প্যারেড-গ্রাউণ্ডে পৌছে গেছে। ও তখন সর্দার ফিলিপের হাতে পাথরটা দিচ্ছে। একটু পরেই ডেভিড ও ইউরিয়াও এসে পৌছে গেলো। গ্রামের লোকেরা সবাই খুশি। ছেলেদের সবাই তো বেশ ভালো করেছে।

টমি সর্দারের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর মনে হ'লো যেন সর্দার একটু বেশি সময় ধ'রে চার্লির দিকে এবং পাথরের টুকরোটার দিকে লক্ষ ক'রে দেখছেন। কিন্তু একবার আবেং-এর শব্দ হ'তেই, সর্দার ফিলিপ ওঁর হাত তুললেন। সবাই চুপ ক'রে গেলো।

খুব উঁচু গলায় সর্দার বললেন, 'পরীক্ষা শেষ হ'লো। আজ থেকে এই পাচজনকে "কিশোর যোদ্ধা" হিশেবে মেরুনদের মধ্যে গণ্য করা হবে। এবং ওদের উনিশ বছর বয়েস পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলবে।'

মেরুনরা সব একসঙ্গে বিরাট এক চীৎকার ক'রে উঠলো।

গাইয়ে-বাজিয়ে যারা ছিলো তারা খুব ফুর্তির সুরে একটা গান বাজালো। সবাই হাত ঝাঁকিয়ে অভিনন্দন জানাবার জন্যে ওদের দিকে এগিয়ে এলো। ছেলেদের প্রত্যেকের বাবা হাতে ধনুক ও তূণ ভর্তি তীর নিয়ে দাঁড়িয়ে

আছেন। খুব সুন্দর ছাগলের চামড়ায় ঐ তূণ বানানো। পালিশের জন্ম চকচক্ করছে এখন।

টমির বাবা ওকে চুমো দিলেন। উনি ঐ নতুন তীর ধনুক ওকে উপহার দিলেন। টমি একটা তীর তুলে নিয়ে শূন্যে ধ'রে রইলো।

টমি বললো, 'সুন্দর জিনিস দিয়েছো, বাবা। ধনুকটা চমৎকার। আর তীরগুলো সোজা সাঁই-সাঁই ক'রে ছুটবে।'

বাবা হঠাৎ ভুরু কুঁচকে ছেলের দিকে চাইলেন।

'তোর কথায় মনে হচ্ছে তুই খুশি। কিন্তু গলার স্বরে যেন অন্যরকম লাগছে। কেন? কী, হয়েছে কী?'

'না, তেমন-কিছু না তো।'

'দৌড়ে সেরা হ'তে পারিসনি ব'লে খারাপ লাগছে? না কি ছুরি ছোঁড়ায় জিততে পারিসনি ব'লে?'

'আমি তো সবগুলোতে জিতবো ব'লে ভাবিনি কখনো।'

'কিন্তু তীর-ধনুক ছোঁড়ায় তো তুইই সবচেয়ে ভালো। ওটাও কি তুই জিতবি ব'লে ভাবিসনি?' বাবা জিগেস করলেন।

'ওটা বোধ হয় ভেবেছিলাম,' টমি বললো।

ছেলের কী হয়েছে ঠিক বোঝা গেলো না। টমি এত ভালো করেছে, অথচ একটা কী যেন হয়েছে ওর।

'ঠিক আছে, চল, বাড়ি যাই। তোর মা অপেক্ষা ক'রে আছেন। উনি এখন খেতে দেবেন তোকে। খাইয়ে-খাইয়ে আজ মোটা ক'রে দেবেন।'

বাবার কথায় টমি আরো বেশি ক'রে চার্লির কথা ভাবলো। কী যে করা উচিত ও কিছু ভেবে পাচ্ছেনা। চার্লির কথা ব'লে দেওয়া উচিত কিনা তাও বুঝতে পারছে না। চার্লি ওর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে এবং মেরুন জাতির পক্ষে সে একটা জঘন্য কলঙ্ক। কিন্তু এ-কথা ব'লে দিলে, সেটাও চার্লির পক্ষে হবে মারাত্মক। হয়তো ওকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবে, বা হয়তো একঘরে ক'রে রাখবে।

টমি বাড়িতে ফিরলে ওর মা মাথায় চুমো দিলেন। আনন্দে ওঁর চোখ দিয়ে তখন জল বেরোচ্ছে।

'খোকা, তুই খুব ভালো করেছিস। আমাদের সবার গর্ব তুই, খোকা। বড়ো হ'য়ে একদিন তুই বাবার মতো বড়ো যোদ্ধা হবি।'

টমি ভাবলো বোধহয় ঠিক এই সময়ে চার্লির মাও চার্লিকে এইসব কথাই বলছেন। চার্লির ব্যাপার ব'লে দিলে মা-বাবাও মনে আঘাত পাবেন।

'ভালো ক'রে খেয়ে নে,' টমির বাবা বললেন। 'আজই বিকেলে তুই আবার শিকারে যাবি।'

মেরুনদের মধ্যে এটা একটা প্রথা। 'কিশোর যোদ্ধা' হবার পরে ছেলেরা সবাই একসঙ্গে শিকারে যায়। জীবনে এই প্রথম ওরা বড়োদের বাদ দিয়ে শুধু নিজেরাই যাবে। এবং রাত্রেও বনের মধ্যে কাটাতে হবে ওদের।

টমির মা ওকে অনেক খাবার-দাবার দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুই যেন তার মুখে রুচতে চাইছে না। বাবা দেখছিলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না।

'খোকা, যা, এবার একটু বিশ্রাম ক'রে নে।' খাওয়া শেষ হ'তেই মা বললেন। 'পরে যখন শিকারে যাবি, তখন কিন্তু এটা পরবি।'

উনি ছেলেকে একটা নতুন জামা দিলেন। যোদ্ধারা যে-রকম জামা পরে, ঠিক সেইরকম। টমির খুব গর্ববোধ হ'লো। তবে এখন সে খুব ক্লান্ত। শিকারে যাবার আগে একটু বিশ্রামের দরকার। টমি বিছানায় গিয়ে শুতে না-শুতে ঘুমিয়ে পড়লো।

৩

মৃগয়া

টমির ঘুম ভাঙলো একেবারে বিকেল গড়িয়ে। এত খুশি লাগছে যে ওর গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করলো। একে সে এখন 'কিশোর যোদ্ধা', তাতে মা ওকে একটা নতুন জামা দিয়েছেন। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে ও বাইরে ছুটলো।

তখনও বেশ রোদ্দুর রয়েছে। আকাশে ছোটো-ছোটো হালকা মেঘের টুকরো। দেখাচ্ছিলো ঠিক ভেড়ার পালের মতো।

টমির মা একটা গাছের ছায়ায় ব'সে ছিলেন। উনি কাছে ডাকলেন। টমি ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'শিকারে যাবার জন্যে তৈরি ?' মা জিগেস করলেন।

'হ্যাঁ, এই তো। জনিরা সব কোথায় গেলো তাই দেখতে যাচ্ছি।'

মা বললেন, 'মনে রাখিস, এই প্রথম বাবাকে ছাড়া শিকারে যাচ্ছিস। বাবা যা-যা শিখিয়েছেন সব মনে থাকবে তো ?'

'থাকবে।'

'তোর জিনিসপত্র সব গুছিয়ে দিয়েছি। দরজার কাছে আছে।'

বুনো শুয়োরের চামড়ায় তৈরি সুন্দর একটা থলে ঘাসের উপরে প'ড়ে রয়েছে। থলের পাশে একটা জলের বোতল। আর তার ওপরে একটা ছবি —পাহাড়ের পেছন থেকে সূর্য উঠছে।

টমি খুশিতে ডগমগ হ'য়ে জিগেস করলো, 'এটা কি আমার জন্যে নাকি ?'

'হ্যাঁ,' মা হেসে বললেন, 'এ-ছবিও তোরই।'

টমি বুঝতে পারলো না কী বলতে হবে। সে এখন ঐ জলের বোতলের কথা ভাবছে। ঐ বোতলটাকে চিরকাল দরজার পেছনে ঝুলতে দেখেছে সে। তার ঠাকুর্দা যখন 'কিশোর যোদ্ধা' হয়েছিলেন তখন তাঁকে দেওয়া হয়েছিলো ঐ জলের বোতল।

মা এবার উঠে আস্তে-আস্তে টমির দিকে এগিয়ে এলেন। উনি ওঁর হাত রাখলেন টমির কাঁধে। 'এটাকে যত্ন ক'রে রাখিস, খোকা। এই যে

পাহাড়ের ছবি, এর মানে হ'লো গোটা পৃথিবী। আর এই সূর্য মানে তোর দাদু। এখন এর মানে তুই নিজে। এই পৃথিবীকে তুই আলো দিবি, ভালোবাসা দিবি, যাতে ক'রে তুই আছিস ব'লে পৃথিবী খুশি হ'য়ে ওঠে। দাদু এই জলের বোতলটা তোর বাবাকে দিয়েছিলেন, যখন উনি "কিশোর যোদ্ধা" হয়েছিলেন। আর আজ তোর বাবা এটা তোকে দিলেন।'

'কিন্তু আমি কী ক'রে পৃথিবীকে আলো দেবো?' টমি জিগেস করলো। 'এই পৃথিবী কী প্রকাণ্ড আর আমি তো মাত্র এইটুকু।'

'নিজের কাজ কর। অন্যদের প্রতি দয়ালু হ। কঠোর পরিশ্রম কর। তাতেই তোর জন্য পৃথিবী আরো সুন্দর হ'য়ে উঠবে।'

'হ্যাঁ, মা,' টমি বললো, 'আমি তোমার কথা বোঝবার জন্য খুব চেষ্টা করছি।'

'যা, এবার শিকারে বেরিয়ে পড়, মজা কর।'

টমি আস্তে-আস্তে দরজার দিকে এগোলো। ঐ ভারি থলেটা তুলে নিলো। নিজের বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিলো থলেটাকে। ভেতরে একবার তাকিয়ে দেখলো। মা ওকে প্রচুর পরিমাণে খাবার দিয়ে দিয়েছেন। একটু হেসে সে জলের বোতলটা তুলে নিলো। তারপর একে-একে নিলো তার ছুরি এবং তীরধনুক। মাকে 'আসি' ব'লে বেরিয়ে পড়লো। দৌড়ুলো জনিকে খুঁজে বার করার জন্য। একটু পরেই ছেলেরা সবাই এক জায়গায় এসে জড়ো হ'লো।

গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই জড়ো হয়েছে ওদের বিদায় জানাবার জন্যে। গানবাজনার দলের লোকেরাও আছে। সবাই চীৎকার ক'রে ওদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। 'যাত্রা শুভ হোক,' 'শিকারে সফল হও'—এইসব আওয়াজ চারদিক থেকে শোনা যাচ্ছে। ছেলেরা যাত্রা শুরু ক'রে দিলো।

সার বেঁধে, একজনের পেছনে আর-একজন, এইভাবে, ওরা বনের মধ্যে ঢুকলো। টমিই ওদের নেতা—কারণ, চারটে পরীক্ষার মধ্যে ও ছুটোতে জিতেছে। ওরা উত্তরের দিকে এগোলো। কারণ, দক্ষিণে ইংরেজদের শিবির, আর তাছাড়া এই দ্বীপের উত্তরের দিকটাই শিকারের পক্ষে ভালো।

ওরা যখন গ্রাম থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে, তখন টমি হাত উঁচু করলো। ছেলেরা সবাই চুপ ক'রে গেলো এবং মাটিতে ব'সে পড়লো।

বনের চারদিক শান্ত নিস্তব্ধ। ছেলেরা নিঃশব্দে ব'সে রইলো। ওরা জানতো যে পাখি ও অন্যান্য ছোটোখাটো জন্তুজানোয়ার আশপাশেই আছে। কিন্তু ঐ 'ক্ষুদ্র অরণ্যবাসীরা'ও এই শিকারীদের মতোই চুপচাপ।

বাবারা যেমন শিখিয়েছিলেন টমি ও তার বন্ধুরা ঠিক তেমনিই করছিলো। শিকারে গেলে মেরুনরা সবসময়েই কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থাকতো। ওদের ধারণা এতে ক'রে বন ওদের কিছুটা জানবার সুযোগ পায়। বনের পাখি এবং জন্তু-জানোয়ারেরা ওদের বন্ধু ব'লে ভাবতে পারে আর তাতে শিকারের সুবিধে হয়।

খরগোশ এবং বাচ্চা শুয়োর শিকারের সময় ওরা খুব চুপিসাড়ে চলাফেরা করছিলো। একটু শব্দ হ'লেই শিকার পালিয়ে যাবে। আবার পাখি ও অন্যান্য ছোটো জানোয়াররা যদি খুব চুপচাপ থাকে তাহ'লেও খরাগোশ ও বাচ্চা শুয়োর শিকারী এসেছে ব'লে বুঝে ফেলবে। ছেলেরা কিছুক্ষণ চুপচাপ ব'সে অপেক্ষা করলো।

একটু পরেই ঝোপের মধ্যে ছোটোখাটো আওয়াজ শুরু হ'লো। পাহাড়ের পেছন থেকে ছোটো জানোয়াররা বেরিয়ে আসছে, পাখিরা এগাছ থেকে ওগাছে ওড়াউড়ি করছে। সবকিছুই আবার যেন জেগে উঠেছে। আগের মতোই।

বন্ধুদের নিয়ে টমি উঠে দাঁড়ালো। ওরা খুব আস্তে-আস্তে একটু-একটু ক'রে হাঁটতে থাকলো। শুকনো পাতা এড়িয়ে চললো, নরম সবুজ ঘাসের ওপর পা ফেলে-ফেলে ওরা এগোচ্ছে। ওদের চলায় একটুও শব্দ হচ্ছে না।

পাহাড় টিলার উপর দিয়ে পথ বেয়ে-বেয়ে ওরা উঠলো। উঠতে হবে সেই উঁচু পর্যন্ত, যেখানে খরগোশদের বাসা। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে। সূর্য পাহাড়ের নিচে নেমে গেছে, হাওয়াও একটু-একটু ঠাণ্ডা হ'তে শুরু করেছে। মায়ের দেওয়া জামাটার কথা ভাবতে টমির ভালো লাগছে—তাছাড়া ও-যে একলা নয়, সেজন্যেও বেশ খুশি লাগছে। বনের বড়ো-বড়ো গাছের কাছে দাঁড়িয়ে টমির নিজেকে আরো ছোটো লাগলো। এবার অন্ধকার হ'য়ে এসেছে। কিন্তু পথ যে হারায়নি সেটা টমি বেশ বুঝতে পারছে। একটু পরেই ওরা গাছপালার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পাহাড় টিলার মধ্যে এসে পড়বে।

এক মহান মেরুন সর্দারের নামে নাম দেওয়া হয়েছে যে-পর্বতের, তারই চূড়ায় ঐসব ছোটো পাহাড়গুলো। সর্দার নেই আজ অনেক বছর হ'লো। ওঁর নাম ছিল হুয়ান দে বোলাস। উনি ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে অনেক লড়াই জিতেছিলেন। ওঁকেই সেই সোনার ফিতে দেওয়া হয়েছিলো যা এখন সর্দার ফিলিপের হাতে পরা।

যখন প্রায় অন্ধকার নেমে এসেছে তখন টমি আবার হাত তুললো।

'আমরা এখানে বিশ্রাম করবো,' টমি শান্ত গলায় বললো।

'আর খাওয়া-দাওয়া করবো,' ডেভিড বললো। ডেভিড সবসময়েই খাবার জন্যে প্রস্তুত।

'ঠিক,' ইউরিয়া বলল। 'আমরা কি এখন খেতে পারি, সর্দার ?'

ইউরিয়া যখন এ-সব বলছিলো তখন চার্লি কিন্তু হাসেনি। টমি ওদের সর্দার ব'লে চার্লি বেশ চটেছে।

'ও আবার কিসের সর্দার ?' চার্লি এবার ব'লেই ফেললো। 'ওর চেয়ে তো আমি বড়ো, আমি তোদের সবার চাইতেই বড়ো।'

'কিন্তু পরীক্ষায় ও আমাদের সবার চাইতে ভালো করেছে।' ডেভিড বললো। 'আর তাই তো ও আমাদের সর্দার।'

'কিন্তু লুকআউট পাহাড়ের সবচেয়ে শক্ত পরীক্ষায় তো আমিই জিতেছি,' চার্লি নাছোড়বান্দা।

টমির পাশেই বসেছিলো জনি। সে টমিকে একটু কনুইয়ের খোঁচা দিলো। টমি অবশ্য কিছুই বললো না।

'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা ওকে সর্দার না-হয় না-ই বললাম। নেতা ব'লে ডাকলেই হ'লো', ইউরিয়া বললো, 'কিন্তু আমার এখন খিদে পেয়েছে।'

'হ্যাঁ, ইউরিয়া, আমরা এবার খাবো,' টমি বললো।

ছেলেরা তাদের ব্যাগ থেকে খাবার বার ক'রে খেতে শুরু ক'রে দিলো। চারপাশে ছোটো-ছোটো জীবজন্তুর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। রাত এখন বেশ ঠাণ্ডা। কিশোর যোদ্ধারা হয়তো আগুন জ্বালাতো, কিন্তু তাদের বাবাদের নিষেধ আছে। ইংরেজ সৈন্যরা যে-কোনো মুহূর্তে পাহাড়ের মধ্যে এসে পড়তে পারে। যে মেরুন স্কাউটরা পাহাড়চুড়োর গ্রাম পাহারা দিতো ছেলেরা এখন তাদের ছাড়িয়ে এসেছে।

জনি ফিসফিস ক'রে টমিকে বললে, 'চাঁদ উঠছে।'

টমি উপরের দিকে তাকালো। গাছের ডগায় যেন রুপোলি রেখার ছোঁয়া লেগেছে। একটু পরেই আলো জোরালো হ'য়ে উঠলো। আকাশটা এখন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। টমির মনে পড়লো যে এখন কথকেরা গ্রামের রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরছে। কোথাও এক জায়গায় ব'সে পড়বে তারা। গ্রামের মেয়ে, পুরুষ ও কাচ্চা-বাচ্চারা এসে জড়ো হবে। পুরোনো দিনের সেই জমকালো মাকড়শা অ্যানান্সির উপকথা ব'লে যাবে একনাগাড়ে একটার পর, একটা।

ছোট্ট চালাক ব্রাদার অ্যানান্সির গল্প, দুষ্টু ব্রাদার টাকোমার গল্প, দয়ালু জোয়ান ব্রাদার বুল-এর এবং আরো কত!

ডেভিড, যে গল্প বলতে খুব ভালোবাসতো, হঠাৎ ফিসফিসিয়ে উঠলো, 'অনেক অনেক দিন আগে……'

ডেভিডের বন্ধুরা আরো কাছ ঘেঁষে ঘন হ'য়ে বসলো। চাঁদ আরো ওপরে উঠলো, বাতাস বইছে তিরতির ক'রে।

'অনেক, অনেক দিন আগে, ব্রাদার অ্যানান্সি তার গ্রাম ছেড়ে চললো। সে চলেছে এক দূর দেশে। হাঁটতে-হাঁটতে সে এসে পৌঁছলো এক রাজার বাড়ি। হেঁটে-হেঁটে সে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত। তাই সে রাজার বাড়ির ফটকে গিয়ে কড়া নাড়লো। কারুর সাড়া নেই। তখন তো রাত্তির। তাই দারোয়ানরাও ভয়ে সাড়াও দিচ্ছে না, ফটকও খুলছে না। কিন্তু ব্রাদার অ্যানান্সির গানের গলা ছিলো খুব সুন্দর। সে গান ধ'রে দিলো :

যখন দ্বারের পাশে
ক্লান্ত কোনো রুগী, না-হয়
গরিব লোক আসে,—
খোলো, দুয়ার খোলো—
সকল সময় লগ্ন শুভ,
দেরি হয়নি বোলো।

রাজা ছিলেন খুব দয়ালু লোক। অসুস্থ রোগী কিংবা গরিব লোককে ফটক থেকে ফিরিয়ে দিলে তিনি রেগে যাবেন। তাই দারোয়ানরা ভেতর থেকে অ্যানান্সিকে জিগেস করলো, "তুমি কে হে বাপু? অসুস্থ রোগী? না গরিব লোক?"

'অ্যানান্সিও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, "আমি এক অসুস্থ গরিব লোক।"

'দারোয়ানরা বললো, "দাঁড়াও রাজাকে ডেকে আনি।"

'একটু পরে দারোয়ানের পায়ের শব্দ শোনা গেলো। তার একটু পরে রাজার গলা পাওয়া গেলো, "তুমি কে? আর এত রাত্রে আমার প্রাসাদেই বা এসেছো কেন?"

'ব্রাদার অ্যানান্সি তার ছোট্ট গানটা আবার গাইলো। এই গরিব অসুস্থ লোকটির মিষ্টি গলা শুনে রাজার খুব দুঃখ হ'লো। রাজা সবে দারোয়ানকে ফটক খোলার কথা বলতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে—এমন সময়ে পেছনের ঝোপের

মধ্যে একটা কিসের আওয়াজ শুনতে পেলো ব্রাদার অ্যানান্সি। সে ফিরে তাকালো। এ কী! চাঁদের আলোর মধ্যে ও যে দুষ্টু ব্রাদার টাকোমা, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে! ফটক খোলা পেলেই ব্রাদার টাকোমা হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়বে আর রাজাকে খেয়ে ফেলবে। ব্রাদার অ্যানান্সি যে নিজের জন্যে ভয় পেয়েছে তা নয়। দয়ালু রাজাকে যে ব্রাদার টাকোমা মেরে ফেলবে এটা ওর মোটেই ভালো লাগছে না।

'তাই দারোয়ান যখন ফটক খুলতে যাচ্ছে তখন ব্রাদার অ্যানান্সি আবার জোরালো গলায় গেয়ে উঠলো,

না, না, দরজা খুলো না!
নইলে হবে বিষম দেরি,
কেউই রক্ষে পাবে না।
টাকোমা ঐ ঝোপে
দ্যাখো ওৎ পেতে রয় ব'সে,
দরজা খোলা দেখতে পেলে
ধাক্কা দেবে ক'ষে···
অলুক্ষুণে সময় কিনা,
হায়রে, অক্কা পাবো শেষে!'

ডেভিড মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকালো। তারপর আবার বলতে শুরু করলো, 'অ্যানান্সি কী বলতে চায় রাজা ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন। ওঁর লোকদের মধ্যে একজনকে বললেন ব্রাদার বুলের জন্য আবেং বাজাতে। জোয়ান, সদাশয় ব্রাদার বুল আবেং-এর শব্দ শুনে ঝোপ থেকে বেরিয়ে দৌড়ে সোজা রাজার প্রাসাদে চ'লে এলো। পালাতে পারার আগেই সে ব্রাদার টাকোমাকে পাকড়ে ফেললো। তারপর ওকে মেরে গবাগব খেয়ে ফেললো।'

একসঙ্গে সব ছেলেরা ফিসফিস ক'রে জিগেস করলো, 'তা ব্রাদার অ্যানান্সির কী হ'লো?'

ডেভিড ব'লে চললো, 'রাজা তাকে প্রাসাদের ভিতর নিয়ে গেলেন। তারপর ও যা খেতে চাইলো, যত ধনরত্ন চাইলো রাজা ওকে সব দিলেন। রাজা ব্রাদার অ্যানান্সির ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছেন। ওর খুব শীত করছিলো, খিদে পেয়েছিলো, তা সত্ত্বেও ও তো নিজের কথা আগে ভাবেনি।'

ডেভিডের গল্প ফুরোলে বন্ধুরা সবাই হেসে উঠলো।

৪

খরগোশের পাড়া

ছেলেরা আবার এগোবার জন্যে তৈরি হ'লো। ওদের থলেগুলোকে ওখানেই রেখে দিলো। ওরা এখন বেড়ালের মতো হেঁটে চললো—খরগোশের পাড়ায় এসে গেছে যে ওরা। হাওয়া কীভাবে বইছে লক্ষ রাখতে হবে। গর্তের মধ্যে থেকে খরগোশ ধরতে গেলে শিকারীকে খুব সতর্ক থাকতে হয়। শত্রু আছে কিনা বোঝবার জন্যে খরগোশেরা ওদের চোখ ও নাক দুই-ই কাজে লাগায়। তাই হাওয়ার উলটো দিকে থাকা দরকার। তাহ'লেই ওদের গায়ের গন্ধ হাওয়ায় অন্য দিকে ভেসে যাবে।

একটু পরেই একটা পরিষ্কার জায়গায় এসে পৌঁছুলো ওরা। অমনি টমি থেমে পড়লো।

'খরগোশদের কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা,' টমি বললো। 'আমাদের তীরধনুক সব ঠিক ক'রে রেখে তারপর আমাদের পরামর্শের কাজ শুরু হবে।'

'শুনলি সবাই!' চার্লি বললো, 'ওর মাথায় ঢুকে গিয়েছে যে ও সত্যিই সর্দার।'

'দরকার বুঝলে পরামর্শসভা করার অধিকার টমির আছে,' ইউরিয়া বললো, 'কারণ ওই তো আমাদের নেতা।'

'কিন্তু পরামর্শসভার তো কোনো দরকার নেই', চার্লি ব'লে চললো, 'কারণ, আমরা সবাই আগে খরগোশ শিকার করেছি আর কখন কী করতে হবে তা তো আমরা জানি।'

টমি উত্তর দিলো, 'ঠিক। কিন্তু এর আগে যা শিকার করেছি সে তো আমাদের বাবাদের সঙ্গে। আজ রাত্রেই আমরা প্রথম নিজেরা একলা, তাই আমাদের কী করা উচিত তা নিজেদেরই ভাবতে হবে। আমরা অনেক খরগোশ শিকার ক'রে গ্রামে ফিরতে চাই, যাতে সবাই বুঝতে পারে আমরা কত ভালো শিকারী। তাছাড়া আমরা যে কিশোর যোদ্ধা। তাই একটা পরামর্শ সভা দরকার যেখানে আমরা আলোচনা ক'রে নিতে পারি যে, সবচেয়ে ভালো ক'রে কীভাবে খরগোশ শিকার করা যায়।'

জনি, ডেভিড, ইউরিয়া সবাই টমির সঙ্গে একমত হ'লো ব'লে চার্লি বললো, 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

ছেলেরা সব কাছাকাছি গা ঘেঁষে দাঁড়ালো, ফিসফিস ক'রে কথা বললো।

'খরগোশ কী ক'রে শিকার করতে হয়, তা তো আমরা জানি,' টমি বললো। 'খরগোশেরা গর্ত থেকে বেরিয়ে গেলে ওদের গর্তের মধ্যে পাথরের টুকরো পুরে দিতে হয়। তাহ'লে ওরা ভয় পেয়ে তাড়াতাড়িতে ওদের গর্ত খুঁজে পাবে না। গর্ত বন্ধ করার আগে যেন খরগোশ ধরার চেষ্টা না-করি। প্রথমে আমাদের তীরধনুক ছুরি সব এখানে রেখে খরগোশদের আস্তানায় ঢুকবো আর ওদের গর্তগুলো খুঁজে বার করবো।'

'ওদের ধরতে শুরু করবো কখন?' ডেভিড জিগেস করলো।

'আমি তিনবার ব্যাঙ ডাকবো,' টমি উত্তর দিলো। 'আমার ব্যাঙ ডাকা শুনতে পেলে তোরা ফিরে এসে তীরধনুক নিবি।'

'কিন্তু আমাদের ছুরি এ-সব এখানে রেখে যেতে হবে কেন?' চার্লি প্রশ্ন তুললো।

'কারণ ওগুলো নিয়ে পাহাড়ের মধ্যে আমরা হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে পারবো না, শব্দ হবে,' টমি উত্তর দিলো।

চার্লি একটু রাগত ভাবেই বললো, 'তুই কি আমাদের বিশ্বাস করিস না?'

টমি কোনো উত্তর দিলো না, কিন্তু লুকআউট পাহাড়ের দৌড়-প্রতিযোগিতার কথা তার মনে প'ড়ে গেলো। অন্য কিশোর যোদ্ধাদের সে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করে, কিন্তু না, চার্লিকে না।

'ওঃ চার্লি, তুই বড্ড কথা বাড়াচ্ছিস,' ইউরিয়া বললো, 'আমরা জানি টমি কী বলতে চায়।'

'ঠিক আছে, টমি,' জনি বললো, 'তুই আমাদের আগে চল এবং কখন ধনুক রাখতে হবে ব'লে দিস।'

টমি আবার চলতে শুরু করলো, আর অন্য সবাই নিঃশব্দে ওর পেছন পেছন চললো। সামনে যখন একগাদা পাথরের চাঁই চোখে পড়লো তখন টমি ওর হাত উঁচু করলো, আবার নামিয়ে দিলো। সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেরা তাদের ধনুক মাটিতে নামিয়ে রাখলো। টমি ওর হাত টান-টান ক'রে কাঁধ পর্যন্ত তুললো, তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দুই হাত জোড়া লাগালো।

মেরুনদের মধ্যে এটা একটা শিকারের সংকেত। ছেলেরা এ-সংকেত জানতো। ওরা সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটু গেড়ে হাতের উপর ভর দিয়ে ব'সে পড়লো। টমি যখন ওর জোড়া লাগানো হাত ওপরে তুললো এবং তারপর হাতের জোড়া খুললো, ওরা একটু-একটু ক'রে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকলো।

টমি একেবারে মাটিতে ঘেঁষে রয়েছে এবং গুঁড়ি মেরে একটু-একটু ক'রে এগোচ্ছে। ওর দু-চোখ মাটিতে খরগোশের গর্ত খুঁজছে। একটু পরেই সে প্রথম গর্তটা দেখতে পেলো এবং পাথর চাপা দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করলো। ক্রমে-ক্রমে চারদিকে অনেক গর্ত দেখা গেলো। সবেমাত্র টমি পাথর দিয়ে একটা বড়ো গর্তের মুখ যেই বন্ধ করেছে অমনি সে তার প্রথম খরগোশ দেখতে পেলো। বেশ দিব্যি গোলগাল একটা খরগোশ, আর তার গায়ের লোম চাঁদের আলোয় এত সুন্দর ধূসর দেখাচ্ছে। খরগোশটা ব'সে ব'সে ওর ছোট্ট কানদুটো সামনে পেছনে আর নাকটাকে হাওয়ায় নাড়াচ্ছিলো। ও যেন হাওয়ায় কোনো গন্ধ খুঁজছে। এই যাঃ, খরগোশটা হঠাৎ যেন কোথায় উধাও হ'য়ে গেলো।

আবার চলতে শুরু করার আগে টমি একটু অপেক্ষা করলো। একটু পরেই গাছপালার জঙ্গল শুরু হ'লো। টমি বুঝলো যে ওরা খরগোশদের আস্তানা পার হ'য়ে এসে পড়েছে। ও তিনবার ব্যাঙ ডাকলো আর তাই শুনে ছেলেরা তাদের ধনুকের জন্য পেছন ফিরলো।

'আমরা আবার ভেতরে যাবো,' টমি বললো। 'আমরা প্রত্যেকে যে-যে হাতিয়ার সবচেয়ে ভালো চালাতে পারি তাই ব্যবহার করবো। ইউরিয়া আর চার্লি, তোরা ছুরি নে। ডেভিড, তুই শিকার করিস ঢিল ছুঁড়ে। জনি আর আমি ধনুক ছুঁড়বো।'

'আমিও কেন ধনুক ছুঁড়তে পারবো না?' চার্লি জিগেস করলো।

'কারণ, আমরা চাইনা যে তুই খরগোশের বদলে আমাদের গায়েই তার ছুঁড়িস,' হাসতে-হাসতে বললে ডেভিড।

ছেলেরা খুব চুপিসাড়ে এগোচ্ছিলো। মেরুনরা তো শিকারের উপরেই জীবনধারণ করতো আর পাহাড়চুড়োর মানুষেরা এই খরগোশ খাবে। তীর, ছুরি ও পাথর ছোঁড়ার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। ছেলেরা শিকারী হিশেবে সত্যিই ভালো। খরগোশ বেচারিরা প্রায় কেউই রেহাই পেলো না।

একটু পরে টমি আবার ব্যাঙ ডাকলো এবং সব ছেলেরা ওর কাছে চ'লে এলো। ওরা তখন হাঁপাচ্ছে, পাহাড়ের ওপর ওঠা-নামা করা বেশ পরিশ্রমের কাজ।

'এবার খরগোশগুলো সব জড়ো করা যাক, চল্, শিবিরে ফিরে যাই,' টমি বললো। 'চাঁদ ডুবে যাচ্ছে এবার। এখন যদি খরগোশ আসেও তাহ'লে আর দেখতে পাবো না।'

'হ্যাঁ, আর কাল সকালে খুব তাড়াতাড়ি শুরু করতে হবে আমাদের,' ইউরিয়া বললো।

ছেলেরা ওদের খরগোশ জড়ো ক'রে শিবিরে ফিরে এলো। ওরা যে সব থলে এনেছিলো খরগোশগুলোকে তার মধ্যে পুরে নিলো। তারপর গাছের ডালপাতা দিয়ে একটা বিরাট ঝোপের মতো বানালো। আর তার নিচে ওরা গুঁড়ি মেরে-মেরে ঢুকে গেলো। একটু পরেই ওদের গা গরম হ'য়ে এলো, আর আরামে ওদের চোখে ঘুম নেমে এলো।

৫

প্রালকোর্তারা

গাছের মধ্যে দিয়ে সকালের আলো ফুটতেই টমির ঘুম ভাঙলো। ওর পাশে জনিও নড়াচড়া করছিলো। অল্প পরে, একটু-একটু ক'রে অন্য কিশোর যোদ্ধারাও জেগে গেলো। ওদের মাথার আর মুখের চারপাশে পাতার ছাওয়া। এ ওর দিকে তাকিয়ে ওরা হাসলো।

হাসতে-হাসতে ওরা যে যার জিনিসপত্রও গোছাচ্ছিলো। ওরা পাহাড়ের আরো ভিতরে পিমেনটো সড়ক ব'লে একটা জায়গার দিকে যাবে। ওখানে পাখি শিকার হবে। সবাই যখন তৈরি হ'লো, টমি তখন আবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। এবার ওরা পুবের দিকে ফিরলো। ওদের খরগোশ-ভর্তি থলেগুলো পাতার নিচে রেখে পাথর চাপা দিয়ে ওরা চ'লে গেলো।

পিমেনটো সড়ক হ'লো গাছগাছালিতে ভর্তি একটা জায়গা। ওখানে খাবারের সন্ধানে নানারকম পাখি আসতো। যেতে-যেতে ছেলেরা হাতের নাগালে যে-সব গাছ পাচ্ছে তাদের ডালপালা ভাঙতে-ভাঙতে এগুচ্ছে। ঐ সব ডালপালা দিয়ে ওরা নিজেদের আপাদমস্তক মুড়ে নিলো। ওদের দেখাচ্ছিলো ঠিক যেন একেকটা চলন্ত গাছ। প্রত্যেকটি কিশোর যোদ্ধা গাছের ডাল-পালায় ঢাকা পড়েছে, কেবল ওদের হাতগুলো আলগা রয়েছে।

টমির সংকেত পাবামাত্র ছেলেরা সব আলাদা-আলাদা হ'য়ে গেলো। প্রত্যেকে যে যার পছন্দমতো কোনো জায়গা বেছে নিলো। চারদিকে সব নিস্তব্ধ, ছেলেরা চুপচাপ অপেক্ষা করছে। আস্তে-আস্তে পশ্চিম দিক থেকে দলে-দলে পাখিরা আসতে শুরু করলো। মেরুন ছেলেরা সূর্যের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়তে লাগলো। ওরা মুহুর্মুহু ধনুকে তীর পরাচ্ছে আর ছুঁড়ছে। কয়েকটা তীর ফসকালো বটে, তবে পাখিও মরলো বেশ অনেক। এবং মাটিতে-পড়া এ-সব পাখি পাহাড়চুড়ো গ্রামের রান্নার হাঁড়িতে যাবে।

পাখিগুলো কুড়োতে-কুড়োতে ছেলেরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করলো। শিকার ভালোই হয়েছে।

'মনে আছে গতবার বা তার আগের বার যখন কিশোর যোদ্ধারা শিকারে

বেরিয়েছিলো ?' ডেভিড জিগেস করলো। 'ওরা কিন্তু আমাদের মতো এতটা ভালো করতে পারেনি।'

'আমরা কিন্তু গর্ব ক'রে বলতে পারি,' ইউরিয়া বললো, 'গ্রামের লোকেরা অনেকদিন ধ'রে আমাদের খাবারই খাবে।'

'এবার আমাদের ফেরা উচিত,' টমি বললো। 'চলো, পাখিটাখি কুড়িয়ে নিয়ে এবার চলো।'

ছেলেরা পাখিগুলো কুড়োতে আরম্ভ করলো। অন্য ছেলেরা যখন কথা বলছিলো জনি ততক্ষণ চুপ ক'রে ছিলো। সে এবার ঘাড় একদিকে কাত করলো। যেন সে কিছু শুনছে।

'কী হ'লো, জনি ?' টমি জিগেস করলো।

'জানি না তো।' জনি বললো।

'তুমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছো ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' জনি বললো। ওর চোখ আধবোঁজা।

টমি জানতো যে জনির চোখ ও কান অন্য অনেক ছেলের চেয়ে বেশি সজাগ। তাই সে এক অদ্ভুত ধরনের বাঁশি বাজালো। আর ছেলেরা চুপচাপ পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়লো। টমি বিপদের সংকেত দিয়েছে। ও ওর হাত উঁচু করলো এবং ওরা সবাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলো।

জনি এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে দেখছে। একটু পরেই, বন্ধুরা দেখলো ও পুবের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ কিছু পাখি গাছ থেকে উড়ে বেরিয়ে এলো।

জনি ফিসফিসিয়ে একটিই শব্দ বললো, 'লোক।'

'কে ?' টমি জিগেস করলো।

'দেখা যাক,' জনি বললো।

একটু পরে ও যেন পশ্চিম দিক থেকে কিছু শুনতে পাচ্ছে মনে হ'লো। আরো-কিছু পাখি হঠাৎ গাছ থেকে উড়ে বেরিয়ে এলো।

'হ্যাঁ, ওদিকেও,' জনি বললো, 'লোক।' মেরুন তরুণেরা সব টমির দিকে ফিরলো। ওই তো তাদের নেতা। সত্যিই যদি বিপদ এসে থাকে তাহ'লে সে ব'লে দেবে কী করতে হবে।

সত্যিই যদি বনের মধ্যে অন্য লোক এসে থাকে, তবে সেটা ছেলেদের পক্ষে খুবই বিপদের কথা। এ-লোকেরা নিশ্চয়ই মেরুন নয়। মেরুনরা এত নিঃশব্দে চলাফেরা করে যে পাখিরাও তাদের অস্তিত্ব টের পায় না।

'টমি, আমরা কী করব এখন?' চার্লি ফিসফিস ক'রে জিগেস করলো। ও যেন ভয় পেয়েছে।

টমি ঠিক বুঝতে পারছে না কী করা উচিত হবে। দেশের ভেতরে তো সে কখনো শত্রু দ্যাখেনি। মেরুন ও লালকোর্তাদের যুদ্ধের কথা সে কেবল গল্প শুনেছে মাত্র। কিন্তু যুদ্ধ কী ক'রে করতে হয় এবং বনের মধ্যে কীভাবে চলতে হয় এ-সব বিষয়ে তো তাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তাই সে চার্লির দিকে চেয়ে অল্প-একটু হাসলো।

'কিছুটা স্কাউটিং করতে হবে আর কি,' টমি বললো।

'স্কাউটিং? কিন্তু আমরা পালিয়ে যাচ্ছি না কেন? আমরা তো ছোটো ছেলের দল! আর ওরা যদি সত্যিই ইংরেজ সৈন্য হয়, তাহ'লে আমরা তো ওদের সঙ্গে যুদ্ধে পেরে উঠবো না।' চার্লি প্রায় কাঁদো-কাঁদো স্বরে বললো।

'ওদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করতেই হবে টমি তো সে-কথা বলেনি,' ইউরিয়া বললো। 'ও বলেছে যে আমাদের একটু স্কাউটিং করা উচিত, তাহ'লেই বুঝতে পারবো ওরা কারা।'

'হ্যাঁ, ওদের পেছন-পেছন গিয়ে দেখার চেষ্টা করা উচিত,' ডেভিডও ওদের মতে মত দিলো। ও চার্লির দিকে তাকিয়ে বললো, 'চার্লি আর আমিই যাবো।'

'না, আমি বলছি আমাদের পালানো উচিত। আমাদের এখুনি পাহাড়চুড়োয় ফিরে গিয়ে ওদের জানানো দরকার।' চার্লি বললো।

'কী বলবো ওদের আমরা?' টমি জিগেস করলো। 'বলবো যে কিছু পাখি বনের ভিতর থেকে উড়ে আসছিলো, আর তাই দেখে আমরা দৌড়ে পালিয়ে এসেছি?'

'ওদের বোলো যে বনে ইংরেজ এসেছিলো,' চার্লি চীৎকার ক'রে বললো।

'কিন্তু সর্দার ফিলিপ জিগেস করবেন পাহাড়ের মধ্যে ক-জন ঢুকেছিলো,' টমি বললো। 'জানতে চাইবেন ওদের হাতে অস্ত্র ছিলো কিনা, বন্দুক ক'টা ছিলো। আর তা ছাড়া, আমরা তো জানিই না ওরা সত্যিই লালকোর্তার দল কিনা।'

'টমি, যদি স্কাউটিং করতে হয়, তাহ'লে কিন্তু এখনি শুরু করা দরকার,' জনি বললো।

'ঠিক আছে জনি, চলো,' টমি বললো। 'ডেভিড, তুমি আর আমি পুবের দিকে যাবো। জনি আর ইউরিয়া, তোমরা অন্য দিকে যাও।'

'আর আমি কী করবো ?' চার্লি জিগেস করলো।

'আমি তো ভেবেছিলাম যে তুমি পালিয়ে যাচ্ছো,' টমি বললো।

'আমি তো আর একলা যেতে পারবো না,' চার্লি বললো।

'তাহলে এখানে আমাদের জন্তে অপেক্ষা করো। যে-সব পাখি শিকার করা হয়েছে সেগুলোকে লুকিয়ে রেখো। দেখো যেন তীরটির মাটিতে প'ড়ে না থাকে। আর লোকেরা পার হ'য়ে না যাওয়া পর্যন্ত নিজেকে লুকিয়ে রেখো। ওরা যদি আমাদের বন্ধু হয় তা'হলে আমরা সঙ্কেত দেবো।'

অন্যান্য ছেলেরা চার্লিকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে এগিয়ে গেলো। টমি ও ডেভিড গেলো পুবের দিকে। একেবারে নিঃশব্দে ওরা এক গাছ থেকে আর-এক গাছের পিছনে একটু-একটু ক'রে এগিয়ে গেলো। পায়ের অাঙুলের ঠিক নিচে পায়ের তলার নরম অংশের উপরে ভর দিয়ে-দিয়ে ওরা হাঁটলো। এইভাবেই হাঁটতে শেখানো হয়েছে ওদের।

একটু দূর যাবার পর টমি ও ডেভিড কিছু একটা শোনবার জন্য থেমে দাঁড়ালো। শব্দ শুনতে পাচ্ছে। এ ওর দিকে তাকালো ওরা। যে-লোকেরা এগিয়ে আসছে তারা মেরুন হ'তে পারে না। ছেলেরা ওদের অস্ত্রের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, মাটিতে বুটের খটখট শব্দও পাওয়া যাচ্ছে।

'এ তো প্রায় ঘোড়ার আওয়াজের মতো,' ডেভিড ফিশফিশ ক'রে বললো। 'ওদের যদি শিকার ক'রে জীবনধারণ করতে হয়, তাহ'লে আর খাবার জোটাতে হবে না কোনদিন।'

টমি ইঙ্গিতে মাটির দিকে দেখালো। ওরা সঙ্গে-সঙ্গে একবারে উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়লো। এ ওর দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখলো। টমির গোড়ালির পিছন দিকে কিছুটা দেখা যাচ্ছিলো। ডেভিড তার উপর আরো-কিছু পাতা চাপা দিলো।

সোজা মাটি ঘেঁষে বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলো টমি। ডান দিকে সে একটা গাছের গুঁড়ি দেখতে পেলো। এক সারি পিঁপড়ে গাছটা বেয়ে উঠছে আবার ঘুরে নেমে আসছে। যখনই দুটো পিঁপড়ে পাশাপাশি পার হয় তখনই যেন একটু করে থেমে যায়। টমি জানতো যে ওরা গন্ধ শুঁকে-শুঁকে নিজেদের পথের নিশানা ঠিক রাখে। টমি নিজের আঙুল দিয়ে একটা ছোট্ট জায়গা একটু টিপে দিলো। প্রথম পিঁপড়ের দল যারা ওখানে এলো সব দলা পাকিয়ে থেমে গেলো। পরে আরো এক দল এলো। কেউ

কেউ থামলো, কেউ-কেউ এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে পড়লো। টমি হঠাৎ পিঁপড়ে দেখা বন্ধ করলো। বুটের শব্দ ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে।

প্রথম সৈন্যদের যখন দেখতে পেলো, তখন টমি সত্যি দারুণ ভয় পেয়ে গেলো। ওদের ঐ বুট দেখেই তার ভয়। বিরাট বড়ো-বড়ো বিশ্রী দেখতে বুট-গুলো, আর তার নিচে যাই পড়বে তাই গুঁড়িয়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। টমি সামনের লোকটিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলো। এই প্রথম সেই লাল কোট দেখা, যে লাল কোটের জন্য ওদের নাম 'লালকোর্তা'। সৈন্যটির মুখ সে দেখতে পায়নি, কিন্তু তার হাতে যে বন্দুক ছিলো সেটা টমি স্পষ্ট দেখেছে।

ওর পেছনে-পেছনে আরো অন্য সৈন্যরাও ছিলো। ওরা সবাই খুব আস্তে হাঁটছিলো। টমি বুঝলো স্কাউট হিসেবে ওরা এখনো তত পোক্ত নয়। কিন্তু হঠাৎ ডান হাতের একটা যন্ত্রণায় ওর চিন্তা সৈন্যদের থেকে স'রে গেলো। ও নিচু হ'য়ে তাকালো। দুটো পিঁপড়ে হাতের নিচের দিকে ঢুকেছে। ওদের চলবার পথ তো ভেঙে গেছে, তাই ওরা এখন এধার-ওধার এলোমেলো করছে।

টমি আরো-একবার তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করলো। ও ঘামতে শুরু করলো। কিন্তু নড়াচড়া করতে সাহস হচ্ছে না। লালকোর্তারা একজন দুজন ক'রে এখনো যাচ্ছে। এই ভাবে প্রায় আরো দু-মিনিট পিঁপড়েরা একটু একটু ক'রে টমির মাংস খুবলে খেলো, আর তাকে নিঃশব্দে শুয়ে থাকতে হ'লো।

শেষ সৈন্যটি চ'লে গেলে ডেভিড ওর দিকে তাকালো। টমির মুখের উপর এখনও বিন্দু-বিন্দু ঘাম। ওর মনে হ'লো টমি খুব ভয় পেয়েছে।

'কী, খুব ভয় পেয়েছিস নাকি?' ডেভিড ফিসফিস করে জিগেস করলো। টমি কোনো উত্তর দিলো না। বদলে, সে তার হাতখানা টেনে এনে ডেভিডকে দেখালো। একটা পিঁপড়ে প'ড়ে গেছে, কিন্তু আর-একটা তখনো কামড়ে ধ'রে রয়েছে। হাতের পিছন দিকটা ইতিমধ্যেই একটু ফুলতে শুরু করেছে।

'এ কী!' ডেভিড চমকে উঠলো। 'কখন হ'লো? যখন সৈন্যরা যাচ্ছিলো তখন নাকি?'

'হ্যাঁ,' টমি উত্তর দিলো। ডেভিড টমির হাতের উপর থেকে শেষ পিঁপড়ে-টাকে রগড়ে মাটিতে ফেলে দিলো। হাতের ব্যথাটাও অমনি একটু কমলো। খুশি হ'য়ে টমি হাসতে-হাসতে ডেভিডের দিকে তাকালো।

'দোষটা অবশ্য আমারই,' টমি বললো। কী ভাবে ও পিঁপড়ের সারির যাবার পথ নষ্ট করেছিলো সে-কথা ডেভিডকে বললো।

'ক'জন সৈন্য ছিলো ?' টমি জিগেস করলো।

ডেভিড ওর দুহাত দু-বার তুলে দেখালো। তার মানে কুড়িজন। ওরা কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলো যাতে সৈন্যরা চার্লিকে পার হ'য়ে যায়। একটু পরে ওরা চার্লির ব্যাঙ ডাকা শুনতে পেলো। উঠে, তাড়াতাড়ি ওরা চার্লির কাছে ফিরে গেলো। জনি আর ইউরিয়া ইতিমধ্যেই এসে গেছে।

চার্লি বলছিলো, 'ওরা প্রায় আমার গা ঘেঁষে যাচ্ছিলো। আমি প্রায় ওদের ছুঁয়ে ফেলতে পারতাম, কিন্তু ওরা তো অন্ধ ছিলো।'

'তীর এবং অন্যান্য জিনিস সব মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিলে তো ?' জনি জিগেস করলো।

'নিশ্চয়ই', চার্লি বললো।

'নিয়ে থাকলে ভালোই, কেননা একজন সৈন্য কিন্তু আবার ফিরে আসছে,' জনি বললো।

ছেলেরা আবার নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে গেলো। টমি জনির দিকে চেয়ে দেখলো ও তার মাথার পিছন দিয়ে অনেক দূরের দিকে দেখছে। টমিও সেইদিকে তাকালো। ওরা একজন লালকোর্তাকে দেখতে পেলো। ঐ পাশের পরিষ্কার জায়গায় সবে এসে দাঁড়িয়েছে সৈন্যটি। গাছের একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে সে। ওর হাতের বন্দুক একেবারে তৈরি। চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে। কিন্তু ওর চোখে তো গাছ ছাড়া কিছুই পড়ছে না। টমি ও তার দলের কিশোর যোদ্ধাদের তো ও দেখতেই পাচ্ছে না। কারণ ওরা তো গাছের ডালে নিজেদের ঢেকে নিয়েছে। তারপর সৈন্যটি তার হাতের কি যেন একটা জিনিসের দিকে তাকালো। এ কী! এ যে তীর!

সৈন্যটি নিজের মনেই বললো, 'এ নিশ্চই কোনো পুরনো তীর, এখানে তো কাছাকাছি লোকজন কাউকে দেখছি না।' ও আবার পিছন ফিরে ওর নিজের দলের দিকে এগিয়ে গেলো।

ইউরিয়া ঝট ক'রে চার্লির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

'তুমি না বললে যে সবকিছু তুলে নিয়েছো মাটি থেকে! তোমাকে আমরা কী মনে করি, জানো ? শুনতে চাও!'

চার্লি খুব লজ্জা পেলো।

'আমি সত্যিই দুঃখিত', চার্লি বললো। 'আমি সত্যিই ভেবেছিলাম যে সবগুলো তোলা হ'য়ে গেছে। যাক, কোনো ক্ষতি তো হয়নি।'

'নাঃ, ক্ষতি আর কী! আমরা সবাই মিলে ধরা পড়তে পারতাম, খতমও হ'তে পারতাম,' ডেভিড বললো। 'তোমাকে কেন কিশোর যোদ্ধা করা হয়েছিলো, বলতে পারো?'

'চুপ।' টমি শক্ত ভাবে বললো। চার্লির মুখের রেখায় সে যন্ত্রণার ছায়া দেখতে পেয়েছে। জনি আর সে তো জানতো যে চার্লি কী ভাবে কষ্ট পাচ্ছে। সে যে সবাইকে ঠকিয়েছে, নিজেই তা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

'ঠিক আছে। ভুল তো আমরা যে কেউই করতে পারতাম।' টমি বললো। 'কিন্তু এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের পাহাড়চুড়োয় ফিরে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি একটা পরামর্শসভা ক'রে নেওয়া যাক। চার্লি, তুমি কিছু বলতে চাও?'

চার্লি মাথা নেড়ে 'না' ব'লে দিলো। টমি অন্যান্যদের প্রত্যেকের দিকে তাকালো। যখন ইউরিয়ার সময় এলো সে বললো:

'এই পাখি এবং খরগোশগুলো আমাদের সংগ্রহ হয়েছে। এগুলোকে নিয়ে তো তাড়াতাড়ি চলা বেশ মুশকিল হবে!'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই। তাহলে, কী করা হবে?' টমি জিগেস করলো।

'আমাদের মধ্যে একজনের যাওয়া উচিত,' জনি বললো।

'জনি ঠিক বলেছে, কিন্তু আমি দু-জনকে পাঠাতে চাই। একলা পেলে যদি তার কিছু হয়,' টমি বললো।

'আর অন্যেরা পিছন-পিছন আস্তে-আস্তে যাবে, এই বলতে চাইছো তো?' ডেভিড বললো। 'আর তারাই পাখি আর খরগোশগুলো নিয়ে যাবে।'

'হুঁ', টমি বললো, 'সত্যিই যদি লালকোর্তারা গ্রাম আক্রমণ করে, তাহ'লে তো পাখি, খরগোশ আরো বেশি ক'রে লাগবে। কাজেই ওগুলো আমাদের নিতেই হবে।'

'কিন্তু ওরা তো আমাদের গ্রাম কিছুতেই খুঁজে পাবে না,' ইউরিয়া বললো।

'ওরা ন্যানি শহর খুঁজে পেয়েছিলো,' জনি শান্ত ভাবে বললো।

মেরুনদের ইতিহাসের এক অতি করুণ কাহিনী মনে প'ড়ে গেলো সবার। ন্যানি শহরও ছিলো পাহাড়ের উপর অনেক উঁচুতে, কিন্তু লালকোর্তারা ঠিক পাহাড় বেয়ে-বেয়ে উপরে উঠে গিয়েছিলো। লোকজনদের একেবারে হতবুদ্ধি ক'রে দিয়ে ওরা গোটা গ্রাম ধ্বংস ক'রে ফেলেছিলো। সেই থেকে

পাহাড়চুড়োর মতো গ্রাম থেকে পাহারার জন্য সবসময়ে স্কাউট পাঠানো হয়।

জনি টমিকে বললো, 'ইউরিয়া আর আমি যে সৈন্যদের দেখেছিলাম তাদের কাছে কিন্তু ঘুরন্ত বন্দুক ছিলো।'

ঘুরন্ত বন্দুক! সেইসব বড়ো বন্দুক, যেগুলো সামনে পিছনে এপাশে ওপাশে চারদিকে ঘোরানো যায়। ন্যানি শহর তো এই ঘুরন্ত বন্দুকেই ধ্বংস হয়েছিলো।

'কিন্তু পাহাড়চুড়োয় অত সুবিধে হবে না,' টমি বললো। 'আমাদের স্কাউটরা চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখছে। তবে স্কাউটরা যখন ওদের দেখতে পাবে তখন ওরা গ্রামের খুব কাছে গিয়ে পড়বে, এবং ওদের হাতে থাকবে সেই ঘুরন্ত বন্দুক। জনি আর আমি তো লালকোর্তাদের চেয়ে তাড়াতাড়ি যেতে পারবো। আমাদের স্কাউটরা লালকোর্তাদের দেখতে পাবার আগেই আমরা পাহাড়চুড়োয় পৌঁছে যাবো।'

'তুমি আর জনি যাচ্ছো?' ইউরিয়া জিগেস করলো। 'তার চেয়ে চার্লিকে সঙ্গে নাও না কেন? লুকআউট দৌড়ে ওই তো জিতেছিলো।'

টমি চার্লির চোখের দিকে তাকালো, কিন্তু চার্লি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো।

'চার্লি তোমাদের পাখি ও খরগোশগুলো ব'য়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে,' টমি বললো। 'জনির চাইতে ওর গায়ে জোর বেশি, কাজেই ও বেশি বোঝা বইতে পারবে। ঠিক না, চার্লি?' টমি ওকে জিগেস করলো।

চার্লি সঙ্গে-সঙ্গে রাজি হ'য়ে গেলো। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বোঝা বইবো।'

ডেভিড যেন একটু অবাক হ'য়ে তাকালো। 'এই প্রথম চার্লি একটা ভারি কাজ করতে রাজি হ'লো,' ডেভিড বললো।

'ও ঠিক আছে, ঠিক আছে,' টমি তাড়াতাড়ি বললো। 'এখুনি যেতে হবে আমাদের। তোমরা তো সবাই জানো খরগোশগুলো কোথায় আছে। গ্রামের কাছাকাছি গিয়ে খুব সাবধান হবে। লালকোর্তারা সাধারণতঃ খুব আওয়াজ-টাওয়াজ করে বটে, কিন্তু ওদের গায়ের মধ্যে গিয়ে প'ড়ো না যেন। খাওয়া দাওয়া বা কোনোকিছুর জন্য তো হঠাৎ কোথাও থেমে যেতে পারো। যাই হোক, খুব সাবধান।'

টমি আর জনি ওদের ধনুক খুলে অন্য ছেলেদের হাতে দিলো। ওদের তীরও ছেলেদের দিয়ে দিলো। ওদের হাতে এখন শুধু ছুরি। বন্ধুদের বিদায় জানিয়ে ওরা দৌড়ে বেরিয়ে গেলো।

৬

মেরুনদের পরিকল্পনা

টমি ও জনি এত জোরে এর আগে আর কখনো দৌড়োয়নি। লালকোর্তারা তাদের গ্রাম খুঁজে পাবার আগে সর্দার ফিলিপের হাতে কতটা সময় থাকবে তার ওপরেই সব কিছু নির্ভর করছে। তিনি হয়তো গ্রামের মহিলাদের এবং বাচ্চাদের অন্যত্র কোথাও পাঠিয়ে দেবেন। ছুটতে-ছুটতে জনি টমিকে একটা সাংঘাতিক কথা বললো। টমি যে সৈন্যদলকে দেখেছে তারা নাকি আসল দল নয়। জনি শ' খানেকের বেশি লোক এবং নিদেন পাঁচটা ঘুরন্ত বন্দুক দেখেছে।

ওরা অনেকটা ঘুরপথে দৌড়ুচ্ছিলো যাতে কোনো লালকোর্তার চোখে প'ড়ে না যায়। ফলে নিজেদের কোনো স্কাউটকেও ওরা দেখতে পায় নি। গ্রামের প্রায় কাছাকাছি এসে টমি বার দুয়েক পড়ো-পড়ো হয়েছিলো, তবে না-থেমে সে দৌড়েই চললো। জনি নিজের বেগ একটু কমিয়ে ওর সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ুলো।

ওরা ঠিক দুপুর বেলায় গ্রামের রাস্তায় এসে পৌছলো। গ্রামের একজন ওদের দেখতে পেয়ে আনন্দে চীৎকার ক'রে উঠলো। দেখতে-দেখতে অনেক লোক এসে জড়ো হ'লো, অনেক আনন্দধ্বনি হ'লো এবং ওদের একেবারে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে চললো সকলে। তারপর একটা গাছের ছায়ার নিচে ওদের নিয়ে নামালো। সেখানে ওরা সব খুলে বললো। মেরুনদের কয়েকজন তখুনি ছুটলো সর্দার ফিলিপকে খবরটা দেবার জন্য। একটু পরে আবেং-এ যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠলো, আর গ্রামের সব লোক চারদিক থেকে দৌড়ে এসে জড়ো হ'লো।

টমিও আবেং-এর আওয়াজ শুনেছিলো। সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই ওর মা ওকে চেপে ধ'রে বসিয়ে দিলেন।

'এটা খেয়ে নে, বাবা', মা বললেন। মা ওকে চা খাওয়াচ্ছিলেন। আখের রস দিয়ে মিষ্টি-করা চা। টমি সবটুকু খেয়ে ফেললো।

'এখন কেমন লাগছে রে?' মা জিগেস করলেন।

'অনেকটা ভালো,' টমি বললো। 'আমি সত্যিই এখন উঠে পড়তে পারি।'

'যাও এবার তাহ'লে সভার ঘরে যাও। সর্দার ফিলিপ তোমাকে ঠিক ঢুকতে দেবেন।'

হ্যাঁ, মা ঠিকই বলেছিলো। টমি দোরগোড়ায় এসে পৌঁছলে সভার একজন ওর জন্য দরজা খুলে দিলো।

'এই তো, তোমাকে ডাকতে সবে লোক যাচ্ছিলো,' লোকটি বললো, 'যাও, জনি ভেতরে আছে। সর্দার তোমাদের দুজনকেই চান। যাও, ভেতরে যাও তোমাদের সবার জন্য আমরা সত্যিই গর্বিত।'

একটা বড়ো ঠাণ্ডা ঘরের ভিতর দিয়ে ঢুকলো টমি। পরামর্শ পরিষদের সব লোক আর বড়ো যোদ্ধারা সবাই উপস্থিত আছেন। টমির বাবাও ঘরের মধ্যে কোথাও আছেন নিশ্চয়ই, তবে টমি ওঁকে খোঁজার চেষ্টা করলো না। সে সোজাসুজি সর্দার ফিলিপের দিকে তাকালো।

ঘরের শেষ প্রান্তে একটা ছোটো তক্তপোশের উপরে বসেছিলেন সর্দার। জনিকেও সেই একই তক্তপোশের উপরে বসে থাকতে দেখে টমি আনন্দে প্রায় লাফিয়েই উঠেছিলো। সে নিজে বসেছিলো সর্দারের পায়ের কাছে মেঝেতে। হঠাৎ শুনতে পেলো সর্দার টমির নাম ধ'রে ডাকছেন।

'টমি, উঠে এসে জনির সঙ্গে বোসো,' সর্দার ফিলিপ বললেন।

টমি তড়াক ক'রে এক লাফে তক্তপোশের উপরে উঠে বসলো। তার সবটা স্বপ্নের মতো লাগছে।

জনিকে খুব শান্ত দেখাচ্ছিলো। সে বললো, 'টমি, আমার পাশে এসে বোস।'

'তোর ভয় করছে না, জনি?' টমি ফিসফিস ক'রে জিগেস করলো।

'না,' জনি বললো। 'আমার বরং বনের মধ্যে ভয় করছিলো'

টমি ভাবলো, 'এ তো বড়ো আশ্চর্য! আমার এখনই ভয় করছে, আর জনির এখন একটুও ভয় হচ্ছে না। অথচ বনের মধ্যে আমার একটুও ভয় করে নি।'

সর্দার কথা বলতে শুরু করলেই টমি নিজের চিন্তা বন্ধ করলো।

'ক্যাপটেন ডিক, আপনি কি স্কাউটদের সংখ্যা বাড়িয়েছেন? পাহারা দেবার লোক কি আরো পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, সর্দার', ক্যাপটেন ডিক বললেন। 'আগে যেখানে একজন স্কাউট ছিলো এখন সেখানে তিনজন আছে। পাহারাদারের সংখ্যাও ঐ রকমই

বাড়ানো হয়েছে। সবচেয়ে উঁচু গাছে ওদের চড়ানো হয়েছে, এবং এক-একটা গাছ আমাদের পাহাড়চুড়ো থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। আর আমাদের স্কাউটরা আরো দূরে চ'লে গেছে। ওরা লালকোর্তাদের দেখার চেষ্টা করছে, খবর পেলেই তা আমাদের জানিয়ে দেবে।'

'ঠিক আছে,' সর্দার বললেন। 'যদি দরকার হয় তাহ'লে কিন্তু গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাবার জন্য আমাদের তৈরি থাকতে হবে। মেয়েরা যেটুকু জিনিসপত্র নিজেরা বইতে পারবে মাত্র সেইটুকুই যেন নেয়। আমাদের হয়তো খুব তাড়া-তাড়ি যেতে হ'তে পারে। এবার একটু যুদ্ধের ব্যাপারটা আলোচনা করা দরকার। টমি আর জনির কথা অনুসারে লালকোর্তারা সংখ্যায় প্রায় একশো কুড়িজন। ওদের হাতে আছে ছ-সাতটা ঘুরন্ত বন্দুক। আর আমাদের আছে মাত্র জন পঞ্চাশেক লোক। এর মধ্যে যাঁরা বৃদ্ধ হয়েছেন তাঁরা আছেন আর কিশোর যোদ্ধারাও আছে। অথচ আমাদের সাহায্য দরকার।'

'কিন্তু সাহায্য আসতে-আসতে হয়তো গ্রাম রক্ষা করার সময় আর পাওয়া যাবে না,' যোদ্ধাদের মধ্যে একজন বললো।

মেরুনদের মধ্যে অনেকে একসঙ্গে কথা বলতে শুরু ক'রে দিলো। মাঝে-মাঝে সর্দার এক-একজনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন। তখন সে-ই কথা বলছে, অন্যেরা চুপ ক'রে যাচ্ছে। এইভাবে আলোচনায় যুদ্ধের অনেক পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা হ'লো। কিন্তু কোনোটাতেই একমত হওয়া গেলো না।

'দয়া ক'রে…' জনি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু সর্দার ওর কথা শুনতে পেলেন না।

'সর্দার, দয়া ক'রে যদি একটু শোনেন,' জনি এবার জোরে চীৎকার ক'রে বললো।

বিস্ময়ে টমির চোখ বড়ো-বড়ো হয়ে উঠেছে। জনি করছে কী? সে কি কাউন্সিলের মিটিং-এ বক্তৃতা করবে না কি? ছেলেদের মধ্যে কাউকে এর আগে সেখানে বসতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

'সর্দার, দয়া করে', এবার জনি ভীষণ জোরে চীৎকার ক'রে বললো। আর সেই সঙ্গে জোরে সর্দারের পা চেপে ধরলো।

সর্দার রাগত ভাবে জনির দিকে তাকালেন। আর এবার টমি সত্যিই ভয় পেয়ে গেলো।

'সর্দার, দয়া ক'রে শুনুন। আমরা খরগোশগুলোকে যা করেছিলাম, আপনি লালকোর্তাদের তাই করছেন না কেন?' জনি ব'লে ফেললো।

সর্দার ফিলিপ হাত উঁচুতে তুললেন। সকলেই চুপ ক'রে গেলো। সবাই এখন জনির দিকে তাকিয়ে।

'তুমি কী বলতে চাও?' সর্দার জিগেস করলেন। 'খরগোশ ধরার মতো ইংরেজ সৈন্য ধরব কী ক'রে আমরা?'

'কাল রাত্রে টমি আর আমি খরগোশ ধরার জন্য একটা ভারি বুদ্ধি বার করেছিলাম,' জনি ব'লে চললো। 'আমরা ইংরেজদের বিরুদ্ধেও সেই একই বুদ্ধি কাজে লাগাতে পারি।'

সর্দার মাথা নাড়ালেন। ওঁর মুখ ভাঁজে-ভাঁজে শক্ত হ'য়ে উঠছে।

'ঠিক এই মুহূর্তে একজন কিশোর যোদ্ধা রসিকতা করবে এটা আমি ভাবিনি,' উনি বললেন।

'আমি রসিকতা করিনি, সর্দার,' জনি বললো।

এবার বন্ধুর হ'য়ে টমিও দুটো কথা বলবে ব'লে ঠিক করলো।

'জনি ঠাট্টা করছে না, সর্দার,' টমি বেশ জোর গলায় বললো। 'আমাদের মধ্যে ও-ই সবচেয়ে চালাক।'

সর্দার ঠিক বুঝতে পারছেন না ব্যাপারটা সত্যি কী দাঁড়াচ্ছে?

'বেশ জনি,' উনি অনুমতি দিলেন। 'বলো, তুমি কী বলতে চাও।'

'তবে সবাই শুনুন, গত রাত্রে আমরা বুঝেছিলাম যে খরগোশগুলোকে গর্তে ঢুকতে দিলে আমাদের চলবে না। তাই পাথর চাপা দিয়ে তাদের গর্তের মুখ আমরা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলাম। আর তাই খরগোশদের বাইরে রাত কাটাতে হয়েছিলো।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে সব তো আমরা জানি। কিন্তু লালকোর্তারা তো আর গর্তে ঢুকতে চাইবে না,' সর্দার ফিলিপ বললেন।

'না, তা চাইবে না। তবে তারা আমাদের গ্রামে ঢুকতে চেষ্টা করবে। কাজেই সেটা আমাদের বন্ধ করতেই হবে।'

টমি এতক্ষণে স্বস্তি বোধ করলো। ওর বন্ধু যে কী বলতে চায় সেটা এবার ও বুঝতে পারছে।

'হ্যাঁ, জনি ঠিক,' টমি চেঁচিয়ে উঠলো। 'আমরা ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাদের গ্রাম থেকে ওদের দূরে নিয়ে যাবো।'

'আর এইভাবে যখন ওদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সেই অবসরে আপনি সাহায্য চেয়ে পাঠাতে পারেন,' জনি ব'লে চললো।

একসঙ্গে একটা বিরাট আওয়াজ ক'রে উঠলো সকলে। লোকেরা সব লাফিয়ে উঠে ছেলেদের অভিনন্দন জানালো। সর্দারও ওদের দিকে হাসি-হাসি মুখে তাকালেন।

অবশেষে সর্দার ওঁর হাত তুললেন এবং গোলমাল থেমে গেলো।

'পরামর্শ পরিষদের সদস্য ও যোদ্ধারা,' সর্দার ব'লে চললেন, 'আজ আমরা যা শুনলাম তার অর্থ বুঝতে পারছেন আপনারা? দুই মেরুনের ছেলে বলছে যে আমরা লালকোর্তাদের খরগোশ বানাই না কেন?'

সভাঘরের সব লোক হেসে উঠলো। যোদ্ধাদের মধ্যে টমি ওর বাবাকেও দেখতে পেলো। ওঁর দু-চোখ গর্বে জ্বল জ্বল করছে। জনির বাবাকে দেখাচ্ছিলো আরো গর্বিত। ওঁর পাশে যে-সব যোদ্ধা বসেছিলো তারা ওঁর কাঁধে চাপড় দিয়ে দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছিলো। সর্দার ফিলিপ ওদের হাসবার জন্য কিছুটা সময় দিয়ে তারপর থামতে বললেন।

'ঠিক আছে, আপনারা তো সবই শুনলেন। আমাদের দুই কিশোর যোদ্ধা কী রকম মোক্ষম মতলব ফেঁদেছে। কিন্তু এইবার সবকিছু ঠিকঠাক করা দরকার। আমাদের তৈরি হ'তে হবে। প্রত্যেক ক্যাপটেনকে দেখতে হবে যে তাঁর লোকেরা যেন তৈরি থাকে। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো মরবে, কিন্তু মেরুনরা তো মরতে ভয় পায় না। আমরা আমাদের মান-ইজ্জত কখনো নষ্ট হ'তে দেবো না। আপনারা আপনাদের তরোয়াল ছুঁয়ে শপথ করুন।'

সব লোকেরা সমবেত চীৎকারে সভাঘরকে যেন কাঁপিয়ে দিলো। তারা সবাই একসঙ্গে তাদের তরোয়াল খুলে উঁচু ক'রে ধরলো।

যোদ্ধারা চীৎকার ক'রে বললো, 'মেরুনদের এই তরোয়ালের নামে শপথ।'

তারপর সবাই একসঙ্গে সভাঘর থেকে লাইন ক'রে বেরোলো, ওদের মধ্যে টমি জনিও ছিলো।

ছেলেরা ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছিলো। যোদ্ধাদের প্রস্তুতি দেখবার জন্যে তারা গিয়েছিলো। বড়ো-বড়ো তূণগুলো চটপট তীরে ভ'রে গেলো। বন্দুকগুলোকে পরিষ্কার ক'রে-ক'রে চকচকে ক'রে তোলা হ'লো। গ্রামের

কয়েকজন মহিলা রান্না করছিলেন। এই খাবার যোদ্ধারা সঙ্গে নিয়ে যাবে। আর এক কোণে, আগুন জেলে কয়েকজন যোদ্ধা মিলে বুলেট বানাচ্ছে। ইংরেজদের কাছ থেকেই পাওয়া সীসে দিয়ে এইসব বানানো হচ্ছে। পাত্রের মধ্যে রেখে এই সীসে ফোটানো হচ্ছে। পুরো ফুটন্ত অবস্থায় মাটির টুকরোর মধ্যে ও-গুলোকে ঢেলে ভর্তি করা হচ্ছে। মাটির টুকরোগুলোর চেহারা বুলেটের মতো। তারপর ঐ মাটির টুকরো ঠাণ্ডা জলের পাত্রে ডোবানো হচ্ছে যতক্ষণ না সীসেটা ঠাণ্ডা হয়। এরপর বুলেটগুলোকে পাতার উপরে রাখা হচ্ছে যাতে শক্ত হ'তে পারে।

এদের অধিকাংশ লোকদেরই বন্দুক ছিলো, তবে কয়েকজনকে নির্ভর করতেই হচ্ছে ধনুকের উপরে। এরা শত্রুদের খুব কাছে চ'লে যায় এবং গাছের ভিতর থেকে তীর ছোঁড়ে। মেরুনদের প্রত্যেকেরই টিপ প্রায় নিখুঁত। কী ধনুক, কী বন্দুক, তাদের লক্ষ্য বড়ো-একটা ফসকায় না।

জনি কোথায় যেন চ'লে গেলো। টমি ওকে খোঁজবার জন্য রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে এমন সময়ে কে যেন ওর নাম ধ'রে ডাকছে শুনতে পেলো। ও পেছন ফিরে দেখলো একজন যোদ্ধা।

'টমি,' যোদ্ধাটি বললেন, 'সর্দার তোমাকে সভা-ঘরে যেতে বলেছেন, তোমাকে আর জনিকে।'

'আমি তো জনিকেই খুঁজছি', টমি বললো।

'ওকে আমি দেখছি, তুমি সর্দারের কাছে যাও,' যোদ্ধা বললেন।

টমি আর জনি একই সঙ্গে সভা-ঘরে এসে হাজির। ওরা দুজনেই অবাক হ'য়ে এ ওর দিকে তাকাচ্ছে। কিছুই বুঝতে পারছে না সর্দার কেন ওদের ডেকেছেন। এখন শুধু পরামর্শ পরিষদের সদস্যেরাই সর্দার ফিলিপের সঙ্গে রয়েছেন। ছেলেরা ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

'এই-যে, টমি আর জনি', সর্দার বললেন, 'তোমরা কি আবার বনের মধ্যে যেতে ভয় পাবে?'

'না, কখনোই না', দুজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললো।

'অন্য মেরুনদের কাছ থেকে আমাদের সাহায্য পেতেই হবে,' সর্দার বললেন। 'কিন্তু গ্রাম থেকে আর-কাউকে আমি এখন পাঠাতে পারছি না। যোদ্ধাদের সবাইকেই এখন এখানে থাকতে হবে। তোমরা দু'জন কি যেতে রাজি আছো? মনে রেখো, কাজটা বিপজ্জনক।'

'নিশ্চয়ই যাবো,' ছেলে দুটি সমস্বরে ব'লে উঠলো।

'শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্র কিন্তু শত্রুরা আরো সাবধান হ'য়ে যাবে,' সর্দার ফিলিপ বললেন। 'তোমাদের কিন্তু খুব বুদ্ধি ক'রে, সাহসে ভর ক'রে ওদের চোখ এড়িয়ে যেতে হবে।'

'আপনি কোথায় পাঠাচ্ছেন আমাদের?' টমি জিগেস করলো।

'পশ্চিমের পাহাড়ে আর-একদল মেরুন আছে, তোমরা সেখানে যাবে,' সর্দার বললেন।

তারপর যে-নদী পার হ'য়ে যেতে হবে উনি তার কথা বললেন। দুই পাহাড়ের মাঝখানে যে বিশেষ ক'রে সাবধান হ'তে হবে তাও বললেন। কারণ লালকোর্তারা ঐসব জায়গাতেই বিশ্রাম করে। তাছাড়া পাহাড়ের উপত্যকায় আখের ক্ষেতের মধ্যেও লালকোর্তা সৈন্যরা থাকতে পারে।

এইসব ব'লে সর্দার ফিলিপ ওঁর হাত তুললেন। যে-যোদ্ধা আবেং-এ ফুঁ দিচ্ছিলেন তিনি এগিয়ে এলেন।

'তোমরা পাহাড়ের ভিতর ঢুকে গেলে জানবে যে মেরুনদের দেশে পৌঁছে গেছো।' কিন্তু না-ডাকলে তোমরা ওদের হয়তো আদৌ দেখতে পাবে না।' সর্দার ফিলিপ ব'লে চললেন। 'আর সেইজন্যে কীভাবে আবেং বাজাতে হবে তা তোমাদের শিখিয়ে দেওয়া হবে। সেইভাবে বাজালে তোমাদের বন্ধু মেরুনরা ঠিক বেরিয়ে আসবে। তখন তাদের বলবে যে, আমি সাহায্যের জন্যে তোমাদের পাঠিয়েছি। ওদের নাম হ'লো মোচো মেরুন, আর ওদের সর্দারের নাম জেম্‌স্।'

বিকেলের দিকে চার্লি, ডেভিড আর ইউরিয়া পাখি ও খরগোশগুলো নিয়ে গ্রামে এসে পৌঁছুলো। টমি আর জনি যে আবেং বাজাতে শিখছে এ দেখে ওরা একেবারে অবাক। ফুঁ দিতে গেলে ওদের দেখাচ্ছিলো ঠিক যেন দুটো বাচ্চা শুয়োর। আর তাই দেখে বন্ধুরা সব হেসে গড়াগড়ি। কিন্তু শেষমেষ চেষ্টা ক'রে ওরা আবেং-এ সাহায্যের ফুঁ দিতে শিখে ফেললো।

রাত্রের মধ্যেই গোটা গ্রাম যুদ্ধের জন্যে তৈরি হ'য়ে নিলো। স্কাউটরা নাকি শত্রুসৈন্যকে দেখতে পেয়েছে ব'লে খবর এসেছে ইতিমধ্যে। লালকোর্তারা অবশ্য জানতেও পারেনি যে তাদের দেখা গেছে।

ঐদিন সন্ধ্যের বেশ অনেক পরে একজন যোদ্ধা টমি আর জনিকে ক্যাপটেন ডিকের কাছে নিয়ে গেলো। উনিই যুদ্ধের নেতা।

'এইমাত্র স্কাউটদের কাছ থেকে একটা খারাপ সংবাদ পেয়েছি আমরা,' উনি বললেন। 'লালকোর্তারা পাহাড়ের মধ্যে চতুর্দিকে এতই ছড়িয়ে রয়েছে যে তোমাদের দুজনকে আমরা একলা ছাড়তে পারি না।'

'ক্যাপ্টেন ডিক, আমরা ঠিক চ'লে যেতে পারবো,' টমি বেশ জোর দিয়ে বললো।

ক্যাপ্টেন ডিক হাসলেন। 'কিন্তু আমরা তো কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না, টমি। তোমাদের যদি ওরা ধ'রে ফ্যালে তাহ'লে তো আমরা যে সাহায্য চাইছি তা কোনোদিনই পাবো না।'

'আপনি কি আমাদের যেতে দেবেন না বলছেন?' জনি জিগেস করলো।

'তোমরাই যাবে,' ক্যাপটেন ডিক বললেন। 'কিন্তু তোমাদের আমরা ইংলিশ লাইনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবো।'

'ইংলিশ লাইনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাবেন?'

'হ্যাঁ, এখন যাও, তৈরি হ'য়ে নাও।' আবেং বাজলে আমরা বেরিয়ে পড়বো।'

ছেলেরা যে যার বাড়িতে ফিরে গেলো। টমির বাবা ওর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। টমি দেখলো বাবা যুদ্ধের সাজে তৈরি।

টমির মা দু-হাত বাড়িয়ে ওকে ডাকলেন। সে মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

মা দু-হাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধ'রে বলতে লাগলেন, 'আমি জানি, বাবা, যে তুই তোর বাবার মতোই যুদ্ধে যাবার জন্যে তৈরি।'।

'ক্যাপটেন ডিক কি তোমাকে কিছু বলেছেন?' বাবা জিগেস করলেন।

টমি বললো, 'হ্যাঁ, তুমিও কি যাবে নাকি বাবা?'

'আমি যোদ্ধাদের সঙ্গে উত্তরের দিকে যাবো। তোমরা যাবে পশ্চিমের দিকে। ভয় পেয়ো না, ক্যাপটেন ডিক তোমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

'আমি ভয়ের কথা বলছি না, তবে তুমি আমাদের সঙ্গে গেলে বেশ হ'তো,' টমি বললো।

'টমি,' বাবা বলে চললেন, 'তোমাকে সবেমাত্র কিশোর বাহিনীতে নেওয়া হয়েছে এবং এই যে-সম্মান তোমাকে দেওয়া হচ্ছে তা কিন্তু খুবই বড়ো সম্মান। কিন্তু মনে রেখো, তুমি কী ভাবে কী করছ তা কিন্তু মেরুন লোকেদের পক্ষে খুব জরুরি ব্যাপার। শুধু আমাদের পাহাড়চুড়োর মেরুনদের জন্যে নয়, সব মেরুনদের জন্যেই!

'ভবিষ্যতে আমাদের কথকেরা তোমার আর জনির গল্প সবাইকে শোনাবে,' মা বললেন, 'ছেলেমেয়েরা সব জ্যোৎস্নার আলোয় ব'সে কথকের মুখে শুনবে টমি আর জনি নামে দুই সাহসী কিশোর বীর যোদ্ধার কথা। কাজেই আজ রাতে তোমাকে সাহসী হ'তে হবে, বাবা।'

'ওর সাহস ঠিকই থাকবে,' বাবা বললেন। 'মার কাছে কাজ সারা হ'লে রাস্তার আগুনের ধারে এসো। তোমাকে তৈরি ক'রে দিতে হবে।'

মার কাছ থেকে বেরিয়ে টমি তাড়াতাড়ি আগুনের ধারে চ'লে গেলো। ওর তখন জানতে ইচ্ছে হচ্ছে কী ক'রে ওকে তৈরি করা হবে। জনিও তার বাবার সঙ্গে ইতিমধ্যেই সেখানে এসে গেছে। হাতে একটা পাত্র নিয়ে এক বৃদ্ধ যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন। টমি ও জনি দুজনকেই জামা খুলে ফেলতে বলা হ'লো। ওদের বাবারা তখন ঐ পাত্র থেকে কিছুটা ক'রে মলমের মতো কী একটা জিনিস নিয়ে ওদের বুকে ঘ'ষে ঘ'ষে লাগিয়ে দিলেন। খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে।

'গাছগাছড়া থেকে তৈরি এই মালিশ,' বৃদ্ধ যোদ্ধা বললেন। 'এই মালিশের জন্য তোমাদের গা থেকে গাছের গন্ধ বেরোবে, আর তাই লাল-কোর্তারা সহজে তোমাদের খুঁজে পাবে না।'

ওরা যখন সব যোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যাচ্ছে তখন চার্লি, ইউরিয়া ও ডেভিডের সঙ্গে দেখা হলো। ওরা তো এদের দুজনকে দেখে একেবারে অবাক।

'তোমরা গাছগাছড়া থেকে বানানো মালিশ মেখেছো, তাই না?' ইউরিয়া ফিশফিশ করে বললো। 'তোমরা এখন পুরোপুরি যোদ্ধা হয়ে গেছো।' টমি আর জনি একটু হাসলো।

'তোমরা যাচ্ছো তাহ'লে?' চার্লি বললো।

'শুনেছি, এত লালকোর্তা এসেছে যে তাদের পার হওয়া খুব শক্ত হবে!'

'হ্যাঁ, কাপটেন ডিক তাই খানিক দূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যাবেন,' টমি বললো।

'আমাকে পাঠানো উচিত ছিলো। আমিই সবার বড়ো আর খুব তাড়াতাড়ি যেতে পারতাম,' চার্লি বললো।

'কিন্তু লালকোর্তারা কাছেপিঠে থাকলে তো তোমার সবকিছু হুঁশ থাকে না। সেই যে তারগুলো মাটিতে ফেলে রেখেছিলে মনে নেই?' ডেভিড বললো।

অন্য ছেলেরা একটু হাসলো।

'লালকোর্তারা তোমাদের ধ'রে ফেললে তো সোজা ফাঁসিতে লটকাবে। আশা করি সর্দার ফিলিপ তখন আমাকে পাঠাবেন,' চার্লি তার গা ঘেঁষে দাঁড়ানো টমিকে বললো।

'আর এবার আশা করি তুমি কাজটা শেষ না-ক'রে ফিরে আসবে না। তুমি তো লুকআউট পাহাড়ের দৌড়ের সময় তাই করেছিলে,' টমি বললো। সে এত চুপি-চুপি কথাগুলো বললো যে কেবল চার্লি ছাড়া আর কেউ সে-কথা শুনতে পেলো না।

চার্লি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে থ হ'য়ে গেলো আর তার চোখেমুখে স্পষ্ট ফুটে উঠলো সেই লজ্জার ছায়া। সে ভাবতে পারেনি যে কেউ তাকে দেখে ফেলেছে।

জনির সঙ্গে টমি দ্রুত হেঁটে বেরিয়ে গেলো। চার্লিকে আঘাত দিয়ে ও দুঃখ পাচ্ছে। কিন্তু সত্যি কথাটা জানা বোধহয় চার্লির দরকার ছিলো। ভবিষ্যতে যাতে আর এ-রকম ফাঁকি দেবার চেষ্টা না করে।

৭

শত্রু শিবিরের মধ্য দিয়ে

মেরুনরা যখন গ্রাম থেকে বেরোলো তখন চাঁদ ওঠেনি। ক্যাপটেন ডিক চেয়েছিলেন লালকোর্তারা ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে আসুক যাতে টমি ও জনি সেই ফাঁকে সুড়ুৎ ক'রে বেরিয়ে যেতে পারে। তাই ওঁর মতলব ছিল সকাল হবার ঠিক আগে ইংরেজদের ঘাঁটির কাছে গিয়ে পৌঁছোনো।

'ঐ সময়ে সকলে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে,' উনি বললেন। 'শত্রু শিবিরে কখনো মাঝরাত্তিরে আক্রমণ করবে না, কারণ ঐ সময়ে পাহারাদাররা ভীষণ সজাগ থাকে। ভোর হবো-হবো এই সময় সবচেয়ে সেরা—তখনই আক্রমণ করবে। ঐ সময়টাতে সবাই ধ'রে নেয় যে বিপদ কেটে গেছে।'

মেরুনরা খুব সাবধানে ওদের প্রথম স্কাউট দলের কাছাকাছি এগোলো। কখনো একটু থামছে, কখনো ক্যাপটেন ডিক প্যাঁচার ডাক ডাকছেন এমনি ভাবেই ওরা এগোলো। ক্যাপটেন ডিক তিনবার প্যাঁচার ডাক ডেকে থামলেন, তারপর আবার ডাকলেন। একটু পরে ওরাও একটা প্যাঁচার ডাক শুনতে পেলো। এই ওদের সাড়া। সবাই থেমে চুপ ক'রে অপেক্ষা করলো। টমি ও জনির কেউই কোনো স্কাউটকে এগিয়ে আসতে দেখলো না। তারা কেবলমাত্র শুনতে পেলো দু'জন লোক ফিশফিশ ক'রে কথা বলছে। আর তখন তারা সবাই আবার সামনে এগোলো। দলটা যখন আবার একবার থামলো তখন গাছের মাথায় সবে চাঁদ উঠছে। এবার, প্যাঁচার ডাক শুনতে পাবার পরে টমি একজন স্কাউটকে দেখলো। উনি তো খুব বিখ্যাত লোক—ওঁনাম পিটার। চাঁদের আলোয় ওঁর কাঁধদুটো যেন চকচক করছে। টমি জানতো যে ওঁর কাঁধেও সেই মলম মালিশ করা হয়েছে।

'লালকোর্তারা কী করছে?' ক্যাপটেন ডিক জিগেস করলেন।

ওদের স্কাউটরা ছাড়া আর সবাই ঘুমিয়ে আছে,' পিটার উত্তর দিলো।

'আমরা তো স্কাউটদের দেখা দিতে চাই না,' ক্যাপটেন ডিক বললেন।

'আপনাদের জন্যে যে জায়গা সাফ করে রেখেছি সেখানে নিয়ে যাবে আপনাদের। স্কাউট জিম আর আমি ওখানে ওদের তিনজন স্কাউটকে খতম করেছি।'

'ঠিক আছে, চলো,' ক্যাপটেন ডিক বললেন। তারপর উনি ছেলেদের দিকে তাকিয়ে ব'লে গেলেন: 'আমরা এখন কিন্তু ইংরেজদের শিবিরের একেবারে কাছে রয়েছি। তোমরা আমার পাশে-পাশে থাকবে, কিন্তু একদম চুপচাপ।'

সমস্ত রাত্রি ধ'রে মেরুনরা আবার পথ চললো। খুব দ্রুত পায়ে ওরা এক গাছের ফাঁক থেকে আর-এক গাছে স'রে-স'রে গেলো। ক্যাপটেন ডিক যা-যা করলেন টমি ও জনি ঠিক তাই-তাই করবার চেষ্টা করলো।

সূর্য ওঠবার ঠিক আগে দলবল সমেত ক্যাপটেন ডিক একসারি নিচু পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে গেলেন। এখান থেকে ওঁরা ইংরেজ ক্যাম্প স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। এখান থেকে আক্রমণ করাও চলতে পারে। গাছগুলো বেশ উঁচুই আছে, তার আড়ালে লুকোনো যাবে। ওখানেই ব'সে প'ড়ে ওঁরা অপেক্ষা করলেন।

দূরের পাহাড়ে যেই মাত্র সূর্য দেখা গেলো অমনি ক্যাপটেন ডিক ছেলেদের দিকে ফিরলেন। 'লালকোর্তারা আমাদের পিছু-পিছু স'রে না-যাওয়া পর্যন্ত কিন্তু তোমরা এখানে অপেক্ষা করবে।' উনি ব'লে চললেন, 'ওদের যখন আর একটুও দেখতে পাবে না, সেই ফাঁকে বেরিয়ে টুক ক'রে স'রে পড়বে। যদি ধরা প'ড়ে যাও, বলবে শিকারে বেরিয়েছো। কখনো বোলো না যে সাহায্য আনবার জন্যে যাচ্ছো। তৈরি হ'য়ে নাও। হ্যাঁ, শোনো, লালকোর্তারা আমাদের পিছনে চ'লে না-যাওয়া পর্যন্ত বেরোবে না।'

'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে,' ছেলেরা বললো।

'মঙ্গল হোক,' এই ব'লে ক্যাপটেন ডিক ওদের আশীর্বাদ করলেন।

বারুদভর্তি শিঙা থেকে উনি কিছুটা বারুদ তুলে নিলেন। একটা বুলেট আর ঐ বারুদ বন্দুকের মধ্যে ভ'রে নিচের দিকে ঠেসে চেপে দিলেন। অন্য মেরুনরাও তাদের বন্দুক বারুদে ভ'রে নিয়ে ক্যাপটেন ডিকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

ছেলেরা গাছের ফাঁক দিয়ে ইংরেজ শিবিরের দিকে তাকিয়ে দেখলো। একটা ছোটো আগুনের চারপাশে ঘিরে একদল সৈন্য ঘুমোচ্ছিল। ওরা তখনও জানতো না যে, ওদের স্কাউটরা পিটার আর জিমের হাতে খুন হ'য়ে গেছে।

হঠাৎ টমির কাঁধে যেন কিসের ছোঁয়া লাগলো। সে ফিরে তাকালে। দেখতে পেলো জনি, ডান দিকে কিছু-একটা দেখাচ্ছে। ক্যাপটেন ডিক বন্দুক ছোঁড়বার জন্য তৈরি হচ্ছেন।

এক ঝলক আগুন আর একটা বিরাট আওয়াজ। তারপরেই ক্যাপটেন ডিক লাফিয়ে উঠে ভীষণ জোরে মেরুন চীৎকার ছাড়লেন।

সমস্ত ইংরেজ সৈন্য এক লাফে উঠে বসলো। তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে বন্য জন্তুর মতো এদিক-ওদিক দেখতে লাগলো। ক্যাপটেন ডিক যখন আবার একবার চীৎকার করলেন তখন ওরা ওঁর দিকে ফিরলো। উনি হাতের বন্দুক নাড়িয়ে আবার চীৎকার করলেন। তারপর উত্তরের দিকে দৌড়ে গেলেন। দৌড়ুতে-দৌড়ুতে আবার বন্দুকে বারুদ ভ'রে নিলেন।

একের পর এক সব ক-জন মেরুন ঠিক একই রকম করলো। এখন টমি বুঝতে পারছে, কেন ক্যাপটেন ডিক আক্রমণের জন্য এই জায়গাটা বেছে নিয়েছেন। ওরা এখান থেকে গুলি ছুঁড়ে দৌড়ে পালিয়ে যাবার আগে একবার নিজেদের দেখিয়ে যেতে পারবে। ফলে লালকোর্তারা ওদের পিছু-পিছু যাবে। গেলোও তাই।

লালকোর্তারাও তাদের অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিয়ে মেরুনদের পিছন-পিছন দৌড়ুলো। এখন দু-পক্ষই গুলি চালাচ্ছে। টমি আর জনিকে দারুণ উত্তেজিত লাগছে। ওরা দেখলো, ইংরেজ শিবির একেবারে ফাঁকা হ'য়ে গেছে। ওরা সেই সুযোগে পাহাড় বেয়ে নিচের দিকে নামতে শুরু করলো। ওরা খুব জোরে দৌড়ুচ্ছিলো যাতে লালকোর্তারা ফিরে আসবার আগেই জায়গাটা পার হ'য়ে চ'লে যেতে পারে। পাহাড়ের নিচে উপত্যকাটা বেশ চওড়া। অল্প পরেই ওরা বড়ো-বড়ো শ্বাস ফেলতে থাকলো: পা দুটো বড়ো বেশি ভারি আর ক্লান্ত লাগছে।

লালকোর্তাদের একজন শিবিরে ফিরে আসছিলো। ওদের দেখেই সে নিজের চোখ রগড়ে নিলো।

'থামো!' লালকোর্তা চীৎকার ক'রে বললো, আর সঙ্গে-সঙ্গে ওদের লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়লো।

কিন্তু টমি ও জনি তখন অনেকটা দূরে ছিলো। গুলি ওদের গায়ে লাগলো না। ওরা দৌড়ুতেই থাকলো। ওরা উপত্যকার অন্য দিকটায় পৌঁছে গেলো আর চটপট ক'রে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকলো। অল্প পরেই ওরা চারদিককার গাছের জঙ্গলে ঢুকে পড়লো। কিন্তু তবুও ওরা থামলো না, কেননা লালকোর্তারা ওদের পিছু-পিছু আসতে পারে। খুব ক্লান্ত, তবু ওরা

দৌড়েই চলেছে। সূর্য এখন ওদের পিছন দিকে। তাই বুঝলো যে ওরা পশ্চিমে যাচ্ছে।

হঠাৎ জনি থেমে গেলো আর কান পেতে কী যেন শুনলো। ওর চোখে-মুখে বিস্ময়, কিন্তু কিছু বললো না। কিছুক্ষণ পরে ও নিচু হ'য়ে মাটিতে কান পাতলো।

'তোমাদের পিছু-পিছু কেউ আসছে?' টমি জিগেস করলো।

'যদি আসেও তবে সে লালকোর্তা নয়। একমাত্র মেরুনরাই অত চুপি-সাড়ে চলাফেরা করতে পারে। আর যদি মেরুন হয় তাহ'লে সে তো বন্ধু,' জনি উত্তর দিলো। ওরা আবার এগিয়ে চললো।

ওরা যখন থামলো সূর্য তখন মাথার উপরে। খাবে ও বিশ্রাম নেবে ব'লে ওরা একটা সুন্দর জায়গা বেছে নিলো। আশেপাশে ঝোপগুলো ঘন ও নিবিড়। মাঝখানে একটু জায়গা পরিষ্কার, সেখানে ওরা গড়াতেও পারে। জনি ঐ পরিষ্কার জায়গাটায় ঢুকতে যাচ্ছিলো, তড়াক ক'রে এক লাফে বেরিয়ে এলো। একঝটকায় টমিকেও সরিয়ে আনলো।

'আরে, ওর ভেতরে এক বুনো বরা,' ও ফিশফিশ ক'রে বললো।

চট ক'রে ওরা উলটো দিকে ফিরে সুবিধেমতো একটা গাছ খুঁজলো। সামনেই এক গাছের ডাল ধ'রে তার উপরে চ'ড়ে বসলো দুজনে। একটুর জন্য বেঁচে গেছে। এক বুনো শুয়োর ঘোঁঙ-ঘোঁত করতে-করতে ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো। রাগে তার চোখদুটো জ্বলছে আর বিরাট জোরে গজরাচ্ছে। বরা একটু থেমে বাতাসে নাক উঁচু ক'রে গন্ধ শুঁকলো। ওর দিকে তাকিয়ে টমি ভয়ে কেঁপে উঠলো।

ওরা জানতো যে বরা গন্ধ শুঁকে-শুঁকে সব টের পায়। কিন্তু হাওয়া তখন ওদের বিপরীতে বইছে। কাজেই আশা আছে যে ওদের গন্ধ সে পাবে না। কিন্তু ওরা যে-গাছে লাফিয়ে উঠেছিলো সেটা ছিলো খুব মোটা। তাই সহজে উপরে উঠতে পারছিলো না। অথচ ডাল ভেঙে গেলে তো একেবারে মাটিতে পড়তে হবে।

এদিকে বরাটাকে ওরা তীর ছুঁড়ে মারতেও পারছে না, কারণ ওদের ধনুক তখন মাটিতে। দৌড়ে এসে যখন গাছে চড়েছিলো, তখন তাড়াহুড়োয় ধনুক মাটিতে ফেলে এসেছিলো। এদিকে হাতে খিল ধ'রে যাচ্ছে, অথচ বরার নড়বার লক্ষণ নেই। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে আর মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

'আর ধ'রে থাকতে পারছি না।' জনি ফিশফিশ ক'রে বললো।

'তুমি হাত ছেড়ে দিলে আমিও দেবো,' টমি বললো। 'তখন হয় দৌড়ে পালাতে হবে নয়তো শুধু ছুরি নিয়ে ওর সঙ্গে লড়তে হবে।'

কিন্তু ওরা দুজনেই জানতো যে, শুধু ছুরি নিয়ে বুনো বরার সঙ্গে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারবে না।

'দাঁড়াও!' জনি চুপিচুপি বললো, 'কিসের যেন একটা আওয়াজ পাচ্ছি।'

ধাড়ি বরা ওর যে-বাচ্চাগুলোকে ফেলে রেখে এসেছিলো তারা ভয় পেয়ে এতক্ষণে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। ধাড়িটা এবার পিছন ফিরে বাচ্চাগুলোর দিকে ছুট দিলো। তক্ষুনি, ওরা দুজন গাছ থেকে লাফিয়ে নামলো। ওদের ধনুক তুলে নিয়ে সেই ফাঁকে এক দৌড়ে পালিয়ে গেলো।

এবার ওরা গাছপালার মধ্যে একটা নিরাপদ লুকোবার জায়গা খুঁজে বার করলো। ভিতরে ঢোকবার আগে দুটো তীর ঝোপের ভিতরের দিকে ছুঁড়লো। কোনো আওয়াজ হ'লো না। তারপর ভিতরে ঢুকে ওদের তীর কুড়িয়ে নিলো।

ভিতরটা খুব ঠাণ্ডা আর শান্ত। মাটিও নরম। ওরা এখানেই ব'সে প'ড়ে বিশ্রাম নিলো। সঙ্গে যে-সব খাবার ছিলো তার থেকে কিছুটা খেলো এবং টমির সেই কায়দা-করা বোতলের জল পান করলো। অল্পক্ষণ পরেই ওদের চোখ বুজে এলো। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলো ওরা।

জনির ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেলো। কেন, তা সে বুঝতে পারলো না। শুধু বুঝতে পারলো যে ভয় পেয়েছে। টমি তখনও ঘুমোচ্ছে। জনি ওর গায়ে হাত দিয়ে ডাকলো। টমিও জাগলো। জনি ঠোঁটে আঙুল রেখে ওকে চুপ ক'রে থাকতে বললো। ও ফিশফিশ ক'রে বললো, 'লোকজন আসছে এদিকে।'

টমি তড়াক ক'রে উঠে বসলো। ও শুনতে পাচ্ছে, পায়ের শব্দ বেশ কাছে এসে গেছে।

'তুমি আগে যে-পায়ের শব্দ শুনেছিলে সেও কি এই রকম?' টমি জিগেস করলো।

'না, এ-শব্দের আওয়াজ অনেক জোরালো। এদের পায়ে বুট রয়েছে।' জনি বললো।

ওরা গুঁড়ি মেরে-মেরে ঝোপের একেবারে ধার পর্যন্ত চ'লে গেলো। শব্দের দিকে কান পেতে রইলো ওরা।

লালকোর্তাদের দুজনকে দেখা গেলো।

ওরা ছেলেদের দেখতে পেয়েছে ব'লে মনে হ'লো না। মাটির দিকে নজর ছিলো না ওদের। ওরা এদিক-ওদিক চারপাশে তাকাচ্ছিলো এবং নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথা বলছিলো। ছেলেরা নিঃসাড়ে প'ড়ে রইলো এবং অপেক্ষা করলো লালকোর্তাদের চ'লে যাবার জন্য।

কিন্তু টমি আর জনিকে বেজায় ঘাবড়ে দিয়ে ওরা ওদের লুকিয়ে থাকার পরিষ্কার জায়গাটার ঠিক উলটো দিকে এসে থেমে দাঁড়িয়ে রইলো।

৮

চার্লির আবির্ভাব

কিশোর মেরুন দুজনে এ ওর দিকে তাকালো। ঠিক যেন নিজেদের গর্তে খরগোশের মতো ধরা প'ড়ে গেছে ওরা। যদিও লালকোর্তারা ওদের দেখতে পায়নি, কিন্তু ওদের লুকোনোর জায়গায় ঠিক উলটো দিকেই দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ওখানেই লালকোর্তা দু-জন ব'সে পড়লো এবার, একটা লম্বা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে।

'ওঃ, ঠিক যেন ক্লান্ত ঘোড়ার মতো লাগছে!' ওদের একজন বললো।

'এই মেরুনের বাচ্চারা যে কী ভাবে বনের মধ্যে অত তাড়াতাড়ি চলাফেরা করে তা কে জানে! আমাদের তো চলতে গেলে, হয় পাথরের নুড়িতে, নয় গাছের ডালে কেবল পা আটকে-আটকে যায়,' অন্যজন বললো।

'বোধহয় ভুল দেখেছো তুমি, মেরুন বাচ্চা নয় ও-সব,' প্রথম জন বললো। 'বাচ্চা জন্তুজানোয়ার কিছু দেখে থাকবে হয়তো, আর ভেবেছো ঐ তো মেরুন।'

'বলছি আমি ঠিক দেখেছি। তোমাকে যেমন দেখছি এখন, তেমনি স্পষ্ট দেখেছি ওদের।'

টমি আর জনি নড়াচড়া করবে কি, ভয়ে একেবারে অসাড় হ'য়ে গেছে। সৈন্যরা ওদের কথাই বলাবলি করছে যে! ওদের মধ্যে একজন তো সেই লোক যে উপত্যকার মধ্যে ওদের দিকে গুলি ছুঁড়েছিলো। টমি ভাবলো দেখাই যাক না একবার ওদের দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে। ঝোপের ভিতর দিয়ে ইঁদুরের মতো নিঃশব্দে সে ওদের দিকে তাকালো। সৈন্যদের একেবারে মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে রইলো।

টমি ঠিক পাথরের মতো নিঃসাড়ে প'ড়ে রইলো। একটু নড়াচড়া করতে গেলেই সৈন্যরা দেখে ফেলবে। ওদের মধ্যে একজন খুব লম্বা, লাল চুল। আর একজন বেঁটে, মোটা। ওরা টুপি ও বেল্ট খুলে ফেলে মাটিতে রাখা বন্দুকের পাশে রেখে দিয়েছে।

'আমরা কতদূর এসেছি?' লম্বা জন অন্য সৈন্যকে জিগেস করলো।

'তা জানি না, তবে অনেকদূর তো হবেই,' বেঁটে মোটা জন উত্তর দিলো। 'আর গেলেই তো পথ গুলিয়ে ফেলবো, আমি বাবা আর যাচ্ছি না।'

'ক্যাপটেনের হুকুম মনে আছে তো? ঐ ছেলেদুটোকে খুঁজে বার ক'রে একেবারে ধ'রে নিয়ে যেতে হবে। ওঁর ধারণা কাছে-পিঠেই কোথাও একটা মেরুন গ্রাম আছে। ঐ ছেলেদুটো আমাদের পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে।'

'ওদের পেলে পরে পায়ের গোড়ালি ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাবো,' লম্বা জন ব'লে চললো, 'কিন্তু তাদের তো চিহ্নমাত্র পাচ্ছি না।'

'এই মেরুনগুলো সব যেন ঠিক বেড়ালের মতো। বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটবার সময় একটু মাত্র চিহ্ন রেখে যায় না।'

'আর লুকোতেও সবাই ধুরন্ধর ওস্তাদ,' লম্বা সৈন্যটি ব'লে চললো'। 'এমনকী হয়তো এখানেই কোথাও আছে। আমাদের সঙ্গে আরো লোকজন আনা উচিত ছিলো, তাহ'লে ভালো ক'রে খুঁজে দেখা যেতো।'

সৈন্যরা যখন ওদের লুকোবার জায়গার দিকে ফিরে তাকালো তখন ছেলেরা ভয়ে কেঁপে উঠলো। মনে হ'লো, ওরা যেন একেবারে সোজা তাদেরই দিকে তাকাচ্ছে।

'সূর্যের দিকে চেয়ে দ্যাখো,' মোটা জন বললো। ও চিত হ'য়ে শুয়ে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখছিলো। 'এখানেও বেশ গরম।'

'বেশি আরাম ক'রে শুয়ো না, তাহ'লে ঘুমিয়ে পড়বে।'

রোদে পুড়ে-পুড়ে গোটা বনটা এখন ভীষণ গরম। পাইন গাছের ছুঁচলো পাতার গন্ধ টমির নাকে আসছে। ক্রমে-ক্রমে পাইনের গন্ধ বেশ জোরালো হ'য়ে উঠছে। এই জোরালো গন্ধে আবার হাঁচি না পেয়ে যায়!

ঠিক সেইসময় জনি ওর হাত চেপে ধরলো। টমি চট ক'রে ফিরে তাকালো। জনি একটা হাত নাকের উপরে চেপে ধরেছে আর তার দু-চোখ জলে ভ'রে গেছে। টমি তো বুঝতে পারছে, ব্যাপারটা কী হচ্ছে। জনির হাঁচি পাচ্ছে।

টমিরও চোখ বড়ো-বড়ো এবং মুখ বিরাট হাঁ হ'লো।

'চেষ্টা করো হাঁচি চাপতে,' সে ফিশফিশ ক'রে বললো।

জনি কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিলো। চোখের জল এতক্ষণে কেটে গেছে, সে নাকের উপর থেকে হাতও সরিয়ে নিলো।

'পাইনের গন্ধ নাকে গেলেই আমার হাঁচি পায়,' জনি ফিশফিশ ক'রে টমিকে বললো।

'এ-কথা আমাকে আগে বলোনি কেন?' টমি জিগেস করলো।

'মনে ছিলো না,' জনি চুপি-চুপি বললো।

'চলো, এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'হবে তো, কিন্তু কেমন ক'রে?'

টমি যা ভাবছিলো তা ওকে খুলে বললো।

'গুঁড়ি মেরে-মেরে অন্য দিকে গিয়ে তারপরে দৌড় লাগানো?' টমির কথা সব শুনে জনি বললো। 'কিন্তু ওরা দেখে ফেলতে পারে, আর গুলিও করতে পারে। তাহ'লে তো সর্দার ফিলিপের জন্য সাহায্য পৌছবেই না কখনো।'

'জনি.' টমি বললো, 'কিন্তু এটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ, এবং তোমার যদি আবার হাঁচি পায়, তাহ'লে,...ওদের বন্দুক, বেল্ট সব মাটিতে ফেলা রয়েছে। ওরা দেখে ফেলতে-ফেলতেও আমরা কিছুটা দূর চ'লে যেতে পারবো। তারপর ওরা বন্দুক তুলে নিয়ে তবে তো আমাদের টিপ করবে।'

'দাঁড়াও, ওরা কী বলছে শোনা যাক।

মোটা সৈন্যটি কথা বলছিলো। 'আমার মনে হয় এবার ফিরে যাওয়া যাক। আমার বেশ খিদে পেয়ে গেছে।'

'বনে তো প্রচুর ফল রয়েছে। খিদে পেয়ে থাকলে পাড়ো আর খাও।'

'ফল!' মোটা লোকটি বললো! 'মাংস চাই হে, মাংস। যা খিদে পেয়েছে তাতে ফলে কুলোবে না। মোটাসোটা একটা পায়রা কিংবা খরগোশ পেলে বেশ হ'তো।'

'হ্যাঁ, তাহ'লেই তুমি গুলি চালাতে আর মেরুনরাও চ'লে আসতে পারতো।'

'গুলি!' মোটা সৈন্যটি হাসলো। 'তুমি এই বনের ব্যাপারস্যাপার কিছুই জানো না। সবে তো ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছো। খরগোশ গুলি ক'রে মারে না। পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মেরে ওদের কাবু করতে হয়। আমি পাথর ছুঁড়ে পায়রাও মেরেছি।'

'আমার পাথরের টিপ ভালো হয় না,' অন্যজন বলল। 'তার চেয়ে দেখি ফলটল কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

উঠে দাঁড়িয়ে সে একটা গাছের দিকে দেখালো। ছাখো 'ওখানে ওটা কী ?'

'ও তো তারা-আপেল গাছ। খুবই ভালো। কিন্তু এখন তারা-আপেলে চলবে না। মাংস চাই।'

'ঐ জন্যেই তুমি এত মোটা,' এগিয়ে যেতে-যেতে লম্বা লোকটি বললো।

জনির চোখ চকচক করছে। 'যদি কোনোমতে অন্যজনের বন্দুকটাও নামিয়ে রাখা যেতো। তাহ'লে এই স্বযোগে পালাতে পারতাম।' সে চুপি-চুপি বললো।

'পায়রা বা খরগোশ দেখতে পেলেই তবে ও নড়বে,' টমি বললো।

'টমি!' জনি ফিশফিশ ক'রে বললো, 'এই তো বুদ্ধি এসেছে। আমিই পায়রা হবো।'

আকাশের দিকে মুখ তুলে জনি দু-বার পায়রার ডাক ডাকলো। ওরা যে ফাঁক দিয়ে দেখছিলো সেই ফাঁক দিয়ে টমি আর-একবার দেখে নিলো। মোটা সৈন্যটি তড়াক ক'রে সোজা উঠে বসছে। এ-পাশ-ও পাশ ঘাড় ঘুরিয়ে সে পায়রা দেখবার চেষ্টা করছে।

'শুনছো ? কিছু শুনতে পাচ্ছো ?' ও বেশ চেঁচিয়েই অন্য সৈন্যটিকে জিগেস করল। 'পায়রার ডাক না ?'

চট ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে মাটিতে পাথর খুঁজতে থাকল। দু-একটা পাথরের টুকরো হাতে নিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেলো।

'বেশ মোটাসোটা নাদুশনুদুশ একটাকে ধ'রে আনছি রাত্রে খাবার জন্য,' ও চেঁচিয়ে বললো।

কিশোর যোদ্ধারা এ ওর দিকে তাকালো এবং টুক ক'রে বেরিয়ে প'ড়ে বন্দুকের দিকে দৌড়ুলো। পিছনে চীৎকার এবং দৌড়ে-আসা পায়ের শব্দ। ওরা সবে যখন বন্দুকগুলোকে তুলে নিচ্ছে সেই সময় লম্বা সৈন্যটি টমিকে পাকড়ে ফেললো। কিন্তু ওর গায়ে সেই মালিশ লাগানো ছিলো ব'লে সে টমিকে ধ'রে রাখতে পারলো না। কিন্তু একটু দেরি করিয়ে দিলো, জনি তো আর টমিকে ফেলে যাবে না।

ইতিমধ্যে অন্য সৈন্যটিও এসে হাজির হ'লো। কী ঘটছে দেখে নিয়ে সে ছেলে দুজনের দিকে ছুটলো।

টমি ও জনি হুতোশে দৌড়চ্ছে। বুঝতে পারছে যে লালকোর্তাদেব হাত থেকে ওদের আর নিস্তার নেই। যদি দুজনেই ধরা পড়ে তাহ'লে সর্দার জেম্‌সের কাছে সংবাদ নিয়ে যাবার কেউ থাকবে না। আর তাহ'লে পাহাড় চুড়োর দশাও ন্যানি শহরের মতো হবে।

হঠাৎ ওরা এমন-একটা জিনিশ দেখতে পেলো যা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না। ওদের ছেড়ে-আসা পরিষ্কার জায়গাটায় দেখা গেলো চার্লিকে।

৯

নদী পেরিয়ে পাহাড়ের ওপর

চার্লি একেবারে সোজা মোটা সৈন্যটির পথের উপরে এসে পড়লো। লালকোর্তা ওকে ধ'রে ফেললো। চার্লি প্রাণপণে ছাড়াবার চেষ্টা করতে-করতে বললো:

'দৌড়ো, টমি, দৌড়ো!'

চার্লির চীৎকারে লম্বা সৈন্য এদিকে ফিরলো। জনি চট্ ক'রে ভারি বন্দুকটা ওর পায়ে ছুঁড়ে মারলো। বিরাট এক আওয়াজ ক'রে সৈন্যটি মাটিতে প'ড়ে গেলো। প'ড়ে গিয়ে গড়াতে-গড়াতে জোরে চীৎকার করতে থাকলো। টমি আর জনি এই ফাঁকে পালিয়ে গেলো।

প্রাণপণে দৌড়ুতে-দৌড়ুতে ওরা নদী পর্যন্ত এসে পৌছলো। এর মধ্যে ওরা একবার মাত্র থেমেছিলো বন্দুকগুলোকে পাতা-লতার মধ্যে লুকিয়ে রাখবার জন্যে। নদীর কাছে পৌছে তীরের পাশে চিত হ'য়ে শুয়ে পড়লো একটু দম নেবার জন্যে। তারপর নদীর ধার দিয়ে নেমে গিয়ে জল খেলো।

টমি জনিকে বললো: 'আচ্ছা, তাহ'লে এখন আমাদের খাবার নেই, তীরধনুক নেই, কিছু নেই। শুধু এই ছুরি আর আবেং। আর সবই তো পিছনে ফেলে এসেছি।'

'কিন্তু আমরা আর খুব দূরে নেই নিশ্চয়ই,' জনি বললো।

'না, এই তো নদীতে এসে গেছি। আর ঐ খাড়া পাহাড়টা পার হ'তে পারলেই পৌছে যাবো।'

ওরা কথা বলতে-বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে এ ওর দিকে তাকালো। দুজনেই চার্লির কথা ভাবছে।

'চার্লি!' টমি ব'লে উঠলো: 'কোথা থেকে এলো চার্লি?'

'আমাদের পিছন-পিছন যে আসছিলো সে ঐ চার্লিই,' জনি বললো। 'আমি বলেছিলাম যে সে মেরুন হবেই।'

'কিন্তু লালকোর্তারা যে ওকে মেরে ফেলবে!' টমি চেঁচিয়ে বললো।

'না, মারবে না, ও যদি কথা দেয় যে আমাদের গ্রামের পথ দেখিয়ে দেবে তাহ'লে মারবে না,' জনি উত্তর দিলো।

'কিন্তু তা তো সে করতে পারে না ! ও যে কিশোর বাহিনীর ছেলে !'

'ওরা ওকে মেরে-ধ'রে হয়তো সেইটা বলিয়ে নেবে,' জনি বললো।

'আর চার্লিকে তো খুব সাহসী ব'লে মনে হয় না,' টমি বললো।

'কিন্তু এইমাত্র ও দারুণ সাহসের কাজ করেছে,' জনি বললো।

ওরা পরস্পরের দিকে তাকালো। কী বলতে হবে, ওদের তা আর জানা নেই এখন।

একটু পরে টমি বললো : 'ও কেন এটা করলো বল্ তো ? তুই শুনেছিলি ও কী ব'লে চেঁচিয়েছিলো ? ও বলেছিলো : "দৌড়ো, টমি, দৌড়ো !" তা এটা ও কেন করলো ?'

'হয়তো ওর মনে হয়েছে যে ও শুধু মেরুন নয় কএজন কিশোর যোদ্ধাও,' জনি বললো। 'হয়তো লুক-আউট পাহাড়ের দৌড়ে ঠকিয়েছিলো ব'লে লজ্জা পেয়েছে এখন সে, সেই গ্লানি একটু কাটাতে চায়।' টমি বললো : 'আমি ওকে বলেছিলাম যে আমরা ওই ফাঁকি দেখে ফেলেছি।'

'ও খুব লজ্জা পেলো নিশ্চয়ই,' জনি খুব ঠাণ্ডা গলায় বললো।

'আমিও খুব লজ্জা পেয়েছিলাম,' টমি বললো। 'ঐভাবে ওকে ব'লে ফেললাম ব'লে আমারও খুব লজ্জা হয়েছিলো।' এই পর্যন্ত ব'লে টমি নদীর দিকে তাকালো। তারপর আবার বলতে শুরু করলো : 'ওকে উদ্ধার করতেই হবে আমাদের। সৈন্যরা ওকে মারধোর করতে পারে। তার ফলে ও যদি গ্রামের পথ বাৎলে দেয়। তাই ওকে আমাদের ছাড়িয়ে আনতেই হবে,' টমি বললো।

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়,' জনি বললো।

'কিন্তু প্রথমেই আমাদের সর্দার জেম্সের কাছে যাওয়া দরকার,' টমি বললো। 'আয়, নদীটা পার হওয়া যাক।'

নদী যে খুব চওড়া ছিলো তা নয়, তবে বেশ গভীর। ধারের গাছ থেকে কেটে-কেটে ডাণ্ডা তৈরি করলো দুজনে, সেগুলোকে মোটা ঘাস দিয়ে বেঁধে ভেলা বানালো। তারপর নদীর ধার দিয়ে যতক্ষণ শান্ত জল না পায় ততক্ষণ হাঁটলো। স্থির জলের কাছে এসে তাদের ভেলা জলে ভাসালো। নিজেরা ভেলার উপর চ'ড়ে ব'সে হাত দিয়ে দাঁড় টেনে-টেনে এগিয়ে চললো। ভেলা বেশ তরতর ক'রে নদীর জল কেটে চললো। একটু পরেই ওরা অন্য পারে এসে পৌছলো।

এবারে কিন্তু বেশ দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। পশ্চিমে সূর্য নিচে নেমে গেছে।

সর্দার ফিলিপ ওদের যে পাহাড়ি খাড়াই-এর কথা ব'লে দিয়েছিলেন সেটাকে এখন ওরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। সর্দার ব'লে দিয়েছিলেন, অন্ধকারের আগেই খাড়াই-এ পৌছুতে। রাত্রে খাড়াই-এ ওঠা প্রায় অসম্ভব।

'ঐ পাহাড়গুলোতে পৌছুবার কি আর-কোনো পথ নেই?' জনি জিগেস করলো। 'এই খাড়াই পার হ'য়ে যাওয়া কিন্তু বেশ শক্ত হবে।'

'অন্য পথে গেলে আমরা হয়তো সৈন্যদের মুখোমুখি প'ড়ে যাবো। সর্দার তো তাই বলেছিলেন,' টমি বলল।

'আমি অবশ্য এখন দু-একজন সৈন্যের মুখোমুখি পড়তেই চাইছি, জনি বললো।

'কেন?' টমি অবাক হ'য়ে জিগেস করলো।

'তাহ'লে রাতের খাবার হিসেবে ওদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যেতো।'

ওরা দুজনেই হেসে উঠলো। দু-একটা তারা-আপেল ও অন্যান্য ফল পেড়ে নিয়ে ওরা তাড়াতাড়ি পা চালালো। যেতে-যেতে টমি আবেং-এর থেকে জল ঝেড়ে ফেললো।

অল্প পরেই ওরা খাড়াই-এর নিচে পৌছে গেলো। খাড়াই-এর গায়ে তিনটে বড়ো-বড়ো গর্ত দেখা গেলো। মেরুন কথকেরা বলেছিলো যে এক সময়ে ওখান দিয়ে তিনটে নদী বইতো। ওরা দেখলো যে, খাড়াই-এর নিচের দিকে বেশ বড়োবড়ো লতা গাছ জন্মেছে। লতাগুলো বেশ মোটা, লম্বা। দেখতে বড়ো-বড়ো সাপের মতো। তারা ছুরি দিয়ে ঐ লতা কাটতে লাগলো যাতে ওগুলো দিয়ে দড়ি বানানো যায়। তারা খুব তাড়াতাড়ি হাত চালাচ্ছিলো, দড়িও খুব চটপট তৈরি হ'য়ে গেলো।

খাড়াই-এর গা এতই এবড়ো-খেবড়ো যে দড়ি ছুঁড়ে আটকাবার জায়গা সহজেই পাওয়া গেলো।

'ঐ দেখছো, বড়ো ছুঁচের মতো যে-চাঁইটা বেরিয়ে আছে,' জনি বললো 'ওটাতে দড়ি আটকাতে পারলে আমরা কিন্তু খাড়াই-এর আদ্ধেক মেরে দেবো।'

'হ্যাঁ,' টমি উত্তরে বললো। 'কিন্তু ওখানে একবার উঠে গেলে তো আমরা আটকে যাবো। একটা দাঁড়াবার জায়গা বার করা দরকার, যাতে ক'রে সেখান থেকে আমরা আরো উপরে দড়ি ছুঁড়তে পারি।'

এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে ওরা যেমন খাঁজ চাইছিলো সে-রকম একটা দেখতে পেয়ে গেলো।

প্রথম জনি দড়ি ছুঁড়লো কিন্তু লাগাতে পারলো না। তারপর টমি চেষ্ট'

করলো, ওরও ফসকালো। জনি অপেক্ষা করলো বাতাস কখন একটু থামে। তারপর সুযোগ বুঝে আবার ছুঁড়লো। দড়ির পাকানো গোল্লা হাওয়ায় উঠে গেলো এবং ঠিক পাথরের চাঁইএ আটকে গেলো। ওরা ভালো ক'রে টেনে-টেনে দেখে নিলো কতটা জোরে আটকেছে। হ্যাঁ, বেশ শক্ত হয়েছে।

এবার ওরা খাড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করলো, টমি আগে-আগে। দু-হাতে লতার দড়ি চেপে ধ'রে খাড়াই-এর গায়ে পায়ের আঙুল দিয়ে-দিয়ে সাবধানে ওরা উঠলো। উঠতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো ওদের এবং মাঝে-মাঝে হাওয়া যখন একটু জোরে বইছিলো ওরা খাড়াই-এর গায়ে আছড়ে যাচ্ছিলো। এইভাবে উপরের সেই খাঁজ পর্যন্ত উঠতে ওদের দম একেবারে ফুরিয়ে গেলো।

পিছনে তাকিয়ে দেখলো দূরে নদী দেখা যাচ্ছে। ওদের খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে সব-কিছু। ক্রমেই দিনের আলো ফুরিয়ে আসছে আর তার ওপর ঐ খাঁজটাও খুব সরু। আর-একটা পাথরের চাঁই খুঁজে বার করতে হবে যার গায়ে দড়ি আটকানো যায়। কিন্তু দেরি হ'য়ে গেলে আর কিছুই দেখা যাবে না। আর ঠিকমতো পা না-ফেলতে পারলে সোজা খাড়াই বেয়ে নিচে!

'আমাদের এখন যেতেই হবে,' টমি বললো। ওর হাত-পা যন্ত্রণায় টনটন করছে।

পাথরের চাঁই থেকে ওরা ওদের দড়ি টেনে বার ক'রে নিলো। আবার ওটাকে টেনেটুনে পরীক্ষা ক'রে নিলো। বেশ শক্তই আছে এখনো। চোখে পড়লো খাড়াই-এর একেবারে মাথার কাছাকাছি একটা পাথর বেশ জুতসই ভাবে বেরিয়ে আছে। তবে ওখানে সুবিধেজনক কোনো খাঁজ নেই। না থাক। মনে হ'লো, ওখান থেকে সোজা মাথায় উঠে যাওয়া যাবে। খাড়াইটা ওখানে খুব চড়া মনে হ'লো না।

এবারে টমি ওদের মাথার উপরের পাথরের চাঁই-এর উপর দিয়ে দড়ি ছুঁড়লো। সে নিজেই ওঠবার জন্য তৈরি হ'লো এবার। খাড়াইটা এখানে খুব চড়া নয় ঠিকই, তবে অনেক আলগা পাথরের টুকরো রয়েছে। আর একসঙ্গে দুজনে যাবার মতো জায়গাও নেই। তাই ঠিক করলো আগে ও নিজে উঠবে, পরে জনি।

পাহাড়ের গায়ের একটা ছোটো ফাটলের মধ্যে পা রাখল টমি। নিচের দিকে তাকাতে পারছে না, ওর শরীর খাড়াই-এর গায়ের সঙ্গে একেবারে সেঁটে রাখতে হয়েছে। ওর দড়িতে একটা টান লাগলো।

‘জনি, এখন এসো না,’ ও চেঁচিয়ে বললো। ‘এখানে দুজনের দাঁড়াবার জায়গা হবে না।’

কথা বলা বন্ধ করলো টমি। এখন দম রাখতে হবে, বাকি পথটা আরো ওঠবার জন্যে।

খুব তাড়াহুড়ো করা চলবে না এও সে জানে। অন্ধকার হ’য়ে আসছে, তবুও কিন্তু ধীরে, নিশ্চিত ভাবে যেতে হবে। হাত ছড়িয়ে আঙুল দিয়ে নিজের চারপাশে যতদূর-সম্ভব বুঝে নেবার চেষ্টা করলো। কোথায়-কোথায় আঁকড়ে ধরা যায় বুঝে গেলো। খুব আস্তে-আস্তে টমি নিজেকে টেনে-টেনে উপরে তুলছে। পায়ের আঙুল দিয়ে বুঝে নিচ্ছে পাথরের গায়ে গর্ত-টর্ত কোথায় আছে। এইভাবে ইঞ্চি-ইঞ্চি ক’রে সে যখন প্রায় মাথা পর্যন্ত উঠে এলো তখন, একটা পাথরের টুকরো চোখে পড়লো। মনো হ’লো বেশ শক্ত, ওর শরীরের ভার ঠিক বইতে পারবে। পা দিয়ে যখন খাঁজে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, সেই সময়ে যে-পাথরটা বাঁ হাতে ধরা ছিলো সেটা ভেঙে গেলো।

হঠাৎ দেখলো যে ও প’ড়ে যাচ্ছে। ডান হাতের আঙুলের জোরে গোটা শরীরকে ধ’রে রাখতে পারলো না। নিচে থেকে জনি চীৎকার ক’রে উঠলো। ঠিক যখন টমি বুঝলো যে ও একেবারে প’ড়েই যাবে, সেই সময় আবার দড়িটাকে খুঁজে পেলো। গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে প্রাণপণে দড়িটা ধ’রে ঝুলে রইলো।

নিচে থেকে জনি ডেকেই চলেছে। কিন্তু ও তো উত্তর দিতে পারছে না। ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছে। কাঁধের থেকে হাত যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে।

‘চেপে ধ’রে থাকিস, ও টমি!’ জনি নিচের থেকে চেঁচিয়ে বললো। ‘একটুক্ষণ ধরে থাক! আমি আসছি।’

‘না, জনি, তোকে আসতে হবে না।’ টমি কোনোমতে কষ্ট ক’রে কথাগুলো বললো। ‘আমি পেরে যাবো।’

ঐভাবেই একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে অপেক্ষা করলো টমি। তারপর আবার আস্তে-আস্তে কষ্ট ক’রে উঠতে থাকলো। এবার ধরবার আগে প্রত্যেকটা পাথরের টুকরো ভালো ক’রে দেখে নিলো। অবশেষে, সে খাড়াই এর মাথায় এলো। কোনোক্রমে নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে উপরের ঘাসের উপরে নিয়ে এলো। ওখানে ধপাশ ক’রে উপুড় হ’য়ে শুয়ে পড়লো। আর যেন নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই শরীরে।

১০

মোচো মেরুনরা

টমি শুনতে পেলো জনি ওর নাম ধ'রে ডাকছে। চোখ মেলে মাথা তুলে তাকিয়ে দেখলো এখন রাত্রি। তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়ালো। খাড়াই-এর ধারে গিয়ে ঝুঁকে নিচের দিকে দেখলো।

'আমি ঠিক আছি, জনি,' ও চেঁচিয়ে বললো।

'আমি যে অনেকক্ষণ ধ'রে তোকে ডাকছি। ভাবছি তোর কিছু হ'লো নাকি।'

'না, কিছুই না, শুধু ভীষণ ক্লান্ত,' টমি বললো।

'দাঁড়া, এবার আমি উঠে আসছি,' জনি বললো।

কিন্তু টমি তো জানে যে, উঠে আসবার সময়ে মাথার কাছাকাছি কী অবস্থা হয়েছিলো তার। আর এই অন্ধকারে জনি নির্ঘাত প'ড়ে যাবে। না ওকে ওই ঝুঁকি কিছুতেই নিতে দেওয়া চলে না।

'উঠিস না, জনি দাঁড়া,' টমি চেঁচিয়ে বললো। 'বলছি, কী করবো।'

টমি ঝোপের মধ্যে চ'লে গেলো। ছুরি দিয়ে গাছ থেকে একটা বড়ো ডাল কেটে আনলো। তারপর ওটার একটা ধার চাপ দিয়ে বেঁকিয়ে নিলো। তারপর খাড়াই-এর কিনারে নিয়ে সোজা শুয়ে পড়লো। বেঁকানো আঁকশির মতো ডগাটা নিচে নামিয়ে দিলো। তাই দিয়ে দড়িটা ধ'রে ফেলে টেনে উপরে নিয়ে এলো। দড়ির একদিক কাছেই একটা গাছের গায়ে শক্ত ক'রে বাঁধলো, অন্য দিকটা নিচে জনির কাছে ছুঁড়ে দিলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছেলেরা দুজনেই একসঙ্গে খাড়াই-এর মাথায় এসে গেলো।

দুজনেই এত ক্লান্ত যে মনে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমোয়। কিন্তু এখনো অনেক কাজ করার রয়েছে। গ্রাম যে ওদের উপরেই সাহায্যের জন্যে নির্ভর করছে।

কিছু ফল পেড়ে নিয়ে ওরা আবার এগোলো। সব কিশোর যোদ্ধাদের মতো ওরাও জানতো কী ক'রে তারার আলোয় পথ চিনে যেতে হয়।

বনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমের দিকে এগোলো ওরা। যখন চাঁদ উঠলো ওরা তখন একটা পরিষ্কার জায়গা পার হচ্ছে। অদ্ভুত আকৃতির এক পাহাড় ওদের সামনে। মেরুনরা যে-রকম চিনির ডেলা বানায় ঠিক যেন সে-রকম দেখতে। জনি পাহাড়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো।

'হ্যাঁ, সর্দার ফিলিপ বলেছিলেন বটে এই পাহাড়ের কথা,' টমি বললো।

'এইবার বোধহয় আবেং-এর আওয়াজ করা উচিত আমাদের,' জনি বললো।

ওরা একটু থামলো। টমি শিঙা লাগালো ঠোঁটে। তারপর সাহায্যের আওয়াজ ক্রমে উঁচু থেকে উঁচুতে উঠলো। তারপর আস্তে-আস্তে নেমে যেতে-যেতে আওয়াজ একেবারে মিলিয়ে গেলো। মিলিয়ে-যাওয়া ঐ আওয়াজের রেশও ওরাও শুনতে পেলো।

পর-পর ওরা দুজনেই আবেং-এর আওয়াজ করেছিলো। চাঁদের আলোয় দেখা যাচ্ছে ওদের চারপাশে বন। বড়ো-বড়ো গাছগুলো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। দু-একটা ব্যাং ডাকছে। ছেলেরা দুজনে গায়ে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো। ওরা জানতো যে অন্য মেরুনদের চোখও হয়তো ওদের লক্ষ করছে। তাই ওরা দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করলো সেখানে।

একটু পরে ওরা একটা গলার স্বর শুনতে পেলো।

'অচেনা কিশোর' এরা কারা? 'এই রাত্রে আবেং বাজাচ্ছে?'

'আমরা পাহাড়চুড়োর কিশোর যোদ্ধা। সর্দার ফিলিপ আমাদের পাঠিয়েছেন,' টমি খুব গর্বের সঙ্গে বললো।

'হুঃ, খোকা মুরগি!' গলার স্বর বললো।

'আমরা দুজন,' জনি বললো। কিশোর যোদ্ধা ভয় পেয়েছে ব'লে যেন কখনো মনে না-হয়।

'দুই হাবা হাঁসের মতো তোমরা এই রাতে বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটছো। আর শত্রুরা কেউ তোমাদের পিছু নিয়েছে কিনা তাও তো দেখছো না।'

'আমরা জানতাম যে আপনারা কাছেই আছেন,' টমি বললো। 'মেরুন যোদ্ধা যদি দেখা দেবে না ব'লে ভাবে তাহ'লে গাছেরাও তাদের দেখতে পায় না।'

মেরুন যোদ্ধা হেসে উঠলো এবং এবার ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো।

'আমার নাম জন, মোচো মেরুনদের স্কাউট আমি,' সে বললো। 'সর্দার ফলিপের কাছ থেকে কী সংবাদ এসেছে?'

'মোচো মেরুনদের জন্য সর্দার ফিলিপের কাছ থেকে একটা সংবাদ এনেছি আমরা,' টমি বললো। 'কিন্তু উনি তো কোনো স্কাউটের কাছে সে- সংবাদ বলতে বলেননি।'

একটু থেমে স্কাউট বললো: 'হুম্...না:, হাবা হাঁস নয়তো, দুই তুখোড় পথিক। ঠিক আছে। আমার সঙ্গে এসো।'

সে খুব জোরে হাঁটছিলো বনের মধ্যে দিয়ে আর ছেলেরাও ওদের পিছন-পিছন তাড়াতাড়ি হাঁটছিলো। কিন্তু ওরা এত ক্লান্ত ছিলো যে স্কাউটকে প্রায়ই থেমে এদের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছিলো।

'এ কী? পাহাড়-চুড়োয় কিশোর যোদ্ধাদের কি বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শেখানো হয়নি?'

'আমরা খুব ক্লান্ত,' জনি বললো।

স্কাউট ওদের দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখলো।

'তোমরা যাত্রা শুরু করেছিলে কখন?' সে জিগ্যেস করলো।

'কাল রাত্রে, চাঁদ ওঠাবার আগে,' টমি বললো।

'অ্যাঁ? তোমরা ঐ খাড়াই পার হ'য়ে এসেছো?'

'হ্যাঁ,' টমি সায় দিলো।

'তাহ'লে তো তোমরা খুবই ক্লান্ত,' নরম গলায় যোদ্ধাটি বললো। 'তোমরা তো ঘুমিয়েই পড়বে।'

'হ্যাঁ, পারলে এখানেই,' টমি বললো।

যোদ্ধাটি একটু সময়ের জন্য ভেবে নিলো। তারপর ওর আঙুল দুই ঠোঁটের ফাঁকে রেখে শিস দিলো। অমনি আর একজন যোদ্ধা এসে হাজির। জনের মতো, সেও একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে।

'এও আমার মতো আর-একজন স্কাউট.' জনি জানালো।

'অভিবাদন।'

'স্বাগত,' নতুন স্কাউট বললো।

'এরা হ'লো পাহাড়চুড়োর দুজন কিশোর যোদ্ধা। ওখানে এদের বিপদ দেখা দিয়েছে,' জন ব'লে চললো।

'গত কাল চাঁদ ওঠবার আগে ওরা হাঁটতে শুরু করেছে। কাজেই ওরা এখন ভারি ক্লান্ত। ওদের সর্দারের কাছ থেকে আমাদের সর্দারের কাছে

ওরা একটা সংবাদ নিয়ে এসেছে। আমাদের উচিত তাড়াতাড়ি সর্দারের কাছে ওদের নিয়ে যাওয়া।'

হঠাৎ, স্কাউট দুজন ছেলেদেরকে পিঠে তুলে নিয়ে বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলো। ছেলেরা এতই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো যে 'না' পর্যন্ত বলতে পারলো না।

মেচো গ্রামে ঢুকে টমি আর জনিকে সোজা পরামর্শ পরিষদের ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'লো। সেখানে ওরা মাদুরের ওপর ব'সে-ব'সে অপেক্ষা করতে লাগলো।

মোচো মেরাজদের সর্দার যখন ঢুকলেন তখন ছেলেরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালো। এদের সর্দার দেখতে রোগা, চাওড়া কাঁধ, সর্দার ফিলিপের চেয়ে বয়সে ছোটো ব'লেই মনে হয়।

'সর্দার, অভিবাদন' ছেলেরা বললে।

'স্বাগত,' সর্দার বললেন।

'পাহাড়চুড়োর সর্দার ফিলিপের কাছ থেকে আমরা আপনার জন্য সংবাদ নিয়ে এসেছি,' টমি বললো।

'বলো, কী সংবাদ।'

'সর্দার ফিলিপ বলেছেন যে লালকোর্তারা তাদের ঘুরন্ত বন্দুক নিয়ে ওঁকে আক্রমণ করতে চলেছে। ওঁকে হয়তো পাহাড়ের আরো ভেতরে ঢুকে যেতে হ'তে পারে। কিন্তু সর্দার জেম্‌স্ ও তাঁর বিখ্যাত মোচো যোদ্ধারা যদি তাঁকে সাহায্য করে তাহ'লে তিনি লালকোর্তাদের ধ্বংস ক'রে ফেলতে পারেন।'

সর্দার জেম্‌স্ নীরবে একটুক্ষণ কী যেন ভাবলেন।

'পাহাড়চুড়োর কী হবে?' সর্দার জিগেস করলেন।

'সর্দার ফিলিপ বলেছেন, দরকার হ'লে পুরো গ্রামটাই পুড়িয়ে দেবেন,' টমি উত্তর দিলো।

'পুড়িয়ে দেবেন?' সর্দার জেমস শান্তভাবে বললেন, 'দিয়ে পাহাড়ের মধ্যে থাকবেন।'

'উনি বলেছেন যে, ন্যানি শহরের মতো ওটাকেও তিনি নষ্ট ক'রে দেবেন,' জনি বললো।

বলতে-বলতে ওদের দুজনের চোখেই জল এসে গেলো। ওরা ওদের পাহাড়-চুড়োর ছোট্ট গ্রামকে ভালোবাসতো।

'ঠিক আছে। তোমরা এখন বিশ্রাম করো। শুনলাম যে তোমরা নাকি

গত কাল চাঁদ ওঠবার আগে হাঁটতে শুরু করেছো। খুব ভালো ছেলে। তোমরা একটু বিশ্রাম করো। আমি ইতিমধ্যে পরামর্শ পরিষদের সভা সেরে ফেলি।'

'আমার আর-একটা কথা আছে, যদি দয়া ক'রে শোনেন একটু,' টমি বললো।

তারপর সে সর্দার জেম্‌স্‌কে চালির কথাটা খুলে বললো। সর্দার শুনে মাথা নাড়ালেন।

'সর্দার ফিলিপের হাতে অনেক সাহসী ছেলে আছে মনে হচ্ছে,' উনি বললেন। 'আচ্ছা, দেখছি কী করা যায়। তবে তোমাদের কি মনে হয় যে এই ছেলেটি, চালি, লালকোর্তাদের শেষটায় গ্রামের পথ দেখিয়ে দেবে?'

'ঠিক বলতে পারছি না, জানেন। কারণ, চালি সাহসী তা আমরা জানি, কিন্তু লালকোর্তারা ওকে মারধোর করতে পারে।'

'তাহ'লে আমাদের খুব তাড়াতাড়ি কাজ করা উচিত,' সর্দার জেম্‌স্ বললেন। 'ওরা যন্ত্রণা দিয়ে-দিয়ে ওকে দিয়ে যা খুশি তাই করিয়ে নিতে পারে।'

১১

লালকোর্তাদের এক বন্দী

চার্লি নিজেও জানতো না কেন সে পাহাড়চুড়ো থেকে টমি আর জনিকে অনুসরণ ক'রে পিছন-পিছন এসেছিলো। কিন্তু এটা সে জানতো যে সে ভয় পেয়েছিলো। টমি তো জেনে গেছে যে সে লুক্‌আউট পাহাড়ের দৌড়ে সবাইকে ঠকিয়েছে। হয়তো সর্দার ফিলিপও এতক্ষণে ব্যাপারটা জেনে গেছেন। তাই ভয় পেয়ে সে ক্যাপটেন ডিকের দলের পিছনে-পিছনে বনের মধ্যে ঢুকেছিলো। ওদের পিছনে খুব কাছ ঘেঁসেই চলছিলো। ক্যাপটেন ডিক যখন স্কাউট পিটারকে দেখতে পেয়েছিলেন, তখন চার্লি ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলো। ইংরেজ শিবিরের উপর আক্রমণের সময় ও অপেক্ষা করেছিলো। ইংরেজ সৈন্যরা যখন মেরুনদের অনুসরন করছিলো, তখনও সে উপুড় হ'য়ে বুকের উপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে-দিয়ে উপত্যকা পার হয়েছিলো। লম্বা সৈন্য যে টমি ও জনির দিকে গুলি ছুঁড়েছিলো তাও সে দেখেছে। তারপরেই ও এগিয়ে যায়। ভেবেছিলো বন্ধুদের সে সাহায্য করতে পারবে। আর তাহ'লেই ওরা হয়তো তাকে ক্ষমা করবে।

বুনো বরার থেকে যখন টমি ও জনি পার পেলো তখনও সে দেখেছে। সৈন্যরা যখন এলো তখনও ও লুকিয়েই ছিলো। এখন চার্লি ঐ মোটা সৈন্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে চলেছে আর চীৎকার ক'রে যাচ্ছে।

'থামো এবার, নইলে মাথা ভেঙে দেবো।' লালকোর্তা চ্যাচালো।

চার্লির তুলনায় ওর জোর তো অবশ্যই বেশি। একটু বাদেই চার্লিকে ওর মুঠোর মধ্যে ধ'রে ফেললো। তার হাত পিছন দিকে ঘুরিয়ে মুচড়ে দিলো। চার্লি যন্ত্রণায় চ্যাচাতে থাকলো।

অন্য সৈন্যটি তখনও মাটিতে ব'সে-ব'সে তার পা রগড়াচ্ছিলো। টমি আর জনি ওদের বন্দুক চুরি ক'রে নেওয়ায় ওরা দুজনেই বেজায় খেপে গেছে।

'ঠিক আছে, এবার আমার সঙ্গে এসো,' মোটা সৈন্য বললো। চার্লি এতক্ষণে লড়াই করা থামিয়ে দিয়েছে।

চার্লির হাত ধ'রে সামনে ঠেলতে-ঠেলতে এগিয়ে নিয়ে চললো তারা।

'ঐ ছেলেগুলো হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হ'লো বলো তো?' মোটা জন অন্য জনকে বললো।

লম্বা জন মাথা ঝাঁকালো। ওর মুখ তখনো যন্ত্রণায় কুঁচকে রয়েছে।

'জানি না। হয়তো ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিলো। হঠাৎ দেখতে পেলাম আমাদের বন্দুকের দিকে দৌড়ুচ্ছে। আর তক্ষুনি একজন আমার পায়ে জোরসে এক ঘা ঝাড়লো।

'পা ভেঙেছে নাকি?'

'তা মনে হচ্ছে না। তবে বেশ যন্ত্রণা হচ্ছে।' ওর রাগ ভাব এখনো কাটেনি। 'মাংসের লোভে যদি অতটা খেপে না-উঠতে তাহ'লে কিন্তু এমন কাণ্ড হ'তো না।'

'মেজাজ দেখিয়ো না আমাকে। ধরেছি তো ওদের একজনকে।'

লম্বা সৈন্য তখন চার্লির দিকে তাকালো। চার্লি দারুণ ভয় পেয়ে গেছে।

'একটা পাথরের ঢিল দাও তো দেখি, ওর সব হাড়গুলো গুঁড়িয়ে দিই,' লম্বা সৈন্য বললো।

'না-না, ওকে এখন আমরা শেষ করবো না। ক্যাপটেন ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন। ও ইচ্ছে করলে মেরুন গ্রামে আমাদের নিয়ে যেতে পারে।'

চার্লি কাঁদতে আরম্ভ করলো।

'তাহ'লে ওকে বেঁধে রাখো আর আমার পায়ের একটা ব্যবস্থা করো,' লম্বা জন বললো।

মোটা সৈন্য তার জলের বোতল থেকে লম্বা এক টুকরো চামড়া বার করলো, আর তাই দিয়ে চার্লির হাত পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে রাখলো। তারপর ওকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

লম্বা সৈন্যটির ব্যথা তখনো কমেনি। সে তার বুট খুলে নিলো। পা বেশ ফোলা। মোটা সৈন্য তার জামা থেকে খানিকটা কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে তাই দিয়ে পায়ের ফোলা জায়গাটা বেঁধে দিলো। দুজনেই খুব রাগতভাবে কথাবার্তা বলতে থাকলো।

শিবিরে ফিরে তাকে কী করা হবে সে-কথা চার্লিকে বিশদ ক'রে বললো ওরা। এতে চার্লি এত ভয় পেয়ে গেলো যে সে গুঁড়ি মেরে-মেরে স'রে যেতে চেষ্টা করলো। লম্বা সৈন্য ওর হাত দুলিয়ে দুলিয়ে চার্লির মুখে একটা প্রচণ্ড ঘুসি কষালো।

চার্লি হাউ মাউ ক'রে কেঁদে উঠলো। ওর মুখ দিয়ে তখন রক্ত ঝরছে আর একটা দাঁত আলগা হ'য়ে গেছে।

'তুই আবার পালাবার চেষ্টা ক'রে ছাখ, তোকে একেবারে খতম ক'রে দেবো,' লালকোর্তা চীৎকার ক'রে বললো।

এরপর চার্লিকে সামনে রেখে ওরা শিবিরের দিকে যাত্রা শুরু করলো। ওখানে পৌছলে ইংরেজ সৈন্যরা সবাই চেঁচিয়ে ওদের অভিনন্দন জানালো। চার্লিকে ক্যাপটেনের কাছে নিয়ে যাওয়া হ'লো। লালকোর্তাদের একজন যখন গোটা কাহিনীটা বলছে তখন চার্লি সারাক্ষণ মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

'তুমি বাপু যাচ্ছিলে কোথায়?' ক্যাপটেন বাজখাঁই গলায় চার্লিকে জিগ্যেস করলেন।

'না-না – কোথাও না তো,' চার্লি বললো। ও খুবই ভয় পেয়েছে।

'মিথ্যে কথা বলছো,' ক্যাপটেন চীৎকার ক'রে উঠলেন।

এবার ক্যাপটেন তরোয়ালের উপরে ওঁর হাত রাখলেন। চার্লির মনে হ'লো ঐ তরোয়াল দিয়েই উনি ওকে মারবেন এবার। ভাবতেই সে ভয়ে শিউরে উঠলো।

'শি-শি-শিকারে, আমরা শিকারে যাচ্ছিলাম,' ও চেঁচিয়ে বললো।

ক্যাপটেন মাথা নাড়লেন।

'আবার মিথ্যে কথা বলছো! আমরা এখানে আছি জেনে মেরুনরা তো এখন এখানে শিকার করতে আসবে না। আজ সকালের হামলাটা খুব অদ্ভুত ছিলো। মেরুনরা চেষ্টা করছিলো এখান থেকে আমাদের টেনে বার করতে। ওরা আমাদের সরিয়ে দিতে চাইছিলো কেন?' উনি চ্যাচালেন।

চার্লি কিছুই বললো না। ক্যাপটেন যেন ওকে আস্ত খেয়ে ফেলবেন মনে হ'লো।

"তোমাদের ছেলেদের এখান দিয়ে পার ক'রে দেবার জন্যে কি? আসল কারণটা কী? মেরুনরা কি সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে কোথাও?' ক্যাপটেন আবার চেঁচিয়ে উঠলেন।

চার্লি ভয়ের চোটে কোনো উত্তর দিতে পারলো না। ও চাইছিলো এক ছুটে পালাতে, কিন্তু চারদিকে তো লালকোর্তা ঘিরে রয়েছে। চার্লি ওদের চামড়ার গন্ধ পাচ্ছে, ওদের গোল বড়ো-বড়ো মুখ সব দেখতে পাচ্ছে।

ক্যাপটেন একেবারে চার্লির মুখের কাছে ওঁর মুখ নিয়ে এলেন।

এক ভয়ংকর রকমে ফিশফিশিয়ে উনি বললেন, 'তোমাকে এখুনি কথা বলাচ্ছি আমরা।'

চার্লির উপরে ওঁর চোখ স্থির রেখে একজন সৈন্যের দিকে ইশারা করলেন।

উনি আদেশ করলেন, 'তোমরা একটা আগুন জ্বালিয়ে তাতে একটা লোহা গরম করো তো। ওর জিভের গোড়াটা একটু গরম ক'রে দিলে নিশ্চয়ই কথা বলবে।'

চার্লি চীৎকার ক'রে উঠলো, ওর দু-হাঁটু কাঁপছে। কাঁপতে-কাঁপতে সে মাটিতে প'ড়ে গেলো।

'তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালাও!' এক মারাত্মক গলায় ক্যাপটেন চীৎকার করলেন। এবার আস্তে-আস্তে উনি তরোয়াল খুলতে লাগলেন।

১২

উদ্ধারের উদ্দেশে

ভালো ক'রে খাওয়া-দাওয়ার পর টমি ও জনি তখুনি ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর স্কাউট জন ওদের জাগিয়ে দিলে তার পিছন-পিছন ওরা পরামর্শ পরিষদের সভাঘরে গেলো। সর্দার জেম্‌স্‌ ও তাঁর লোকেরা ততক্ষণে সবাই ওখানে এসে গেছেন। মোচোর পথ-ঘাট তখন মেরুনে-মেরুনে ছেয়ে গেছে। অস্ত্রশস্ত্র হাতে যোদ্ধারাও আছেন তার মধ্যে।

সর্দার জেম্‌স্‌ টমি ও জনিকে বললেন, 'আমাদের যোদ্ধারা দল বেঁধে পাহাড়-চূড়োয় যাচ্ছেন। তোমাদের বাবাদের কাছেও আমি খবর পাঠাচ্ছি যে, তোমরা ভালো আছো। তোমরা কি আর-কিছু খবর পাঠাতে চাও?'

ছেলেরা পরস্পরের দিকে তাকালো। মনে হ'লো ওরা যেন নিঃশব্দে নিজেদের মধ্যে একটু শলাপরামর্শ ব'লে নিলো।

টমি চেঁচিয়ে বললো, 'কিন্তু আমরা তো যোদ্ধাদের সঙ্গেই ফিরতে চাই। চার্লিকে উদ্ধার করতেই হবে, তা ছাড়া আমরাও তো আমাদের গ্রামের জন্য যুদ্ধ করতে চাই!'

সর্দার জেম্‌স্‌কে গম্ভীর দেখালো।

'কিন্তু তোমরা তো ক্লান্ত! তোমরা তাড়াতাড়ি কুচকাওয়াজ ক'রে ওদের সঙ্গে পেরে উঠবে না।'

'আমরা পারবো, সর্দার। আমরা অনেকক্ষণ টানা বিশ্রাম করেছি,' জনি বললো। 'আর তা ছাড়া যেখানে ঐ ইংরেজদের বন্দুক দুটো আমরা লুকিয়ে রেখে এসেছি সে-জায়গাটাও দেখিয়ে দিতে পারবো।'

পরিষদের লোকেরা সব একসঙ্গে হেসে উঠলো।

'আমরা ঐ ইংরেজদের বন্দুক দুটো ব্যবহার করতে পারি অবশ্য,' সর্দার বললেন। 'কিন্তু তোমরা মোটেই বেশিক্ষন ঘুমোওনি, মাত্র কয়েক মিনিট ঘুমিয়েছো।'

'আমাদের অল্পসল্প বিশ্রাম করার অভ্যেস আছে,' টমি তাড়াতাড়ি বললো।

'খুব ভালো কথা। আমরা অবশ্য ভেবেছিলাম যে তোমরা ফিরে যেতেই চাইবে। কিন্তু কথা দাও যে, সব সময় ক্যাপটেনকে মেনে চলবে।'

ছেলেরা প্রতিশ্রুতি দিলো।

দিনের আলো ফোটবার আগেই যোদ্ধারা ছাউনি ছেড়ে চললো। টমি ও জনি কিছুক্ষণ বাদেই বুঝতে পারলো যে কেন ওদের কাছ থেকে ক্যাপটেনকে মেনে চলার কথা আদায় করা হ'লো। ওরা গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে আসার একটু পরেই দুজন যোদ্ধা ছেলে দুজনকে এক ঝটকায় কাঁধের উপরে তুলে নিলো।

'না, না, আমাদের ব'য়ে নিতে হবে না, আমরা হাঁটতে পারবো,' টমি চ্যাঁচামেচি করলো। 'আমরা কিশোর যোদ্ধা।'

'হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই কিশোর যোদ্ধা,' ক্যাপটেন বললেন। 'আর সেই কারণেই তো তোমরা প্রতিশ্রুতি ভাঙতে পারো না। তোমরা সর্দার জেম্‌স্‌কে কথা দিয়েছো যে আমাকে মেনে চলবে।'

ছেলেরা বুঝলো উনি ঠিকই বলছেন। মোচো যোদ্ধারা এরপর ওদের নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললো।

সৈন্যরা কিন্তু খাড়াই-এর পথে নামলো না। ওদের একটা গোপন পথ ছিলো: পাহাড়ের মধ্যে গর্তের ভিতর দিয়ে ওরা একটা গুহা পর্যন্ত গেলো। গুহার পর গুহা—তার ভিতর দিয়ে দিয়ে ওরা অনেকক্ষণ হাঁটলো। তারপর একসময়ে ওরা সেই লম্বা-লম্বা ঘাসের জায়গাটতে এলো যেটা ছেলেরা আগের দিন পার হয়েছে।

বিকেল পড়তে না-পড়তেই ওরা নদীর ধারে পৌছে গেলো।

'নৌকোটা বার করো,' ক্যাপটেন আদেশ দিলেন।

ছেলেদের চোখ এবার বিস্ময়ে বড়ো-বড়ো হ'য়ে গেলো। ছুরি দিয়ে মোচো মেরুনরা একটা বড়ো গাছের ধারের নরম মাটি খানিকটা কেটে ফেললো। তার নিচে থেকে বেরিয়ে পড়ল মস্ত একটা বড়ো নৌকো। নৌকোটা পরিষ্কার রাখার জন্যে ওর মধ্যে ঘাস ভর্তি ক'রে রাখা হয়েছিল।

'এটা এলো কোথা থেকে?' টমি একজন যোদ্ধাকে জিগেস করলো।

যোদ্ধা হেসে উত্তর দিলেন, 'এটা মাছ ধরার জন্যে ব্যবহার করা হয়। এখানেই এটা লুকোনো থাকে। মাছ ধরবার সময় এখান থেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি আমরা। আবার কাজ হ'য়ে গেলে ঢেকেঢুকে এখানেই রেখে যাই।'

দুজন লোক নৌকোটাকে সামনে পিছনে ক'রে বেয়ে আনলো। অল্পক্ষণ

বাদেই সব যোদ্ধারা নদী পার হ'য়ে আবার বনের মধ্যে এসে পড়লো। ওরা এগিয়ে চললো, তাড়াতাড়ি চটপটে পায়ে, কিন্তু নিঃশব্দে। ছেলেদের লুকোনো বন্দুকগুলোও একটু পরে পেয়ে গেলো ওরা। যোদ্ধারা একটু হাসলো এবং টমি ও জনির দিকে যেন বেশ সম্মানের দৃষ্টিতে তাকালো। ইংরেজ শিবিরের কাছাকাছি এসে মোচো যোদ্ধারা থামলো। ওখান থেকে ওরা স্কাউটের দল পাঠালো পাহাড়-চুড়োর মানুষদের দেখবার জন্য।

মেরুনরা নিজেরা শিবির বানালো না। ওরা ঘাসের উপরে ব'সেও রইলো না। ক্যাপটেন ওঁর হাত উপরে তুলে রাখলেন। হাত যখন নামালেন তখন যোদ্ধারা সব হঠাৎ যেন কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

যতক্ষণ-না অন্ধকার হ'য়ে এলো ওর সব এইভাবেই রইলো। তারপর ওদের ক্যাপটেন খুব আস্তে একটা শিশ দিলেন। ওরা সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হ'য়ে গেলো। অপেক্ষা করলো কতক্ষণে স্কাউটরা ফিরে আসে। একটু পরেই ওরা পাহাড়চুড়োয় মানুষদের দেখা পেলো।

১৩

ক্যাপটেন ডিকের সম্মতি

'আমরা চ'লে যাবার পরে আর কি কোনো যুদ্ধ হয়েছে?' টমি ওর বাবাকে জিগেস করলো।

'না।'

'তাহ'লে আমরা ঠিক সময়েই এসে গেছি,' টমি বললো।

একটা গাছের নিচে বাবার পাশে শুয়ে-শুয়ে টমি কথা বলছিলো। দুই মেরুন সৈন্যের দল বনের ঠিক মধ্যিখানে একটা শিবির পেতেছে। সর্দারেরা পরামর্শ সভা করছিলেন। শিবিরের চারদিকেই স্কাউট। সকলেই ফিশফিশ ক'রে কথা বলছে। কোনো আগুন জ্বালানো হয়নি।

'তুমি আর জনি একটা দারুণ কাজ করেছো,' টমির বাবা বললেন। 'সর্দার ফিলিপ তোমাদের জন্যে খুব গর্বিত। আমরা সকলেই গর্বিত।'

'আমরা নিজেরা অবশ্য বেশির ভাগ সময় এমন ভয় পেয়েছিলাম,' টমি বললো।

'মানুষ অধিকাংশ সময় ভয় পেলেই তবে সবচেয়ে সাহসের কাজটা করতে পারে,' ওর বাবা উত্তর দিলেন।

'চার্লি নিশ্চয়ই এখনো ভয়ে সিঁটিয়ে আছে,' টমি বললো।

বাবা একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে আরাম ক'রে পাশ ফিরে শুলেন।

'একটা কথা বলি তোমাকে,' উনি খুব চাপা গলায় বললেন।

'হ্যাঁ, বলো।'

'চার্লি যে লুকআউট পাহাড়ের দৌড়ে ফাঁকি দিয়েছে তা সর্দার ফিলিপ এবং আমরা কয়েকজন জানতাম।'

টমি খুব অবাক হ'য়ে গেলো।

'কী ক'রে জানলে তোমরা?' সে জিগেস করলো।

'আমরা তো মেরুন। এইসব পাহাড়-পর্বত আমরা চিনি। চার্লি যখন ফিরে এলো তখন ও তেমন ক্লান্ত ছিলো না, তা ছাড়া ও ভালো ক'রে মুখ মোছেনি। ফলে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে ও ইতিমধ্যে খেয়েছে।'

টমি চুপ ক'রে থাকলো। শুয়ে-শুয়ে ভাবলো: সর্দার তাহ'লে সবই জানতেন গোড়া থেকে? তা এখন তাহ'লে ওকে কী করা হবে? ওকে কি ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে?' সে বাবাকে জিগেস করলো।

'আমাদের কোনো যোদ্ধাকে তো আমরা এখন চার্লিকে উদ্ধার ক'রে আনবার জন্যে পাঠাতে পারি না,' বাবা উত্তর দিলেন। 'এটা যুদ্ধ। সবার আগে গ্রামকে বাঁচাতেই হবে।'

টমি উঠে বসলো।

'কিন্তু চার্লি যে সমস্ত গ্রামকে বাঁচিয়েছে! চার্লি হঠাৎ গিয়ে না-পড়লে লালকোর্তারা জনিকে ও আমাকে নিশ্চয়ই ধ'রে ফেলতো।'

টমির বাবা বিষণ্ণ বোধ করলেন। উনি বুঝতে পারছেন যে চার্লি তার কর্তব্য করেছে। টমি অবশ্য সে-কথা ভাবছিলো না। সে চায় চার্লি নিরাপদে ফিরে আসুক।

'হ্যাঁ, চার্লি তখন গ্রামকে বাঁচিয়েছে বটে। কিন্তু ভয় কী জানো? চার্লি হয়তো এতোক্ষণে আমাদের সম্বন্ধে সব কথা লালকোর্তাদের ব'লে দিয়েছে। ইংরেজরা ওকে যে-শাস্তি দেবে তাতে ওর মনের জোর ও সাহসে হয়তো কুলোবে না।'

'তুমি কী বলতে চাও?' টমি জিগেস করলো।

'সে হয়তো ইংরেজদের পাহাড়চুড়োয় আসবার পথ দেখিয়ে দেবে,' বাবা বললেন।

'তা সে কখনোই দেবে না!' টমি বেশ রাগত স্বরেই বললো। 'জনি আর আমাকে বাঁচাবার সময় সে যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছে।'

'ঠিক, টমি, এ-কথা ঠিক। চার্লি তখন খুবই সাহস দেখিয়েছে। চার্লি যদি আমার বন্ধু হ'তো তাহ'লে আমি হয়তো অন্যান্য কিশোর যোদ্ধাদের নিয়ে ক্যাপটেন ডিকের কাছে যেতাম। ক্যাপটেন ডিকই তো আমাদের নেতা,' বাবা খুব শান্ত গলায় বললেন।

টমি উঠে দাঁড়ালো। শিবিরের চারদিকে ঘুরে-ঘুরে সে তিনবার ব্যাঙের ডাক ডাকলো। একে-একে জনি, ডেভিড ও ইউরিয়া এসে জড়ো হ'লো। বাবার কথা ও সবাইকে সবিস্তারে বললো। ওরা চটপট ঠিক করলো যে ক্যাপটেন ডিকের কাছে যেতে হবে।

পরামর্শসভা থেকে ফেরবার পথে ওরা তাঁর সঙ্গে দেখা করলো।

'ক্যাপটেন ডিক, দয়া ক'রে আমাদের একটা কথা শুনুন,' টমি বললো।

কাপটেন থামলেন। 'তুমি টমি?' উনি বললেন। 'আর এরা কিশোর বাহিনীর অন্যান্যেরা?'

'হ্যাঁ, ক্যাপটেন ডিক, আমরা কখন চার্লিকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে যাচ্ছি?'

'আক্রমণের আগে নয়,' ক্যাপটেন ডিক উত্তর দিলেন। 'এখুনি চার্লিকে আনতে যাবার মতো অত যোদ্ধা আমাদের নেই।'

'আক্রমণ করছি?' জনি জিগেস করলো। ও খুব অবাক হ'য়ে গেছে।

'হ্যাঁ, কারণ ইংরেজ সৈন্যরা তো আশা করবে না যে আমরা ওদের আক্রমণ করবো।'

'কিন্তু আক্রমণ করলে তো আমাদের অনেক লোকজন হারাতে হবে,' টমি বললো। 'আমাদের অনেক লোক যুদ্ধে নিহত হবে। তার চেয়ে আমরা ওদের একটা ফাঁদে ফেলছি না কেন?'

ক্যাপটেন ডিক উত্তর দেবার আগে অনেকক্ষণ থেমে রইলেন। তারপর খুব নিচু স্বরে কথা বলতে আরম্ভ করলেন। 'এর দুটো কারণ আছে। তোমাদের সব কথাই বলবো। সব তোমাদের জানা দরকার। তোমরা গ্রামের জন্যে সত্যিই ভালো কাজ করেছো। প্রথম কারণ হ'লো যে, লালকোর্তারা এখন কোনো ফাঁদে পা দেবে না। গতকাল ওরা বুঝে গেছে যে, আমরা ওদের টেনে বার করবার চেষ্টা করছি। এবং তার কারণও ওরা এতক্ষণে আন্দাজ ক'রে ফেলেছে। ওরা হয়তো জানে যে আমরা সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছি। দ্বিতীয় কারণ, ওরা হয়তো চার্লিকে দিয়ে জোর ক'রে আমাদের গ্রামের পথ বার ক'রে নিতে পারে। আর তাই যদি হয় তাহ'লে ফাঁদে ফেলবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ওদের ঘুরন্ত বন্দুকে আমাদের টুকরো-টুকরো ক'রে ফেলবে। ফাঁদে ফেলবার মতো জায়গাও একটাই মাত্র আছে। তারা-আপেল খাদে। ওখানে ওরা ঘুরন্ত বন্দুক চালাতে পারবে না।' তারা—আপেল খাদ জায়গাটা ছেলেরা সবাই চিনতো। ওখানকার আপেল গাছ বিখ্যাত, ফাঁদের পক্ষে জায়গাটা চমৎকার। দু-দিকেই ঘন নিবিড় বন। মেরুনরা দুদিকেই লুকিয়ে থেকে গুলি গোল্লা চালাতে পারে।

'কিন্তু চার্লি সৈন্যদের গ্রামে আনবার আগেই তো আমরা ওকে বার ক'রে আনতে পারি,' জনি বললো।

'সে-রকম লোক আমাদের নেই। আর তা ছাড়া আজ রাতে ইংরেজ সৈন্যরা জোর পাহারা দেবে।'

হঠাৎ, টমির মাথায় একটা বুদ্ধি-এলো।

'কিন্তু আমরা তো তাকে বার ক'রে আনতে পারি, ক্যাপটেন ডিক! আমরা কিশোর বাহিনীর ছেলেরা যদি যাই, তাহ'লে আপনার যোদ্ধাদের তো পাঠাতে হয় না।'

ক্যাপটেন ডিক অনেকক্ষণ ধ'রে ভাবলেন। উনিও চার্লিকে আনবার জন্যে চিন্তিত। চার্লি যদিও ভুল করেছে, তবু সে কষ্টও কিছু কম পায়নি। ছেলেরা একটা বড়ো ঝুঁকি নিতে চাইছে। তবে মেরুনদের তো ঝুঁকি নিতেই হয়।

গাছের মধ্যে দিয়ে আকাশের তারাদের দিকে চেয়ে দেখলেন ক্যাপটেন ডিক।

'চাঁদ ওঠবার আগেই তোমাদের কাজ শেষ করতে হবে,' ক্যাপটেন বললেন।

'চাঁদ ওঠবার আগে', টমি কথাগুলো আবার বললো।

'ঠিক আছে তবে,' ক্যাপটেন ডিক চাপা স্বরে বললেন।

১৪

লালকোর্তাদের হারাবার ফন্দি

ছেলেরা যখন গ্রাম থেকে বেরুলো তখন ওদের পরনে ছিলো লম্বা ট্রাউজার আর সঙ্গে ছিলো শুধু ছুরি। ওরা গায়ের শার্ট, তীর-ধনুক সব মেরুন শিবিরে রেখে গেলো। আবারও আগের মতো, ওদের বুকে সেই মালিশ মাখানো হয়েছে। ওরা তরতর ক'রে পাহাড় বেয়ে নেমে এলো। গাছের সঙ্গে গা ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে চললো। কোনো ইংরেজ স্কাউট দেখা যায় কিনা দেখতে-দেখতে এগুলো।

মাইল চারেক পরে ইংরেজ শিবিরের আলো প্রথম চোখে পড়লো। টমি ব্যাঙ ডাকল আর ছেলেরা সব তক্ষুনি থেমে গেলো। টমির দিকে ঝুঁকে পড়লো সবাই।

'দুজন ভেতরে যাবে, আর দুজন এখানে থেকে পাহারা দেবে,' টমি বললো। 'প্রথম দুজন যদি ধরা পড়ে তাহ'লে অন্য দুজন ফিরে গিয়ে ক্যাপটেন ডিককে খবর দেবে।'

'কে-কে ভেতরে যাবে!' ডেভিড জিগেস করলো।

'আমি একজন,' টমি বললো। 'আর একজনকে বেছে সঙ্গে নেবো।'

মেরুনদের মধ্যে প্রচলিত একটা সহজ খেলা খেলে ওরা ঠিক করলে কে যাবে। খেলায় জিতলো ডেভিড।

'তাহ'লে ডেভিডই আমার সঙ্গে যাবে,' টমি বললো।

ওরা চটপট বেরিয়ে গেলো। জনি আর ইউরিয়া উপত্যকার কিনার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রইলো।

প্রথম দিকে টমি আর ডেভিড সন্তর্পনে হাঁটছিলো, কিন্তু শিবিরের কাছাকাছি এসে ওরা হামাগুঁড়ি দিতে আরম্ভ করলো। একটা উঁচু পাহাড়ের কাছে এসে ওরা তার পেছনে থেমে গেলো।

'আমি ডান দিকে দেখবো, তুই বাঁ দিকে। খেয়াল রাখিস চালিকে দেখা যায় কিনা,' টমি ডেভিডকে বললো।

পাহাড়ের চারপাশে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো ওরা। আবহাওয়া এখন চমৎকার, তাই সৈন্যরা শিবির করেছে একেবারে খোলা জায়গায়। তিনটে আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। প্রত্যেক আগুনের চারপাশ ঘিরে কয়েকজন ক'রে সৈন্য। শিবিরের চারধারে পাহারাদারদেরও দেখতে পেলো ছেলেরা। প্রত্যেক কোণে একজন ক'রে মোট চারজন পাহারা দিচ্ছে। সৈন্যরা এখন খাওয়া-দাওয়া করছে।

আগুনের থেকে খানিকটা দূরে বড়ো-বড়ো ছায়া পড়েছে। তারই একটার ধারে চার্লিকে দেখা গেলো।

ওর হাতদুটো পিঠের দিকে ঘুরিয়ে বাঁধা, আর একজন সৈন্য ওকে খাবার দিচ্ছে। এক-একবার এক গাদা ক'রে খাবার চার্লির মুখে পু'রে দিচ্ছে আর অন্য-একজন সৈন্য হেসে-হেসে উঠছে। রাগে টমি ও ডেভিডের মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করতে থাকলো।

'আমরা কি ওর খুব কাছে গিয়ে পড়ে দড়িটা কেটে দিতে পারি না,' ডেভিড বললো।

চার্লি কাঁদছিলো আর কান্নার চাপে ওর কাঁধ কেঁপে-কেঁপে উঠছিলো। ওরা বুঝতে পারছে ওর কী-রকম ভয় করছে আর একলা লাগছে।

'ওকে বার ক'রে আনতেই হবে,' টমি বললো।

'কিন্তু ওকে বার ক'রে আনতে গিয়ে সৈন্যদের কেউ যদি আমাদের দেখে-ফ্যালে,' ডেভিড বললো।

'ওদের নজর অন্য-কোনোদিকে যদি ঘুরিয়ে দিতে পারা যায়,' টমি বললো, 'তাহ'লে সেই ফাঁকে আমি অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে ওর দড়ি কেটে দিতে পারি।'

হঠাৎ, ডেভিড খুব আস্তে একটু হাসলো। 'চার্লির ওপর থেকে ওদের নজর কী ক'রে সরিয়ে আনতে হবে তা আমি জানি,' ডেভিড বললো। 'তুই শুধু দড়িটা কাটবি, তাহ'লেই হবে। আমার দিকে নজর রাখবি। আর চার্লিকে নিয়ে যখন তৈরি তখন তিনবার ব্যাং ডাকবি।'

'কী, করবি কী তুই,' টমি জিগেস করলো।

'আমি ওদের সঙ্গে এমন-একটা গল্প ফাঁদবো যার শেষ কোনো নেই। গল্পটা হবে এক ভয়ংকর ঝড় নিয়ে, ঐ ঝড় কোনোদিনও থামবে না। তাহ'লে ঐ কথাই রইলো, চার্লির দড়ি কাটার পরে তিনবার ব্যাং ডাকবি।'

আর-কোনো কথা না-ব'লে ডেভিড এগিয়ে গেলো। ওদের লালকোর্তাদের আগুনের দিকেই হেঁটে গেলো ও।

কথা বলবে কি টমি তখন বেজায় হতভম্ব হ'য়ে গেছে। ডেভিড কি বদ্ধ পাগল হ'য়ে গেছে ?

ডেভিড খুব চড়া গলায় একটা মেরুনদের গান গাইলো। পাহারাদারদের একজন ওকে থামতে বললো। কিন্তু ডেভিড এগিয়েই চললো। পাহারাদার ওর বন্দুকের টিপ করলো ডেভিডের দিকে। কিন্তু সে গান গেয়েই চললো। একটা আগুনের ধারে একজন অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন। উনি বিরাট চীৎকার ক'রে-একটা আদেশ দিলেন। পাহারাদার তার বন্দুক নামিয়ে নিলো। ডেভিড তার গান গাইতে-গাইতে এগিয়েই বললো। ও একবারও চার্লির দিকে তাকায়নি। আগুনের কাছে না-আসা পর্যন্ত ওর গান শেষ হয়নি। কাছাকাছি এসে ও থামলো। সৈন্যরা সব একসঙ্গে চার্লির দিক থেকে ফিরে ওর দিকে তাকাচ্ছে। ডেভিড দু-হাত মাথার উপরে তুলে চেঁচিয়ে বললো : 'নমস্কার লন ভদ্রজন, লালকোর্তা মহাপ্রভুগণ।'

এক মুহূর্তের জন্য সব চুপচাপ। পরক্ষণেই ক্যাপটেন বেয়াড়া হুংকার ছাড়লেন :

'ছেলেটিকে এ-ধারে নিয়ে এসো!'

দুজন সৈন্য ডেভিডকে ধরতে চেষ্টা করলো। কিন্তু সে দ্রুতপায়ে ক্যাপটেনের দিকে এগিয়ে গেলো। মাথা নুইয়ে ওঁকে নমস্কার জানালো।

'কে তুমি? কী চাও এখানে?' ক্যাপটেন চেঁচিয়ে উঠলেন।

'আমার নাম ডেভিড, আমি এক মেরুনের ছেলে। আমি গান গেয়ে-গেয়ে বেড়াই আর অ্যানান্সির গল্প বলি। বনের মধ্যে ঘুরছিলাম। দেখলাম লালকোর্তা প্রভুদের আগুন জ্বলছে। তাই অ্যানান্সির গল্প শোনাতে চ'লে এসেছি। সদয় ইংরেজগণ যদি একটা টাকা দেন আর দু-মুঠো ভাত।'

'তুমি, মেরুনের বাচ্চা, ইংরেজদের কাছে দু-মুঠো ভাতের জন্য এসেছো? তোমার কি মাথা খারাপ? হাঃ হাঃ হাঃ,' ক্যাপটেন হেসে উঠলেন।

সৈন্যরাও সব হেসে উঠলো। কিন্তু, ওরা যখন হাসছে, ডেভিড তার গল্প বলা শুরু ক'রে দিয়েছে।

'এক-যে ছিলো রাজা, তার যে-সব সৈন্যসামন্ত ছিলো, তারা সবাই পরতো লালকোর্তা। তারা সবাই ছিলো দারুণ সাহসী, গানে-গানে তাদের কীর্তি

কথা গাওয়া হ'তো। আর এই সাহসীরাই সমুদ্রের এ-পার থেকে ও-পার পর্যন্ত জ্যামেকাবাসীদের নতুন রাজা।'

এক-এক ক'রে সৈন্যদের হাসি থেমে গেলো। ওরা ডেভিডের চমৎকার গলার স্বর শুনতে শুরু করেছে আর অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখছে ওর ঝকঝকে সুন্দর কালো মুখের দিকে।

টমির তো নাড়ি থেমে যাবার জোগাড় হয়েছে। সে ছুরি বার ক'রে হাতে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে একটু-একটু ক'রে হামাগুঁড়ি দিয়ে এগোলো। চার্লির মাথার পেছন দিকে ও দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। ডেভিড যে কতক্ষণ গল্প চালাতে পারবে তা সে বুঝতে পারছে না। কিন্তু সে এটা জানতো যে অ্যানান্সির গল্পের ভালো কথক ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প চালাতে পারে।

'ইংলণ্ডের সাহসী লোকেরা একমাত্র পাহাড় ছাড়া দ্বীপের সর্বত্র তাদের শাসন চালালো। আফ্রিকার লোকেরা, যারা মেরুন হয়েছিলো, তাদের রাজত্ব ছিলো ওখানে,' ডেভিডের গল্প চললো।

গল্প বলতে-বলতে সে এধার ওধার হাঁটা-চলা করতে লাগলো। কখনো-কখনো একটা ঘন ঝোপের ধারে এসে দাঁড়াচ্ছে। ইতিমধ্যেই একটা বুদ্ধি এসে গেছে ওর মাথায়।

'একদিন হ'লো' কী! বছরের ঠিক মাঝামাঝি এক দারুণ ঝড় এলো! খুব ভোর থেকে ঝড় শুরু হ'লো আর সারাদিন উলটোপালট ঘূর্ণি বাতাস বইলো। ঝড়ে ব্রের অ্যানান্সির বাড়ি ভেঙে ধুলোয় মিশে গেলো। ব্রের অ্যানান্সির তো বেজায় মন খারাপ। ইংরেজদের অধিকার পুব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত কায়েম। মেরুনদের হাতে শুধু পাহাড়। কিন্তু ব্রের অ্যানান্সি চেয়েছিলো শুধু তার নিজে হাতে-গড়া বাড়িটার অধিকার রাখতে। আর এই তার প্রথম ঝড়।'

গল্প এই পর্যন্ত আসতে টমি চার্লির কাছে পৌঁছে গেছে। যে-সৈন্যটি চার্লিকে খাবার দিচ্ছিলো সেও স'রে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে মিশে গেছে। ওরা সবাই মন দিয়ে ডেভিডের গল্প শুনছে। টমি ঠিক চার্লির পেছনে এসে থামলো। চার্লিকে ভ্যাবাচ্যাকা দেখাচ্ছিলো।

হঠাৎ চার্লি লাফিয়ে উঠলো। ওর পেছনে একটা ফিশফিশানির শব্দ। চার্লি সবে মাথা ঘোরাতে চেষ্টা করছিলো, থেমে গেলো।

'আমরা তোর জন্যে এসেছি। এক্ষুনি তোকে ছাড়িয়ে নেবো,' টমি আবার ফিশফিশিয়ে বললো।

'না-না, চেষ্টা করিসনে—আমার ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে ছাখ।' চার্লিও ফিশফিশ ক'রে বললো।

টমি তাকিয়ে দেখে আঁৎকে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলো আর কি! চার্লির গলায় বাঁধা একটা দড়ি, তার একটা দিক ঐ সৈন্যের হাতে ধরা। মাঝে-মাঝে সৈন্যটি দড়িতে একটু-একটু ক'রে টান দেয়। আর চার্লির মাথা দড়ির টানে-টানে একটু ক'রে লাফিয়ে উঠে এগিয়ে চলে। দড়িতে বাঁধা একটা মুরগির মতো লাগছে ওকে।

'আমি দড়ি কেটে দেবো, আর তারপর বনের মধ্যে ছুটবো আমরা,' টমি বললো। 'আগুনের আলোয় ওরা ঠিকমতো বন্দুকের তাক করতে পারবে না।'

'না, টমি, আমি তোর সঙ্গে ফিরতে পারবো না।'

'কেন? তুই নিরাপদে আবার আমাদের সঙ্গে থাকবি!' টমি চুপি-চুপি বললো।

'আমি পাহাড়চুড়োয় আর ফিরতে পারি না। আমি যে সব মেরুনদের সঙ্গে জোচ্চুরি করেছি!'

'তুই লালকোর্তাদের কী বলেছিস?' টমি জিগেস করলো।

'সব ব'লে দিয়েছি। আমি ওদের বলেছি আমাদের গ্রামে মোট লোক কত। বলেছি যে সর্দার ফিলিপ সাহায্যের খবর পাঠিয়েছেন। বলেছি আমাদের গ্রামে কী ভাবে যেতে হয়। কথা দিয়েছি আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো।' চার্লি ব'লে চলে। চোখের জল তখন ওর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

'কেন বলেছিস, চার্লি?' টমি জিগেস করলো। 'কেন সব কথা বলতে গেলি ওদের?'

'ওরা গরম লোহা চেপে ধরেছিলো আমার মুখে-বুকে,' চার্লি কেঁদে ফেললো, 'আমি ভয় পেয়ে গেলাম!'

'বুঝতে পারছি সব,' টমি বললো।

'চাঁদ উঠলেই লালকোর্তারা যেতে শুরু করবে,' চার্লি বললো। 'যা, ফিরে গিয়ে সর্দার ফিলিপকে সব জানিয়ে দে।'

'আমি এখনই দড়ি কেটে দিচ্ছি। তুইও আমাদের সঙ্গে দৌড়ুতে পারবি, আর নিজেই গিয়ে সর্দারকে বলতে পারবি। এবং উনিও লালকোর্তারা গিয়ে পৌছুবার আগে সব মেরুনদের সরিয়ে দিতে পারবেন।'

'কিন্তু আমি তো ফিরতে পারবো না, টমি। মেরুনদের সঙ্গে জোচ্চুরির জন্যে আমাকে লালকোর্তাদের সঙ্গেই থেকে যেতে হবে,' চার্লি কাঁদতে-কাঁদতে বললো।

'কিন্তু লালকোর্তারা তো তোকে মেরে ফেলবে!' টমি বললো।

'না, গ্রামের পথ দেখিয়ে দিলে ওরা মারবে না।'

'কিন্তু সর্দার ফিলিপ তো আক্রমণ করবেন ব'লে ঠিক করেছেন,' টমি বললো।

চার্লি একটু জোর গলায় কথা বলছে এবার। ওকে উত্তেজিত লাগছে। "ইংরেজদের আক্রমণ করবেন! মোচো মেরুনরা ওঁর সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু ইংরেজদের আক্রমণ ক'রে জিতবেন কী ক'রে। ওদের ঘুরন্ত বন্দুকে আমাদের সবাইকে যে ওরা মেরে ফেলবে।'

'শ্‌ শ্‌ শ্‌! লালকোর্তারা তোর গলা শুনে ফেলবে,' টমি সাবধান ক'রে দিলো।

চার্লি একটু ভেবে নিলো। তারপর বললো, 'না! তোদের সঙ্গে আমি ফিরতে পারি না, তবে লালকোর্তাদের একটা একটা ফাঁদে নিয়ে যেতে পারি আমি।'

'কিন্তু এখান থেকে আরম্ভ ক'রে গ্রামের মধ্যে ফাঁদের জায়গা তো নেই কোথাও,' টমি বললো।

'নেই তা জানি.' চার্লি বললো 'কিন্তু একটা জায়গা ভেবে বার করা যাক। তারপর তুই সর্দার ফিলিপকে গিয়ে বলিস আমি ইংরেজদের সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।'

'তারা-আপেল খাদ!' টমি তাড়াতাড়ি ব'লে ফেললো।

'ঠিক আছে। তুই এক্ষুনি ফিরে যা। সর্দার ফিলিপকে বলিস 'আমি ওখানে ওদের নিয়ে যাচ্ছি।'

ওর গাল বেয়ে চোখের জল নামছে আর ওর কাঁধ কান্নায় কেঁপে-কেঁপে ফুলে-ফুলে উঠছে।

'না, চার্লি, তুই আমাদের সঙ্গে ফিরে চল,' টমি বললো।

কিন্তু চার্লি মাথা নাড়লো।

'ফিরে যা, তাড়াতাড়ি যা তারা-আপেল খাদে!' ওর চোখের জলের মধ্যেই চার্লি বললো।

লালকোর্তার দড়ির টান পড়লো আর চার্লির মাথা আবার সামনে এগিয়ে

গেলো। টমি হামাগুঁড়ি দিয়ে পেছিয়ে এলো একটু। সে ছায়ায় অন্ধকারেই র'য়ে গেলো। ওখান থেকে সে ব্যাং ডাকলো।

ডেভিডের গলা শুনতে পাচ্ছে :

'চতুর্থ দিনের ঝড়ের পর ব্রের অ্যান্যান্সি তার নিজের হাতে গড়া বাড়ির দরজা পর্যন্ত এলো। যে-সব লালকোর্তারা ওর ওপর নজর রাখছিলো ও তাদের সবাইকে দেখলো।'

টমি বনের একেবারে কিনারে এসে গেছে। এখন সে তিনবার ব্যাঙের ডাক ডাকলো। ডেভিড মাথা উঁচু করলো। টমি যে-গাছগুলো পর্যন্ত গিয়েছিলো ওর চোখ যেন সেদিকে তাকিয়ে দেখছে। কিন্তু ওর স্পষ্ট গলায় যে-ঝড়ের শেষ নেই তার গল্প এগিয়েই চললো।

'তখন ব্রের অ্যান্যান্সি বললো,' হেই, বোকা, ভোদা, লালকোর্তার দল! তোরা নিজের কাজ ফেলে এক মেরুন ছেলের গল্প শুনতে এসেছিস কেন? ও গল্প তো ফুরোবে না। হা, হা, হা! হোঃ হোঃ হোঃ!'

তারপর আচমকা ডেভিড যেন নিজেকে ছুড়ে ফেললো ঐ ঘন ঝোপের মধ্যে। এই ছিলো, এই নেই, —যেন চক্ষের নিমেষে উঠে গেলো।

লালকোর্তারা এ ওর মুখের দিকে চাইলো। একটু-একটু ক'রে ওরা বুঝতে পারছে ঐ ছেলে কী ক'রে ওদের ধাপ্পা দিয়েছে। রাগে চীৎকার করতে-করতে ওরা ঝোপের দিকে ছুটলো। কিন্তু ডেভিডের আর পাত্তা পাওয়া গেলো না।

১৫

যুদ্ধ

পাহাড়ের উপর সূর্য উঠলো। রোদের আলো গাছের ভিতর দিয়ে তারা-আপেল খাদে এসে পড়লো। টমি ও অন্যান্য কিশোর যোদ্ধারা একটা মোটা গাছে চ'ড়ে বসেছে। ওরা খুব শক্ত ডালের উপর শুয়ে আছে যাতে তীর টিপ করার জন্য হাত দুটো ফাঁকা থাকে। টমি পাতার ফাঁক দিয়ে-দিয়ে খাদের দুই ধারে দেখে নিলো ; মেরুন যোদ্ধারা যে ওখানে লুকিয়ে ব'সে আছে সে তা জানে ! ওরা এমন-ভাবে লুকিয়ে আছে যে কিছুতেই দেখা যাবে না ! কাল রাত্রে টমি যখন চার্লির খবর এনে সর্দার ফিলিপকে বললো তখন উনি সব যোদ্ধাদের আদেশ দিলেন তারা-আপেল খাদে চ'লে যেতে।

প্রথমে, ওরা ওদের সবুজ পোশাক প'রে নিলো। এটা ওদের ফাঁদের পোশাক। মাথা থেকে পা পর্যন্ত গাছের ডালপালা বাঁধলো। তারপর দল বেঁধে তাড়াতাড়ি তারা-আপেল খাদে চ'লে গিয়ে যে যার জায়গায় ব'সে গেলো। গাছের থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে টমি গাছ আর যোদ্ধা কিছুতেই তফাৎ করতে পারছে না।

বাঁ দিক থেকে ব্যাঙের ডাক শুনতে পেলো টমি। মাথা ঘুরিয়ে ডেভিডের দিকে তাকালো। ডেভিড ওর দিকে চেয়ে একটু হাসলো।

'তারা-আপেল খাদে ঢুকলে ইংরেজ সৈন্যরা তোর বড়ো-বড়ো দাঁতগুলো দেখতে পাবে,' টমি বললো।

'ওরা ভাববে একটা দাঁতওয়ালা গাছ। অ্যানান্সির গল্পে যেমন আছে,' ডেভিড উত্তর দিলো।

'কাল রাত্রে অ্যানান্সির গল্প আর কতক্ষণ চালাতে পারতিস তুই ?' টমি জিগেস করলো।

'আমার ঝড় না-ফুরোনো পর্যন্ত,' ডেভিড হাসতে-হাসতে উত্তর দিলো।

হঠাৎ, খাদের ওপাশের গাছের ওপর থেকে, পাখিদের শব্দ শোনা গেলো। অনেক ছোটো-ছোটো গাছ যেন নড়তে থাকলো। বন্দুকে বারুদ ভর্তি করার

ব্দ শুনতে পাচ্ছে ছেলেরা। ওরা জানতো যে, পাখির শব্দ ক্যাপটেন ডিকের।
।টা হ'লো বারুদ ভর্তি ক'রে নেবার সংকেত।

তারা-আপেল খাদ প্রায় একশো গজ চওড়া। যোদ্ধারা খাদের দু-পাশেই আছে; একটা লম্বা সরু উপত্যকাপথে ওরা এই খাদে ঢুকেছে। উপত্যকার পেছনে গাছের ভেতর দিয়েও ওপাশে ওরা দেখতে পাচ্ছে। ওরা আশা করছে যে এই পথেই লালকোর্তাদের দেখা মিলবে—চার্লির পেছন-পেছন তারা এই ফাঁদে এসে ঢুকবে।

মেরুনদের অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো, কিন্তু ওদের তো ধৈর্যের শেষ নেই। তারপর একসময় লালকোর্তাদের আওয়াজ পাওয়া গেলো।

বড়ো একটা গোরুর দলের মতো আওয়াজ করতে-করতে আসছিলো ওরা। ছেলেরা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আওয়াজ আরো জোরালো হ'লো। তারপর লালকোর্তাদের দেখা পাওয়া গেলো।

ওদের ক্যাপটেন সবার সামনে আসছিলেন। তাঁর পাশে ছোট্টখাট্ট একজন হাঁটছিলো। সেই চার্লি-বেশ মাথা উঁচু ক'রে হাঁটছে এখন।

ওর হাত আর এখন বাঁধা নেই, কিন্তু গলার দড়িটা এখনো আছে। দড়ির একটা ধার একজন সৈন্যের হাতে ধরা। গাছের সারির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় ক্যাপটেন চার্লিকে কিছু বলছিলেন। মেরুন ছেলে চার্লি তারা-আপেল খাদের দিকে দেখালো।

ইংরেজ সৈন্যরা উপত্যকা থেকে নামতে শুরু করলো। টমি জানতো যে মেরুন যোদ্ধাদের দুজনের চোখ চাঁদমারিতে স্থির হ'য়ে আছে। আগের রাতে ছেলেদের কাহিনী সব শোনবার পর ক্যাপটেন ডিক তাঁর নির্দেশ ঠিক-ঠিক সবাইকে দিয়ে রেখেছেন। 'তুমি ইংরেজ ক্যাপটেনকে টিপ করবে,' একজন যোদ্ধাকে ব'লে রেখেছেন। 'আর তুমি টিপ করবে যে-সৈন্য চার্লির গলার দড়ি ধ'রে আছে তার দিকে,' আর-একজনকে ব'লে রেখেছেন।

চার্লি সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে হেঁটে চলেছে। সে জানতো যে সামনের গাছপালার মধ্যে মেরুন যোদ্ধারা তাদের বন্দুক নিয়ে ঠিক তৈরি আছে। ইংরেজ সৈন্যদের সামনের দলটা এবার খাদে ঢুকছে। ওদের ঘুরন্ত বন্দুক একদল সৈন্য টেনে-টেনে আসছে, কিন্তু তা এখনো পেছনে রয়েছে। চার্লি যখন ওদের নিচে দিয়ে যাচ্ছিলো তখন কিশোর যোদ্ধারা একবার তার দিকে তাকালো।

ওর গালের একটা দিক ফুলে রয়েছে। হয় ও প'ড়ে গেছে, না-হয়তো লালকোর্তাদের কেউ ওকে বেজায় মেরেছে।

টমি ও অন্যান্য ছেলেরা সংকেতের জন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। ওরা যে-গাছে লুকিয়ে ছিলো আরো অনেক সৈন্য সে-গাছের নিচে দিয়ে গেলো। দেখতে-দেখতে তারা-আপেল খাদের সবটা ইংরেজ সৈন্যে ভ'রে গেলো। ওদের ভারি বুটের ঘায়ে ধুলো উড়ছে আর মাটি যেন কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

এবার সংকেত এলো। ক্যাপটেন ডিক জোরে একটা আওয়াজ করলেন।

খাদের দু-ধারের সমস্ত গাছ যেন হঠাৎ জেগে উঠলো। গুলি-গোলার আওয়াজ, হাওয়ায় ছুটে-যাওয়া তীরের শাঁই-শাঁই শব্দ, চারদিক কেমন ভয়াবহ হ'য়ে উঠলো হঠাৎ। মেরুন যোদ্ধারা এবার তাদের যুদ্ধের হাঁক ছাড়লো আর পুরোদমে যুদ্ধ শুরু হ'য়ে গেলো।

ছেলেরা চার্লিকে দেখছিলো। ক্যাপটেন ও সেই-যে সৈন্য চার্লির দড়ি ধরেছিলো তারা তো সঙ্গে-সঙ্গে মাটিতে প'ড়ে গেলো। চার্লিও অমনি তড়াক ক'রে এক লাফে খাদের ধারে একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। ও যেন ঠিক খরগোশের মতো গুড়ুৎ ক'রে দৌড়ুলো। টমি ও অন্যান্য কিশোর যোদ্ধারা হাততালি দিয়ে উঠলো। 'চার্লি! হুরে! হুরে!' ওরা চীৎকার ক'রে উঠলো।

'চ'লে এসো সবাই। ওদের মনে রাখার মতো একটু-কিছু দেওয়া যাক!' টমি চেঁচিয়ে বললো।

ওরা লালকোর্তাদের ঝাঁকের মধ্যে তীর ছুড়লো। তাদের কেউ-কেউ প'ড়ে গেলো। দু'-একজনে ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে আবার প'ড়ে গেলো। অনেকেই স্থির হ'য়ে গেলো। লালকোর্তারা বুঝেই উঠতে পারছে না কোনদিকে টিপ করবে। ওরা তো বুঝতে পারছে না কোনটা গাছ আর কোনটা মেরুন।

হঠাৎ, যুদ্ধের আওয়াজ ছাপিয়ে একটা শিঙার আওয়াজ শোনা গেলো। এটা হ'লো ইংরেজ সৈন্যদের পিছু হঠবার সংকেত। মেরুনরা তখন একটা বিরাট জয়ধ্বনি করলো। ওরা নিজেরা তো সাহসী এবং জানতো যে ইংরেজদের মধ্যেও অনেক সাহসী যোদ্ধা আছে। কিন্তু ওদের ক্যাপটেন নিহত, কাজেই ওদের তো পিছু হঠতেই হবে।

গুলি ছুঁড়ে পেছোতে-পেছোতে লালকোর্তারা খাদের বাইরে চ'লে গেলো। পেছোবার সময় ওরা চেষ্টা করেছিলো ঘুরন্ত বন্দুকগুলোকে নিয়ে যেতে। কিন্তু

এতে ক'রে পেছিয়ে আসাটা এত আস্তে হ'য়ে যাচ্ছিলো যে ওদের অনেক লোক হারাতে হ'লো।

মেরুন যোদ্ধাদের কেউ-কেউ লালকোর্তাদের অনুসরণ করতে চাইছিলো। কিন্তু ক্যাপটেন ডিকের আদেশে তারা থেমে গেলো।

'ফিরে চলো, ফিরে চলো! বনের মধ্যে ফিরে চলো!' ক্যাপটেন ডিক চীৎকার ক'রে হুকুম দিলেন।

টমি ওর ধনুক ঝুলিয়ে কাঁধে তুলে নিলো।

'চার্লি! চলো, চার্লির কাছে যাওয়া যাক!' টমি ওর বন্ধুদের চেঁচিয়ে বললো।

কিশোর যোদ্ধা চারজন লাফ দিয়ে মাটিতে নেমে তরতর ক'রে খাদের পাশ দিয়ে নেমে চ'লে গেলো। চার্লি যে-ঝোপের মধ্যে ঢুকেছিলো, ওরা সেই ঝোপে ঢুকে গেলো। দৌড়ুতে-দৌড়ুতেই ওরা চার্লির মাথা দেখতে পেলো।

'চার্লি! চার্লি! বেরিয়ে আয়—বনের মধ্যে চল!'

ওরা সবাই যখন ওকে ঘিরে রয়েছে তখন চার্লির ঠোঁটে মৃদু হাসি। ওরা তাড়াতাড়ি ক'রে সবাই ওখান থেকে বনের দিকে ছুটলো। চীৎকার করতে-করতে, হাসতে-হাসতে ওরা দৌড়ুলো।

১৬

জয়

ঐ রাত্রে পাহাড়চুড়োর গ্রামে এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করা হ'লো। ক্লান্ত বটে, তবে জয়ের জন্য মেরুনরা সবাই খুব খুশি। সারা রাত ধ'রে ওরা গান গাইলো আর নাচলো।

প্যারেড গ্রাউণ্ডে বানানো মঞ্চের উপর ব'সে আছেন সর্দার ফিলিপ আর সর্দার জেম্‌স্। কিশোর বাহিনীর সকলে ওঁদের সঙ্গে ব'সে। বড়ো আগুনের কুণ্ডে আগুন জ্বলছে—তার আলোয় চারদিক আলো হ'য়ে গেছে। ঐ আগুনে অনেক বুনো শুয়োর আর একটা ষাঁড় সেঁকা হচ্ছে। গাদা-গাদা ফল রয়েছে। গান-বাজনার লোকেরা রয়েছে। তাদের পুরোনো দেশ আফ্রিকার অনেক নাচ নাচলো লোকেরা।

ভোজসভার শেষে সর্দার ফিলিপ উঠে দাঁড়ালেন এবং চুপ করাবার জন্যে ওঁর হাত উপরে তুললেন।

'আমার ভাই-বোনেরা, আজ শত্রুর উপরে জয়লাভের জন্যে আমরা এখানে আনন্দ করছি,' উনি বললেন। 'এটা খুবই সংগত, কারণ আমরা সত্যিই ভালো লড়াই করেছি। কিন্তু মনে রাখবেন যে ইংরেজরাও বেশ ভালো লড়েছে। এখন আমরাই পুরোনো জ্যামেকাবাসী আর ইংরেজরা নতুন। আশা করা যাক যে আমরা একসঙ্গে শান্তিতে বাস করতে পারবো। আর যদি আমরা একসঙ্গে থাকতে না-পারি তাহ'লে ইংরেজরা সমতলে থাকবে। আমরা আমাদের পাহাড়ের দখল রাখবো।'

'পাহাড় চাই, আমরা আমাদের পাহাড় চাই!' মেরুনরা চীৎকার ক'রে জানালো।

আবার যখন কথা শুরু করলেন তখন সর্দারের গলা বিষণ্ণ লাগছিলো, 'দু-দিকেই প্রচুর লোক নিহত হয়েছে। এটা অমঙ্গল।'

সবাই সর্দার ফিলিপের সঙ্গে একমত হ'লো। মেরুন স্ত্রীলোকেরা ও শিশুরা যারা তাদের স্বামী কিংবা পিতাকে হারিয়েছে তারাও বিষণ্ণ।

সর্দার ফিলিপ তখন চার্লির দিকে ফিরলেন।

'আমাদের তরুণ সাহসী চার্লিকে আমরা প্রায় হারাতে বসেছিলাম,' উনি বললেন।

সবাই মিলে এমন আনন্দধ্বনি করলো যে গাছপালা পর্যন্ত যেন কেঁপে উঠলো।

'অন্যান্য কিশোর যোদ্ধারাও, টমি, জনি, ডেভিড এবং ইউরিয়া—এরাও সাহসের পরিচয় দিয়েছে,' সর্দার ফিলিপ গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে বললেন। 'ওরাই চার্লিকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে এনেছে আর পাহাড়চুড়ো গ্রামকে বাঁচিয়েছে!'

'হুরে! হুরে! হুরে!' মেরুনরা সব চেঁচিয়ে উঠলো।

এত জোর আওয়াজ হ'লো যে বনের মধ্যে বুনো বরাগুলো পর্যন্ত বেজায় ভয় পেয়ে গেলো।

———

মেরুন কারা?

সম্পাদকের টীকা

'নতুন জগতের প্রথম সফল বিপ্লবী' ছিলেন জেনারেল কুদহোয়ে (বা কুজো)। ক্রীতদাসপ্রথা ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে মেরুনরা অবিশ্রাম সংঘর্ষ চালিয়েছিলো জ্যামেকায়—প্রথমে স্পেনের কোন্‌কিস্তাদোরদের বিরুদ্ধে, পরে ইংরেজ লালকোর্তাদের বিরুদ্ধে।

মেরুনদের সব খবর ও ইতিহাস এতকাল সযত্নে তারা গোপন রেখেছিলো তাদের নিজেদের মধ্যে। তাদের সমাজ ঘননিবিড়—জ্যামেকার বাইরে তারা কিছুতেই তাদের কাহিনী ছড়াতে দিতে চাইতো না। ১৯৭৭ সালে মিলটন ম্যাকফারলেন 'কুদহোয়ে দি মেরুন' নামে একটি বই লিখে এতদিনকার অগোচর সব রহস্যের ওপর থেকে পর্দা উঠিয়ে দিয়েছেন। ম্যাকফারলেন স্বয়ং কুদ্‌হোয়ের বংশধর: মেরুনরা তাদের কাহিনী বংশপরম্পরায় মুখে-মুখে নিজেদেরই মধ্যে প্রচার করতো: ম্যাকফারলেন সব কাহিনী শুনেছিলেন তাঁর ঠাকুরদা গ্র্যাণ্ড-পা ওয়ালেস-এর কাছে।

মেরুনদের পূর্বপুরুষদের প্রথমে জোর ক'রে আফ্রিকা থেকে ধ'রে আনে স্পেনের বোম্বেটেরা—আনে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে জ্যামেকায়। প্রচণ্ড নির্যাতন ও অবিশ্রাম তাড়ন-পীড়ন সত্ত্বেও তারা গোড়ায় দাস হিশেবে কাজ করতে অস্বীকার করেছিলো; পরে এমন ভঙ্গি করে যেন তারা পোষমানা ও বশংবদ হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু সেটা ছিলো তাদের রণকৌশলেরই অংশ, কারণ পাহারা একটু শিথিল হ'তেই তারা জ্যামেকার বনে-পাহাড়ে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের সমাজ প্রতিষ্ঠা করে; সেখানে তারা জমি চাষ করে; এছাড়া তাদের জীবন ধারণের অন্যান্য উপায়ের মধ্যে প্রধান ছিলো শিকার, মাছধরা ও ফলমূল সংগ্রহ। স্পেনীয় কোন্‌কিস্তাদোররা তাদের আবার পাকড়াবার জন্য বহু নিষ্ফল চেষ্টা ক'রে শেষটায় তাদের পুনর্দখল করার আশা ছেড়ে দেয়। কিন্তু ইংরেজরা তা করেনি; ১৬৫৫ সালে স্পেনীয়দের কাছ থেকে জ্যামেকা কেড়ে নেবার পর থেকে ইংরেজরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে মেরুনদের খোঁজ করতে থাকে: তাদের

পাকড়ে ফেলে আবাদে দাস হিশেবে কাজ করাবার প্রচণ্ড প্রলোভনই ইংরেজদের চালিত করেছিলো। জ্যামেকার সম্প্রসারণশীল অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় শ্রমজীবী মানুষদের একান্ত অভাবই ইংরেজদের মেরুনদের অধিকার ক'রে নেবার কাজে এমন তীব্রভাবে একাগ্র রেখেছিলো। তাছাড়া মেরুনরা প্রায়ই অতর্কিত হামলা চালাতো আবাদগুলোয়, এবং চিরকালই তারা ছিলো পলাতক ক্রীত-দাসদের নির্ভর ও আশ্রয়। ইংরেজরা কত-রকম যে রণকৌশল ব্যবহার করেছিলো, তার ইয়ত্তা নেই ; একবার এমনকী উত্তর আমেরিকা থেকে মেস্‌কিটো ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে এসেও তাদের হদিশ করার চেষ্টা করা হয়, চেষ্টা করা হয় তাদের আস্তানাগুলো খুঁজে বার করার। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়, এটা মনে রাখা জরুরি। সেই জন্যেই, শেষকালে অন্য উপায় না-দেখে, ১৭৩১ সালে ইংরেজরা বাধ্য হয় জেনারেল কুদ্‌হোয়ের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠাতে সন্ধিপ্রস্তাবের শর্তগুলোর মধ্যে ছিলো মেরুনদের নিরাপত্তার অভয়পত্র, পাহাড়ি এলাকাগুলোয় তাদের অধিকারের স্বীকৃতি এবং দাসত্ব থেকে মুক্তির নিঃশর্ত সনদ। মনে রাখতে হবে সরকারিভাবে জ্যামেকা থেকে ক্রীতদাস প্রথা কিন্তু তারও একশো বছর পর ওঠানো হয়েছিলো।

মেরুনরা তাদের ছেলেমেয়েদের ছেলেবেলা থেকেই গেরিলা যুদ্ধে দীক্ষা দিতো। পশ্চিম অফ্রিকায় গোষ্ঠী হিশেবে বাস করতো, সকলের ছিলো সমান অধিকার, নেতা বা সেনাপতি সবাই মিলে মত প্রকাশ ক'রে নির্বাচন করতো। সেই ঐতিহ্য ও সূত্রের প্রতি নির্বাধ আনুগত্যই মেরুনদের প্রচণ্ড শক্তিশালী ক'রে তুলেছিলো, আর তার ফলেই তারা তাদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছিলো।

ভিক রীডের এই কিশোর উপন্যাস এই ঐতিহাসিক পটভূমিকার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে। 'কিশোর যোদ্ধা' উপন্যাসে মেরুনদের জীবনযাপনের রীতি-নীতির নিখুঁত ও সজীব বর্ণনা এই উপন্যাসটিকে এক বিশেষ শক্তি দিয়েছে। কাহিনীটি কাল্পনিক, কিন্তু পুরোপুরি কাল্পনিকও নয়—কারণ এখানে যে-যুদ্ধের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, এ-রকম যুদ্ধ অসংখ্যবার ঘটেছিলো। মেরুনদের মধ্যে যে-উদ্ভাবনী শক্তি, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার যে-নিবিড় সম্পর্ক ছিলো, তার অনেকটাই এই উপন্যাসে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে—আর ফুটে উঠেছে স্বাধীনতার তীব্র উৎকাঙ্ক্ষা।

এখানে ব্রে-র অ্যানান্সির গল্পও ব্যবহার করা হয়েছে। ব্রের মানে

ব্রাদ্যর, আর অ্যানান্সি পশ্চিম আফ্রিকার উপকথা ও কিংবদন্তির চরিত্র। অ্যানান্সি একটি মাকড়শা—সে চালাক, কৌশলী, উদ্ভাবক, স্বাধীনতাপ্রিয়, বিদ্রোহী, রসিক ইত্যাদি প্রায় সবকিছুই। সে রাজনৈতিক মাকড়শা। কত-যে অজস্র গল্প মুখে-মুখে বানানো হ'তো অ্যানান্সিকে নিয়ে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এবং যেটা, আরো, মনে রাখা উচিত, তা হ'লো এখনও অ্যানান্সিকে নিয়ে অনেক গল্প বানানো হয়। অ্যানড্রু সল্‌কি অ্যানান্সিকে নিয়ে অজস্র গল্প ফেঁদেছেন। অ্যানান্সির গল্পে থাকে সমসাময়িক ঘটনার ছায়া, থাকে চমকপ্রদ সব কৌশলের বিবরণ যার সাহায্যে সবরকম দুর্যোগ ও বিপত্তির মধ্যে আত্মরক্ষা করা যায়, আর সেই জন্যেই আজও এই উদ্দীপক মাকড়শাটির কাহিনী জ্যামেকাবাসীদের অফুরন্ত শক্তির ভাড়ার হ'য়ে আছে।

———

রজার মেই

স্বপ্নদেখা মানুষেরা

স্বপ্নদেখা মানুষেরা বেঁচে থাকে জীবন পেরিয়ে
তাদের মৃত্যুর সঙ্গে তাদের স্বপ্নের শেষ নয়
রক্তের ক্ষরণ করে তাদের জীবন বয়ে যায়
মাটির গভীরে আর সেখানে তা হয়ে ওঠে বীজ
এক জীবনের ক্ষয়ে হারায় না সে-স্বপ্ন তাদের
বীজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মাথা তোলে অজস্র সম্ভারে।

আদালত ঘরের সামনেই
মাস্তুলে ঝুলিয়ে ওরা মেরেছিল গর্ডনকে
আঠারোজনকে আরো ঝুলিয়েছে সঙ্গী হিসেবে
যিশুর দুজন শুধু ছিল
তবুও যে স্বপ্ন নিয়ে বেঁচেছে গর্ডন
তার সঙ্গে শেষ হয়নি সেটা
আর যিশু প্রাণ দিল মহৎ যে সমাজবিপ্লব বুকে নিয়ে
তাও তো মরেনি সঙ্গে তার
যিশুর পাশেই আরো দুজনকে বিঁধে দিয়েছিল ওরা ক্রুশে
নতুন মাস্তুলে ওরা ফাঁসিতে লটকেছিল গর্ডনের সঙ্গী আঠারোকে
কিন্তু গর্ডনের সঙ্গে সমতা বা ন্যায়ের বিবেক
মাটির ভিতরে গিয়ে মাপ দিয়ে জেগে ওঠে বীজ হয়ে অজস্রতায়
একশো বছর ধরে মাটির বুকের মধ্যে জেগে ওঠে বীজ
একশো বছর তত বেশি নয়
একশো বছর তত কমও নয়
একশো বছর সে তো একটা সময়, এক ঋতু
আর, সমস্ত কিছুরই চাই একটা সময়, এক ঋতু
আর, প্রতিটি সৃষ্টির এই একটা সময়, এক ঋতু
এই হলো পথ, অন্য কোনো পথ নেই আর

জন্মাবার, ফল ফলাবার এই তো সময় আর ঋতু
নিহিত সে বীজের স্বভাবে
নিহিত সে এর জায়মানতায়, এর ফলে
এই হলো পথ, অন্য কোনো পথ নেই আর
একশো বছর তত বেশি নয়
মাটির ভিতরে খোসা ভেঙে ফেলে বীজ
পথ চিরে নেয় আর ঠেলে ওঠে উর্ধ্বমুখে
জয়োল্লাসে ছুঁড়ে দেয় সূর্যকে সবুজ তার পাতা
যে বাড়ি উঠছে গড়ে তার জন্য উদ্‌বেগ কোরো না
লাঙলের নিচে আজও বপন হয়নি বলে উদ্‌বেগ কোরো না
কেননা সবারই চাই যথার্থ সময়, ঠিক ঋতু।

স্বপ্ন দেওয়া হয়েছিল যাকে কোনো রাতে
রাত্রি বা আঁধার তাকে ফিরিয়ে কি নিতে পারে আর
ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল ওরা জর্জ উইলিয়ম গর্ডনকে
কেননা সে স্বপ্ন পেয়েছিল এক রাতে
সেই স্বপ্ন বয়েছিল বুকে
ওরা ভেবেছিল তাকে ধ্বংস করে দিয়ে
ধ্বংস করে দেবে স্বপ্ন তার
কিন্তু যে-মুহূর্তে ওরা খুন করে ওকে
সে-মুহূর্তে স্বপ্ন তার অমরতা পায়
কেননা স্বপ্নই সব
মানুষের তো আছে শুধু, সেই তো অমর
মানুষের সব অমরতা সে তো বেঁচে থাকে শুধু সেইখানে।

বহুকাল আগে ওরা ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল জর্জ উইলিয়ম গর্ডনকে
কিন্তু তত আগে নয়
বহুকাল আগে
যিশুকে ঝুলিয়ে ছিল ক্রুশে
কিন্তু তত আগে নয়
কেননা সবারই চাই যথার্থ সময়, ঠিক ঋতু
বহুকাল আগে

চন্দনকাঠের বীজ ঠোঁটে তুলে নিয়েছিল পারাবত দল
আজ তারা ঝরে পড়ে সুগভীর উপত্যকায়
সেখানে একদিন ছিল নগ্ন পাথরের বেড়ে ওঠা
প্রথম অরণ্য হয়ে আজ তার বুকে জাগে নতুন অরণি
এই দীর্ঘ অরণির মধুর কণিকাবীজ
যেখানে ঝরিয়েছিল একদিন বুনো পাখিদল
আজ তার পাদভূমি সবুজ বনানী
বহুকাল আগে কিন্তু তত আগে নয়
কেননা সবারই চাই যথার্থ সময়, ঠিক ঋতু
একশো বছর কাল তত বেশি নয়
একশো বছর কাল তত কমও নয়।

আঠারো জনের সঙ্গে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল গর্ডনকে
যিশুকে পেরেক দিয়ে বিঁধেছিল দুজন চোরের মাঝখানে
কিন্তু যে স্বপ্নের জন্য বেঁচেছিল ওরা কখনো তো মৃত্যু নেই তার
একটি বীজের কণা ভেঙে গিয়ে জেগে ওঠে একদিন একটি মঞ্জরী
একটি মঞ্জরী থেকে দুই প্রজন্মের মধ্যে ভরে যায় মাঠ
এ-রকমই হতে থাকে এক পূর্ণিমার থেকে অন্য পূর্ণিমায়
কেননা সবারই চাই যথার্থ সময়, ঠিক ঋতু
একশো বছর, তার দুই গুণও তত বেশি নয়
একশো বছর, তার দুই গুণ তত কমও নয়।

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

অরল্যাণ্ডো প্যাটারসন

আগন্তুক

লোকটা অদ্ভুত। ছাই রঙা ফেল্ট্ টুপিটার তলায় তার দ্বিধায় ভরা হাসিটা আমায় খানিকটা বিভ্রান্ত ক'রে দিয়েছিলো, কেননা হঠাৎ আমার কেমন একটা অদ্ভুত ধারণা হ'লো যে আমি তাকে অস্বস্তিতে ফেলছি। সে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। আমি তার মধ্যে একটা অলুক্ষুনে কিছু খুঁজে পাচ্ছিলাম।

হঠাৎ প্রায় ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে সে ব'লে উঠলো, 'তুমি কি মিস্ গ্ল্যাডিসের ছেলে?' দাঁতের মাজন আর মদের একটা মৃদু গন্ধ। আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম। সে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, মুখটা আধখোলা। চোখদুটো কেমন জলে ভরা, কৌতূহলী আর খানিকটা ব্যথাতুর।

আমি জিগেস করলাম, 'আমি কি ওঁকে আপনার কাছে ডেকে আনবো?'

'অ্যাঁ?' আমি যে কোনো প্রশ্ন করতে পারি, তাতে সে যেন কেমন চমকে উঠলো; কিংবা হয়তো এতেই যে আমি তাকে কিছু জিগেস ক'রে ফেলেছি। ঢোঁক গিলে, আরো বেশি কৌতূহলের সঙ্গে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর ফিশফিশ ক'রে বললো, 'ওঃ, ওঁকে ডেকে দেবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই করো।'

দরজার দিকে যেতে-যেতে আমার মনে হ'লো লোকটা কী মজার।

'মা।'

'কী?'

'এক ভদ্রলোক এসেছেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'এক ভদ্রলোক? কে?'

'চিনি না। আগে কখনও দেখিনি।'

মা উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো। এতক্ষণে আগন্তুকটির পরিচয় জানার জন্যে আমিও উদ্গ্রীব, তাই মা যখন জানলা দিয়ে উঁকি মারছে আমি মার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। মা তাকিয়েই রইলো। একটুও

নড়লো না, জানলার পাশে মাকে কেমন পাথরের মতো দেখাচ্ছিলো। আমি ভেতরে ঢুকে মায়ের মুখের ভাব দেখে ধাক্কা খেলাম।

'কী হয়েছে, মা ?'

মা কোনো উত্তর দিলো না। আমি বুঝতে পারলাম ভয়ানক কিছু একটা ঘটেছে। এর আগে কখনও আমি মাকে এমন কোনো অবস্থায় পড়তে দেখিনি, যা তার আয়ত্তের বাইরে। অন্তত তখন পর্যন্ত নয়।

'মা··· ?'

'ওঁকে গিয়ে বল্ যে আমি এখানে নেই · ওঁকে গিয়ে বল্ ··না. দাঁড়া, ওঁকে গিয়ে বল্ ··বল্ যে আমি আসছি।'

আমি বুঝতে পারলাম যে আগন্তুকটি যেই হোক সে কোনো-না-কোনোভাবে আমাদের···আর তক্ষুনি আমি তাকে ভয় পেতে শুরু করলাম। অথচ, যখন আমি তার কাছে ফিরে গেলাম তার চেহারা আমার মধ্যে কোনোরকম শঙ্কা জাগালো না। ওর মুখের ভাব দ্বিধাতুর, অস্পষ্ট আর সুদূর; আমার যাবতীয় ধারণার সে ঠিক উল্টো। এক মুহূর্তের জন্য আমি এই ভেবে ফেলেছিলাম যে সে আমায় ভয় পাচ্ছে। এই ভাবনা আমার ছেলেমানুষি দম্ভকে যথারীতি উসকে দিলে।

আমি তাকে বললাম, 'মা বললেন, আসছেন।' মৃদুস্বরে সে আমায় ধন্যবাদ জানালো। মা দরজা দিয়ে বেরিয়ে, থেমে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। মার দিকে এগিয়ে গেলো সে আর কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়লো যেন স্তব্ধতার কোনো চক্রান্ত শাসন করছে তাদের, কিংবা বলা উচিত আমাদের মধ্যে, কারণ এতক্ষণে আমিও এক হতবাক্ দ্রষ্টা, পুরো ব্যাপারটা বুঝে দেখার চেষ্টা করছি। শেষ অব্দি আগন্তুকটিই স্তব্ধতাটা ভেঙে দিলে।

'এই যে, গ্ল্যাডিস্! আশা করি তোমায় খুব বেশি তাক লাগিয়ে দিইনি ?'

'কী ক'রে খুঁজে বার করলে আমার ঠিকানা তুমি ?' মার গলার স্বর অস্বাভাবিক সংযত, যদিও তার মধ্যে একটা মৃদু ভয় দেখাবার রেশও ছিলো।

'ওঃ, আমি এই শহর দিয়েই যাচ্ছিলাম। ওই চীনে লোকটার দোকানে তোমায় চেনে কিনা জিগেস করায় ওরা দেখিয়ে দিলো···'

আর এক দফা দীর্ঘ নিঃস্তব্ধতার পর মা তাকে ভেতরে ডাকলো। দরজাটা আধ-খোলা প'ড়ে রইলো আর পরের পনেরো মিনিট আমি সেই দরজার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইলাম। শুনতে পেলাম মা আমায় ডাকছে। শেষ অব্দি সেই আগন্তুকের রহস্য সমাধানের আশায় আমিও লাফিয়ে উঠলাম। শার্টটা

ভদ্রভাবে প্যাণ্টের মধ্যে গুঁজে নিলাম। মা ফের আমায় ডাকলো, কেমন যেন অধীর। আমি ছুটে ভেতরে গেলাম।

লোকটা বসে আছে আমাদের সবেধন চেয়ারটায়, মা খাটের কিনারে ব'সে। আমাকে ঢুকতে দেখে দুজনেই আমার দিকে তাকালো। আমি তার দৃষ্টি এড়াবার জন্য মার চোখে আশ্রয় খুঁজছিলাম। আরো একটি দীর্ঘ বিরতির পর লোকটার দিকে কুণ্ঠিত ইঙ্গিত ক'রে মা ফিশফিশ ক'রে বললো, 'তোর বাবা।'

আমি ঠিকই একটু অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু আহত হইনি। বরং হয়তো একটু বিমূঢ় বোধ করছিলাম। আমি জানতাম যে কোথাও-না-কোথাও কোনো-না-কোনো অবস্থায় আমার বাবা বেঁচে আছে। কিন্তু তার সম্পর্কে আমার ধারণাটা ছিলো অস্পষ্ট আকারহীন। সে ছিলো আমার মনগড়া জগতের একটা অংশ: যা আমি ভালোবেসেছি আর মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখেছি, দামী সোনালি মাছের মতো, কিন্তু যা আমি কখনো তেমনভাবে চাইনি, তেমন আমল দিইনি। তাকে আজ হঠাৎ সামনে দেখে, আমি নিশ্চিত যে ছেলেভোলানো ছড়ার হামটি-ডামটির মুখোমুখি হ'লেও আমি এর চেয়ে বেশি অবাক হতাম না। কী বলবো আমি? কী বলা উচিত আমার? হয়তো আমার উচিত তার দিকে তাকানো। বেশ তো, তাকালাম।

তার কপালে ভাঁজ পড়েছে, গাল দুটো খরখরে। আমার কেমন মনে হ'লো ওর রোজ দাড়ি কামানো উচিত; আমার বন্ধুরা বলে ওদের বাপরা তাই করে। মজা হ'তো যদি আমার মাকেও রোজ দাড়ি কামাতে হ'তো। আমার বোকামিটা আমার নিজের কাছেই ধরা প'ড়ে গেলো।

সে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে পছন্দ করার ভঙ্গি করলো। বললো, 'চমৎকার ছেলে।' আমি চিন্তা করছিলাম ওর কথাটার মানে। তারপর সে আমার দিকে তাকিয়ে সেই একই দ্বিধায় ভরা নিস্তেজ গলায় আবার বললো, 'খুব ভালো ছেলে।' সাড়া দিয়ে মা কী যেন ফিশফিশ করলো, তারপর আমার দিকে তাকালো। সাধারণত আমার প্রশংসায় মায়ের চোখে যে দীপ্তি প্রকাশ পায়, আজ সেই দীপ্তি ছিলো না। বরং খানিকটা যেন সন্দিগ্ধ: তার চোখে আমি যেন একটা রাগের ইঙ্গিত খুঁজে পাচ্ছিলাম। কেন মায়ের এমন প্রতিক্রিয়া হচ্ছিলো আমি ভেবে পাইনি। ঘাড় ঘুরিয়ে মা মাথা নীচু ক'রে রইলো, সে যদি আমারই মা না হ'তো তাহ'লে আজ আমি

নির্ঘাৎ ভেবে নিতাম যে তার চোখে ছিলো লজ্জা আর ধিক্কার। তারপর কনুই দিয়ে হাঁটুতে ভর রেখে গালে হাত দিয়ে মা যে দীর্ঘশ্বাস ফেললো, আমি জানি তা তার সেই পরিচিত : 'ওঃ, কী জীবন, ভগবান!' অভিব্যক্তিটির পুনরুক্তির এক নির্বাক শারীরিক ভঙ্গি।

কী যে হচ্ছে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এর আগেও কখনো কখনো বড়োদের অদ্ভুত আচরণ করতে দেখেছি, আমার ছেলেমানুষি সত্ত্বেও তা আমি একটু-আধটু বুঝতাম, হয়তো সেই ধারণাগুলো খুবই সুন্দর, তবু বড়োদের উদ্দেশ্য আমার কাছে একেবারে অর্থহীন ছিলো না। কিন্তু আমার মা এবং এই আগন্তুকের ব্যবহার আমাকে পুরোপুরি ভড়কে দিলো। ওরা কেন কোনো কথা বলছে না, ওরা কি পরস্পরকে ঘৃণা করে? সে যে আমার বাবা, এই ব্যাপারটায় কি আমার মায়ের এতটাই যায় আসে?

হঠাৎ, আমার ভীষণ ভয় করতে লাগলো যে সে হয়তো আমার মাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে এসেছে। হয়তো সেটাই ওদের চিন্তায় ফেলেছে। আমায় কী ভাবে জানাবে তা বুঝতে পারছে না হয়তো। আমার মা আমায় একেবারে একলা ফেলে চলে যাবে। মুহূর্তের মধ্যে, মার সঙ্গে আমার সম্পর্ক, মায়ের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা আমার মনে নানা ছাপ ফেলে গেলো। মাকে আমি ভালোও বাসি না, ঘৃণাও করি না, বরং খানিকটা ভয় পাই, কারণ প্রায়ই মা আমায় নির্মম ভাবে মারে। কিন্তু তখন আমার কান্নার মধ্যে যে-রাগটা ফুটে বেরুতো তা নিছকই আমার ব্যথা লাগার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। কারণ আমার কেমন যেন মনে হ'তো যে আমার মার খাওয়াটায় আমার চেয়েও আমার মার অনেক বেশি এসে যায়। মা আমায় প্রায়ই বলতো, জগৎটা কঠিন। আমি তার সন্তান আর স্বভাবতই তার ওপর নির্ভরশীল, তাই ওটাই ছিলো স্বাভাবিক। সব সত্ত্বেও একটা দৃঢ় বন্ধন আমাদের ধ'রে রেখেছিলো। তেমন আশাপ্রদ কিছুই নয়; বরং পরস্পরকে হারানোর ভয়টাই ছিলো প্রধান। একে অপরকে হারালে যেন আমাদের সবকিছু হারিয়ে যাবে। আমার কাছে সে ছিলো মা : যে আমার খাবার জোগাতো, জোগাতো পোশাক-আশাক আর আমার ইস্কুলের পাঠ্য বই। যে আমায় ভালো হ'তে শিখিয়েছিলো। অথচ ভালো হওয়া বলতে সে যে কী বোঝাতো তা কখনোই তেমন পরিষ্কার ছিলো না। বেশির ভাগ সময়ই সেটা শুধুই 'ভালো হওয়া,' কিংবা 'অকৃতজ্ঞ না হওয়া'

—ছুটো যেন প্রায় একই ব্যাপার। হয়তো তার নিজের ধরনে সে ছিলো স্নেহপ্রবণ। কিন্তু নিজেরই অজান্তে, সে আমায় শিখিয়েছিলো বেশি আশা না করতে, তাই আমি কমই কিছু চাইতাম। আমার একমাত্র ইচ্ছে, ছিলো চিরটা কাল মা আমার কাছে থাকুক। এখন সেই মার চ'লে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দিলো।

কিন্তু তা সম্ভব ছিলো না। আমি নিজেকে এই ব'লে আশ্বাস দিলাম যে আমি বোকার মতোই মনে করছিলাম এই ঘর থেকে আমার চ'লে যাওয়া উচিত। হয়তো তারা বড়োদের কথাবার্তা বলতে চায়। যেই আমি দরজার দিকে এগুচ্ছি শুনতে পেলাম লোকটা যেন পুনরুক্তি করছে, 'হ্যাঁ, গ্ল্যাডিস্, অনেকদিন হ'লো।' তখন আমার আর ভাবতে বাধা রইলো না যে আমিই তাদের আপাত অস্বস্তির কারণ, নিজেকে আরো গুটিয়ে নিয়ে আমি দরজার দিকে এগুতে লাগলাম। হঠাৎ শুনলাম মা আমার নাম ধ'রে ডাকছে। তীক্ষ্ণ ও কঠিন তার কণ্ঠস্বর; আমায় আর বুঝিয়ে বলতে হ'লো না যে আমার ঐ ঘরেই থাকা উচিত, মার গলার স্বরই যথেষ্ট ছিলো।

আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকালো আগন্তুক। তারপর ফের আমার মার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হ'লো সে চ'লে যেতে চাইছে; কিন্তু কোথায় যেন খানিকটা দ্বিধা। হঠাৎ যেন তার কী-একটা মনে প'ড়ে গেলো। প্যান্টের পকেট থেকে একটা পাঁচ শিলিঙের নোট বার ক'রে আমার হাতে দিলো সে।

বললো, 'কিছু-একটা কিনে নিয়ো।'

অতগুলো টাকা আর এত লোক থাকতে ও যে আমায় এতগুলো টাকা দিলে এইসব ভাবনায় হতবাক্ হয়ে আমি নোট্‌টার দিকে চেয়ে রইলাম। মার প্রতিক্রিয়া জানার জন্য মার দিকে তাকালাম। 'ফেরৎ দিয়ে দাও'—মার এই উক্তিতে আমি একটুও অবাক হইনি। মা তার দিকে ঘুরে বললো, 'তোমার সাহায্য ছাড়াই আমি ওকে এতটা বড়ো করেছি; এখন আর তোমার কোনো সাহায্যের দরকার নেই।'

আমি তক্ষুনি নোটটা ফেরৎ দিয়ে দিলাম, কারণ আমি জানি তখন মাকে ঘাঁটানো ঠিক হবে না। মার সঙ্গে একা থাকার মুহূর্তটা আমায় ভয় পাইয়ে দিলো।

লোকটা প্রতিবাদ করতে শুরু করেছিলো, কিন্তু হঠাৎ হাল ছেড়ে দিয়ে টাকাটা আমার কাছ থেকে ফেরৎ নিয়ে নিলো। কেমন অপমানিত, দুঃখী দেখাচ্ছিলো ওকে ; ওর জন্যে আমারই কেমন খারাপ লাগতে থাকলো। ছোটো ফেল্ট্‌ টুপিটা মাথায় দিয়ে হঠাৎ সে কিছু না-ব'লেই চ'লে গেলো। ওকে আমি আর কখনও দেখিনি।

অনুবাদঃ শ্রাবণী দে ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মার্টিন কার্টার

লিপ্ত সবাই তাতে

শিখেছি এই শুধু :
আজ যে কলঙ্কিত
কাল সে হবে নায়ক
নায়ক হোক বা দানব
তোমরা সবাই হজম !

নাচের লয়ে যেন
ঝাঁকিয়ে দেয় তাঁত।
জালের মতো করে
নকশা বুনে তোলে
লিপ্ত সবাই তাতে
সবাই হলো হজম !

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

ক্লিফর্ড সিলি

তিক্ত সিদ্ধান্ত

উডফোর্ড স্কোয়ারের পোড়া ঘাসগুলোর উপর মধ্যাহ্নের দুঃসহ খরতাপ আছড়াচ্ছে। উডফোর্ড স্কোয়ার হ'লো পোর্ট অভ স্পেনের বেকার বুদ্ধিজীবীদের খোলামেলা আড্ডা। শুকনো পোড়া জমির ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ব'সে-থাকা জীর্ণ, বিষণ্ণ ও মুখর মেয়ে-পুরুষেরা নানা বিষয়ে আলোচনা করছে।

একদলের নিবিষ্ট আলোচনার বিষয় বিদেশের রাজনীতি; অন্য-একটি দলে সে-সময়কার এক খুনের মামলায় জুরিদের বক্তব্য বিষয়ে গভীর মনোযোগ দেয়া হচ্ছে; তৃতীয় একটি দলে জোরালো তর্ক চলছে বন্দরকর্মীদের ধর্মঘটে সরকারের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে।

যত দল, তত আলোচনার বিষয়; আর আলোচনাকারীরা তাদের স্বভাবে ও চেহারায় যতটা বিচিত্র, ততটাই বিচিত্র বিষয়গুলোর গুরুত্ব আর ধরন। স্কোয়ারের ঠিক মাঝখান থেকে উঠেছে একটা ছোট্ট সবুজ ধাতুনির্মিত মূর্তি; মূর্তিটাকে ঘিরে আছে শানবাঁধানো একটা চওড়া পুকুর—যদিও জল তাতে কখনোই থাকে না। এই পুকুরেরই মুখোমুখি বসানো আছে ছ'টি কাঠের বেঞ্চি —যার ঘন খয়েরি রঙের আস্তরটা অনেকদিন আগেই উধাও হ'য়ে গিয়ে খসখসে হলদে পিচ-পাইন কাঠটা বেরিয়ে পড়েছে।

এই বেঞ্চিগুলোর একটাতে ব'সে আছে তিনজন লোক। লিও ব'সে আছে মাঝখানে। লম্বা আর গাট্টাগোট্টা—তার পরনে রংচটা আর নোংরা এক খাকির স্যুট, হাত ও পায়ের অনেকটা উন্মোচিত অংশ দেখে বোঝা যায় এককালে এই স্যুটের সঙ্গে যার সাহচর্য ছিলো, সে ছিলো বেঁটে ও রোগা।

লিও-র ডানদিকে এরিক। রোগা, শুঁটকো চেহারা—তার পাৎলা কালো চামড়া ফুঁড়ে যেন হাড়গুলো বেরিয়ে আছে—তার ধূসর চোখে চকচক করছে এক ধরনের ধূর্ত দৃষ্টি।

ত্রিমূর্তিকে সম্পূর্ণ করেছে স্যাম। বেঁটে আর একহারা—তার নিজের

কোনো পূর্বনির্ধারিত মতামত নেই—ফলে তার মত সবসময় তার দুই বন্ধুর মতামতের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে।

'শুনছি, সরকার জাহাজের মাল খালাস করবার জন্য লোক চায়', ফ্যাশফেশে গলায় ইঙ্গিত করলে এরিক।

লিও তার ব্যাঙের মতো পুরু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। তারপর তার ডানহাতের কড়ে আঙুলের টোকা দিয়ে তার সিগারেটের ধূসর ছাই ঝেড়ে ফেলে বেঞ্চিটার লোহার হাতলের ওপর সিগারেটের মৃদু লাল আগুনটা আলতো ক'রে মিভিয়ে কালো ছাইগুলো সরিয়ে দিয়ে, তখনও গরম সিগারেটটা তার ডান কানের পেছনে গুঁজে রাখলো।

লিও-র মুখে কোনো কথা নেই; স্যামের মুখেও না। মাথা নিচু ক'রে সে তার ভোঁতা-ভোঁতা আঙুলগুলো দিয়ে শার্টের আলগা বোতাম নিয়ে খেলা করছে।

এই অপ্রত্যাশিত স্তব্ধতায় এরিক চটে গেলো। গাঁক-গাঁক ক'রে বললে, 'তা, এখন কী হবে? তোমরা সবাই কোনো কাজ করতে চাও তো—না কি ইচ্ছে নেই? সরকার আমাদের কাজ দিচ্ছে—আর তোমরা একেকজন বংবাজের মতো ব'সে আছো!'

এরিকের টিপ্পনি লিও-র মেজাজ খি চড়ে দিলো। তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে সে এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠলো, যার পেছনে ছিলো গভীর নৈতিক বিশ্বাস। 'আমাদের কালো লোকদের মধ্যে কোনো একতাই নেই। ও ধরনের কাজ যে নেবে সে তো গুলি খেতে চায়! শাদারা যখন কোনো কাজ-কারবারে নামে—সব্বাই তারা একজোট হয়। কিন্তু আমরা কালো লোকেরা যখন কিছু করি, আরেকদল তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। আমাদের কোনো একতা নেই—আর এটাই মোদ্দা কথা!' আবার মুখ ফিরিয়ে সে তার জ্যাকেটের হাতায় তার দাড়ি-না-কামানো গোল মুখটা মুছলো।

'তুমিই ঠিক, লিও, একেবারে হক কথা বলেছো!' স্যাম কেমন দ্বিধার সুরে ব'লে উঠলো। 'আমাদের কালো লোকদের মধ্যে সত্যি একে-অন্যের মধ্যে কোনো ভালোবাসাই নেই। এটাই আসল কথা—একেবারে খাঁটি সত্যি।'

'লিও আর তার হাঁদামিকে হিসেবে ধরো না স্যাম!' এরিকের তর্জন এলো। 'ও ঐ সব রাজনীতিবাজদের ছেঁদো কথা আওড়াচ্ছে!'

'কিন্তু, কালা লোকটা যা বলেছিলো তা তো সত্যি কথাই,' লিও বললে।

'কী বলেছিলো? ঐ লোকগুলোর কথা শুনলে হ'তো—এটা আমারও মনে হয়। কিন্তু ও-সব বক্তিমে তো আর তোমাকে স্বর্গে পৌঁছে দেবে না!' বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে এরিক হাতের চেটো দিয়ে তার ট্রাউজারের ধুলো ঝাড়লো। ঘৃণা আর অবজ্ঞায় তার শুকনো মুখটা কুঁচকে গিয়েছে। 'কালা আদমিদের মতো আকাট আর কোথাও নেই।' চ'লে যেতে-যেতে লিও-র কাঁধ চাপড়ালো সে—যেন কোনো অভিজ্ঞ বাবা তার বোকা ছেলেকে কৃপা ক'রে বোঝাচ্ছে। 'যা বলেছো, ঠিকই বলেছো, তার রাজনীতিটা মোটেই কালো লোকদের জন্য নয়। মানুষকে বেঁচেবর্তে থাকতে হবে।'

ঢ্যাঙা, কুঁজো চেহারার লোকটা পায়ে-চলার পথ দিয়ে হেঁটে চ'লে যাচ্ছে—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো লিও। এরিককে তার কেমন যেন অচেনা ঠেকলো। লোকটা বদ, এটা সে জানে। তবু তার কথাগুলো লিও-র মনের মধ্যে অদ্ভুত এক ধরনের শ্রদ্ধা জাগিয়ে দিতো।

স্কোয়ারে তখন দারুণ ব্যস্ততা। দোকানের লোকজন কেউ যাচ্ছে লাঞ্চ খেতে, কেউ লাঞ্চ সেরে ফিরছে। তাছাড়া খদ্দেরদেরও ভিড়; মোটা-রোগা, ঢ্যাঙা-বেঁটে মহিলারা সব কেনাকাটা ক'রে ফিরছে, তাদের হাত থেকে ঝুলছে ঠোঙা আর মোড়ক, জিভের ডগায় ঝুলছে পরচর্চা।

কাছের ট্রিনিটি ক্যাথিড্রালের ঘড়িটায় বারোটা বাজলো ঢং ঢং। আর তা শুনে লিও-র মনে প'ড়ে গেলো শিগগিরই তাকে তার স্ত্রী মেবেলের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। মেবেল গ্রেনাডার মেয়ে। মেবেলের কথা মনে পড়তেই তার মন গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলোর ওপর গড়িয়ে গেলো।

জীবনটাই কঠিন। সে ভেবে দেখলো যে জীবন কোনোদিনই মধুময় ছিলো না; এখন তো বরং, রূঢ় আর বীভৎস। আর মেবেলের ঔদাসীন্য ব্যাপারটাকে আরো খারাপ ক'রে তুলেছে। একটাই ক্ষীণ আশা যে হয়তো তার বদল হবে—'জিশুর মহিমা' দলটায় যোগ দেবার পর থেকেই এই আশা জেগেছে। দলটা বিপথে চলা গরিব লোকের—প্রত্যেকে যারা নিজের দুর্দশায় খাবি খেতে খেতে ভাবে যে বুঝি তারা কোনো 'বার্তা' পেয়েছে, রাত্তিরে রাস্তা জুড়ে উপাসনাসভা বসিয়ে দেবার জন্য।

কাল বিকেলে 'ভাষণ' শুনে ফেরবার পর মেবেলের মেজাজ ভীষণ খিটখিটে হ'য়ে ছিলো, এটা লিও-র মনে প'ড়ে গেলো।

'কবে তুমি চাকরি জোটাবে, লিও?' মেবেল জিগেস করেছিলো। 'এক

বছরেরও বেশি হ'লো তুমি বেকার ব'সে আছো। এভাবে আর কদ্দিন বাঁচবো আমরা ?'

'কিন্তু, মেবেল,' লিও তাকে তিরস্কার করেছিলো, 'আমি তো প্রাণপণে চেষ্টা ক'রে যাচ্ছি। কত লোকই আজকাল বছরের পর বছর বেকার ব'সে আছে।'

'তারা আবার মানুষ,' রাগে ফেটে পড়েছিলো মেবেল, 'কিন্তু আমি আমিই—ওদের মতো নয়। আমি আর এভাবে বাঁচতে পারবো না। কাল কী খাবো, তার ঠিক নেই; বাড়িওলা কবে ভাড়া না-পেয়ে তাড়িয়ে দেবে ঠিক নেই; ধারের পর ধার, কবে শোধ দেবো, ঠিক নেই। এভাবে আর চলতে পারে না।'

লিও ভোলাতে চেষ্টা করেছিলো, 'ভরসা রেখো, দুদু', তার মেজাজ ভালো করতে চেয়েছিলো লিও, 'তুমি ভুলে গেছো যে কাল সাবানের কারখানার লোকটার সঙ্গে দেখা করার কথা।'

স্যামের চিঁ-চিঁ করা গলা লিওকে তার ভাবনা থেকে ফিরিয়ে আনলো। 'লিও, আজ সকালে তোমার যে চাকরিটা পাবার কথা ছিলো, তার কী হ'লো ? তুমি তো সে-সম্বন্ধে কিছু বলো নি।'

লিও জানালো, 'ফোরমানের এক ভাইপো না ভাগ্নে সেটা বাগিয়ে নিয়েছে।'

স্যাম তার অদ্ভুত গোল মাথাটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নাড়তে-নাড়তে সহানুভূতির সুরে মৃদুস্বরে বললে: 'মামার জোর চাই, বুঝলে, মামার জোর।'

একটু পরেই স্কোয়ারের মধ্যে পথচারীদের সংখ্যা কমে গেলো; তাদের শশব্যস্ত চলাফেরায় এতক্ষণ যে ধুলো উড়ছিলো, তাও এখন ক'মে এসেছে। মাঝে-মাঝে শুকনো ঝরা পাতা ভেসে আসছে, আস্তে নেমে আসছে মাটিতে; ওপরে, গাছে-গাছে পাতায়-পাতায় মর্মরধ্বনি জাগছে।

কয়েকটা দল ভেঙে গেলো; কিন্তু পরক্ষণেই সেই একই জায়গাগুলোয় নতুন-নতুন দল গ'ড়ে উঠলো। অন্যরা, কাঠফাটা রোদ্দুরের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে কংক্রিটের ছোট্ট বাস-স্ট্যাণ্ডটায় আশ্রয় খুঁজছিলো। কিন্তু তখনও স্কোয়ারটা দিনের সব সময়কার মতোই অন্তত জনা পঞ্চাশ বেকার লোকের আড্ডা হ'য়ে আছে।

'দেখা যাক, কাল কী হয়,' বেঞ্চি থেকে উঠতে-উঠতে লিও বললে।

'ঠিক আছে,' স্যাম উত্তর দিলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লিও ডানকান স্ট্রীটে তার বস্তির ঘরে এসে ঢুকলো। মেবেল ছোট্ট লোহার খাটটায় শুয়ে আছে, তার শস্তা ফুটিফুটি সবুজ জামাটা তোশকের নানা রঙের ছোপের সঙ্গে বেশ ছবির মতো মিশে গেছে। তার কাপড় কেচে-কেচে ক্ষ'য়ে-যাওয়া মোটা-সোটা হাতে দামী বাঁধাইয়ের একটা কালো রঙের বাইবেল।

লিও-র কাতর মুখে নিশ্চয়ই হতাশা ফুটে উঠেছিলো, কারণ তাকে দেখেই মেবেল আর্তনাদ ক'রে উঠলো, 'তুমি চাকরিটা পাওনি।'

'না!' লিও জানালো।

'কিন্তু এটা'…বাইবেলটা বন্ধ ক'রে তড়াক ক'রে উঠে বসলো মেবেল, রাগী সুরে ব'লে উঠলো, 'এর কী মানে, বলো? যদি তুমি জানতেই যে কোনো কাজ জোটাতে পারবে না, তাহ'লে বিয়ে করেছিলে কেন?'

তার আত্মসম্মানে এত বড়ো একটা ঘা খেয়ে লিও তোৎলালো, 'কিন্তু, মেবেল, আমি তো প্রাণপণে চেষ্টা করছি।'

'তুমি প্রাণপণে চেষ্টা করছো' মেবেল মুখ বেঁকালো। 'তাহ'লে জেন-এর বর আজ তিনদিন ধ'রে বন্দরে কাজ করছে কী ভাবে?'

'ও তো একটা কুত্তা,' লিও যে-ছোট্ট বেঞ্চিটায় ধপ ক'রে ব'সে পড়েছিলো, তা থেকে উঠতে-উঠতে রাগে গরগর ক'রে উঠলো। ঘরের আসবাব বলতে ঐ বেঞ্চিটা, রংচটা একটা দেরাজ, আর চৌকো একটা খাবার টেবিল। 'ওভাবে আমি কোনো চাকরি চাই না। ও তো…'

'আহা, তোমার তো আবার বাছাবাছি আছে,' কোমরে হাত রেখে মেবেল খিঁচিয়ে উঠলো। 'তুমি ওদের ইউনিয়ন ওদের রাজনীতি, এই সবকে পাত্তা দিচ্ছো। বুঝলাম। তোমার দেমাকই তোমাকে খেলো।'

'মোটেই দেমাক নয়। শিক্ষা। ঐ তাদের মতো শিক্ষা, যারা…'

'শিক্ষা, না হাতি! শিক্ষা তোমাকে খাওয়াবে?'

'তুমি বুঝছো না…'

'আমি ভালোই বুঝতে পারি। আসলে তুমি কাজই করতে চাও না। কিন্তু আমি এমন লোকের সঙ্গে ঘর করতে চাই না যে-কোনো কাজ করে না বা বউকে খাওয়াতে পরাতে চায় না। আমি এমন-কোনো মেয়ে নই যে তুমি রাস্তায় প'ড়ে পেয়েছো—আমার খাওয়া-পরার ভার তোমাকে নিতে হবে।'

তারপর নাটুকে ভঙ্গিতে শেষ কথা ব'লে দিলো মেবেল। 'তুমি যদি আমার দেখাশোনা না-করো তো আমি তাহ'লে নিজের রাস্তা নিজেই দেখবো।'

'কী হয়েছে?'

'আমি খুবই ঠাণ্ডা আছি,' মেবেলের পুঁতির মতো কালো চোখ দুটি তেরিয়া ভঙ্গিতে চকচক ক'রে উঠলো। 'তুমি যদি আমার দেখাশোনা না-করো তো অন্য লোকে করবে।'

'জাহান্নামে যাও' ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে হোঁচট খেতে-খেতে চাৎকার করে লিও।

বিশাল এক উত্তেজিত জনতা জড়ো হয়েছে প্রিন্স স্ট্রীটে। রাস্তায় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে মেয়ে-পুরুষেরা। কারু-কারু জামায় নানা রঙের ফিতে বাঁধা: কারু-কারু হাতে ছোটো-ছোটো জলভরা বালতি, কারু বা হাতে বেতের ঝুড়িতে খাবারদাবার; অন্য অনেকে জলজ্বলে লাল রঙে লেখা ছোটো-ছোটো কাডবোর্ডের প্ল্যাকার্ড নাড়াচ্ছে।

লিও-র কাছে এই সংক্রামক উল্লাস কার্নিভালের সময়কার খালাসিদের বাজনদার দলের কথা মনে করিয়ে দিলো। কত সহজে তারা সৈন্যদের মতো কুচকাওয়াজ ক'রে চলেছে, কেমন অদম্য উৎসাহে তারা তাদের ব্যানারগুলো দোলাচ্ছে। লিও-র অবাক লাগে।

এই জমায়েতের বেখাপ্পা ধরনটাকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যই যেন জনতার সামনে দাঁড়িয়ে আছে শৌখিন পোশাক পরা কয়েকজন লোক—গলায় দামী টাই।

'ওরা সব বড়োবাবু,' লিও আপনমনে ভাবলে। 'ওরা তো খালাসি নয়।'

এলোমেলো ভিড়টা তারপর নড়তে শুরু করে। নিজের অজান্তেই লিও আবিষ্কার করলো যে সেও তাদের সঙ্গে চলেছে। অস্ফুট গুঞ্জনটা থেমে গিয়েছে। প্ল্যাকার্ডগুলো উঁচু ক'রে ধরা, আকাশ লক্ষ্য করে ধ্বনি উঠছে।

সামনের দিক থেকে শুরু হ'য়ে গানটা এক নিমেষে গ্রীষ্মের দিনের দাবানলের মতো পুরো জমায়েতে ছড়িয়ে পড়লো।

'গাও, কমরেড, গাও,' ধর্মঘটের শরিক এক লম্বা চওড়া লোক খালি পায়ে চলতে-চলতে লিওকে আহ্বান করে—বাজারের এক দশাসই তরকারিউলির পাশে তাকে সে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়।

রাস্তাটা তাদের পায়ের শব্দে আর গানের সুরে গমগম ক'রে ওঠে—কড়ি আর কোমলে মেশামেশি এক হৃদয়স্পর্শী ঐকতান যেন।

আগলে রাখো দুর্গ, কারণ আমরা এসে যোগ দেবো
ইউনিয়নের মজুর, তুমি শক্ত হও

দ্রুত ছুটে-আসা কথাগুলো লিও-র বুকের গভীরে একটা অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি জাগিয়ে দেয়। সকলের সঙ্গে এগুতে-এগুতে গাইতে থাকে সে, আর গানটা পৌঁছে যায় এক দম-আটকানো উঁচু পর্দায়।

দম নেবার জন্য প্রিন্স স্ট্রীট আর হেনার স্ট্রীটের মোড়ে মিছিল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে লিও। ফুটপাতের উপর অনেক লোক দাঁড়িয়ে, লিও শুনতে পায় এদের মধ্যে কে যেন কাকে বলছে, 'এই একতা যদি ওরা বজায় রাখতে পারে, তাহ'লে ওরা জিতবেই।'

লিও ঘুরে দাঁড়িয়ে খেয়াল করে যে বক্তা একজন তরুণ। ঢ্যাঙা, পরনে শোভন বেশ, চোখে চশমা, থুৎনিটা দাড়িতে ঢাকা। নিমেষের জন্য তার পায়ের চকচকে জুতো জোড়ায় লিও-র চোখ ধাঁধিয়ে যায়; তার নিজের পায়ের নোংরা লালচে চটির সরু মুখ দিয়ে তার নোংরা আঙুলগুলো বেরিয়ে আছে—সেদিকে তাকিয়ে লিও কিছুতেই তার বিদ্রূপের হাসি চাপতে পারে না।

একটা বিচ্ছিরি মানসিক দ্বন্দ্বে লিও-র মনটা যেন ফাঁদে প'ড়ে যায়। মেবেল আর তার শাসানি, এরিক আর তার টিপ্পনি, তার নিজের দাউদাউ ক্ষুধা, মিছিলের নেতারা, শিক্ষকরা, ধর্মঘট, তার এই অসহ্য উদ্দেশ্যহীন অস্তিত্ব—সব, যেন কোনো অদ্ভুত উপায়ে, তার মাথায় জট পাকিয়ে যায়।

জনতা থেকে দূরে স'রে যায় সে, হেনরি স্ট্রীট ধ'রে হাঁটতে থাকে। সে স'রে যায় ঐ সংক্রামক উল্লাস থেকে, যা তাকে তার নিজের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলো—দূরে, দূরে স'রে যায় সে ক্রমে। অস্পষ্টভাবে, যেন কুয়াসার মধ্য দিয়ে, সে সামনে এসে-পড়া গাড়ি ঘোড়া এড়িয়ে চলে।

অবশেষে সে এসে পৌঁছোয় দক্ষিণ জেটিতে। একটা মস্ত কাঠের বাড়ির সামনে এক সার লোক দাঁড়িয়ে। এমনকি এই দৃশ্যও তার মনে কোনো আশা জাগিয়ে দিতে পারে না। বড্ড বেশি দুর্বল সে। অথচ কোনো প্রশ্ন জিগেস করার জন্য সে থামে না, বরং নিজের অজান্তেই এগিয়ে যায় সারিটার দিকে।

'লিও!' একটা চেনা ভাঙা গলার মৃদু স্বর শোনা যায়। 'এই-যে, এখানে একটা জায়গা আছে।'

ভূম ক'রে ঘুরে দাঁড়ায় লিও, তার মুখটা জ্বলছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সে কী করবে। ফিরে যাবার জন্য সে পা বাড়ায়। কিন্তু নড়বার আগেই এরিকের লম্বা হাত তাকে আঁকড়ে ধরেছে।

'আরে এসো, গবেট কোথাকার, সুযোগটা ফসকাবার আগেই চ'লে এসো,' এরিক বলে।

গভীর একটি তাৎপর্যময় মুহূর্ত—লিও এরিকের টানাটানি ঠেকিয়ে রাখে। তার পরস্পরবিরোধী ভাবনাগুলো যেভাবে ক্রমশ ছোটো-হ'তে-থাকা পাগল করা আবর্তের মধ্যে পাক খেতে থাকে, তাতে সে যেন একেবারেই স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে। তার চিন্তাগুলো যেন কোনো চূড়ান্ত দ্বন্দ্বের দিকে ছুটে যাচ্ছে। আর যেই তারা সেই চরম পরিণতিতে পৌঁছলো, সে মনস্থির ক'রে ফেললো।

কোনো রকমে গুটিসুটি মেরে সে এরিকের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো, এরিক ক্ষুব্ধ স্বরে যখন তাকে ফিশফিশ ক'রে বললো, 'সরকার আমাদের তিন ডলার রোজে কাজ দিচ্ছে। সত্যি, কালো লোকেরা যে কী হাঁদা!' সে-কথা যেন তার কানেই গেলো না।

'হুঁ...' এটাই ছিলো লিও-র ছোট্ট উত্তর।

অনুবাদ : শ্রাবণী দে ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কে. ই. ইনগ্রাম

যেন-বা এক সোনার জালের ভিতর

যেন-বা এক সোনার জালের ভিতর
পাতার নিচে রবিন পাখি গায় ;
রৌদ্র আর বাতাস দিয়ে বোনা
ভুবন, তোমার বন্দীরও কী সুখ ;
ভাবে না যে জীবনসন্ধ্যা তার
দিনের মতোই অস্তে নেমে আসে,
গাছের নিচে শীতল হবে যখন
জীবনচক্র ফুরিয়ে যাবে সব,
বাতাসে তার হাড়ই হবে বাঁশি
বাজিয়ে যাবে অসম্পন্ন গান।

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

মাইকেল অ্যান্টনি

সফেদা গাছ

সফেদা-গাছটা ফলে ফলে ভর্তি হয়ে আছে, ভার সইতে না পেরে ডালগুলো নুয়ে পড়েছে একেবারে। কী বড় বড় খয়েরি রঙের ফল—দেখলে লোভ লাগে! একটুখানি ভাবলেই টের পাবে, কেমন স্বাদু রস জমা আছে ওর খোসাগুলোর তলায়। বাদুড়ে খুবলে খেয়েছে কিছু ফল, সে জায়গায় রসটা জমে একেবারে চিনি, আর তার থেকে বেরিয়ে এসেছে কালো কিসমিসের মতো দেখতে কী একটা বীজ। পাকা-টুসটুসে সফেদা—যেগুলো মাটিতে ঝরে পড়েছে—দেখলেই কেমন যেন করে বুকের মধ্যে।

কিন্তু কিছু করার নেই। এই সফেদা গাছটা নিয়ে মুশকিল কী—মিস্টার ফারফ্যানের জানলাটার ঠিক পাশেই ওটা দাঁড়িয়ে, আর যা হাতটান মিস্টার ফারফ্যানের! ওঁর মতো আর একটা লোকও দেখি নি বাবা—বিশাল একখানা 'না'!

জানো, যতই সাধ্যসাধনা করো না কেন, মিস্টার ফারফ্যানের কাছে, একটা সফেদা চাওয়া মানেই 'না' আর 'না', কেবলই 'না'। আর তারপরই গজগজ করবেন, আজকালকার ছোকরাগুলো কী বাউণ্ডুলে আর লোভী রে বাবা! তাঁর আমলে তো ছেলেপুলেরা কখনও সফেদা চেয়ে চেয়ে বেড়াত না। যখন খুব বেশিরকম মেজাজ গরম থাকত আর আমরা একেবারে হন্যে হয়ে উঠতাম, দরজার পাশ থেকে তিনি টেনে বার করতেন বিরাট একখানা ছড়ি, আর আমরাও অমনি রাস্তা ধরে চ্যাচাতে চ্যাচাতে দৌড়।

উইস্কি আর আমি একবার ঠিক করে ফেললাম, আর কক্ষনো একটাও সফেদা চাইতে যাব না মিস্টার ফারফ্যানের কাছে। আমি বললাম, 'থাকুক ও, ওর বাসি সফেদাগুলো নিয়ে, ওখানে পচুক বসে বসে!' উইস্কিরও তাই মত। কিন্তু একদিন দেখি কী, হাঁপাতে হাঁপাতে উইস্কি বাড়ি এসে হাজির, ওর টুপিটা ভর্তি পাকা সফেদা।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় পেলি রে ?'

জানিস না ?' দাঁত বার করে ও হাসতে থাকে।

আমি তো অবাক। 'তোকে দিল ?' বলেই বুঝলাম কী বোকার মতো কথাটা বলেছি। সফেদা দেওয়ার চেয়ে অনেক স্বচ্ছন্দে প্রাণটা দিতে পারেন মিস্টার ফারফ্যান। তবে তো এর একটাই মানে। নিশ্চয়ই খুব ভোরে উঠে পড়ে সফেদা গাছটায় উইস্কি ডাকাতি করে এসেছে।

তারপর কতকাল ধরে যে উইস্কিকে আমি রাজি করালাম—একটা দিন যেন আমাকে ও ওর ভোর-রাত্তিরের অভিযানটায় সঙ্গে নেয়। আমায় ঘুষ দিতে হলো সব রকম জিনিস। আর দিব্যি যে গালতে হলো কত কিছুর ! শেষটায় পার পাওয়া গেল আমার নতুন লাটিমটার জন্য।

তবুও কিন্তু, আমায় সঙ্গে নিতে হবে বলে ও খুব অস্বস্তিতে থাকল। এই-রকম সব কাজে যেমন সঙ্গী ও চায়, আমি তো ঠিক তেমন না। উইস্কির মতো সব পরিস্থিতিতে পড়লে আমি তো বোধ হয় কিছু করতেও পারব না সত্যি। আমি একটু ভীতু আছি, চট্পটেও নই একদম। উইস্কি কিন্তু অন্যরকম। যতই কম সময় থাকুক না কেন, যে কোন জিনিস ও ঠিক চুরি করতে পারে। তারপর এমন শান্তশিষ্ট হয়ে থাকে যে কেউ রাগ করতেও পারে না ওর ওপর।

'ঠিক আছে', যে-লাটিমটা আমি দিয়েছিলাম, সেটা মেপে-টেপে নিয়ে মনে মনে কী সব ভেবে তারপর বলল কথাটা। 'ঠিক আছে, চল্। কিন্তু ভগবানের দিব্যি, ঠিকঠাক থাকবি। ধরা পড়লে কিন্তু ফারফ্যান ঠিক জেলে দিয়ে দেবে তখন।'

আমরা যখন পৌঁছেছি, সকালের আলোটা তখন ঠিক যেমনটি দরকার। খুব আঁধারও নেই, খুব আলোও হয় নি। চারদিক কী চুপচাপ—যেন কবরখানা।

উইস্কি গাছে উঠে সফেদা পাড়বে, আর গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আমাকে লুফতে হবে সেগুলো। লুফে ঢোকাতে হবে ঝোলার ভেতর। ব্যস্ এই। আমার মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল—এতে আর বীরত্বের কী আছে !

প্রথম ফলটা যে-ই নিচে ছুঁড়েছে উইস্কি, আমার হাত গলে সেটা মাটিতে পড়েই—ফটাস্। শুনতে পাচ্ছিলাম, ওপরে গাছের মধ্যে বসে ও ফোঁস ফোঁস করছে রাগে।

মুখ ভার করে বলি: 'একটা তো মোটে পড়ে গেল। হয়েছেটা কী তাতে?'

'বুঝবি মজা': নরম-গলায় বললে কী হবে, কথাগুলো বাঁকা বাঁকা, 'ফেল্ মাটিতে, ফারফ্যান জাগুক বুঝবি।'

এই ফাঁড়াটা অবশ্য কেটে গেল, সব কিছু ঠিকঠাক চলতে লাগল তারপর। আস্তে আস্তে আরও ভালো করে আমি লুফতে পারছিলাম। এমনকি কয়েকটা তো একদম ওস্তাদের মতো—এক হাতে আমি লুফেছি। আর আমাকে ওস্তাদি করতে দেখলেই উইস্কি কট্‌মট্ করে আমার দিকে চাইছে।

কিন্তু বেশ ভালোই এগোচ্ছিল আমাদের কাজটা। সফেদা-ফলে আমাদের ঝোলাটা প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। বললাম উইস্কিকে। ও বলল, 'ঠিক আছে, আর শেষ কয়েকখানা ছুঁড়ছি তাড়াতাড়ি করে। ঠিকমতো ধর্‌বি, হ্যাঁ?'

আর অমনি হঠাৎ গাছের ওপর ও থমকে গেল, ফ্যাকাসে হয়ে উঠল ওর মুখ। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী দেখিস?' একবার আমার দিকে তাকিয়েই ও চোখ ফিরিয়ে নিল ঐ বাড়িটার দিকে। মুখটা ভয়ে সাদা—বিড়বিড় করে উঠল ঠোঁট দুটো 'ফারফ্যান'। পড়ি-মরি আমি রাস্তা ধরে দৌড়।

দিনের আলো পরিষ্কার হলে ভাবলাম আমি আবার ওখানটায় যাই। ভয় করছিল। উইস্কির অপেক্ষায় সারাটা সকাল আমি বাড়ি বসে রইলাম। অপেক্ষা করছিলাম, পুরো ঘটনাটা শুনব বলে। আমি জানতাম, উইস্কি কিছুতেই ধরা পড়বে না। কী রকম করে ও পালাল, সেটা জানার জন্যেই আমি তখন ব্যাকুল। প্রায় রোজই তো উইস্কি একটা-না-একটা নতুন বীরত্বের কাজ করে। সব সময় কাজটা যে তত বীরত্বের, তা না-ও হতে পারে, কিন্তু যে-ভাবে ও তোমায় বলবে না গল্পটা! আমি তো সময় সময় ভাবি, বড় হয়ে একদিন উইস্কি রহস্য-উপন্যাস লিখতে পারবে। এমন ভালো করে ও ঘটনাগুলো বলে! এমনও হতে পারে যে, ঘটনাটা যখন ঘটছিল, তুমিও ওখানে ছিলে, কিন্তু তাও, উইস্কির মুখ থেকে সেগুলো শোনায় একটা নতুন আনন্দ থাকে। আমি জানতাম, এই ঘটনাটাও একটা সত্যিকারের শিল্প হয়ে উঠবে। তাই তো আমি ওর জন্যে অপেক্ষায় ছিলাম এতটা আগ্রহে।

কিন্তু 'এই আসে' 'এই আসে' করে কতক্ষণ যে পেরিয়ে গেল। মিনিটের হিসেব পেরিয়ে এখন এক ঘণ্টা—দু-ঘণ্টা। ভোর থেকে সকাল গড়াল, তবু

সে আসে না। তখনই কেমন এই ব্যাপারটা মাথায় এল আমার। এখন আমার কাছে ব্যাপারটা একেবারে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। মিস্টার ফারক্যান যেই বাইরে বেরিয়ে এসেছেন আর আমিও যেই-না চম্পট দিয়েছি, উইস্কি ঠিক গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে ব্যাগটা তুলেই দৌড় লাগিয়েছে। না, বড় রাস্তা ধরে যায় নি। চোট্টা কোথাকার! ওই যেখানে ও ওর জিনিসপত্র সব লুকোয়, নির্ঘাৎ গিয়ে পড়েছে ওর সেই পেটোয়া ঝোপে, গিয়ে যতগুলো সফেদা গিলতে পারে গিলেছে, আর লুকিয়ে ফেলেছে বাকিগুলো!

উঠে পড়লাম। এবার আর চিন্তা না, রাগ হচ্ছে। রাগে ফুঁসছি আমি। যা হলো সে তো অন্তত আমার জন্য না। আমি নিশ্চয়ই মিস্টার ফারক্যানকে দরজা খুলিয়ে বাইরে আনাই নি!

রাস্তা ধরে আমি চলেছি, গা-টা রাগে জ্বলছে। নিজের ভাগ বুঝে নেওয়ার জন্যই যাওয়া। আমার চেয়ে বড় না উইস্কি। আমার ভাগের সফেদা আমি কিছুতেই ওকে নিতে দেব না।

মিস্টার ফারক্যানের বাড়ির সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছি, দরজাটা দেখি খোলা। ভয়ে ভয়ে ভেতরে তাকালাম। তারপর মাথাটা খাড়া রেখে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। আর কয়েক পা যেই-না এগিয়েছি, শুনি: 'সুপ্রভাত, কেন!' চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি, সফেদা গাছটার নিচে মিস্টার ফারক্যান—লাঠিটা হাতেই আছে, সামনে পড়ে আছে সফেদা-ভর্তি ঝোলাটা।

ওখান থেকে উনি আমার দিকে তাকিয়ে, মুখটা হাসি-হাসি। 'সফেদা চাই, না রে?' ঝোলার মধ্যে তিনি হাত ঢুকোলেন। আমি তো বোবা হয়ে গেছি তখন। তাঁর দিক থেকে চোখ সরিয়ে তাকালাম সফেদা গাছটার দিকে, তারপর গাছটার ওপর দিকে চোখ গেল। 'কী রে, চাই নাকি কয়েকটা সফেদা?' আবার তাঁর প্রশ্ন, উঠে পড়েছেন এবার।

ততক্ষণে আমি কিন্তু পগার পার। সমস্ত শক্তি জড়ো করে দৌড়লাম আর তখন আমার সারা মুখ ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। কেন কাঁদছিলাম, কী জানি। গাছের ওপর থেকে উইস্কি কেমন করে আমার দিকে তাকিয়েছিল, বোধহয় সেটাই মনে পড়ল আমার, আর তাতেই এ রকম লাগছে। আর মনে পড়ছিল মিস্টার ফারফানের বিশাল লাঠিটা। সেটা মনে পড়েই আরও খারাপ লাগছে। দৌড় থামিয়ে বাকি পথটা আমার হেঁটেই যাওয়া উচিত ছিল বাড়ির দিকে। কিন্তু উইস্কির চিন্তাটা যে কিছুতেই সরাতে পারছি না

মন থেকে। আমি জানতাম দেবতারও সাধ্যি নেই সফেদা গাছটা থেকে নিচে নামা, যেটার তলায় দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার ফ্যারফান।

বাড়িতে বসে তখনও কেঁদেই চলেছি, হঠাৎ শুনি বাইরে একটা কণ্ঠস্বর। মুহূর্তের মধ্যে উঠে পড়ে দেখি, উঠোনের মধ্য দিয়ে লাফাতে লাফাতে আসছে—উইস্কি। 'এসেছিস!' বলে চেঁচিয়ে উঠি আনন্দে। আশ্চর্য, কী করে ও পালাতে পারল!

দাঁত বার করে ও বলল: 'তুই তো কিছু সাহায্য করলি না।' আর ঠিক তখুনি আমি তাকিয়ে দেখি সফেদা-ভর্তি একটা ঝুড়ি!

ও নিয়ে অবশ্য বললাম না কিছুই। সেই মুহূর্তে সফেদা টফেদা আর আর আমার মাথায় নেই। ও পালালোটা কী করে—এইটেই এখন আমি জানতে চাই।

'ধরতে পারে নি তোকে?' জিজ্ঞেস করি।

'কেন ধরবেটা কিসের জন্য?' বলেই হো-হো করে হাসতে থাকে। বলে: 'তোকে ডাকল লোকটা, আর তুই পালালি!'

আমি তো থতমত খেয়ে তাকিয়ে।

ও হাসছেই, কেবলই হাসে। তারপর এক সময়ে আর চাপতে না পেরে বলল পুরো ঘটনাটা। আমি হতভম্ব। আমি তো এখনও পর্যন্ত ভেবে পাই না—এইভাবে সমানে উইস্কি বোকা বানিয়েছে আমায়? সম্প্রতি নাকি ও হয়ে উঠেছিল মিস্টার ফারফ্যানের একজন প্রাণের বন্ধু!

অনুবাদ: শ্রাবন্তী ঘোষ

একফালি পেয়ারা বাগান

বাগানটা ওখানে তখনও আছে। খানিকটা অবশ্য ঢাকা পড়ে গেছে বিছুটি আর আগাছার জঙ্গলে আর লম্বা, ক্ষুরের মতো ধারালো ঘাসে. কিন্তু কোন বড় গাছ ওখানে গজিয়ে ওঠে নি। এতগুলি বছর ধরে বেশ সুন্দর রাখা হয়েছে বাগানটাকে। কেবল দুই ধার বরাবর কয়েকটা বড় বড় গাছ গজিয়ে মাথার ওপর হেলে আছে, মাথার ওপর যেন একটা পুরু চাঁদোয়া বিছানো।

মিস্টার জনসন বেশ লম্বা মানুষ, মাথাটা একটু নুইয়ে তাঁকে চাঁদোয়ার তলা দিয়ে যেতে হলো। অভিভূতভাবে তিনি চলেছেন, তাঁর মুখে বিস্ময়-মেশানো একটুখানি হাসি। যখন আবার আলোয় বেরিয়ে এলেন, ওঁর সামনে পড়ে থাকা নিচু জমিটার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে তিনি হাসলেন। একটুখানি কেঁপে উঠলেন যেন। পেয়ারা গাছ-ভরা সেই জমিটা ওখানে এখনও আছে। সত্যি, এখনও আছে, এই এতগুলি বছর পরেও।

মুহূর্তের জন্য চারিদিকে তাকালেন তিনি। ঐ তাঁর পরিচিত নারকেল গাছগুলো, কাঠবেড়ালি লাফিয়ে যাচ্ছে এ-ডাল থেকে ও-ডাল। এ-সব কিছু, মিস্টার জনসন দেখছেন। ঐ গাছগুলোও একই রকম আছে, আর এমনকি ঐ কাঠবেড়ালিগুলোও।

এবার পথ ধরে তিনি এগোতে লাগলেন নারকেল গাছের ঝাড়টার দিকে। একটুখানি থেমে কাছেই বয়ে-চলা নদীটার জলে ডুবিয়ে নিলেন হাতদুটো। কী দ্রুত এখন বয়ে চলেছে নদীর জল! এতগুলো বছর ধরে যেন আরও বেশি উচ্ছল হয়ে উঠেছে এই নদী। সমস্ত দেখে বিস্ময়ে আবিষ্টভাবে হেঁটে চলেছেন প্রৌঢ় মানুষটি।

নারকেল-ঝাড়ে পৌঁছে খুব সহজেই তিনি খুঁজে পেলেন ঠিক যে-গাছটির কথা তিনি ভাবছিলেন। গাছের ছালে কিছু দেখবেন বলে এগিয়ে গেছেন। আর তারপর নিজের চোখকেই যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। হ্যাঁ, 'ই. সি.' লেখাটা তো এখনও ওখানে রয়েছে। যে ছোট্ট ছুরিটা দিয়ে ও-দাগটা কাটা, সেটার যে কী হলো ওঁর মনে পড়ছে না, এমি এখন কোথায় তাও তিনি জানেন না। কিন্তু ছেলেবেলায় চিরে দেওয়া সেই 'ই. সি.' দাগটা এখনও ওখানে তেমনি আছে।

তাঁর ধূসর মাথার চুলের ভেতরে হাত চালালেন মিস্টার জনসন। আলুথালু পড়ে-থাকা পেয়ারা-জমিটার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আর বুকের মধ্যে যেন শুনতে পাচ্ছেন একটা উত্থান-পতনের আওয়াজ।

সেটা গরমকাল, তাই পেয়ারার শুকনো পাতা ঝরে পড়েছে পুরু হয়ে—যেন তৈরি হয়েছে একটা ঢেউ, যেন পায়ের নিচে বিছানো খয়েরি রঙের একটা কার্পেট। শাখাগুলোর মাঝে মাঝে হলুদ-রঙা ফল, কিন্তু গাছের গোড়ায় ঝোপের চিহ্নমাত্র নেই। পুরু পাতার রাশের মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো এসে পৌঁছচ্ছে না মাটিতে। সেই অনেক আগের দিনগুলোয় যেমন লাগত, ঠিক তেমনি হালকা মেজাজে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলো।

পদ্মপুকুরটার কাছে আসার আগে পর্যন্ত মিস্টার জনসন ধীরে ধীরে এগোচ্ছিলেন সামনের দিকে, তখনও তিনি আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। যেমন ছিল, পুকুরটা আজও তেমনি পদ্মফুলে ভরা। কিছু ফুল শুকিয়ে গেছে, কিছু বা রোদের তাপে গুটিয়ে নিয়েছে তাদের পাপড়ি।

পুকুরপাড়ে শুকনো পাতার ওপর বসে পড়লেন প্রৌঢ়টি। শুকনো দিনে এই পুকুরেই তারা জল নিতে আসতেন—কুট্‌স, কিটসিপ, মলি, এমি আর তিনি নিজে। তিনি ভাবছেন—তাঁর সেই পূর্বভারতের প্রতিবেশীরা, তিনি যাদের সান্নিধ্য পেতেন, এখন কোথায় সেই শিশুর দল? মনে মনে হাসলেন তখন। সেই শিশুরা এখন তো আর শিশু নেই! কিন্তু গাঁ ছেড়ে তাদের চলে যাওয়ার খবর ছাড়া আর কোন খবরই তো তিনি পান নি।

ভেতরে ভেতরে তিনি ভীষণ কষ্ট বোধ করলেন। তার কত কাছের মানুষ ছিল ওরা! শৈশবের দিনগুলো ভরে দিয়েছিল তাঁর। এখন তারা নেই। চলে গেছে অনেকদিন আগে, আর চিরদিনের মতোই চলে যাওয়া। আর এই কবরখানার পাশে যদি বাচ্চারা থাকতও, তারাও তো তখন ওঁর মতো এমন বৃদ্ধ, অথর্ব।

শেষটায়, যেন খানিকটা কষ্ট করেই, তিনি উঠে দাঁড়ালেন। হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেললেন প্যান্টের ধুলো, তারপর ফিরে চললেন সেই দিকে, যেদিক দিয়ে তিনি এসেছিলেন। আর পেয়ারা বাগানের ভেতর দিয়ে যখন আসছেন, মুঠো-মুঠো পেয়ারা নিলেন সঙ্গে, ভর্তি করে ফেললেন তাঁর পকেট।

* * *

গ্রামটির ওপর কিন্তু সময়ের ছাপ খানিকটা পড়েইছে। মৃত্যু হয়েছে কয়েকজন

বৃদ্ধের, আর সে সময়ের মধ্যবয়সীরা এখন পূরণ করেছে সেই বৃদ্ধদের স্থান। এবং সেই মধ্যবয়সীদের স্থানে এখন সেদিনের কিশোর-তরুণের দল। যুবকেরা অনেকেই চলে গেছে এখান থেকে। ধ্বসে গেছে কয়েকটা পুরনো বাড়ি, নতুন বাড়ী তৈরীও হয়েছে সামান্য কিছু। ডাকঘরটা নিয়ে আসা হয়েছে গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে। আর একটা ভারি সুন্দর, অনেকদিনের পুরনো পামগাছ ছিল পাহাড়ের ওপর—সেটা এখন নেই। এছাড়া অবশ্য জায়গাটার খুব কিছু পরিবর্তন আর হয়নি।

ছেলেবেলার পরিচিত এই গ্রামটিতে এসে আবার বাসা বাঁধা—মিস্টার জনসনের পক্ষে এখনও সম্ভব। বস্তুত তাঁর অনেকটাই মনে হচ্ছে যেন এখান থেকে তিনি দূরে যান নি আসলে। এতদিন অন্য জায়গায় কাটিয়েছেন, তবু তাঁর মনে হয়, এটাই তাঁর আসল বাসস্থান, এখানেই তিনি ভালো থেকেছেন। পারিবারিক বাসাটার দায়িত্ব বর্তেছে তাঁরই ওপর। ফিরে আসতে প্রথম-প্রথম তাঁর খানিকটা আপত্তিই ছিল। কিন্তু কী দারুণ লাগছে এখন; তিনি ঠিক করে ফেললেন ভিটেটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে স্থায়ী আস্তানা গাড়বেন এখানে।

বাড়ির পিছনের টুকরো বাগানটা এখন কী ভালোই দেখায়! চোখে পড়ে পাকা টমেটোর টুকটুকে রং, লাউকুমড়ো আর নানারকম শস্যের লম্বা গাছ। আরও আছে প্রচুর কাসাভা, মটর, আর রাঙা আলুর গাছ। ফল ভালোবাসেন মিস্টার জনসন, তাঁর জন্যে আছে কুলগাছ, খেজুরগাছ আর পর্তুগাল-ট্রি।

গ্রামবাসীরাও দারুণ খুশি। মিস্টার জনসন তাদের এখানে এসেছেন, খুব বেশিদিন তো নয়, অথচ তারই মধ্যে কী রকম অন্য চেহারা নিয়েছে এই পরিত্যক্ত জায়গাটা। বাগান ছাড়াও, পুরনো বাড়িটা মেরামত হয়েছে, রং করা হয়েছে নতুন করে। ওরা বোঝে, এই মানুষটির প্রাণস্ফূর্তি তাদের সকলকেই উৎসাহ জোগায়।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত গ্রামবাসীর কাছে তিনি একটি আদর্শ হয়ে উঠলেন।

মিস্টার জনসনের প্রত্যাবর্তনের পর এক বছরও তখন কাটে নি, দেখা গেল ব্রিফকেস-হাতে কয়েকজন লোক সে-পথে আনাগোনা করছে। ব্যবসায়ী বলে মনে হয়। মিস্টার জনসনের অনুমতি নিয়ে তারা চলে গেল বাড়িটার ঠিক পিছনের জমিটায়।

ভাবিত নয়, কিন্তু একটু আশ্চর্য হয়েছিলেন মিস্টার জনসন। কৌতূহল বাতিকটা তাঁর খুব নেই। কেবল ভাবলেন, এ রকম ভালো পোশাক-পরা মানুষগুলির ওই ঝোপঝাড়ের মধ্যে কী কাজ! তারপর ক্রমে আর ওদের লক্ষ্যও করেন না তিনি। কিন্তু একদিন পথ দিয়ে যেতে যেতে ব্রিফকেস-ওয়ালা একজনের সঙ্গে তাঁর দেখাই হয়ে গেল। 'এই যে।'···হাঁটা থামিয়ে লোকটি ডাকল। তারপর তাদের কাজ সম্পর্কে বিশদ বোঝাতে লাগল তাঁকে।

বলে চলে ব্রিফকেস-ওয়ালা, 'হ্যাঁ সবরকম জিনিসই এখানে আমরা তৈরী করব, জানেন মিস্টার······নামটা যেন কী?'

'জনসন।'

'সবরকম জিনিসই এখানে তৈরী হবে, মিস্টার জনসন। সবরকম—কোকো আর চকোলেটের জিনিস, নারকেল, নারকেলের শাঁস, নারকেল তেল, ওটের খোল, মাদুরের কাঠি···' বলে থামল, যেন এই বিস্তারিত পরিকল্পনায় সে নিজেই মুগ্ধ।

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছেন মিস্টার জনসন। তারপর চোখ ফেরালেন পাশের জমিটায়, যেন ওখানেই তিনি খুঁজছেন তাঁর উত্তর। কথা না বলে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, 'আমি—মানে আমার মনে হয় এ-জায়গাটা যেমন আছে, তাতেই আমাদের ভালো লাগে। শান্তি আর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে থাকাটাই বোধ হয় আমাদের পছন্দ।'

'শান্তি! নৈঃশব্দ্য!' ব্যবসায়ী অবাক। হে ভগবান, বলে কী এ-লোক! 'মিস্টার জনসন, একটু ভেবে দেখুন একটা কারখানা হলে এ-অঞ্চলে কত উন্নতি হবে। একটা অনুন্নত জায়গায় এটা তৈরি হওয়ার মানেটা একটু বুঝুন। যে শত শত লোক আমাদের এখানে কাজ পাবে—তাদের কথাটা ভাবুন। প্রগতির কথা ভাবুন, মিস্টার জনসন, প্র-গতি। এর আগে এ-অঞ্চলে এমন উন্নতি তো আর কখনো হয়নি।'

'হয়নি—সে আমাদের ভাগ্য!' ভাবলেন মিস্টার জনসন। বললেন না কিছুই। সতৃষ্ণনয়নে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। তাকালেন ব্যবসায়ীর দিকে। নিজেকে তাঁর দুর্বল লাগছিল। তার ভাবনাটা বিস্তারিত জানিয়ে ব্যবসায়ী তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে। গৃহনির্মাণ-পরিকল্পনাটা তার কাছে স্পষ্ট। চোখ মেললেই সে দেখতে পায়, কলকারখানা যেন তার সামনে উপস্থিত। সেগুলির চিমনি দিয়ে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া, চাকা ঘোরার শব্দ হচ্ছে ঘড়ঘড়।

যেন সে শুনতে পাচ্ছে, এই স্থানের নৈঃশব্দ্য ভেদ করে উঠে-আসা কারখানার গুমগুম আওয়াজ।

মিস্টার জনসনের দিকে সে ফিরে তাকায়। তার তৃপ্তি যেন আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। বলছে, 'কী সুন্দর সমতল ঐ জায়গাটা, দেখুন। সত্যিই সুন্দর। আমাদের বাকি শুধু এখন ঐ পেয়ারা বাগানটা সরিয়ে ফেলা।'

'কিন্তু কেন?' মিস্টার জনসন বললেন, 'কিন্তু কেন? পেয়ারা বাগানটা কেন?'

নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ব্যবসায়ী। ফিরে দাঁড়ায় মিস্টার জনসনের দিকে। অধৈর্যভাবে সে বলে ওঠে, 'আপনি চান ওটা এখানে থাকুক?' ফুলে উঠেছে তার গলার শির। 'ম্যালেরিয়া হোক, টাইফয়েড হোক—এই কি আপনার ইচ্ছে নাকি?' সে বলে চলে, 'শুনুন, মিঃ জনসন, ওই-রকম ভাবুক কবি-কবি হয়ে থাকাটা কোন কাজের কথা নয়। এটা রক্তের, ঘামের, হাঁপ ধরানো কাজের যুগ, কাব্য করার যুগ নয় এটা।' বলে ঝড়ের বেগে সে চলে যায় ওখান থেকে।

সেখানেই দাঁড়িয়ে ওর চলে যাওয়াটা লক্ষ্য করেন মিস্টার জনসন। তারপর চোখ সরান একফালি এই পেয়ারা-বাগানটার দিকে। কী একটা কষ্ট বুকের মধ্যে নিয়ে তিনি ভাবতে থাকেন, পুরনো দিনের স্মৃতি ভীড় করে আসে মনের মধ্যে। কিছুতেই আর সম্ভব না যে, চারিদিকের এই পরিস্থিতি থেকে তিনি বেরিয়ে আসবেন, আবার ফিরে যাবেন বালক-বয়সে, এমি, মলি, কিটসিজ, কুটসের সঙ্গে সেই পেয়ারা বাগানটায়! কিছুতেই তিনি পারেন না আর শৈশবে ফিরে যেতে, দুর্দান্ত, স্বাধীন আর ঠিক ঐ পেয়ারার ডালগুলির মতো নমনীয় হয়ে উঠতে। সেইরকম দিনগুলো কেমন ছিল—ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর ফিরে এলেন ব্যবসায়ীর ভাবনায়, আর অমনি মনে হলো যেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন তার সেই গম্ভীর স্বর: 'ম্যালেরিয়া চান? টাইফয়েড?··· এটা কাব্য করার যুগ নয়, হাঁপ ধরানো কাজের যুগ।'

চারিদিকে চাইলেন তিনি—কেউ কোথাও নেই। সশব্দে বলে উঠলেন, 'তোমরা—এই তোমরাই ধরাচ্ছো হাঁপ। কোন কিছু ধ্বংস করলে, তবেই সেখানে সৃষ্টি করার কিছু দেখো তোমরা। জায়গাটা লণ্ডভণ্ড করে দিলে।' বুকের মধ্যে একটা কষ্ট অনুভব করলেন তিনি। তিনি জানতেন, ব্রিফকেস-হাতে ঐ লোকগুলির কাজ যখন শুরু হবে, গ্রামটা কখনোই আর এইরকম তো থাকবে না।

ঠিক সেই মুহূর্তে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা কথা ওঁর মনে হলো, তাই তিনি পথ ধরে ফিরে চললেন সেই নারকেল গাছটার দিকে। আর একটু পরেই তিনি এসে পৌছলেন সেই ব্যবসায়ীটির কাছে।

বললেন, 'আচ্ছা মশাই, কবে নাগাদ শুরু হচ্ছে আপনাদের কাজ ?'

পিছন ফিরে খানিকটা অবাকই হলো ব্যবসায়ী। সহাস্যবদনে বলল, 'এই —আমরা—প্রায় প্রস্তুত হয়েই আছি, মিস্টার জনসন।—দেখি, কাটাকাটি আর মাটি সমান করার কাজটা তো মঙ্গলবার নাগাদই শুরু হওয়া উচিত। আর এই ধরুন ও মাসের শুরু নাগাদ মালমশলা সব এখানে পৌছে যাওয়ার কথা। কারখানা তৈরিও ঐ তখনই শুরু হয়ে যাবে।'

'ও, আচ্ছা। খুব ভালো, আচ্ছা, নমস্কার।' বলে উঠলেন মিস্টার জনসন। তারপর পিছন ফিরে তিনি এগিয়ে গেলেন পথে।

এই কারখানা-চত্বরের কারবারীদের যেন এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করার জো নেই। ঠিক মঙ্গলবার সকালেই শ্রমিকদের কাজ শুরু হয়ে গেল বাড়ির পিছনের জমিটায়। পেয়ারা-বাগানটা দিয়েই শুরু। ঝপ্! ঝপ্! ঝপ্!—কুঠার কাজ করে চলেছে। ঝপ্! ঝপ্! ঝপ্! হেলে পড়ছে পেয়ারা গাছগুলো, তারপর সটান মাটিতে।

উঁচু জমিতে দাঁড়িয়ে কাজকর্ম তদারক করছে ব্যবসায়ী লোকটি। হঠাৎ তার মনে পড়ল ব্রিফকেসে বয়ে আনা তাদের ছক-আঁকা কাগজটার কথা। মিস্টার জনসনকে দেখানোর জন্যই আনা। চিন্তিত ভাবে গাছের ঝাড়টার মধ্য দিয়ে সে এগিয়ে চলে।

বাড়িটায় পৌছে মিস্টার জনসনের নাম ধরে সে ডাকল, গর্জন করে উঠল বলা যায়। শুনতে পেয়ে দৌড়ে বেরোলেন পাশের বাড়ির প্রতিবেশী মহিলাটি। বললেন, 'মিস্টার জনসন তো এখানে নেই, আপনি বুঝি জানেন না? কী হয়েছিল কী জানি—সবাই তো অবাক। হঠাৎই ফিরে এলেন গত বছর, আমরা তো জানি, বেশ ভালোই কাটাচ্ছিলেন এখানে। হঠাৎ কালকে জিনিসপত্র বাঁধলেন-টাঁধলেন আর সঙ্গে সঙ্গে রওনা।'

অনুবাদ : শ্রাবন্তী ঘোষ

ক্যালিপ্‌সোনিয়ান

সামুয়েল সেলভন

ত্রিনিদাদে সময়টা বড্ডো খারাপ যাচ্ছে। রেজর ব্লেড কিছুতেই কিছু সুবিধে করতে পারছে না। কেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু হচ্ছে না কিছুই। যেখানেই যাচ্ছে কোনো কাজ মিলছে না। কাজ সোনার মতোই দুর্লভ হয়ে পড়েছে। ছ'মাস হতে চললো ওর কোনো কাজ নেই।

ওদিকে চিন-এর দোকানে পাঁচ ডলার ধার হয়েছে। গতবার ওখানে যখন স্যাণ্ডউইচ আর মিষ্টি মদ খেতে গিয়েছিলো, চিন ওকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে বাকি শোধ না করলে আর বিশ্বাসের কোনো ব্যাপার নেই। কাউন্টারের নিচে একটা খাতায় চিন ওর নাম টুকে রেখেছে। "সবুর করো, ক্যালিপ্‌সোর দিন আসুক", ও চিনকে বলে "তখন আমি কী করি দেখো। মনে আছে গত বছর কতো রোজগার করেছিলাম?"

গত বছরের কথা মনে করেও চিন-এর মন গলে না। ফলে অবস্থা দাঁড়ালো সেই ক্ষুধা, সেই নোংরা জামা-কাপড় আর কোথাও কিছু হবার কোনো লক্ষণ নেই। এদিকে ক্যালিপ্‌সো আসতে এখনো চার মাস বাকি।

এর ওপর প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। ওর পায়ের জুতোয় এতো বড়ো-বড়ো ফুটো হয়েছে, যেন ওগুলো হাসছে।

এই বৃষ্টির জন্যেই সে পার্ক স্ট্রীটের-এক জুতো তৈরির দোকান থেকে একজোড়া জুতো চুরি করলো। জীবনে এই প্রথম চুরি, তাই মনস্থির করতে অনেকটা সময় লাগলো। জুতোর দোকানের সামনে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ও ভাবছে, হা ঈশ্বর, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে, তখন সামনের দোকানে টেবিলের ওপর, মাটিতে, এখানে-ওখানে সব জুতো ছড়ানো। কোনোটা নতুন, কোনোটা পুরনো, কারো হাফসোল হবে, কারো বা হিল। ওখানে একজোড়া রয়েছে ঠিক ওর পায়েরটার মতো।

টেবিলটা কেটে-কেটে গেছে, যেন মুচি চোখে দেখে না, তাই চামড়া কাটতে

গিয়ে টেবিলটাই কেটে ফেলেছে। টেবিলের ওপর আধভাঙা লাউ-এর খোলার মধ্যে ফোটানো মাড়। দেখতে লাউ-এর মতো। ওর এতো খিদে পেয়েছে যে ওগুলো খেয়ে নিলে হয়। মুচি দোকানের পেছন দিকটায় রয়েছে। সামনে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য কিছু লোক আশ্রয় নিয়েছে। কাজটা এতো সহজ মনে হলো—নিজের জুতো জোড়া খুলে রেখে আরেক জোড়া তুলে নেয়া, অথচ নজরটা ঠিক পড়েছে একজোড়া 'টেকনিক'-এর ওপর, ঠিক নিজের পায়ের মাপের।

রেজর ব্লেড-এর মনে পড়ে গত বছর ওর সময়টা কতো ভালো ছিলো—পায়ে দো-রঙা 'টেকনিক', গায়ে গ্যাবার্ডিন স্যুট আর রঙীন টাই। এখন সময় খারাপ যাচ্ছে ব'লে প্রতিমুহূর্তেই সে গত বছরের সঙ্গে তুলনা করছে, মনে-মনে ভাবছে সেই সুন্দর পুরনো দিনগুলো যদি আবার ফিরে আসতো!

ওর মনে হ'লো চুরি করা বেশ সহজ, কারণ অনেকেই জিনিসপত্র ফেলে রেখেই এদিক-ওদিক চলে যায়। যেমন এই মুচিটি দোকানের পেছনে চলে গেছে, আর ওকে যা করতে হলো তা হলো শুধু একজোড়া জুতো তুলে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় হেঁটে যাওয়া।

চুরি করা এমন একটা কিছু ব্যাপার নয়। যা দরকার তা হলো একটু মেজাজ, বেকারত্ব—ব্যস্। এদিক-ওদিক দু-তিনবার ঢুঁ মারলে ঝাঁকা থেকে একটা কমলা অথবা দোকান থেকে রুটি কিম্বা অন্য কিছু। ঠিক যেমন ক'রে জুতো জোড়া হাতানো গেলো।

যদিও ভীষণ ভয়ে-ভয়ে আছে এবং মনে হচ্ছে শরীরের কোনো-কোনো অংশে কেউ সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরেছে, রেজর ব্লেড কিন্তু বিজয়ী বীরের মতো শিস্ দিতে-দিতে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলো।

শুধু ওর এখন ভীষণ খিদে পেয়েছে।

ঠিক কুইন স্ট্রীটের যেখানটায় এক রেস্তরাঁ রয়েছে সেখানটায় দাঁড়িয়ে তার মাথায় একটা ব্যাপার খেলে গেলো। আসলে ব্যাপার কিছু নয়, ও ভাবলো: শিলিং চুরি করা যা, পাউণ্ড চুরি করাও তাই, এখন সে সবকিছুই করতে পারে। শুধু শুরু করাটাই যা, শুধু একবার ক্ষেপে যাওয়া, তারপর ব্যাপারটা সহজ

ও পরিকল্পনা ভাঁজছে বলে আপনার মনে হয় ও ভাবছে সামনের

চীনে রেস্তরাঁয় ঢুকে প'ড়ে সোজা টেবিল দখল করে বেশ পেট ভরে খেয়ে নিয়ে পয়সা না দিয়ে বেরিয়ে পড়া। কাজটা এত সহজ, অথচ একথা সে আর কখনো কেন ভাবেনি, আশ্চর্য!

ওয়েট্রেস্ পাশে এসে দাঁড়ায়, রেজর ব্রেড মেনু দেখতে থাকে। কানে পেনসিল গুঁজে মহিলা দাঁড়িয়ে। ও তার দিকে আড়চোখে এক ঝলক দেখেই বুঝতে পারলো মেয়েটি এখানে ঠিকে। কারণ দেখলে মনে হয়, ওর ঘুম পেয়েছে আর শরীরটা এক টুকরো তামার তারের মতো বেঁকে গেছে। কীই-বা করার আছে? মেয়েটা ঐ চীনে লোকটির কাছ থেকে কয়েকটা ডলার মাত্র পায় যাতে ওর দিন চলে না।

হঠাৎ ও বুঝতে পারলো নিজেরই কিছু ঠিক নেই অথচ সে ঐ মহিলাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। তাই সে মাথা ঝাঁকিয়ে মেনু দেখতে লাগলো।

প্রায় সবগুলো জিনিসেরই কিছু অর্ডার দেবার জন্য ও পাগল হ'য়ে উঠলো—ফ্রায়েড রাইস, চিকেন চপ-স্যুয়ে, পর্ক রোস্ট, চিকেন চৌ-মিন, বার্ডনেস্ট স্যুপ, চিকেন ব্রথ এবং ইয়া বড়া টোমাটো ও পেঁয়াজের টুকরো দিয়ে দারুণ সালাড। আবার সে গত ক্যালিপ্সোর দিনগুলোর কথা ভাবতে বসলো। তখন কী দিন ছিলো! সেণ্ট ভিনসেণ্ট স্ট্রীটের নামকরা চীনে রেস্তরাঁয় তখন সে যেতো। ওর ভাবতে মজা লাগে মানুষ কেমন এক সময় বেশি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে, আবার অন্য সময় খাবারের জন্য মাথা খুঁড়ে মরতে হয়।

এ রকম একটা ব্যবস্থা থাকা বোধ হয় উচিত, যাতে একসঙ্গে এক হপ্তা বা এক মাসের খাবার খেয়ে নেয়া যেতে পারে। ও ভাবলে এরপর যখন ওর হাতে টাকা হবে (হা ঈশ্বর!), তার বড়ো-একটা অংশ রেস্তরাঁয় জমা দিয়ে রাখবে যাতে ওকে শুধু ওখানটায় সময়মতো ঢুকে পড়ে হাভাতের মতো গিলতে পারে।

এদিকে মহিলা অস্থির হ'য়ে উঠেছেন। তিনি বললেন: "মনে হচ্ছে আপনি এর আগে কোনো দিন রেস্তরাঁয় খান নি। মনস্থির করতে এতো সময় নিচ্ছেন কেন?"

আর ও ভাবতে লাগলো সেই সময়ের কথা যখন ওর টাকা ছিলো, যখন কোনো এলেবেলে মেয়েছেলে ওর সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারতো না। ওর মনে পড়ে বেয়ারারা ওকে পরিচর্যা করার জন্য কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়তো। এবং একদিন যখন খবর রটে গেলো যে ক্যালিপ্সোনিয়ান রেজর

ব্লেড এসেছে, ওরা সব্বাই সনির্বন্ধ অনুরোধ করলো একটা গানের জন্য—সেই হোম আর ব্যাচেলরকে নিয়ে যে গানটা।

"আরে মশাই চটপট মন ঠিক ক'রে ফেলুন। আমার কাজ রয়েছে।"

সুতরাং সে খালি ভাত ও চিকেন স্টু-র অর্ডার দিলো। এর আগে যে-সব দারুণ খাবারের কথা ভাবছিলো, সেটা শুধু মজা ক'রে ভাবাই। আসলে সে চাইছে রোস্ট ব্রেডফ্রুট এবং সল্টফিশ, মানে ভারী কিছু যা পেটে গেলে টের পাওয়া যায়।

তাই সে প্রথমেই অর্ডার দিলো বারবাডোজ রাম-এর জন্য, কারণ সে জানে এরা খাবার আনতে কতো দেরী করে। সেই সময়টা রাম দিয়ে ভরে দেয়া যাবে।

খাবার আসতে-আসতে ওর দারুণ খিদে পেয়ে গেলো। তাই সে ভাত ও চিকেন স্টু-র ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো যেন জীবনে সে এই প্রথম খাবার দেখছে। তিন মিনিটেই সব শেষ।

মনে হ'লো এই প্রথম পৃথিবীকে দেখছে। নিজেকে মনে হচ্ছে লক্ষপতি, লর্ড। একটা মস্তো ঢেঁকুর ওর গলায় তুলে আনলো কিছু মাংস আর ভাত। সেগুলো যখন আবার ও গিলতে গেলো কেমন যেন টক-টক স্বাদ।

ও ভাবছে কী ক'রে এক আমেরিকান ত্রিনিদাদ-এ ক্যালিপ্‌সো শুনে দেশে ফিরে গিয়ে তাতে সুর এবং রঙ লাগিয়ে এ্যান্ড্রুজ সিস্টারসকে দিয়ে গাওয়ায়। লোকটা যাচ্ছেতাই পয়সা ক'রে ফেললো এ থেকে। 'হিট প্যারেড'-এ ওটা বাজলো। যেখানেই যাও, ঐ গান। শুধু ঐ গান। কিন্তু বেচারা ক্যালিপ্‌সোনিয়ান, যে নিজে ঐ গান লিখেছে, সে ত্রিনিদাদ-এ পচে মরছিলো। এক চালাক চতুর উকিলবাবু ওকে কপিরাইটের কথা বুঝিয়ে দিতেই সে আমেরিকা চলে গেলো। তারপর নিউ ইয়র্কের সেই মামলার কথা নিশ্চয়ই জানেন যাতে সে প্রচুর পয়সাকড়ি পেয়েছিলো ?

রেজর ব্লেড গল্পটা ভালো করেই জানে। যখনই সে একটা ক্যালিপ্‌সো বাজায়, প্রার্থনা করে মার্কিন মুলুক থেকে একজন হোমরা-চোমরা কেউ ওটা শুনুক ও পছন্দ করুক। তারপর সব্ ঠিক হো যায়গা। রেজর ব্লেড মাঝে-মাঝেই ফ্রেডরিক স্ট্রীট ও মেরিন স্কোয়ারে ওয়ান-টু মিউজিক শপগুলোর কাছে যায়, চালু গানগুলোর স্বরলিপির দিকে তাকিয়ে থাকে! স্বরলিপির পাশে বড়ো-বড়ো অক্ষরে গীতিকারের নাম, কখনো বা ছবি। রেজর ব্লেড

ভাবে : আমি কেন এ রকম গান লিখতে পারি না যাতে সব জায়গায় নাম ছড়িয়ে পড়ে।

সময় যখন ভালো ছিলো, সে দোকানের ভেতরে যেতো এবং কেরানীদের বলতো যে, সে ক্যালিপ্‌সো লেখে। ওর কথা শুনে ওরা হাসতো, কারণ, ওরা মনে করে ক্যালিপ্‌সো কোনো গানই নয়। মার্কিনি সুরকাররা যে-গুলো তৈরি করছে যেমন 'আই হ্যাভ গট ইউ আনডার মাই স্কিন' এবং 'সেণ্টিমেণ্টাল জার্নি' হচ্ছে সত্যিকারের গান।

এবং রেজর ব্লেড নিজের সঙ্গে তর্ক ক'রে চলে—সবারই দিন একদিন আসে। একদিন এমন হবে সারা দুনিয়া পাগলের মতো শুধু ক্যালিপ্‌সো গাইবে।

চীনে রেস্তরাঁয় চেয়ারে হেলান দিয়ে সে এসব কথাই ভাবছে।

এখন তো পয়সা-কড়ি না দিয়ে সট্‌কে পড়তে হবে!

সবচেয়ে ভালো হচ্ছে ঠাণ্ডা মাথায় গম্ভীরমুখে বেরিয়ে যাওয়া যেন ও-ই এ রেস্তরাঁর মালিক।

সুতরাং সে উঠে দাঁড়ালো। দেখলো ওয়েট্রেস্ ধারে কাছে নেই, সে নিশ্চয়ই অন্য কাউকে এখন খাবার দিচ্ছে, তারপর ক্যাশিয়ারের পাশ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেলো। ক্যাশিয়ার খাতায় যেন কী লিখছে।

কিন্তু এ-অবস্থায় যতই গম্ভীরমুখে তুমি হেঁটে যাও না, তোমার শরীরের একটা অংশে চিম্‌টে ক্লিপ্-ক্লিপ্ ক'রে খাম্‌চে ধরবে, মনে হবে দুটো পা এক হ'য়ে গিয়ে তুমি হাঁটছো।

ওয়েট্রেস্ যখন দেখলো রেজর ব্লেড পয়সা না দিয়ে চ'লে গেছে, দারুণ চেঁচামেচি শুরু করে। রান্নাঘর থেকে একজন চীনেম্যান ছুটে গেলো বাইরে যদি লোকটাকে দেখতে পায় এই আশায়। কিন্তু তখন রেজর ব্লেড ফ্রেডরিক স্ট্রীট ধরে ছুটে চলেছে।

রেস্তরাঁর মালিক মহিলাকে জানালো যে রেজর ব্লেড-এর খাবারের দাম তাকেই দিতে হবে, কারণ দোষ তারই। মহিলা আরও চেঁচামেচি জুড়ে দিলেন, কারণ রেজর অনেকটা খাবার খেয়েছে—তার মানে ওর মাইনে থেকে প্রায় দু-তিন ডলার কাটা যাবে।

যাক তাহ'লে এবারও, রেজর ব্লেড হেসেই অস্থির। রেলওয়ে স্টেশনের কাছে এসে পড়েছে সে। এখন ওকে আর কেউ ধরতে পারবে না।

হঠাৎ বৃষ্টি পড়তে লাগলো। রেজর ব্লেড নতুন জুতো পায়ে রাজার মতো হেঁটে

চলেছে। এখন আর পায়ে জল লাগছে না, তাই আশ্রয়ের জন্যও মাথা ব্যথা নেই।

ও জানেনা কেন, কিন্তু হঠাৎ ওর মাথায় একটা ক্যালিপ্‌সোর কথা খেলে যায়। ওটা হবে একটা লোককে নিয়ে যে সবরকম চেষ্টা করেও কোনো কাজ পাচ্ছে না, এবং সত্যিকারের কষ্টের দিনগুলোকে সে কীভাবে দেখছে। বৃষ্টির ভেতর হাঁটতে-হাঁটতে সে কথাগুলো তৈরি করার চেষ্টা করে এভাবে—

'এই কলোনীর সেই যে আমার দিনগুলি।

যখন আমি ছাড়া সবাইর ছিলো টাকা।

যখন মাথা কুটেও জোটেনি কোনো কাজ।

মনে হতো ভালো সময় এড়িয়ে যাচ্ছে আমায়।'

একটা পুরোনো ক্যালিপ্‌সোর (ম্যান সেন্টিপেড ব্যাড টু ব্যাড) সুরে ও গুনগুন ক'রে ত্থাখে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়:

ওর মনে পড়লো ওয়ান ফুট হার্পারি-এর কথা। সে-ই একমাত্র লোক যে ওকে গানের সুর জোগাতে পারে।

ওয়ান ফুটকে নিয়ে এক সময়ে একটা দারুণ রগড় হয়েছিলো। একদিন উডফোর্ড স্কোয়ারে এক উইলো গাছের ছায়ায় ওয়ান ফুট যখন ঝিমোচ্ছিলো, কেউ সেই ফাঁকে ওর ক্রাচ্‌ চুরি করে। ফলে ওকে সারাদিন সারারাত স্কোয়ারে থাকতে হয়েছিলো। সহজেই ভাবা যায় ও কতো অভিশাপ দিচ্ছিলো নিজেকে। সবাই দাঁড়িয়ে দাঁত বার ক'রে হাসছে, কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে না। হয়তো এই মুহূর্ত পর্যন্ত ওয়ান ফুটকে ঐ উইলো গাছের নিচে প'ড়ে থাকতে হতো, যদি না রেজর ব্লেড ওখানে গিয়ে পড়তো।

সেই থেকে ওরা দু-জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সুতরাং রেজর ব্লেড এগিয়ে চলে দরজির দোকানের দিকে যার এক অংশে ওয়ান ফুটকে পাওয়া যাবেই, কারণ ওর কোনো কাজ নেই। একটা সাবানের বাক্সের ওপর ব'সে সারাদিন সে ব'কে চলে।

অযথা মাথা গরম ক'রে লাভ নেই, কারণ ওয়ান ফুট মোটেই বোকা নয়; একদিন ছিলো যখন লোকে ওকে ক্যালিপ্‌সোর রাজা বলতো: এবং সত্যিই সে দারুণ গাইতো। ওর যদি টাকা এবং ডিগ্রি থাকতো তাহ'লে নির্ঘাৎ আজ ও অনেক ওপরে উঠে যেতো। কারণ, ও-ই প্রথম লোক যার মাথায় খেলে-

ছিলো যে ক্যালিপ্‌সোনিয়ানদের আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড-এ গিয়ে গান গাওয়া উচিত। কিন্তু লোকে ওর কথা তখন হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে।

রেজর ব্লেড যখন ওয়ান ফুট-এর দেখা পেলো তখন সে টাউন হলে কী ক'রে আগুন লেগেছিলো (ওয়ান ফুট বলছিলো সে জানে কে ঐ আগুন লাগিয়েছিলো) সেই আলোচনায় মশগুল। ওকে দেখে ওয়ান ফুট আলোচনা থামিয়ে বললো, "কী ব্যাপার দোস, অনেক কাল দেখা নেই।"

রেজর ব্লেড বলে, "শোনো দোস্ত, একটা ক্যালিপ্‌সোর দারুণ আইডিয়া মাথায় এসেছে। চলো, দোকানের পেছনে ব'সে ওটা চেষ্টা করা যাক।"

ওয়ান ফুট কিন্তু সাবানের বাক্সের ওপরই বেশ আরামে আছে। সে বললে, "আরাম ক'রে ব'সো, তাড়া দিও না। তা গত হপ্তায় যে এক শিলিং ধার নিয়েছিলে তার কী হ'লো?"

রেজর ব্লেড পকেটগুলোকে উল্টে দিলো। মেঝের ওপর ছিটকে পড়লো একজোড়া পাশা ও একটা পেনসিল-কাটা ছুরি।

"আমার কাছে একটা কপর্দকও নেই। কিস্‌সু নেই। আমার গায়ে যদি পিন ফোটাও এক ফোঁটা রক্তও বেরুবে না।"

"থামকা ওসব কথা বলো না। তোমাদের সবারই ওই এক কায়দা। লোকের কাছ থেকে টাকা ধার করো, তারপর তার ঠিকানা ভুলে যাও।"

"তোমায় বলছি আমি," রেজর ব্লেড এমনভাবে বলে যেন খুব তাড়া রয়েছে, আসলে সে এই আলোচনা থেকে স'রে যেতে চায়, "তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছো না?"

কিন্তু ওয়ান ফুট ছাড়বার পাত্র নয়। সে বলে, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিন্তু তোমায় বলে রাখছি যদি আবার আমার কাছে ধার চাইতে আসো তবে মস্ত ভুল করবে। এক কাণাকড়িও তোমায় আমি দেব না যতক্ষণ না তুমি আমার ঐ এক শিলিঙ শোধ দিচ্ছো।" সাবানের বাক্সো ছেড়ে উঠে ক্রাচে দেহের ভার ঠিক ক'রে নেয়।

"এসো তাড়াতাড়ি এসো," রেজর ব্লেড দোকানের পেছন দিককার ঘরে যাবার ভাব করে। এই সময় ভারতীয় দরজি রহমতকে দেখতে পায়। "কেমন আছো, ভালোই চলছে মনে হয়।"

খাকি প্যান্ট সেলাই করা থামিয়ে রহমত রেজর ব্লেড-এর দিকে তাকায়।

"তুমি ও ওয়ান ফুট হরদম এই দোকানে ব'সে ক্যালিপ্সো লিখছো। আমায় কিন্তু কমিশন দিতে হবে।"

"তুমি তো জানোই ব্যাপারটা কেমন—কখনো সময় ভালো যাচ্ছে, কখনো আবার খারাপ। এই মুহূর্তে ঝুলে আছি, একেবারে দারুণভাবে ঝুলে আছি।"

"জানি, ওই বুড়ো মজার লোক। কিন্তু তোমাকে আমি কখনো ভালো অবস্থায় দেখিনি।"

"আ, ক্যালিপ্সো শুরু হোক তখন দেখতে পাবে।"

"তখন তো তুমি এদিকে পা-ই মাড়াবে না। তখন তো তুমি মস্তো লোক, এই সামান্য রহমতকে কি মনে থাকবে।"

এরপর রহমতকে কী বলবে রেজর ব্লেড ভেবে পায় না। কারণ, দোকানের পেছনে বসে থাকা সে ও ওয়ান ফুট সম্পর্কে ভারতীয়টি যা বলেছে সবই ঠিক। ওর মনে পড়ে ইদানীং ওকে যখনই কেউ জিগেস করেছে, ও বলেছে: "ক্যালিপ্সোর সময় আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো," যেন ক্যালিপ্সো শুরু হলেই ঈশ্বর পৃথিবীতে নেমে আসবেন এবং সবাইকে সুখী ক'রে দেবেন।

সুতরাং রেজর ব্লেড ফিক্-ফিক্ ক'রে হেসে রহমতের পিঠ চাপড়ে দেয় আস্তে-আস্তে পুরনো বন্ধুর মতো।

এ-সময়ে ওয়ান ফুট এগিয়ে আসে, এবং ওরা দু'জনে বিশ্রামের টেবিলের পাশে বসে।

রেজর ব্লেড বললো: "এই কথাগুলো শোনো, জন্ম থেকে এ রকম ক্যালিপ্সো কোনোদিন শোনো নি," বলেই সে কথাগুলো বলতে শুরু করে।

শুরু করতেই ওয়ান ফুট আঙুলে কান বন্ধ ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো: "হা ঈশ্বর, তোমার মাথায় কি নতুন-কিছু ভাবতে পারো না। প্রতি বছরই সেই এক পুরোনো কথা।"

"তুমি কী বলছো," রেজর বলে, "এই তো আদি ক্যালিপ্সো। আগে সবটা শুনে নাও।" ওরা দু-জন গানটা নিয়ে কাজ শুরু করে। ওয়ান ফুট দু-লাইন ক'রে সুর বসিয়ে দিলো। রেজর ব্লেড একটা খালি বোতল ও একটা কাঠি দিয়ে এবং ওয়ান ফুট টেবিলে তাল বাজিয়ে ওদের নতুন তৈরি ক্যালিপ্সো গাইতে থাকলো।

রহমত এবং ওর সাহায্যকারী অন্য ভারতীয়টি সেলাই হাতে নিয়ে শুনতে লাগলো।

"এই নতুন গানটা কেমন লাগলো তোমার ?" রেজর ব্লেড রহমতকে জিগেস করে।

রহমত মাথা চুলকে বললো : "আবার শুনি সুরটা।" সুতরাং ওরা টেবিল এবং বোতল বাজিয়ে আবার শুরু করলো। আর রেজর ব্লেড-এর মনে হলো সে ক্যালিপ্‌সো টেস্ট-এ বেশ বড়ো শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে গাইছে। সুতরাং ও সবকিছু ঢেলে দিলো ওর গানে।

যখন শেষ হ'লো রহমতের সাহায্যকারী লোকটি ব'লে উঠলো : "এ হ'লো প্রাণের জিনিস।"

কিন্তু রহমত বলে : "মুখ বন্ধ ক'রে থাকোনা বাপু। তোমরা ভারতবর্ষের লোকেরা ক্যালিপ্‌সোর কী বোঝ ?" একথা শুনে সবাই হাসতে লাগলো। দারুন হাসির ব্যাপার, কারণ রহমত নিজেই একজন ভারতীয়।

ওয়ান ফুট রেজর ব্লেড-এর দিকে ফিরে বললো : "শোনো দু-জন ভারতীয় কীভাবে ক্যালিপ্‌সো নিয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। আমার বাপের জন্মেও এমন দেখিনি।"

রহমত বললে : "আরে বাবা, আমি হচ্ছি ত্রিনিদাদের আসল অধিবাসী, হ্যাঁ।"

রেজর ব্লেড বললো : "ঠিক আছে ভাই। তামাশা হচ্ছে তামাশা। তোমাদের এ-গান ভালো লেগেছে ? সত্যি ভালো লেগেছে ?"

রহমত হ্যাঁ বলতে চাইলো, কিন্তু নানান ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেষে বললো : "এই, মানে মোটামুটি" এবং "না, তেমন-কিছু খারাপ নয়" এবং "আমি এর চেয়ে খারাপ গানও শুনেছি।"

কিন্তু যে-লোকটা রহমতকে সাহায্য করে সে পাগলের মতো রেজর ব্লেড ও ওয়ান ফুট-এর কাঁধ চাপড়ে বললো, সে এ রকম ক্যালিপ্‌সো আগে কোনোদিন শোনেনি। ওর নিশ্চিত ধারণা পরের বছর কার্নিভালে এ-গান রোড মার্চ হবেই। কথা বলতে-বলতে সে হাওয়ায় হাত ছুঁড়ে দিলো, সেই হাত গিয়ে লাগলো রহমতের হাতে আর রহমতের হাতের ছুঁচ ওর আঙুলে বিঁধে গেলো।

রহমত হাতের আঙুল মুখে দিয়ে চুষতে লাগলো। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সহকর্মীকে খিস্তি করলো কেন সে চুপ ক'রে থাকে না। "ছুঁচের খোঁচায় শালা

আঙ্গুলটাই গেলো।” “তাতে হয়েছে কি? ছুঁচ ফুটতেই তুমি মরে যাচ্ছো?” লোকটি বললো।

দারুণ তর্ক শুরু হ'য়ে গেলো। ওরা রেজর ব্লেডের ক্যালিপ্‌সোর কথা ভুলে গিয়ে কী ক'রে পিন ও ছুঁচ থেকে রক্ত দূষিত হয় তাই নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠলো।

ভালো কথা, ক্যালিপ্‌সোর ব্যাপারে কোনো-কিছু লিখে রাখবার নেই। রেজর ব্লেড গানের কথা ও সুর মনে মনে ধ'রে রাখে—ব্যস্‌। এ ভাবেই একটা ক্যালিপ্‌সোরা জন্ম নেয়, ধীরে ধীরে কোনো হৈ-চৈ না করে। এভাবেই জন্ম নিয়েছে সব বিখ্যাত ক্যালিপ্‌সো—“ইয়েস, আই ক্যাচ্‌ হিম লাস্ট নাইট,” এবং “হোয়াট ইজ্‌ এ থিং আই ক্যান ডু এনিটাইম এনিহোয়ার,” এবং “ওল্ড লেডি ইয়োর ব্রুয়ারস্‌ ফলিং ডাউন” ঐ রহমতের সেলাই-র দোকানের পেছনে।

পিন ও ছুঁচ নিয়ে মস্তো তর্কের পর রহমত ও তার সহকারী ফিরে গেলো একটা স্যুটের কাজ শেষ করতে, কারণ লোকটা সন্ধ্যেবেলা আসবে ওটা নেবার জন্য।

এবার রেজর ব্লেড ভাবছে ওয়ান ফুটকে বলবে ওকে এক শিলিং ধার দেবার জন্য, কিন্তু বুঝতে পারছে না ঠিক কী ভাবে বলবে—কারণ, ওর কাছে আগে থেকেই ধার রয়েছে। সুতরাং মিষ্টি কথা দিয়ে শুরু করে ক্যালিপ্‌সোর জন্য ওয়ান ফুট যে সুর দেয় তার প্রশংসা দিয়ে। এত মধুর সুর নাকি সে এর আগে আর শোনে নি।

কিন্তু যেই সে বলতে শুরু করে, অমনি বুড়ো ওয়ান ফুট হুঁশিয়ার হ'য়ে যায় এবং বলে, “ঈশ্বরের দোহাই, আমায় বোকা বানাবার চেষ্টা করো না।”

রেজর ব্লেড তাড়াহুড়ো করে না, কারণ ওর পেট এখন ভর্তি। কিন্তু কিছু ধার পাবার জন্য ওয়ান ফুটকে বোকা বানাতে গিয়ে ওর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়।

ও ওয়ান ফুটকে বলতে লাগলো কী ক'রে দিনটা কেটেছে। কী ক'রে পার্ক স্ট্রীটে জুতো সরিয়েছে দোকান থেকে এবং কিচ্ছু খরচা না ক'রে কী ক'রে একপেট খেয়েছে।

ওয়ান ফুট বললে: “আমি বাজি ধরছি তুমি বিপদে পড়বে। তোমরা বড্ডো বেশি ঝুঁকি নাও, হ্যাঁ।”

'মেজর ব্লেভ বললো : "ওটা হাতে চুব খাবার মতোই সহজ। তুমি ও রকম বলছো কারণ তোমার একটা পা নিয়ে ছুটতে পারো না ব'লে।"

ওয়ান ফুট বলে : "আমার পা নিয়ে কোনো ঠাট্টা নয়।" মেজর ব্লেভ বলে : "শোনো, তুমি একটা আস্ত গাধা! তুমি ও আমি মিলে টাকা রোজগারের ফন্দি বার করতে পারি। চেষ্টা করলে তুমিও একটা বড়ো চোর হ'তে পারো।"

"চোর তুমি, আমি নই।"

"কিন্তু ওয়ান ফুট শোনো," মেজর ব্লেভ নিচু গলায় বলে, "আমি সব কিছুই করতে পারি, কিন্তু তোমাকে বলছি পাহারায় থাকতে, দেখতে কেউ আসে কিনা।"

"তোমার ফন্দিটা কি বলোতো ?"

সত্যি বলতে কি বুড়ো ব্লেভ-এর মাথায় আগে থেকে ঠিক করা কোনো কিছু ছিলো না। যেটা সে ভাবছিলো তা হ'লো একটা বড়ো ধরনের চুরি যাতে পয়সা হবে। একটা ছবিতে দেখা স্পেন্সার ট্রাসির মতো ক'রে মাথা ও কান চুলকে বললো : "সেন্ট জেমস্-এ রক্সি থিয়েটারটা কেমন ?"

কথা বলার সময় সারা শরীরে উত্তেজনা, যেন ঢেউ উঠছে। ও ওয়ান ফুটের হাত ধরে আছে।

ওয়ান ফুট বললো : "এমন দিন হোক যখন সত্যিই তোমার মেজাজ খুলে যাবে। এমন দিনের কথা কোনোদিন ভাবিনি যখন আমার বন্ধু মেজর ব্লেভকে দেখবো চুরি করতে। ওহে, একদিন তুমি ধরা পড়ে যাবে। ক্যালিপ্সোর সময় আসা পর্যন্ত তুমি কোথাও একটা কাজ জুটিয়ে নিচ্ছোনা কেন ?"

"চেষ্টা করেছি অনেক, একটা কাজও জোটেনি।"

"তুমি যে চোর নও, একদিন নির্ঘাত ধরা প'ড়ে যাবে বলছি।"

"কিন্তু ছাখো আমি কীভাবে জুতো জোড়া নিয়ে এবং খাবার খেয়ে সটকে পড়েছি! আমি বলছি তোমাকে শুধু সাহস সঞ্চয় করতে হবে, আর কিছু নয়। তাহলে খুন করেও ছাড়া পেয়ে যাবে।" ওয়ান ফুট গুনগুন ক'রে একটা পুরনো ক্যালিপ্সো গাইতে লাগলো :

> "কারো যদি থাকে অনেক টাকা
> খুনী হলেও যায় না ধরে রাখা।
> তার ওঠা বসা গবর্নরের সঙ্গে..."

রেজর ব্লেড বিরক্ত বোধ করতে লাগলো। "তাহলে ব্যাপার তোমার পছন্দ নয়? তুমি ভাবছো আমি বেরিয়ে যেতে পারবো না।" "তোমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তুমি একটা নবিশ। অপরাধ ক'রে লাভ হয় না কিছুই।"

"তুমি এক নম্বরের ভীতু!"

"আমাদের ক্যালিপ্‌সোনিয়ানদের একটা মর্যাদা আছে।"

"মরোগে যাও! তুমি আমায় সাহায্য না করলে আমি নিজেই করবো। শুধু চেয়ে ত্যাখো! আর আমি ছোটো জিনিস হাতাইনে, বড়ো দাঁওই মারি! নদীর ধারে ধারে এগিয়ে গেলে, আমি জানি, অনেক টাকা করতে পারি: খুচরো ব্যাপারে আমি ··" চলতে-চলতে ভাবতে-ভাবতে সে কুইনস পার্ক সাভানায় এসে পড়লো। দেখলো এক বুড়ি কমলালেবু বেচছে। ও যেন রোদ্দুরে ঘুমোচ্ছে এমনভাবে এক হাতের ওপর থুতনি রেখে মাথা নিচু ক'রে বসে ছিলো। দু-একজন লোক এদিক-ওদিক যাচ্ছে। রেজর ব্লেড অবস্থাটা দেখে নিলো পলকে।

ও ক্ষেপে গেলো ডালা থেকে একটা লেবু নিয়ে কেটে পড়তে, লোককে দেখাতে যে সে এটা পারে। পাশ দিয়ে চলে যাও, নিচে ডালার দিকে তাকিও না—শুধু একটা তুলে নিয়ে সোজা হেঁটে যাও পকেটে পুরে।

আহা, ওয়ান ফুট এখন থাকলে দেখতে পেতো কাজটা করা কতো সহজ।

কিন্তু লেবুটা সবে পকেটে ফেলেছে অমনি বুড়ি লাফিয়ে উঠে চেঁচাতে লাগলো: "চোর, চোর! লোকটা একটা লেবু চুরি করে পালাচ্ছে! পাকড়াও ওকে! ধরে ফ্যালো!"

মনে হ'লো ঐ চিৎকার আর চেঁচামেচি ওর শরীরে সাঁড়াশী চালিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণ যা-কিছু ভাবছিলো সব ভুলে গিয়ে সাভানা দিয়ে ছুটতে শুরু করলো। সে পেছন ফিরে দেখলো তিনজন লোক তাড়া ক'রে আসছে। মনে হলো ও কিছুই অনুভব করছে না, ও দৌড়চ্ছে না, ও যেন এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। শুধু শরীরের ভেতরে সাঁড়াশী চলছে ক্যাঁচ্‌-ক্যাঁচ্‌ ক'রে আর ও হাঁপাচ্ছে: হে ভগবান! হে ভগবান!

"নেই।"

"ঠিক আছে গুরুদেব, আমি বলছি না আপনার কোনো বিপদ হোক।"

"বুঝলে হে ওয়ান ফুট, তোমার মুশকিল হচ্ছে তোমার একটা মাত্র পা, এবং তুমি আমার মতো ভাবতে পারো না।"

ওয়ান ফুট রেগে গেলো। বললো: "শোনো, আমার পা নিয়ে কোনো

ঠাট্টা নয়, বুঝলে ? ও-মশকরা আমি বরদাস্ত করবো না। আমার বাবা-মাকে তুমি শাপান্ত করতে পারো, কিন্তু পা নিয়ে একটি কথাও নয়।”

রেজর ব্লেড দমে না। “দুঃখিত ওয়ান ফুট। আমি জানি তুমি ঠাট্টা একদম সহ্য করতে পারো না।”

এ সময় রহমত ভেতর থেকে ডেকে জিগেস করলো ওরা এতো শোর জমিয়েছে কেন, নাকি ওরা মাছের বাজারে রয়েছে।

অতএব ওদের কথা শেষ হলো। রেজর ব্লেড বললো পরে এক সময় ও ওয়ান ফুট-এর সঙ্গে দেখা করবে। আর ওয়ান ফুট বললো: “ঠিক হ্যায়, ভাই, গানের কথাগুলো ভুলোনা। আর তোমায় আমি শেষ বারের মতো সাবধান ক'রে দিচ্ছি ঝামেলায় পড়ো না।”

কিন্তু দোকান ছাড়ার মুহূর্তের মধ্যেই রেজর ব্লেড ভাবতে শুরু করলো এই বড়ো কাজটা করা কতো সহজ। সে একাই করবে এবং বন্দুক পিস্তল ছাড়াই।

ওয়ান ফুট বলেছে ও নবিশ—ভাবা যায় না! শুধু দরকার নির্বিকার মুখ, ভাবলেশহীন মুখ। যেন তুমি এক সাধুসন্ত পুরুষ, যেন শিশুর মতো নিষ্পাপ তোমার আকৃতি। আর কেউ যদি তোমায় কিছু জিগেস করে অমনি কপালে চোখ তুলে আকাশে হাত ছুঁড়ে বলবে: “হা ঈশ্বর, কার কথা বলছো, আমি ?”

অনুবাদ: সিদ্ধার্থ [illegible]

রং-রুট

কিং ফিশ একরকম লড়াকু মাছ যার পাক খাওয়ার গতিতেই তোমার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। তোমার বাহু সমান লম্বা মাছটা বঁড়শি পর্যন্ত চ'লে যায় সড়সড়িয়ে, জলের মধ্যে ঘুর্ণি কষায় তার ছায়াটা। মাঝে-মাঝে এই মাছটা ওয়াহু মাছের মতো ধাক্কা মারে, মাথায় একটা ঠোক্কর আর ব্যস, বঁড়শিটা ঢুকে যায় মুখের ভেতর। জোর দেবার জন্য ঝুলিয়ে দেয় সে চোয়ালদুটো আর শিরদাঁড়ায় একটা ঝটকাতেই সে ছিঁড়ে ফেলতে পারে সুতোটা। যখন বঁড়শি থাকে তার মুখে, সে হয়ে ওঠে এক ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া, সমুদ্র যাকে ক'রে তুলেছে নরম, চিক্কণ, তার আর কোনো জুড়ি নেই, আর তাই তাকে পেয়ে হারাবার মতো দুঃখ আর কিছু নেই।

জ্যামেকার মেয়ে টিনা একটা ছিপ দিয়েছে কেনেডি নামে মার্কিনটিকে, কিন্তু অনেকক্ষণ ধ'রে কিছুই ঘটলো না। আর তারপর এলো একটা বড়ো মাছ, তার বঁড়শিতে ঠোক্কর খেলো আর চিংড়ির টোপটার মিষ্টি রস চাখতে-চাখতে সে সেটাকে টেনে নিয়ে গেলো বটে তিরিশ ফিট, কিন্তু সেটাকে নিয়ে আর কিছুই করলে না। মাঝে-মাঝে সে বেশ রসিক খাইয়ে হ'য়ে যায়।

কেনেডির চীৎকার শুনে টিনার নাবিক টাই ক্রুকস ছই-এর বাইরে এসে হাত দিয়ে ধ'রে দেখলো ছিপটা। অস্ফুটভাবে চেঁচিয়ে উঠলো টাই ক্রুকস, এ হেন সৌভাগ্য তার যেন বিশ্বাস হ'তেই চাইছে না।

'ব্যাপার কী টাই?' টিনা বললে। 'এ যে একেবারে দেবদূতদের ভোজ', সশব্দে ফিসফিস ক'রে বললে টাই ক্রুকস্।

ছোট্ট মাছধরা নৌকোটার জালের কাছে বসেছিলো মেয়েটি। মার্কিন ছোকরাটি যে ছিপে একটা মাছ গাঁথতে পেরেছে তাতে সে খুশি হ'লো। মার্কিনরা এখানে বেড়াতে আসে, তারা অচেনা। কেউ-কেউ ছ-মাসও থাকতে আসে, তবু তারা অচেনাই ফিরে যায়। এরা অনেকটা সে-রকম প্রতিবেশী, যার সম্বন্ধে কচিৎ কিছু জানা যায়; কিন্তু যার সঙ্গে এক নৌকোয়

ব'লে তুমি মাছ ধরেছো সে তো আর তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে পারবে না।

'অত তাড়া নেই, বিদেশী,' বললে টিনা।

'বড়ো বাড়ির ভোজ টেবিলেরই যোগ্য এ-মাছ। এ নিশ্চয়ই কোনো পুরুষমাছ না-হয়ে যায় না।' টাই ব্রুক্স আবারও সোৎসাহে চ্যাচালো।

টিনা ওর দিকে ফিরে খুব জোরে মাথা নাড়লো। ওর চোখে যে রূঢ় রসিকতায় ঝিলিক, তা টিনার চোখ এড়ায়নি। জ্যামেকার উত্তর উপকূলের জেলেরা তার চেনা। সে নিজেও তো তাদেরই একজন। এটা তো তারই নৌকো।

টাই ব্রুক্স সামনে বাড়ানো ছিপটাকে ছুঁয়ে দেখলো। সৌভাগ্যের এমন সূত্রটাকে আঁকড়ে ধরার ইচ্ছেয় তার আঙুলগুলো হাহাকার ক'রে উঠছে। কিন্তু কোনো ছিপ কেউ ব্যবহার করছে—তাকে কিছুতেই অন্য-কেউ নিতে পারে না : এটাই অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

কেনেডি মোটেই কোনো মৎস্য-শিকারী নয়। নৌকোটায় সে আছে কারণ সে এই গাঁয়ে এসেছিলো আর মেয়েটি তাকে তাদের সঙ্গে মাছ ধরতে যাবার নেমন্তন্ন জানিয়েছিলো। হঠাৎ এভাবে একেবারে পাদপ্রদীপের আলোর সামনে নিজেকে আবিষ্কার ক'রে তার যেন অস্বস্তি হচ্ছে, সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সে দুর্বলভাবে হাসলো।

'দয়া দেখাও ওকে,' টাই ব্রুক্স উত্তেজনার ঘোরে ফিসফিস করলো। 'সময় নাও, নরম ব্যবহার করো—ভেবে নাও, ও কোনো কুমারী মেয়ে। ওকে কোনো সাজা দিয়ো না। ও একটা বন্ধু মাছ। ওর মধ্যে আমার বাবার আত্মা আছে—আর আমার বাবা ছিলেন পুরুত। ভগবান মৃতের আত্মার সদ্গতি করুন।'

'থামো তো, ভাঁড় কোথাকার!' ঝাঝিয়ে উঠলো কেনেডি; হঠাৎ কখন টান-টান সুতো ঢিলে হয়ে যাবে, এই ভয়ে সে ঘেমে উঠেছে। নৌকোয় তার পায়ের কাছে কুণ্ডলি পাকানো সুতোর বাণ্ডিল ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে, আর সে কতটা সুতো গেছে তার মাপ নিতে চাচ্ছিলো। একটু দোনোমনা ক'রে সে কয়েক ইঞ্চি টেনে গোটালো।

'ওর হাতগুলো ঠিক গোরুর মতো। মাঝি, না কাঁচকলা।' টাই ব্রুক্স

টিনার দিকে তাকিয়ে কাৎরে উঠলো। 'এই আমেরিকান সাহেব একটা অপদার্থ।'

টিনা কঠোর স্বরে বললে, 'ওটা ওরই মাছ, টাই ব্রুক্‌স।'

'মাছটা সবার জন্যেই। সব বারের মতো এ-বারও সবাই লাভের বখরা পাবে। এটা জেলে ডিঙি—মণ্টেগো বে-র আমেরিকান হোটেলগুলোর ফুরফুরে খেলার নৌকো নয়,' টাই ব্রুক্‌স জানালো।

টাই ব্রুক্‌স কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলো না কেন ভগবান একেবারে সমুদ্দুরের তলা থেকে একটা কিং ফিশকে তাড়িয়ে এনে এই মার্কিনটার বঁড়শিতে গেঁথে দিয়েছেন, যখন কিনা তার বঁড়শিটায় কোনো মাছই ঠোকরাচ্ছে না। সে কেনেডির আরো কাছে চলে এলো।

মাছটা—তার তো আছে দশ কিলো ওজনের গভীর জলের সপ্রতিভ হাড়, পেশী আর মুখরোচক ভরা শরীর। তার পাখনায় যে বঁড়শি গেঁথে গেছে তা টের পেলো, আর তক্ষুনি ডান দিকে পাক খেলো, তারপরেই বাঁ দিকে, আর এমনি চললো সারাক্ষণ, যতক্ষণ-না বঁড়শিটা তার এইসব মোচড়ে তার গা থেকে খুলে গেলো। কেনেডির হাতের মধ্যে ছিপের সুতো প'ড়ে রইলো নিষ্প্রাণ, আর ছোট, একটা শপথ উচ্চারণ ক'রে কেনেডি তার হতাশা ঢাকলো। রেগে, সে সুতো গোটাতে শুরু ক'রে দিলে, কিন্তু টাই ব্রুক্‌স যন্ত্রণায় কাৎরে উঠলো:

'না! না! মাছটা সাঁৎরে আবার আমাদের কাছেই আসছে। ও আমাদেরই মাছ, ও চায় না যে তুমি ওকে ধরতে না-পারো। খুব মধুর ভাবে সুতো গোটাও আলগোছে, সাবধানে—যেন ও কোনো কিশোরী মেয়ে।'

কেনেডি হালের কাছে ঠকঠক শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখতে পেলে টিনা সেই ভারি কাঠের টুকরোটাকে টেনে নামাচ্ছে; তার ভিজে বাহু রোদে চকচক করছে। হালকা দাঁড়টাকে হাতে তুলে নিলো টিনা, গলুইয়ের ওপর দিয়ে জলে নামিয়ে নিলো। দাঁড়ের ফলকে ফিশফিশ ক'রে কী যেন বললে জল, যখন সে নৌকোটার মুখ ঘুরিয়ে মাছের চলার পথের দিকে চালিয়ে দিলো। টিনা নৌকোর মধ্যে স্কার্টটা না পরলেই ভালো করতো, মনে-মনে ভাবলো কেনেডি।

'ওহে,' টিনার গলার স্বর ধারালো, 'মাছটার দিকে মন দাও। ও কি, টোপটা গিলে ফেলেছে?'

মেয়েটির সুডৌল বাহু আর চিক্কণ কালো মুখে সমুদ্রের আভা মাখানো।

'তা, আমি কী ক'রে জানবো,' কেনেডি একটু চটেই গেলো।

'ও সুতো ধ'রে টান দিয়ে তোমায় ব'লে যাবে,' নৌকোর কিনারে কনুই ঠেকিয়ে, দু-হাতে মুখ রেখে, কষ্টের সুরে বললে টাই ব্রুক্স।

'মাছটাই সুতো ধ'রে টান দেবে। চিংড়ির ল্যাজটা তার গলার পক্ষে বেশি লম্বা ঠেকলে সে খাপ্পা হয়ে যাবে,' বললে টিনা।

'আহা, কী চমৎকার তার গলা,' বললে টাই ব্রুক্স। সে তার নিজের বঁড়শির কথা ভুলে গিয়েছে, এখন সে কেনেডির ছিপের কথা ভেবেই দারুণ চিন্তিত। 'আমি ওর গলাটা দেখতে পাচ্ছি—ঐ যে জলের তলায়। শুধু ঐ গলাটারই ওজন হবে দু-কিলোর বেশি। ও হচ্ছে সমুদ্দুরের সেরা মাছ—আর আমেরিকানটা ওকে বঁড়শিতে গেঁথেছিলোও।'

কেনেডি চেঁচিয়ে উঠলো, 'তুমি কি চুপ করবে?'

'কাজেই এখন ও সমুদ্রের সেরা মাছটাকে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে ছাড়বে। বোধ হয় আমেরিকানটির কাছ থেকে মাছটাকে আমারই নিয়ে নেয়া উচিত,' বললে টাই ব্রুক্স।

'ওর ছিপটায় তুমি হাত দেবে না' বললে টিনা, 'এ নৌকা চলে আমারই হুকুমে, মনে রেখো।'

'নৌকো চলে বঁড়শিতে গাঁথা মাছের হুকুমে,' জানালো টাই ব্রুক্স।

'একটা মাছ আর কী এমন? ওকে আমরা ছেড়েও দিতে পারি,'বললে টিনা।

'তাহ'লে আর কী, মুখটা থেকে বঁড়শিটা খুলে দাও,' ঘ্যানঘ্যান করলো টাই ব্রুক্স।

টিনা আপন মনেই বললে, 'মোদ্দা কারণটা কি, না আমেরিকানটি চেয়েছিলো সময় হবার আগেই মাছটার সঙ্গে লড়াই বাঁধাতে। টোপ গেলবার পর যে মাছটার পেট কামড়াবে, ততটুকুও তার তর সয়নি। সুতো যদি আমার হাতে থাকতো, তবে আমি মাছটাকে এমনভাবে খেলাতুম যে শেষটায় ও ল্যাজে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে মিনতি করতো ক্ষান্ত দিতে, অনুনয় করতো ওকে নৌকোয় টেনে তুলতে। আর সুতো কি না এমন শক্ত ছিলো। আমিতো ওর সঙ্গে এমন খেলতুম যে ও একেবারে জেরবার হ'য়ে যেতো, আমার পায়ের আঙুলে অব্দি যতটুকু লড়ায়ের শক্তি আছে, তাও ওর আর থাকতো না।'

কাঠের তৈরি নিচু ডিঙিটা তরতর করে ভেসে যাচ্ছে সমুদ্রে। সুতো লাফিয়ে উঠলো, কেনেডির হাত থেকে সরসর করে বেরিয়ে এলো।

'টোপ গিলেছে,' বললে টিনা। সুতোয় টান দিতেই ওদিককার লড়াকু ওজনটা মালুম হ'লো কেনেডির। 'একারে পৃথিবীতে শুধু দুজন লোক—তুমি আর ঐ মাছটা। কিন্তু তোমাদের একজন খচ্চর হ'য়ে যাবে। আর খচ্চরটা মরবে,' বললে টাই ব্রুক্স।

'কী ভ্যাজর-ভ্যাজর করছো?' বললে কেনেডি। তার আঙুলে যে কাঁপুনি ধরেছে, সেটা কারু চোখে পড়বে না ব'লে সে আশা করছিলো। মাছ ধরাকে লোকে কিনা খেলা বলে, মজার ব্যাপার ভাবে—অথচ এটাতো মোটেই তা নয়, এ একেবারে বুকভাঙা কাণ্ড। না, ওকে ঠাণ্ডা মাথায় লড়তে হবে। আড়চোখে তাকিয়ে সে মণ্টেগো বে-র হোটেলগুলোর লাল আর গোলাপি রং দেখতে পেলে।

'তীরের এতো কাছে এ যে একটা বড়োমাছের কামড়, তাই না?' মাথাটা পুরো ঘুরিয়ে সে বললে টিনাকে।

টিনা সাবধান করে দিলে, 'মাছের ওপর থেকে চোখ সরিয়ো না।'

'উনি এক মহা তালেবর ব্যক্তি। উনি না-তাকিয়েই মাছ ধরতে পারেন, হাতে লাগাম না-ধ'রে ঘোড়া ছোটাবার মতো আর কী,' অমনি ফোড়ন কাটলো টাই ব্রুক্স।

কেনেডি তার দিকে ফিরে বললে, 'তা চাঁদু, খচ্চর সম্বন্ধে তখন কী ফ্যাচফ্যাচ করছিলে?'

'মাছ যদি খচ্চরের মতো হয়ে পড়ে, বঁড়শির সঙ্গে লড়তে চায়, তাহ'লে কাবু হ'য়ে গিয়ে কাবার হবে। আর তুমি যদি খচ্চর ব'নে যাও, তো জোরে সুতো ধরে টান দেবে—আর সুতো ছিঁড়ে যাবে, আর মাছটাকে তুমি খোয়াবে।'

'তো তাতে আমার ম'রে যাবার কী হ'লো? তুমি তো বললে যে খচ্চর মরবেই।'

'যখন মাছটা টের পাবে যে সুতো ছিঁড়ছে, অমনি সটান ফিরে এসে তোমায় গিলে খাবে,' বুঝিয়ে দিলো টাই ব্রুক্স।

কেনেডি সহজভাবে খুকখুক ক'রে হেসে উঠে তার ছিপের দিকে ফিরলো। সমুদ্রে জলজলে হলদে আর নীলের ঝিলিক। সে আশা করছিলো মাছটা ঝোঁকের বশে এমন-কিছু ক'রে বসবে না যাতে তাকে সত্যিকার মৎস্য শিকারীর মতো কেরামতি দেখাতে হয়। এতক্ষণ অবধি ব্যাপারটা প্রায় ঘুড়ি ওড়াবার

মতোই লাগছে। অবশ্য ভেতরে-ভেতরে তার ঘেমে ওঠাটা বাদ দিলো।

'একদা আমি এক মৎস্য হারাইয়াছিলাম এবং উহা আমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছিল,' জলের দিকে তাকিয়ে টাই ক্রুক্স বললে। 'সেই রজনীতে আমি ছিলাম হালধারী আর সে ছিল ভরোয়াল মাছ। গলুইয়ের উপর তরোয়াল মাছ তাহার সুবৃহৎ তরবারিটা উঁচাইয়া বলিয়াছিল:

"নৌকা থামাও!"

'আমি বলিয়াছিলাম, "কেন থামাইব, তরোয়াল মাছবাবু?"

'সে কহিয়াছিল, "নৌকা থামাইতেই হইবে, কেমনা যে-ব্যক্তি আমাকে হারাইয়াছিল, আমি তাহারই খোঁজে ফিরিয়া আসিয়াছি।"

'তখন আমি বলিলাম, "তরোয়াল মাছবাবু, আপনি জানেন ইহা কাহার নৌকা?"

'অমনি সে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, কহিল, "নৌকা কাহার, তাহাতে আমার কী আসিয়া যায়? আমি যখন বঁড়শিবিদ্ধ, তখন নৌকা চলে আমারই আদেশে। উপরন্তু আমি সমুদ্রতলে হলফ করিয়া কহিয়াছিলাম যে যদি আমি বঁড়শিটাকে কোনোক্রমে ছাড়াইতে পারি, তবে আমি যে-ব্যক্তি আমাকে ধরিতে পারে নাই তাহার উদ্দেশে ফিরিয়া আসিয়া নৌকার দখলদারি লইব।"

'তা, তখন আমি কহিলাম, "এই নৌকা এক মার্কিনের—সে এখানে বেড়াইতে আসিয়াছে।"

'শুনিয়া তরোয়াল মাছ লম্ফ দিয়া উঠিল, কহিল, "অ্যা?" আর পরক্ষণেই এমন ক্ষিপ্রগতিতে পিঠটান দিল, যেন শত-শত বাঘা হাঙর তাহাকে তাড়া করিয়াছে—কারণ তরোয়াল মাছ হাঙরকে বিষম ভয় করে। তবে ইহা কি জানেন সে ভ্রমণকারীদের ভয় পায় কেন?'

'না, জানি না,' বললে কেনেডি, 'কেন?'

'কারণ ভ্রমণকারী তাহাকে আবার বঁড়শিতে গাঁথিবে এবং আবার তাহাকে খোয়াইবে—হয়তো অনেকবার। আর প্রতিবারই বিদ্ধ হইবার পর বঁড়শি তাহাকে যাহা করে, তাহা সে কায়মনোবাক্যে অপছন্দ করে,' বললে টাই ক্রুক্স।

'ঠিক আছে, এবার ক্ষমা দাও,' বললে কেনেডি। টিনার দিকে তাকিয়ে সে চোখ টিপলো।

এই লোকটার মধ্যে আবার ষাঁড়ের রাগ আছে, আপন মনে বললে টিনা। কিন্তু লোকে আবার তিড়িংবিড়িং লাফায়ও। এদিকে তো মোটেই মাছশিকারী নয়, কিন্তু আশা ক'রে আছে যে এই অভিযানটাকে এক দোল-কেদারা বানিয়ে নিয়ে সে আমাদের বোকা বোঝাবে যে আসলে সে এক মহা ওস্তাদ।

মাছটা জলের ঝাপটা ছিটিয়ে লাফ দিলে, আর অমনি টাই ব্রুক্স শপথ ক'রে বললে যে মাছটাকে সে চিনতে পেরেছে। এটা তার চেনা এক বুড়ো কিংফিশ, দারুণ লড়াকু, এমন কি জলের ওপরেই লড়াই করতে ভালোবাসে।

'তুমি যদি ওর মাথা ধ'রে টান দাও, তো মাছটাকে বঁড়শিতে রেখেই ও চ'লে যাবে। ও দারুণ তাজা মাছ,' টাই ব্রুক্স সাবধান ক'রে দিলে।

'আহা! ওকেই মাছটা ধরতে দাও না,' বললে টিনা।

সুতোটা না-ধরলে কী হবে, কেনেডির সঙ্গে সঙ্গে টাই ব্রুক্সও মাছটাকে হয়রান করে তুলছিলো। হাত দিয়ে নানারকম ইশারা করছিলো সে কী করতে হবে, মাছটা ঝাঁপ খেলেই কুঁজো হ'য়ে ব'সে পড়ছিলো নৌকার খোলে, আর মাছটা যখন হাওয়ায় দাপাচ্ছে সে তার মাথাটা এতটাই বাড়িয়ে দিচ্ছিলো যে তার গলাটাই বুঝি ছিঁড়ে যায়। মাছটা যখন জলের ওপর দাপাদাপি করছে, টাই ব্রুক্স তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিলো মার্কিনটির দ্বিধায় ভরা কব্জি, আর দেখে খুকখুক করে হাসছিলো। এই বিদেশী মোটেই কোনো মাছ শিকারী নয়।

কেনেডিকে সে জিগেস করলো, 'মাছ কেন অমন করে, তা জানো?'

'তুমি ওকে তাকিয়ে দেখছো টের পেয়ে ও ওর নানারকম কারদানি দেখায়,' কেনেডি গম্ভীরমুখে রসিকতা করলো।

'ও ভাবে যে, যদি ও হাওয়া বেয়ে নিজেকে ওভাবে সাজা দেয়, তাহ'লেই ওর পেটের ঐ অদ্ভুত অসুখটা সেরে যাবে। আমরা জেলেরা বলি—ও ওষুধ খাচ্ছে,' টাই ব্রুক্স বুঝিয়ে বললে।

'লোকটা তো ভালোই লড়ছে মাছটার সঙ্গে,' টিনা বললে।

'আঃ, আমাকে অনুমতি দাও না, আমেরিকানটকে একটু সাহায্য করি,' টাই ব্রুক্স বেদম বিতৃষ্ণায় ব'লে উঠলো। এই সব সাদা পেটের বিদেশীগুলো থেকে এইতো খানিকটা মজা নিঙড়ে নেবার সুযোগ। এই বিদেশীগুলো

মতো ভাবে রোদের মধ্যে শুয়ে থাকে—বেলাভূমিকে বানিয়ে তোলে কসাই-খানা, মাংসের আড়ত। মাছটা কখন হয়রান হ'য়ে গেছে, টিনা বুঝতে পারলে, কারণ মাছ এখন আর ততটা লাফাচ্ছে না হাওয়ায়। টাই ব্রুক্‌সের চাঞ্চল্য অনুভব করতে পারলে কেনেডি; জেলেটির হাতের কোঁচটা তার নজরে পড়লো এক ঝলক। টাই ব্রুক্‌সের দিকে তাকিয়ে সে গরগর করলে—যা করতে হবে, তা সে একাই করবে, সে অন্য কারও কোনো সাহায্য চায় না।

লড়াইক্ষ্যাপা মাছটা তার যুদ্ধের পরিধি কমিয়ে এনেছে। কেমন শ্লথ ভাবে সে লড়ছে এখন: তাকে খতম করবার জন্য যে বঁড়শিটা ব্যবহার করা হচ্ছে, তারই ওপর ভর দিয়ে সে মাঝে-মাঝে জিরিয়ে নিচ্ছে। সমুদ্রের আস্তরের তলায় কোন্ নাটকের অভিনয় হচ্ছে, টিনা তার সব খুঁটিনাটিই জানে। মাছটার জন্যে তার মনে কোনো দুঃখ নেই। আসলে এই শিকারীই যেন বঁড়শিতে গেঁথে গিলেছে। তার চোখে জয়ের গর্ব। একটা ছোট্ট ঢেউ হঠাৎ টিনার চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে গেলো। টিনা বৈঠা চালিয়ে নৌকোটা ঘুরিয়ে আনলো; মাছটাকে টেনে তোলবার জন্যে কেনেডিকে একটা কাঠের টুকরো দিলে সে। মস্ত মাথাটা উঁচিয়ে আছে জল থেকে, অবাধ্য এক টাট্টুর মতো ছুটছে বঁড়শির সঙ্গে। প্রবল শিরদাঁড়াটা বেঁকে গেলো আর সেটা আছড়ে পড়লো জলে। কেনেডির হাত হুড়মুড় ক'রে সুতো গোটাতে শুরু করে দিলো। তার কব্জির ব্যথা এখন কেমন মধুর ঠেকছে।

'না,' টিনা বললে আস্তে।

'না', হাঁক পাড়লে টাই ব্রুক্‌স।

কেনেডির হাত কিন্তু সানন্দ তাড়ায় সাগ্রহে গুটিয়ে আনছে সুতো। সুতোর রান সে আঁকড়ে ধরলো, তার ঠোঁটদুটি খোলা, মাথার মধ্যে খুশির তীব্র সুর। টাই ব্রুক্‌স তার হাত থেকে সুতো ছিনিয়ে আনতে চাইলে, আর কেনেডি কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিলে তাকে, তড়াক করে সরেও গেলো।

সুতো ছিঁড়ে গেলো।

বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো টাই ব্রুক্‌স ছেড়ে গেলো নৌকো, তার হাত দুটো অন্ধের মতো হাৎড়ালো জল, যখন সে জল ছুঁলো। ঢেউ সুতোটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলে, আর টাই ব্রুক্‌স সুতোটা ধরতে পারলো না।

টাই ব্রুক্‌স আবার উঠে এলো নৌকোয়, মাথা গুঁজে ব'সে রইলো।

আবার জলের ঝাপটা লাগলো টিনার মুখে-চোখে ; সে বাঁশের খুঁটির ওপর গুটিয়ে রাখা পাল ক'টাকে টান-টান ক'রে মেলে দিলে। তীরে ফিরে যাবার জন্যে টিনা এবার ছোট্ট কোনো হাওয়াকে ধরবে।

'যে মাছটা হাতছাড়া হ'য়ে গেলো, আমি তার দাম দেবো,' বললে কেনেডি।

টাই ব্রুক্‌স এগিয়ে গিয়ে পালটা তুলে ধরলো। বাঁশের মাস্তুলটা ধ'রে সে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ, তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো মরা মাছটা ভেসে চ'লে গেলো দূরে। টিনাও দেখলো একবার, তারপরেই চোখ ফিরিয়ে নিলে। কেনেডি সেটা দেখতে পেল।

'যে-মাছটা হাতছাড়া হ'য়ে গেলো, আমি তার দাম দেবো,' আবার বললে কেনেডি।

পালে হাওয়া লাগলো, নৌকো হুড়মুড় ন'ড়ে উঠলো। মরা মাছটার পাশ দিয়ে চ'লে গেলো তারা, তারপরেই সমুদ্র ফাঁকা হয়ে গেলো।

'ওটা তো আমারই মাছ। আমারই তো ক্ষতি,' রেগে চেঁচিয়ে উঠলো কেনেডি।

'ক্ষতি হলো এই নৌকোর', টিনা বললে।

'আগে তো তোমরা সে-কথা বলোনি,' বললে কেনেডি।

যখন বঁড়শিতে গেঁথেছিলে, তখন মাছটা তোমার ছিলো। আমাদের দু-পয়সা লাভ হোক, এটা তখন তোমার ক্ষমতার মধ্যে ছিলো। এখন যখন তুমি ওটাকে খোয়ালে, এটা নৌকোরই ক্ষতি,' তরুণীটি বললে।

তারা ভেসে চললো। একটু পরেই তারা শুনতে পেলো মণ্টেগো বে-র বেলাভূমির হোটেলগুলোয় মার্কিন ভ্রমণকারীদের হাসির রোল।

'আমি জেলে নই,' বললে কেনেডি।

'আগে তুমি নিছক ভ্রমণকারী ছিলে, কিন্তু যেই একবার হাতে ছিপ ধরেছো, তুমি হয়ে উঠেছো জেলে,' বললে টিনা, 'এটা মাছধরার নৌকো।'

কেনেডি মেয়েটির দিকে তাকালে ; তার নবোদ্ভিন্ন সৌন্দর্যের প্রায় সবটাই তার চোখে পড়ছিলো। মেয়েটি নৌকোর মধ্যে স্কার্ট না-পরলেই ভালো করতো।

'কাল আমি আবার তোমার নৌকো ভাড়া নেবো। আমি মাছধরা শিখতে চাই।'

টিনা ভাবলে সে তাকে নৌকোটা ভাড়া দেবে—এমনি রাগ ক'রে তো কোনো লাভ নেই। লোককে তো শিখতে হয় মাছ ধরা, যেমন ক'রে লোকে

শেখে কাঠচেরাই, বা জুতো বানানো, বা ইঞ্জিন সারানো, যা-কিছু। কিন্তু একটা ব্যাপারে টিনা খুশি ; কেন তারা মরা মাছটিকে জল থেকে তুলে নেয়নি, এ-কথা সে জিগেস করেনি। অন্তত এটা সে জানে যে নৌকোর মধ্যে জ্যান্ত আসতে দিতে হয় মাছকে। ও মাছ ধরতে শিখে ফেলবে একদিন।

অনুবাদ : স্বাতী ভট্টাচার্য ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এডগার মিট্‌লহোলজার

তাকামা

তাকামা যেন কেমন অগোছালো আর দলছুট।

ফেব্রুয়ারির সেই দিনটিতে 'কোরিয়াল'টা যখন তীরে এসে ঠেকলো, আমি নেমে দাঁড়িয়ে চার্লসকে বললাম যে আমি একটু ভেতরে ঢুকে জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখতে চাই।'

বললাম, 'এ-ই জায়গাটা আমার বেশ মনে ধরেছে।'

সে আমায় হাত নেড়ে বিদায় জানালে।

'আমার সঙ্গে আসছো না তাহ'লে?'

'না, ধন্যবাদ। আমি বরং এখানেই শুয়ে একটু আলসেমি করবো। ছুটি তো বিশ্রামের জন্যই—এই কাঠফাটা রোদে ঘুরে-ঘুরে সান-স্ট্রোক্‌ বাধাবার জন্য নয়।'

আমি তাকে বললাম, 'আমি পাঁচ মিনিটও নেবো না।'

মাছির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে মাথাটা একটা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে জলের ধারে একটা জংলি কোকো গাছের তলায় টান হ'য়ে শুয়ে পড়লো চার্লস্‌।

'পিটার, রাস্তাটা খেয়াল রেখো।' তোয়ালেটা একটু তুলে আমায় জেগে সে সাবধান ক'রে দিলে।

বালির মধ্য দিয়ে থপথপ ক'রে হাঁটতে শুরু করে আমি তাকে আশ্বাস দিলাম, 'দিক সম্পর্কে আমার ধারণা চমৎকার', যদি ভেবে থাকো যে আমি পথ হারিয়ে ফেলবো, তবে বলি আমার সে-ভয় নেই।'

'কোরাল'-এর পাশ দিয়ে যে-রাস্তাটা উঠে গেছে সেটা বেশ স্পষ্ট। নেহাৎ কৌতূহল বশেই আমি সেটা ধ'রে এগিয়ে চললাম; কিছুদূর যাবার পর আমি দেখতে পেলাম যে পশ্চিমে ও দক্ষিণে দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরের মধ্যে রাস্তাট সাপের মতো এঁকেবেঁকে মিলিয়ে গেছে। ওই রাস্তাটা ধ'রে আমার আর যাবার ইচ্ছে ছিলো না। বরং আমায় টানছিলো জঙ্গলটা। আমি জঙ্গল ভালোবাসি।

বালির ওপর সবখানেই জীবজন্তু আর মানুষের পায়ের ছাপ ; কয়েক সপ্তাহ কোনো বৃষ্টি না-হওয়ায় ওগুলো ধুয়ে যায়নি।

রাস্তার বাঁ ধারে একটা তেড়াবেঁকা গাছ আমার নজর কাড়লো। একেবারে আগায় ছাড়া গাছটার আর কোথাও কোনো পাতা নেই, যেন ধীরে ধীরে খরায় শুকিয়ে যাচ্ছে। কচি ঘোরা গ্লাছের মতো দেখতে। যেন মৃত্যুতৃষ্ণায় আমার দিকে তাকিয়ে একটা ধূসর হাসি হাসছে ; গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে আমার মনে হ'লো যে বালির মধ্য থেকে যে-তাপ উঠে আসছে তাতে ক্রমেই সেটা নেতিয়ে যাচ্ছে।

আমি দাঁড়িয়ে প'ড়ে মিনিট খানেকের জন্য তাপটা পরীক্ষা করলাম। তরল রেশমের মতো তাপটা আমার চারদিকে পাক দিয়ে-দিয়ে উঠছে।

গাছটা আবার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তেড়াবেঁকা একটা গাছ, আগেই বলেছি। একটা গাছ—যেটা মৃত্যুর ফাঁদে প'ড়ে গেছে আমি ভাবলাম।

ভাবনাটা আমার মনকে কেমন দমিয়ে দিলো। এই মুহূর্তে আমার মাথার মধ্যে যেন সময় থমকে গেছে…কেন মরণফাঁদে জড়ালো ? কি সে ? ঢেউয়ের ? …গাছের মাথায় হাওয়া ঢেউয়ের আছড়ানির মতোই শব্দ করে…কান পাতলেই শুনতে পাবে যে ঢেউ এগিয়ে আসছে—তুমি হয়তো বৃষ্টি ব'লে ভুল করবে…কিন্তু আসলে এ শুধু হাওয়া…।

নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে ঘোরটা থেকে জেগে উঠলাম আমি, এগিয়ে গেলাম গাছটার দিকে। আমার খালি মাথার ওপর কড়া রোদ। কোনো পেতলে তৈরি প্রেত যেন অলুক্ষুণে ভাবে জোর ক'রে আমার চুল ছেঁটে দিচ্ছে।

পিঁপড়েগুলো গাছটার সরু, শুকনো গুঁড়িটা বেয়ে-বেয়ে উঠছে, বড়ো-বড়ো কালো পিঁপড়েদের এক লম্বা বাহিনী। তাদেরই একটি থেমে জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকে তাকালো—সাবধানী, সজাগ। যেন সংকেত দিচ্ছে। যেন একরত্তি কেউ সংকেত পাঠাচ্ছে। মুহূর্তের জন্য অন্য পিঁপড়েগুলো এটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেলো। হঠাৎ এ-পিঁপড়েটাও চলতে শুরু করলো ; ওর নিশ্চয়ই মনে হয়েছে যে মনুষ্যজাতির নিছক একটা দৃষ্টান্ত যতটা মনোযোগ দাবি করে তার চেয়ে ও আমার অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে ফেলেছে।

পিঁপড়েগুলোকে তাকিয়ে দেখলাম কিছুক্ষণ। শ'য়ে-শ'য়ে হাজারে-হাজারে কালো বুনো পিঁপড়ে। সমুদ্রের উপকূলে এইরকম পিঁপড়ে নেই।

পিঁপড়েদের নিয়ে ভাবছিলাম আমি। ওরা নাকি বুদ্ধিমান প্রাণী। বিজ্ঞান এও ইঙ্গিত দিয়েছে যে ওরা নাকি নিজেদের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ভাষায় কথা বলে। যে এই কালো পিঁপড়েগুলো পাতার টুকরোয় লেখা তাদের জাতির ইতিহাস যে সেটা মাটির তলায় জমিয়ে রাখেনি তা কে বলতে পারে? যার খোঁজ কেবলমাত্র তারাই জানে। হ'তে কি পারে না যে এদের পূর্বপুরুষেরা ১৭৬৩-র কোনো দুর্ভাগা ওলন্দাজ আবাদকারীকে দেখে ব্যঙ্গের হাসি হেসেছিলো। যাকে ক্রীতদাসদের একটি দল অনুসরণ করে শেষে কুপিয়ে মারে। এই সাদা বালির তলায় হারিয়ে-যাওয়া মাটির নীচের ছোটো ছোটো ভাঁড়ারে হয়তো এরা ধ'রে রেখেছিলো গরীয়ান দাসবিদ্রোহের সেইসব দলিল যা রডওয়ের ব্রিটিশ গিয়ানার ইতিহাস বইয়ের চেয়েও ঢের দামী। পিঁপড়েদের কথা কিছু বলা যায় না।

এই অদ্ভুত খেয়ালের বশেই শেষটায় আমি আবিষ্কার ক'রে ফেললাম কোত্থেকে তারা আসছে।

দেখলাম যে, তারা বালি থেকে গাছের গুঁড়িটায় উঠছে। পিঁপড়ের সারি না ভেঙে দিয়ে আমি পাশটায় সরে এসে দেখলাম যে সারিটা গেছে একটা সুইজ্‌ল্‌-স্টিক্‌ গাছের ঝাড় অব্দি। আমি পাতাঝাড়টার মধ্যে ঢুকে পড়লাম। খুব একটা ঘন বা নিবিড় নয় ঝাড়টা, চলাফেরার পক্ষে যথেষ্ট জায়গা আছে। এখন আমি সত্যি-সত্যি জঙ্গলটার মাঝখানে—কিন্তু কোনো লিয়ানার লতা আমার পথে বিছানো নেই, হলিউড দৃশ্যটা যেমনভাবে দেখাতো। তার দাঁতালো চোয়াল হাঁ ক'রে জলার মধ্য থেকে কোনো কুমির লাফিয়ে বেরোয়নি কিংবা কোনো অলুক্ষুনে চিত্রল সাপও কুণ্ডলী খুলে ছোবল মারতে উদ্যত হয়নি। সত্যি বলতে, স্তব্ধতাটাই ছিলো একমাত্র ভয় জাগানো উপস্থিতি। সে যেন জ্যান্ত। সে যেন পাক খাচ্ছে, হাতড়ে ছুঁয়ে দেখছে আমাকে, যেন ইচ্ছে ক'রে আমার সব বোধের মধ্যে নানারকম ইঙ্গিত করে যাচ্ছে। রোদের সঙ্গে খাতির জমিয়েছে সে, আমি না-চাওয়া সত্ত্বেও তার আদরে-আদরে আমার দম আটকে দিচ্ছে। আমার ওপর নজর রাখছে সে, আর গোপনে-গোপনে আপন মনে হাসছে।

সেই তেড়াবেঁকা গাছটা এখনও দেখা যাচ্ছে কিনা নিশ্চিতভাবে জানবার জন্যে আমি ফিরে তাকালাম—ঠিক করলাম সবসময়েই গাছটাকে চোখে চোখে রাখতে হবে—কোনো চিহ্ন হিসেবে—বলা যায় না, দৈবাৎ যদি কখনও গুলিয়ে যায় আমি কোথায় আছি।

কালো পিঁপড়েদের সারির পেছনে-পেছনে ঝাড়টার আরো ভেতরে ঢুকে পড়লাম আমি। শুকনো পাতার ওপর আমার পা প'ড়ে গেলো হঠাৎ, আর আওয়াজটা হ'লো যেন কোনো কাঁচ ভেঙে গেলো, আর স্তব্ধতাটা যেন এই অপকর্মের জন্য দাঁত খিঁচিয়ে উঠলো। কেমন একটা দোষী-দোষী ভাব জেগে উঠলো আমার মধ্যে। প্রায় ক্ষমাই চেয়ে নিলাম। ভবিষ্যতে আর কখনও শুকনো পাতা মাড়িয়ে যাবো না ব'লে দিব্যি গাললাম আমি।

আমি এগিয়ে চললাম।

এখনও গাছপালাগুলো নীচু, আর ছাড়াছাড়াভাবে দাঁড়ানো; আমার মাথা বাঁচাতে মোটেই সাহায্য করলো না তারা। পিঁপড়েরা আমাকে বুনো পাইনের একটা দঙ্গলের কাছে নিয়ে এলো। সারটা তারপর বাঁক ঘুরে আরো-একটা স্থইজল-স্টিক্ গাছের ঝাড়ের দিকে এগিয়ে গেছে, কিন্তু এখানে এসে আমি ঠিক করলাম এ খেলার কোনো মানেই নেই, শুধু তা ছেলেমানুষিতে ভরা। রোদ দারুণ চড়া, এই ফাঁদ থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে চার্লসের কাছে চলে যাওয়া উচিত আমার। মাথাটা কেমন ঘুরছে টের পেলাম—নাঃ, এটা মোটেই ভালো কথা নয়। মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম মাথাটা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

ফিরে যাবার আগেই কিন্তু বুনোপাইনের দঙ্গলটার মধ্যে কী একটা শাদা জিনিসে আমার চোখ পড়লো। বুনো পাইন তার দীর্ঘ, ছুঁচলো পাতাগুলো বাড়িয়ে দেয় আকাশে—শক্ত ধারালো সব পাতা। কোনো বুনো পাইনের ঝাড়ে ধাক্কা খেলে বা থুবড়ে পড়লে বিষম জখম হ'তে পারে—বিশ্রীভাবে কেটে যেতে পারে, ছ'ড়ে যেতে পারে। কীভাবে আমি ঝুঁকে তাকিয়ে দেখি দঙ্গলটার মাঝখানে, অতএব, আমাকে সাবধান হ'তে হবে এবার।

দঙ্গলটার মাঝখানটায় যে ফাঁকা গর্ত, কচি পাতাগুলোকে জড়িয়ে সেখানে ধবধবে শাদা একটা মাকড়সার জাল নিচে নেমে গেছে। জালটার একটা ছ্যাদা আছে—ভুতুড়ে-কালো আর রহস্যময়। কিন্তু এই ছ্যাদার মধ্যে কোনো ভূত নেই। বরং তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আছে দুটি রোমশ নীলচে কালো পা—তাদের ডগাগুলো লাল।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি—কেমন বিস্মিত আর অভিভূত।

সব মাকড়সাই আমার শত্রু—আর এখানে কিনা একটা জংলি মাকড়সা। একটা বিশাল রোমশ নীলচে-কালো মাকড়সা।

আমার পিঠ বেয়ে একটা শিহরণ নিচে নেমে গেলো—এমন একটা শিহরণ, আমার মগজ যাকে তর্জমা ক'রে দিলো যেন আমার চামড়ায় এলোমেলো দৌড়ে বেড়াচ্ছে নীলচে-কালো রোমশ পা। আমি নীচু গলায় হেসে উঠলাম—কেমন একটা বিকৃত হাসি।

আর একটা নতুন পরিস্থিতি আমার সামনে। এ-সম্বন্ধে আমার কিছু-একটা করা উচিত।

আমি নুয়ে একটা ভাঙা ডাল তুলে নিলাম। মৃদু হাসছি আর কাঁপছি। কিন্তু তবু হাত বাড়িয়ে ইচ্ছে করে জালটার মধ্যে ডালটা ফেলে দিলাম আমি।

ডালটা হালকা, জালের মধ্যে প'ড়ে সেটা আটকে রইলো, আর ঝুলতে লাগলো।

চারটে নীলচে-কালো রোমশ পা বীভৎসভাবে ছ্যাদাটার মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো, আর দুটো অপেক্ষমান দাঁত, নিষ্ঠুর আর বর্বরভাবে আশায় ভরা।

বাঃ, চমৎকার—ভয় জাগানো, কিন্তু চমৎকার।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, আমাদের মধ্যে সব্বাই একটু না একটু কষ্ট পেতে ভালোবাসে। তা, আমার কষ্ট পাওয়ার ভঙ্গিটা এইরকম চেহারা নিলো। কতক্ষণ যে ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম খেয়াল ছিলো না—শুধু ছোটো-ছোটো ডাল ছুঁড়ে ফেলছি আর মাকড়সাটাকে তাতিয়ে দিচ্ছি। আর সেইসঙ্গে ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ আমার খেয়াল হ'লো যে সেই তেড়াবেঁকা গাছটা চোখে পড়ে কিনা তাকিয়ে দেখা উচিত।

কী যেন মড়মড় ক'রে উঠলো আমার পেছনে।

চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম।

একটাও ডাল নড়ছে না। একটা পাতাও না। কাজেই শেষটায় ধ'রে নিতে হ'লো যে স্তব্ধতাই বুঝি আমাকে নিয়ে খিকখিক ক'রে হাসছে।

বারে-বারে ফিরে তাকালাম আমি, একবার তাকে অসাবধানে পাকড়ে ফেলার জন্য। কিন্তু দারুণ চালাক সে।

একটা নীল গিরগিটি তীরের মতো ছুটে গেলো বালির ওপর—একটা ডাল থেকে আরেকটা ডালে।

দূর থেকে ভেসে এলো ঢেউয়ের শব্দ—আস্তে জেগে উঠেই আওয়াজটা মরে গেলো।

পিঁপড়েদের সারিটা খুঁজে বার করা উচিত আমি ভাবলাম। সারিটার পেছন-পেছন গেলে সহজেই ঐ অষ্টাবক্র গাছটার কাছে পৌঁছোনো যাবে।

তাকালাম—কিন্তু কোথায় ঐ পিঁপড়েরা ঘুরে-ঘুরে দেখলাম, বারবার, আর হেসে ফেললাম। চেয়েছিলাম তেমনি খুক ক'রে হাসতে, যেমন স্তব্ধতা হেসেছিলো, কিন্তু আমার ঐ হাসি শোনাতো বাজ পড়ার মতো—আর বাজের আওয়াজ শোনবার মতো মনের অবস্থা আমার ছিলো না।

একটু ঘুরে দেখলাম আমি, তারপর ঐ বুনো পাইনের দঙ্গলের কাছে এসে হাজির হলাম। ডালটার দিকে ঝুঁকে দেখলাম। কিন্তু মাকড়সাটার কোনো পাত্তা নেই। নিশ্চয়ই সে ঐ গর্তের গভীরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

যে-ডালগুলো ছুঁড়ে ফেলেছিলাম, তাদের ওখানে ঝোলা উচিত ছিলো। কিন্তু একটাও নেই।

আমি জানি এটা হেসে উড়িয়ে দেবার জিনিস। মাকড়সাটা নিশ্চয়ই ডালগুলোকে তার জালের ঠিক ভেতরটায় টেনে নিয়ে যায়নি, কোনো ডাল তো আর কোনো মাছি নয় যে মাকড়সা তাকে বলবে, 'এসো আমার বসবার ঘরে।'

এটা নিশ্চয়ই অন্য কোনো বুনো পাইনের ঝাড়। আমি নিশ্চয়ই প্রথমটার কাছ থেকে স'রে গিয়েছি। এ নিশ্চয়ই নতুন কোনো।

আমার ভেতরটায় ঝাঁকি খেতে লাগলো যেন থয়েরি একটা স্পঞ্জ। আমার মুখের ভেতরটা কেমন যেন শুকনো।

আমি দুহাত জড়ো ক'রে মাথায় রাখলাম। মাথাটা যেন একটা বিজলি তাওয়ার মতো, যার বিদ্যুৎপ্রবাহ যেন এইমাত্র বোতাম টিপে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। আমি মাথায় হাত দেওয়ামাত্র আবিষ্কার করলাম যে আমি ঢলে প'ড়ে যেতে চাচ্ছি। মুহূর্তের জন্য টলমল করলাম, আর বুনো পাইনের পাতাগুলো আমার কাছে এসে পৌঁছলো। তাদের পাশ কাটাতে আমাকে ক্ষিপ্রভাবে মাথা সরাতে হ'লো। পাতাগুলো নীলচে-কালো আর রোমশ, আর তাদের ডগাগুলো লাল।

কাৎরে উঠতাম প্রায়, কিন্তু এটা জানতাম যে, শব্দে বা ভাবে ভঙ্গিতে ভয়ের ভাব ফুটিয়ে তুললেই সব শেষ। সবসময়েই আমাকে তো স্তব্ধতার মোকাবিলা করতে হবে।

কোনোমতে নিজেকে সামলে নিলাম আমি। আমি বসে পড়লাম, আর

অনুভব করলাম কিছু একটা কঠিন জিনিস আমাকে ছোঁবার জন্য এগিয়ে এসেছে। তাকিয়ে দেখি সেটা একটা তালগাছের ডাল। কোথেকে যে এই তালগাছের ডাল এসে হাজির হ'লো, তা আমি মোটেই জানি না। কিন্তু এই নতুন বিষয়টা আমার মনের জোর ক্ষইয়ে দিক, তা আমি চাই না। এই তাপ আর স্তব্ধতার সঙ্গে সহ-অবস্থানই যথেষ্ট।

খুব স্থিরভাবে ব'সে আমি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। চেষ্টা করলাম তাপ যেন আমাকে বড্ড বেশি গলন্ত রেশমে আগাগোড়া ঢেকে না ফেলে। অফুরান এই গলন্ত রেশম—আমার চারপাশে ছড়িয়ে আছে। যেন কোনো অফুরান চাদর।

নাঃ, মোটেই ভালো ভাবনা নয়। অফুরান—চাদর!

আমি কিছুই করলাম না, আমি কোনো সাড়া দেবো না। নিচে তাকালাম আমি, ভেবেছিলাম শাদা বালি দেখবো—দেখলাম সেখানে ঝরাপাতার গলিচে পাতা—নরম, ভেজা-ভেজা। সেই যখন ফান হোগেনহাইম রাজ্যপাল ছিলেন, তখন থেকে যে-সব পাতা জমে আছে। আমি খেয়াল করলাম ছায়াদের নতুন এক মূর্তি। এতক্ষণ তো ছায়া থাকার কথা ছিলো না। চার্লসের কাছ থেকে চ'লে আসার সময় ছিলো বেলা দুপুর। সে তো মাত্র কয়েক মিনিট আগে—তাহ'লে ছায়াগুলো এমন লম্বালম্বি পড়েছে কেন? দুপুরে ছায়ারা থাকে ছোটোখাটো, বামন সব ছায়া, তোমার পায়ের তলায় পড়ে থাকে, যাতে তুমি মাড়িয়ে যেতে পারো তাদের, বশে রাখতে পারো। শুধু যখন তারা তোমার পেছনে লম্বা হ'য়ে ওঠে বিকেলবেলায়, তখনই তারা তোমার কথা মানে না, আর বদ মতলবে ঘুরে বেড়ায় তোমার পেছন পেছন।

আমি মুখ তুলে তাকালাম।

সূর্য পশ্চিম দিগন্তে প্রায় ডুবতে বসেছে। আবারও আমাকে কার গলার স্বর ডাকলো—শুনতে পেলাম। গলাটা এতই চার্লসের মতো যে আমি উঠে দাঁড়িয়ে যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছে ব'লে মনে হ'লো সেদিকে এগিয়ে চললাম।

তার দিকেই এগিয়ে যেতে লাগলাম আমি; আর স্বরটা আরো জোরে ডাকলো আমায়।

তারপরেই দেখতে পেলাম সেই অষ্টাবক্র গাছটা। বুনো পাইনের একটা জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে গেলাম আমি। গেলাম সুইজল-স্টিক গাছপালার একটা

ঝাড়ের পাশ দিয়ে—আর, এই তো আমি, আবার ঠিক পথটায়। আর ঐ যে চার্লস আমার নাম ধ'রে ডাকতে-ডাকতে এগিয়ে আসছে।

চার্লস বললো ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সে সাড়ে-তিনটেয় জেগে ওঠে, আর আমার কোনো চিহ্ন দেখতে পায় না। 'ভড়কে দিয়েছিলে, বাপু। কী, হারিয়ে গিয়েছিলে নাকি?'

'গাধা নাকি'—আমি ওকে বললাম। 'আমি মোটেই পথ হারাইনি।'

হেসে উঠলাম আমি। 'ঐ অষ্টাবক্র গাছটা দেখতে পাচ্ছো? ওটাই ছিলো আমার দিকচিহ্ন। ওরকম একটা গাছ থাকা সত্ত্বেও আমি পথ হারাবো কী করে?'

আমি আবার হাসলাম। 'শুধু এই কড়া রোদ আমাকে একটু দেরি করিয়ে দিয়েছিলো চার্লস। আর এই স্তব্ধতা। শয়তান। চেয়েছিলো আমাকে একটা চাদরে ঢেকে ফেলতে।'

কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালো চার্লস, তারপর আমার হাত ধ'রে জলের ধারে নিয়ে গিয়ে আমার মাথা ধোয়াতে শুরু করলো।

অনুবাদ : শ্রাবণী দে ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লুইস সিমসন

ব্যাঙ

ঝড় উঠল, বৃষ্টি হলো খুব
পুকুর ভরে উঠল কানায় কানায়
নালার জলে লাফিয়ে বেড়ায় ব্যাঙ

হলুদ আর সবুজ রঙা গায়ে,
থকথকানো কাদার থেকে কেবল
বাইরে জেগে থাকে ওদের চোখ।

রাত্রে যখন জোনাকিদের দল
সুগন্ধি ফুল এবং গাছের ফাঁকে
আলোকরেখা তৈরি করে দেয়

ছন্দে কথা বলে তখন ব্যাঙ
এ ওর সাথে বীভৎস এক তানে,
কিন্তু তাদের গলায় ঝরে খুশি।

শহরে মন গাঁয়ের জন্য কাঁদে
গাঁয়ে ভাবি কোথায় আলাপচারি
সেই আমাদের সুখী গ্যাঙর গ্যাঙ!

অনুবাদঃ শঙ্খ ঘোষ

মেরভিন মরিস

একটি মৃত্যু

'ওঠ্! ওঠ্! ট্রেভর, ওঠ্!

আবার ডাক শোনা গেলো আগের মতোই চাপা, শান্ত কিন্তু তীব্রস্বর : উঠে পড়্! ট্রেভর, ওঠ্!'

ট্রেভর পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো, কিন্তু গোড়ায় কিছুই দেখতে পেলো না, একদম অন্ধকার। পরমুহূর্তেই সে তার ওপর ঝুঁকে পড়া অবয়বটা খেয়াল করলো। গলা শোনা গেলো ফের।

'উঠে পড়্, ট্রেভর, ওঠ্!'

'অ্যাঁ?' ট্রেভর বললে।

'ওঠ্, তোকে বাড়ি যেতে হবে।'

'বাড়ি যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, বাড়ি। তোর বাবার খুব অসুখ।'

'অসুখ? বাবার?'

এতক্ষণে গলাটা চিনতে পারলো ট্রেভর; আর্থার কাকা। ধড়মড় ক'রে উঠে সে আলোর জন্যে হাত বাড়ালো।

ছেলেদের জামাকাপড় রাখার লকারের একটা খোলা; তার ওপর শুইয়ে রাখা একটা টর্চ। ট্রেভর তার স্কুলের খাকি পোশাক প'রে ফেললো। আর্থার কাকার পরামর্শ মতো তারই কিছু জামাকাপড়ও একটা ব্যাগে ভ'রে ফেললো।

'তোর নীল স্যুটটা নিয়ে নে,' আর্থার কাকা বললেন।

'কটা বাজে?'

আর্থার কাকা টর্চের আলোয় কব্জিটা এনে বললেন, 'মোটামুটি দুটো বেজে কুড়ি।'

ছোট্ট দলটা নিঃশব্দে রওনা দিলো, নিঃশব্দেই। কারণ ডরমিটরির দরজার ঠিক সামনে মেঝের ঢিলে তক্তাটার ওপর দিয়ে তারা তিনজনে পেরোলো। কাঠের ও পাথরের সিঁড়ি পার ক'রে পাথরের ভারি খিলানের তল অব্দি রাতের পাহারাওলা জোন্‌স্ তাদের আলো দেখিয়ে এগিয়ে দিলো।

বাইরে হাওয়া দিচ্ছিলো, বেশে ঠাণ্ডা। শিরশির করছে। ত্রেজারের

বোতাম লাগিয়ে নিলো ট্রেভর। হেড স্যারের ঘরে আলো জ্বলছে দেখা যাচ্ছে। ট্রেভররা সেদিকেই এগোলো। হেড স্যারের পরনে ড্রেসিং গাউন। ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো তাঁকে, তবু আতিথেয়তার খাতিরে তাদের কফি খেয়ে যেতে বললেন। আর্থার কাকা নম্রভাবে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করলেন। হেড স্যারের গাড়িবারান্দায় তারা তিনজনে গাড়িতে উঠে পড়লো। চলতে শুরু করতে গাড়ির আলোয় গীর্জের সামনেটা আর বাইরের সবেধন কবরটার ওপরের ক্রুশ দেখা গেলো।

'তুই প্রার্থনা করিস?' কাকা জিগেস করলে।

'হ্যাঁ।'

'তাহ'লে কর। তোর বাবার খুব অসুখ।'

'মারা যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

যখন তারা বাড়ি পৌঁছলো, তখন আকাশে আলো ফুটে উঠেছে। ট্রেভরকে শুয়ে পড়তে বলা হ'লো। আস্ত বাড়িটায় মাকে খুঁজলো ট্রেভর, কিন্তু তিনি তখন হাসপাতালে। পরের তিন দিনের ধকল কিন্তু সইতে খুব কষ্ট হ'লো না। ট্রেভরের মনে হচ্ছিলো, হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু সে মনে-মনে জানে, যে অনুভূতিটা তার ভেতরে তা উৎকণ্ঠাও নয়, শোকও নয়, ; কেমন এক অদ্ভুত শূন্যতা, অনুভূতি যেন থমকে আছে ; যেন তারা সবাই অপেক্ষা করে আছে কিছু-একটা ঘটবে ব'লে, যা তাদের ব্যাপারটার সত্যিকার গুরুত্ব আরো ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়ে দেবে।

মায়ের সঙ্গে হাসপাতালে যেতে-আসতে আসতে ট্রেভরের কেমন মনে হ'লো এই নাটকে সে যেন মোটেই কোনোভাবেই নেই। এটা যে কোন নাটক তা সে জানে। তার মা কেমন বিমনা আর শোকে আতুর, আর অস্বস্তিকর-ভাবে চুপচাপ ; যে কয়েক ঘণ্টা তারা বাড়িতে কাটায় হঠাৎ-হঠাৎ মা তাকে বুকে চেপে ধরেন। বাবা যে মারা যাচ্ছেন, তা সে স্পষ্টই বোঝে। তার বাবা কাউকেই চিনতে পারছেন না। এমনকি ট্রেভরের মাকে অব্দি না। তিনি শুধু শুয়ে থাকেন চিৎ হ'য়ে, বেশির ভাগ সময়েই চোখ বোজা, শ্বাস-প্রশ্বাস নেন মুখ দিয়ে সশব্দে, হাত দুটি বিবশ পড়ে থাকে বিছানায়। ট্রেভরের মা ব'সে থাকেন একটা শক্ত চেয়ারে তাঁর স্বামীর দিকে তাকিয়ে। কখনো তাঁর দৃষ্টি অপলক, কখনো কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা, যেন তিনি অন্য কিছুর কথা ভাবছেন।

অবশেষে, বুধবার বিকেল চারটে নাগাদ, মনে হ'লো রুগী যেন নিশ্বাস নিতে গিয়ে খাবি খাচ্ছে। তাঁর স্ত্রী চকিতে সজাগ হ'য়ে উঠে বসলেন; কি রকম আড়ষ্ট, আর টানটান।

'নার্স! নার্স!' একটু থেমে ট্রেভরকে পাঠালেন তিনি, 'যা নার্সকে ডেকে আন।'

বাবা যখন সত্যি-সত্যি শেষ নিশ্বাস ফেললেন, ট্রেভর যতটা-না উত্তেজিত হ'লো তরে চেয়ে বেশি হ'লো কৌতূহলী—কেমন যেন নৈর্ব্যক্তিকভাবে। তার বাবার নিশ্বাস শুধু বন্ধ হয়ে গেলো একসময়। তাঁর সারা শরীর আর বিশেষ ক'রে তাঁর মুখ, যতটা-না শিথিল হ'য়ে গেলো, প্রথমে তার চেয়েও বেশী কেমন শান্তির ভাবে ভ'রে এলো। তারপর মুহূর্তের মধ্যে, তাঁর মুখ ভাবলেশহীন হ'য়ে গেলো। একজন নার্স তাঁর মুখে বাঁধানো দাঁতের পাটি পরিয়ে দিলো, তারপর চাদরটা টেনে দিলো মাথার ওপর।

ট্রেভরের মা ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, দুহাতে মুখ ঢাকলেন, তারপর কেমন টানটান দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে যখন তিনি মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে তাঁর স্বামীর দিকে তাকাবার জন্য ফিরে দাঁড়ালেন, বিছানার চারপাশে তখন একটা পর্দা টাঙানো। ট্রেভরকে দেখতে পেলেন তিনি হঠাৎ। অমনি আবার চোখের জল ঝরতে লাগলো, এবার একেবারেই নিঃশব্দে। এই চোখের জল কেমন অবসাদে ভরা ব'লে মনে হ'লো ট্রেভরের, কেমন যেন একটা স্বস্তির ভাবও আছে তাতে।

সেই সংকটের সময় কাকারা কেউ ছিলেন না ব'লে ট্রেভর আর তার মা একটা ট্যাক্সির দিকে এগিয়ে গেলেন। ট্যাক্সির কাছাকাছি আসতেই রেক্টর রেভারেণ্ড টমাসের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো।

'শুভ সন্ধ্যা মিসেস ফ্রাঙ্কলিন,' বললেন তিনি, তারপর মুখে হাসি ফুটিয়ে জিগেস করলেন, 'কেমন আছেন?'

'ভালোই, চলে যাচ্ছে,' অস্পষ্ট স্বরে ট্রেভরের মা বললেন।

'আপনার স্বামী আজ কেমন আছেন?'

আবার ট্রেভরের মা কেঁদে ফেললেন।

'রেক্টর, উনি মারা গেছেন।'

হতবাক, রেক্টর মার হাতটা চেপে ধরলেন, তারপরে ট্যাক্সিতে উঠতে সাহায্য করলেন তাঁকে, ট্যাক্সিটা ছাড়া অব্দি তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা বাড়ি পৌঁছে গেলো। খবরটা ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে গেছে, সমবেদনা জানাতে আত্মীয় পরিজনরা আসতে শুরু করেছেন। ট্রেভরের এক বৌদি গরম দুধে গোপনে একটা ঘুমের বড়ি মিশিয়ে ট্রেভরের মাকে দিলেন, তারপর তাঁকে শুইয়ে দিলেন।

একটু পরেই কাকাদের আবির্ভাব হ'লো; ট্রেভর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো আর শুনলো কীভাবে তাঁরা জরুরি বন্দোবস্তগুলো করছেন। বেতারে খবরটা জানাবার ব্যবস্থা করলেন তাঁরা, খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তিরও, কোন্ পুরুত কবর দেবেন, কোথায় কবর দেয়া হবে, অন্ত্যেষ্টির সময় কী—তারও।

হাপুশ কাঁদিয়েরা পরে এসে পৌঁছুলো,—তাকিয়ে দেখলো ট্রেভর—সেই যারা বলাবলি করলো কবে তারা তার বাবাকে শেষ দেখেছিলো, আর কেমন চমৎকার মানুষ ছিলেন তিনি—এইসব। ট্রেভর জানতো যে তার বয়স এতোই কম যে কাউকে বিচার করা তাকে মানায় না, কিন্তু এরা যে সবাই মিথ্যেবাদী, ধাপ্পাবাজ তা সে টের পেলো। এদের শোক প্রকাশের ধরনটা যেন আগে থেকে ঠিক-ক'রে-রাখা কোনো বাঁধাধরা পথে চলেছে—যেন এরা আগে থেকেই মহড়া দিচ্ছিলো। ট্রেভর তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো আর তার ইচ্ছে করলো এদের অপমান করতে।

শেষকৃত্য করা হ'লো পরদিন। কিন্তু অন্ত্যেষ্টির চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক ছিলো তার প্রস্তুতি। সারা সকাল ধরে ট্রেভরের মাসিপিসিরা স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে ঠোঙায় ভ'রে রাখতে বা তেলে-কাগজে মুড়ে রাখতে ব্যস্ত রইলেন—যাতে স্যাণ্ডউইচগুলো টাটকা থাকে। বেলা দুটো নাগাদ মৃতদেহ এসে পৌঁছলো। ট্রেভরের মা কফিনের গোল ঘুলঘুলিটার ওপর থেকে কাঠের ঢাকনাটা খুলে ফেললেন, যাতে তার বাবার মুখটা দেখা যায়। মুখটা কেমন যেন অস্বাভাবিক দেখাচ্ছিলো, সত্যি বলতে যেন মেকআপ পরানো। ট্রেভরের মা একবার মৃতদেহের কাছ থেকে সরে যান, আবার পরক্ষণেই ফিরে আসেন, কেমন ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকেন সেই মৃত ফ্যাকাশে মুখটার দিকে। অবশেষে তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁর ঘরে পাঠানো হ'লো, সৎকারের জন্য পোশাক প'রে নিতে। সাড়ে তিনটে নাগাদ তিনি সদর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য প্রস্তুত, মুখচোখে কেমন একটা সুখে দুঃখে নির্বিকার গর্বের ভাব।

এক-এক ক'রে অভ্যাগতরা কফিনের পাশ দিয়ে গেলেন, কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকালেন ট্রেভরের বাবার মৃত মুখের দিকে, আর যাঁর যা উচিত মনে হ'লো সেইভাবে শোক প্রকাশ করলেন—কেউ খুব পোশাকিভাবে, কেউ-বা আন্তরিক। বোকারা বললেন, 'চিরবিশ্রাম নিতে গেছেন, আমেন!' আর ট্রেভর বহু কষ্টে তার মজা চেপে রাখলো। বাড়ির সামনেটায় সবখানে ছোটো-ছোটো দলে লোকেরা দাঁড়িয়ে—ট্রেভর আবিষ্কার করলো তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলছে—কে যে মৃতের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ছিলো, আর কে তাঁকে শেষ দেখেছে—এই নিয়ে। যারা তাকে 'ছোট্ট ছেলে' বলেছে সেইসব মধ্যবয়সী লোকদের ওপর সে কতটা রেগে গিয়েছে তা যাতে প্রকাশ না-পায়, ট্রেভর সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করলো তার চোখেমুখে শোকের ছায়া এঁটে রাখতে।

চারটের ঠিক আগটায় রেক্টর এসে পৌঁছুলেন। কালো পিয়ানোটার দিকে পেছন ফিরে ছোট্ট করে তিনি প্রার্থনা সারলেন। কফিনটাকে বৈঠকখানার চেয়ারগুলো থেকে তুলে নিয়ে শবযাত্রার গাড়িতে ওঠানো হ'লো। তার মায়ের সঙ্গে ট্রেভরের কোন-এক অচেনা ধনী লোকের শোফার-চালানো গাড়িতে তুলে দেয়া হ'লো, আসলে ভদ্রলোক ছিলেন তাঁরই বাবার সঙ্গে গির্জের ওয়ার্ডেন। ট্রেভর অবশ্য চটলো না; স্টুডিবেকার গাড়িটা বেশ আরামের।

গির্জেয় গিয়ে ট্রেভরের মা ছেলের হাত শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরলেন। ট্রেভর দেখলো তার মুখঢাকা কালো কাপড়ের আড়ালে তিনি কাঁদছেন—কিন্তু তিনি ভেঙে পড়লেন না মোটেই, আর চোখও মুছলেন না।

'ঈশ্বরের গতিবিধি রহস্যময়
বিচিত্র তাঁর লীলা...'

কথাগুলো ট্রেভরকে ক্রুদ্ধ ক'রে দিলো। কে এই ঈশ্বর, সে ভাবলো আর কেনই বা কেউ তাকে বোঝে না? স্কুলের গির্জের সব সুভাষিতের কথা ভাবলে সে, ভাবলে সব জটপাকানো হেঁয়ালিগুলোর কথা, সেইসব প্রশ্নের কথা—যা তার মনে হ'তো এইসব সুসমাচারে শুনলে।

ঐ অন্য স্তোত্রগুলো, তার মনে হ'লো, বরং অনেক মানাতো এখন। 'স্বর্গের রাজা, আমার আত্মার স্তুতি করো'—এই অদ্ভুত চরণটার মানে ক-জন বুঝতে পেরেছে, এ-কথা না-ভেবে অবশ্য সে পারলে না। ক-জন লোক এ নিয়ে ভাবার কষ্ট স্বীকার করে? ক-জন জানে যে আত্মা হ'লো স্বর্গেরই রাজা? 'আমার সঙ্গে থাকো,' তার মনে পড়লো বাবা পিয়ানোয় বাজাতেন, আর মাঝে-মাঝেই

এমন স্বরসুষমা ফুটিয়ে তুলতেন, যা ছিলো উজ্জ্বল, সুনিশ্চিত আর জটিল—সবই একসঙ্গে।

'এবং যদিও কীটেরা এই শরীর ধ্বংস ক'রে দেবে, তবু আমার এই শরীরেই আমি দেখতে পাবো ঈশ্বরকে…' কী মানে এই কথায়?

প্রশংসার কথাগুলো আন্তরিক ব'লেই মনে হ'লো ট্রেভরের। রেক্টর সম্ভবত সত্যি চিনতেন তার বাবাকে। ট্রেভর অবাক হ'য়ে গেলো। সে ভেবেছিলো ফাঁকা কতগুলো বুলি শুনবে, কিন্তু তা তো নয়। সেদিন এই প্রথমবার তার কেঁদে উঠতে ইচ্ছে ক'রলো। রেক্টর দাঁড়িয়ে আছেন পাদপীঠে, তার ঝাপসা দৃষ্টি তাঁকে ছাড়িয়ে চ'লে গেলো: বেদির ওপর পেতলের ক্রুশ—ঠিক তার স্কুলের কাঠের ক্রুশের মতো। এখনও তার মনে আছে এই বছরখানেক আগেও তার বাবা প্রার্থনাদলের সঙ্গে গাইতেন, প্রার্থনাদলের পুরোভাগে ক্রুশের কাছে দাঁড়াতেন তিনি।

গির্জের শেষকৃত্য শেষ হ'তেই সেই মস্ত জমায়েত সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো কারখানার উদ্দেশ্যে।

শববাহকদের পেছন-পেছন শোকযাত্রীরা সমাধিস্থলে এসে পৌঁছুলো—একটা গাছের নীচে। ছায়া দেবে কি এই গাছ—না কি ঝরা পাতা নোংরা ক'রে রাখবে এই সমাধিকে? তাতে কি সত্যি কিছু এসে যায়?

সমাধির চারপাশে কোদালের কাজ এমনই ছিমছাম যে গর্তটা যেন জায়গায়-জায়গায় ঝকমক ক'রে উঠেছে। অনেক ফুলের স্তবক প'ড়ে আছে মাটিতে।

কফিনটা দড়ি দিয়ে বেঁধে সমাধির ওপর রাখা হ'লো। ট্রেভর অন্য দর্শকদের দিকে ফিরে তাকালো। সবাইকেই ঠিক একরকম বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

'নারীর গর্ভে যে-মানুষের জন্ম তার পরমায়ু অতি স্বল্প ও দুর্দশায় ভরা। তিনি আসেন, উৎপাটিত হন, যেন কোনো ফুল, তিনি মিলিয়ে যান, যেন কোনো রামধনু, এবং কখনোই চিরকাল থাকেন না।

'জীবনের মাঝখানে আমরা মৃত্যুতেই আছি…'

তার হাতের ওপর মায়ের মুঠি আরো আঁটো হ'য়ে উঠলো।

কপিকলের ক্যাঁচকেচে আওয়াজ অশ্লীল শোনালো—কফিনের ওপর প্রথম মাটি পড়ার চেয়েও অশ্লীল। তার মা কাঁদতে শুরু করে দিলেন।

সমাধির ওপর শেষ পাল্লা মাটি চাপাবার পর জমায়েতের মধ্যে হঠাৎ যে পরিবর্তন দেখা দিলো, তা লক্ষ্য ক'রে ট্রেভরের তাজ্জব লাগলো। সে তাকিয়ে

দেখলো ফুলের স্তবক হাতে সগর্ব এগিয়ে এলো লোকে, তাদের স্তবক সাজিয়ে রাখতে।

আর তারপরেই, আচমকা শুরু হ'য়ে গেলো কথার গুঞ্জন ; তাদের মুখে ফুটে উঠলো হাসি, সংকারের আবহাওয়াটা এমন হ'য়ে উঠলো যেন এটা কোনো বাগানের মধ্যে পিকনিক। এমন কি ট্রেভরের মাও—যেন এই নতুন ভাবটার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করলেন, অস্ফুট একটা হাসি তাঁর মুখে—যদিও তাতে কোনো প্রাণ নেই।

'ছোট্টো মানুষ, মার দেখাশুনো কোরো।'

ট্রেভর ঘাড় নাড়ালো।

'এখন তুমিই তো বাড়ির পুরুষ।'

গম্ভীর ও দায়িত্ববান দেখাবার চেষ্টা করলো ট্রেভর। লোকে কতটুকু বোঝে তাকে? কতখানি? সে ভাবলে। শোক কাকে বলে? সমবেদনা জানানোই বা কেন?

'বুঝেছো, আমি সবসময়েই বলি, জীবনের মধ্যেও আমরা মৃত্যুর সঙ্গেই আছি। লোকটা হেসে উঠলো, 'যাক, পুরোনো কথা ভুলে গিয়ে এবার একটু হাসিখুশি হও।'

স্কুলে ফিরে গিয়ে কী বলবো আমি? ট্রেভর ভাবলে। কিছুদিন আমিই থাকবো কৌতূহলের বিষয়। কেমন ভাব করতে হবে আমাকে? লোকে কী চায়? কী তারা আশা করে আমার কাছ থেকে?

'তা, ট্রেভর,' সে শুনতে পেলো তার এক কাকা বলেছেন, 'আমরা তোর জন্য গর্বিত। তোকে আমি কাঁদতে দেখিনি।'

ট্রেভরের মা শক্ত মুঠোয় তার হাতটা চেপে ধরলেন। আর ট্রেভর কেমন করুণভাবে একটু হাসলো।

অনুবাদ : চন্দ্রচূড় সরকার

এডওয়ার্ড কামাউ ব্রাফেট

ব্ল্যাক + ব্লুজ

১ ভূমিকা

মাদল চামড়া চাবুকের
শপাং, ম্যালিক সর্দেরের
চামড়াকাটা তাপের
ধার, সবকিছুর
টানটান উপরিতল
আমি গান ক'রে উঠি
আমি চীৎকার করি
আমি কাৎরে উঠি
আমি স্বপ্ন দেখে
চলি

ধুলো কাচ বালির কণা
মরুভূমির সব নুড়ি :
বালি ফুলে ওঠে স'রে যায় :
পোড়া জগতের মধ্য দিয়ে
জল তার প্রবাহ
রুদ্ধ ক'রে দেয়।
তপ্ত চাকায়
বছরের
মড়াগুলো
প'চে যায়।
উটগুলো চুরমার
তাদের নিজেদের

মনের মধ্যে
আবার বাঁচিয়ে দেয় প্রজা-
পতিদের যারা
নেচে বেড়ায় দুপুর রৌদ্রে
আশাহীন
কোনো সকালের
আশাহীন।

শিগগিরই
পাথর
হাতির চামড়া গায়ে-
পরা থ'য়ে-যাওয়া শিলাখণ্ড
টেনে-আনা এখন
শুকনো সব নদীর
খাতে, মৃত্যুর
উপত্যকাগুলোয়।
এখানে মাটি
ঠাণ্ডা কয়লা আঁকড়ে থাকে
কাচে, সৃষ্টি করে
ঝনঝন, লাভা ঝকঝক ক'রে ওঠে,
আকাশের সব তারার শিশুরা।
এখানে ঠাণ্ডা
শিশির পড়ে
সন্ধ্যায়
শ্যামা পাখিরা মিটমিট করে
গাছের ওপর
গুঁড়িগুলো ধর্ষিত
আগুনে
তছনছ তার সব
সোনা সমেত।

এখুনি প'ড়ে তোলো
নতুন-সব
গ্রাম, তোমাকে
ময়লার সঙ্গে মেশাতেই হবে
থুতু, গোবরের সঙ্গে
লালা আর
ঘাম : গোল
মাটির দেয়াল উঠে দাঁড়াবে
উষায়
দেয়ালঘেরা সব নগরী
উঠে দাঁড়াবে
সাভান্না আর
পাথুরে নদীর খাত থেকে :
হে কানো হে বামাকো
হে গাও

কিন্তু মাছির পাল
উঠে দাঁড়ায় গোখেঁায়াড়
শহর থেকে : রক্তশোষা
মাছি। দুধ
জ'মে যায়
বাঁটে
স্তনে
মুখে। মাছির পাল
ঠুকরোয় আর লপুঁজ ক্ষত :
ঝাঁটো টানটান রুপোলি—
পিঠ ঝাঁক ব'য়ে নিয়ে আসে
স্তব্ধতা, প'চে যাওয়ার
দীর্ঘ সব শুঁড়।
তপ্ত

হায়মাটালের মধ্যে,

লাশগুলো আস্তানা গাড়ে
আর কাঁপে
সেই চাদরের কাছে হাল ছেড়ে দেয়া
যে-চাদর ঢেকে রাখে আর গরম রাখে
সেই চরম হিমের
গরম থেকে ; যতক্ষণ-না আচমকা ফেটে পড়ে,
গুঞ্জিত সব কালো এলাকা যারা সব
স্তব্ধতা, ঘূর্ণি তুলে যায়
রৌদ্রে, যে পরিত্যক্ত পুঁজে ভরা
মাংস তারা ঢেকে রেখেছিলো
ধারাবওয়া গর্তে ভরা যেন বৃষ্টির
নিচে ধুলো, যেন বৃষ্টির নিচে
মাটি ।

কিন্তু মাংস যখন
পচে যায়,
মাছি যখন ঝাঁক বাঁধে
কোনো বর্ষণই
নামে না । কিন্তু, ঐ যে,
নদীর খাতের শুকিয়ে-যাওয়া
অন্ত্রের ভেতর,
ছাখো !
গাছপালা
শীতল, তাদের পাতাগুলো
শ্যামল, সেখানে
জ্ব'লে উঠেছে কোনো ঝরনার
স্বপ্ন,
গন্ধের বিতান,
নরম সব গলিপথ ।

কাজেই বানাও গ'ড়ে তোলো
আবার নতুন-সব
গ্রাম : তোমাকে
মেশাতেই হবে নোংরার সঙ্গে
থুতু, গোবরের সঙ্গে
ঘাম আর লালা, পলেস্তারা বানাতে। ছাতের জন্য
পাতার ছাউনি আর লতাপাতার
ঝালর।
কিন্তু চৌকো কাঠামো
ফেটে যায়, কাঠ
পচে, মসৃণ পলেস্তারাও
প'ড়ে থাকে মরণাতুর,
তার নিজের নুনেই ফাঁদে-পড়া,
তার জলের টালমাটাল সব ভিত।
তাই, ভগবান, তুমি মঞ্জুর করো
যাতে এই বাড়ি সটান সামলাতে পারে।
চার হাওয়া
ঋতুর অদলবদল
ঘুণপোকার হাতড়ানি।
মঞ্জুর করো, ভগবান,
চোরেদের কাছে থেকে এক সুপরিস্ফুট মুক্তি,
দস্যুদের কাছ থেকে আর তাদের কাছ থেকে
যারা ষড়যন্ত্র করে বিষ দেয়
যখন তারা আমাদের থালায়
হাত বাড়ায়।
আরো মঞ্জুর করো : উষ্ণ আগুন, সুমঙ্গলা
সহধর্মিণী, কৃতজ্ঞ সব সন্তান।

কিন্তু দারুণ তপ্ত আগুন শিখা ছড়িয়ে দেয়।
শিখা জ্বলে, পোড়ায়, জ্বালায়, ফাটিয়ে দেয়,

ভগ্ন বাড়ির শুকনো পাতাগুলো
গ্রাস করে।   শিখারা ঠকায় ঋতুদের,
পোকাদের, আমাদের পড়শীর বেইমানিদের,
আমাদের জানলা, আমাদের খিল-ছিটকিনি, আমাদের সব পূজা,
আমাদের কুকুর আর আমাদের ভগবানকে।   শিখা,
সেই লোহিত দেবমূর্তি, আমাদেরই শক্তির
সে প্রতিষ্ঠাতা :   শিখা গ'ড়ে তোলে কাঠের ছাঁচ ;   বারুদ দিয়ে,
লোহা।   দীর্ঘ লোহা
ছুটে যায় সব তরোয়ালে,
বল্লমে, ঝকঝকে সব ফলায়
যারা হটিয়ে দেয় বন্য জীব, চক্ষু হ্রেষাধ্বনি।

শিখা আমাদের ভগবান, আমাদের শেষ প্রতিরোধ, আমাদের সর্বনাশ।

শিখা জ্বালিয়ে দেয় গ্রাম।

নয়া দুনিয়া আ-রহা

অসহায় এই রকম
দলনায়ক-
হীন এই রকম,
বীরনায়কহীন,
আমরা মুখোমুখি হয়েছিলাম তোমার :   প্রেমিক,
যোদ্ধা, ঘৃণাকারী,
বেরিয়ে আসছো বনের
সার থেকে
নরম পা
স্তব্ধতার
নরম মাটিতে :

আমাদের দেখা হয়েছিলো
ঝরা পাতার প'চে-যাওয়া শুঁড়িপথে।

খট তালা
তোমার বহ্নি-
জ্বালা পুরো-
বাহু আগে-
রাস্ত্র ঝলসে দিয়েছিলো
আগুন আর আমাদের দৃঢ়তা
শিথিল, শিখা
সুতপ্ত, পতঙ্গ
কামড়ানো যোদ্ধারা সব
প'ড়ে গিয়েছিলো পর-পর।

কত দিন
হায় কতদিন
হে প্রভু
হে শয়তান
হে আগুন
হে শিখা
আমরা হেঁটেছি
আমরা পথ পেরিয়ে এসেছি
এই জায়গায়
এই দেখা হওয়ায়
এই ঝাঁকুনিতে
আর লজ্জায়
এই কলঙ্কিত
স্তব্ধতায়।

সে-যে কতকাল আমরা
নেমে আসছি নিচে

উপত্যকায় নিচে
চাল বেয়ে, জমানো লাভা
ঝকমক করে, নুড়িগুলো
জলের মতো শুকনো,
জঙ্গলের মধ্যে শেষকালে এই
শিখার ঝলসানিতে।
হায় কে তবে এখন বাঁচাবে
আমাদের, সহায়-
হীন, তুরঙ্গ-
হীন, কোনো
আশা নেই, কোনো হকিন্‌স নেই, কোনো
কোরতেজের আবির্ভাব নেই।
প্রেমপে বন্দী,
তাইয়া মৃত,
আসানতেয়া দড়ি বাঁধা
আর ফাঁসিতে ঝোলানো।
হায় কে তবে এখন বাঁচাবে
আমাদের : জেরোনিমো, টাকি
আর মোন্‌তেজুমার যে আসতে বাকি।

আর আগুন, আমাদের
আগুন, গ'ড়ে তোলে তালা,
লোহার চেয়েও কালো পাথর ;
আগুন ফাঁসিয়ে দিয়েছিলো একবার আমাদের
গ্রামে ; এখন
জঙ্গলে, আগুন ঝ'রে পড়ে
পাখির মতো, আমাদের পেটের তপ্ত
খোলস। আগুন পেড়ে ফ্যালে
সব দেয়াল, আকার দেয় এই সব বহি-
জালাকে যা লোহার চেয়েও কালো,

আর আমরা সারি-সারি নেমে এসেছিলাম পথ দিয়ে
লোহার এক নতুন ঝনঝনে স্তব্ধতার
পরস্পরের সঙ্গে গাঁথা।

অনেক অনেক কাল কেটে যাবে আবার আমাদের চোখে পড়বার আগে
এই দেশ আবার, এই গাছগুলো
আবার, জোয়ারের শব্দের সঙ্গে
ভাসমান এই ভেতরদেশ, ধোঁয়া উঠছে

অনেক অনেক কাল কেটে যাবে আবার আমাদের চোখে পড়ার আগে
এইসব খামার আবার, নরম ভেজা মন্থর শ্যামল
আবার: আবুরি, আক্‌ওয়াম্‌,
কুয়াশা উঠছে

এখন লক্ষ ক'রে ছাখো এই কঠিন লোকগুলোকে, হিম
চোখ যেন জল চেপে এলাম তারই মতো স্বচ্ছ,
পাল আর দড়ি আর মাস্তুল বিষয়ে কী তুমুল দক্ষ

লক্ষ ক'রে ছাখো এখন এই ঠাণ্ডা লোকগুলোকে, সাহসী
সেই জলের মতো যে গলুইতে আছড়ায় অতর্কিত বন্য জোয়ার যেন-বা,
উদাসীন, মনে হয়,

জল আর হাওয়ার এই সংঘর্ষে;
কারণ আমাদের রুধির, শিগগিরই
মিশে যাবে তাদের খেলাধুলোর উৎকাঙ্ক্ষায়,

ঔদাসীন্যে, রোষে,
গ'ড়ে তুলবে নতুন মাটি, নতুন আত্মা, নতুন
পূর্বপুরুষ; ব'য়ে যাবে এই জোয়ারের মতো

তারার গায়ে আটকানো যে-জোয়ারের জলে ভেসে যায় এই জাহাজ
নতুন জগতের উদ্দেশে, নতুন জলের দিকে, নতুন
বন্দরের দিকে, আমাদের পূর্বপুরুষের গরিমা

হাওয়ার জলের সঙ্গে মেশানো

মাংস আর মাছির সঙ্গে, চাবুকগুলো আর

এই শৃঙ্খলিত স্বাগত জানানো বন্দরের যন্ত্রণার ভয়ের সঙ্গে অনড় জুড়ে-দেয়া।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এমে সেজেয়ার

দুটি কবিতা

শকুনদের দখলে মঞ্চ

কোথায়, কখন, কী ভাবে, কেন, হ্যাঁ, কেন, কেন,
কেন এ-সব ভয়ানক বজ্জাত শব্দ ভবিষ্যৎকে ঝুলিয়ে রাখার জন্যে
এত-কম কয়েকটা আকশি আবিষ্কার করেছে

ঐ নিরীহ লোকটাকে থামাও, ও তো ঠিক অন্যদের মতোই। ঐ
লোকটা ঘাড়ে ব'য়ে নিয়ে যায় আমার রক্ত। তার জুতোর ভিতর
ব'য়ে নিয়ে যায় আমার রক্ত। তার নাক ফেরি ক'রে বেড়ায় আমার
রক্ত। চোরাকারবারীদের খতম করা হোক। সমস্ত সীমান্ত রুদ্ধ।
চেনাও নয় আবার অচেনাও নয়
তাদের সবাই
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমার হৃদয় হারমাটানের চেয়েও শুকনো,
সমস্ত অন্ধকারই আমার শিকার
সমগ্র তামসই আমার প্রাপ্য, আর সব বোমা আমার উল্লাস

তোমরা শকুনেরা, ছিঁড়ে খাবার জন্য জঙ্গলের ওপর উদ্যত চকচক করছে।
তোমরা পাক খাচ্ছো গুহার ওপর যেখানে দরজাটা এক ত্রিভুজ
যেখানে একটি কুকুর প্রহরী
যেখানে জীবন সবুজ পাপড়ির মতো উন্মীলিত
যেখানে কৌমার্য একটি মাকড়সা
যেখানে অসাধারণ নর্দমাটি একটি হ্রদ যেখান থেকে দুটো
মহাপ্রলয়ের স্বর পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
পথ খুলে দেয় ঘোড়ো জলের আহ্লাদের

অন্য-সব নিধনের মধ্যে

সমস্ত শক্তি দিয়ে চাঁদ আর সূর্য পরস্পরকে জাপটায় ঝাপটায়
নক্ষত্রেরা ঝ'রে পড়ে মাছের হৃষ্টপুষ্ট ডিমের মতো

আর একঝাঁক সদ্যোজাত ধূসর ইঁদুরের মতো

ভয় পেয়ো না তৈরি ক'রে তোলো তোমার জন্য জোয়ার
যে এত নিখুঁত স্বচ্ছভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যায় দর্পণের তটদেশে

ওরা আমার দু-চোখে কাদা লেপটে দিয়েছে
আর আমি দেখি আমি ভয়ংকরভাবে দেখতে পাই
অনমুতপ্ত সমুদ্রটির থুথুর ফেনায়
সমস্ত দ্বীপ সমস্ত পাহাড়ের মধ্যে
কিছুই আর অবশিষ্ট নেই
মূলসুদ্ধ উপড়ে-আসা ক্ষ'য়ে-যাওয়া কয়েকটি দাঁত ছাড়া।

অনুবাদ ঃ মণিভূষণ ভট্টাচার্য

লিওপোল্ড সেডার সেন্‌ঘোর্‌

নীল দিগন্তে

আমার সমস্ত হিমায়িত নদী থেকে বরফ মুছে নিয়েছে বসন্ত
নরম বাকল বরাবর প্রথম সোহাগছোঁয়া পেয়ে শিউরে উঠছে
আমার কচি চারা
অথচ দেখ, মধ্য জুলাই-তে আমি সুমেরু শীতের চেয়েও
কত অন্ধ !
আমার ডানাগুলি ঝটপট আঘাত করে, ভেঙে পড়ে
আকাশ দেয়ালে
আমার তিক্ততার বধির কুঠুরি ভেদ ক'রে
কোনো আলো ভিতরে ঢোকে না।
তবে কোন্‌ চিহ্ন খুঁজে পেতে হবে ? কোন্‌ চাবিতে খুলতে হবে
রুদ্ধ দরজা ?
বর্শা ছুঁড়তে ছুঁড়তে কীভাবে পৌঁছনো যায় ঈশ্বরের কাছে ?
দূর দক্ষিণের হে রাজকীয় গ্রীষ্মঋতু, অনেক দেরি ক'রে
এক ঘৃণাময় সেপ্টেম্বরে তুমি এসে পৌঁছবে !
কোন্‌ গ্রন্থে খুঁজে পাবো তোমার সেই প্রতিধ্বনির রোমাঞ্চ ?
কোন্‌ বইয়ের পৃষ্ঠায়, পৃষ্ঠায়, কোন্‌ অসম্ভব ঠোঁটে পাবো
তোমার প্রলাপবিদ্ধ ভালোবাসার স্বাদ ?

অস্থির সেই বিক্ষেপ আমাকে ছেড়ে গেছে।
পাতায় পাতায়-বাজা হে ক্লান্তিকর বৃষ্টিধ্বনি,
হে রাজন্‌, তোমার একাকিত্ব নিয়ে তুমি আমাকে বাজাও
যতক্ষণ না আমি কেঁদে কেঁদে নিজেকে হারিয়ে ফেলি ঘুমে।

দেখাশুনা

এক বিকেলের অন্তরঙ্গ আধো অন্ধকারে
আমি স্বপ্ন দেখি।

আমাকে দেখা দিয়ে যায়
প্রতিদিনের ক্লান্তিপুঞ্জ, প্রতি বছরের মৃতেরা, দশকের স্মৃতিচিহ্নদল
অগভীর সমুদ্রের দিগন্তছোঁয়া গ্রামে
মৃতদের মিছিলের মতো।
মায়াবী শিশিরে ভেজা সেই একই রোদ,
কিছু কিছু লুকনো হাজিরা নিয়ে বিপন্ন সেই একই আকাশ,
মৃতদের সঙ্গে হিসেবী সম্বন্ধ আছে যাদের
তাদের নিয়ে সন্ত্রস্ত
সেই একই আকাশ।
তারপর হঠাৎ আমার শব আমাকে কাছে টানতে থাকে…

সারাদিন

সারাদিন দীর্ঘ সোজা রেল লাইনের উপর
অনন্ত বালিয়াড়ির উপর এক অনমনীয় ইচ্ছার মতো
রোদঝলসানো কেয়র এবং বাওল পেরিয়ে
যেখানে বাওবাব গাছেরা যন্ত্রণায় তাদের হাত মোচড়াতে থাকে
সারাদিন লাইন বরাবর
একঘেয়ে ছোট ছোট ইস্টিশান পেরিয়ে
ইসকুলের গেটে পাখিদের-মতো-ডানা-ঝাপটানো
কালো মেয়েদের পেরিয়ে
সারাদিন
লোহার ট্রেনের আওয়াজে ধ্বস্ত বিপর্যস্ত ধুলোমাখা রুক্ষ
এই আমাকে
দেখ,
যে আমি ভুলতে চেষ্টা করছি ইয়োরোপকে
সীনের রাখালিয়া হৃদয়ের মাঝখানে থেকে।

মুখোশদের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা

হে কালো মুখোশ, লাল মুখোশ, শাদা-কালো মুখোশের দল,
হে আয়তাকার মুখোশের দল

তোমরা, যাদের ভিতর দিয়ে আত্মা নিঃশ্বাস ফেলে
তোমাদের স্বাগত জানাই এই নৈঃশব্দের মধ্যে।
স্বাগত তোমাকেও, হে আমার চিতার-মাথা-ওয়ালা পূর্বপুরুষ
তুমি পাহারা দিচ্ছো এই জায়গাটুকু
যেখানে কোনো মেয়েলি মস্করার ঠাঁই নেই
যেখানে সব নশ্বর হাসি পুরোপুরি নিষেধ।
এই জায়গায় যেখানে আমি আমার বাপ-ঠাকুরদার স্মৃতিমাখা
বাতাস নিঃশ্বাস ভরে নিচ্ছি
তোমরা সেই সনাতন বাতাসকে শুদ্ধ করছো
গালের মেকি টোল এবং চামড়ার কুঞ্চনমুক্ত
হে নির্জ্ঞান মুখের মুখোশমালা,
তোমরা তৈরি করেছো এই মূর্তি, এই আমার মুখ
যা নুয়ে পড়ে শাদা কাগজের বেদির উপরে।
তোমাদের নামে শপথ নিয়ে বলছি, শোনো,
এখন পুরনো স্বৈরাচারের আফ্রিকা মরে যাচ্ছে
এ যেন এক বেচারা রাজকুমারীর দুঃখ
ঠিক ইয়োরোপের মতো, যার সঙ্গে তার নাভির যোগ,
এখন তোমার শিশুদের দিকে তোমার স্থির চক্ষু ফেরাও
সেই ডেকে-আনা শিশুদের দিকে
যারা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করছে গরিব মানুষেরা
শেষ পোশাকটুকুও দিয়ে দেবার মতো
যাতে পৃথিবীর নতুন করে জন্মানোর সময়ে
এবার আমরা চেঁচিয়ে বলতে পারি 'এখানে'
যে চিৎকার শাদা ময়দার পক্ষে জরুরি খামিরের মতো।
কারণ
যন্ত্রপাতি গোলাবারুদের চাপে মৃত এই পৃথিবীকে
কে আর ছন্দ শেখাবে?
কে আর হঠাৎ তুলবে সেই প্রবল আনন্দধ্বনি
যা মৃত ও সবজান্তাদের জাগিয়ে তোলে এক নতুন ভোরে?
বলো, কে আর মানুষের কাছে পুরনো জীবনের স্মৃতিকে ফিরিয়ে দিতে পারে

একটি দীর্ঘ আশাসমেত ?
ওরা আমাদের বলে 'তুলো-ঠাসা মাথা' বলে 'কফি ও তেলের মানুষ' বলে
'যমের পেয়াদা'
অথচ আসলে আমরা সেই নাচের মানুষ
যাদের দু'পা কঠিন মাটিকে আঘাত করে করেই
শক্তি খুঁজে পায়।

মৃতেরা

তারা সব শুয়ে আছে ওইখানে
দখল-করা রাস্তার পাশে, বিধ্বস্ত সড়ক বরাবর
অপরূপ পপলারের সার বেয়ে, লম্বা ঝুলের সোনার আংরাখা-পরা
গম্ভীর দেবতাদের মূর্তির পাশে
সেনেগালী বন্দীরা ফ্রান্সের অন্ধকার মাটিতে শায়িত।
বৃথাই তারা ছেঁটে দিয়েছে তোমার মুখের হাসিকে
বৃথাই তোমার মাংসের নিচে ফুটেছে গাঢ় ফুল
নগ্ন অনুপস্থিতির মধ্যে প্রথম সৌন্দর্যে-জাগা
তুমিই সেই ফুল
বিষণ্ণ-হাসি-মাখা কালো ফুল, অনাদি কালের হীরা।
তুমিই পৃথিবীর সবুজ বসন্তের মজ্জা রক্ত-রস
প্রথম দম্পতির তুমি ত্বক উজ্জ্বল তলপেট দুধেল ভাব
তুমি উজ্জ্বল স্বর্গীয় বাগানের পবিত্র প্রসার
আগুন ও বজ্রজয়ী দুর্জয় বনানী।
তোমার রক্তের মহাসংগীত ডুবিয়ে দেবে সব যন্ত্রপাতি এবং কামানকে
তোমার বুক-তোলপাড়-করা কথা ডুবিয়ে দেবে
সব গা-বাঁচানো কাজ ও মিথ্যাকে।
ঘৃণাবিহীন কোনো ঘৃণা তোমাদের আত্মায় নেই
নেই ধূর্ততাশূন্য কোনো ধূর্ততা।
হে কালো শহীদের দল, অমর সম্প্রদায়,
আমাকে ক্ষমার কথা উচ্চারণ করতে দাও।

অনুবাদ : পিনাকেশ সরকার

বিরাগো দিওপ

সার্‌ঞান

কোনটা যে ধ্বংসস্তূপ আর কোনটা যে উইঢিবি তা কিছুতেই স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায় না। শুধু একটা উটপাখির ডিমের খোলা—ফাটা, আর রোদে-জলে হলদে-হ'য়ে-যাওয়া—এখনও দেখিয়ে দিচ্ছিলো একটা লম্বা থামের আগায় একদিন যা ছিলো এল হজ ওমরের যোদ্ধাদের তৈরি মসজিদের মিরাব। আজ যারা এখানকার গাঁওবুড়ো, তুকুলোর বিজেতা তাদের বাপ-ঠাকুর্দার চুল ছেঁটে মাথা কামিয়ে দিয়েছিলো। যারা কোরানের বিধিনিষেধ মানতে চায়নি, ধড় থেকে তাদের মুণ্ড সে উড়িয়ে দিয়েছিলো। এখন আবার গাঁওবুড়োরা চুল রাখে, বিনুনি বেঁধে। গোঁড়া তালিবেরা একদিন যে-পবিত্র বনগুলো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছিলো, অনেকদিন হ'লো সে-সব আবার বড়ো হ'য়ে গিয়েছে। এখনও সেখানে র'য়ে গেছে পুজোর উপকরণগুলো—জোয়ার সেদ্ধ করতে করতে শাদা-হওয়া সব হাঁড়িকুড়ি বা বলি-দেয়া মুরগি বা কুকুরের রক্ত জ'মে জ'মে খয়েরি হ'য়ে-যাওয়া সব বাসনকোসন।

পাটাতনে ধানের আঁটি আছড়ালে যেমন ধান ছড়িয়ে পড়ে আশপাশে, কিংবা রসে টইটম্বুর ফল যেমন খ'সে পড়ে গাছ থেকে, তেমনিভাবেই গোটা-গোটা পরিবার ডুগুবা ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলো নতুন-নতুন গ্রামের পত্তন করতে। —ডুগুবানিস। কোনো-কোনো ছোকরা কাজকর্মের সন্ধানে যেতো সেগু, বামাকো, কায়ে অথবা ডাকার-এ; অন্যরা কাজ করতে যেতো সেনেগালের বাদাম বনগুলোয়, ফিরে আসতো ফসল তোলা শেষ ক'রে, সব মাল জাহাজ বোঝাই ক'রে ভিনদেশে পাঠিয়ে দেবার পর। সবাই জানতো যে তাদে[র] জীবনের শিকড় কিন্তু এখনও ডুগুবাতেই প্রোথিত, যেখান থেকে অনেক দি[ন] আগেই ইসলাম যাযাবরদের সব চিহ্ন মুছে গিয়েছে, যেখানে আবার ফি[রে] এসেছে পূর্বপুরুষের রীতিনীতি শিক্ষাদীক্ষা।

ডুগুবারই একটি ছেলে কিন্তু সাহস ক'রে চ'লে গিয়েছিলো সকলের চেয়ে দূরে আর সেখানে থেকেও ছিলো সবচেয়ে বেশিদিন; তার নাম থিয়েখো কইতা

ডুগুবা থেকে সে গিয়েছিলো স্থানীয় রাজধানীতে, সেখান থেকে কাটি, কাটি থেকে ডাকার, ডাকার থেকে ক্যাসাব্লাঙ্কা, ক্যাসাব্লাঙ্কা থেকে ফ্রেজুস, আর তারপর দামাস্কাস। সৈন্য হবে ব'লে সুদান ছেড়েছিলো থিমেথো কইতা, ট্রেনিং নিয়েছিলো সেনেগালে, যুদ্ধ করেছিলো মরোক্কোয়, ফ্রান্সে হয়েছিলো পাহারাদার, আর লেবাননে শান্তিরক্ষী। শেষমেশ আমার ডাক্তারি ক্যারাভানের সঙ্গে সে ফিরে এলো ডুগুবায়—একজন সার্জেন্ট হিসেবে।

আমি তখন পশুর ডাক্তার হিসেবে সুদানের দূর-দূরান্তরে রোদে বেরুচ্ছি। এই সময়ে স্থানীয় শাসনকর্তার দপ্তরে আমার সঙ্গে সার্জেন্ট কইতার দেখা হ'য়ে গেলো। সে তখন সদ্য চাকরি থেকে ছাঁটাই হয়েছে—ইচ্ছে যে, হয় স্থানীয় পুলিশ বাহিনীতে কাজ নেয় অথবা কোনো দোভাষীর কাজ পায়।

'না-না,' স্থানীয় শাসনকর্তা তাকে বলেছিলেন, 'গ্রামে ফিরে গেলেই তুমি বরং আমাদের বেশি সাহায্য করতে পারবে। তুমি এত ঘুরেছো, এত দেখেছো-শুনেছো, তুমিই তো সহজে অন্যদের শেখাতে পারবে শাদারা কেমন ক'রে থাকে। তুমি তো তাদের অন্তত একটু "সভ্য" করে তুলতে পারবে। আচ্ছা, ডাক্তার,'—আমার দিকে ফিরে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি যখন ওদিকটাতেই যাচ্ছেন, তো কইতাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান না কেন? তাতে ওকে অতটা রাস্তার ধকল সইতে হবে না, তাছাড়া সময়ও কিছুটা বাঁচবে। ও দেশ ছেড়েছে তা সে বছর পনেরো তো হবেই।'

অতএব আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ছোট্ট ট্রাকটার সামনের আসনে বসলাম আমি, সার্জেন্ট আর ড্রাইভার, আর পেছনে বসলো রাঁধুনিরা, আমার সহকারীরা, ড্রাইভারের শাগরেদ, আর সরকারি রক্ষীরা—সফরের রান্নাঘরের জিনিসপত্তর, ক্যাম্প খাট, আর ওষুধবিসুধ ও টিকে দেবার সিরামের বাক্সগুলোর মধ্যে গাদাগাদি ক'রে। সার্জেন্ট আমাকে তখনই তার সেনাজীবনের কথা বলেছিলো, বলেছিলো তারপর যখন সে সেনাবাহিনীর নিম্নপদস্থ কর্মচারী হয় তখনকার কথা। সুদানের কোনো বন্দুকবাজের পক্ষ থেকে রিফ যুদ্ধ কেমন হয়েছিলো, তার বিবরণ আমি শুনেছিলাম; সে শুনিয়েছিলো মার্সেই, তুলোঁ, ফ্রেজুস, বেইরুটের কথা। আমাদের চোখের সামনের রাস্তাটা যেন তার চোখে পড়ছিলো না। ঢেউ-তোলা টিনের চালের মতো রূঢ় অসমতল এই রাস্তা—কাঠের গুঁড়ির ওপর কাদার আস্তর বুলিয়ে শান বাঁধানো, এই প্রচণ্ড গরম আর দারুণ শুকতায় সে-প্রলেপ এখন গুঁড়িয়ে ধুলো হ'য়ে গিয়েছে। কেমন একরকম তেলতেলে

ধুলো হলদে মুখোশের মতো এঁটে বসছিলো আমাদের চোখেমুখে, ধুলোয় আমাদের দাঁতগুলো কিচকিচ করছে, আর কিচিরমিচির তোলা বেবুন ও ভয়চকিত যে-সব হরিণী আমাদের পথের ওপর লাফিয়ে পড়ছিলো, ধুলোর এই পর্দা তাদেরও আমাদের চোখ থেকে ঢেকে দিচ্ছিলো। এই দমবন্ধ আব-ছায়াতেও কইতা কিন্তু, মনে হচ্ছিলো, তার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ফেজ-এর মিনার, মার্সেই-এর উত্তাল জলস্রোত, ফ্রান্সের বড়ো-বড়ো সব দালানকোঠা আর নীল সমুদ্র।

দুপুরের মধ্যেই আমরা পৌঁছেছিলাম মাতুগু শহরে—এখানেই রাস্তা শেষ। রাত নামবার আগেই ডুগুবা পৌঁছবার জন্য আমরা নিয়েছিলাম ঘোড়া আর বাহক।

'এরপর যেবার আপনি এ-পথে আসবেন,' কইতা বললে, 'একেবারে ডুগুবা অব্দি পুরো রাস্তাই আপনি গাড়ীতে যেতে পারবেন। কালকেই আমি রাস্তা বানাবার কাজে লেগে যাবো।'

একটা টমটমের অস্ফুট আওয়াজ বুঝিয়ে দিচ্ছিলো যে আমরা কোনো গ্রামের কাছে এসে পড়েছি। দেখা দিলো আবছাধূসর কুঁড়েঘরের সারি, বিবর্ণতর ধূসর আকাশের পটভূমি গাঢ়তর ধূসর রঙের তিনটি তালগাছ দাঁড়িয়ে। গুমগুমে শব্দটার সঙ্গে এবার মিশেছে একটা বাঁশির সুর—তীব্র তিনটি স্বরগ্রাম। আমরা ডুগুবা পৌঁছে গেছি। আমিই সকলের আগে নেমে প'ড়ে গাঁয়ের মোড়লের খোঁজ করলাম।

'ডুগু-টিগুই, এই-যে তোমার সন্তান, সার্জেন্ট কইতা।' তার ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমেছিলো থিমেখো কইতা। যেন মাটির ওপর তার জুতোর শব্দ ছিলো কোনো সংকেত—অমনি থেমে গেলো মাদলের বোল আর বাঁশির সুর। বুড়ো মোড়ল কইতার দু-হাত ধরলো আর অন্য বুড়োরা তার বাহু, কাঁধ, তার মেডেলগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখলো। কয়েকজন বুড়ি ছুটে এলো, আর তার হাঁটুর ওপরকার পট্টিগুলো আঙুল দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো। কালো মুখগুলোর মধ্যে চকচক ক'রে উঠলো চোখের জল—উপজাতির ক্ষতচিহ্নগুলো আর মুখের অসংখ্য বলিরেখার ভাঁজে-ভাঁজে তা আটকে রইলো। সকলেরই মুখে শুধু:

'কইতা! কইতা! কইতা!'

'যাঁরা,' কম্পিত স্বরে অবশেষে বুড়ো মোড়ল বললে, 'যাঁরা আমাদের গাঁয়ে আজ আবার তোমার পায়ের চিহ্ন নিয়ে এসেছেন, তাঁরা সদাশয় ও ভালো মানুষ।'

সত্যি বলতে ভৃগুবার অন্য দিনগুলোর চাইতে এই দিনটা ছিলো আলাদা। এটা ছিলো কোতেবা বা পরীক্ষার দিন।

আবার মাদল তার বোল শুরু ক'রে দিলো, আর তাকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে বেজে উঠলো বাঁশির শিস। গণ্ডির ভেতরটায় ছিলো নারী পুরুষ আর শিশুরা, আর খোলা-বুক তরুণেরা, প্রত্যেকের হাতেই একটা ক'রে বালাজান গাছের ডাল—চাঁছা, পরিষ্কার, আর চাবুকের মতো নমনীয়, আর তারা ঘুরে-ঘুরে নাচছিলো টমটমের তালে-তালে। সেই আন্দোলিত গণ্ডির ঠিক মাঝখানে, হাঁটু মুড়ে আর মাটিতে কনুই ঠেকিয়ে গুঁড়ি মেরে ব'সে, বংশীবাদক ফুঁ দিয়ে চলেছে তিনটি স্বরে—সব সময়েই একই তিনটি স্বর। মাঝে-মাঝে কোনো তরুণ এসে দাঁড়ায় তার ওপর, পা দুটি ফাঁক করা, ক্রুশের ভঙ্গিতে হাত দুটি ছড়ানো, —আর অন্যরা তখন, তার কাছ দিয়ে যেতে-যেতে, শপাং ক'রে আছড়ায় তাদের চাবুক। চাবুকের ঘা এসে পড়ে তার বুকে, ডোরা কেটে যায় বুড়ো আঙুলের মতো চওড়া, মাঝে-মাঝে চামড়া ফাটিয়ে দেয়। বাঁশির তীক্ষ্ণ সুর তখন চ'ড়ে যায় আরেক পর্দা, টমটমের বোল হ'য়ে আসে আরো-নরম, আর চাবুক শিস দেয়, রক্ত ঝরে পড়ে। কালো-বাদামি গায়ে আগুনের আলো চকচক ক'রে ওঠে আর অঙ্গার থেকে আলো লাফিয়ে-লাফিয়ে ওঠে তালগাছের ডগা অব্দি —সন্ধ্যের হাওয়ায় আস্তে মর্মর তুলে। কোতেবা! সহ্যশক্তির পরীক্ষা, যন্ত্রণার বোধ অবলুপ্ত ক'রে দেবার পরীক্ষা। যে শিশু কোনো আঘাতের যন্ত্রণায় কেঁদে ওঠে, সে নিছকই শিশু : যে শিশু যন্ত্রণার চোটে আর্তনাদ ক'রে ওঠে সে কখনো সত্যিকার পুরুষ হ'য়ে উঠবে না।

কোতেবা! তার মানেই নিজের পিঠ বাড়িয়ে দেয়া, আঘাত গ্রহণ করা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্য কাউকে সেই আঘাত দেয়া। কোতেবা!

'এ-সব…এ-সব এখনও জংলিদের রীতি দেখছি যে!'

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, মাদলের পাশে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সার্জেন্ট কইতা।

জংলিদের রীতি? এই পরীক্ষা, যা কিনা অন্য সব কিছু বাদ দিলেও এমন মানুষ গ'ড়ে দেয় যে শক্ত, কঠিন, সমর্থ! কী সেই কষ্ট যা এইসব যুবকের

পূর্বপুরুষদের একদিন ক্ষমতা দিয়েছিলো মাথায় প্রকাণ্ড বোঝা চাপিয়ে দিনের পর দিন না থেমে চলতে? কী সেই বস্তু, যা স্বয়ং থিমেখো কইতা এবং তারই মতো অন্য অনেক পুরুষ সৃষ্টি করেছে—যারা যুদ্ধ করেছে, এমন-সব আকাশের তলায় যেখানে সূর্য নিজেই অনেক সময়ে ছিলো বিবর্ণ ও পাণ্ডুর, যারা পিঠের ওপর প্রকাণ্ড বোঝা চাপিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে দিনের পর দিন, সহ্য করেছে ঠাণ্ডা, পিপাসা, ক্ষুধা?

জংলিদের রীতি? হয়তো-বা। কিন্তু আমি ভাবছিলাম যে অন্যখানে, যেমন আমি নিজে যেখান থেকে এসেছি, আমরা এইসব দীক্ষার অনুষ্ঠান পিছে ফেলে এসেছি। আমাদের কিশোরদের জন্য আর নেই সেইসব 'পুরুষ ভবন', যেখানে শরীর মন আর চরিত্র ইস্পাতের মতো পিটিয়ে গড়া হয়; যেখানে উপুড় পিঠে বা বাড়ানো আঙুলে ঘা দিয়ে শেখানো হ'তো পাসিন, হেঁয়ালি আর যত কঠিন জিজ্ঞাসা; অথবা যেখানে শেখানো হ'তো 'কাসাক', যুগযুগান্তরের পুরোনো সেই গানগুলো যা ছিলো স্মরণশক্তির ব্যায়াম, যার বাণী আর প্রজ্ঞা আমাদের ওপর বর্ষিত হ'তো অন্ধকার সব রাত্রি থেকে, আমাদের মাথায় যাকে সুনিশ্চিত স্থান দেবার জন্য জলন্ত কয়লার তাপ দেয়া হ'তো, আমাদের হাতের চেটো যাতে পুড়ে যেতো। আমি ভাবছিলাম আমি অন্তত যদ্দুর বুঝতে পারি তাতে আমরা অর্জন করিনি কিছুই, যে হয়তো আমরা এইসব পুরোনো রীতিনীতি ছেড়ে এসেছি নতুন কোনো প্রথা অর্জন ক'রে নেবার আগেই।

বাঁশির সেই তীব্র চেরা শব্দকে লালন ক'রে ক'রে টমটমের মর্মর চলতে লাগলো। আগুনরা ম'রে গেলো, জন্মালো আবার। যে কুঁড়ে বাড়িটায় আমার থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, আমি সেখানে চ'লে গেলাম। ভেতরে, ছেঁড়াখোঁড়া পচা খড়ের শুকনো কাদামাটির তাল মাখিয়ে কুঁড়েকে যে-বৃষ্টিনিরোধ করা হয়েছিলো সেই বানকোর পুরু ভারি গন্ধের সঙ্গে মাখামাখি হ'য়ে ঝুলে ছিলো সূক্ষ্মতর আরো একটি গন্ধ, মৃতের গন্ধ, যার সংখ্যা তিন, বোঝা যাচ্ছিলো দেয়ালের গায়ে কোনো মানুষ সমান উঁচুতে তিনটি জন্তুর শিং দেখে। কারণ, ডুগুবায় এমনকি গোরস্থানও অদৃশ্য হ'য়ে গেছে, আর মৃতেরা জীবিতের সঙ্গেই বেঁচে আছে। তাদের কবর দেয়া হয় কুঁড়ের মধ্যেই।

যখন আমি বিদায় নিলাম রোদ তখন বেশ চ'ড়ে গিয়েছে, কিন্তু ডুগুবা তখনও ঘুমিয়ে আছে নেশাচ্ছন্ন-অবসাদ, আর কালাবাশে-কালাবাশে যে

জোয়ারের মদ হাত থেকে মুখে আর মুখ থেকে হাতে ঘুরেছে সারা রাত ধ'রে, তার ফলেই।

'বিদায়,' বলেছিলো কইতা, 'পরের বার আপনি যখন এখানে আসবেন দেখবেন যে পাকা রাস্তা হ'য়ে গেছে—কথা দিচ্ছি।'

বিভিন্ন বিভাগে এবং অন্য নানা অঞ্চলে কাজে ব্যস্ত থাকায় পরের বছরের আগে আমি আর ডুগুবা যেতেই পারিনি।

বেলা প'ড়ে এসেছে, পথের ধকলও বিস্তর ছিলো। হাওয়া কেমন যেন পুরু আর ভারি হ'য়ে ঝুলে ছিলো, গরম আর চটচটে, তার ফলে আমাদের দারুণ কষ্ট ক'রে এগুতে হয়েছিলো।

সার্জেন্ট কইতা তার কথা রেখেছে: একেবারে ডুগুবা অব্দি পুরো রাস্তা ছিলো শানবাঁধানো। সব গাঁয়েই যেমন হয়, গাড়ির শব্দ শুনেই পালে-পালে ন্যাংটো ছেলেমেয়ে এসে রাস্তার ধারে ভিড় জমালো, তাদের ছোট্ট শরীরগুলো ধুলোয় ধূসর, আর তাদের পায়ে-পায়েই এলো লালচে-খয়েরি কুকুরের পাল, কান ছাঁটা, হাড়-জিরজিরে। ছেলেমেয়েদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কে-একজন বয়স্ক লোক হাত-পা নেড়ে কী যেন বলছে, তার ডান মণিবন্ধে বাঁধা একটা গরুর ল্যাজ নাড়াচ্ছে। গাড়ি থামতেই আমি দেখতে পেলাম এ আর কেউ নয়, স্বয়ং সার্জেন্ট, থিমেথো কইতা। তার পরনে একটা রংজ্বলা ছেঁড়াখোঁড়া কুর্তা, তার না-আছে কোনো বোতাম, না-আছে কোনো রশি। নিচে একটা 'বুবু' পরা, আর পাৎলুনটা তৈরি খাকি রঙের সুতি কাপড়ের ফালিতে, যেমন এককালে পরতো গাঁওবুড়োরা। হাঁটুর ওপরেই শেষ হয়েছে তার পাৎলুন, রশি দিয়ে বাঁধা ব'লেই খুলে প'ড়ে যাচ্ছে না। তার পট্টিগুলো শতচ্ছিন্ন। খালি পা, মাথায় 'কেপি'।

'কইতা!'

ছেলেমেয়েগুলো ছিটকে পড়লো চড়ুই পাখির ঝাঁকের মতো, আর সেই-রকমই কিচিরমিচির তুললো:

'না! না!'

থিমেথো কইতা আমার হাত ধ'রে ঝাঁকালো না। সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু আমি যেন তার চোখেই পড়ছি না। তার দৃষ্টি এতই সুদূর প্রসারিত যে ফিরে তাকিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম আমাকে ছাড়িয়ে

গিয়ে তার দৃষ্টি কোথায় নিবদ্ধ। হঠাৎ তার মণিবন্ধের গরুর ল্যাজটি নেড়ে কেমন অদ্ভুত কর্কশ গলায় সে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো :

শোনো সব বস্তুদের কান পেতে
প্রাণীদের যত শোনো
তার চেয়ে আরো বেশি শোনো যত বস্তুর সহজ কণ্ঠস্বর
শোনো অগ্নি শোনো জল শোনো-শোনো বাতাস কিভাবে
ঝোপের ভিতরে ফ্যালে দীর্ঘশ্বাস
এ তোমারই পূর্বজাত পুরুষের শ্বাসক্রিয়া, এটা মনে রেখো।

'ও পাগল,' বললে আমার ড্রাইভার, আর তাকে আমি ইঙ্গিতে চুপ করিয়ে দিলাম। সার্জেন্ট তখনও মন্ত্রের মতো গান গেয়ে চলেছে, কেমন অদ্ভুত, টানা-টানা গলায় :

যারা মৃত তারা কেউ কখনোই পুরোপুরি হয়নি উধাও
যে-তিমির ধীরে-ধীরে আলো হয়
তারা সব র'য়ে গেছে সেই অন্ধকারে
এবং রয়েছে তারা সেই গূঢ় তমিস্রাতে
গাঢ় থেকে গাঢ়তর হ'য়ে আসে ক্রমে-ক্রমে
যে-দীর্ঘ তিমির
মৃতেরা কখনো নেই মাটির ভিতরে মাটি চাপা
তারা সব র'য়ে গেছে গাছপালাপাতার শিহরে
বনের কাতর ক্ষীণ আর্তনাদে
যে-জল প্রবলবেগে দূরে ছুটে যায়
যে-জল ঘুমিয়ে থাকে নিরিবিলি একা
সেইসব জলে
তারা আছে কুটিরে, বাড়িতে, যত ভিড়ের ভিতরে।

মৃতেরা মোটেই নয় মৃত।
প্রাণীদের যত শোনো
তার চেয়ে আরো বেশি শোনো যত বস্তুর সহজ কণ্ঠস্বর

শোনো অগ্নি শোনো জল শোনো-শোনো বাতাস কিভাবে
ঝোপের ভিতরে ফ্যালে দীর্ঘশ্বাস
এ তোমারই পূর্বজাত পুরুষের শ্বাসক্রিয়া, এটা মনে রেখো
সে-পূর্বপুরুষ যারা কোনোদিনও হয়নি উধাও
যারা নেই মাটির ভিতরে মাটিচাপা
যারা কেউ সত্যি-সত্যি কখনো মরে না।

যারা ম'রে গেছে তারা পুরোপুরি হয়নি উধাও
তারা সব র'য়ে গেছে মাতৃস্তন্যে শিশুর ক্রন্দনে
আর যত অগ্নিময় কাঠে আর উষর শিলায়
বিলাপে আতুর যত তৃণের ভিতর
তারা আছে বনে-বনে তারা আছে সকলেরই ঘরে
মৃতেরা মোটেই নয় মৃত।

আগুন কেমন ক'রে কথা বলে কান পেতে শোনো
শোনো জল কোন্ কথা কয়
ফুলে-ফুলে কেঁদে ওঠে ঝোপ, তাকে বাতাস কী কথা বলে—
এ তোমারই পূর্বজাত পুরুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস।

প্রাচীন বন্ধন তারা প্রতিদিন আবার নতুন ক'রে বাঁধে
আদিম সে-রাখী যেটা দৃঢ় ধ'রে রাখে সকলেরে
আমাদের ভাগ্য বাঁধে তাদের বিধির দীর্ঘ ডোরে
আমাদের চেয়ে ঢের বলশালী আত্মাদের আকাঙ্ক্ষার সাথে
জীবনের সাথে বাঁধে আমাদের সকলেরে সংহিতা যাদের
যাদের কর্তৃত্ব দৃঢ় বেঁধে রাখে যত গূঢ় আকাঙ্ক্ষার সাথে
তারই তো আকাঙ্ক্ষা সব, মৃতের আত্মার,
যে বয় নদীর খাতে তীরের চঞ্চল কোলাহলে
পূর্বজাত পুরুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস
শিলায়-শিলায় কাঁদে ব্যাকুল কেবল কাঁদে তৃণের ভিতরে

যে-তিমির আলো হ'য়ে আসে

যে-তমিস্রা আরো গাঢ় হয়

সেইখানে মৃতের আবাস

শিহরণশীল গাছে মর্মরস্ফুরিত বনে-বনে

উচ্ছল চঞ্চল জলে সুপ্তিমগ্ন অলস সলিলে

মৃতেরা অনেক বলী আমরা ততটা বলী নই

যে-মৃতেরা বাস্তবিক কখনো মরেনি

যে-মৃতেরা পুরোপুরি হয়নি উধাও কোনোদিন

যে-মৃতেরা আর নেই পৃথিবীতে মাটির ভিতরে

সেইসব মৃতের নিশ্বাস।

শোনো সব বস্তুদের কান পেতে

প্রাণীদের যত শোনো

তার চেয়ে আরো বেশি শোনো যত বস্তুর সহজ কণ্ঠস্বর…

ছেলেমেয়ের পাল ফিরে এলো, ঘিরে দাঁড়ালো বুড়ো মোড়ল আর অন্য-সব গাঁওবুড়োদের। সম্ভাষণ বিনিময়ের পর আমি জিগ্যেস করলাম সার্জেন্ট কইতার ব্যাপারটা কী।

'না! না!' বললে বুড়োরা। 'না! না!' প্রতিধ্বনি করলো বাচ্চারা।

'না, না, কইতা নয়!' বুড়ো মোড়ল বললে, 'সারজান, শুধু সারজান![1] আমরা যেন মৃতদের কিছুতেই না-রাগাই। সারজান এখন আর মোটেই কইতা নয়। মৃতেরা, আত্মারা তাকে তার অপরাধের যেন সাজা দিয়েছেন।'

শাস্তি শুরু হয়েছিলো সে সেখানে পৌঁছুবার পরদিন থেকেই, ঠিক যেদিন আমি ডুগুবা থেকে বিদায় নিই।

সার্জেন্ট কইতা নিরাপদে সুস্থ শরীরে ঘরে ফিরে এসেছে ব'লে তার বাবা একটা শাদা মুরগি উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন পূর্বপুরুষদের—কইতা তাতে বাধা দেয়, বলে যে, সে যে বাড়ি ফিরে এসেছে, তা নেহাৎ বাধ্য হ'য়েই, তা না-ক'রে যেহেতু কোনো উপায় ছিলো না। এবং এর সঙ্গে তার পূর্বপুরুষদের কোনোই সম্পর্ক নেই।

১। সারজান হ'লো সার্জেন্ট কথাটিরই সেনোগালি সংস্করণ।

'মৃতদের নিয়ে আবার টানাটানি কেন,' সে বলেছিলো, 'তারা যেমন আছে তেমনি থাক। যারা বেঁচে আছে, তাদের মঙ্গল-অমঙ্গল কিছুই করার কোনো ক্ষমতা তাদের আর নেই।'

বুড়ো মোড়ল সে-কথায় কোনো পাত্তা দেয়নি—মুরগিটাকে যথারীতি উৎসর্গ করাই হয়েছিলো।

যখন ক্ষেতে কাজ করতে যাবার সময় এলো, থিমেথো বলেছিলো একজোড়া কালো মুরগিগুলো জবাই ক'রে তাদের রক্ত ক্ষেতের কোণায় ফেলবার রীতিটা কেবল যে অর্থহীন তা-ই নয়, রীতিমতো বোকামি। কাজ করাই তো, সে বলেছিলো, যথেষ্ট। বৃষ্টি যদি পড়বার হয় তো এমনিতেই পড়বে। জোয়ার, ভুট্টা, চিনেবাদাম, ইয়াম,' বীন—নিজে-নিজেই গজাবে, এবং খুবই ভালো ফসল হবে যদি গাঁয়ের লোকে স্থানীয় শাসনকর্তার পাঠানো জোয়াল ইত্যাদি ব্যবহার করে। দাসিরি গাছ পুণ্যতরু, গাঁয়ের আর ফসলের রক্ষাকর্তা, তার গোড়ায় কুকুর কেটে উৎসর্গ করা হয়;—কইতা সেটাকে কেটে ফেলে তার ডালপালাগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিলো।

ছোটো ছেলেমেয়েদের যেদিন সুন্নৎ করার কথা, সার্জেন্ট কইতা একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো গানগুরাং অর্থাৎ তাদের গুরুর ওপর—সে তখন নেচে-নেচে মন্ত্র আওড়াচ্ছিলো। গানগুরাং তার মাথায় শজারুর কাঁটার যে শিরো-ভূষণ পরেছিলো, আর শরীর ঢাকবার জন্য জাল-জাল পোশাক প'রেছিলো, তা সে টেনে খুলে দেয়। পূজ্যপাদ পিতামহ মামা দিজোম্বা গাঁয়ের তরুণীদের দীক্ষা দিতেন, কইতা তার মাথা থেকে গ্রি-গ্রি মন্ত্র আর ফিতে ঝোলানো শঙ্খের মতো হলদে টুপিটা ছিনিয়ে নিয়েছিলো। এ-সব নাকি, সে বলেছিলো, জংলিদের রীতি'। অথচ সে কিনা গেছে নীস্, দেখেছে মজার আর ভয়ের মুখোশ পরা কার্নিভাল। শাদারা বা তুবাবরা—এটা সত্যি যে—মুখোশ পরে মজা করবার জন্য—তাদের ছেলেমেয়েদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞানবিজ্ঞানে দীক্ষা দেবার জন্য নয়।

তাদের কুঁড়েতে ঝোলানো ছোট্ট ঝোলাটা—যার মধ্যে নিয়ানকোলি থাকে, কইতাদের বাস্তুদেবতা—টেনে, খুলে, উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সার্জেন্ট কইতা, আর রোগাপটকা কুকুরগুলো আরেকটু হ'লেই বাচ্চাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতোই হয়তো যদি না সময়মতো বুড়ো মোড়ল সেখানে গিয়ে পড়তো।

একদিন সকালে সে গিয়েছিলো পুজোর বনে, গিয়ে জোয়ার সেদ্ধ আর দইয়ের

বাতিগুলো ভেঙে দিয়ে এসেছিলো। ছোটো-ছোটো মূর্তিগুলো ঠেলে সরিয়ে ঢুকেছিলো সে, ফু-কলা বল্লমগুলো টেনে তুলেছিলো, ফলাগুলো সব রক্তের ভেলা আর মুরগির পালকে মাখামাখি হ'য়ে ছিলো। 'জংলিদের সব রীতি,', সে বলেছিলো এদের। সার্জেন্ট এদিকে অথচ গির্জেয় গেছে। সেখানে সাধু সন্তদের ছোটো-ছোটো মূর্তি দেখেছে নিজের চোখে, দেখেছে দিব্য কুমারীকে, যার সামনে লোকে মোমবাতি জ্বালায়। এটা সত্যি যে এ-সব মূর্তি ঝলমলে সব রঙে রাঙানো, নীল, লাল, হলদে আর গায়ে সোনার কাজ করা। সত্যি যে পুজোয় বনের কালিসেন্দ্রা বা মেহগিনি কাঠে তৈরি লম্বা হাত খাটো পা-ওলা সব পিগমি মূর্তির চেয়েও সেগুলো ঢের সুন্দর।

'তুমি তো তাদের একটু "সভ্য" ক'রে তুলতে পারবে,' বলেছিলেন স্থানীয় শাসনকর্তা। সার্জেন্ট কইতা অতএব তার দেশের লোকদের "সভ্য" ক'রে তুলবেই। অতএব, ভেঙে ফেলতে হবে ঐতিহ্য, খতম ক'রে দিতে হ'বে সেইসব বিশ্বাস যার ওপর ভর দিয়ে চিরকাল দাঁড়িয়ে আছে গাঁয়ের জীবন-যাত্রা, পরিবারের অস্তিত্ব, লোকজনের আচার-ব্যবহার। কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ চাই। জংলিদের যত রীতি! জংলিদের রীতিনীতি! সুন্নৎ করার সময় যে রূঢ় কঠোর আঘাত করা হয় শিশুদের তাদের চোখ খুলে দেবার জন্য, তাদের চরিত্র গ'ড়ে দেবার জন্য যে, কখনও, কস্মিন কালেও, কোনোখানেই, তাদের জীবদ্দশায় তারা একা থাকবে না—একা থাকতে পারবে না। জংলিদের যত রীতি, অর্থাৎ কোতেবা, যা গ'ড়ে তোলে সত্যি-মানুষ, যার ওপর যন্ত্রণার কোনো প্রভুত্ব খাটে না। জংলীদের রীতিনীতি…এই সব বলি আর উৎসর্জন, পূর্বপুরুষ আর মাটির উদ্দেশে অঞ্জলি দেয়া এই রক্ত‥যাযাবর সব আত্মা আর রক্ষাকর্তা, দেবতাদের উদ্দেশে নিবেদিত এই জোয়ার সেদ্ধ আর দই… জংলীদের যত রীতিনীতি!

এইসবই সার্জেন্ট কইতা পালাভার-গাছের ছায়ায় দাঁড়ানো গ্রামের সমবেত ছেলেবুড়োকে বলেছিলো—দৃঢ়স্বরে।

তখন প্রায় সূর্য ডোবার সময়, যখন সার্জেন্ট কইতা পাগল হ'য়ে গেলো। সে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো পালাভার-গাছে, মুখে কথার তোড়, কথা, কথা আর কথা, ওঝার বিরুদ্ধে নালিশ, যে কিনা সেদিনই সকালে বলি দিয়েছে কতকগুলো কুকুর, বুড়োদের বিরুদ্ধে নালিশ যারা কিনা তার কথা একবর্ণও

শুনতে চায় না, ছোটোদের বিরুদ্ধে নালিশ, যারা কিনা এখনও বুড়োদের কথায় কান দেয়। তখনও তার মুখে কথার খই ফুটছে, এমন সময় হঠাৎ সে অনুভব করলে তার বাম কাঁধে কী যেন বিঁধে গেলো। সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালে একবার, তারপর যখন সে তার শ্রোতাদের দিকে ফিরে তাকালে তখন তার চোখের দৃষ্টি আর আগের মতো নেই। তার ঠোঁটের কোণায় শাদা ফেনা। সে কথা বললে, আবারও, কিন্তু তার মুখ থেকে এবার কিন্তু একেবারে অন্য কথা বেরুলো। আত্মারা তার মনটিকে নিয়ে গিয়েছে, আর এখন সবাই আর্তনাদ ক'রে উঠলো আতঙ্কে :

কালো রাত! কালো রাত!

সে চেঁচিয়ে উঠলো রাত নামতেই, আর মেয়েরা ছোটোরা ভয়ে কাঁপলো তাদের কুঁড়ের মধ্যে :

কালো রাত! কালো রাত!

সে চেঁচিয়ে উঠলো উষার সময় :

কালো রাত! কালো রাত!

সে হাউ-হাউ ক'রে উঠলো ভর দুপুরে। রাত আর দিন, দিন আর রাত পূর্বপুরুষেরা, আত্মারা, দেবতারা তাকে দিয়ে কথা বলালো, কাঁদালো, জপালো, আর্তনাদ করালো…

তখন সকাল ফুটি-ফুটি, আমি কোনো রকমে একটুখানি ঢুলতে পারলাম সেই কুঁড়ের মধ্যে যেখানে মৃতেরা বেঁচে থাকে। সারারাত ধ'রে আমি শুনেছি সার্জেন্ট কইতার আসা-যাওয়া, তার হাউ-হাউ, তার কান্না, আর তার গান :

আঁধার জটিল বনে
অভিশপ্ত ঢাকের উপর
শুঁড়তোলা হাতির বৃংহিত,
কালো রাত! কালো রাত!

কালাবাশে দুধ ট'কে যায়

যত মণ্ড বোয়ামে জমাট
বিভীষিকা ওত পাতে কুঁড়ের ভিতরে,
কালো রাত ! কালো রাত !

মশাল ছড়িয়ে দেয় আকাশে হাওয়ায়
অশরীরী যত অগ্নিশিখা
তারপর, ধীরে, আসে ধূম্রপুঞ্জ রক্তচক্ষুহীন,
কালো রাত ! কালো রাত !

অস্থির আত্মারা সব
এলোমেলো কাৎরায় ঘোরে
অস্ফুট কেবল বলে শব্দ কোন্ হারানো ভাষার,
যে-সব হারানো শব্দ বিভীষিকা জাগায় হৃদয়ে,
কালো রাত ! কালো রাত !

হিমজমা মুরগির শরীর
কিংবা উষ্ণ চলন্ত শবের
একফোঁটা রক্তও ঝরে না
নয় কোনো কালো রক্ত কিংবা নয় টকটকে লোহিত,
কালো রাত ! কালো রাত !
অভিশপ্ত ঢাকের উপর
শুঁড়তোলা হাতির বৃংহিত,
কালো রাত ! কালো রাত !

অন্তহীন, নিষ্ফল, চঞ্চল
পরিত্যক্ত পাড় থেকে পাড়ে
মানুষের জন্য কোন নিদারুণ ভয়ে
অনাথ আতুর নদী ডেকে-ডেকে ঘুরে-ঘুরে বলে,
কালো রাত ! কালো রাত !

আর ঘন সাভানায় নিঃসঙ্গ একাকী
পূর্বজাত পুরুষের আত্মা যাকে ছেড়ে গেছে
শুঁড়তোলা হাতির বৃংহিত

অভিশপ্ত ঢাকের উপর,
কালো রাত! কালো রাত!

শঙ্কায় ব্যাকুল গাছে-গাছে
যত রস হিম জ'মে যায় ডালপালায় পাতায়
পূর্বজাত পুরুষেরা একদিন এসেছে এখানে
তাদের নিশ্চল পাদদেশে
অথচ এখন তারা বোবা সব
আর তারা জানে না প্রার্থনা,
কালো রাত! কালো রাত!

কুটিরে-কুটিরে ভয় গুড়ি মেরে ব'সে আছে ওই
ভয় আছে ধূমার্ত মশালে
ভয় আছে অনাথ নদীতে
ভয় আছে অবসন্ন আত্মাহীন বনের ভিতরে
ভয় আছে শঙ্কাতুর রংচটা গাছে

আঁধার জটিল বনে
অভিশপ্ত ঢাকের উপর
শুঁড়তোলা হাতির বৃংহিত,
কালো রাত! কালো রাত!

আর কারু সাহস হয় না তাকে তার নাম ধ'রে ডাকে, কারণ আত্মারা, দেবতারা, পূর্বপুরুষেরা তো তাকে পুরোপুরি অন্য এক নতুন মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন। থিমেথো কইতা গাঁয়ের লোকের কাছ থেকে চিরকালের মতো হারিয়ে গিয়েছে। তার বদলে র'য়ে গেছে শুধু 'সারজান,' পাগলা সারজান।

অনুবাদঃ স্বাতী ভট্টাচার্য ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সেম্বেন উসমান

উপজাতির ক্ষতচিহ্ন অথবা ভোল্‌তেইকরা

সন্ধ্যেবেলাগুলো আমরা যেতুম মেন্‌-এর ওখানে; সেখানে পুদিনা মেশানো চা খেতে-খেতে কত বিষয়ে কথা হ'তো আমাদের—যদিও অনেক বিষয়েই আমাদের জ্ঞান ছিলো সামান্য। কিন্তু ইদানীং আমরা বড়ো-বড়ো সমস্যা-গুলো এড়িয়ে যেতুম—যেমন বেলজিয়ান কঙ্গোর কথা, মালি যুক্তরাষ্ট্রের গণ্ডগোলের বিষয়, আলজেরিয়ার স্বাধীনতার লড়াই অথবা জাতিপুঞ্জের পরবর্তী অধিবেশনের কথা। তার কারণ ছিলো সেয়ার, বেশির ভাগ সময়েই যার মাথা থাকতো ঠাণ্ডা, আর যার স্বভাবটা ছিলো গম্ভীর। প্রশ্নটা সে-ই তুলেছিলো। 'আমাদের জাতের লোকের গায়ে ও-রকম জখমের দাগ থাকে কেন?'

(এখানে আমার যোগ করা উচিত যে সেয়ার ছিলো আধা-ভোল্‌তেইক, আধা—সেনেগালি; কিন্তু তার নিজের গায়ে কোনো জাতিগত ক্ষতচিহ্ন ছিলো না।)

আমাদের সকলের মুখে যদিও ও-রকম কোনো ঘায়ের দাগ ছিলো না, তবু আমি কখনো ও-রকম উত্তেজিত আলোচনা শুনিনি—শুনিনি ও-রকম অনর্গল কথা—অন্তত যদ্দিন ধ'রে আমরা মেন্‌-এর বাড়িতে আড্ডা দিতে যাচ্ছিলুম। আমাদের কথা শুনে যে-কারও মনে হ'তে পারতো যে গোটা আফ্রিকা মহাদেশের ভবিষ্যৎটাই বুঝি বিপন্ন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধ'রে রোজ সন্ধ্যেয় যত অদ্ভুত-অদ্ভুত আর অপ্রত্যাশিত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হ'তো। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ তো আশপাশের গাঁগুলোয়—এমনকি আরো দূরেও—চ'লে যেতো, গাঁওবুড়ো আর পুরুতদের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য—তাদেরই কিনা এ-অঞ্চলের 'জ্যান্ত বিশ্বকোষ' ব'লে ধরা হ'তো। তারা যেতো শুধু এই রহস্যটার গভীরে তলিয়ে দেখবার জন্য—কেননা এটা মনে হচ্ছিলো যে এই ক্ষতচিহ্নের ব্যাপারটা কোনো সুদূর অতীতে প্রোথিত হ'য়ে আছে।

সবগুলো ব্যাখ্যাই যে ভুল, এটা সেন্নার বুঝিয়ে দিতে পারলো।

কেউ-একজন তীব্রস্বরে বলেছিলো যে, 'এটা হ'লো বংশগরিমার চিহ্ন;' আরেকজন বলেছিলো, 'এটা দাসত্বের প্রতীক।' তৃতীয় আরেকজন ঘোষণা করেছিলো যে, 'এটা নিছকই একটা শোভার চিহ্ন—এককালে এমন-এক জাতি ছিলো যারা গায়ে-মুখে এই বিশেষ চিহ্নগুলো না-থাকলে কোনো ছেলেমেয়েকেই বিয়ে করতো না।' আরেকজন ভাঁড় গম্ভীর স্বরে বলেছিলো: 'একদা আফ্রিকায় কোনো ধনী সর্দার তার ছেলেকে ইওরোপে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছিলো। সর্দারের ছেলে যখন দেশ ছেড়ে চ'লে যায়, তখন সে ছিলো নেহাৎই ছেলেমানুষ—যখন ফিরে এলো, তখন সে প্রাপ্তবয়স্ক। তো আমরা বলতে পারি যে সে ছিলো শিক্ষিত—একজন বুদ্ধিজীবী। সে তার নিজের জাতের লোকদের আর সব প্রথা-পার্বণকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে দেখতো। এতে তার বাবা খুব বিরক্ত হ'য়ে পড়েন—কী ক'রে তাকে বংশমর্যাদা বিষয়ে অবহিত ক'রে ফিরিয়ে আনা যায়, এটাই তিনি ভাবতে থাকেন। তাঁর প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তিনি পরামর্শ করেন। আর শেষকালে, একদিন সকালে, গাঁয়ের বড়ো চত্বরটায় সকলের চোখের সামনে ছেলেটির মুখে ঐ কাটার দাগগুলো তৈরি ক'রে দেয়া হয়।'

কেউ তার গল্পটা বিশ্বাস করলো না ব'লে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বক্তা শেষটায় তার মতটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হ'লো।

আরেকজন কে বললে: 'আমি ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউটে গিয়ে বিস্তর বই ঘেঁটেছি, কিন্তু এ-ব্যাপারে কিছুই বার করতে পারিনি। তবে, এইটুকু জেনেছি যে যারা বড়ো-বড়ো চাকরি করে তাদের বৌরা তাদের মুখ থেকে এই দাগগুলো তুলে ফেলছে; তারা ইওরোপে গিয়ে ডাক্তারদের পরামর্শ নেয়। কারণ আফ্রিকার সৌন্দর্যবোধের নতুন বিধিগুলো দেশের সব পুরোনো ঐতিহ্যকে তাচ্ছিল্য করে; মেয়েরা সব মার্কিনমার্কা হ'য়ে আছে। নিউ-ইয়র্কের ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউয়ের কালা আদমীদের প্রভাব ছড়াচ্ছে এরা। আর এই ঝোঁকটা যত বাড়তে থাকবে, জাতির গায়ের এই ক্ষতচিহ্নগুলো ততই তাদের অর্থ আর গুরুত্ব হারিয়ে বসবে—এবং শেষে একদিন এ-সব চিহ্ন একেবারেই উধাও হ'য়ে যাবে।'

আমরা এই চিহ্নগুলোর বৈচিত্র্য নিয়েও অনেক আলোচনা করেছিলুম। এমনকি এক জাতের লোকের মধ্যেও যে কত রকম ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়।

সারা গায়ে যেমন কাটার দাগ, তেমনি আবার মুখেও। এই প্রসঙ্গে একজন জিগেস করলে: 'এই দাগগুলো যদি সত্যিই বংশগরিমার চিহ্ন হয়, অথবা উঁচু বংশ নিচু বংশের তফাৎ বোঝায়, তবে আমেরিকার দেশগুলোয় কেন কোনোদিন তাদের দেখা যায় না?'

'হুম্। এতক্ষণ শেষ অব্দি আমরা কোথাও একটা পৌঁছুচ্ছি!' সেয়ার চেঁচিয়ে উঠলো। সেয়ার—স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো যে—মূল প্রশ্নটার সঠিক উত্তর জানে, অন্তত তার ধারণা ছিলো যে সে জানে।

'তাহ'লে তুমিই আমাদের বলো,—' আমরা হার মানলুম, আমরা সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম।

'ঠিক আছে,' সেয়ার বললে। যতক্ষণ-না কাজের লোক গ্লাস ভর্তি গরম চা এনে পরিবেষণ করলো, সেয়ার চুপচাপ ব'সে রইলো। সারা ঘর পুদিনার গন্ধে ভ'রে উঠলো।

'তাহ'লে আমরা আমেরিকায় এসে পৌঁছেছি,' সেয়ার শুরু করলো। 'এখন, ক্রীতদাস প্রথা ও দাস ব্যবসায় সম্বন্ধে যে-সব লেখক ভালো কাজ করেছেন, আমি যদ্দূর জানি তারা কেউই কোনো দিন এই ক্ষতচিহ্নগুলোর কথা উল্লেখ করেননি। দক্ষিণ আমেরিকায়—যেখানে ক্রীতদাসদের ঝাড়ফুঁক তুকতাক জাদুবিদ্যা আজও বেঁচে আছে কোনোদিনই এই জাতীয় ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়নি। ক্যারিবিয়ানে যেসব কালো লোক আছে, তাদের মধ্যেও এটা নেই—নেই হাইতা, কিউবা বা ডমিনিকান রিপাবলিকে—অথবা অন্য কোথাও। তো, তাহ'লে আমরা ফিরে আসি দাস ব্যবসার আগেকার কালো আফ্রিকায়—সেই প্রাচীন ঘানা সাম্রাজ্য, মালি আর গাও সাম্রাজ্যের আমলে—হাউসা, বুরুনু, বেনিন, মসি ইত্যাদি নগর ও রাজত্বের সময়ে। এখন, ও-সব জায়গায় যারা ভ্রমণ করেছেন এবং ও-সব দেশ সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখেছেন, তাদের একজনও কিন্তু এই জাতীয় ক্ষতচিহ্নের প্রথার কথা উল্লেখ করেননি। তাহ'লে কোথায় এই প্রথার উদ্ভব হ'লো?'

ততক্ষণ সবাই গরম চায়ে চুমুক দেয়া বন্ধ করেছে; সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

আমরা যদি তন্ময়ভাবে দাসব্যবসার ইতিহাস পরীক্ষা করি, তাহ'লে দেখতে পাবো যে, ব্যবসায়ীরা সেই কালোদেরই সন্ধান করতো যারা শক্তসমর্থ, স্বাস্থ্যবান ও নিখুঁত গড়ন। অন্য অনেক তথ্যের মধ্যে এটাও দেখতে পাবো যে

এখানে আফ্রিকার বাজারে, এবং বিদেশের বন্দরে ক্রীতদাসদের তন্ন তন্ন ক'রে খুঁটিয়ে দেখা হ'তো, জন্তুর মতো তাদের ওজন নেয়া হ'তো, দাম ঠিক করা হ'তো। কোনো খুঁত বা ত্রুটি আছে, এমন পণ্য কেনবার ইচ্ছে, কারই ছিলো না—শুধু দাস ব্যবসায়ীর নিজের বসানো মোহরটা তারা মেনে নিতো; কিন্তু এই জন্তুর দেহে অন্য কোনো চিহ্নই সহ্য করা হ'তো না। কারণ তারপর ক্রীতদাসদের নিলামের জন্য প্রস্তুত করা হ'তো; তাকে ধুয়ে মুছে পালিশ ক'রে—তারা বলতো শাদা ক'রে—বাজারে ছাড়া হ'তো, যাতে তার দাম বাড়তো। তাই যদি হয়, তবে এই দাগগুলোর উৎপত্তি হ'লো কীভাবে?'

আমরা কোনো উত্তর খুঁজে পেলুম না। ওর ঐ ইতিহাসের জরিপ আমাদের কাছে রহস্যটাকে গভীরতর ক'রে তুলেছিলো।

'বলো, সেয়ার, তুমিই আমাদের বলো,' আমরা ব'লে উঠলুম, জাতীয় ক্ষতচিহ্নের উদ্ভব বিষয়ে তার কাহিনী শোনবার জন্য এখন আমরা আরো উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছি।

আর, এই কথাই সে আমাদের বলেছিলো:

দাসব্যবসার জাহাজ 'আফ্রিকান' বেশ ক-দিন ধ'রেই উপসাগরে নোঙরবন্দী হ'য়ে ছিলো—দাসদের যারা কেনে, সে-সব দেশের উদ্দেশে পাড়ি দেবার আগে সে চাচ্ছিলো তার পণ্যের ঠাস বোঝাই। এর মধ্যেই পঞ্চাশজন কালো লোক আর তিরিশজন নিগ্রো মেয়েকে জাহাজের খোলে পোরা হয়েছে। কাপ্তেনের দালালরা সারা দেশ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজছে পণ্যের সন্ধানে। সেদিন জাহাজে মাত্র কয়েকজন খালাসী হাজির ছিলো; কাপ্তেন আর জাহাজের ডাক্তারের সঙ্গে তারা সবাই ডাক্তারের কামরায় ব'সে। তাদের কথাবার্তার আওয়াজ এমনকি ডেক থেকেও শোনা যাচ্ছে।

আমু নুয়ে প'ড়ে একবার তার অনুগামীদের দিকে তাকালে। বলিষ্ঠ সে, তেজস্বী পুরুষ, তার গায়ের পেশীগুলো ঢেউয়ের মতো নেচে উঠছে। যে-কোনো রকম কায়িক শ্রমের পক্ষেই সে উপযুক্ত। একহাতে তার কুঠারটা শক্ত ক'রে ধ'রে, অন্য হাতটা তার লম্বা বাঁকানো তলোয়ারে বুলিয়ে নিয়ে, সে খুব সন্তর্পণে সামনের দিকে এগুলো। আরো কয়েকজন সশস্ত্র লোক আলতো ভাবে ডিঙিয়ে এলো রেলিঙ, একের পর এক। মোমুতু, তাদের

দলপতি, প'রে আছে এক চওড়া পাড়ওলা টুপি, লাল আঁচল লাগানো একটা নীল উর্দি, আর উঁচু কালো বুটজুতো। সে তার বন্দুক তুলে ইশারা করলো ডেকের চারপাশ ঘিরে ফেলবার জন্য। হঠাৎ কোত্থেকে এসে হাজির হয়েছিলো জাহাজের পিপেনির্মাতা, সে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে পালাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু যে কালো লোকরা তখনও শালতিতে ব'সে অপেক্ষা করছিলো তাকে চেপে ধ'রে বর্শা দিয়ে খুন করলো।

'আফ্রিকান'-এর ওপরে তখন লড়াই বেধে গিয়েছে। খালাসীদের একজন আক্রমণকারীদের কাছে আসতে চেষ্টা করেছিলো—তাকে পেড়ে ফেলা হ'লো। কাপ্তেন আর বাকি সবাই ডাক্তারের কামরায় দরজা বন্ধ ক'রে লুকিয়ে রইলো। মোমুতু আর তার দলের লোকরা—তারা বন্দুক আর তলোয়ারে সশস্ত্র—কামরাটা দখল করতে চেষ্টা করলো—মাঝে-মাঝেই তারা গুলি ছুঁড়ছে। এদিকে জাহাজে তখন লুটপাট শুরু হ'য়ে গেছে! গুলির আওয়াজ হ'তেই আক্রমণকারীদের সংখ্যা আরো বেড়ে গেছে, শালতিগুলো তীর ছেড়ে 'আফ্রিকান'-এর পাশে ভেসে এলো, আর মালবোঝাই ক'রে ফিরে গেলো।

মোমুতু তার প্রধান অনুচরদের কাছে ডাকলো: চারজন জোয়ান পুরুষ, আপাদমস্তক সশস্ত্র। 'বন্দীদের মুক্ত করে দাও—খোল থেকে বের করতে শুরু করে দাও।'

'ওর ব্যাপারে কী হবে?' তার সহকারী জিগ্যেস করলে—আমুর দিকে ইঙ্গিত ক'রে। আমু খোলের ঘুলঘুলিটার পাশে দাঁড়িয়েছিলো।

'ওর ব্যাপার পরে দেখা যাবে,' মোমুতু উত্তর দিলে। 'ও ওর মেয়েকে খুঁজছে। খোলটা খুলে দাও—আর স্থানীয় লোকদের হাতে কোনো হাতিয়ার দিয়ো না। সব্বাইকে নিয়ে যাও।'

বারুদ আর ঘামের গন্ধে বাতাস ভারি হ'য়ে আছে। আমু এর মধ্যেই ঘুলঘুলির ঢাকায় গায়ের জোরে ঘা মারতে শুরু করেছিলো—শেষটায় কুঠার আর মুগুর দিয়ে ঢাকাটা ভাঙা হ'লো।

বিকট গন্ধে-ভরা খোলের মধ্যে লোকেরা শুয়ে আছে—তাদের পায়ে বেড়ি। গুলির শব্দ শুনেই তারা চ্যাচাতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো—খানিকটা আনন্দে, খানিকটা ভয়ে। দুই ডেকের মাঝখানের চিলতে জায়গাটায় ছিলো মেয়েবন্দীরা—যেখান থেকে আসছিলো আতঙ্কের রোল। এই বিষম কোলাহলের মধ্যেও আমু তার মেয়ের গলা শুনতে পাচ্ছিলো। তার পা থেকে

দরদর ক'রে ঘাম ঝরছে—তবু সে গায়ের জোরে কাঠের খোলটা কুঠারে দিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেললে।

'ও ভাই, এই-যে!' কে-একজন চেঁচিয়ে বললে। 'মেয়েকে দেখবার জন্য তোমার খুব তাড়া বুঝি?'

'হ্যাঁ,' আমু বললে—তার অধীর চোখ দুটি চকচক করছে। কয়েক ঘণ্টার কঠোর পরিশ্রমের পর পুরো খোলটা খোলা গেলো। মোমুতুর লোকেরা বন্দীদের ওপরে এনে পাটাতনের ওপর সার ক'রে দাঁড় করিয়ে দিলো। ডেকের ওপর তখন জাহাজের সব মাল এনে জড়ো করা হয়েছে—এ-সব মাল দিয়ে তারা বিনিময় ব্যবসা চালায়: মদের পিপে, বাক্স-বাক্স ছুরি, পেটি ভর্তি কাচের জিনিস, রেশমি কাপড়, রঙ-বেরঙের শৌখিন ছাতা, আর কাপড়ের থান। আমু, ততক্ষণে তার মেয়ে ইওনেকে খুঁজে পেয়েছে—দুজনেই অন্যদের থেকে একটু সরে আলাদা হ'য়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। আমু খুব ভালো ক'রেই জানতো যে মোমুতু এই বন্দীদের উদ্ধার করেছে শুধু তাদের আবার বিক্রি করবার জন্যে। 'আফ্রিকান'-এর কাপ্তেনকে আরো ক্রীতদাসের লোভ দেখিয়ে সে-ই এই উপসাগরে নিয়ে এসেছিলো।

'এবার আমরা তীরে যাবো', মোমুতু জানালো। 'আগেই তোমাদের সাবধান ক'রে দিচ্ছি—তোমরা সবাই আমার বন্দী। যদি কেউ পালাবার বা আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করে, আমি কিন্তু তার পাশের লোকটাকে কুচি-কুচি ক'রে কাটবো।'

দিগন্তের দিকে সূর্য ডুবছিলো তখন, উপসাগরটি যেন জলের একটি ঝিকিমিকি রুপোলি চাদর, তীরের ওপর গাছের সার কালো হ'য়ে দাঁড়িয়ে। মোমুতুর লোকজনেরা লুঠের মাল শালতিতে উঠিয়ে তীরে নিয়ে যেতে শুরু করলো। মোমুতু—তাদের অবিসংবাদিত নেতা—সব কাজ পরিচালনা করছে, হুকুম দিচ্ছে। তার দলের কয়েকজন তখনও ডাক্তারের সামনের কামরায় পাহারা দিচ্ছে; তারা যে দরজার বাইরেই মোতায়েন আছে, তার জানান দিতে কয়েক মিনিট পরে-পরেই তারা দরজা লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়ছে। জাহাজ যখন বিলকুল সাফ, মোমুতু তখন দু-পিপে বারুদের গায়ে লাগানো একটা বড়ো সলতেয় আগুন ধরিয়ে দিলো। সব চুপচাপ হ'য়ে গেছে দেখে কাপ্তেন ওপরে উঠতে শুরু করেছিলো; যেই সে ডেকে এসে পৌঁছুলো, বন্দুকের একটা গুলি সরাসরি তার বুকে এসে লাগলো। শেষ শালতিগুলো ততক্ষণে

জাহাজের কাছ থেকে স'রে গিয়েছে, তারা যখন তীরের দিকে অর্ধেক পথ গেছে, তখনই শুরু হ'লো পর-পর বিস্ফোরণ ; তার পরেই প্রচণ্ড আওয়াজ ক'রে 'আফ্রিকান' উড়ে গেলো—আর নিচে তলিয়ে গেলো।

সবকিছু যতক্ষণে তীরে নামানো হ'লো, ততক্ষণে বেশ অন্ধকার হ'য়ে গেছে। জানোয়ারের পালের মতো বন্দীদের এক জায়গায় জড়ো করা হ'লো, তাদের ওপর নজর রাখবার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করা হ'লো—যদিও বন্দীদের হাতে-পায়ে তখনও বাঁধন পরানো। সারা রাত ধ'রে তাদের কান্নাকাটি ও চুপিচুপি কথা বলার আওয়াজ শোনা গেলো—আর মাঝে-মাঝেই চাবুকের তীক্ষ্ণ শপাং। খানিকটা দূরে মোমুতু আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গ লুঠের মালের হিসেব কষছে—আর লাভের পরিমাণ দেখে ফুর্তির চোটে তারাজ্বলা আকাশের তলায় ব'সে-ব'সে অনবরত মদ খাচ্ছে।

আসরে যোগ দেবার জন্য আমুকে ডেকে পাঠালো মোমুতু।

'কী ? তুমি আমাদের সঙ্গে একটু মদ খাবে, কেমন ?' পিঠে তার ঘুমন্ত মেয়েকে নিয়ে আমু যখন এলো (তাদের দেখাচ্ছিলো আবছা ছায়ার মতো), মোমুতু তাকে বললে।

'আমার এক্ষুনি যাওয়া উচিত। অনেকটা পথ, তাছাড়া উপকূল এখন আর মোটেই নিরাপদ নেই। আমি তো পাক্কা ছ-মাস ধ'রে তোমার জন্য কাজ করছি,' মদের গেলাস প্রত্যাখ্যান ক'রে আমু বললে।

'এটা কি সত্যি যে দাসব্যবসাদারদের হাতে তুলে দিতে চাওনি ব'লে তুমি তোমার বৌকে খুন করেছিলে ?' ভকভক ক'রে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে গা দিয়ে—মোমুতুর এক স্যাঙাত তাকে জিগেস করলে।

'হ্যাঁ।'

'আর তোমার মেয়েকে বাঁচাবার জন্যে তুমি একাধিকবার নিজের জীবন বিপন্ন করেছো—এও কি সত্যি ?'

'ও আমার মেয়ে। আমাদের পরিবারের সবাই একে-একে কী ক'রে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি হ'লো আর অজানার দিকে চ'লে গেলো—এতকাল আমি তা শুধু তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখেছি। আমি বড়ো হয়েছি ভয় আর বিভীষিকার মধ্যে, জাতভাইদের সঙ্গে অনবরত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালিয়ে বেড়িয়েছি—শুধু ক্রীতদাস হ'তে চাইনা ব'লে। আমাদের জাতে কোনো দাস নেই, আমরা সবাই সমান।'

'তার কারণ তোমরা উপকূলে থাকো না,' কে একজন টিপ্পনী কাটলো আর তা শুনে মোমুতু অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। 'আরে, এসো-এসো, একটু মদ খাও! তুমি দারুণ যোদ্ধা। কী ক'রে ঐ খালাসীটাকে তুমি কেটে ফেললে তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। তুমি তো কুঠার বেশ ভালোই চালাও।'

'আমার সঙ্গে থেকে যাও। তুমি শক্ত মানুষ, তুমি জানো তুমি কী চাও,' মোমুতু তার দিকে একটা মদের বাটি বাড়িয়ে দিলো। আমু তবু সবিনয়ে মদ খেতে অস্বীকার করলে। 'এটা আমাদের কাজ,' মোমুতু ব'লে চললো, 'আমরা তৃণভূমি তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজি, লোকজনদের বন্দী ক'রে নিই আর শাদাদের কাছে বিক্রি ক'রে দিই। কয়েকজন কাপ্তেন আমায় ভালোই চেনে, কিন্তু অন্যদের আমি লোভ দেখিয়ে উপসাগরে নিয়ে আসি—আর আমার লোকজনেরা খালাসীদের ভুলিয়ে ভালিয়ে জাহাজ থেকে নামিয়ে আনে। তারপর আমরা জাহাজটা লুঠ করি, বন্দীদের ফিরিয়ে আনি। জাহাজে কোনো শাদা লোক থাকলে তাকে খতম করি। দারুণ সোজা কাজ, আর সব দিক থেকেই আমাদের জিত। আমি তো তোমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিয়েছি। চমৎকার মেয়ে তোমার—বেশ কয়েক তাল লোহা ওর দাম হবে।'

(সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে দাসদের কেনা হ'তো কড়ির ছড়া আর শস্তা সব টুকিটাকির বিনিময়ে। পরে কড়ির জায়গায় আসে লোহার তাল। এটা সবাই জানে যে অন্য সবখানে, অন্য-সব বাজারে, লোহার তালই ছিলো সবসময় বিনিময়ের মাধ্যম।)

'এটা সত্যি যে আমি মানুষ খুন করেছি,' আমু বললে, 'কিন্তু সে লোকজনকে বন্দী ক'রে ক্রীতদাস হিসেবে বেচে দেবার জন্যে নয়। ওটা তোমার কাজ, আমার নয়। আমি আমার গাঁয়ে ফিরে যেতে চাই।'

'লোকটা ছিটেল আছে। নিজের গ্রাম, নিজের বৌ, নিজের মেয়ে ছাড়া আর-কিছুর কথাই ও ভাবে না।'

আমু শুধু ওদের চোখের শাদাটুকু দেখতে পাচ্ছিলো। এটা সে ভালোই জানতো যে এই লোকগুলো তাকে আর তার মেয়েকে চেপে ধ'রে নিয়ে গিয়ে নিকটতম দাস-ব্যবসায়ীর কাছে বেচে দিতে দু-বার ভাববে না। সে নিজে তাদের মতো বদমায়েস হিসেবে তৈরি হয়নি।

'আমি আজ রাতেই বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিলাম।'

'না,' মোমুতু রুক্ষস্বরে ব'লে উঠলো। এতক্ষণে মদের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু তবু সে নিজেকে সামলে নিয়ে গলার স্বর মোলায়েম ক'রে ফেললো। 'শিগগিরই আরেকটা লড়াইতে আমরা জড়িয়ে পড়বো। দলের কয়েকজন শাদাদের সঙ্গে বন্দী সংগ্রহ করতে গেছে। যে-ক'রেই হোক তাদের আমাদের পাকড়াতে হবে। তারপর তুমি স্বচ্ছন্দে চ'লে যেতে পারবে।'

'আমি ওকে শোয়াতে যাচ্ছি একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্য। ওর ভীষণ দুঃসময় গেছে,' আমু তার মেয়েকে নিয়ে স'রে যেতে-যেতে বললে।

ও কিছু খেয়েছে?'

'আমরা দুজনেই ভালো খেয়েছি। আমি সকাল-সকাল উঠে পড়বো।'

দুজনে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো। কিন্তু তাদের পেছন-পেছন অনুসরণ ক'রে এলো এক ছায়ামূর্তি।

'লোকটা দারুণ তাগড়া আছে। চার পিপে মদ দাম হবে।'

'তার চেয়ে বেশি, আরেকজন জুড়ে দিলে। ওর বদলে বেশ কয়েকটা লোহার তাল আর অন্যান্য জিনিস পাওয়া যাবে।'

'তাড়াহুড়ো কোরো না! কালকের লড়াই শেষ হ'লেই ওকে আর ওর মেয়েকে আমরা পাকড়াবো। মেয়েটারও বেশ দর হবে। ওদের যেতে দিলে চলবে না। ওদের মতো মাল এই উপকূলে আজকাল আর সহজে মেলে না।'

সমুদ্র থেকে মোলায়েম এক ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে আসছিলো। তারায় ভরা আকাশের তলায় নিবিড়ভাবে রাত চেপে এলো। হঠাৎ-হঠাৎ তীক্ষ্ণভাবে ভেসে আসছে কাতর আর্তনাদ আর তারপরেই চাবুকের আওয়াজ—শপাং। আমু তার মেয়ে ইওমেকে নিয়ে অন্যদের চেয়ে একটু দূরে শুয়েছিলো। তার চোখ দুটি সজাগ, যদিও তার চেহারায় ঘুম-ঘুম ভাব। তার মেয়েকে উদ্ধার করবার জন্যে যে দশ-বারোটি লড়াইতে সে অংশ নিয়েছিলো, তাতেই মোমুতু তার গুণগুলো বুঝতে পেরেছিলো: অসীম শক্তি তার, আর শরীরটা নমনীয়।

তিনগুণ তিন অমাবস্যা আগে দাসশিকারীরা আমুদের গ্রামে হামলা করেছিলো—গাঁয়ে যতজন সুস্থ সবল লোক ছিলো, সবাইকে ধ'রে নিয়ে এসেছিলো। সে যে তাদের কবলে পড়েনি তার কারণ সে সেদিন জঙ্গলে

গিয়েছিলো। তার শাশুড়ির গোদ ছিলো ব'লে দাসশিকারীরা হেলা ক'রে তাকে ধরেনি—সে-ই তাকে পুরো কাহিনীটা বলেছিলো।

দাসজাহাজ থেকে মেয়েকে উদ্ধার করার পর আমু অঝোর ধারে চোখের জল ফেলেছিলো। শক্ত ক'রে মেয়ের কব্জি চেপে ধ'রে, অন্য হাতে রক্তমাখা কুঠার উঁচিয়ে, সে যখন দাঁড়িয়েছিলো, তার বুক প্রবলবেগে ধ্বকধ্বক ক'রে উঠেছিলো। ইওমে, তার বয়েস নয়-দশ হবে,—সেও কেঁদেছিলো।

আমু তার মেয়ের ভয় শান্ত করতে চেষ্টা করেছিলো। 'আমরা গাঁয়ে ফিরে যাচ্ছি। তুই কাঁদিসনে, কিন্তু আমি তোকে যা বলবো, ঠিক তা-ই করবি। বুঝতে পারছিস ?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'আর কাঁদিসনে। ও-সব এখন শেষ হ'য়ে গেছে! আমি তো তোর সঙ্গে আছি এখন।'

আর এখন, রাত্রির কোলে ইওমে ঘুমিয়ে আছে তার বাবার কোলে মাথা রেখে। আমু কাঁধ থেকে কুঠারটা খুলে তার পাশে রাখলো। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে ব'সে আমু তার সমস্ত অভিনিবেশ সংহত ক'রে আনলো তার আশপাশের দিকে। পাতার শরশর শুনলেই সে কুঠারটা সবলভাবে চেপে ধরে। নইলে সে মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়ছিলো।

কোনো পাণ্ডুর আলো পুবদিগন্ত আলো ক'রে দেবার আগেই মোমুতু তার লোকজনদের জাগালো। কয়েকজনের ওপর হুকুম হ'লো বন্দীদের আর লুঠের মাল নিয়ে কোনো নিরাপদ জায়গায় চ'লে যেতে। আমু আর ইওমে এ-সময় একটু দূরে-দূরে স'রে রইলো। গভীর দুটি চোখ ইওমের, বয়েসের তুলনায় সে অনেকটা লম্বা। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটা তার—দুটি বিনুনি ঝুলে আছে কাঁধে। বাবার পাশ আঁকড়ে ছিলো সে; দাসজাহাজে যারা তার সঙ্গে ছিলো, তাদের সে দেখতে পাচ্ছিলো; তাদের ভাগ্যে কী আছে তা যদিও তার স্পষ্ট জানা ছিলো না, কিন্তু এই মুহূর্তে তাদের দশা যে কী, চাবুকের অবিশ্রাম শপাং সে-সম্বন্ধে লেশমাত্র সন্দেহ রাখেনি।

'ওরা আমাদের জন্য সামনে অপেক্ষা করবে,' আমুর কাছে এসে মোমুতু বললে। 'শাদাদের গুপ্তচরেরা যাতে আমাদের ওপর আচমকা হামলা করতে না-পারে, সে বিষয়ে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। তোমার মেয়েকে লুকিয়ে

সঙ্গে-সঙ্গে রাখছো কেন? ওকে তো দলের কারোর কাছে রেখে এলেই পারতে।'

'আমি বরং ওকে নিজের কাছেই রাখবো। ও ভীষণ ভয় পেয়েছে,' বন্দীদের নিয়ে পাহারাওলাদের চ'লে-যাওয়া দেখতে-দেখতে আমু উত্তর দিলে।

'তোমার মেয়ে খুব সুন্দরী।'

'হ্যাঁ।'

'ওর মা-র মতো সুন্দর?'

'ঠিক ততটা নয়।'

মোমুতু তার দলবলের কাছে ফিরে গেলো; সংখ্যায় তারা জনা তিরিশ—তাদের সে বললে রওনা হ'য়ে পড়তে। তারা একসার বেঁধে হাঁটতে লাগলো। দাসব্যবসাদাররা মোমুতুকে ভালোই চেনে—কেউই তাকে বিশ্বাস করে না। আগে সে কয়েকজন ব্যবসাদারের হ'য়ে দালালের কাজ করেছিলো, তার পরে সে হ'য়ে ওঠে 'ভাষার ওস্তাদ' অর্থাৎ দোভাষী, কেল্লা আর ছাউনি যে-সব জায়গায় বন্দী নিগ্রোদের রাখা হ'তো, দোভাষী হিসেবে সে সে-সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতো।

সেদিন সারা সকাল তারা কুচকাওয়াজ ক'রে এগুলো—আমু আর তার মেয়ে ছিলো সকলের পেছনে। ইওমে যখন ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো, তার বাবা তাকে পিঠে তুলে নিলো। আমু ভালো ক'রেই জানতো যে তার ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। তার সামনের লোকগুলো ছিলো রুক্ষ, রূঢ়, আর কেমন যেন করুণ; লম্বা বন্দুকগুলো যেভাবে হিঁচড়ে-হিঁচড়ে তারা হাঁটছিলো, তাতে তাদের হাস্যকর দেখাচ্ছিলো। তৃণভূমি পেছনে ফেলে এলো তারা; শিগগিরই এসে পড়লো বনের মধ্যে—উঁচু-উঁচু গাছের ডালে শকুনের ঝাঁক ব'সে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। শুধু পাখির কিচিরমিচির কানে আসছে—আর তার মাঝে-মাঝে দূর থেকে প্রতিধ্বনি তুলে ভেসে আসছে বুনো জানোয়ারের গর্জন। তারপর তারা বনের গভীরে এসে পৌঁছুলো—আর্দ্র আর বিরূপ এক বন—আর মোমুতু হেঁকে তার দলবলকে বললো থামতে, তাদের ছুটি দিয়ে সে জিরিয়ে নিতে বললো।

'কী, ভাই, ক্লান্ত?' একজন আমুকে শুধোলে। 'আর তোমার মেয়ের কী অবস্থা?'

ইওমে তার ঘন চোখের পাতা তুলে লোকটাকে একবার দেখলো, তারপর তার বাবার দিকে তাকালো।

'সেও একটু ক্লান্ত,' কোথায় ব'সে বিশ্রাম করবে, খুঁজতে-খুঁজতে আমু বললে। একটা গাছের গুঁড়ির কাছে ভাঙা একটা ডাল প'ড়ে আছে—ইওমেকে সে সেদিকে নিয়ে গেলো। একটু দূরে ব'সে লোকটা তাদের ওপর নজর রাখলো সবসময়।

মোমুতু তার দলবলের মধ্যে কয়েকটা মিষ্টি আলু ভাগ ক'রে দিলে, তারপর এই সামান্য খাবার শেষ হ'তেই সে আমুর সঙ্গে দেখা করতে এলো।

'তোমার মেয়ে কেমন আছে?'

'ও ঘুমোচ্ছে,' আমু একটা কাঠের টুকরো কেটে-কেটে একটা পুতুল বানাচ্ছিলো।

'মেয়েটি বেশ সবল,' মোমুতু তার পাশে ব'সে প'ড়ে তার চওড়া পাড়ওলা টুপিটা মাথা থেকে খুললো। তার বিরাট কালো বুটজোড়া কাদায় মাথামাথি হ'য়ে আছে। 'আমরা একটু জিরিয়ে নিয়ে ওদের জন্য অপেক্ষা করবো—এখানে। এ-পথ দিয়েই ওদের আসতে হবে।'

আমু ক্রমেই খুব সাবধান হ'য়ে পড়ছে। সে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। কাঠের টুকরোটা ক্রমে একটা পুতুলের চেহারা নিচ্ছে—কাঠের গায়ে খোদাই করতে-করতে সে সবসময় ইওমের ওপর চোখ রাখলো।

'ব্যাপারটা চুকে গেলেই তুমি চ'লে যেতে পারো। তবে সত্যি কি তুমি তোমার গাঁয়ে ফিরে যেতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তোমাদের বাড়ির আর কেউই তো ওখানে নেই,' বললে মোমুতু। আমুর উত্তরের অপেক্ষা না-ক'রেই সে ব'লে চললো, 'এককালে আমারও একটা গ্রাম ছিলো—এক জঙ্গলের পাশে। আমার মা-বাবা থাকতেন সেখানে। অনেক আত্মীয়স্বজন—পুরো একটা জ্ঞাতিগুষ্ঠি! আমাদের খাবার জুটতো অনেক—মাংস, মাঝে-মাঝে মাছ। কিন্তু আস্তে-আস্তে গাঁয়ের অবস্থা প'ড়ে এলো। বিলাপের কোনো অন্ত রইলো না। আমি তো জন্মাবধি আর্তনাদ ছাড়া আর-কিছু শুনিনি—উন্মাদের মতো লোকজনদের পালাতে দেখেছি, ঝোপে-ঝাড়ে-জঙ্গলে। কিন্তু তুমি জঙ্গলে গেলে—আর কোনো

অজানা লোকের শিকার হ'য়ে মরলে ; খোলামেলায় থাকলে তো, তোমাকে পাকড়ে দাস হিসেবে বেচে দেয়া হ'তো। কী করতে পারতাম আমি? শেষটায় আমি আমার পথ বেছে নিলাম। আমি বরং শিকারীদের সঙ্গে থাকবো —শিকার হ'তে আমি চাই না।

আমুও জানতো যে এটাই জীবন। কক্ষনো নিরাপদ নও তুমি, পরের দিন সূর্য ওঠা দেখতে পাবে কিনা, তা অব্দি তোমার জানা নেই। কিন্তু যেটা ও বুঝতে পারতো না তা হ'লো, এই যে নারী-পুরুষ ধ'রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাদের কোন্ কাজে লাগানো হয়? জনরব যে, শাদারা নাকি তাদের চামড়া দিয়ে জুতো বানায়।

অনেকক্ষণ কথা বললো তারা—আসলে মোমুতুই বললো—অবিরাম। সে তার কীর্তিকাহিনী শোনালো সাত কাহন, তার মদের আড্ডা সম্বন্ধে বারফট্টাই করলো। শুনতে-শুনতে মোমুতুর চরিত্রটা আমুর কাছে ক্রমশ একটা হেঁয়ালি হ'য়ে দাঁড়ালো। ও যেন এক ক্ষুদে যুদ্ধনেতা, শুধু গায়ের জোর আর দমননীতি দিয়ে যে তার ক্ষমতা খাটায়। অবশেষে—আমুর কাছে যখন এই কথাবার্তা বড্ড বেশি দীর্ঘ ঠেকতে শুরু করেছে—একটি লোক এসে সর্দারকে সাবধান ক'রে দিলে যে শাদারা আসছে। মোমুতু হুকুম দিলে—সব ক-টাকে সাবাড় ক'রে দাও, আর বন্দীদের ধ'রে রাখো। মুহূর্তের মধ্যে সারা বন স্তব্ধ হ'য়ে গেলো ; শুধু শোনা যেতে লাগলো বাতাসের নিরপেক্ষ স্বর।

কালো বন্দীদের লম্বা সারটা চোখে এলো, তাদের চালিয়ে নিয়ে এসেছে চারজন ইওরোপীয়, তাদের প্রত্যেকের হাতে দুটি ক'রে পিস্তল আর একটা ক'রে ছুরি। বন্দীরা—নারীপুরুষ সবাই এক জায়গায় জড়ো করা—একটা কাঠের জোয়াল আটকানো তাদের ঘাড়ে—সামনের আর পেছনের লোকের ঘাড়ে। দলের পেছনে ছিলো আরো তিনজন ইওরোপীয়—আর চতুর্থজন, সে বোধহয় অসুস্থ, তাকে চারজন কালো লোক ডুলিতে ক'রে ব'য়ে আনছে।

গাছের ওপর থেকে আচমকা গুলির আওয়াজ হ'লো—অনেকক্ষণ দূরে-দূরান্তরে শোনা গেলো তার প্রতিধ্বনি। তার পরেই শোনা গেলো আর্তনাদ আর বিশৃঙ্খল লড়াইয়ের আওয়াজ। আমু সুযোগ বুঝে যে-লোকটা তাকে পাহারা দিচ্ছিলো তাকে পেড়ে ফেললো, তারপর তার মেয়ের হাত ধ'রে, জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেলো।

তারা পেরিয়ে গেলো ছোটো নদী আর বড়ো-বড়ো নদী, ঢুকে পড়লো অরণ্যের আরো গভীরে, সবসময়েই লক্ষ্য দক্ষিণ পূর্ব দিক। আমুর ছুরি আর কুঠার এখন যতটা কাজে লাগলো, তেমন আর কখনও হয়নি। তারা প্রধানত চলতো রাতের বেলায়—কখনো খটখটে দিনের আলোয় নয়, আর সবসময়েই মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে যেতো।

তিন সপ্তাহ পর তারা গাঁয়ে এসে পৌঁছুলো—গ্রাম মানে গোটা তিরিশ কুঁড়েবাড়ি, একে আরেকের গায়ে জড়াজড়ি ক'রে আছে, ঠিক জঙ্গল আর নদীর মুখটায়। দিনের সে-সময় সব বাসিন্দাই গাঁয়ে ছিলো; তাছাড়া গ্রামের যারা সবল ও কর্মক্ষম মানুষ, তাদের বার-বার হামলা ক'রে ধ'রে নিয়ে যাবার দরুন এমনিতেই গ্রামে লোকের সংখ্যা ক'মে গিয়েছিলো। আমু আর ইওমে যখন তার শাশুড়ির বাড়ির দাওয়ায় গিয়ে পৌঁছুলো, বুড়ি খোঁড়াতে-খোঁড়াতে বাইরে বেরিয়ে এলো, আর তার কান্নাকাটি চ্যাঁচামেচি অন্য লোকদের জড়ো ক'রে আনলো—তাদের অনেকেই রুগ্ন আর দুর্বল। গোড়ায় তারা দারুণ ভয় পেয়েছিলো, কিন্তু আমু আর ইওমেকে দেখে তারা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আনন্দ আর বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগলো। তারা দুজনের চারপাশে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো, তাদের অশ্রু আর প্রশ্ন একে আরেকের সঙ্গে মিলে গেলো। ইওমের দিদিমা তাকে কোলে তুলে নিলো, তাকে এমনভাবে কুঁড়ের ভিতরে নিয়ে গেলো যেন সে কোনো অমূল্য নিধি। আর মেয়েটি দিদিমার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কথার সঙ্গে চোখের জল মিশিয়ে ফেললো।

গাঁওবুড়োরা আমুর সঙ্গে কথা বলবার জন্য তাকে ডেকে পাঠালো: তারা তার দুঃসাহসী কীর্তির কথা শুনতে চায়।

'আমি সারা জীবন ধ'রে—এমনকি আমার বাপের জন্মেরও আগে থেকে', জমায়েতের মধ্যে যারা সবচেয়ে বুড়ো, তাদের একজন ব'লে উঠলো, 'সারা দেশ কেবলই ভয়ে-ভয়ে কাটিয়েছে কবে তারা ধরা পড়বে আর শাদাদের কাছে বিক্রি হবে। শাদারা বর্বর।'

'এর কি কোনো শেষ নেই?' জিগেস করলে আরেকজন, 'কেবলই দেখলাম, আমার সব ছেলেপুলেকে ওরা ধ'রে নিয়ে গেলো—আর কতবার যে এ-গ্রাম থেকে ও-গ্রামে পালিয়ে বেড়িয়েছি, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। জঙ্গলের মধ্যে এর চেয়ে গভীরে আর যাওয়া যাবে না···বুনো জানোয়ার আছে, অসুখ বিসুখ আছে···'

'দাসশিকারীদের চেয়ে বরং বুনো জানোয়ারের মুখোমুখি পড়তে আমি রাজি,' বললে তৃতীয় একজন। 'পাঁচ-ছ বর্ষা আগে আমরা ভেবেছিলাম এখানে বেশ নিরাপদ আছি। কিন্তু এখন আর মোটেই নিরাপদ নই। গ্রাম থেকে মাত্র সাড়ে তিনদিনের পথ দূরে একটা দাসশিবির আছে।'

সবাই চুপ ক'রে গেলো, তাদের ভাঁজপড়া, জীর্ণশীর্ণ, উদ্বিগ্ন মুখগুলোয় যুগের ছাপ পড়েছে। আবারও একবার পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য কোথাও চ'লে যাবার কথা তারা আলোচনা করলো। কেউ-কেউ ছিলো চ'লে যাবার পক্ষে, কিন্তু অন্যরা জঙ্গলের মাঝখানে জল ছাড়া থাকতে যাওয়ার বিপদের কথা মনে করিয়ে দিলো—তাছাড়া সবল পুরুষ নেই দলে, পারিবারিক কবরখানাও তো ছেড়ে যেতে হবে। মোড়ল—তার মাথাটা অধঃপাতে যাওয়া লোকের মতো চ্যাপটা আর গর্দানটা মাংসল—প্রস্তাব করলে যে শীতকালটা তাদের এখানেই কাটানো উচিত, তবে অন্য কোনো ভালো বাসস্থানের সন্ধানে একদল লোক পাঠানো যায়। কোনো জায়গার খোঁজ না-পেয়ে, সেখানে বসবাসের কোনো প্রস্তুতি না-ক'রে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়াটা হবে নিছকই পাগলামি। তাছাড়া প্রথা অনুযায়ী বলি-উৎসর্গের ব্যাপারটাও আছে। শেষটায়, সকলেই এই কর্মসূচিতে সম্মত হ'লো। যে অল্প কিছুদিন তারা এখানে থাকবে, তাদের চাষবাসের মাত্রা বাড়াতে হবে, সব গোরুমোষকে সকলের সাধারণ সম্পত্তি ব'লে মেনে নিতে হবে—সব জন্তুকেই রাখতে হবে একটা খোঁয়াড়ে। মোড়লের মতে গ্রামের বুড়িদের ওপর গ্রামের পাহারার ভারটা দেয়া উচিত।

আমু আর ইওমের ফিরে-আসা তাদের মধ্যে নতুন প্রাণের সাড়া জাগিয়ে দিলো। তারা একজোট হ'য়ে কাজ করতে শুরু করলো,—জমি সাফাই, আগাছা কাটা, বেড়া মেরামত—সব কাজেই সবাই সমানভাবে লেগে পড়লো। পুরুষরা একসঙ্গে কাজে বেরোয়, একসঙ্গে কাজ থেকে ফিরে আসে। মেয়েরাও কাজে ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে পড়লো; কেউ-কেউ রান্না করে, অন্যরা নজর রাখে আচমকা কোনোখান থেকে 'আড়কাঠিরা' এসে হাজির হয় কিনা। ('আড়কাঠিরা' হ'লো দেশেরই লোক, দালাল, তাদের চেনা যায় তাদের গায়ের উর্দির রং দেখে, বোঝা যায় তারা কোন্ দেশের হ'য়ে কাজ করছে, তাদের সাধারণ নাম ছিল 'দাসশিকারী') কোনো আশঙ্কার ভাব ছাড়া কেউই সমুদ্রের দিকে তাকাতে পারতো না।

বর্ষা এলো ; উর্বরা, সুফলা জমি বীজগুলোকে জীবন্ত ক'রে তুললো। যদিও গ্রামবাসীরা প্রকাশ্যে উদ্বেগ বা শঙ্কা না-দেখিয়েই কাজে যেতো, সব সময়েই কিন্তু তারা হামলার জন্য সজাগ থাকতো : এটা তারা ভালোই জানতো যে একদিন না-একদিন অতর্কিতে ঐ আক্রমণ আসবেই।

ইওমের সঙ্গে একই কুঁড়েঘরে থাকতো আমু, ঘুমোবার সময় হাতের কাছে সে কোনো অস্ত্র রাখতো। এমনকি বাতাসের একটা নিরীহ ঝাপটাও বাচ্চা মেয়েটিকে আতঙ্কিত ক'রে তুলতো। আমু তার কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দিলো ; ইওমের যে বিশ্রাম করা উচিত, এ-বিষয়ে সকলেরই ছিলো একমত, ক্রমে সে নিদারুণ অভিজ্ঞতার প্রভাবটা কাটিয়ে উঠলো। আবার তার কালো গাল চকচক ক'রে উঠলো, তার গলার চারপাশে ছোটো-ছোটো ভাঁজ পড়লো, তার ছোট্ট সমতল বুক ত্বটি ভরতে শুরু ক'রে দিলো।

শান্তিতেই কাটলো দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। দীর্ঘ লড়াই চালিয়ে প্রকৃতির কবল থেকে তারা যে সরু-সরু জমিগুলো ছিনিয়ে নিয়ে এসে চাষ করেছিলো, এবার তারা সুফলা ফসলের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলো। ক্যাসাভার মুকুল ধরেছে ; লোকে তালের তেল, মাখন, শীম, মধু ভাঁড়ারে জমাতে শুরু করেছে—যা-যা তাদের নতুন গ্রামে লাগতে পারে সব। নতুন বসতির খোঁজে যে-দলটা বেরিয়েছিলো তারা ফিরে এলো : তারা পাহাড়তলিতে একটা চমৎকার আস্তানার সন্ধান পেয়েছে, তৃণভূমির বেশ খানিকটা ওপরে—অথচ একটা ঝরণার কাছেই। জমিও ভালো, গোরুমোষের চরবার জায়গা অঢেল, আর ছেলেপুলেরাও 'আড়কাঠিদের' হাত থেকে নিরাপদ।

সবাই ভবিষ্যতের এই প্রত্যাশিত স্বপ্নে ভারি খুশি। কবে যাত্রা করা হবে, মোড়ল দিনটা ঠিক ক'রে দিলো ; অদূর ভবিষ্যতেই সবাই নিরাপদে থাকতে পারবে, এই বোধটায় সব সতর্কতায় একটু ঢিলে পড়লো। আগে রাত্রের অন্ধকারে আগুন জ্বালানো ছিলো নিষেধ, কারণ তাহ'লে গ্রামের কথা দূর থেকেই লোকে জেনে যাবে, কিন্তু এখন রাতের বেলায় জলজল ক'রে উঠলো আগুন ; হাসির লহরী ঝমঝম ক'রে উঠলো, ছোটোরা বাবা-মার চোখের আড়ালে দূরে চ'লে যাবার সাহস পেলো—কারণ বড়োরা এখন শুধু যাবার ভাবনাতেই মগ্ন। এখন তারা হাতে দিনগুলো গুনতে পারে। পরামর্শ সভায় আলোচনা হ'লো রওনা হবার শুভ লক্ষণ কী। প্রত্যেকেই গৃহদেবতা, টোটেম চিহ্ন আর পারিবারিক কবরখানার উপাসনায় মন দিলো।

অথচ তবু সেটা কোনো শুভদিন ছিলো না, ছিলো অন্য যে-কোনো দিনের মতোই একটি দিন। সূর্য ঝলসাচ্ছে দীপ্ত করোজ্জ্বল, গাছের নরম কচিপাতা হাওয়ায় শরশর ক'রে উঠছে, মেঘেরা খেলা ক'রে যাচ্ছে আকাশে, গান-গাওয়া পাখিরা খুশিভাবে খাবার খুঁটছে, আর বানরগুলো গাছে-গাছে নাচানাচি লাফালাফি করছে। সারা গ্রামটা এই ঝলমলে দিনটাকে উপভোগ করছে ; এটা এমনই এক দিন যেদিন যাত্রীরা আরো একটুক্ষণ থেকে যেতে প্রলুব্ধ হয়, বেশ কিছুক্ষণ।

আর সেই বিশেষ দিনেই ঘটলো ঘটনাটা। সেদিনই আচমকা এসে হাজির হ'লো 'আড়কাঠিরা'। ভয়-পাওয়া পশুরা সহজাত প্রবৃত্তির বশেই জঙ্গলের গভীরে পালিয়ে গেলো ; বন্দুকের শব্দ শুনে নারী পুরুষ ছেলেমেয়েরা আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, সাতঙ্কে ছড়িয়ে পড়লো এদিক-ওদিক, মাথায় শুধু একটাই ভাবনা—পালাবার যে একটা রাস্তা তাদের সামনে খোলা আছে—অর্থাৎ জঙ্গল—সেখানে উধাও হ'য়ে যাওয়া।

আমু তার কুঠারটা হাতে চেপে ধ'রে ইওমে আর তার দিদিমাকে সামনে ঠেলে দিলো। কিন্তু সেই পঙ্গু বুড়ি কিছুতেই দ্রুত যেতে পারছিলো না। তারা কুঁড়েঘরগুলোর মধ্য দিয়ে পালিয়েছে, পেরিয়ে এসেছে খোঁয়াড়, এসে পৌঁছেছে গ্রামের কিনারে, আর ঠিক তক্ষুনি আমু মোমুতুর এক শাগরেদের মুখোমুখি পড়লো। দুজনের মধ্যে আমুর ক্ষিপ্রতা ছিলো বেশি, সে তাকে পেড়ে ফেললো মাটিতে। কিন্তু ততক্ষণে তার পেছনে ধাওয়া করেছে একটা পুরো দল।

জঙ্গলের আরো-গভীরে ঢুকে পড়লো আমু, যেখানে ঘন ঝোপঝাড় আর ঝোলা নিচু ডালপালা তাদের অগ্রগতিকে আরো মন্থর ক'রে দিলো। তবু, আমু যদি কেবল একা হ'তো, সে পালাতে পারতো। কিন্তু সে তো তার মেয়েকে ছেড়ে যেতে পারে না। স্ত্রীর কথা মনে প'ড়ে গেলো তার। যাতে তার স্ত্রীকে এই দাসশিকারীরা ধ'রে নিয়ে যেতে না-পারে সেজন্যে সে নিজের হাতে তার স্ত্রীকে খুন করেছিলো। তার শাশুড়ি তাকে তার স্ত্রীর কথা মনে করিয়ে দিলো। এই বুড়িকে ফেলে যাওয়া হবে তার স্ত্রীকেই ফেলে যাওয়া। বুড়ি বারে-বারে থামছে হাঁফ নিতে ; তার গোদা পা দুটো ক্রমে এত ভারি হ'য়ে উঠছে যে আর যেন নাড়ানো যায় না। যতটা পারে আমু তাকে সাহায্য করলে। আর ইওমে—সে লেপটে রইলো তার পাশে, তার মুখে টুঁ শব্দটি নেই।

হঠাৎ আমুর মাথায় একটা মতলব খেলে গেলো। সে থেমে পড়লো, আস্তে আলতোভাবে সে ইওমের চিবুকটা ধরলো, অনেকক্ষণ অপলকে তাকিয়ে রইলো তার মুখে—অনেকক্ষণ, যেন অনন্তকাল। তার চোখ দুটি জলে ভ'রে উঠলো।

'মা,' সে বললে, 'আর আমাদের এগুবার উপায় নেই, সামনে আছে মরণ—আমাদের তিনজনের জন্যই। পেছনে আছে গোলামি—ইওমে আর আমার জন্য।'

'আমার আর এক পাও যাবার ক্ষমতা নেই,' নাতনির হাতটা ধ'রে বুড়ি বললে। করুণ, শঙ্কাতুর মুখটা তুলে আমুর দিকে তাকালো বুড়ি।

'মা, ইওমে কিন্তু ওদের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। তোমরা দুজনেই পারো। তোমার চামড়া আর ওদের কাজে লাগবে না—শাদারা তা দিয়ে আর জুতো বানাতে পারবে না।'

'কিন্তু ইওমে যদি একা প'ড়ে থাকে, তাহ'লে ও তো মারা পড়বে। আর তোমারই বা কী হবে?'

'তোমরা স্বাধীনভাবে চ'লে যাও, আমার কী হবে, সেটা আমি বুঝবো।'

'তুমি আমাদের মেরে ফেলবে না তো?' বুড়ি ব'লে উঠলো।

'না, মা, আমি তোমাদের মারবো না। তবে তোমরা যাতে বন্দী না হও, তার জন্য কী করা উচিত, তা আমি জানি। আমাকে চট ক'রে কাজটা করতে হবে। ওরা এসে পড়লো ব'লে—আমি ওদের কথা শুনতে পাচ্ছি।'

আমুর মাথার মধ্যে যেন একটা বাজ ফেটে পড়েছে, তার পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে। কোনো রকমে নিজেকে সে সামলে নিলো, ছুরিটা শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে সে একটা বিশেষ ঝোপের কাছে গেলো (য়োলোফরা তাকে বলে 'বান্‌টামারা'; তার পাতা ছেঁচে ঘা শুকোবার ওষুধ পাওয়া যায়), একগোছা বড়ো-বড়ো পাতা সে ছিঁড়ে নিলো একটানে, তারপর অন্য দুজনের কাছে ফিরে এলো—তারা অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকিয়েছিলো।

মেয়ের দিকে যখন সে তাকালো, তার চোখ দুটি চোখের জলে ঝাপসা হ'য়ে গেছে। 'ইওমে, তুই ভয় পাসনি।'

তার শাশুড়ি আবার ব'লে উঠলো, 'তুমি ওকে ওর মায়ের মতো মেরে ফেলবে না তো?'

'না। ইওমে, এতে তোর খুব ব্যথা লাগবে, কিন্তু তুই কখনো ক্রীতদাসী হবি না। বুঝলি?'

বাচ্চা মেয়েটির একটিই উত্তর ছিলো—ছুরির ঐ ধারালো ফলাটার দিকে চেয়ে থাকা। দাসজাহাজ আর রক্তমাখা কুঠারটির কথা তার মনে প'ড়ে গেছে।

আমু চট ক'রে মেয়েটিকে তার দুই সবল পায়ের মধ্যে চেপে ধরলো, আর তারপর সারা গায়ে ছুরি দিয়ে কেটে দিতে লাগলো। সারা বনের মধ্যে বাচ্চাটির আর্তনাদ ঝমঝম ক'রে উঠলো ; তার চীৎকার শুধু তখনই থামলো যখন তার গলায় আর কোনো স্বর নেই। দাসশিকারীরা তাকে পাকড়ে ফেলার আগে কোনোমতে কাজটা শেষ করতে পেরেছিলো আমু। বান্টামারার পাতা দিয়ে সে তার মেয়ের সারা শরীর মুড়ে দিয়েছে। অন্যান্য বন্দী গ্রামবাসীর সঙ্গে আমুকেও উপকূলে নিয়ে যাওয়া হ'লো। ইওমে তার দিদিমার সঙ্গে গ্রামে ফিরে এলো, আর বুড়িতো অনেক রকম লতাপাতা চেনে, তারই সৌজন্যে ইওমের শরীর কিছুদিন পরে সেরে গেলো—কিন্তু কাটা দাগগুলোর চিহ্ন কিন্তু তার শরীর থেকে মেলালো না।

অনেক মাস পরে দাসশিকারীরা আবার গ্রামে ফিরে এলো ; তারা ইওমেকেও ধরেছিলো, কিন্তু আবার তাকে তারা ছেড়ে দেয়। তার আর এক কানাকড়িও দাম নেই—তার গায়ে ঐ ক্ষতচিহ্নগুলো আছে ব'লে।

খবরটা ক্রোশের পর ক্রোশ ছড়িয়ে গেলো। দূর-দূর গ্রাম থেকে লোক এলো দিদিমার সঙ্গে পরামর্শ করতে। আর বছরের পর বছর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে আমাদের পূর্বপুরুষদের দেহে নানা রকম ক্ষতচিহ্ন দেখা দিতে লাগলো।

আর এইভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষদের শরীর ক্ষত ক'রে দাগী ক'রে দেয়া হ'লো। তারা কিছুতেই গোলাম হ'তে চায়নি।

অনুবাদ ঃ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দাভিদ দিওপ

আফ্রিকা

আমার মাকে

আফ্রিকা আফ্রিকা আমার
পূর্বপুরুষের সাভানার সেই অহংকারী যোদ্ধাদের আফ্রিকা আমার
যার কথা আমার দিদিমা গান করেন
তাঁর সুদূর নদীর ধারে অফুরান
আফ্রিকা আমি তোমাকে জানিনি কোনোদিন
কিন্তু আমার চোখ তোমার রক্তে ভ'রে যায়
তোমার সেই কী-সুন্দর ক্ষেতে-মাঠে ঝরে-পড়া কালো রক্তে
তোমার স্বেদের রক্তে
তোমার পরিশ্রমের স্বেদে
তোমার দাসত্বের পরিশ্রমে
তোমার সন্তানদের দাসত্বে
আফ্রিকা বলো তুমি বলো আমাকে আফ্রিকা
এই-যে পিঠ যা বেঁকে নুয়ে গেলো
এই-যে পিঠ যা থুবড়ে পড়লো দীনতার ভারে
এই-যে কম্পমান লাল-লাল ডোরাকাটা পিঠ
সে কি তোমার
যে-পিঠ চাবুকের কাছে জো-হুজুর বলে মধ্যদিনের সব রাস্তায়
আর তখন এক কণ্ঠস্বর আমাকে উত্তর দেয় সুগম্ভীর
অবুঝ বালক ঐ যে ঐখানে
তুমি দেখতে পাচ্ছো এক কিশোর ও উদ্দীপ্ত গাছ
শাদা রংজ্বলা সব ফুলের মধ্যে চমৎকার নিঃসঙ্গ
সে-ই আসলে আফ্রিকা তোমারই আফ্রিকা পুনর্জায়মান
আবার সে জন্ম নিচ্ছে অসীম ধৈর্যে জেদী একগুঁয়ে
সেইসব ফলে-ফলে যারা ধীরে ধীরে শুষে নেয়
স্বাধীনতার তিক্ত আস্বাদ।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃষ্টির কারিগর

সিপ্রিয়ান একোয়েন্সি

সেদিন আমার একটি ছোট ছেলের সঙ্গে পরিচয় হলো সে নিজের ইচ্ছেমত বৃষ্টি আনতে পারে। সে তার এই শক্তি সত্যিকারের প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করতে চায় না। কিন্তু এইবার এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যে সে তার এই শক্তি ব্যবহার করবার প্রয়োজন অনুভব করেছিল।

আমি ডেলের কাছে বেড়াতে গিয়েছিলাম, দিনটা ছিল ভীষণ গরম এক ডিসেম্বরের দিন। ডিসেম্বর মাসে হারমাটান সবচাইতে তীব্র হয়ে ওঠে। সমস্ত জায়গায় শুকনো পাতা আর শুকনো ঘাস তার শক্তির কথাই বলছিলো। আমরা বারান্দায় বসে বসে, ঠাণ্ডা হাওয়ার দমকে কাঁপছিলাম আর যখন কথা বলছিলাম আমাদের দাঁত ঠকঠক করে কেঁপে উঠছিলো।

হঠাৎ আমরা আমাদের ছাদের ওপর থেকে মেশিনগানের আওয়াজের মতো একটা শব্দ শুনলাম। ডেল যে বইটা পড়বার চেষ্টা করছিলো সেটা থামিয়ে আমার দিকে চক্‌চকে চোখে তাকাল।

সে কিছুক্ষণ শুনবার পর জিগ্যেস করলো, 'বৃষ্টি? অসম্ভব!'

দুজনে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে মেঝেটা পেরিয়ে জানলার কাছে গেলাম। মাথার ওপরে আকাশটা কালো হয়ে আছে। খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছে। গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে শব্দ করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। পাখীগুলো ভয় পেয়ে চারিদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। গ্রামের বাড়িগুলোর চালের আলগা খড় উড়ে উড়ে যাচ্ছে, সত্যিই বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু এক্ষুনি তা হয়ে উঠবে প্রচণ্ড ঝড়।

'কী অদ্ভুত, না?' আমি বললাম, 'এখন তো মাত্র ডিসেম্বর, এবং হারমাটানও বইছে।' ডেল ভুরু কোঁচকালো। বিদ্যুতের আলো কালো আকাশটাকে যেন চিরে ফেলছিলো। বাজের ভীষণ কর্কশ আওয়াজে আমরা ভয় পেয়ে দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম, তারপর দৌড়ে ঘরে চলে এলাম।

আমরা জানলা বন্ধ করে ঘরের ভেতরে চুপ করে বসে রইলাম। ডেল বারবার বলতে লাগল 'কী অদ্ভুত, কিছুই বুঝতে পারছি না...ভারী অদ্ভুত।'

'কেন অদ্ভুত কেন ?' আমি জিগ্যেস করলাম।

'অদ্ভুত নয় ?' সে বলল ওনাবায় কখনো ডিসেম্বরে বৃষ্টি হয় না। আমি এখানে পনেরো বছর আছি, একবারও ডিসেম্বরে বৃষ্টি হয়নি। এটা শুকনো ঋতু।'

আমি বললাম 'হ্যাঁ, কিন্তু এখন বৃষ্টি হচ্ছে।'

'এখন বৃষ্টি হচ্ছে', সে পুনরাবৃত্তি করলো। 'আর এখন এই ভয়ঙ্কর বৃষ্টির পর যদি সেই লোকটি মারা যায় আমি একটুও আশ্চর্য হবো না।'

'কোন লোকটি ?'

সে বলল 'কেন বালে, গ্রামের মোড়ল।'

'সে কেন মারা যাবে ?'

ডেল আমার দিকে একটু আশ্চর্য হয়ে তাকালো, 'তুমি বুঝি সেই গল্পটা শোননি ? শোন তাহলে—বৃদ্ধটি বৃষ্টির উপাসকদের একজন।'

'কুসংস্কারে বিশ্বাস কোরো না।'

ডেল হাসিমুখে বলল, 'আমি কি তোমায় বলেছি যে এর একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি ? আমি স্বাভাবিক ভাবেই একজন খোলা মনের মানুষ। যাই হোক, এ কথাই সবাই বলে যে সে একজন বৃষ্টির উপাসক। সে যখন খুশি বৃষ্টি আনতে পারে। তার ওপর সে গ্রামের চাষীদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে যে তার মৃত্যুদিনে সে তাদের ক্ষেত ভাসিয়ে দেবে।

'যতো সব কুসংস্কার', আমি অবজ্ঞাভাবে বললাম, 'তুমি নিশ্চয় এর একটা কথাও বিশ্বাস করো না।'

'দেখো,' ডেল বলল 'বিশ্বাস করি, একথা বলতে পারি না, কিন্তু অপেক্ষা করেই দেখা যাক না কি হয়। বালের বয়স সত্তরের বেশী, সে যে কোনো সময়েই মারা যেতে পারে।'

বৃষ্টি খুব জোরেই পড়ছিল। জানলার ফুটো দিয়ে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঘরে ঢুকতে লাগল, অচিরেই আমরা ঘরের মধ্যে এক ইঞ্চি জলের ওপর বসে রইলাম। সমস্ত রাত ধরে বৃষ্টি পড়ল। ডেল বাধ্য হলো তার অবশিষ্ট বিছানাটা আমাকে দিতে।

পরদিন সকালে আমরা জানলা খুলে রাস্তা দেখছিলাম। এখন সমস্ত কিছুই শান্ত এবং নিস্তব্ধ। পাতার ওপরে বিন্দু বিন্দু জলকণা লেগে রয়েছে। প'ড়ে যাওয়া গাছগুলো বনের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাঁক সৃষ্টি করেছে।

বাতাসে একটা মিষ্টি সতেজ গন্ধ। ডেল গম্ভীর, বিষণ্ণ মুখে আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

সে আমার কাঁধের ওপর দিয়ে একটা ধোঁয়া ওঠা মাটি আর খড়ের ধ্বংসস্তূপ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'দেখে মনে হচ্ছে ঐ বাড়িটায় বজ্রপাত হয়েছে।'

ডেল ঠিকই বলেছিলো, আমরা পরে জানতে পারলাম যে বাড়িটার মালিক একজন চাষী মারা গিয়েছে। সে বাড়ির মধ্যে তার বারো বছরের ছেলের সঙ্গে আটকে পড়েছিল, ছেলেটা কিন্তু কোনোক্রমে পালাতে পেরেছিলো।

যাই হোক, বালে কিন্তু সেই বৃষ্টির পর মারা যায় নি। সে সেই ছেলেটির ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা শুনে তাকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছিলো।

বৃষ্টি সেই অন্য ঋতুতে একবার দেখা দেবার পর আবার সমস্ত কিছুই স্বাভাবিক হয়ে গেল। হারমাটান আবার সব জায়গায় বইতে লাগল। আমাদের ঠোঁট ফেটে গেল। বাতাসে ভারী কুয়াশা ঝুলে রইল। আমাদের চামড়ায় যেন আঁশ উঠতে লাগল এবং গরম অসহ্য হয়ে উঠল। অনেক চাষীরা এই বৃষ্টির সুযোগে ইয়াম এবং ভুট্টা পুঁতেছিলো; তারা এখন দেখলো যে তারা ভুল করেছে। ডিসেম্বরের পর এল জানুয়ারী, জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী, ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ, এরকম করে জুন মাস চলে এল, কিন্তু বৃষ্টি এল না। দিনের পর দিন গরম আরো বেড়েই যেতে লাগল। পুকুরগুলো শুকিয়ে গেল। গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত সবুজ থেকে বাদামী হয়ে গেল। স্ত্রী-পুরুষেরা লাল উত্তপ্ত চোখে এই প্রচণ্ড গরমে যেন ঝলসে যেতে লাগল।

'ওনাবায় কোনো খাবার নেই,' ডেল আমাকে বলল যখন জুলাই মাসে আমি ওখানে গেলাম! 'এই ইয়ামগুলোকে দেখ', সে একটা গোটা বারো ইয়ামের ছোট্ট স্তূপে লাথি মারল, যার একটাও আমার তর্জনীর থেকে বড়ো নয়। 'আমার চাকর এগুলো কিনে এনেছে দশ শিলিং দিয়ে।'

তুমি তো ভাগ্যবান যে কেনবার মতো কিছু পেয়েছ।' আমি বললাম, 'কোথায় পেলে?'

সে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকালো, তারপর ফিশফিশ করে বলল, 'তোমাকে বলতে বাধা নেই, এক বুড়ী এগুলো মাটির তলার কোনো ভাঁড়ার থেকে খুঁড়ে বার করেছে···আমি ঠিক পুরো ব্যাপারটা জানি না।'

তারপর এরকমই চলতে লাগল। গরীব লোকেরাই অবশ্য সব চাইতে বেশী কষ্ট পেল। কোথাও কোনো খাবার নেই। এমন কি অতি সাধারণ গারি, যা কিনা সমস্ত গ্রামবাসীই কিনতে পারে তাও হয়ে উঠল বিলাস।

কোকোর ব্যবসা ছাড়া, যার জন্য আমাকে ঐ সময়ে ঐ জায়গায় থাকতে হয়েছিল, আমার ঐ ভীষণ জায়গা ছেড়ে আসবার কোনো বাধাই ছিলো না। কিন্তু একজন কোম্পানীর এজেন্টকে তো খাবার না থাকলেও তারই মধ্যে কাজ করে যেতে হবে।

এক সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় আমি যখন ডেলের বাড়িতে যাচ্ছিলাম, তখন দেখলাম একদল লোক খুব গম্ভীর এবং উদ্বিগ্ন মুখে তালগাছের তলায় বসে আছে। যেহেতু আমি ওদের সমাজের কেউ নই, সেইজন্য আমি ওদের মধ্যে গিয়ে জিগ্যেস করতে পারি না যে কিসের জন্য তাদের এই জমায়েত। কিন্তু একটা জিনিস যখন চরমে পৌছয় তখন তা জানবার জন্য ডিটেকটিভের প্রয়োজন হয় না।

আমি ডেলের জানলা দিয়ে ওদের লক্ষ্য করছিলাম। দেখলাম, ঘণ্টা দুয়েক উত্তপ্ত তর্কবিতর্কের পর তাদের মিছিল খুব ধীরে ধীরে নড়ে উঠল, বুড়োদের সবার মুখ খুব গম্ভীর, এমন কি যুবকেরাও চেষ্টা করছিলো তাদের মুখ গম্ভীর করে রাখতে এবং ইচ্ছে করেই খুবই আস্তে আস্তে পা ফেলে হাঁটছিলো।

'মনে হচ্ছে ওরা বালের বাড়ির দিকে যাচ্ছে,' ডেল বলল।

'হবে হয়তো', আমি সেই মিছিলের দিকে চোখ রেখে বললাম। মিছিলটা বুবা, সাধারণ সুতীর টুপি এবং খালি টাক মাথার এক অদ্ভুত মিশেল যার সমস্তই লাল রঙে ছুপিয়ে গেছে অস্তমিত সূর্যের আলোতে।

ডেল হঠাৎ বলল, 'চল, ওদের অনুসরণ করি।'

'কি?' আমি প্রতিবাদ করলাম। 'তুমি কি পাগল হলে? তুমি জানো তুমি কি বলছ?'

কিন্তু ডেল আমার কথা শুনলো না। সে তার চওড়া কাঁধের ওপর দিয়ে তার পোশাক কোনোরকমে গলিয়ে নিল। আমার বন্ধু ডেলের ব্যাপারটা এই রকমই। সে হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত সব সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে, ফলের কথা চিন্তাই করে না। তখন আর প্রতিবাদ করবার

সময় ছিলো না। এক মিনিটের মধ্যে আমরা দুজনেই রাস্তায় নেমে সেই মিছিলের পেছন পেছন চলতে আরম্ভ করলাম।

দক্ষিণপূর্ব দিক থেকে হাওয়া এসে আমাদের গায়ে লাগছিলো। বাতাস যখন আমাদের মুখে এসে লাগছিলো তখন স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম তাতে জলকণার অস্তিত্ব। আকাশে মেঘ জমেছিলো, প্রতিমুহূর্তেই তা আরো বেশী কালো হয়ে উঠছিলো। কোথাও কি বৃষ্টির কোনো আভাস ছিলো? বছরের প্রথম বৃষ্টি সেপ্টেম্বর মাসে—আর ঠিক সেই সময়েই যখন গ্রামের বৃদ্ধরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। সেই পাখীরা আবার উড়ছে কালো আকাশের গায়ে।

আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম, দেখলাম, বৃদ্ধরা বাড়ির সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। একজন বৃদ্ধ, মনে হল তিনি দলের নেতা, বললেন—

'আমরা কি মোড়লের সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

যে মহিলাটি দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কিছু গণ্ডগোল হয়েছে কি?'

'আমরা মোড়লের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' বৃদ্ধটি আবার বললেন এবং এবার তার সমর্থনে কিছু রাগী গলার গুঞ্জন শুনতে পাওয়া গেল।

'তিনি ঐ মন্দিরে', বৃদ্ধা মহিলাটি বললেন।

মন্দিরের কথা শুনে সবাই যেন একটু বিচলিত হয়ে আকাশের দিকে তাকালো। আকাশে এখন আরো অনেক বেশি পাখী এবং তারা যেন বেশ রাগতস্বরে ডাকছে। বাতাস আরো জোরে বইছে, আমাদের পোশাক যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে। মনে হচ্ছে এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে। আশেপাশে কোনো আচ্ছাদন নেই যেখানে আশ্রয় নেওয়া যায়। হঠাৎ আমি গালের ওপর একটা জলকণার স্পর্শ অনুভব করলাম। আকাশটা চিরে যেন বিজলী চমকালো। কিছু বুঝবার আগেই আমরা সবাই সেই নিষিদ্ধ মন্দিরের দিকে দৌড়লাম।

মন্দিরের বাড়িটা বেশ নিচু। তালপাতা দিয়ে ছাওয়া চাল। ভেতরে যতক্ষণ না চোখ স্তিমিত আলোয় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে মনে হয় যেন রাত্রের মতো কালো অন্ধকার। আমি, প্রথমেই যারা দৌড়ে ঢুকেছিলো তাদের মধ্যেই ছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল এখানে যেন বলি দেওয়া হয়। ঘরের ছাদ থেকে একটি কালো কাঠে কোঁদা মাথা ঝুলছিলো। ঘরের মধ্যে খুব অদ্ভুতভাবেই তাজা রক্তের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিলো।

আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে ডেলের কাছে গেলাম। সে মন্দিরের তিরিশ গজের মধ্যে যেতেই ভয় পাচ্ছিলো। কয়েক মুহূর্ত বাদেই আমি দেখলাম কয়েকজন লোক মন্দির থেকে ফিরে আসছে। তারা আমার মতো তাড়াহুড়ো করছে না, বরং বিষণ্ণ ভাবে আস্তে-আস্তে হাঁটছে।

আরো ভালোভাবে দেখতে গিয়ে, আমি দেখলাম তারা একটা স্ট্রেচারের মতো জিনিস বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্ট্রেচারের ওপর সাদা কাপড় পরানো একটি মানুষের দেহ।

ডেল আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'মোড়ল'।

'মৃত ?' আমার গলার স্বর আর স্বাভাবিক থাকছিলো না।

ডেল মাথা ঝাঁকালো।

এবার হঠাৎ আমার চোখে পড়লো যে আকাশ হঠাৎ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। বৃষ্টির মেঘ সব উড়ে গেছে। পাখীরাও আর ডাকছে না। বাতাস আবার আগের মতোই শুকনো। কিছু বিষয় আছে, যে সম্বন্ধে কথা না বলাই ভালো, তাই আমি এ বিষয়ে কোনো কথাই বললাম না। কিন্তু ডেল আমাকে বলল যে সেও এই বিষয়টা লক্ষ্য করেছে।

'মোড়ল তার কথামতো গ্রামকে ভাসিয়ে দেয়নি।' ডেল বলল, 'সে কি বলত না, যে সে বৃষ্টি তৈরী করতে পারে ?'

'চুপ করো,' আমি বললাম।

ঘটনাটা এইরকমই হয়েছিলো।

ডাক্তাররা পরে বলেছিলো যে মোড়ল হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলো বা ঐরকমই কিছু একটা, আমার ঠিক মনে নেই।

যখন আমরা মোড়লের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি তখন দেখলাম সদর দরজার কাছে একজন লম্বা, কোমল চেহারার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে চিনতে পারলাম, এ সেই প্রথম বৃষ্টিতে মারা যাওয়া চাষীটির ছেলে। ভারী দুঃখের ব্যাপার যে সে তার সৎ বাবাকেও হারালো।

সে জলভরা চোখে বললো, 'এখন আমার আর কোনো আশ্রয় রইল না। মোড়ল, আমার দ্বিতীয় বাবাও মারা গেল।' সে ঠিক একটা বাচ্চার মতো কাঁদছিলো। .

'আমার সঙ্গে এসো।' আমি পরামর্শ দিলাম। 'আমি তোমাকে সুখী করবার চেষ্টা করবো।'

সে চোখের জল মুছে আমাদের সঙ্গে এলো। আহা বেচারা অনাথ! আমরা যখন ডেলের ঘরে ঢুকছিলাম, আমি তখন তার দিকে তাকাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম যে আমি কেমন সৎবাবা হবো। সে ডেলকে ঘরের একদিকে ডেকে নিয়ে তার কানে কানে কিছু বলল। মনে হলো তাদের দুজনের মধ্যে একটা বেশ সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ডেলের মুখে প্রথমে ফুটে উঠলো বিস্ময়ের রেখা, তারপর অবিশ্বাসের আর আশ্চর্যের। সে হাঁ হয়ে রইল।

'অসম্ভব!' সে চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি তা করতেই পারবে না।'

ছেলেটি শুধুই হাসলো।

আমি কৌতুহলী হয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কি করবে?'

সে আমাদের আঁকাবাঁকা পথ ধরে নিয়ে গেল সেই ধ্বংসস্তূপের কাছে যা একসময় ছিল তার বাবার বাড়ি। ভাঙা বেড়ার কাছে সে আমাদের রেখে চলে গেল।

আমার কৌতুহলী প্রশ্নের উত্তরে ডেল বলল যে, সে তার বাবার মন্দিরে গেছে।

মিনিট পনেরো বাদে ছেলেটি ফিরে এল। তার সমস্ত শরীরে ঘাম। তাকে এখন বড়োদের মত দেখতে লাগছে, তার মুখে একটা বিষণ্ণ ভাব। আবার তাকে ডেলের বাড়িতে নিয়ে এলাম। সে কিছুতেই বসতে চাইল না, খেতেও না, এমন কি একটু—আরাম করতেও নয়। সে কেবল পায়চারি করতে লাগলো। মাঝে মাঝে সে জানলার কাছে আসছিলো আর বিড়বিড করছিলো, 'আমার বাবা যখন বেঁচে ছিলো, সেও ঠিক এমনই করতো…মৃত মোড়লকেও সে এমনই শিখিয়েছিলো…যদি আমি কিছু বাদ না দিয়ে থাকি …আবার সে পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল ঘর জুড়ে।

তোমাদের যদি ইচ্ছে হয়, তাহলে একে কাকতালীয় ব্যাপার বলতে পারো, আমি কিছুই মনে করবো না। কারণ আমি আগেই বলেছি যে আমি কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না। এসমস্ত ব্যাপারে আমি খোলা মন রাখতেই ভালবাসি।

আমরা দশমিনিটও বসে থাকিনি, এমন সময়ে শুরু হলো বৃষ্টি। প্রথমে সেটা একেবারেই একপশলা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। তারপর আরম্ভ হলো জোর বৃষ্টি এবং সেই জোর বৃষ্টি একইভাবে চলল চারদিন ধরে। বৃষ্টি ঠিক একই রকম ভাবে হয়ে যাচ্ছিলো। এই ছোট্ট বৃষ্টির কারিগরের তৈরী বৃষ্টিতে কোনো

উদ্দাম উত্তাল ব্যাপার ছিলো না। এমনকি মোড়লের শেষকৃত্য পর্যন্ত সেই বৃষ্টি বন্ধ হওয়া অবধি স্থগিত ছিলো।

সবাই বলতে লাগলো, 'মোড়ল তার প্রতিজ্ঞা রেখেছে। ক্ষেত, রাস্তা সমস্তই জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। ঠিক যেমনটি সে কথা দিয়েছিলো।'

এবং এই সমস্ত সময় জেলের ঘরে সেই ছোট্ট ছেলেটি কেবলই পায়চারি করেছে, আর বলেছে, 'আমার বাবা ঠিক এমনই করতো আর ঠিক এমনই আমাকে শিখিয়েছিল, মারা যাবার আগে।'

অনুবাদঃ শান্তা রায়

প্রতিরোধ ! প্রতিবাদ !

আমেরিকার কালোমানুষদের কবিতা

১. লে রয় জোন্‌স (ইমাম আমিরি বারাকা)

কালো কবিতা

কালো লোকদের একটি কবিতা
আমরা চাই
আর চাই কালো লোকদের জন্য একটি জগৎ
আর বরং
পৃথিবীটাই হ'য়ে উঠুক
একটি কালো কবিতা ।

২. ল্যারি টমসন

কালোই সবার সেরা

কালো যে সবার সেরা
আমার মা আমাকে বলতে ভুলে গেলো
উলটে আমিই তাঁকে বললাম :
কালোই হ'লো সেরা ।
মা ব'লে উঠলো : বাছা, চুপ ক'রে থাক,
অমন কথা বলিস্‌নি ।
আবার আমি বললাম :
মাগো, কালোই সবার ভালো ।
শুনে মা আমায় চাপড় লাগালো ।
তবু কিন্তু আমি বার-বার বলি :
কালোই সবার ভালো
জগৎ সে করে আলো ।

৩. নিকি জোভান্নি

ডাক

ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে—
এসো, আমরা মেতে উঠি তাণ্ডবে,
যা-কিছু আছে সব ধ্বংস করি ।

এসো, আমরা গ'ড়ে তুলি,
গ'ড়ে তুলি তা-ই
আমরা যার শুধু স্বপ্ন দেখি।

৪. নিকি জোভান্নি

মার্টিন লুথার কিং-এর কবর

কবরের মাথায় লেখা :
'মুক্ত, সে আজ মুক্ত'
হায়, এ-মৃত্যু তো শুধু একজন ক্রীতদাসের মুক্তি
আমরা চাই সমস্ত মানুষের মুক্তি
চাই গড়তে সেই পৃথিবী
যেখানে মার্টিন লুথার কিং
নির্ভয়ে বেঁচে থাকতে পারতেন
আর গাইতে পারতেন
প্রেম আর অহিংসার গান।

৫. হেনরি ডুমাস

ওদের ছোঁড়া তীর

আঘাত পাবার ভয় করি না
কারণ এখন বুঝি
ওদের ছোঁড়া তীরগুলো সব
শুধুই বুমেরাং।

৬. কার্টি এম. কুম্বো

কবি

দীর্ঘ
কাব্যময়
উচ্চরব
ক্রুদ্ধ
কৃষ্ণকায়
সগৌরব

৭. **উইলিয়াম জে হ্যারিস**

সত্য—সে বড়োই অগোছালো

মহাশয়া
ফিটফাট ছিমছাম তুমি
সত্য—তার সঙ্গে সে যে বড়ো বেমানান
সত্য—সে বড়োই অগোছালো
এলোমেলো বড়ো—
যেমন তছনছ ক'রে ঐ ঘর
ব'য়ে গেলো ঝড়।

৮. **ল্যাংস্টন হিউজ**

রং

সগৌরবে
ধ্বজার মতো উচ্চে তুলে ধরো
এ তো লজ্জা করার নয়।
উচ্চরবে
গানের মতো গলায় ধ'রে রাখো
এ তো ছিঁচকাঁদুনি
কান্না কাঁদার নয়।

৯. **ডন এল লী**

সচেতনা

নিগ্রো মানুষ চিন্তা করে
নিগ্রো মানুষ নিগ্রো
চিন্তা করে মানুষ করে সমস্তক্ষণ চিন্তা
নিগ্রো মানুষ চিন্তা করে
নিগ্রোদেরই চিন্তা।

অনুবাদ : মোহিতরঞ্জন লাহিড়ী

জুলিয়াস লেস্টার

কালো মানুষদের লোককথা

১০ মানুষ কাজ করে কেন

আকাশ এককালে ছিলো মাটির খুব কাছে। সত্যি বলতে, মাথার ওপর হাত তুললে হাতটা যতটা উঁচুতে ওঠে, আকাশটা কিন্তু তার চাইতে বেশি উঁচুতে ছিলো না। যখনই কারোর খিদে পেতো, তাকে শুধু হাতটা ওপরে তুলে আকাশের একটা টুকরো ভেঙে খেয়ে ফেললেই হ'তো। সেইজন্যেই কাউকে কক্‌খনো কোনো কাজকর্ম করতে হ'তো না।

তা কিছুকাল তো দিব্যি খাসা চললো এই ব্যবস্থায়, কিন্তু সময়-সময় লোকে এমন একেকটা বড়ো টুকরো ভেঙে নিতো যা তাদের পেটেই আঁটে না—ফলে যা তারা খেয়ে শেষ করতে পারতো না, মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিতো। আকাশ কিনা এতই বড়ো যে চিরকালই লোকের খাবার মতো অনেকটা আকাশ থেকেই যাবে। কীই বা এসে যায়, যতটা তাদের দরকার তার চাইতে বড়ো কোনো টুকরো ভেঙে নিলে ?

তা তাদের না-হয় এই ব্যাপারে কিছুই এসে যায় না, তবে আকাশের অনেক কিছু এসে যায়। সত্যি বলতে, নিজেকে আধখাওয়া অবস্থায় মাটিতে প'ড়ে থাকতে দেখে আকাশ রেগেই যেতো। তাই একদিন আকাশ একেবারে হাউমাউ ক'রে উঠলো, বললো, 'বলি, হচ্ছেটা কী, অ্যা ? নাঃ, এ আমি মোটেই বরদাস্ত করবো না! উঁহু, মোটেই না। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করলেই তোমরা এসে যে যেমন-খুশি আমার গা থেকে একেকটা টুকরো ছিঁড়ে নেবে, তারপর এক কামড় খেয়েই বাকিটুকু ফেলে দেবে, এ আর চলবে না। যদি এই বদভ্যেস তোমরা না ছাড়ো, তবে আমি কিন্তু এতই দূরে চ'লে যাবো যে কেউ আর কোনোদিন আমার নাগাল পাবে না। কী, কথাটা মাথায় ঢুকলো ?'

তা মর্মার্থটা লোকে বুঝতে পারলে ঠিকই! সত্যি বলতে, তারা ভালো-

একটা ঝাঁকুনিই খেলো, আর কিছুকাল বেশ খেয়াল রাখলো, যাতে যতটা পেটে ধরে তার চেয়ে বড়ো কোনো টুকরো কেউ আকাশ থেকে ভেঙে না-নেয়। কিন্তু দিনে-দিনে শাসানিটা তারা ভুলতে বসলো। একদিন একটা লোক চল্লিশজন লোকের মাসভর খাবার মতো মস্ত একটা টুকরো ভেঙে নিলো। মাত্র অল্প কয়েকটা ছোট্ট কামড় দিয়ে, ধারগুলো জিভ দিয়ে চেটে-চেটে, বাকিটুকু সে কাঁধের ওপর দিয়ে কোন দূরে ছুঁড়ে ফেলে রাস্তা দিয়ে এমন ভাবভঙ্গি ক'রে হাঁটান দিলে যে অমন পরিতুষ্ট আর আকাট লোক তোমরা কেউ কোনোদিন চোখেও ছাখোনি। হুম! আকাশ কথাটিও কইলে না, শুধু প্রচণ্ড এক হাঁক ছেড়ে সে যতটা উঁচুতে উঠতে পারে ততটা উঁচুতে উঠে গেলো, আর তা উঁচুই, বেশ উঁচু।

লোকের যখন মালুম হ'লো কী কাণ্ড ঘ'টে গেলো, তখন তারা হাউ-হাউ ক'রে কান্নাকাটি জুড়ে দিলে। আর ফিরে আসার জন্য আকাশের কাছে তাদের সে কী কাকুতিমিনতি! তারা শপথ ক'রে বললো যে আর-কখনও তারা এমন কর্ম করবে না, কিন্তু আকাশ এমন একটা ভাব করতে লাগলো যেন একটা কথাও তার কানে যায়নি।

পরদিন তো কারোরই আর একফোঁটা খাবার নেই—কাজেই পেট ভরাবার জন্যে বাধ্য হ'য়ে তাদের কাজে যেতে হ'লো—আর এই জন্যেই সেদিন থেকে লোকে কাজ করে।

২. সাপ কী ক'রে পেলো তার ঝমঝম

ভগবান যখন সাপ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন মাথায় যত সুন্দর-সুন্দর রঙের কথা খেলে গিয়েছিলো, সব তাকে দিয়ে দিয়েছিলেন—সব লাল, বাদামি আর কমলার ছোপ—আর তারপর তিনি সাপকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এখানে যাতে সে সব জমি আর ঝোপঝাড়ের শোভা বাড়িয়ে দেয়, সবকিছুতেই যাতে একটু রং লাগিয়ে দেয়।

তা, পৃথিবীকে এভাবে সাজাতে সাপ মোটেই কোনো আপত্তি করলে না, কিন্তু মাঝে-মাঝে সে ভাবতো ভগবান কি জানেন তার জীবনটা কেমন কষ্টের। আর কষ্ট ব'লে কষ্ট! তাতে সন্দেহের কোনো লেশ নেই। পাখিদের মতো তার ডানা নেই—তাই সে উড়তে পারে না। মাছেদের মতো তার কানকো আর পাখনা নেই—তাই নদীতে সাঁতার কাটতে যেতে

পারে না। তার পা নেই—কাজেই সে জোরে ছুটতে পারে না। তাকে খালি-খালি ধুলোবালিতে বুকে হেঁটে বেড়াতে হয়। এতোতেও সে কিছু মনে করতো না, কিন্তু এটা সে বুঝতে পারতো না যে কেন ভগবান তাকে এত কম চোখের তেজ দিয়ে পাঠিয়েছেন। সত্যি, সাপ ছিলো এমনই ডাহা অন্ধ যে তুমি যদি তার চোখের ওপর টর্চের আলো ফ্যালো তবে তাও সে দেখতে পাবে না। সে ছিলো এমনই ডাহা অন্ধ যে নিজের হাত দুটো চোখের কাছে এনে ধরলেও সে দেখতে পেতো না—অবশ্য যদি তার কোনো হাত থাকতো। তার চোখের দৃষ্টি এতই খারাপ ছিলো যে তাকে গন্ধ শুঁকে-শুঁকে সবকিছু করতে হ'তো। আর, সত্যি কথা বলবো? তার গন্ধ শোঁকার ক্ষমতাও তেমন কিছু আহা-মরি ছিলো না।

এখন নিশ্চয়ই তোমরা আন্দাজ করতে পারছো যে সাপকে যদি মুদিখানায় বা কাপড় কাচার দোকানে যেতে হ'তো তো তার দশাটা কেমন হ'তো। একে অমনভাবে ঘুরে বেড়াতে হয় বুকে হেঁটে ধুলোবালিতে, তায় আবার আধা অন্ধ—সব সময়েই এ ও তাকে মাড়িয়ে যায়। কেউ আসছে কি না, সে তা দেখতেই পায় না, এদিকে সে তো প'ড়ে আছে মাটিতে, তাই অন্যরাও তাকে ঠিক ঠাহর করতে পারে না। অন্য জীবজন্তু যে ইচ্ছে ক'রে তাকে মাড়িয়ে যায় তা নয়, কিন্তু বোঝোই তো, সময়-সময় কেমন-সব ব্যাপার হয়। হয়তো কোথাও যাবার জন্য তোমার দারুণ তাড়া, কোথায় কোনখানে কোন সাপ প'ড়ে আছে ডাহা অন্ধ আর একেবারে অকর্মা এক নাক নিয়ে—তা খেয়াল ক'রে দেখার তোমার সময় কোথায়? কোনো-কোনো দিন, কোথাও যাবার কথা ভাবতেই সাপের এমন ক্লান্ত লাগতো যে সে এমনকি উঠে বসারও কোনো চেষ্টা করতো না।

সাপগিন্নিও এই অবস্থায় খুব-একটা সুখী ছিলো না। ছানা সাপেদের নিয়ে একটু যে খেলার মাঠে যাবে, তাও আর তার ইচ্ছে করে না। অন্য ছেলেপুলেরা ভাবে যে এরা হচ্ছে লাফিয়ে ডিঙোবার চমৎকার সব রংচঙে দড়ি। তাই সব ছানাপোনাদের নিয়ে সাপগিন্নিকে সারাদিন বাড়িতে বন্দী হ'য়ে থাকতে হয়, আর বাড়ির মধ্যে তারা যে হুলুস্থুল কাণ্ড করে তাতে সে বুঝি পুরোপুরি পাগল হ'য়েই যাবে একদিন। 'আচ্ছা, তুমি কী বলো তো? এ বিষয়ে তুমি কিছু করতেও পারো না,' একদিন সাপগিন্নি তার স্বামীকে লক্ষ্য ক'রে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় ক'রে তুললো। 'এই তো, আজ সকালে

কাপড় কেচে বাইরে টাঙাতে গিয়েছিলুম কাপড় শুকোবো ব'লে—আর আমাকে একটু হ'লেই ছুটো তাগড়াই মোষ, তিনটে মস্ত হরিণ, আর এমনকি একটা ছোট্ট খরগোশ কিনা একবারে চ্যাপ্টা ক'রে ফেলতো! আমি একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছি! তুমি যদি আদ্ধেকও সাপ হও তো এ-বিষয়ে তোমার একটা-কিছু করা উচিত।'

কত্তা-সাপ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এ-সব কথা কি আজই প্রথম কানে এলো! এর আগে তো কতবারই…'তা, তুমি আমার কাছে কী আশা করো, শুনি? ছুটো হাত গজাবো? ভগবান আমাদের এই ভাবেই তৈরি করেছেন—এ-ব্যাপারে আমি আর কী করবো, বলো!'

'কে বলেছে? আমি যেমন জানি, তুমিও তেমনি ভালোই জানো যে ভগবান আদ্ধেক সময়ই খেয়াল ক'রে ছাখেন না তিনি কী করছেন। উনি তো ওখানে ব'সে থাকেন দিব্যি খোশ মেজাজে, আর এটা-ওটা নিয়ে দিব্যি এক্সপেরিমেণ্ট চালিয়ে যান। আমরাও তাঁর ও-রকম একটা এক্সপেরিমেণ্ট, যার গোড়াতেই গলদ ছিলো! এ-সম্বন্ধে তোমাকে কিছু একটা করতেই হবে, না'হলে আমি জানতে চাই তোমার টুঁ শব্দ না-করার কারণটা কী। তুমি একটা কী—কিস্সু না, কুঁড়ের হদ্দ, তুমি তো কোনো ধর্তব্যেই আসো না। মা আমাকে ঠিকই বলেছিলেন তোমাকে বিয়ে না করতে! আমার উচিত ছিলো তখনই তার কথা শোনা।' সাপগিন্নি তারপর থেকে তাকে এক-নাগাড়ে গালাগাল ক'রেই চললো। সারা বাড়িতে তারপর সে দাপাদাপি করতে লাগলো—তাকে থামায় সাধ্য কার! এমনকি এটা অব্দি সে বললে যে সাপকত্তার মা নাকি ছিলো এক গিরগিটি আর বাবা এক কেঁচো।

তা, সাপকত্তা সেদিন কোন নম্বরে খেলবেন তা নিয়ে ভাববার চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু তাতে যে একটু মন বসাবেন তার জো কী—গিন্নি এমন চীৎকার জুড়ে দিয়েছেন! শেষটায় সে ঠিক করলে বুকে হেঁটেই চ'লে যাবে স্বর্গে, গিয়ে ভগবানের সঙ্গে কথা ব'লে ব্যাপারটার একটা ফয়সালা ক'রে আসবে। ভগবান যে কিছু করতে পারবেন, সে-বিশ্বাস তার ছিলো না—তবে তাতে গিন্নির মুখটা অন্তত একটু বন্ধ হ'বে—যদি ভগবান সরাসরি তাকে ডেকে ছু-কথা বলেন।

•

তখন বেলা ছুটো, সাপ গিয়ে স্বর্গে পৌঁছুলো। ভগবান তাঁর মস্ত দোল-

কেদারায় ব'সে টি. ভি. তে কী দেখানো হবে তার কাগজ পড়ছিলেন। 'তা, সাপমশাই, কী খবর ?'

'নাঃ, খবর আর কী ! পুরোনো কাসুন্দি। আপনি তো জানেনই।'

'হুম, বুঝলাম তুমি কী বলতে চাইছো। নাও, একটা চেয়ার টেনে বোসো। আমি ব'সে-ব'সে দেখছিলাম ১৯৭০ সালে টেলিভিশনে কী দেখানো হবে। অবশ্য, ১৯৭০ আসতে অনেক দেরি, তবে আমি ভাবছিলাম এখন থেকেই ঠিক ক'রে রাখি কী-কী দেখানো হবে—যদি তখন ভুলে ছুটিতে বেড়াতে যাই।'

সাপ একটা চেয়ারে কুণ্ডলি পাকিয়ে বসলো।

'চুরুট চলবে না কি, সাপমশাই ?'

'ধন্যবাদ প্রভু, তবে চুরুট খাই না।'

'আমিও ধূমপান কমিয়ে দেবার কথা ভাবছিলাম। আমার গিন্নি বলেন আমি নাকি বড্ড বেশি চুরুট খাই। তিনি বলেন তাতে আমার মুখে নাকি গন্ধ হয়।'

'তাই বুঝি ?'

'তিনি অন্তত তা-ই বলেন, সাপমশাই, যদিও আমি কথাটা মোটেই বুঝতে পারি না। প্রতিবার খাবার পরেই তো আমি দাঁত মাজি। তা, এ-সব থাক। আপনি এখানে কী মনে ক'রে ? আপনাকে তো তোফা দেখাচ্ছে—বেশ ভালো।'

'না প্রভু, আমি ভালো নেই।'

'ও-কথা বলবেন না !'

'সত্যি বলছি, প্রভু। এখানে এসে আপনাকে এভাবে জ্বালাতন করতে আমার খুবই খারাপ লাগে—জানি তো, আপনি কেমন ব্যস্ত থাকেন সবসময়। কিন্তু আমার স্ত্রী—তিনি একদণ্ডও আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দেবেন না যদি না আমি একটা হেস্তনেস্ত করি।'

'তা, আপনি বরং পুরো ব্যাপারটা খুলেই বলুন।'

'প্রভু, ব্যাপারটা এইরকম : আপনি তো জানেনই আমার চোখ তেমন সুবিধের নয়। আমাদের বংশেরই বোধ হয় এই ধারা—মা-বাবা দুই তরফেই। আর সব সময়েই তো মাটিতে প'ড়ে থাকতে হয় আমাকে—আমি বুঝতেই পারি না কখন অন্য-কেউ রাস্তা দিয়ে আসছে। তার ফলে আমি আর

আমাদের বাড়ির সব্বাই সবসময় অন্য প্রাণীদের পায়ের তলায় চাপা প'ড়ে যাচ্ছি। আর প্রভু, আমার সারা গায়ে সে কী ব্যথা—আর আপনি তো জানেনই আমার পেশী নেহাৎ অল্প নেই—কাজেই ব্যথার পরিমাণটা কত! এই দশায় আমার স্নায়ু এমনি হ'য়ে আছে যে গাছের পাতার ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়লেও আমি আঁৎকে উঠি।'

'হুম, আপনার দশা তো বেশ খারাপ, সাপমশাই।'

'আমি মাথাধরার ওষুধ খেয়েছি, স্নায়ু ঠাণ্ডা করার ওষুধ খেয়েছি—একগাদা ওষুধ, নার্ভের রোগে যা-যা দেয়, কিন্তু প্রভু, কিছুই কোনো কাজে আসেনি। মাঝে-মাঝে যেই মনে ভাবি যে বাইরে গেলেই লোকে আমাকে মাড়িয়ে যাবে, অমনি আমার আর বিছানা ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করে না।'

ভগবান তাঁর একটা মস্ত চুরুট ধরিয়ে নিয়ে কয়েক মিনিট ধ'রে নাক মুখ দিয়ে ভকভক ক'রে ধোঁয়ার আংটা ছাড়লেন। 'তোমার দশা যে এমন হবে, তা আমি মোটেই চাইনি।' হাত ঢুকিয়ে তিনি পকেট থেকে একটা ছোট্ট বোতল বার ক'রে আনলেন। 'এই যে, এ হ'লো বিষ। এটা আপনি আপনার মুখে রাখুন আর বাকিটা আত্মীয়-স্বজনকে দিয়ে দিন। আত্মরক্ষার জন্য এটা আপনি ব্যবহার করবেন। কেউ যেই আপনাকে মাড়াবে, অমনি দেবেন তাকে ছুবলে, আর একটু বিষ ঢেলে দেবেন—ব্যস, তাতেই কাজ হবে।'

'ধন্যবাদ প্রভু, আন্তরিক ধন্যবাদ।'

'না-না, এ আর কী। আপনাদের সাহায্য করতে পারলেই আমার ভালো লাগে। যদি আর কোনো সমস্যা দেখা দেয় তো আমাকে শুধু একবার খবর দেবেন।'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে বাড়ি ফিরতে একফোঁটা সময় নষ্ট করলো না সাপ। যখন বৌকে গিয়ে সে বিষের কথা বললে বৌ তো তাকে আদরটাদর ক'রে একশা। সাপ অবশ্য বৌকে বললে যে চেপে যেতে, বরং গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ুক।

তা, কয়েকদিন পরে, খরগোশ সারা বনের ভেতর খবর পাঠালে যে সব জীবজন্তুই যেন তাদের ইউনিয়নের প্রতিনিধি পাঠায় সভায়। সব জীবজন্তু—তবে, সাপ বাদ।

'এখন সভার কাজ আরম্ভ হচ্ছে!' খরগোশ ঘোষণা করলে। 'ঐ যে, ওহে, হস্তীপ্রবর! আপনি কি কোথাও একটু বসতে পারেন না—আপনি তো সূর্যের আলো আটকে দিচ্ছেন। এটা ককখনো আমার মাথায় ঢোকেনা কেন যে ভগবান জঙ্গলের সেরা বুদ্ধুটাকে সবচেয়ে বৃহদাকার ক'রে সৃষ্টি করেছেন!'

হাতি ব'সে পড়লো।

'আপনি এখনো কিন্তু রোদের আলো আড়াল ক'রে রেখেছেন, হস্তীপ্রবর!'

'আমি দুঃখিত, খরগোশ মশাই।'

'যাক-গে, ব্যাপারটা আসলে আপনার দোষ নয়। তবে আপনার মাথাটা একপাশে একটু হেলিয়ে রাখতে পারবেন তো, যাতে খানিকটা আলো আসতে পারে?—আচ্ছা, এভাবেই হবে! এখন, সব্বাই তো আপনারা জানেন কেন আজ আমি এই সভা ডেকেছি। কারণটা হ'লো ঐ সাপ! এ-বিষয়ে কিছু-একটা আমাদের করা উচিত, এবং এক্ষুনি, আমাদের সব্বাইকে ও খতম ক'রে দেবার আগেই কিছু একটা করা চাই। এ-হপ্তায় আমাকে সবসুদ্ধ তেরো-তেরোটা অন্ত্যেষ্টিতে যেতে হয়েছে—আর আজ কি না মাত্র মঙ্গলবার!'

'আপনি কী বলতে চাইছেন, তা আমি জানি,' ব্যাঙ ঘ্যাঙোর ঘ্যাঙ ক'রে উঠলো। 'ঐ সাপ আমার তিন খুড়োকে কেটেছে আজ অব্দি, মাসতুতোভাই, দুই মাসি আর আমার জামাইবাবুও বিলকুল খতম। তবে, এটা অবশ্য বলবো যে ঐ জামাইবাবুর অন্তর্ধানটা একদিক থেকে আশীর্বাদের মতোই।'

'হুম, আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ, কিছু এসে যায়-না। ভগবান যেদিন ওকে বিষ দিয়েছেন, সেদিন থেকেই ঐ সাপটা এ-তল্লাটের বিভীষিকা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ঝোপে-ঝাড়ে যে-ই নড়াচড়া ক'রে, তাকেই সে ছোবলাচ্ছে। সে যে চোখে দ্যাখে না, তা ঠিক, কিন্তু কানে শুনতে তো তার আটকায়-না। আরো, ছোট্ট একটা সরসর শুনলেই সে গিয়ে অমনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

ঘোড়া বললে, 'আর কী তার তাগ—একেবারে সবার সেরা—আমি কখনো অমন তাগ দেখিনি—কখনো ফসকায় না।'

'কাকে শেখাচ্ছেন?' খরগোশ ব'লে উঠলো, 'সেদিন দেখলুম ঝোপের একটা পাতা একটু কেঁপে উঠলো—আর আপনারা নিশ্চয়ই জানেন সে-পাতাটা এখন একটা মরা পাতা, ঝরা পাতা। সাপ যে কত রকম বিষ ঐটুকুনি পাতায় ঢেলে দিয়েছিলো—

'তা, এ-বিষয়ে আমরা এখন কী করবো, তবে?' খ্যাঁকশেয়াল জানতে চাইলো।

'ওকে কেটে পড়তে বলো, নইলে আমরাই ওকে সাবাড় ক'রে দেবো,' বললে চিতাবাঘ। 'ওকে বলো যে আর যদি কখনো ওর ঐ দু-ফলা জিভ দিয়ে কাউকে ছোঁয় তো ওকে আমরা তক্ষুনি খতম ক'রে ফেলবো।'

'ধরা যাক, ওর ঐ দু-ফলা জিভ দিয়ে কাউকে ও ছুঁয়েই দিলো আর আপনি ওকে সাবাড় করতে পারলেন না,' খরগোশ জিগ্যেস করলে।

'ঠিক কথা,' প্যাঁচা সায় দিলে। 'গুণ্ডার সর্দারকে মোকাবিলা করবে কে বটে?'

হাতি বললে, 'আমরা তো ওকে ভালো ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলতে পারি, বলতে পারি যে আমরা ওর কোনো ক্ষতি করতে চাই না, শুধু আমরা আমাদের বাঁচবার অধিকার চাই। এ কথাটা তার অন্তত বোঝা উচিত।'

'সেই কথাটাই তো আমি আগে জিগ্যেস করেছি—ভগবান কেমন ক'রে কাউকে এমন মস্ত ক'রে তৈরি করলেন যে তাকে মগজ দিলেন মাত্র এইটুকুনি! যদি আপনার মগজটাকে একশোগুণ বাড়িয়ে দেয়া যায়, তবে একটা পোকার নাভির মধ্যে সেটাকে আঁটানো যাবে—কর্নফ্লেক্সের কৌটোয় বি-বির মতো সেটাকে তখন ঝমঝম ক'রে বাজানো যাবে। কী, কিছু ঢুকলো মগজে? সে যা বুঝতে চাইবে না তা বুঝতে যাবার জন্য তার দায় কী—অন্তত যতদিন তার ও-রকম দুর্দান্ত ক্ষমতা আছে।'

আলোচনা চললো তো চললো তো চললোই—এতক্ষণ ধ'রে যে শেষটায় খরগোশের একেবারে এমন ঘেন্না ধ'রে গেলো যে সে নিজেই, একাই, ছুটলো স্বর্গে। ওরা তো অনন্তকাল আলোচনা চালাবে, তারপর ঠিক করবে যে কাকে স্বর্গে ভগবানের কাছে কথা বলতে পাঠানো উচিত। খরগোশ শুধু একবার মনে-মনে ভাবলে সব প্রাণীদের মধ্যে শুধু কি তার মাথাতেই খানিকটা কাণ্ডজ্ঞান আছে?

খরগোশ গিয়ে যখন দাওয়ায় পৌঁছুলো, ভগবান তখন ব'সে ব'সে খবর-কাগজ পড়ছিলেন। 'হ্যাঁ, খরগোশ মশাই—শুধু আপনাকেই ব'লে রাখি। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০-এর মধ্যে আমাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর আপনি যদি আমার পরামর্শ শোনেন তো আপনারও কোথাও গিয়ে গা-ঢাকা দেয়া উচিত। ঐ দশ বছর সত্যি দারুণ খারাপ যাবে।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ দশ বছরে আমি কারোর কাকুতিমিনতিই শুনবো না।'

'প্রভু! আপনি বলছেন কী?'

'আপনি শুধু মনে রাখবেন আমি কী বললাম, ব্যস।' ভগবান খবর-কাগজটা ভাঁজ ক'রে তাঁর চেয়ারের পাশে রাখলেন। 'তা, এবার ব'লেই ফেলুন আপনার মনের মধ্যে কী আছে।'

'ওটা ঐ সাপ।'

'ও তো কয়েকদিন আগেই এখানে এসেছিলো।'

'তা কি আর আমরা টের পাইনি ব'লে আপনি ভেবেছেন। আপনি তাকে কী সব বিষ দিয়েছেন, আর সে এরই মধ্যে এত জীবজন্তুকে ছুবলেছে যে, অন্য অনেকে ভাবছে তল্পিতল্পা গুটিয়ে দূরে উত্তরে চ'লে যাবে কিনা। সব্বাই এত ভয় পেয়েছে যে রাত-বিরেতে বৌ মেয়েকে বাইরে বেরুতেও দিতে চায় না। হ্যাঁ, আমি একেবারে নির্জলা সত্যি কথা বলছি। ভগবান, ঐ সাপ সবসুদ্ধ তিনশো সাঁইত্রিশ জনকে ছুবলেছে, এ ছাড়া পাঁচটা ওকগাছ, সতেরোটা তালগাছ আর একটা কাঁটাঝোপও হিসেবে ধরবেন। হা! হা! হা! কাঁটা ঝোপটাকে ছোবলাবার সময় ওকে আপনার স্বচক্ষে দেখা উচিত ছিলো। হা! হা! হা! তারপর দু-ঘণ্টা ধ'রে ওর বৌ ওর মুখ থেকে কাঁটা আর শুঁয়োগুলো টেনে-টেনে খুলছিলো! ঠিকই সাজা হয়েছিলো, ব্যাটা অধম—'

'হু-হু, ব্যাপারটা আমি বুঝে নিয়েছি। আপনি ফিরে গিয়ে সাপকে বলুন যে, ও যেন এখানে চট ক'রে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে।'

'আজ্ঞে, তার কাছে গিয়ে পড়া একটু বিপজ্জনক হবে, প্রভু।'

'তা আপনি হাতিকে গিয়ে বলুন সে যেন চেঁচিয়ে সবদিকে খবরটা জানান দেয়। সাপ মশাইয়ের কানে তো আর কোনো দোষ নেই।'

কয়েক ঘণ্টা পরে দেখা গেলো সাপকর্তা ভগবানের পাশে একটা চেয়ারে কুণ্ডলি পাকিয়ে ব'সে আছে।

'প্রভু, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ—কয়েকদিন আগে যে মোক্ষম দাওয়াই আমাকে দিয়েছেন তার তুলনা হয় না। তারপর থেকে কোনো প্রাণীই আমাকে আর মাড়িয়ে যেতে পারেনি।'

'ঠিক ঐ বিষয়েই আলোচনা করবার জন্য আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি। আমি আপনাকে বিষ দিয়েছিলাম আত্মরক্ষা করার জন্য ব্যবহার

করতে—কিন্তু এখন এ-সব কী শুনছি—আপনাকে তো আমি আক্রমণ করতে বলিনি।'

'আজ্ঞে, প্রভু, আপনি তো জানেনই আমার চোখ তেমন ভালো নয়—ফলে কে যে বন্ধু আর কে যে শত্রু তা আমি দেখতেই পাই না। কাজেই যার সঙ্গেই মোলাকাৎ হয় তাকেই আমি ছুবলে দিই—তাতে ক'রে সবসময়েই আমি দিব্যি নিরাপদে থাকতে পারি। আমাকে এতবার এতজনে মাড়িয়ে গেছে যে আর আমি কোনো ঝুঁকি নিতে পারি না।'

'তা আমি বুঝতে পারি, সাপমশাই। কিন্তু এখন তো আপনি দেখছি সবাইকেই বিভীষিকা দেখাচ্ছেন।'

'আমি তা করতে চাইনি, প্রভু। সত্যি বলছি, আমি তা মোটেই করতে চাইনি।'

ভগবান তাঁর পকেটে হাত ঢোকালেন। 'এই যে। আপনি এই ঝুমঝুমিগুলো নিন, নিয়ে ল্যাজে আটকে দিন। যখনই আপনি কোনোকিছুর সাড়া পাবেন, অমনি ল্যাজ আছড়াবেন, সেটা যথেষ্ট সাবধানবাণী হবে। যদি সে আপনার বন্ধু হয় তো সে থেমে যাবে, আপনার সঙ্গে সারাদিন চুটিয়ে আড্ডা দেবে। আর যদি কোনো শত্রু হয়, আর ঝমঝম শোনবার পরও এগিয়ে আসে, তাহ'লে তারপর আপনি যা ভালো বোঝেন—সে আপনাদের দু'জনকার ব্যাপার। বুঝলেন?'

'হ্যাঁ, প্রভু বুঝেছি। আবারও আপনাকে ধন্যবাদ। যা-ই কাছে আসে, তাকেই ছোবলাতে হবে—ব্যাপারটা বড্ড ক্লান্তিকর হ'য়ে উঠছিলো। সত্যিই ক্লান্তিকর।'

আর এইভাবেই সাপ পেয়ে গেলো তার ঝমঝম। ততদিনে অবিশ্যি ভয়ে সব্বাই এমনি আধমরা হ'য়ে গিয়েছিলো যে কেউই পারতপক্ষে তার ধারে-কাছে ঘেঁষেনি। তবে, যখন কেউ এসে পড়তো হঠাৎ, সাপ এমন জোরে-জোরে তার ল্যাজ ঝমঝম করতো যে সমস্ত বন জুড়ে সে-আওয়াজ শোনা যেতো, সবাই জানতে পারতো যে: এখানে শ্রীল শ্রীযুক্ত সর্পমহারাজ আছেন—আর কেউ আমাকে মশাই মাড়িয়ে যেতে পারবেন না।

অনুবাদ: শান্তা সরকার

হাভিয়ের এরাউদ

এক গেরিলা যোদ্ধার বিবৃতি

যেহেতু আমার স্বদেশ
কোনো খাপ-খোলা তলোয়ারের মতো সুন্দর
আর আরো-গরীয়ান, এখন, এমনকি
সুন্দরতর, আমি
তারই কথা বলি সবসময় আর প্রাণ দিয়ে
তাকে রক্ষা করি।
দেশদ্রোহী ? ওরা কী বলে
তার কী তোয়াক্কা করি আমি ?
গিরিসংকট বন্ধ ক'রে দিয়েছি
ইস্পাতের
বিশাল অশ্রুতে।
আকাশ আমাদের।
আমাদেরই দৈনন্দিন রুটি, আমরাই
বীজ বুনেছি আর ফলিয়েছি
ফসল আর মাটি,
এ-সব আমাদের, আর আমাদেরই, এখন,
চিরতরে
সমুদ্র,
পাহাড়
আর পাখিরা।

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এদুয়ার্দো গালেয়ানো

সোনার লোভ রূপোর লোভ

১. তলোয়ারের বাঁটে ক্রুশ

ক্রিস্টোফার কলম্বাস যেদিন, খ্রীস্টীয় জগৎ-এর পশ্চিমে, বিশাল শূন্যতায় পাড়ি দেন, সেদিনই কিংবদন্তীর আহ্বান তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ভয়ঙ্কর ঝড় তাঁর জাহাজগুলোকে নিয়ে খেলা করবে, যেন তারা বাদামের খোলা, আর ছুঁড়ে দেবে রাক্ষসদের চোয়ালে; নরমাংসলোলুপ সিন্ধুনাগ, ওত পেতে থাকবে কালো অতলে। পনেরো শতকের মানুষদের মতে তখন, শেষ বিচারের শুদ্ধকর আগুনে পৃথিবী ধ্বংস হ'তে মাত্র হাজার বছর বাকি; আর পৃথিবী বলতে তখন বোঝাতো, ভূমধ্যসাগর আর তার অনিশ্চিত দিগন্ত: ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া। পর্তুগালের নাবিকেরা কিছু অদ্ভুত মরদেহ আর আশ্চর্য সব খোদাই-করা কাঠের ফলক পশ্চিম বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসার কথা বলাবলি করেছিল, কিন্তু কেউ সন্দেহও করেনি যে পৃথিবীটাকে চমকপ্রদভাবে বিস্ফারিত করে দিতে চলেছে একান্ত এক নতুন দেশ।

আমেরিকা তখন শুধু নামহীনই নয়। নরওয়ের লোকেরা বুঝতেই পারেনি যে কতকাল আগেই তাকে তারা আবিষ্কার করেছে, আর স্বয়ং কলম্বাস এই বদ্ধমূল ধারণা নিয়ে মারা যান যে, তিনি পশ্চিমপথে এশিয়ায় পৌঁছেছিলেন। ১৪৯২-এ স্পেনের নৌকো যখন বাহামার পাড় ঘেঁষে যাচ্ছে, তখন ঐ দ্বীপগুলিকে নৌ-সেনাপতি মনে করেছিলেন কিংবদন্তীর দ্বীপ জিপাংগো বা জাপানের ফাঁড়ি। কলম্বাসের সঙ্গে ছিল মার্কো পোলোর বই, আর তার পাতার মার্জিনগুলো তিনি ভর্তি করেছিলেন নানা মন্তব্যে আর টীকায়। মার্কো পোলো বলেছিলেন, "জিপাংগোর অধিবাসীদের, প্রভূত পরিমাণে সোনা আছে। উৎস অফুরন্ত।... এই দ্বীপে প্রচুর সংখ্যক মুক্তো আছে যার রঙ লাল, গড়ন গোল, আকার বৃহৎ ডিমের তুল্য বা তারও বেশী।" (১) জিপাংগোর ঐশ্বর্য সম্পর্কে মহামান্য কুবলা খান-ও শুনেছিলেন, ফলে তাকে হাতিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে তাঁর

চাপিয়ে ওঠে, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হ'ন। মার্কো পোলোর উজ্জ্বল পাতাগুলো থেকে জগৎ-এর সব কাম্য জিনিসগুলো লাফিয়ে বেরিয়ে আসে: ইন্ডিয়ান সাগরগুলোতে প্রায় তেরো হাজার দ্বীপে মজুত সোনা ও মুক্তোর পাহাড় আর অঢেল সাদা ও কালো মরিচ ছাড়া আরো বারো রকমের প্রচুর মশলা।

মাংস যাতে পচতে না পারে বা শীতকালে তার গন্ধ নষ্ট না হয়, তার জন্যে লবণের মত মরিচ, আদা, লবঙ্গ, জায়ফল আর দারুচিনিরও সমান কদর ছিল। রহস্যে ঘেরা প্রাচী-র মশলা, গাছগাছড়া, মসলিন আর তলোয়ারের লেনদেনের কারবার একচেটে ছিল দালাল আর ফাটকাবাজদের; তাদের গুরুভার থেকে মুক্তি পেতে আর উৎস-এর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তৈরী করতে স্পেনের ক্যাথলিক শাসকেরা ঐ অভিযানকে মূলধন যোগানো মনস্থ করেন। বাণিজ্যিক লেনদেন যে দামী ধাতুগুলির মারফৎ চলত, তাদের পাবার লোভও সাজ্ঘাতিক সব সাগর পাড়ি দিতে মানুষকে উত্তেজিত করে। তখন গোটা ইউরোপের রুপোর দরকার; বোহেমিয়া, স্যাক্সনি আর টাইরোল-এর স্তরগুলি, শেষপ্রায়।

স্পেনের তখন পুনর্দখলের যুগ: ১৪৯২ শুধু নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের সন নয়, গ্রানাদা ফিরে পাওয়ারও সন; এই নতুন পৃথিবীর জন্ম একটি ভুলের থেকে, যদিও তার ফল হল ব্যাপক। আরাগন-এর ফার্দিনান্দ আর কাস্তিয়ের ইসাবেলার বিবাহের ফলে তাঁদের রাজ্যগুলো এক হয়; আর ঐ বছরের গোড়ায় তাঁরা স্পেনের মাটিতে গেড়ে থাকা শেষ আরব ঘাঁটির ওপর প্রচণ্ড হামলা চালান। সাত বছরে যা হারিয়েছিল তা ফিরে পেতে প্রায় আট শতক সময় লাগে, কিন্তু এই পুনর্দখলের যুদ্ধ রাজকোষ শূন্য করে দেয়। তবু এই যুদ্ধ ছিল পবিত্র যুদ্ধ, ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রীস্টীয় যুদ্ধ আর ঐ একই সন ১৪৯২-এ ১৫০,০০০ ইহুদিকে যে দেশছাড়া করা হয়েছিল, তা মোটেই কাকতালীয় ছিল না। স্পেন রাষ্ট্র হিসেবে এক এবং তা সম্ভব হতে পেরেছিল, বাঁটে ক্রুশ লাগানো তলোয়ার হাতে নিয়ে। রাণী ইসাবেলা এই পবিত্র ইনকুইশিজান-এর পৃষ্ঠপোষক। কাস্তিয়ের মধ্যযুগে জেহাদের যে রেওয়াজ চলেছিল, কেবল তার নিরিখেই আমেরিকা আবিষ্কারের কৃতিত্ব বোঝা যেতে পারে; সাগর পাড়ি দিয়ে অচেনা অজানা দেশ জয়ের অভিযানকে পারমার্থিক অনুমোদন দিতে চার্চকে আভাস দেবারও দরকার হয়নি। পোপ আলেকজাণ্ডার VI, যিনি আবার স্পেনীয় ছিলেন, রাণী ইসাবেলাকে নতুন পৃথিবীর স্বত্বাধিকারিণী ও সম্রাজ্ঞী নিয়োগ

করেন। কাস্তিয়ের সাম্রাজ্যবিস্তার পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের সীমানা বাড়িয়ে দেয়।

কলম্বাস হাইতির নাম রেখেছিলেন এস্‌পেনোলা; আর স্বয়ং তিনি আবিষ্কারের তিন বছর পরেই হাইতির বাসিন্দাদের ওপর হামলা চালান। জনাকয়েক ঘোড়সওয়ার, দুশো পাইক ও কিছু বিশেষ তালিম দেওয়া কুকুর দশ ভাগের এক ভাগেরও বেশী ইন্‌ডিয়ানকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। পাঁচশোরও বেশী, জাহাজে করে স্পেনে পাঠিয়ে সেভিয়ে-তে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রী করা হয়; সেখানে তাদের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। কিছু ধর্মতাত্ত্বিক প্রতিবাদ করেন, আর ষোলো শতকের গোড়ার দিকে ইন্‌ডিয়ানদের ক্রীতদাস করা আইন করে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আদতে তাকে নিষিদ্ধ নয়, আশীর্বাদ করা হয়েছিল: প্রতিটি সামরিক অভিযানের আগে, তার সেনাপতিকে, দোভাষী ছাড়া কিন্তু এক রাজকর্মচারীকে সামনে রেখে, ইন্‌ডিয়ানদের পবিত্র ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা নেবার জন্যে আবেদন করে এক লম্বা অলঙ্কৃত ভাষণ Requerimients পড়তে হ'ত:

তোমরা যদি দীক্ষাগ্রহণ না কর, বা গ্রহণে বিদ্বেষবশতঃ বিলম্ব কর, তবে আমি নিশ্চিতরূপে ঘোষণা করিতেছি যে, ঈশ্বরের সহায়তায় আমি সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া অগ্রসর হইব ও যে-কোনো স্থানে ও যে-কোনো প্রকারে সম্ভব যুদ্ধ করিব। চার্চ ও তার কৃপাধন্যদের বশ্যতা ও আনুগত্য মানিয়া লইতে তোমাদের বাধ্য করিব। তোমাদের স্ত্রী ও শিশুদের দাস রূপে গণ্য করিয়া মহিমাময়দের আজ্ঞানুসারে তাহাদের বিক্রয় ও হস্তান্তর করিব ও তৎসহ তোমাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া তোমাদের ক্ষতি ও অনিষ্টসাধনে যথাসাধ্য প্রবৃত্ত হইব। (২) আমেরিকা খোদ শয়তানের রাজ্য, তার ত্রাণ অসম্ভব, অন্তত সংশয়জনক; কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের ধর্মের বিরুদ্ধে গোঁড়া অন্ধ প্রচারের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে গিয়েছিল নতুন পৃথিবীর ঐশ্বর্যের প্রতি সদ্য আগত বিজেতাদের লোভ। মেক্সিকো দখলের অভিযানে হের্নান কোর্তেস-এর অনুগত সঙ্গী বেরনাল দিয়াদ দেল্ কাস্তিও লিখেছিলেন যে, তাঁরা আমেরিকা এসেছেন, "ঈশ্বর ও মহিমাময় সম্রাটের সেবার্থে ও সেই সঙ্গে ধনসম্পদ পেতে।"

উপদ্রবওয়ালা গোল প্রবালদ্বীপ স্যান সালভাডোর-এ প্রথম পা রেখে,

ক্যারিবিয়ায় স্বচ্ছ রং, সবুজ শোভা, মৃদু পরিষ্কার বাতাস, চমৎকার সব পাখী আর "দীর্ঘ ও সুগঠিত দেহ ও সুন্দর মুখসম্পন্ন", স্থানীয় যুবক যুবতীদের দেখে কলম্বাসের চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের দেন, "কিছু লাল টুপি, পুঁতির মালা আর অল্পদামের কিছু টুকিটাকি," যা ওদের খুব খুশী করে। এইসব পেয়ে ওরা খুব খুশী হয়, আর এর ফলে আমাদের এত বন্ধু হয়ে পড়ে, যে তা বেশ আশ্চর্যের ছিল।" তলোয়ারের কিছুই ওরা জানতো না; দেখালে ওরা ধারালো দিকটা ধরতে গিয়ে হাত কেটে ফেলে। এর ফাঁকে, নৌসেনাপতি তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন, "আমি খুব মনোযোগ দিয়ে ওদের দেখছিলাম, ওদের কাছে সোনা আছে কিনা জানবার চেষ্টা করছিলাম। কারো কারো নাকে সোনার টুকরো দেখে, ইঙ্গিতে জেনে নিলাম যে দক্ষিণমুখো গেলে বা দ্বীপটা প্রদক্ষিণ করলে এক রাজার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে যার কাছে বিরাট সব পাত্র ভর্তি সোনা আছে। আর তা-ও অঢেল।" (৩) "সব ঐশ্বর্যের মূলে সোনা, আর তাকে পুঁজি করে তার মালিক দুনিয়াতে নিজের মর্জিমত চলে, এমন-কি তা আত্মাদের স্বর্গে-ও পাঠাতে পারে।"

তিনের দফায় সাগর পাড়ি দেবার বেলায়-ও কলম্বাস ভেনেজুয়েলার তটের কাছে এসে মনে করেছিলেন তিনি চীনসাগরে আছেন। অবশ্য তা তাঁকে সামনের অন্তহীন স্থল যে ভূস্বর্গের মত, এ-কথা বলা থেকে বিরত করেনি। পরে, ষোলো শতকের গোড়ার দিকে ব্রেজিলের তটভূমির এক অভিযাত্রী আমেরিকো ভেস্‌পুচ্চি, লরেন্‌জ দ মেদিচিকে বিবরণ দিয়েছিলেন: "বৃক্ষদের এমনই শোভা ও মিষ্টতা যে আমাদের মনে হয়েছিল আমরা ভূস্বর্গে বিচরণ করছি। (৪)* ১৫০৩ সালে কলম্বাস জামাইকা থেকে তাঁর অধিপতিদের লেখেন: "আমি যখন ইন্‌ডিস আবিষ্কার করি, তখনই

---

* ইডেন-এর কানন যে আমেরিকায়, তা প্রমাণের উদ্দেশ্যে আইনব্যবসায়ী এণ্টোনিও ডি লিওন পিনেলো দু-খণ্ডের এক গ্রন্থ লেখেন। তিনি El Paraiso en el Nuevo Mundo (১৬৫৬)-এ দক্ষিণ আমেরিকার একটি মানচিত্র দিয়ে দেখিয়েছিলেন, আমাজন, ডিলা প্লাটা, ওরিনোকো ও ম্যাগ্‌ডেলানা নদীর ধারে মহাদেশের ঠিক মাঝখানে ছিল ইডেন কানন। নিষিদ্ধ ফলটি ছিল, কলা। মানচিত্রে, মহাপ্লাবনের সময়ে নোআ'র জাহাজ ঠিক যে জায়গা থেকে পাড়ি দেয়, দেখানো ছিল।

বলেছিলাম ঐগুলি বিশ্বের সব থেকে ধনী অঞ্চল। ওখানে আছে সোনা, মুক্তো, দামী পাথর, মশলা..."

মধ্যযুগে এক থলি মরিচ একটি মানুষের জীবনের চেয়ে বেশী দামী ছিল। কিন্তু নবজাগরণ, সোনা আর রুপোর চাবিকাঠি দিয়েই আকাশে খুলেছিল স্বর্গের দরজা আর পৃথিবীতে পুঁজিবাদী বাণিজ্যের। আমেরিকায় স্পেন ও পর্তুগালের কাহিনীতে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের পাশাপাশি এসে মিলেছে স্থানীয় সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া আর লুটপাটের ঘটনা। ইউরোপীয় শক্তি ছড়িয়ে প'ড়ে কোলাকুলি করতে চাইলে সারা বিশ্বকে। জঙ্গল আর বিপদে ভরা অনাবাদী দেশ, কাপ্তেনদের, ঘোড়সওয়ার অভিজাতদের আর লুঠকরা সব মালের অদ্ভুত লোভ গরীব সৈনিকদের ধনলিপ্সাকে তাতিয়ে তোলে: তাদের আস্থা ছিল গৌরবে, "মৃতদের স্বর্গে", আর তা জিতে নেবার চাবিকাঠিতে, কোর্তেস-এর সংজ্ঞায় যা: "অদৃষ্ট অনুগ্রহ করে নির্ভীককে" মেক্সিকো অভিযান-এর সাজসরঞ্জাম যোগাড় করতে কোর্তেস নিজে তাঁর সব সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিলেন। কলম্বাস, পেদ্রারিয়াস দাভেলা আর মাগেলন এই ক-জন বাদে, কন্‌কিসতাদোর-দের' 'স্পেনীয় বিজেতারা') টাকার যোগাড় সরকারি সাহায্য ছাড়াই, নিজেদের ভরসায় বা যারা ঝুঁকি নিয়ে টাকা ঢালতে রাজী হ'ত, এমন ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভর করেই করতে হয়েছে।

এল-দোরাদোর কিংবদন্তীর, সোনার রাজার জন্ম হ'ল: তাঁর রাজ্যের শহরগুলির বাড়ি সোনার, রাজপথ সোনার। কলম্বাসের এক শতক পরে, স্যার ওয়াল্‌টার র‍্যালে ওরিনোকো পর্যন্ত পাড়ি দিলেও তার জলপ্রপাতগুলি তাঁকে হার মানায়। "যে-পাহাড় থেকে নির্গত হয় অনর্গল রৌপ্য-প্রবাহ," সেই রূপকথার গপ্‌পোও ১৫৪৫ সালে পেতোসি আবিষ্কারের সঙ্গে সত্যি হ'ল, কিন্তু তার আগে কত দুঃসাহসী, ঐ রুপোর পাহাড়ের বিফল খোঁজে পারানা নদী পর্যন্ত পাড়ি দিয়ে, হয় রসদের অভাবে নয় রোগে নয় স্থানীয় বাসিন্দাদের তীরে বিঁধে মারা গেছে।

কিন্তু সত্যিই মেক্সিকোর অধিত্যকা আর এন্‌ডিয়ান আনটিপ্লানোতে অঢেল সোনা-রুপো মজুত ছিল। ১৫১৯-এ কোর্তেস স্পেনকে জানিয়েছিলেন যে, মন্টেজুমার আস্‌টেক ভাণ্ডারের বিশালতা রূপকথার সামিল, আর তার পনেরো বছর পরে সেভিয়েতে এসে পৌছয় এক ঘর ভর্তি সোনা আর দু-ঘর ভর্তি রুপো, ফ্রান্সিস্‌কো পিজারো যা, দমবন্ধ করে মেরে ফেসার আগে, ইন্‌কা

আতাউ-আল্পার কাছ থেকে আদায় করেছিলেন মুক্তিপণ হিসেবে। বেশ কিছু বছর আগে, কলম্বাসের প্রথম নৌযাত্রার নাবিকদের এলাইস্‌স থেকে নিয়ে আসা সোনা দিয়ে মাইনে মিটিয়েছিলেন রাজা। ক্যারিবিয়ান দ্বীপের লোকেরা শেষ-বেশ ভেট পাঠানো বন্ধ করলে, কেননা ততদিনে তারা অদৃশ্য। হয় তারা সোনার খনিতে সমূলে উৎখাত হয়ে, জলে আধডোবা অবস্থায় চালুনি দিয়ে সোনার ধুলো ঝাড়ার মত মারাত্মক কাজ করছে, নয়-তো চূড়ান্ত ক্লান্তি সত্ত্বেও মাটি কুপিয়েই চলেছে; স্পেন থেকে আমদানি করা ভারী ভারী কৃষি-যন্ত্র ব্যবহার করার ফলে শরীর গেছে বেঁকে, দু-ভাঁজ হয়ে। সাদা চামড়ার শোষকেরা তাদের জন্যে কী চরম পরিণতি ধার্য করে রেখেছে, হাইতির বহু বাসিন্দা তা টের পেয়েছিল: তারা তাদের সন্তানদের মেরে ফেলে, দল বেঁধে আত্মহত্যা করে। মধ্য ষোলো শতকের ঐতিহাসিক ফের্নানদেজ দে ওভিয়েদো এই এটিফিয়ার ধ্বংসকাণ্ডের ব্যাখ্যা করেছিলেন: "ওদের অনেকেই, ভিন্ন কিছু করার তাগিদে, কাজ না করে বরং বিষ খায়, আর অন্যেরা নিজেদের হাতে নিজেদের ফাঁসি দেয়।" (৫)*

২। দেবতারা ফিরে এলেন, সঙ্গে গোপন অস্ত্র

সাগর পাড়ি দেবার প্রথম দফায় টেনেরাইফ-এর পাশ দিয়ে যেতে কলম্বাস একটি আগ্নেয়গিরির দুর্দান্ত বিস্ফোরণ চাক্ষুষ দেখেন। সামনের প্রকাণ্ড ঐ নতুন দেশে, যা সব ঘটতে চলেছে, তখন তাকে তাঁর অশুভ লক্ষণ বলে ঠেকেছিল; ঐ নতুন দেশ আবার আশ্চর্য ভাবে এশিয়া যাওয়ার পশ্চিমপথের আড়ে দাঁড়িয়ে। সামনে আমেরিকা—প্রথমে অন্তহীন তটরেখা থেকে অনুমানের বিষয়, পরে একের পর এক ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়া। ক্রমে নৌসেনাপতিদের জায়গা নিয়ে নেয় শাসকেরা, জাহাজের নাবিকের দল চেহারা পালটে হয় জঙ্গী ফৌজ। পোপের হুকুমনামা বলে আফ্রিকা হস্তগত

---

* তাঁর ব্যাখ্যা একটি মতবাদের জন্ম দেয়। আমি বিস্মিত হই, ফরাসী প্রযুক্তিবিদ্ রেনে দুমো-এর নতুন বই (১৯৭০) Cuba : Is it Socialism-এ পড়ে: "ইন্ডিয়ানদের পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়নি। কিউবার ক্রমোসমে এখনো তাদের জিন্ বর্তমান আছে। একটানা খাটুনির ফলে যে মানসিক অবস্থা হয়, তার প্রতি তাদের বিরাগ এত প্রবল ছিল যে, তাদের কেউ কেউ বাধ্যতা-মূলক শ্রম স্বীকার করার বদলে, নিজেদের হত্যা করে।"

হয় পর্তুগালের রাজার, আর যে-সব অজানা এলাকা, "আপনার দূতেরা আবিষ্কার করেছে বা ভবিষ্যতে করবে,"—কাস্তিয়ের রাণীর। আমেরিকা দেওয়া হয়েছিল রাণী ইসাবেলাকে ১৫০৮ সালে।

পোপের আর একটি হুকুমনামা বলে, আমেরিকা থেকে জোগাড় করা সম্পদের দশভাগের এক ভাগ-এর মালিকানা, চিরকালের মত স্পেনের রাণীর হাতে সঁপে দেওয়া হয়। নিউ ওয়ার্লড চার্চ-এর প্রার্থিত পোষকতার দরুন, যাজকদের সব রকম সুযোগ সুবিধার চেয়ে রাজার অধিকার-এর গুরুত্ব বেশী ছিল।

১৪৯৪ সালে টর্ডেসিলাস-এর চুক্তির ফলে, পোপ-এর নির্দেশিত সীমারেখা অনুযায়ী লাতিন আমেরিকার নীচের এলাকাগুলো পর্তুগালের হাতে আসে, আর ১৫৩০ সালে হানাদার ফরাসীদের হটিয়ে মারৃতিস অফেন্‌সো দে সুজা ব্রাজিলে পর্তুগালের প্রথম ঘাঁটিগুলোর পত্তন করেন। ততদিনে স্প্যানিয়ার্ডরা, অগুনতি নরক সমান জঙ্গল আর বাধা-বিঘ্নে ভরা মরুভূমি পেরিয়ে, অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ১৫১৩ সালে ভাস্‌কো নুনিয়েজ দে বালবোআ'র চোখের সামনে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর ঝলমল করে ওঠে। ১৫২২ সালে ফার্দিন্যান্দ মাগেলান-এর অভিযানের আঠারো জন জীবিত সদস্য স্পেনে ফিরে আসে: তারাই এই প্রথম দুই মহা-সাগরকে এক করে, আর পৃথিবী আবর্তন করে প্রমাণ করে দেয় যে, পৃথিবী গোল। এর তিনবছর আগে হের্নান কোর্তেস-এর দশখানা জাহাজ কিউবা থেকে মেক্সিকোর দিকে রওনা দিয়েছিল, আর ১৫২৩ সালে পেদ্রো দে আলভারাডো মধ্য-আমেরিকা অভিযান শুরু করেন। ১৫৩৩ সালে, ফ্রান্সিস্‌কো পিজারো, এক নিরক্ষর শূকর-পালক, সাফল্যের সঙ্গে কুজকো ঢুকে ইন্‌কা সাম্রাজ্যের কেন্দ্রটি দখল করে নেন। ১৫৪০ সালে পেদ্রো দে ভ্যালডিভিয়া আতাকামা মরুভূমি পার হয়ে স্যানটিয়াগো-ডি-চিলি স্থাপন করেন। কন্‌কিস্‌তা-দোরেরা চাকাও-এ ঢুকে পড়ে আর তার ফলে পেরু থেকে গ্রহের প্রবলতম নদীর মোহানা পর্যন্ত প্রকাণ্ড নতুন পৃথিবীটি খুলে যায়।

লাতিন আমেরিকার বাসিন্দাদের মধ্যে তখন সবকিছুরই কিছু-না-কিছু চিহ্ন ছিল: জ্যোতির্বিদ ও নরখাদক, যন্ত্রবিদ ও পাথরযুগের বর্বর। কিন্তু স্থানীয় একটি সম্প্রদায়ও পরিচিত ছিল না লোহা বা লাঙল, কাঁচ বা বারুদের সঙ্গে, জানতো না পুজো-পার্বণে ব্যবহৃত গাড়িতে ছাড়া চাকার ব্যবহার। যে সভ্যতা মহাসাগর পার হয়ে এই সব এলাকায় জুড়ে বসে, তা তখন চলেছে নব নব

উন্মেষশালিনী নবজাগরণের মধ্যে দিয়ে: প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর আধুনিক যুগের জন্মমুহূর্তে বারুদ, ছাপাখানা, কাগজ আর কম্পাস-এর মত লাতিন আমেরিকাও হয়েছিল আত্মস্থ হ'বার অপেক্ষায় আর একটি আবিষ্কার মাত্র। দুই পৃথিবীর অসমান বিকাশ থেকে বোঝা যায়, কেন অত সহজে স্থানীয় সভ্যতাগুলি বশ মেনে নিয়েছিল। কোর্তেস ভেরাক্রুজে-এ পা রাখেন মাত্র ১০৪ জন নাবিক ও ৫০৮ জন সৈনিক নিয়ে; সঙ্গে ছিল ১৬টি ঘোড়া, ৩২টি আড়ধনুক, ১০টি ব্রোন্‌জের কামান আর কিছু হার্কিউবিস, গাদা বন্দুক ও পিস্তল। পিজারো কাহামারকা ঢোকেন ১৮০ জন সৈনিক ও ৩৭টি ঘোড়া নিয়ে। তাই যথেষ্ট ছিল। অথচ তখন আস্‌টেক-এর রাজধানী, তেনোচ্‌-তিংলান মাদ্রিদের পাঁচগুণ বড় ও লোক-সংখ্যায় স্পেনের সব থেকে বড় শহর সেভিয়ের দু-গুণ আর পেরু পিজারোতে জমায়েত হয়েছিল ১০০,০০০ জনের মত সৈন্য।

সন্ত্রাস-ও ইন্‌ডিয়ানদের হারিয়েছিল। সম্রাট মণ্টেজুমা রাজপ্রাসাদে প্রথম খবর পেলেন: একটি বিরাট পাহাড় সমুদ্রের ওপর দিয়ে আসছে। আরো দূত আসে: "যে-সব খবর শোনেন তাতে তিনি আরো ঘাবড়ে যান। কামান কি-ভাবে বিস্ফোরণ করে, কি-ভাবে তার শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়, কি-ভাবে তা লোকদের ভীত-চকিত করে কান ফাটিয়ে দেয়। আর বিস্ফোরণ-এর পরে তার ভেতর থেকে পাথরের গোলার মত কিছু বেরিয়ে আসে আর অগ্নি-বর্ষণ করতে থাকে। "বিদেশীরা" ছাতসমান উঁচু হরিণদের ওপর বসে। ওদের পুরো দেহ ঢাকা, কেবল মুখগুলো দেখা যায়। ওরা সাদা, যেন চুন দিয়ে তৈরী। ওদের চুলের রং হলুদ, যদি-ও কারো কারো কালো। লম্বা দাড়ি।" মণ্টেজুমা ভেবেছিলেন যে দেবতা কেৎজালকোআৎল ফিরে আসছেন: এ-সম্পর্কে আটটি ভবিষ্যদ্‌বাণী কিছুদিন আগেও হয়েছিল। শিকারীরা তাঁকে একটি পাখী এনে দিয়েছিল যার মাথার ঝুঁটি গোল আয়নার মত, যাতে সূর্য-ডোবা দেখা যায়; সেই আয়নায় মণ্টেজুমা দেখেন মেক্সিকোর দিকে ধেয়ে আসছে ফৌজের বিভিন্ন ভাগ।

কেৎজালকোআৎল পুবদিক থেকে এসেছিলেন আর পুবদিকে গিয়েছিলেন: তাঁর দেহের রং ছিল সাদা, দাড়ি ছিল। ভিরাকোচা, ইন্‌কাদের দ্বিলিঙ্গ

দেবতার রংও ছিল সাদা, ছিল দাড়ি। আর প্রাচী—মায়াদের বীর পূর্ব-পুরুষদের জন্মভূমিও বটে।*

প্রতিহিংসাপর দেবতারা সাঁজোয়া পরে, ঘোড়াদের উজ্জ্বল কাপড়ে ঢেকে প্রজাদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশ চোকাতে আসছেন ; তাঁদের অস্ত্র থেকে মারাত্মক রশ্মি বের হয় আর দমবন্ধকর ধোঁয়ায় বাতাস অন্ধকার হয়ে যায়। আর তা-ছাড়া কন্‌কিস্‌তাদোরেরা তো ফন্দি আঁটা আর বেইমানিতে দারুণ দড়। তারা বুদ্ধি খাটিয়ে মণ্টেজুমার বিরুদ্ধে তল্‌কাস্কালার লোকেদের সঙ্গে হাত মেলায় আর দুই ভাই হুআস্‌কর আর আতাউআল্‌পা'র মধ্যে ইন্‌কা সাম্রাজ্যের দু-ভাগকে সার্থকভাবে কাজে লাগায়। তারা জানতো, শাসকশ্রেণীর মধ্যবর্তী-স্তরের লোক, যাজক, আমলা, পরাজিত সৈনিক আর ইন্ডিয়ান প্রধানদের ভেতর থেকে কিভাবে নিজেদের দুষ্কৃতির সহচর খুঁজে নিতে হয়। কিন্তু এছাড়াও তাদের অন্য হাতিয়ার ছিল,—কিম্বা ঘুরিয়ে বললে, অন্য বস্তুগত কারণ আক্রমণকারীদের জয়ের পেছনে কাজ করেছে। যেমন : ঘোড়া, রোগজীবাণু।

উটের মত ঘোড়াও একসময়ে লাতিন আমেরিকায় ছিল, কিন্তু লোপ পেয়ে যায়। আরব ঘোড়সওয়ারেরা ইউরোপে ঘোড়া নিয়ে আসে ; সেখানে, যুদ্ধ আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের মূল্য যে অসামান্য তা বোঝা গিয়েছিল। দখল-এর সময়ে লাতিন আমেরিকায় তাদের আবির্ভাব স্থানীয় বাসিন্দাদের তাজ্জব করে দেয়, ঘোড়াগুলো যেন হানাদারদের যাদুকরী শক্তির পরিচায়ক হয়ে ওঠে। আতাউআল্‌পা দেখেন, প্রথম স্পেনীয় যোদ্ধারা পালকগুচ্ছ আর ছোটো ঘণ্টায় সাজানো তেজী ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসছে ; ঘোড়াদের খুরে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে আর ধুলোর মেঘ উড়ে আসছে। আতঙ্কগ্রস্ত ইন্‌কা পড়ে যান। ঘোড়াগুলো কন্‌কিস্‌তাদোরদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এই ভেবে পের্দো দে আল্‌ভারাদোর-এর ঘোড়াটির মাথা কেটে ফেলেন মায়া-বংশধরদের প্রধান টেকাস্‌ঃ আল্‌ভারাদোর দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে মেরে ফেলেন। মধ্যযুগের যুদ্ধসাজে কিছু ঘোড়া ইন্‌ডিয়ান বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়, সন্ত্রাস ও মৃত্যু ছড়িয়ে পড়ে। উপনিবেশ স্থাপন যখন চলছে, সেই সময়ে যাজক আর ধর্মপ্রচারকেরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইন্‌ডিয়ানদের জন্যে গল্প ছড়িয়েছিল যে, অশ্ব প্রাণীটির জন্ম পবিত্র উৎস থেকে, কেননা, যে

---

* এই অদ্ভুত সমাপতনগুলির ফলে একটি মত দানা বেঁধে উঠেছে যে, স্থানীয় বাসিন্দাদের ধর্মে বর্ণিত দেবতারা আদতে ইউরোপীয়, কলম্বাসের বহু আগেই তারা আমেরিকার তটে এসে পৌঁছেছিল। (৭)

শ্বেত অশ্বটি দৈবকৃপায় মুর আর ইহুদিদের বিরুদ্ধে বীরযুদ্ধে জয়ী হয়েছিল, তা চড়তেন স্পেনের রক্ষক সন্ত স্যান্তিইআগো।

রোগ জীবাণু আর বীজাণু সবথেকে কার্যকর জোট ছিল। বাইবেলের প্লেগের মত ইউরোপীয়রা সঙ্গে করে এনেছিল বসন্ত ও ধনুষ্টঙ্কার, বিভিন্ন ফুসফুস ও অন্ত্র সংক্রান্ত অসুখ, যৌনরোগ, চোখের সংক্রামক ব্যাধি, টাইফাস, কুষ্ঠ, হলুদজ্বর আর দন্তক্ষয়ের রোগ। প্রথমে ঘটলো বসন্ত-এর প্রাদুর্ভাব। কিন্তু এই-যে অভূতপূর্ব আর ভয়ঙ্কর মহামারী, যার ফলে উত্তপ্ত জ্বর হয় আর মাংসে পচন ধরে, তা কি প্রজাদের শোধরাবার জন্যে দেবতাদের শাস্তিবিধান নয়? এক প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দার বিবৃতি থেকে জানা যায়: হানাদারেরা "তল্‌ক্সাকালায় ঢোকার পর, মহামারী ছড়িয়ে পড়ে: কাশি, উত্তপ্ত ফুসকুড়ি।" আর একজনের বিবৃতি: "সংক্রামক, পীড়াদায়ক, যন্ত্রণাকর ফুসকুড়ি অসুখ অনেকের মৃত্যু ঘটায়।" (৮) ইন্‌ডিয়ানরা পোকার মত মরে, এইসব রোগের বিরুদ্ধে তাদের শারীরিক গঠনের কোনো প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল না। আর যারা টিকে থাকে তারা দুর্বল ও অকেজো হয়ে যায়। ব্রেজিলের নৃতত্ত্ববিদ্ দার্‌সি রিবেইর আন্দাজ করেন যে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ওসেনিয়ার বাসিন্দাদের অর্ধেকেরও বেশী সাদা চামড়ার মানুষদের প্রথম সংসর্গের ফলে দূষিত হয়ে মারা যায়।

৩ 'খিদেয় হন্যে শুওরের মতো ওরা সোনা চায়'

বন্দুক ছুঁড়ে, তলোয়ার দিয়ে কচুকাটা করে, আর নিশ্বাসে মহামারী ছড়িয়ে, বেপরোয়া কন্‌কিস্‌তাদোর-দের ছোটো দলটি আমেরিকার ভেতরে ঢুকে পড়ে। বিজিতদের কাছ থেকে আমরা তার বিবরণ পাই। চলুলার নির্বিচার হত্যাকাণ্ড-এর পর মণ্টেজুমা নতুন দূত পাঠান কোর্তেস-এর কাছে, কোর্তেস তখন এগোচ্ছেন মেক্সিকো উপত্যকার দিকে। তারা সঙ্গে করে উপহার এনেছিল সোনার গলবন্ধনী আর কুয়েতজাল পাখীর পালকে তৈরি কিছু নিশান। ফ্লোরেন্টিন কোডেক্স-এ রক্ষিত নাহুআত্ল-পাঠ থেকে জানা যায় যে, স্প্যানিয়ার্ডরা "তখন সপ্তম স্বর্গে"। "ওরা সোনার জিনিসগুলো উঁচু করে তুলে ধরলে: ঠিক যেন বাঁদর, চোখে-মুখে আনন্দের ছটা, ওদের মধ্যে যেন নতুন জীবন সঞ্চারিত হয়েছে, মনে খুশীর বান ডেকেছে। যেন সত্যিই সোনার প্রতি ওদের লোভটা প্রচণ্ড। ওদের শরীর ওতে পুষ্ট হয়,

তা-ও আশ মেটে না। খিদেয় হন্যে শুওরের মত ওরা সোনা চায়।" পরে কোর্তেস যখন ৩,০০,০০০ লোকের জাঁকজমকে ভরা আস্‌টেক রাজধানী তেনোচ্‌তিৎলান পৌছন, স্প্যানিয়ার্ডরা ভাণ্ডার ঘরে ঢোকে, "আর তারপর তারা সোনার একটা বিরাট তাল তৈরী করে, আগুন জ্বালায়। আর তাতে যা-যত দামীই হোক্ সব ফেলে দেয়; সমস্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর সোনা, স্প্যানিয়ার্ডরা বারের আকারে ছোটো করে নেয়।"

যুদ্ধ শুরু হয়। তেনোচ্‌তিৎলান আগে হারানোর পর, অবশেষে ১৫২১ সালে, কোর্তেস তা ফের দখল করে নেন: "আর ততদিনে আমাদের কোনো ঢাল বাকি নেই, নেই কোনো মুগুর, খাওয়ার কিছু নেই, কিছু খাচ্ছিলামই না আর।" মণ্টেজুমার বিরুদ্ধে বেইমানির অভিযোগ আনে কিছু যাজক; হয়রান হয়ে তিনি আত্মহত্যা করে বসেন। বিধ্বস্ত হয়ে, পুড়ে, মৃতদেহের জঞ্জালে ভরে গিয়ে শহরটার পতন হয়: "ঢালই ছিল তার প্রতিরোধের হাতিয়ার, কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না...শিশুদের অন্ত্রাদি যারা দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করত, সেই ভেরাক্রুজ-ইন্‌ডিয়ানদের বলি প্রথা সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা ছিল কোর্তেস-এর, কিন্তু পুনর্দখল-করা শহরের ওপর তাঁর নৃশংসতার কোনো মাপজোক ছিল না: "আর সারা রাত ধরে আমাদের ওপর তা বর্ষিত হয়।" ফাঁসিকাঠ বা পীড়নই যথেষ্ট ছিল না অবশ্য: দখল-করা ধন-ভাণ্ডার স্প্যানিয়ার্ডদের চাহিদার ধারে কাছে-ও কোনোদিন পৌছতে পারে নি; তাই ইন্‌ডিয়ানরা নিশ্চয় সোনা আর মূল্যবান সব জিনিসপত্র হ্রদের তলায় লুকিয়ে রেখেছে, এই অনুমানের ভিত্তিতে ওরা হ্রদটি বহু বছর ধরে খুঁড়ে চলে।

পের্দো দে আল্‌ভারাদো আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গো গুয়াতেমালার ওপর হামলা চালান আর, "এত ইন্‌ডিয়ান হত্যা করেন যে তা একটা রক্তের নদী তৈরি করে, যার নাম দেওয়া হয় ওলিম্‌টেপেকিউ"; "সেদিন এত রক্ত বয়েছিল, যে দিনটাই লাল হয়ে যায়।" চূড়ান্ত লড়াই-এর আগে, "ইন্‌ডিয়ানরা নিজেদের নৃশংস ভাবে নির্যাতিত হ'তে দেখে স্প্যানিয়ার্ডদের অনুরোধ করে যেন তারা আর নির্যাতন না করে; বলে, ওদের অধিপতিদ্বয় নেহাইব আর ইক্সকুইন-এর কাছে—নেহাইব ঈগল ও সিংহের ছদ্মবেশে—প্রচুর সোনা, রুপো, হীরে ও পান্না আছে। তারপরে তারা ঐসব স্প্যানিয়ার্ডদের দিয়ে দিলে স্প্যানিয়ার্ডরা তা রেখে দেয়।" (৯)

আতাউআল্পাকে দমবন্ধ করে শিরশ্ছেদ করার আগে পিজারো মুক্তিপণ হিসেবে তাঁর কাছ থেকে আদায় করেছিলেন, "ওজনে ২০,০০০ মার্কেরও বেশী রুপো ও ১৩,২৬,০০০ এস্কুডো খাঁটি সোনা।" তারপরে পিজারো কুজকোর দিকে এগিয়ে যান। সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী এতই ঝলমলে ছিল যে, পিজারোর সেনারা ভেবেছিল তারা সিজারদের শহরে ঢুকেছে, কিন্তু তা-সত্ত্বেও তারা সূর্যমন্দির ধ্বংস আর লুটপাট শুরু করতে, এক তিল দেরী করে না। "লুঠের বেশীর ভাগটাই হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টায়, নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি হাতাহাতি করতে করতে, প্রত্যেক উর্দি-পরা সৈনিক রত্ন ও প্রতিমাগুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে যায়; বয়ে নিয়ে যাওয়ার সুবিধে হবে বলে, সোনার বাসন হাতুড়ি দিয়ে পিটতে থাকে…বারের আকারে ছোটো করার জন্যে মন্দিরের সমস্ত সোনা ওরা এক দ্রাবণ-পাত্রে ফেলে দেয়: দেয়ালের ওপর-স্তরে গাছ, পাখী আর অন্যান্য বস্তুর অদ্ভুত যে-সব প্রতিমূর্তি বাগানে ছিল, সব।" (১০)

মেক্সিকো শহরের ঠিক মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড খোলা চকে তেনোচ্‌তিৎলান-এর সব থেকে বড় মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ-এর ওপর আজ ক্যাথলিক ক্যাথিড্রাল দাঁড়িয়ে, কোর্তেস যাকে শহীদত্ব দিয়েছিলেন সেই আস্‌টেক-প্রধান কুআউহ্‌টেমোক্‌-এর আবাসভূমি জুড়ে সরকারি ভবন। তেনোচ্‌তিৎলান মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পেরুতে, কুজকোর-ও সমান দুর্গতি হয়, যদিও বিজয়ীরা তার বৃহদায়তন সব দেয়াল পুরোপুরি ধ্বংস করতে পারে না, ইন্‌কাদের মহৎ স্থাপত্য-শিল্পের, প্রামাণিক নমুনা হিসেবে আজও তাদের দেখতে পাওয়া যায় ঔপনিবেশিক নির্মাণের ভিতগুলিতে।

তুপাক আমারুর ভগ্ন স্মৃতি

স্প্যানিয়ার্ডরা যখন লাতিন আমেরিকায় হানা দেয়, তখন দিব্যতান্ত্রিক ইন্‌কারা উৎকর্ষ-এর চরমে পৌছেছে। তাদের সাম্রাজ্য, আজকের পেরু, বোলিভিয়া আর ইকুআদর, কলম্বিয়া আর চিলির অংশ, পশ্চিম আর্জেন্টিনা আর ব্রেজিলের জঙ্গল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। মেক্সিকো উপত্যকার আস্‌টেক রাষ্ট্রসঙ্ঘ বিশেষ ভাবে দক্ষ হয়ে উঠেছে, আর ইউকাতান ও মধ্য আমেরিকায়, শ্রম ও যুদ্ধে সংগঠিত, অসাধারণ মায়া-সভ্যতা, তাদের উত্তরসূরীদের মধ্যে তখনও বহমান।

বহুযুগ ধরে লুটতরাজ চলা সত্ত্বেও এইসব সমাজ তাদের কীর্তির অনেক

চিহ্ন রেখে যেতে পেরেছে : ইজিপ্টের পিরামিডের চেয়েও বেশী দক্ষতার সঙ্গে তৈরী ধর্মীয় সৌধ, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই-এর জন্যে বিজ্ঞানসম্মত যোগ্য ব্যবস্থা, কিছু শিল্পকাজ—এ-সব তাদের অদম্য প্রতিভার নমুনা হয়ে রয়েছে। লিমার যাদুঘরে এমন মাথার খুলি শ'য়ে শ'য়ে রাখা আছে, যেগুলোতে ইন্‌কা শল্যবিদেরা ছেনি দিয়ে ছেঁদা করে সোনা বা রুপোর ফলক ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। মায়ারা অসাধারণ জ্যোতির্বিদ ছিল, স্থানকাল গণনায় একচুল নড়চড় হ'ত না, আর ইতিহাসে ওরাই প্রথম শূন্য সংখ্যাটির গুরুত্ব বুঝতে পারে। আস্‌টেকদের সেচ-ব্যবস্থা আর নকল দ্বীপ দেখে কোর্তেস-এর চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল,—যদিও সে-সব সোনার তৈরী ছিল না।

এইসব সভ্যতার বুনিয়াদ ভেঙে চুরমার করে দেয় দখলের লড়াই। খনিভিত্তিক অর্থনীতি চালু হলে, তার ফলাফল, আগুন আর তলোয়ারের চেয়েও শোচনীয় হয়। খনির স্বার্থে বহু লোককে জমি ছেড়ে দিতে হয়, কৃষক গোষ্ঠিগুলিতে ভাঙন ধরে ; ওরা শুধু জবরদস্তি খাটিয়েই অগুনতি মানুষ মেরে ফেলেনি, পরোক্ষভাবে চাষ-আবাদের সমবায় ব্যবস্থাও ভেঙে তছনছ করে দেয়। ইন্‌ডিয়ানদের খনিতে চালান দিয়ে, এন্‌কসেন্‌দোরাদের কাজে ধরে বেঁধে লাগিয়ে দেওয়া হয়—আর তার ফলে যে-সব জমি তারা ছেড়ে আসে বা যত্ন করতে পারে না, বিনা খেসারতেই সে-সবের মালিকানা ওদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ভুট্টা, ইউক্কা, কিডনি ও সাদা বিন, চিনেবাদাম আর আলুর বিশাল সব খেত, হয় স্প্যানিয়ার্ডরা ধ্বংস করে, নয় নষ্ট হয়ে যেতে দেয় ; ইন্‌কা সেচ-ব্যবস্থার ফলে যে বিরাট এলাকা জুড়ে প্রাচুর্য ছিল, তা দ্রুত গ্রাস করে নিতে থাকে মরুভূমি। এককালে যেখানে সাম্রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগ-এর জন্যে রাস্তা ছিল, আজ সেখানে দখলের সাড়ে চার শতক পরে শুধু পাথর আর কাঁটা ঝোপঝাড়। যদিও ইন্‌কাদের অসাধারণ পূর্তকাজ-গুলোর বেশীর ভাগ হয় সময়ের প্রভাবে নয় দখলিকারদের হাতে ধ্বংস হয়েছে, তবু এন্‌ডিয়ান কর্ডিলেরায় বিশাল সব চত্বরের চিহ্ন আজও দেখা যায় ; এদের সাহায্যে পাহাড়ের উতরাইগুলোতে একসময়ে চাষ হ'ত, আজ-ও হয়। এক মার্কিন প্রযুক্তিবিদ ১৯৩৬ সালে আন্দাজ করেছিলেন যে, ইন্‌কা চত্বরগুলি আধুনিক প্রণালীতে ১৯৩৬ সালের মজুরির হারে তৈরী হলে, তার খরচ পড়ত প্রতি একরে ৩০,০০০ ডলার। চাকা, ঘোড়া বা লোহা চিনতো না যে সাম্রাজ্য, সে সাম্রাজ্যে চত্বর আর নর্দমা তৈরী সম্ভব হয়েছিল অসাধারণ

সংগঠন ও কারিগরি নিপুণতার দরুন। আর তাছাড়া মানুষের সঙ্গে মাটির সম্পর্কে যে পবিত্র ও জীবন্ত ধর্মীয় প্রভাব ছিল, তার জন্যে কারিগরি নিপুণতা সম্ভব হয়েছিল বিবেচনাপ্রসূত শ্রমবিভাগের দরুন।

আস্‌টেকরা প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে আশ্চর্যভাবে সাড়া দিত। যে শুকিয়ে-যাওয়া হ্রদে, স্থানীয় ধ্বংসাবশেষ-এর ওপর মেক্সিকো শহর দাঁড়িয়ে, সেই হ্রদের টিকে থাকা কিছু দ্বীপ, পর্যটকদের কাছে আজ "ভাসমান বাগান" নামে পরিচিত। আস্‌টেকরা এগুলো তৈরী করেছিল, কেননা তেনোচ্‌তিৎলান গড়ে তোলার জন্যে যে জায়গা বাছা হয়, সেখানে জমির ঘাটতি ছিল। তারা পাড় থেকে প্রচুর পরিমাণে কাদা নিয়ে আসে আর যতদিন গাছের শিকড়েরা দৃঢ়তা দিতে না পারে, খাগড়ার সরু দেয়ালের মধ্যে নতুন কাদা-দ্বীপগুলোকে ঠেকনা দিয়ে রাখে। এই সব অসাধারণ উর্বর দ্বীপগুলোর পাশ দিয়ে বইত খাল, আর তাদের ওপর গড়ে ওঠেছিল আস্‌টেক রাজধানী: চওড়া রাজপথ, সাদাসিধে কিন্তু সুন্দর প্রাসাদ, খাড়া পিরামিড: হ্রদ থেকে যাদুকরী ভাবে বেরিয়ে আসা এই শহরের কিন্তু, বিদেশীদের হাতে ধ্বংস হওয়া ধার্য ছিল। সে-যুগের লোকসংখ্যায় ফিরে যেতে মেক্সিকোর চার শতক লেগেছিল।

দার্‌সি রিবেইর বলেছেন, ইন্‌ডিয়ানরা ছিল ঔপনিবেশিক প্রসারণ ব্যবস্থার জ্বালানি-শক্তি। সের্‌গিয়ো বাগু লিখেছেন, "এ-কথা প্রায় নিশ্চিত যে, বহু ইন্‌ডিয়ান ভাস্কর, স্থপতি, যন্ত্রবিদ্‌ ও জ্যোতির্বিদকে দাসেদের সঙ্গে খনি থেকে আকরিক পদার্থ বের করে আনার প্রাণান্তকর কাজে লাগানো হয়েছিল। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কাছে এঁদের কারিগরি দক্ষতার কোনো মূল্য ছিল না। তাঁদের কিছু দক্ষ মজুর হিসেবেই গণ্য করা হয়েছিল।" তা সত্ত্বেও ঐ সব ধ্বস্ত সভ্যতার চিহ্ন পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি: হারানো মর্যাদা ফিরে পাবার আশা, সে-সব, কত ইন্‌ডিয়ান বিদ্রোহের ইন্ধন যুগিয়েছে।

১৭৮১ খ্রী: তুপাক আমারু কুজকো অবরোধ করেন। ইন্‌কা সম্রাটদের বংশধর, এই মেস্‌তিজো প্রধান, এক বিরাট বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যান। যে তিন্‌তা প্রদেশে, বাসিন্দাদের প্রায় পুরোপুরি উচ্ছেদ করে সেরো রিকো খনিতে চালান দেওয়া হয়েছিল, সেখানেও বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে, তুপাক আমারু তুৎগাসুকার চকে এসে দাঁড়ান আর ড্রাম ও পুতুতুর-এর শব্দের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, তিনি মাননীয়

করেগিদোর আন্তেনিও হুয়ান দে আরিআগার ফাঁসি দিয়েছেন ও পোতেনি মিতার অবসান ঘটিয়েছেন। কিছুদিন পরে, তুপাক দাসেদের মুক্তি দিয়ে এক হুকুম জারি করেন। তিনি সব রকমের কর ও বাধ্যতামূলক শ্রম রদ করেন। "গরীব, হতভাগ্য ও অসহায়দের পিতা", তুপাকের ফৌজের পাশে ইন্ডিয়ানরা হাজারে হাজারে জড়ো হয়। গেরিলাদের নেতৃত্ব দিয়ে আগে আগে চললেন তিনি, কুজকোর দিকে। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, যুদ্ধে তাঁর হুকুম তামিল করতে গিয়ে যারা মারা যাবে, তারা, দখলিকারেরা যে সুখ ও সমৃদ্ধি তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, সে-সব ভোগ করতে, প্রাণ পেয়ে ফের ফিরে আসতে পারবে। হার-জিত চলল; অবশেষে, তাঁর নিজেরই এক প্রধান তাঁকে বেইমানি করে বন্দী করে; তুপাককে শেকলে বেঁধে, রাজার অনুগতদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তদন্তকর্তা আরেচে, তাঁর কুঠুরিতে এসে কিছু প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে, তাঁর কাছ থেকে বিদ্রোহী সহযোগীদের নাম জানতে চান। অবজ্ঞার সঙ্গে তুপাক আমারু উত্তর দেন: "এখানে আপনি বা আমি ছাড়া অন্য কোনো সহযোগী নেই। আপনি উৎপীড়ক, আমি মুক্তিদাতা, আমাদের দুজনেরই মৃত্যু হওয়া কাম্য।"

স্ত্রী, সন্তান ও প্রধান সহযোগীদের সঙ্গে তুপাককে কুজকোর প্লাজা দেল্ ওয়াকাইপাতায় নির্যাতন করা হয়। তাঁর জিভ কেটে নেওয়া হয়; দেহটা চারটুকরো করার জন্যে তাঁর হাত-পা চারটে ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়; কিন্তু সে অভিপ্রায় সফল হয় না। অবশেষে ফাঁসি-কাঠের তলায় তাঁর মাথা কেটে নেওয়া হয়। তাঁর মাথা পাঠানো হয় তিনতায়, একটি বাহু তুন্‌গাসুকায়, অন্যটি কারাবাইআয়, একটি পা সান্তা রোসায় আর অন্যটি লিভিতাকায়। ধড়টাকে পুড়িয়ে ওয়াতানাই নদীতে তার ছাই ফেলে দেওয়া হয়। প্রস্তাবনা করা হয়, তাঁর বংশের অধস্তন চার পুরুষ পর্যন্ত সবাইকে মেরে ফেলা হোক্।

ইন্‌কাদের আর এক বংশধর, আস্‌তোরপিল্‌কো নামে এক প্রধানের সঙ্গে ১৮০২ খ্রীঃ কাহামারকায় হামবোল্ট সাক্ষাৎ করতে আসেন, ঠিক যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষ আতাউআল্‌পা, কন্‌কিস্‌তাদোর পিজারোকে প্রথম দেখেছিলেন। প্রধানের ছেলে জার্মানির পণ্ডিতকে শহরের ধ্বংসাবশেষ আর পুরোনো ইন্‌কা প্রাসাদের পাথরকুচি ঘুরিয়ে দেখায়; হাঁটতে-হাঁটতে ধুলো আর ছাই-এর তলায় লুকোনো বিরাট ভাণ্ডারের কথা বলে। "নিজেদের দরকারের জন্যেও কি

তোমরা ঐ সম্পদ খুঁড়ে বার করবার কথা ভাবো না?" হামবোল্ট তাকে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে যুবকটি বলে, "না, কখনো না। আমার বাবা বলেন যে তাতে পাপ হ'তে পারে। আমরা সোনার ডালপালা আর ফল খুঁজে পেলে, সাদা চামড়ার লোকেরা আমাদের ঘৃণা করবে, আমাদের ক্ষতি করবে।" প্রধান নিজে একটা ছোটো মাঠে গম ফলাতেন, কিন্তু তা সাদা চামড়াদের লোভের হাত থেকে রক্ষা পাবার মত যথেষ্ট ছিল না। দখলিকারেরা সোনা-রূপো আর খনি চালাবার জন্যে দাসের খোঁজে সর্বদা হন্যে হয়ে থাকত; শস্য থেকে মুনাফার সুযোগ আছে বুঝলেই তারা সেই জমি ছিনিয়ে নিতে পিছপাও হত না।

বছরের পর বছর লুঠ হয়ে চলেছে; ১৯৬৯ সালে পেরুতে জমিসংক্রান্ত নীতির সংস্কার ঘোষণার পরেও, শোনা গেছে, পাহাড়ে এলাকার ইন্‌ডিয়ানরা, তাদের বা তাদের বাপ-ঠাকুর্দাদের কাছ থেকে হাতিয়ে-নেওয়া জমি পুনর্দখল করার জন্যে পতাকা হাতে নেমে এসেছে; সামরিক বাহিনী তাদের বুলেট দিয়ে হটিয়ে দিয়েছে। তুপাক আমারুর মৃত্যুর পর দু-শতক পার হ'তে হ'ল, যার পর জাতীয়তাবাদী জেনেরাল জুআন ভেলাস্‌কো আল্‌ভারাদো তুপাকের অবিস্মরণীয় কথাগুলির প্রতিধ্বনি করলেন: "ক্যাস্‌পিসেনো! তোমাদের দরিদ্র প্রভুদের আর অন্ন যোগাবে না।" ১

অন্য যে বীরদের পরাজয়, পট পরিবর্তনের সঙ্গে উল্টে গেছে, তাঁরা হ'লেন মেক্সিকোর দু-জন: মিগুয়েল ইদাল্‌গো আর হোসে মারিয়া মোরেলস। ইদাল্‌গো, পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত ছিলেন শান্তশিষ্ট গ্রাম্য যাজক; একদিন ডোলোরেস গীর্জার ঘণ্টা বাজিয়ে ইন্‌ডিয়ানদের জড়ো করে তাদের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করতে বলেন:

"তিনশো বছর আগে, তোমাদের বাপ-ঠাকুদাদের জমি যারা ডাকাতি করে কেড়ে নিয়েছিল, ঐ ঘৃণ্য স্প্যানিয়ার্ডদের কাছ থেকে সে-সব কি ফের দখল করে নেবার জন্যে তোমরা সচেষ্ট হ'বে না?" উনি পবিত্র ইন্‌ডিয়ান গুআদালুপের পতাকা তুলে ধরেন, আর ছ-হপ্তা যেতে না যেতেই ম্যাচেট, বর্শা, গুলতি আর তীর-ধনুক নিয়ে আশি হাজার লোক তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। বিপ্লবী যাজক ভেট পাঠানো বন্ধ করেন আর গুআদালাজারার জমি ভাগ-বাটোয়ারা করে নেন; ক্রীতদাসদের মুক্তির হুকুম জারি করেন, তারপর তাঁর বাহিনী নিয়ে মেক্সিকো শহরের দিকে ধেয়ে আসেন। অবশেষে যুদ্ধে হেরে যাবার পর, তাঁর ফাঁসি হয়ে

যায়, আর বলা হয়ে থাকে যে তিনি একটি তীব্র অনুতাপের দলিল রেখে গেছেন। বিপ্লব তাড়াতাড়ি অবশ্য আর একজন নেতা খুঁজে পায়, যাজক হোসে মারিয়া মোরেলস: "ধনী, অভিজাত আর আমলাদের নিজেদের শত্রু বলে চিনে রাখবে..." তাঁর আন্দোলন, ইন্ডিয়ান অভ্যুত্থান আর সামাজিক বিপ্লব একসঙ্গে মেলাতে পেরেছিল; পরাজিত হয়ে গুলিবিদ্ধ হ'বার আগে তিনি মেক্সিকোর বিরাট অংশ নিজের দখলে আনতে পেরেছিলেন। এক মার্কিন সেনেটার লিখেছেন, দু-বছর পরে, মেক্সিকোর স্বাধীনতা, "ঠিক হিস্পানি পরিবারে যেমন, ইউরোপ আর আমেরিকার বংশজাত সদস্যদের মধ্যেকার ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেল...শাসকশ্রেণীদের মধ্যে একটা রাজনৈতিক লড়াই।" শুধু এন্কোমিয়েন্দা ভূমিদাস হল পিওন আর এন্কোমেন্দেরো হ'ল বসতবাড়ি-সহ বিরাট জমির মালিক।

পবিত্র হপ্তার শেষে, ইন্ডিয়ানদের জন্যে পুনরুত্থান নেই। এই শতকের গোড়ার দিকেও, ইন্ডিয়ান পঙ্গো বা বাড়ির চাকরদের ভাড়া খাটাতে চেয়ে, তাদের মালিকেরা লা পাজ কাগজে বিজ্ঞাপন দিত। যতদিন না ১৯৬২ সালের বিপ্লব বোলিভিয়ার ইন্ডিয়ানদের ভুলে যাওয়া অধিকারের মর্যাদা ফিরিয়ে না দিল, পঙ্গোরা শুয়েছে কুকুরের পাশে, মালিকের থালার ছিটেফোঁটা কুড়িয়ে খেয়েছে আর সাদা-চামড়া কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই হাঁটু গেড়ে বসেছে। কন্কিসতাদোর-দের সময়ে চারপেয়ে ভারবাহী জন্তুর অভাব ছিল, তাই তাদের মালপত্তর বইবার জন্যে ইন্ডিয়ানদের পিঠ ব্যবহার করা হত; আর আজও ইন্ডিয়ান আলটিপ্লানোতে, আইমারা ও কেচুআ কুলিদের এক-টুকরো রুটির জন্যে মাল বইতে দেখা যায়। লাতিন আমেরিকার প্রথম পেশাঘটিত রোগ ছিল নিউমোকোনিওসিস্; আর আজকের বোলিভিয়ার খনি-মজুরদের ফুসফুস পঁয়ত্রিশ বছরের পর কাজ করে না। সিলিকা-ধুলো আটকানো যায় না, চামড়ায় ঢুকে পড়ে, হাতে মুখে চিড় ধরিয়ে, গন্ধ আর স্বাদের বোধ নষ্ট করে, ফুসফুস শক্ত করে নষ্ট করে দেয়।

পর্যটকেরা আলটিপ্লানোর বাসিন্দাদের স্থানীয় পোশাকে ছবি তুলতে ভালোবাসে। অবশ্য এ-কথা না জেনে যে, এই পোশাকগুলো আঠারো শতকের শেষ দিকে চার্লস III এদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। স্প্যানিয়ার্ডরা ইন্ডিয়ান

মেয়েদের যে-সব পোশাক পরতে বাধ্য করে, সেগুলো ছিল এসত্রেমাদুর, আন্দালুসিআ আর বাস্ক রমণীদের পরিচ্ছদের নকল, আর মাথার মাঝখানে চুল বাঁধার ধরনটা চাপিয়ে দিয়েছিলেন ভাইসরয় তলেদো। অবশ্য কোকা প্রসঙ্গে এ-কথা প্রযোজ্য নয়, ইন্‌কাদের সময়েও তার চল ছিল। কিন্তু তখন ভাগের মাত্রাটা ছিল পরিমিত; তার ওপর একচেটিয়া অধিকার ছিল ইন্‌কা সরকারের এবং শুধু আচার-অনুষ্ঠানের সময়ে খনির মজুরদের ব্যবহারের অনুমতি মিলত। স্প্যানিয়ার্ডরা ইন্‌ডিয়ানদের বেশ উৎসাহের সঙ্গে কোকা চিবোনেতে প্ররোচিত করতে লাগল। এটি খুব লাভজনক ব্যবসা ছিল। ষোলো শতকে পতোসিতে শোষকেরা ইউরোপীয় পোশাক পরিচ্ছদের জন্য যত খরচ করেছিল, ততখানিই করেছিল শোষিতরা কোকার ওপর। কুজকোতে চারশো স্প্যানিয়ার্ড কোকা ব্যবসায়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল, প্রতি বছর এক লক্ষ ঝুড়ি ভরতি দশ লক্ষ কিলো ওজনের কোকা-পাতা পতোসির রুপোর খনিতে ঢুকতো। চার্চ নেশাদ্রব্যটির ওপর কর বসায়। ইন্‌কা ঐতিহাসিক গার্‌সিলাসো দে লা ভেগা তাঁর কমেন্‌তারিওস রিয়ালেস কুএ দেল ওরিজেন দে লা ইন্‌কাস-এ লিখেছেন যে, বিশপ, যাজক আর অন্যান্য কুজকো চার্চ-অধিকারীদের আয়ের বেশীর ভাগ অংশই আসত কোকার ওপর চাপানো কর থেকে, আর জিনিসটির সরবরাহ আর বিক্রী করে বহু স্প্যানিয়ার্ড বড়লোক হয়।

কাজ করে যে-কটা পয়সা পেত ইন্‌ডিয়ানরা তা দিয়ে খাবারের বদলে কোকা-পাতা কিনতো; ওগুলো চিবিয়ে আয়ু কমাবার বিনিময়ে, তারা ঐ মারাত্মক কাজের চাপ আরো ভালো করে সইতে পারত। কোকার সঙ্গে ইন্‌ডিয়ানরা আগুআরদিয়েন্‌তে পান করত,—আর তার ফলে "ক্ষতিকর বদভ্যাসের" চল হচ্ছে বলে তাদের মালিকেরা অনুযোগ করে। বিশ শতকে পতোসিতে ইন্‌ডিয়ানরা আজ-ও ক্ষুধা আর নিজেদের মারবার জন্যে কোকা-পাতা চিবোয়, বিশুদ্ধ কোহল দিয়ে নিজেদের মাড়ি পোড়ায়—শোষিতদের নিষ্ফল প্রতিবাদ। পুরোনো দিনের মত বোলিভিয়ার খনি-মজুরেরা আজ-ও তাদের মজুরিকে মিতা বলে।

নিজদেশে পরদেশী, নিরন্তর দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য, লাতিন আমেরিকা বাসিন্দাদের, ক্ষমতাশালী সভ্যতা যত সীমানা বাড়ায়, ততই ঠেলে দেয় দরিদ্রতম এলাকায়—অনুর্বর পাহাড়ে, মরুভূমির মাঝখানে। নিজেদের ঐশ্বর্যের অভিশাপের

শাস্তি ভুগতে হয়েছে ইন্‌ডিয়ানদের, আজ-ও হচ্ছে : লাতিন আমেরিকার প্রহসন এইটাই। প্লেসার সোনা নিকারাগুআ'র রিও ব্লুফিল্ডে আবিষ্কার হ'লে, কারুকা ইন্‌ডিয়ানদের তৎক্ষণাৎ নদীর তীরবর্তী জমি থেকে হটিয়ে দেওয়া হয়; গ্রানদে নদীর দক্ষিণে প্রতিটি আবাদী উপত্যকা আর জমিতে ইন্‌ডিয়ানদের ভাগ্যে বরাদ্দ থাকে ঐ একই ব্যবস্থা। কলম্বাস-এর সময় থেকে ইন্‌ডিয়ানদের হত্যালীলার যে শুরু তা কোনোদিন-ও থামে নি। যাতে গবাদি-পশু লাতিফুনদিআ'র সারি বেঁধে এগোনোতে ব্যাঘাত না ঘটে, তাই গত শতকে, উরুগোএ আর আর্জেনটিন পাতাগোনিআ-য় সেনাবাহিনী, ইন্‌ডিয়ানদের তাড়া করে, জঙ্গল বা মরুভূমিতে ঠেলে দিয়ে পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলে।*

---

* যারা উত্তর উরুগোএতে ষাঁড় চরিয়ে খেয়ে পরে বাঁচতো, সেই শেষ চারুগাদের প্রতি রাষ্ট্রপ্রধান জোস ফ্রুকটোওসো রিভেরা ১৮৩২ সালে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেন। বন্ধুত্বের ভুয়ো প্রতিশ্রুতিতে ভুলে ওরা ঝোপের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে, ঘোড়া-অস্ত্র রেখে বেরিয়ে আসে, কিন্তু বোকা দেল টাইগ্রে নামে এক জায়গায় ওদের ওপর আক্রমণ করা হয়। এদুআর্দো আসেভেদো দিয়াজ, লা এপোকা-তে (আগস্ট ১৯, ১৮৯০) লেখেন, "বিউগল বাজিয়ে আক্রমণ শুরু হয়। তাদের দল মরিয়ার মত ঘুরপাক খেতে থাকে, তারপর একের পর এক যুবক তীরবেঁধা ষাঁড়ের মত মাটিতে পড়তে থাকে।" বহু প্রধান মারা যায়। অল্প যে-ক'জন ইন্‌ডিয়ান আগুনের কুণ্ড থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছিল, তারা তার খানিক পরেই প্রতিশোধ নেয়। রিভেরার ভাই তাদের পেছনে ধেয়ে আসছিল; তাকে এবং তার দলবলকে তারা অতর্কিতে আক্রমণ করে আর বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারে। সেপে'র "বর্শার ফলা মৃতদেহগুলোর পেশীবন্ধনী দিয়ে সজ্জিত হয়ে গিয়েছিল।" আর্জেন্টিনায় পাতাগোনিয়া সৈনিকরা প্রতি শুক্রাশয়ের জোড়া যা ওরা যোগাড় করে আনতে পারত, তার ওপর টাকা পেত। দাভিদ ভিনাস্‌-এর উপন্যাস Los dueños de la tierra (১৯৫৯) একটি ইনডিয়ান-শিকার দিয়ে শুরু: "খতম করাটা ছিল কাউকে বলাৎকার করার মত। বেশ ভালো। আর তা পুরুষকে দিত সুখ: তুমি জলদি হ'তে, তুমি হল্লা করতে, তুমি ঘামতে আর পরে বেশ ক্ষুধিত হ'তে ......গুলি ছোঁড়ার মধ্যে বিরতি বাড়তে লাগল। নিঃসন্দেহে, ঐ পরিখায় লুকোনো কোনো একটা পথে, একটা দেহ পা-ফাঁক করে পড়ে আছে—একটা ইন্‌ডিয়ান দেহ, চিৎ হয়ে শুয়ে, উরুর মাঝখানে কালো মতন দাগ।"

মেক্সিকোর সোনোরা রাজ্যের ইআকুই ইন্‌ডিয়ানদের রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া হয়, (যাতে তাদের সারযুক্ত সুফলা জমিগুলো মার্কিন ধনিকদের বিনা ঝঞ্জাটে বিক্রী করা যায়)। যারা টিকে থাকে, তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইউকাতান উপনিবেশে, আর ইউকাতান উপদ্বীপ, শুধু পূর্বতন মালিক মায়াদেরই নয়, দূরাগত ইআকুইদেরও কবরখানা হয়ে ওঠে: এই শতকের গোড়ার দিকে পঞ্চাশ জন হেনেকুইন-রাজার খেতে কাজ করত এক লক্ষেরও বেশী ইন্‌ডিয়ান দাস। স্বাস্থ্যবান, সুন্দর ইআকুইদের খাটবার অসম্ভব ক্ষমতা সত্ত্বেও গোলামির প্রথম বছরে তাদের তিন-এর দু-ভাগ লোক মারা যায়। শ্রমিকদের জীবন যাপনের মান অসম্ভব নীচু বলেই, হেনেকুইন আজ-ও কৃত্রিম ফাইবারের বিকল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে। অবস্থা নিশ্চয়ই বদলেছে, তবে যথেষ্ট নয়—অন্তত ইউকাতান-এর বাসিন্দাদের জন্যে—যেমন অনেকে বলেন। এক সমকালীন বিশেষজ্ঞের মতে: "এই সব শ্রমিকদের হাল ক্রীতদাসদের মত।" বগোতার কাছে, এন্‌ডিয়ান ঢলে চাঁদের আলোয় নিজের জমি চাষ করার জন্যে, হাসেন্‌দাদো'র অনুমতি পেতে ইন্‌ডিয়ান পিওনকে আজ-ও বিনা মজুরিতে কাজ করে দিতে হয়।" রেনে দুমো বলেছেন, "ইন্‌ডিয়ানদের পূর্বপুরুষেরা, আগে বিনা জবাবদিহিতে মালিকবিহীন খেতে চাষ-আবাদ করত। আর আজ কিনা, শুধু পাহাড়ের অনুর্বর ঢলগুলোতে চাষ করার অনুমতিটুকু পেতে বিনা মজুরিতে খেটে দিতে হয়।"

জঙ্গলের গভীরে গিয়েও ইন্‌ডিয়ানদের আজ ছাড় নেই। এই শতকের গোড়ায় ব্রাজিলে ২৩০টি উপজাতি ছিল; তারপর থেকে নব্বইটি উবে গেছে—বন্দুক আর জীবাণুর প্রকোপে মুছে গেছে পৃথিবী থেকে। হিংস্রতা আর রোগ, সভ্যতার প্রথম সারির পদাতিকবাহিনী: আজ-ও ইন্‌ডিয়ানদের পক্ষে সাদা চামড়ার লোকেদের সংসর্গে আসার অর্থ মৃত্যুর সংসর্গে আসা। ১৫৩৭ সাল থেকে ব্রাজিলে, ইন্‌ডিয়াননের স্বার্থরক্ষার জন্যে যে-ক'টা আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, প্রতিটা তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়ে এসেছে। ব্রাজিলের প্রতিটি সংবিধান অনুযায়ী, তারা নিজেদের জমির "প্রাথমিক ও জন্মগত অধিকারে" মালিক, কিন্তু জমি উর্বরা হ'লেই, তাদের মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলতে থাকে। প্রকৃতির বদান্যতাই তাদের লুটপাট আর উৎপাত-এর নিশানা করে। ইন্‌ডিয়ান-শিকার এ-যুগে ভয়ানক আকার নিয়েছে; পৃথিবীর সব থেকে বড় জঙ্গল, এক নতুন "আমেরিকার স্বপ্ন"-এর ইন্ধন যোগাচ্ছে।

কন্‌কিস্‌তাদোর-দের নতুন দল, মার্কিন মুলুকের মানুষ, তাদের বাণিজ্যিক পরিকল্পনা নিয়ে আমাজনে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ছে। এই মার্কিনি হামলা ব্রাজিলের ফাটকাবাজদের লোভ যে-ভাবে তাতিয়ে তুলেছে, এর আগে কখনো তা হয়নি। ইন্‌ডিয়ানরা কোনো চিহ্ন না রেখেই মুছে যায়, আর তাদের জমি ডলারের বিনিময়ে নতুন ক্রেতাদের হাতে চলে যায়। যাদের বাণিজ্যিক মূল্য সম্পর্কে ইন্‌ডিয়ানরা সচেতন-ও নয়, সেই সোনা, খনিজ পদার্থ, টিম্‌বার, রাবার-এর উল্লেখ, অল্প যে-কয়েকটা তদন্ত হয়েছে তাতে বারবার ফিরে আসে। জানা গেছে যে, হেলিকপটার আর হাল্কা এয়ারপ্লেন থেকে ইন্‌ডিয়ানদের মেসিন-গান দিয়ে গুলি করা হয়েছে, টিকে দেওয়া হয়েছে বসন্তরোগের বীজাণু দিয়ে, গ্রামে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে ডিনামাইট, আর চিনিতে স্ট্রিকনিন্‌ ও নুনে সেঁকোবিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে উপহার। কাস্তেলো ব্রাঙ্‌কো—একনায়কতন্ত্র যাঁর ওপর প্রশাসন ঢেলে সাজানোর ভার দিয়েছিল, সেই ইন্‌ডিয়ান প্রোটেক্‌শান সারভিস-এর পরিচালকের বিরুদ্ধে ইন্‌ডিয়ানদের ওপর বিয়াল্লিশ রকমের অপরাধ-এর অভিযোগ প্রমাণ সহ দাখিল করা হয়। ১৯৬৮ সালে এই কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়।

এ-যুগে ইন্‌ডিয়ান সমাজ, লাতিন আমেরিকার অর্থ-কাঠামোর বাইরে শূন্যে ঝুলে থাকে না। যদি-ও, এটা সত্যি যে ব্রাজিলের কিছু উপজাতি জঙ্গলে বদ্ধ হয়ে রয়েছে, কিছু আলটিপ্লানো সম্প্রদায় বিশ্ব থেকে পুরোপুরি বিযুক্ত, ভেনেজুয়েলার সামান্তে কিছু বর্বর উপজাতির ঘাঁটি আছে, কিন্তু মোটামুটি ইন্‌ডিয়ানরা, সরাসরি না হ'লেও, উৎপাদন আর খাদক-ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে গেছে। তারা যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় অংশ নেয়, তা তাদের গণ্য করে বলি-হিসেবে,—শোষিতদের মধ্যেও সবথেকে শোষিত তারা। তারা যে অল্প জিনিস ব্যবহার করে বা বানায়, তা অতিলোভী দালালদের পাল্লায় প'ড়ে বেশী দামে কিনতে বাধ্য হয়, অথচ যৎসামান্য মূল্যে পরে বিক্রী করতে বাধ্য হয়; সব থেকে কম শ্রম-হারে তারা খেতে দিনমজুরি করে বা পাহাড়ে প্রহরা দেয়; হয় তারা তাদের দিনগুলো বিশ্বের বাজারের জন্যে খেটে মরে, নয় দখলিকার-দের জন্যে যুদ্ধে প্রাণ দেয়। গুয়েতামালার মত দেশে, তারা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যমণি: প্রতি বছর অবিচ্ছিন্ন ধারায় তারা তাদের "পবিত্র জমি" (যে জমিতে একটি ছোটো খামার মরদেহের সমান,) ছেড়ে ওঁরা কফি, তুলো আর চিনির ফলনে তাদের দু-লক্ষ জোড়া হাত

লাগাতে চলে যায়। গবাদি পশুর মত ওদের ট্রাকে চালান দেওয়া হয়; অনেক সময়ে রুটির প্রয়োজনের চেয়ে মদই ওদের টেনে নিয়ে যায়। ঠিকাদারেরা মারিম্বা আর প্রচুর পরিমাণে আন্তআরদিয়েন্‌তের যোগান দেয় আর ইন্‌ডিয়ানরা নেশা ছুটলে দেখে ততদিনে তারা দেনায় ডুবে গেছে। এই দেনা শোধ করতে সে গরম এক অচেনা দেশে খেটে মরে, আর হয়তো, পকেটে কটা সেন্‌টাভো কিংবা ক্ষয়রোগ বা ম্যালেরিয়া নিয়ে, ক'মাস পরে সে দেশে ফিরে যায়। কাজে লাগতে গররাজীদের বোঝাতে সেনাবাহিনী দক্ষতার সঙ্গে সহযোগিতা করে। ইন্‌ডিয়ানদের জমি দখল করে আর শ্রমে ভাগ বসিয়ে, তাদের সর্বস্বান্ত করার ব্যাপারে হাত মিলিয়ে কাজ করছে জাতি-বৈষম্যের মনোভাব; এদের আবার মদত দিয়ে চলেছে দখলের লড়াই-এ ভেঙ্গে চুরমার সভ্যতার গৌরব হ্রাসের প্রচার। দখল আর তারপর দীর্ঘকাল ধ'রে অপমানের ফলে ইন্‌ডিয়ানদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চেতনায় ভাঙন ধরে। অথচ গুয়েতামালাতে এই গুঁড়ো হয়ে যাওয়া সচেতনতাই যা টিকে আছে।* পবিত্র সপ্তাহে, মায়াদের বংশধরদের মিছিল দলবদ্ধ ভাবে মর্ষক্ষমতার বীভৎস নমুনা দেখায়। তারা বিরাট ক্রুশ টেনে নিয়ে যায় আর গোলগোথা পর্যন্ত সমস্ত পথ ধরে যীশুকে বেতমারার প্রতিটি পর্বে অংশ নেয়; যন্ত্রণার, চিৎকারের ভেতর দিয়ে তাঁর মৃত্যু তাঁর কবরস্থ হওয়ার কাহিনীকে নিজেদের মৃত্যু—নিজেদের কবরস্থ হওয়ার কাহিনীতে রূপ দেয় যে-কাহিনী কত কালের আগের সুন্দর জীবন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কাহিনী। কেবল পবিত্র হপ্তার শেষে পুনরুত্থানটাই কেবল ঘটে না।

---

* মায়া-কুইচেরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করত; উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত, মিতাচার, পাপ-স্বীকার এর প্রথা ছিল; বিশ্বাস করত যে পৃথিবী ধ্বংস হবার সময়ে মহাপ্লাবন হবে। খ্রীস্টীয় ধর্ম ওদের জন্যে অল্প কিছুই নতুন আনতে পেরেছিলো। উপনিবেশ ভাঙনের সঙ্গে ধর্মীয় ভাঙন শুরু হয়। কন্‌কিস্‌তাদোর-দের ভাবধারণার সঙ্গে ইন্‌ডিয়ানদের বিশ্বাস খাপ খাওয়াবার জন্যে, ক্যাথলিক ধর্ম, মায়াদের ধর্মের কিছু অংশ গ্রহণ করে; কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত বিফল হয়। গোড়াকার সংস্কৃতি ভেঙে চুরমার করার ধারাতেই বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আদান-প্রদান শুরু হয়।

অনুবাদ: শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়

আন্তোনিয়ো সিস্নেরোস

কবিতা চার

মৃত বিজেতারা

১

তারা জলপথে এসেছিলো
এই নীল চামড়ার লোকগুলো
যারা দাড়ি রাখতো
আর কখনো ঘুমোতো না
একে অন্যের সবকিছু হাতিয়ে মেরে দেবার লোভে।
তাদের ব্যবসা ছিলো
ক্রুশ আর ব্রাণ্ডির, যারা
তাদের জনপদ প্রতিষ্ঠা করতো
একটা গির্জে বানিয়ে।

২

সেবারকার গ্রীষ্মে ১৫২৬ সালে
বর্ষা নেমেছিলো মুষলধারে
তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম আর মাথার ওপর,
আর কেউই মেরামত করেনি
জং-ধরা পুরোনো বর্মগুলো।
সংরক্ষিত আসন আর বেদিগুলোর মধ্যে
গজিয়েছিলো কালো ডুমুরগাছ,
আর ছাতের টালিগুলোর ওপর
চড়ুইরা তাদের ঠোঁট থেঁৎলে ফেলেছিলো
ঘণ্টাগুলোকে স্তব্ধ করতে গিয়ে।
পরে পেরুতে

কেউ, যদিও নিজের বাড়িতে
সে প্রভু, এক পা-ও
নড়াচড়া করতে পারতো না মড়াগুলো না-মাড়িয়ে
কিংবা ঘুমোতেও পারতো না শাদা চেয়ারের পাশে
অথবা জলাগুলোয়
কোনো বিছের মতো আত্মীয়দের সঙ্গে
বিছানা ভাগ না-ক'রে।
বিছে আর মাকড়সার মল গায়ে
অল্প ক-জনাই শুধু তাদের ঘোড়াগুলোর চেয়ে বেশি দিন বাঁচতে পেরেছিলো।

তুপাক আমারু অবনমিত

লম্বা-লম্বা জুলফিওলা
কত-কত মুক্তিদাতা ছিলো।
যারা দেখেছিলো মৃতদের, আর আহত তাদের
ফিরিয়ে আনা হয়েছিলো
যুদ্ধের পর। অল্পদিনের মধ্যেই তাদের লাশগুলো
ইতিহাস হ'য়ে গেলো আর জুলফিগুলো
তাদের পুরোনো উর্দির গায়ে গজিয়ে
তাদের জাতির প্রতিষ্ঠাতা ব'লে ঘোষণা ক'রে দিলো।
যাদের অত ভাগ্য নেই, তারা
তাদের চারটে ঘোড়া আর মৃত্যু নিয়ে
সবসুদ্ধ মোটে দু-পাতা জুড়েছে।

প্রাচীন পেরু

হুয়ারাঙ্গোর ডাল দিয়ে
তারা মাছি তাড়ায়
যারা ভনভন করে
মৃতের বুকের ওপর।
মন্দিরের পাথরের ওপর, চাতালে,
সম্ভপতিহারাদের সঙ্গে বুড়ো সর্দারদের

কী-গভীর ভালোবাসা! আর এক রক্তচোখ সূর্য
ঝলসে দেয়
তাদের ছেলেমেয়েদের হাড়।

তারমা

দেয়ালে-দেয়ালে রোদ, ছাতগুলো
ডালপালার মধ্যে দুলছে,
আমার জামায় জড়িয়ে-যাওয়া হলুদ লতা,
জুতোর মধ্যে শ্যামাপাখি,
পাহাড়ের দিকে ওঠা
ইউক্যালিপ্‌টাসের শানবাঁধানো রাস্তা—
অথচ তবু
মাছিগুলো আর মৃতেরা
কিছুই চায় না—
না ডুমুরগাছ, না হলুদ লতা, না ঝাঁকবাঁধা
উইলোর ছায়া।

অনুবাদ ঃ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এর্‌নেস্তো কার্‌দেনাল

কবিতা তিন

কামানের গর্জনে জেগে-ওঠা
সকালবেলায় আকাশ-ছাওয়া উড়োজাহাজে
মনে হ'তে পারে বুঝি বিপ্লব
কিন্তু আসলে এটা স্বৈরাচারীর জন্মদিন।

২

আদোল্‌ফ বেয়াজ বোনে-র সমাধিফলকের জন্য
তোমাকে ওর খুন করেছে আর আমাদের জানায়ওনি কোনখানে গোর দিয়েছে
তোমার শরীর
কিন্তু সেদিন থেকে আমাদের এই সারা দেশ তোমার সমাধি,
কিংবা বরং বলি: তুমি ফিরে এসেছো জীবনের মাঝখানে
প্রতিটি ইঙ্গিতে, যেখানে তোমার শরীর নেই সেখানেও।
ওরা ভেবেছিলো 'গুলি চালাও' এই হুকুম দিয়েই ওরা তোমাকে খতম ক'রে দিয়েছে
ভেবেছিলো তোমাকে ওরা মাটিতে পুঁতে ফেলেছে
আর আসলে যা করেছিলো তা এই: ওরা মাটিতে পুঁতেছিলো একটা বীজ।

৩

নিকারাগুয়ার গন্ধ গায়ে, এসে হাজির বসন্ত:
নতুন বৃষ্টিভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ, আর উষ্ণ আবহাওয়ার,
ফুলের, অঙ্কুর বেরিয়ে এলো মাটি ফুঁড়ে, ভেজা পাতা,
(আর আমি শুনতে পেলাম এক জন্তু কোথাও ডুকরে উঠলো),
না কি এটা ভালোবাসার গন্ধ? কিন্তু এ তো তোমার ভালোবাসা নয়, কার্‌দেনাল,
দেশপ্রেম ছিলো শুধু একনায়কের: থলথলে পৃথুল
একনায়ক, তার সব খোলতাই জামা আর দশ-গ্যালন সমব্রেরো,
তোমার স্বপ্নের ভূমিচিত্র পেরিয়ে যাচ্ছে তার জমকালো ইয়াটে;
সেই তো দেশকে ভালোবেসেছে, চুরি করেছে দখল ক'রে নিয়েছে।
আর এখন এই মলম মাখানো একনায়ক শুয়ে আছে মাটিতে যাকে সে ভালোবাসতো।
কিন্তু দেশপ্রেম তোমাকে, কার্‌দেনাল, নিয়ে চ'লে গিয়েছে নির্বাসনে।

অনুবাদ: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গাব্রিয়েল গারসিয়া মার্কেস

বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর জলে-ডোবা মানুষ

বাচ্চাদের মধ্যে যারা প্রথমে সাগরের ওপর দিয়ে কালো ফুলেওঠা জিনিসটাকে ধীরে-ধীরে ভেসে আসতে দেখেছিলো, ভেবেছিলো বুঝি শত্রুপক্ষের কোনো জাহাজ। পরে তারা দেখতে পেলো ওর কোনো নিশান বা মাস্তুল নেই, তখন তারা ভাবলো ওটা তিমিমাছ। কিন্তু জিনিসটা যখন ঢেউয়ের দোলায় কূলে এসে পড়লো, তারা সামুদ্রিক আগাছার ঝাড়, জেলিফিশের, মাছের আর সমুদ্রে ভেসেবেড়ানো জিনিসের টুকিটাকি তার গা থেকে সরিয়ে ফেললো, আর তখনই কেবল তারা দেখতে পেলো, ওটা একজন ডুবে-যাওয়া মানুষ।

সারাটা বিকেল তারা তার সঙ্গে খেলা করলো, বালির নিচে তাকে কবর দিলো, কবর খুঁড়ে আবার তাকে তুললো, সেইসময় কেউ একজন হঠাৎ তাদের দেখে ফেললো আর খবরটা গাঁয়ে রটিয়ে দিলো। যারা তাকে সবচেয়ে কাছের বাড়িটায় ব'য়ে নিয়ে এলো, লক্ষ করলো, তাদের জানা যে-কোনো মৃত মানুষের চেয়ে এই দেহটা বেশি ভারি, প্রায় একটা ঘোড়ার সমান। আর তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, হয়তো অনেকক্ষণ ধ'রে জলের ওপর ভেসে ছিলো আর তাই জল একেবারে হাড়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। তাকে মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে তারা বললো, অন্য সব মানুষের চেয়ে সে লম্বা। কারণ বাড়িটায় তার জন্য আর খুব অল্পই জায়গা অবশিষ্ট ছিলো। কিন্তু তারা ভাবলো মৃত্যুর পরেও বেড়ে চলার ক্ষমতা হয়তো কোনো-কোনো জলে-ডোবা মানুষের প্রকৃতির একটা অঙ্গ। তার সারা গায়ে সমুদ্রের গন্ধ আর আকৃতি থেকেই কেবল বোঝা যাচ্ছিলো যে এটা মানুষের শব, কারণ কাদা আর আঁশের আবরণে তার চামড়া ঢাকা প'ড়ে গিয়েছিলো।

মৃত মানুষটি যে অপরিচিত তা জানতে তার মুখটাও তাদের সাফ করার দরকার হলো না। সারা গাঁয়ে মোটে গোটা-কুড়ি কাঠের বাড়ি, যার পাথুরে উঠোনে কোনো ফুল ফোটে না আর গ্রামটি একটি

মরুভূমির মতো অন্তরীপের একেবারে শেষ পর্যন্ত ছড়ানো। জমি এতই কম ছিলো যে মায়েদের মনে সবসময়েই ভয়, বুঝি বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাবে তাদের বাচ্চাদের আর তাদের মধ্যে বুড়ো হ'য়ে যে ক-কজন মারা গেছে, তাদের পর্বতের খাড়াই থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়েছে। কিন্তু সাগর শান্ত আর দরাজ, আর সাতটি নৌকোতেই সব লোক ধ'রে যেতো। কাজেই তারা যখন জলে-ডোবা মানুষটিকে দেখলো, শুধু নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে দেখে নিলো যে তারা সবাই সেখানে রয়েছে।

সে-রাতে তারা সাগরে গেলো না কাজে। যখন পুরুষরা দেখতে বেরুলো আশেপাশের গাঁয়ের কেউ নিখোঁজ হয়েছে কি-না, মেয়েরা থেকে গেলো জলে-ডোবা মানুষটির যত্ন-আত্তি করবার জন্য। তারা ঘাসের তৈরি ঝাড়ন দিয়ে মাটি ঝেড়ে ফেললো, জলের নিচের যে-সব নুড়ি তার চুলে জড়িয়ে গিয়েছিলো সেগুলো সরিয়ে দিলো আর মাছের আঁশ ছাড়াবার ঝিনুক দিয়ে তার গা থেকে শ্যাওলা চেঁছে ফেললো। কাজ করতে করতে তাদের নজরে পড়লো, তার গায়ে যে-সব গাছপালা সেগুলো বহুদূর সমুদ্রের আর গভীর জলের, আর তার পোশাক শতচ্ছিন্ন, যেন প্রবালের গোলক-ধাঁধার পথ উজিয়ে এসেছে। তারা এ-ও দেখলো, মৃত্যুকে সে বহন করেছে খুবই মর্যাদার সঙ্গে, কারণ সাগর থেকে ফেরা অন্য ডুবন্ত মানুষদের মতো তার দৃষ্টি নির্জন নয়, বা নদীতে যারা ডুবে যায় তাদের মতো বন্য, নিঃস্বও নয়। কিন্তু তাকে সাফ করার কাজ শেষ করার পরেই তারা বুঝতে পারলো মানুষটি কেমন ছিলো, আর বুঝতে পারামাত্রই তাদের দম আটকে এলো। সে কেবল সবচেয়ে দীর্ঘকায়, সবচেয়ে শক্তিশালী, অত্যন্ত পৌরুষপূর্ণ এবং তাদের দেখা সবচেয়ে সুপুরুষই নয়, যদিও তারা তাকেই দেখছিলো, তবু তাদের কল্পনাতেও এমন মানুষের স্থান ছিলো না।

তাকে শোয়ানোর মতো বড়ো বিছানা তারা সারা গাঁয়ে খুঁজে পেলো না, পেলো না এমন কোনো পোক্ত টেবিল যা তার উপাসনার জন্য ব্যবহার করা চলে। সবচেয়ে লম্বা মানুষদের হলিডে প্যান্ট তার মাপমতো হবে না, সবচেয়ে মোটা মানুষদের সান্‌ডে শার্টও তার গায়ে লাগবে না, সবচেয়ে বড়ো মাপের পায়ের জুতোও তার পায়ে হবে না। তার বিশাল আকৃতি আর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে মেয়েরা ঠিক করলো পালের বড়ো টুকরো দিয়ে তার জন্য ক'টা প্যান্ট আর লিনেন দিয়ে একটা জামা বানিয়ে দেবে যাতে মৃত্যুর

মধ্যেও তার মর্যাদা অটুট থাকে। গোল হ'য়ে ব'সে যখন তারা সেলাই করছিলো, ফোঁড় দেবার ফাঁকে-ফাঁকে শবটির দিকে তাকাচ্ছিলো, তাদের মনে হচ্ছিলো, সে-রাতের মতো বাতাস এর আগে আর কখনো এমন দামাল হয়নি, সাগর হয়নি এমন অশান্ত; আর তারা ভাবলো মৃত মানুষটির সঙ্গে আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের হয়তো কোনো যোগ আছে। তারা ভাবছিলো, এই অসামান্য মানুষটি যদি (তাদের) গ্রামে বাস করতো, তাহলে তারই বাড়িতে থাকতো সবচেয়ে চওড়া দরজা আর সবচেয়ে উঁচু সিলিং আর সবচেয়ে মজবুত মেঝে; তার পালঙ্ক তৈরি হ'তো জাহাজের মাঝখানের কাঠামোয় লোহার বল্টু লাগিয়ে, আর তার স্ত্রী হ'তো সবচেয়ে সুখী রমণী। তারা ভাবছিলো, তার এতই দাপট থাকতো যে শুধুমাত্র নাম ধ'রে ডেকেই সে সাগরের মাছদের কাছে টেনে আনতে পারতো, আর সে তার জমিতে এত বেশি মেহনত করত যে পাথরের বুক চিরে ঝরনা বেরিয়ে আসতো যাতে সে খাড়া পাহাড়ের গায়ে ফুলগাছ লাগাতে পারে। তারা গোপনে যে যার স্বামীর সঙ্গে তার তুলনা করলো, ভাবলো সারা জীবন ধ'রে তাদের স্বামীরা যা করতে অক্ষম এ তা করতে পারে একরাত্রেই। আর পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল, সবচেয়ে নীচমনা এবং সবচেয়ে অপদার্থ জীব হিসেবে তাদের বাতিল ক'রে হৃদয়ের গভীরে পাঠিয়ে দিয়ে ভাবনায় ইতি টানলো। কল্পনার গোলকধাঁধায় যখন তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন সবচেয়ে প্রধানা স্ত্রীলোকটি, প্রধানা ব'লেই যিনি আসক্তির চেয়ে বেশি করুণা নিয়ে ডুবন্ত মানুষটিকে দেখছিলেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন: 'ওর মুখখানা কোনো এক এস্তেবানের মতো।'

সত্যি। তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মেয়ে তার দিকে একবার মাত্র তাকিয়েই বুঝলো যে, অন্য-কোনো নামে তাকে মানায় না। মেয়েদের মধ্যে যারা একটু বেশি একগুঁয়ে, বয়স যাদের সবচেয়ে কম, আরো কিছুক্ষণ এই মোহে আচ্ছন্ন থাকলো যে যখন তারা তাকে পোশাক পরাচ্ছিলো এবং সে চকচকে চামড়ার জুতো পায়ে ফুলের মধ্যে শুয়েছিলো, তখন মনে হচ্ছিলো তার নাম লুতারো-ও হ'তে পারে। কিন্তু বৃথা এই মোহ। ক্যাম্বিসের কাপড় যতটা দরকার তা ছিলো না, খুবই অপটুভাবে ছাঁটা আর সেলাই করা প্যান্ট অত্যন্ত আঁটো-সাঁটো এবং তার হৃৎপিণ্ডের লুকোনো শক্তিতে তার জামার বোতাম সশব্দে খুলে যাচ্ছে। মাঝরাতের পর বাতাসের শনশনানি থেমে গেলো,

আর সাগর তার ওয়েন্‌জড়ে তন্দ্রালুতায় চ'লে পড়লো। নৈঃশব্দ্য সবশেষে সন্দেহেরও নিরসন ঘটালো : সে এস্‌তেবান। মেয়েরা যারা তাকে পোশাক পরিয়েছে, তার চুল আঁচড়ে দিয়েছে, নখ কেটে দিয়েছে আর দাড়ি কামিয়ে দিয়েছে, তারা যখন দেখলো বাধ্য হ'য়ে তাকে মাটির উপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে, তখন তাদের দরদ উঠলে উথলো। তখনই তারা বুঝতে পারলো এত বড়ো দেহটা নিয়ে সে কত অসুখী ছিলো, কারণ মৃত্যুর পরেও এ-নিয়ে তাকে ঝঞ্ঝাট পোহাতে হচ্ছে। তারা দেখতে পেলো সে কারকম ভাবে বেঁচে ছিলো, বাধ্য হ'য়ে আড়াআড়িভাবে দরজা দিয়ে যেতে গিয়ে চৌকাঠে মাথা ঠুকে যাচ্ছে, বেড়াতে গেলেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা, নরম গোলাপী সিলায়ন মাছের মতো হাত দুটি নিয়ে কী করবে জানে না, এদিকে গৃহকর্ত্রী তাঁর সবচেয়ে পোক্ত চেয়ারটি খুঁজছেন আর মিনতি করছেন মৃত্যুভয়ে—'এস্‌তেবান. অনুগ্রহ ক'রে এখানে বোসো' আর সে দেয়ালে হেলান দিয়ে, হাসিমুখে. 'বিব্রত হবেন না ঠাকরুন, যেখানে আছি বেশ আছি আমি।' যখনই কারো বাড়ি যায়, একই কাজ বারবার ক'রে ক'রে গোড়ালি শক্ত আর পিঠ ছড়ে গেছে, 'বিব্রত হবেন না, ঠাকরুন' চেয়ারটি পাছে ভেঙে ফ্যালে সেই লজ্জা এড়াতে, 'আমি যেখানে আছি বেশ আছি' (বলা) এবং বোধ হয় কখনো জানতেও পারেনি যে যারা বলেছিলো, যেয়োনা এস্‌তেবান, অন্তত কফি বানানো পর্যন্ত সবুর করো, তারাই পরে কানাকানি করতো, গণ্ডমূর্খটা শেষ পর্যন্ত চ'লে গেছে, যাক্‌ বাঁচা গেছে, রূপবান গাধাটা চ'লে গেছে। ভোর হবার একটু আগে পর্যন্ত দেহটির পাশে ব'সে মেয়েরা এই সবই ভাবছিলো। পরে, যখন তারা একটা রুমালে তার মুখ ঢেকে দিলো যাতে আলোয় তার অসুবিধে না হয়, তাকে এমন চিরতরে মৃত ,এত অসহায়, এত আপনজনের মতো লাগছিলো যে তাদের হৃদয়ে প্রথম অশ্রুর উৎসার অবারিত হ'লো। তরুণীদের মধ্যে একজন প্রথম কান্না শুরু করলো। অন্যেরাও, তাতে যোগ দিয়ে, প্রথমে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো পরে বিলাপ করতে শুরু করলো, আর যত তারা ফোঁপাচ্ছিলো ততই তাদের কান্না পাচ্ছিলো। কারণ ডুবন্ত মানুষটি তাদের কাছে এস্‌তেবানই হ'য়ে উঠেছিলো আর তাই তারা হাপুস নয়নে কাঁদলো, কারণ সে ছিলো পৃথিবীর সবচেয়ে নিঃস্ব সবচেয়ে প্রশান্ত এবং সবচেয়ে সদাশয় হতভাগ্য এস্‌তেবান। কাজেই পুরুষরা যখন এই খবর নিয়ে ফিরে এলো যে ডুবে-যাওয়া মানুষটি পাশের কোনো গ্রামেরও নয়, তখন মেয়েরা তাদের কান্নার মধ্যেও উল্লাস অনুভব করলো।

তারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'ঈশ্বরের গুণগান করো, ও আমাদের।'

পুরুষরা ভাবছিলো, এই বাড়াবাড়ি মেয়েলি আদিখ্যেতা ছাড়া আর কিছু নয়। সারারাত হন্যে হ'য়ে খোঁজাখুঁজির ধকলে ক্লান্ত তারা চাইছিলো শুকনো, বায়ুহীন দিনটিতে রোদের তেজ বেড়ে ওঠার আগেই আগন্তুকের ঝামেলা থেকে চিরতরে রেহাই পেতে। জাহাজের সামনের মাস্তুল আর মাছধরার কোঁচের টুকরোটাকৃরা দিয়ে তারা একটা শয্যা তৈরি করলো, একত্রে দড়ি দিয়ে বাঁধলো যাতে পাহাড়ের খাড়াইতে পৌঁছনো পর্যন্ত সেটা দেহের ভার সইতে পারে। তাদের ইচ্ছে ছিলো মালবাহী জাহাজের একটা নোঙ্গর তার শরীরের সঙ্গে বেঁধে দেয়, যাতে অতল ঢেউয়ের নিচে সে সহজেই তলিয়ে যায়, যেখানে মাছ অন্ধ আর যেখানে ডুব দিলে ডুবুরিরা বাড়ি ফেরার জন্য আকুল হয়, এবং যেখান থেকে স্রোত আবার তাকে কূলে ফিরিয়ে আনবে না, যেমন নাকি অন্য মৃতদেহের বেলায় ঘটেছিলো। কিন্তু তারা যতই তাড়াহুড়ো করছিলো, মেয়েরা ততই নানা অছিলায় সময় নষ্ট করার কথা চিন্তা করছিলো। ত্রস্ত মুরগির মতো তারা চলাফেরা করছিলো।

কেউ একপাশে ডুবন্ত মানুষটির গায়ে সু-পবনের অংসফলক লাগাতে ব্যস্ত, অন্য কেউ আর একপাশে তার কব্জিতে কম্পাস বেঁধে দিচ্ছে, তারপর অনেকবার, 'ওখান থেকে স'রে যাও, এই মেয়ে, পথ ছাড়ো ছাখো, তুমি তো মরা মানুষটার গায়ের ওপরেই আমায় ফেলে দিলে,' (বলার পর) পুরুষরা তাদের একঘেয়ে জীবনধারায় অনাস্থা বোধ করতে শুরু করলো এবং এই ব'লে গাঁইগুঁই করতে আরম্ভ করলো যে, একজন আগন্তুকের জন্য এত সমারোহের ঘটা কেন। কারণ যতই পেরেক ঠোকা হোক আর যত পবিত্র জলই তার মাথায় ঢালা হোক-না-কেন, হাঙর তাকে চিবিয়ে খাবেই। কিন্তু মেয়েরা ভাঙা-নৌকোর টুকরো টাকৃরা চাপিয়েই চলেছে, দৌড়ে আসছে, যাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে, চোখের জলে যা বলতে পারছে না দীর্ঘনিঃশ্বাসে প্রকাশ করছে। কাজেই পুরুষরা শেষ পর্যন্ত এই ব'লে ফেটে পড়ল, 'ভেসে-আসা মড়া, এক অচেনা ডুবে-যাওয়া মানুষ, একখণ্ড শীতল ওয়েন্‌জডে মীট নিয়ে এমন আদিখ্যেতা আর কবে হয়েছে।' মেয়েদের মধ্যে একজন এই তাচ্ছিল্যে আহত হ'য়ে, অতঃপর, মৃত মানুষটির মুখের ওপর থেকে রুমালটি সরিয়ে নিলো, সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদেরও দমবন্ধ হ'য়ে এলো।

সে এস্‌তেবান। তাকে চেনবার জন্য এ-নামটা আবার বলবার দরকার ছিলো না। গ্রিংগো অ্যাক্‌সেন্ট, কাঁধের ম্যাকাও, নরখাদক-মারা বন্দুকে চিনতে

পারলেও সার ওয়াল্টার র‍্যালের নামটা হয়তো তাদের ব'লে দিতে হয়। কিন্তু এস্তেবান পৃথিবীতে একজনই আর এ-ই তো সে, স্পার্ম-তিমির মতো শয়ান, পাদুকাহীন; ছোটো শিশুর প্যান্ট পরনে এবং পাথুরে নখ, সেগুলো ছুরি দিয়ে কাটতে হয়। তার মুখের ওপর থেকে রুমালটা সরিয়ে ফেলতে হ'লো শুধু এটা দেখার জন্য যে, সে লজ্জিত। সে-যে এত বড়ো অথবা এত ভারী অথবা তার যে এমন অনিন্দ্যকান্তি, সে-দোষ তার নয়, এবং সে যদি জানতো এমনটা ঘটতে চলেছে, তাহ'লে সে ডুবে যাবার জন্য অন্য কোনো অনুকূল জায়গা খুঁজে নিতো; বাস্তবিক, আমি গ্যালিয়ন থেকে খুলে একটা নোঙরও গলায় বেঁধে নিতে পারতাম এবং পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তাম এমন একজন মানুষের মতো যে অন্যদের সুস্থির জীবন বিঘ্নিত হোক তা চায় না, এখন যেমন ওয়েন্‌জডে শব নিয়ে হয়েছে। এই যে তোমরা বলছো, এই নোংরা ঠাণ্ডা মাংসের টুক্‌রো নিয়ে কারো মাথা ঘামাবার দরকার নেই—এ নিয়ে আমার তো কিছু করবার নেই আর হাবভাবে এত বেশি সততা প্রকাশ পাচ্ছিলো যে পুরুষদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি সন্দিগ্ধ, তারা, যারা সমুদ্রভ্রমণে অন্তহীন রাতের পর রাত কাটিয়ে এই ভেবে তিতবিরক্ত যে, ঘরে তাদের বৌ-রা তাদের কথা ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে এবং মরা মানুষটার স্বপ্ন দেখবে, তারাও এবং অন্য যারা আরো বেশি বেশি কট্টর, হাড়ে মজ্জায় কেঁপে উঠছিলো এস্তেবানের আন্তরিকতায়।

একজন পরিত্যক্ত মৃত মানুষের জন্য যতখানি জাঁকালো শবযাত্রার কথা তারা ভাবতে পেরেছিলো, সেইভাবেই তারা আয়োজন করলো। মেয়েদের মধ্যে যারা আশেপাশের গ্রামগুলোতে ফুল আনতে গিয়েছিলো, ফিরে এলো অন্য মেয়েদের সঙ্গে ক'রে যারা শোনা কথায় বিশ্বাস করতে পারেনি, এবং ঐ মেয়েরা মৃত মানুষটিকে দেখার পর আরো ফুল আনতে ফিরে গেলো এবং তারা কেবলই ফুল আনতে আনতে এত রাশিরাশি ফুল আর এত বেশি লোক জড়ো হ'লো যে হাঁটাচলাই মুশকিল হ'য়ে উঠলো। যখন শেষের মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো, তাকে অনাথের মতো জলে ফিরিয়ে দিতে তারা ব্যথাতুর হ'য়ে উঠলো এবং সবচেয়ে ভালো লোকদের মধ্যে থেকে একজন বাবা আর একজন মা এবং খুড়িমাসিপিসি, খুড়োমেসোপিসে, ভাইবোনভাগনে বেছে নিল, যাতে তার মধ্য দিয়ে গ্রামের অধিবাসীরা একে অপরের আত্মীয় হ'য়ে ওঠে। দূর থেকে যে-নাবিকরা কান্নার শব্দ শুনেছিলো তারা পথ বদলে ফেললো এবং গ্রামবাসীরা

একজনের কথা জানতো যে সাইরেন সম্পর্কে পুরোনো কিংবদন্তী স্মরণ ক'রে নিজেকে প্রধান মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলো। পাহাড়ের বন্ধুর, খাড়াই দিয়ে কারা তাকে কাঁধে ক'রে বয়ে নিয়ে যাবে এই নিয়ে তারা যখন হুড়োহুড়ি করছিলো, ডুবে-যাওয়া মানুষটির বৈভব এবং সৌন্দর্যের মুখোমুখি হ'য়ে পুরুষ এবং মেয়েরা তখনই প্রথম টের পেলো, তাদের রাস্তাগুলো কত নির্জন, উঠোনগুলো কত উষর, তাদের সব স্বপ্নই কত সংকীর্ণ। কোনো নোঙ্গর ছাড়াই তারা তাকে যেতে দিলো যাতে ইচ্ছে করলে সে ফিরে আসতে পারে এবং অতল গহ্বরে দেহটা পড়তে যতটুকু সময় লেগেছিলো, বুঝি বহু শতাব্দীর ভগ্নাংশ, তারা সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে রেখেছিলে। এটা বুঝতে তাদের আর, পরস্পরের দিকে তাকাবার দরকার হ'লো না যে তারা সকলে আর উপস্থিত নেই, আর কখনও তারা একত্র হবেও না। কিন্তু তারা এ-ও বুঝলো যে এখন থেকে সবকিছুই বদ্‌লে যাবে, তাদের বাড়িগুলোর আরো বড়ো-বড়ো দরজা থাকবে, আরো উঁচু সিলিং, আরো শক্ত মেঝে, যাতে কড়ি বরগায় ধাক্কা না খেয়ে এস্‌তেবানের স্মৃতি সবজায়গায় চলতে-ফিরতে পারে এবং যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ-কথা বলতে সাহস না পায় যে শেষ পর্যন্ত দশাসই হাবাগোবা লোকটা মরেছে, কী বিশ্রী, রূপবান বোকাটা মরেছে শেষ পর্যন্ত। কারণ এস্‌তেবানের স্মৃতিকে শাশ্বত করতে এবার তারা তাদের বাড়ির সামনেটা নানা সুন্দর রঙে চিত্রিত করবে আর পাথরের মধ্যে থেকে ঝরনা খুঁড়ে বের করতে তারা তাদের শিরদাঁড়া প্রায় ভেঙে ফেলবে এবং খাড়া পাহাড়ের গায়ে তারা ফুলগাছ লাগাবে, যাতে ভবিষ্যতে সকালবেলা জাহাজের যাত্রীদের মাঝদরিয়ায় শ্বাসরোধকারী ফুলের গন্ধে জেগে উঠতে হয় এবং কাপ্তেনকে নেমে আসতে হয় নিজের ক্যাবিন থেকে। পরনে ইউনিফর্ম, সঙ্গে সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্র পোলস্টার, যুদ্ধের জন্য পাওয়া পদকের সারি এবং দিগন্তে সমুদ্রের বুকে জেগে-ওঠা গোলাপে ছাওয়া শৈলান্তরীপের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে হয়ত চৌদ্দটি ভাষায় বলবেন, ঐ দিকে দ্যাখো, যেখানে বাতাস এখন এত শান্ত যে মনে হয় বিছানায় ঘুমোতে গেছে, ঐ ওখানে যেখানে সূর্য এত প্রখর যে সূর্যমুখী দিশে পায় না কোন্‌দিকে ফিরবে, হ্যাঁ, ওখানে, ঐটাই এস্‌তেবানের গাঁ।

অনুবাদ : অজয় গুপ্ত

রোকে দাল্‌তোন

আবার কারাগার

আবার কারাগার, কালো জল।
রাস্তায়, কিংবা মানুষের ঘরে, এই মুহূর্তে কেউ গুঞ্জন ক'রে উঠবে
ভালোবাসায়, গান গাইবে, কিংবা এশিয়ার রাতের তলায় সেই-যে
যুদ্ধ হচ্ছে, তার খবর পড়বে। নদীতে, মহাসমুদ্রের কথা বিশ্বাস
করতে-না-পারার গান গাইবে মাছ, অসম্ভব স্বপ্ন এই মহাসমুদ্র,
এত গরীয়ান যে কিছুতেই সত্যি হ'তে পারে না। (সেইসব মাছের কথা
বলছি আমি, আসলে যারা নীল কিন্তু নাম যাদের লিরিয়ো-নেগ্রো,
যাদের শিরদাঁড়া নিংড়ে ক্ষিপ্র হিংস্র মানুষ দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধি আতর
বার ক'রে নিয়ে আসে।)

আর, কোথাও-না-কোথাও আমার চেয়েও কম-বন্দী হ'য়ে উঠবে শুকনো
কোঁচকানো পেরেক-আঁটা কোনো জিনিস।
(সত্যি, আমার এই-যে কাগজ-পেনসিল আছে—আর কবিতা—তা-ই
প্রমাণ ক'রে দেয় যে একেকটা ফাঁপিয়ে-তোলা বিশ্বজনীন ধারণা
আছে যা বড়ো-বড়ো অক্ষরে লেখা হবার যোগ্য—সত্য, ঈশ্বর,
অজ্ঞাত শক্তি—এক সুখী দিনে আমার মধ্য দিয়ে গড়িয়ে গিয়েছিলো
তারা, আর আমি থুবড়ে পড়িনি—ধপ ক'রে প'ড়ে যাইনি এই
অন্ধকূপে—বরং পড়েছি সুযোগেরই হাতে, যাতে মানুষের কাছে
সে-সম্বন্ধে পরে প্রকৃত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করতে পারি।
তবু, গ্রামের রাস্তায় হাঁটতেই আমার বেশি ভালো লাগতো।
এমনকি, কোনো কুকুর ছাড়াই।)

অনুবাদ: মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নিকোলাস গিয়েন

দোনা মারিয়া

আহা রে! বেচারি দোনা মারিয়া,
কিছু জানেন না সেই বেচারি!
কালোকোলো ঐ ছেলেটি তাঁরই
কিনা টাকা পায় চরের কাজে!
এ যে নিদারুণ, অভাবনীয়!

কালকে ধূর্ত বিষম চালাক
সে গেছে আমার বাসার পাশে।
দেখেই আমি তো রুদ্ধশ্বাসে
বলেছি কেবল : ভাগ! পালা! ভাগ!
(শাদা পোশাকের পুলিস সে যে!)

হায় রে! বেচারি দোনা মারিয়া
এত কিনা যিনি সম্মানিতা
ছেলের যে সব পুলিশ মিতা
তাও জানেন না ঘুণাক্ষরে!
পুরো ব্যাপারটা অভাবনীয়!

অনুবাদ : মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লেওপোল্‌দো লুগোনেস্‌

ইজুর

আমি বাঁদরটাকে কিনেছিলাম নীলামে—দেউলে-হ'য়ে-যাওয়া এক সার্কাস থেকে।

এখানে যে-পরীক্ষানিরীক্ষার কথা বর্ণনা করেছি তার কথা প্রথম আমার মাথায় জেগেছিলো একদিন বিকেলে। কোন-একটা প্রবন্ধে আমি পড়েছিলাম যে, জাভার আদিবাসীদের ধারণা বাঁদরের মুখে কথা ফোটে না, তার কারণ এটা নয় যে তারা কথা বলতে পারে না, বরং তার কারণ এটাই—তারা কথা বলতে চায় না। 'তারা কথা বলে না,' প্রবন্ধটি বলেছিলো, 'যাতে মানুষ তাদের জোর ক'রে কাজে না লাগায়।'

গোড়ায় এই কথাটাকে আমি তেমন আমল দিইনি, কিন্তু ক্রমেই ভাবনাটা আমাকে এমনভাবে দখল ক'রে নিলে যে তা থেকে বিজ্ঞানের এই তত্ত্বটা দানা বেঁধে উঠলো: বাঁদরেরা হলো এমন মানুষ যারা কোনো কারণে কথা বলা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। ফলে মস্তিষ্কের যে-অংশ বাক্‌ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে, তার সঙ্গে স্বরযন্ত্রের সম্পর্ক ক্রমেই এত ক্ষীণ হয়ে আসে যে শেষ অব্দি তা একেবার বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। বাঁদরদের ভাষা শেষে একেবারে কতকগুলো অস্পষ্ট চীৎকারে পরিণত হয়, আর আদিম মানুষ একেবারে জন্তুর পর্যায়ে নেমে আসে।

এটা তো স্পষ্ট যে, তত্ত্বটাকে যদি হাতেকলমে প্রমাণ করা যায়, তাহ'লে যে সব অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য বাঁদরদের এ-রকম অসাধারণ জীবে পরিণত করেছে, তাদের সহজেই ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর। কিন্তু এর তো একটাই সম্ভাব্য প্রমাণ: কোনো বাঁদরকে আবার কথা বলাতে বাধ্য করা।

ইতিমধ্যে আমি আমার এই বাঁদরটাকে নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরেছি, আর এই ঘোরাঘুরির মধ্য দিয়ে তাকে আমার খুব কাছে টেনে এনেছি। ইওরোপে সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো, আর আমি যদি চাইতাম তবে ওকে আমি কনসুলের মতো বিখ্যাত ক'রে দিতে পারতাম, কিন্তু আমার এ-ধরনের মূর্খতা আমার ব্যবসায়িক সততার সঙ্গে মানাতো না।

বাঁদরদের কথা বলার ক্ষমতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে এমনই তাতিয়ে দিয়েছিলো যে, এ-বিষয়ে যাবতীয় বইপত্র আমি ঘেঁটে দেখেছিলাম, কিন্তু তেমন লাভ হ'লো না! একমাত্র যে-বিষয়টা আমি তর্কাতীতভাবে জানতে পেলাম তা হলো এই যে, বাঁদর কেন কথা বলে না এই রহস্যের পেছনে কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। আর এতেই কেটে গেলো পাঁচ বছর—অধ্যয়নে আর চিন্তায়।

ইজুর—কোত্থেকে যে এই নামটা ও জুটিয়েছিলো তা আমি কোনোদিন জানতে পারিনি, যেহেতু ওর পুরোনো মালিকও তা জানতো না! তবে ইজুর নিঃসন্দেহে এক আশ্চর্য জীব। সার্কাসে ও যে খেলা শিখেছিলো, যদিও তা কেবল প্রধানত নকল ক'রে দেখানোতেই সীমাবদ্ধ ছিলো, তা ওর চিন্তা-শক্তির যথেষ্ট বিকাশ ঘটিয়েছিলো, আর এটাই আরো খোঁচাতে লাগলো আমার এই তথাকথিত আজগুবি তত্ত্বটা ওর ওপর খাটিয়ে দেখবার জন্য। তাছাড়া, এ তো জানা কথাই যে শিম্পাঞ্জিরা (ইজুর তো আসলে তাই) বাঁদরদের ভেতর সবচেয়ে বাধ্য জাত, আর মানসিক দিক থেকেও সবচেয়ে উন্নত, যেটা আমার সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিলো। যখনই ওকে দেখতাম দু-পায়ে হেঁটে যাচ্ছে, টলোমলো, হাত দুটো পেছনে, অনেকটা যেন কোনো মাতাল খালাসি, তখনই আমার মধ্যে এ-ধারণা আরো জোরালো হ'য়ে উঠতো যে, ও আদতে এক প্রতিবন্ধী মানুষ।

সত্যি-বলতে, কোনো বাঁদর যে কেন নিখুঁতভাবে কথা সাজাতে পারবে না, তার কোনো কারণ নেই। তার স্বাভাবিক কথা—অর্থাৎ যে-সব আওয়াজ সাজিয়ে অন্যান্য বাঁদরদের ওর মনের ভাব জানায়—বেশ বিচিত্র, ওর স্বরযন্ত্র যদিও মানুষের চেয়ে ভিন্ন, তবু তা তোতাপাখির স্বরযন্ত্র যতটা ভিন্ন ততটা নয়—অথচ তোতা কিন্তু কথা বলতে পারে। আর তার মগজ—তোতার সঙ্গে তার তুলনা করলেই তো সব সন্দেহের নিরসন হয়—এটাও মনে করা উচিত যে জড়বুদ্ধি মানুষের মগজও তো অনুন্নত থাকে, অথচ তা সত্ত্বেও কোনো জড়বুদ্ধি তো কিছু-কিছু কথা বলতে পারে। আর ব্রোকা-র মস্তিষ্কের খাঁজ-বিষয়ক তত্ত্বের কথা যদি ধরা যায়, সেটা তো বলাই বাহুল্য নির্ভর করে মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকাশের ওপর। তাছাড়া, বাক্‌ক্ষমতা যে এর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় তার কোনো নিঃসন্দেহ প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। যদিও শারীর সংস্থানের

দিক থেকে এই-ই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, তবে তার বিরুদ্ধে অকাট্য কিছু যুক্তিও তো আছে।

তবে সুখের কথা, অনেক বদভ্যাস থাকলেও বাঁদরদের একটা বৈশিষ্ট্য তাদের শেখার আগ্রহ, যা তার নকল করে দেখাবার বাহাদুরিতেই বোঝা যায়। তার উৎকৃষ্ট স্মরণশক্তি, চিন্তার ক্ষমতা—সেটা আবার এমন স্তরে উন্নীত যে বেশ সুষ্ঠুভাবে সে ভান করতে পারে, আর মনোযোগ সেটা তো যে-কোনো মানবশিশুর চেয়েই তুলনায় অনেক বিকশিত। বাঁদর, অতএব, শিল্পবিজ্ঞানের দারুণ সব সম্ভাবনায় ভরা বিষয়।

তার ওপর আমার বাঁদরটা ছিলো কমবয়েসী। আর কে না জানে এই সময়েই বাঁদরদের বুদ্ধি সবচেয়ে বেশী থাকে। একমাত্র মুশকিল যেটা সেটা এই: ওকে যে কথা বলতে শেখাবো সেটা কোন্ পদ্ধতিতে? তাছাড়া আমার পূর্বসূরিদের সমস্ত ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথাও আমার জানা ছিলো। আর এটা না বললেও চলে যে তাঁদের যোগ্যতা এবং তাঁদের সব চেষ্টার পুরোপুরি ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে, আমার প্রতিজ্ঞা একাধিকার হোঁচট খেয়েছিলো। কিন্তু এই বিষয়ে আমার সব ভাবনাচিন্তাই আমাকে এই সিদ্ধান্তে টেনে আনলো যে, এ-ব্যাপারে আমার প্রথম কাজ হওয়া উচিত বাঁদরের শব্দ উৎপাদক যন্ত্রের বিকাশ ঘটানো। বস্তুত এইভাবেই কেউ বোবা-কালাদের কথা বলতে শেখায়। এ-বিষয়ে ভাবতে শুরু করামাত্র বোবা-কালাদের সঙ্গে বাঁদরের যে কত মিল আছে তা আমার মনে জেগে উঠলো। প্রথমেই আছে তাদের ঐ অসাধারণ অনুকরণ করার ক্ষমতা—যেটা উচ্চারণ ক'রে বলা কথার ক্ষতিপূরণ ক'রে দেয় আর এটাই বোঝায় যে, কথা বলতে না-পারার মানে মোটেই চিন্তাশক্তি-হীনতা নয়। যদিও কথনশক্তির পক্ষাঘাত চিন্তার ক্ষমতাকে খানিকটা কমিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া আরো কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে—যেগুলো তুলনায় সুনির্দিষ্ট ব'লেই আরো অদ্ভুত: কর্তব্যনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, আর সাহস—যা দুটি বিশেষ কারণে এতই বেড়ে ওঠে যে নিশ্চয়ই স্বপ্রকাশ—ব্যালান্সের খেলায় স্বাভাবিক নৈপুণ্যে আর ঘূর্ণিরোগের প্রতিরোধ ক্ষমতায়।

আমি তাই ঠিক করলাম, আমার বাঁদরকে ব্যবহারিক ভাবে জিভ আর ঠোঁটের ব্যায়াম শিখিয়ে কাজ শুরু করবো: অর্থাৎ ওকে বোবা-কালা হিসেবেই গণ্য করলাম। তারপরে তার শ্রবণশক্তি নিশ্চয়ই আমাকে ওর সঙ্গে সরাসরি কথা-যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে—তার স্পর্শশক্তিকে ব্যবহার না করেও।

পাঠক নিশ্চয়ই দেখবেন যে, এক্ষেত্রে আমি বড্ড বেশি আশার সঙ্গে পরিকল্পনা করেছিলাম।

সৌভাগ্যবশত, সব বড়ো-বড়ো বাঁদরদের মধ্যে শিম্পাঞ্জির জিভই সবচেয়ে নড়াচড়া করে—আর এই বিশেষ ক্ষেত্রে ইজুর—সে তখন গলা-ব্যথায় ভুগছিলো, জানতো কী ক'রে বড়ো ক'রে হাঁ করতে হয়, যাতে তারা ওর গলা পরীক্ষা করতে পারে। প্রথম দেখেই আমার সন্দেহ দৃঢ় হ'লো—অবিশ্যি অংশতঃ—ওর জিহ্বা প'ড়ে আছে গলার তলায়—নির্জীব পদার্থের মতো—কেবল কোনোকিছু গেলবার সময় ছাড়া যা অনড় প'ড়ে থাকে। অচিরেই ব্যায়ামের ফল দেখা গেলো; দু-মাস পরেই ও শিখে ফেললো কী ক'রে জিভ বার ক'রে আমাকে দেখাতে হয়। কোনো ভাবনার সঙ্গে জিভ নাড়াবার প্রথম যোগসূত্র ছিলো এটাই—এমন এক যোগসূত্র যেটা ঠিক ওর ধাতের সঙ্গে মেলে।

ঠোঁট নিয়ে বরং অনেক ঝামেলা বাধলো: এমনকি চিমটে দিয়ে তাদের টেনে দিতে হ'লো মাঝে-মাঝে। কিন্তু বোধহয় আমার মুখের ভাব দেখেই ও এই অদ্ভুত কসরতের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলো—তাই চেষ্টা করেই কাজটা করতে শুরু করেছিলো ও। তার সামনে রুটিন ধরে আমি ঠোঁট নাড়তাম—যাতে ও সহজে নকল করতে পারে। ও চুপ করে বসে বসে হাত দুটি পিছনে নিয়ে পাছা চুলকাতো আর মনোযোগ দেবার চেষ্টায় জিজ্ঞাসুভাবে চোখ পিটপিট করতো। কিংবা তার লোমশ গালে এমন ভাবে টোকা দিতে থাকতো, যেন কোনো মানুষ তার ভাবনা-চিন্তাকে তাল দিয়ে দিয়ে বিন্যস্ত করবার চেষ্টা করছে। অবশেষে কী ক'রে ঠোঁট নাড়াতে হয় তা ও শিখে ফেললো।

ভাষার দক্ষতা অর্জন কিন্তু সহজ কাজ নয়, যে-কারণে পুরোপুরি কথা বলতে শেখবার আগে অনেকদিন ধরে মানবশিশুরা আধোআধো আবোলতাবোল বকে, আর শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তার ভাষার দক্ষতা বেড়ে ওঠে। এটা স্পষ্ট দেখানো গেছে যে, গলার স্বর-উৎপাদন কেন্দ্রের সঙ্গে মস্তিষ্কের বাক্-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের সম্পর্ক এমন যে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ নির্ভর করে তাদের পারস্পরিক আনুপূর্বিক সহায়তায়। ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে বোবা-কালাদের কথাশিক্ষা-বিজ্ঞানের জনক এই তত্ত্বের পূর্বদ্রষ্টা। তিনি একে বলতেন "চিন্তার গতিশীল শৃঙ্খলা।" এই কথাটি এমনই স্ফটিকস্বচ্ছ যে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকদের অনেকেরই গৌরব বাড়াতো এটা।

ভাষার শিল্পের ব্যাপারে ইজুরের অবস্থা তখন ছিলো এমন এক শিশুর মতো, যে পুরোপুরি কথা বলতে পারার আগেই অনেক শব্দ বুঝতে পারে, তবে বিভিন্ন বিষয়ে নানারকম সিদ্ধান্ত নেবার দিকেই ওর প্রবণতা ছিলো বেশী। আসলে এ তো শুধু জীবন বিষয়ে ওর বেশি অভিজ্ঞতারই ফল। এ-সব সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই কেবল কতকগুলো ঝাপসা ধারণার ফল নয়, বরং বুদ্ধি-প্রসূত কৌতূহল ও নিরীক্ষার ফল—অন্তত তাদের বিচিত্র ধরন দেখে তাই মনে হয়। এতে যেহেতু ধ'রে নেয়া হচ্ছে ওর মধ্যে বিমূর্ত কিছু যুক্তি দিয়ে ভাবার ক্ষমতা আছে, তাতে বোঝা যায় ওর মধ্যে উচ্চস্তরের বুদ্ধি আছে —আমার উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে তা যে খুবই অনুকূল তা তো বলাই বাহুল্য।

যদি আমার তত্ত্বগুলো বড্ড বেশি দুঃসাহসী ব'লে মনে হয়, তবে এটা মনে রাখতে হবে যে ন্যায়বাদ—যা কি না যুক্তি সাজিয়ে চিন্তা করার গোড়ার কথা—অনেক জীবজন্তুরই মানসিক ক্ষমতার বাইরে নয়। এটা যে সত্য তার কারণ ন্যায়বাদ মূলত দুই ভিন্ন অনুভূতির প্রতিতুলনা: তা যদি না হবে, তবে যে-সব জন্তু মানুষ দেখেছে তারা মানুষ দেখলেই পালিয়ে যায় কেন— আদৌ যারা কখনও দ্যাখেনি তারা তো যায় না!

এবার অতএব আমি ইজুরের ধ্বনিশিক্ষা নিয়ে পড়লাম, গোড়ায় শারীরিক বাক্‌প্রক্রিয়া শেখানো, তারপরে ধীরে ধীরে অর্থপূর্ণ ভাষা প্রয়োগের দিকে নিয়ে যাওয়া। বোবা-কালাদের চেয়ে বাঁদরদের সুবিধে এইটুকু যে বাঁদর স্বর তৈরী করতে পারে। প্রথমে ওকে স্বরনিয়ন্ত্রণে শিক্ষা দেওয়া হলো যা স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে স্থিতিশীল আর ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে গতিশীল।

বাঁদররা যে খেতে ভালোবাসে এ-কথা মনে রেখে—এবং বোবা-কালাদের শেখাতে গিয়ে হাইনিকে যে-পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তার সূত্র ধরে— আমি ঠিক করলাম মুখরোচক একেকটা খাবারের সঙ্গে একটা ক'রে স্বরবর্ণের অনুষঙ্গ জাগিয়ে তুলবো—যেমন 'আ' উচ্চারণের সঙ্গে আলু, 'ও' বলতে ওল, 'এ' বলতে খেজুর, এইসব। এমনভাবে ব্যাপারটাকে সাজালাম যে টুকিটাকি খাবারের নামের মধ্যে স্বরবর্ণটাকে পাওয়া যায়—কখনও একবার, কখনও বা দু-বার পর-পর, যেমন 'ও' স্বরবর্ণের পুনরাবৃত্তি আছে কোকো-তে। কিংবা কোনো শব্দ উচ্চারণের সময় কোথায়-কোথায় ঝোঁক পড়ে, সেদিকেও নজর রইলো। স্বরবর্ণ শেখাবার পালা তো ভালোয়-ভালোয় উৎরে গেলো, অর্থাৎ মুখ খুলে যে-আওয়াজগুলো করা যায়। ইজুর তা দু-হপ্তাতেই শিখে

গেলো। ওর পক্ষে সবচেয়ে অসুবিধে হয়েছিলো 'উ' উচ্চারণ করার সময়।

ব্যঞ্জনবর্ণগুলো আমাকে একেবারে রাক্ষসের মতো খাটিয়ে নিলো। চট ক'রেই আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলুম, ও কখনও সে-সব ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করতে পারবে না, যাদের বেলায় জিভ আর মাড়ি দুয়েরই ব্যবহার করতে হয়। ওর লম্বা শ্ব-দন্ত তাতে বিষম বাদ সাধলো। ওর শব্দসংখ্যা কাজে-কাজেই সীমিত হ'য়ে গেলো—শুধু স্বরবর্ণ কয়েকটা, আর ব, ক, ম, গ, ফ, চ আর স—অর্থাৎ যে-সব ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ হয় জিভ আর তালুর সহযোগে। এমনকি এ-সব ক্ষেত্রেও উচ্চারণ পদ্ধতিই যথেষ্ট হ'লো না—বোবা-কালাদের বেলায় যেমন করা হয়, ওর বেলাতেও আমাকে তেমনি স্পর্শবোধের সাহায্য নিতে হ'লো—প্রথমে আমার বুকে ওর হাত পেতে রেখে—পরে ওর নিজের বুকেই, যাতে ও শব্দের স্পন্দন বুঝতে পারে।

এইভাবেই তিনবছর কেটে গেলো—একটা শব্দও ও পুরোপুরি উচ্চারণ করতে শিখলো না। ও জিনিসপত্রের নাম করতে শিখলো শুধু প্রধান বর্ণটির অনুসরণে—মাত্র এইটুকুই ওকে শেখানো গেলো।

সার্কাসে ইজুর কুকুরের মতো ঘেউ-ঘেউ করতে শিখেছিলো, কারণ একটা কুকুর ছিলো ওর খেলার সাথী। যখনই ও দেখতো যে, ওর মুখ থেকে কথা বার করবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে-ক'রে আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি, ও জোরে-জোরে ঘেউ-ঘেউ ক'রে উঠতো, যেন আমাকে দেখাতে চাইতো ও কতটা জানে। স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণগুলো আলাদা-আলাদা ক'রে এক-এক ক'রে উচ্চারণ করতো, কিন্তু তাদের জুড়ে কিছু তৈরী করতে পারতো না। খুব বেশি হ'লে এমনভাবে হুড়মুড় করে প আর ম পর-পর উচ্চারণ করতো যে, মাথা ঘুরে যাবার জোগাড় হ'তো।

এই মন্থর প্রগতি সত্ত্বেও ইজুরের চরিত্রে কিন্তু মস্ত একটা বদল দেখা গেলো। ও তার শরীর কম নাড়ে এখন, মুখের ভাব আরো চালাকচতুর হয়ে উঠেছে আর মাঝে-মাঝেই চিন্তার ভঙ্গি করে। যেমন আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকার অভ্যেস হ'য়ে গেলো ওর। ওর স্পর্শাতুরভাবও অনেক বেড়ে গেছে; এখন একটুতেই ও কেঁদে ওঠে।

উচ্চারণ-চর্চা চলতেই থাকলো, নাছোড় প্রতিজ্ঞায়—যদিও তেমন একটা সাফল্য দেখা গেলো না। পুরো ব্যাপারটাই একটা বেদনাদায়ক প্রবল আবেগে ভ'রে গেলো—শেষটায় ক্রমেই আমি মারধোর করতে শুরু ক'রে দিলাম। ব্যর্থতার

সঙ্গে-সঙ্গে ধরনটাও ক্রমে তিক্ত হ'য়ে উঠছিলো—এতটাই যে শেষকালে ওকে দেখলেই আমার মধ্যে একটা অচেতন বিরূপভাব জেগে উঠতো।

ইজুরও ক্রমেই ওর গভীর, একরোখা নিঃশব্দতার মধ্যে ডুবে যেতে থাকলো, মেজাজ দেখাতো, আর সেটাই আমার মধ্যে এ-বিশ্বাস জন্মাচ্ছিলো যে ওকে আমি কিছুতেই এই দশা থেকে বার ক'রে আনতে পারবো না। আর তখনই আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে ও-যে কথা বলে না, তার কারণ ও কথা বলতে চায় না।

এক সন্ধ্যায় আমার রাঁধুনি এসে দারুণ আঁৎকে উঠে আমাকে জানালো যে, বাঁদরটাকে নাকি সে সত্যি-সত্যিই কথা বলতে শুনেছে। তার কথা অনুযায়ী বাগানের ডুমুরগাছ-তলায় ও বসে আছে, সত্যি কী কথা বলেছিলো তা অবিশ্যি সে ভয়ে বলতে পারলো না, তবে বাঁদরটা যে কথা বলেছিলো এ ব্যাপারে তার কোনোই সন্দেহ নেই। দুটো মাত্র শব্দ সে মনে করতে পারলো—'বিছানা' আর 'পাইপ'। তার মূর্খতা দেখে আমি শুধু লাথি মারতে বাকি রাখলাম। আর তিন বছর ধ'রে আমি যা করিনি—যে ভুলটা পুরো নিরীক্ষাটাই বানচাল ক'রে দিলো—সেই ভুলটা আমি করলাম—সারা রাত জেগে উত্ত্যক্ত ছিলাম ব'লে, আর অতিরিক্ত কৌতূহলের বশে।

বলাই বাহুল্য, তীব্র নিদ্রাহীন উত্তেজনায় আমার সে-রাতটা কেটেছিলো। কোথায় বাঁদরটাকে নিজে এসে কথা বলতে দেবো, তার বদলে উল্টে আমি ওকে জোরজুলুম ও কথা বলানোর জন্য জবরদস্তি করতে লাগলাম। যা পেলাম তা সেই 'প' আর 'ম'—যে-আওয়াজ দুটোয় আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছিলো। আর শুধু মাঝে-মাঝে তার ভণ্ড চোখ টেপা,—আর ভগবান রক্ষে করুন আমাকে—আর তার অস্থির নড়াচড়ার মধ্যে একটা উদ্ধত টিটকিরির ইঙ্গিত। আমি এত রেগে গেলাম যে এই প্রথম ওকে ক'ষে চাবকালাম, যার ফল হিসেবে ওর চোখ দিয়ে ঝরঝর চোখের জল আর ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা নেমে এলো। গোঙানির কোনো আওয়াজ অব্দি করলো না।

ইজুর তিনদিন পরে অসুস্থ হ'য়ে পড়লো—মনখারাপ, আর তার সঙ্গে দেখা দিলো মেনিনজাইটিসের লক্ষণ। জোঁক বসানো, ঠাণ্ডা জলে স্নান, জোলাপ, ঘুমের ওষুধ—এই ভীষণ অসুখ সারাবার জন্য সব ব্যবস্থাই করা হ'লো। দারুণ হতাশার সঙ্গে জেদ মিশে গেলো, আর তাই আমি যুঝে চললাম, অনুতপ্ত আর ভয়তাড়িত—অনুতাপ এই জন্য যে, আমার বিশ্বাস ছিলো জীবটি আমারই

নিষ্ঠুরতার বলি হ'লো, আর ভয় এইজন্য যে, হয়তো যে-রহস্য ও বহন করছে তা ভেদ করার আগেই ও কবরে চলে যাবে।

ওর কৃতজ্ঞ দুটো চোখ কখনোই আমার থেকে দূরে থাকতো না, ওর দৃষ্টি সবসময়ে আমাকে অনুসরণ করতো, পেছনে চলে গেলে ওর হাতদুটো আমাকে জাপ্‌টে ধরতো, আমার এই নিঃসঙ্গ দুঃখময় দিনে ও যেন সত্যিকারের মানুষ হ'য়ে উঠছিলো!

অনেক চেষ্টায় ওর অবস্থার কিছুটা উন্নতি চোখে পড়লো, কিন্তু এত দুর্বল যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতো না। আসন্ন মৃত্যু ওর মধ্যে মহিমা আর মনুষ্যত্ব জাগিয়ে তুলেছিলো, পরীক্ষা চালাবার ভূত—সে তো আসলে এক ধরনের মনের রোগ ছাড়া কিছুই না—তবু আবার আমার ঘাড়ের ওপর চেপে বসলো। বাঁদরটা যে সত্যি-সত্যি কথা বলেছে—আমি তো আর ওকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না!

খুব ধীরে-ধীরে শুরু করলাম, যে-সব বর্ণ ও উচ্চারণ করতে পারে সেগুলো দিয়েই শুরু করলাম। কোনো আওয়াজ নেই। ওকে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা একা রেখে দিলাম—আর দেয়ালের ফুটো দিয়ে ওকে লক্ষ করতে লাগলাম—ওর বিশ্বস্ততা, ওর খাদ্যপ্রিয়তা, এগুলোকে ব্যবহার করবার চেষ্টা করলাম। টু শব্দ নেই! আমার বাক্যগুলো যখন দুঃখী-দুঃখী শোনাতো, ওর চোখ জলে ভ'রে যেতো। যখন আমি কোনো চেনা অভিব্যক্তি ব্যবহার করতাম, যেমন যে কথাটা দিয়ে আমি রোজ পড়ানো শুরু করতাম, 'আমি তোমার প্রভু', অথবা এই কথাটার জের টেনে যে-কথা বলতাম, 'তুমি আমার বাঁদর,'—যা দিয়ে আমি ওর মধ্যে এক শাশ্বত সত্যের অনড় অবস্থা বোঝাতে চাইতাম, ও তার চোখ বুজে সে-সব কথায় সায় দিতো, কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ করতো না, এমনকি ঠোঁট অব্দি নাড়তো না।

আমার সঙ্গে ভাববিনিময়ের একমাত্র উপায় হিসেবে আবার ও ইশারা-ইঙ্গিত ব্যবহার করতে শুরু করেছিলো। এই ঘটনা, আর বোবা-কালাদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য—এই দু'য়ের ফলে আমি আরো সাবধান হলাম, কারণ বোবা-কালাদের যে সহজেই মনের রোগ দেখা দেয়, তা তো সবাই জানে। কখনো-কখনো আমি চাইতাম ও সত্যি-সত্যি পাগল হ'য়ে যাক—যদি তবু প্রলাপ ওর স্তব্ধতা ভাঙতে সাহায্য করে।

ওর শরীর কিন্তু সারছিলো না! সেই একই শুষ্ক-বিশুষ্ক চেহারা, সেই একই বিষণ্নতা, বোঝাই যাচ্ছিলো যে ওকে মনের রোগে ধরেছে: ওর পুরো শরীরটাই মস্তিষ্কের কাজ ঠিকভাবে না-চলায় ভেঙে পড়েছে—আর শিগ্‌গিরই ওর অবস্থা পুরোপুরি আশাহীন হয়ে পড়বে। কিন্তু এই রোগের ফলে ওর বাধ্যতা বেড়ে গেলেও ওর স্তব্ধতা—আমার মরীয়া চাবকানির ফলে যে মাথা খারাপকরা স্তব্ধতা ওর মধ্যে দেখা দিয়েছিলো তা একবারও ভাঙলো না। ঐতিহ্যের কোনো আবছা পশ্চাৎপট থেকে—যা ক্রমেই ধূসরতর হয়ে আসছে—বাঁদরজাতটাই ওর ওপর শত-শত বছরের স্তব্ধতা চাপিয়ে দিচ্ছিলো—ওর অন্তর্লীন সত্তায় ক্রমে জোরালো হ'য়ে উঠছিলো পূর্বসূরিদের উৎকাঙ্ক্ষা। ব্যাপারটা যেন কোনো অজ্ঞাত ও বর্বর অবিচারের ফলে জঙ্গলের আদিম মানুষ অনিচ্ছুক স্তব্ধতায় ফিরে গিয়েছে, অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির আত্মহত্যা ঘটিয়েছে,—ইজুরের এই অবস্থা তারই নামান্তর। ইতিহাসের ঊষা থেকে আরণ্য রহস্যগুলো এখনও সময়ের বিশাল উপসাগর পেরিয়ে ওর অচেতন সিদ্ধান্তের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে।

চারপেয়ে মানুষদের বিশাল পরিবার দুর্ভাগ্যবশত বিবর্তনের সময় পিছু হ'টে গিয়েছিলো—এবং মানুষ সে অবস্থা স্পষ্টতই পেরিয়ে গিয়েছিলো, পাশবিক বর্বরতায় তাদের দমিয়ে রেখেছিলো, আর নিঃসন্দেহে বাঁদরবংশ সিংহাসনচ্যুত হয়ে তাদের আদিম নন্দনকাননের পত্রালির মধ্যে রাজত্ব হারিয়ে বসেছিলো। তাদের বংশধর কমে এসেছে সংখ্যায়, তাদের স্ত্রীজাতিকে ধরে বন্দী করা হয়েছে, যাতে সুসংগঠিত দাসত্ব মাতৃজঠরেই শুরু হ'য়ে যায়। তাদের সেই পরাভূত অবস্থায় তারা বাধ্য হয়েছিলো তাদের আত্মমর্যাদা প্রমাণ করতে অসুখী সেই উচ্চতর যোগসূত্র ছিঁড়ে ফেলে—যে যোগসূত্র কথিত ভাষা—যা কিনা তাদের শত্রুদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয় আর এক চরম রক্ষাকবচ হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিলো প্রাণিজগতের অস্পষ্ট আবছায়ায়।

আর কী নিদারুণ অত্যাচার, কী দানবিক নিষ্ঠুরতাই না বিজয়ীরা এই অর্ধপশুদের ওপর চালিয়েছিলো সেই বিবর্তনের মুহূর্তে—যার ফলে শাস্ত্রের সেই নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ পাবার পর, বুদ্ধিবৃত্তির স্বাদ পাবার পরও—তাদের বাধ্য হ'য়ে মেনে নিতে হয়েছিলো অন্যান্য হীনতর জন্তুর সঙ্গে একত্রবাস! কোনো স্বয়ংচল সার্কাস খেলোয়াড়ের অঙ্গভঙ্গির স্তরেই তারা রয়ে গেল, যেন এক পশ্চাৎগতি তাদের পেছনে টেনে রেখেছিলো। জীবনের সেই দারুণ ভয় যা কিনা পরিণামে তাদের মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে দিলো দাসত্বে—যা তাদের জান্তব অবস্থার প্রতীক—

তাদের গায়ে মোহর বসিয়ে দিলো এক সুকরুণ বিমূঢ়ভাবের—যা তাদের ট্র্যাজি-কমিক স্বভাবের ভিত্তি হ'য়ে দাঁড়ালো।

সাফল্যের ঠিক পূর্বমুহূর্তে এটাই আমার মেজাজ খারাপ ক'রে দিয়েছিলো। হয়তো আমার মধ্যেই কোনো আদিম অন্ধকারে তার বাস ছিলো, হাজার-হাজার বছর ধরে বাক্‌শক্তির জাদু বাঁদরদের আত্মায় সাড়া জাগিয়েছে, প্রাণীদের সহজাত অন্ধ আবছায়া ভেদ করে যা স্ফুরিত হ'তে উদ্যত হয়েছিলো, সেই পূর্বসূরিদের স্মৃতিবিস্মৃতি যা তার চেতনে-অবচেতনে মাখামাখি হয়েছিলো—সেই যুগযুগের পুরোনো বেড়াকেই আবার মনে পড়িয়ে দিলো আমার রাগ।

চেতনা না হারিয়েই ইজুর মরতে বসেছে। খুব শান্ত এক মৃত্যুর ছবি: দু-চোখ বোজা, মৃদু নিঃশ্বাস, ক্ষীণ নাড়ির শব্দ, আর পরিপূর্ণ শান্তি। শুধু মাঝে-মাঝে তারই মধ্যে ফুটে ওঠে অন্য ছবি—যখন সে তার করুণ, বৃদ্ধ মুলাটো মুখ ফেরায়—তার মধ্যে দেখি বুকভাঙা অভিব্যক্তির চিহ্ন। শেষ বিকেলবেলাটায়, ওর মৃত্যুর অপরাহ্নে, একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিলো, যার জন্য আজ আমি এই গল্প লিখতে বসেছি।

আসন্ন সন্ধ্যার উষ্ণতা ও স্তব্ধতায় ঝিম্ ধরে আসছিলো আমার। ইজুরের বিছানার পাশে আমি ঢুলছিলাম, এমন সময় হঠাৎ অনুভব করলাম কে আমার কব্জি চেপে ধরেছে। আঁৎকে, আমার চট্‌কা ভেঙে গেলো। বাঁদরটা—তার চোখ দুটি বিস্ফারিত, মরতে চলেছে, আর তার মুখের ভাব এমনই মানুষের মতো দেখালো যে আমি বিভীষিকা দেখলাম। কিন্তু ওর হাত, ওর চোখ দুটি, এমন মুখরভাবে তার দিকে টেনে নিলো যে, আমি ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লাম। আর তখন, ওর শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে, সেই অন্তিম নিঃশ্বাস যা যুগপৎ আমার সব আশা ভেঙে দিলো আবার জয়ের আহ্লাদ এনে দিলো—ও উচ্চারণ করলো—আমার কোনোই সন্দেহ নেই—ও অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলো (কেমন ক'রে আমি জানবো সে স্বর কী-রকম, যে হাজার-হাজার বছর আমার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি)—এই কথাগুলো, যার গভীর মানবিকতা আমাদের দুই প্রাণীর মধ্যকার অতল ব্যবধানের মধ্যে সেতু রচনা ক'রে দিলো!—

'প্রভু, প্রভু আমার, জল দাও! জল……'

অনুবাদ: অভিজিৎ সেন

ভূমিকা

গত সওয়া শো বছরের দীর্ঘ সময়ে হিন্দী উপন্যাস যথেষ্ট এগিয়ে গেছে; বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে দেখলে মনে হয় এই অগ্রগতি নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও নানা ঘটনার বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। কী করে কু রীতি-নীতি দূর করে জাতীয় গৌরব ও মানবতার উদার ভাব জাগিয়ে তোলা যায়— প্রথম দিকের উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যে তারই ইঙ্গিত ছিল। নিবাসদাসের 'পরীক্ষা গুরু', কিশোরীলাল গোস্বামীর 'ত্রিবেণী', 'স্বর্গীয় কুসুম' ও রাধাকৃষ্ণদাসের 'নিঃসহায় হিন্দু' ইত্যাদি উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ই ভাবগুলিই ফুটে উঠেছে। সমসাময়িক কালে দেবকীনন্দন ...র কয়েকটি উপন্যাস কাল্পনিক জীবন এবং অতিমানবীয় ...টনাকে কেন্দ্র করে লেখা। হিন্দী উপন্যাসের তৃতীয় ধারায় প্রধানতঃ মধ্যযুগীয় শৌর্য ও প্রেমের অনুভূতিতে রঞ্জিত মারাঠী ও ...াংলা উপন্যাসের অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুবাদ-সাহিত্য-...াণ্ডারে 'রাজসিংহ', 'স্বর্ণলতা', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'কপালকুণ্ডলা' ...ত্যাদি উপন্যাস হিন্দী উপন্যাসের ধারাকে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

প্রেমচন্দের উপন্যাসের বিষয়বস্তু ভারতীয় পল্লীজীবন। তিনি কল্পনার স্বপ্নময় পরিমণ্ডল, প্রেম ও শৌর্যের মধ্যযুগীয় বাতাবরণে আবদ্ধ হিন্দী উপন্যাসকে এক উন্মুক্ত আকাশের নীচে গ্রামীণ কৃষকের সুখ-দুঃখ ও সোঁদামাটির গন্ধে প্রাণময় করে তোলেন।

সামাজিক পটভূমিকায় লেখা প্রেমচন্দের যুগোপযোগী উপন্যাসের মাঝে সংঘর্ষরত ভারতীয় জীবনের যুগযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি স্মরণীয় আলেখ্য হয়ে থাকবে। এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে প্রেমচন্দের মত দরদী উপন্যাস-রচয়িতার জন্যই হিন্দী সাহিত্যে এক চিন্তাশীল পাঠকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার ছোঁয়া ভারতীয় জনগণের মনে গভীর রেখাপাত করে। বিদেশে এসময় মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের একটা যেন প্লাবন এসেছিল। হিন্দী উপন্যাসে জৈনেন্দ্র ও অজ্ঞেয়-রচিত চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে মানবমনের জটিলতম গ্রন্থি ও ভাবধারা উন্মোচিত হয়েছে। গান্ধীবাদের আত্মদহনের দীক্ষা গ্রহণ করেন জৈনেন্দ্র, তাঁর রচনায় মনোবিশ্লেষণের পদ্ধতি অবলম্বনে লেখা দুখানি উপন্যাস 'পরখ' ও 'ত্যাগপত্র' তাঁর নিজস্ব মৌলিক চিন্তাধারার প্রতিভূ হিসাবে হিন্দী উপন্যাসের জ্ঞানভাণ্ডার স[illegible] করেছে। অজ্ঞেয়-রচিত 'শেখর : এক জীবনী' ফ্ল্যাশব্যাকের র[illegible] শৈলীতে লেখা গভীর ভাববোধ ও দীপ্ত অভিব্যক্তির অন্য[illegible] নিদর্শন। ইলাচাঁদ যোশীর উপন্যাসে আমরা পাই মানুষের মনে[illegible] জটিল জগতের পরিচয়, তাঁর লেখায় মনোবিজ্ঞানের অসামান্য প্রভাব স্পষ্ট।

1936 সালে লক্ষ্ণৌতে প্রগতিশীল লেখকদের একটি অধিবেশন হবার পরই হিন্দী সাহিত্যে প্রগতিবাদের জোয়ার আসে। এই ধারার শ্রেষ্ঠ বাহক ঔপন্যাসিক যশপাল। মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক বৈষম্য কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরোধিতা করে যশপাল উপন্যাস লিখেছেন। একই সঙ্গে নাম করা যায় রাঁগেয় রাঘব, অমৃতলাল ইত্যাদি লেখকদের; এঁদের অবদান

উল্লেখযোগ্য। মধ্যভারতের আঞ্চলিক পরিবেশে এবং সেখানকার ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর পটভূমিকায় লেখা বৃন্দাবনলাল বর্মার রচনা ঐতিহাসিক রোমান্সের এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। 'বিরাটা কী পদ্মিনী', 'গড়কুণ্ডার', 'মৃগনয়নী', 'রানী লক্ষ্মীবাঈ' ইত্যাদি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্য তিনি গুজরাটী সাহিত্যের মুন্সীজী ও ধূমকেতুর মতই হিন্দী উপন্যাসের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সম্মানের অধিকারী। মার্ক্সবাদী চিন্তাধারায় প্রভাবিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন 'জয় যৌধেয়' ও 'সিংহ সেনাপতি'র মত উপন্যাস লিখেছেন যাতে জীবনকে ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখার প্রয়াস পরিস্ফুটিত। ভগবতীচরণ রচিত 'চিত্রলেখা' যদি শুধু রোমান্সের উদাহরণ হয় তবে যশপালের 'দিব্যা' হল ঐতিহাসিক উপলব্ধির ফসল।

1950 সালের পরবর্তী কালে নব লেখক-গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটল। তখন হিন্দীতে নাগার্জুন ও ফণীশ্বরনাথ রেণুর আঞ্চলিক উপন্যাসের একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সত্যি বলতে কি 1950 সাল থেকে 1955 সাল পর্যন্ত আঞ্চলিক পরিবেশের মধ্যেই হিন্দী কথাসাহিত্যের মূল সুর নিহিত ছিল। নাগার্জুনের 'বলচনমা' ও রেণুর 'ময়লা আঁচল' উপন্যাসে মিথিলার জনজীবনকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁরা গভীর এক সংবেদনশীল রচনাশৈলীর পরিচয় দিয়েছেন। এই আঞ্চলিক উপন্যাস লেখার উৎসাহে যেন ভাটা পড়ে এল, কারণ আঞ্চলিকতার নামে জীবনের অবাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রধানতা দেখা গিয়েছিল। এরই মধ্যে এল তিনটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, যশপালের 'ঝুঠা সচ', নরেশ মেহেতার 'ওহ পথ বন্ধু থা' ও অজ্ঞেয়র 'আপনে আপনে অজনবী'। ধর্মবীর ভারতীর 'সুরজ কী সাতবাঁ ঘোড়া' হিন্দী কথাসাহিত্যে স্মরণীয়

হয়ে থাকবে। গত পাঁচ-সাত বছরে হিন্দী উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার সূচনা হয়। এ প্রসঙ্গে 'আধা গাঁও', 'অলগ অলগ বৈতরণী' ও 'রাগ দরবারী' উপন্যাসগুলি উল্লেখযোগ্য।

অমৃতলাল নাগর হিন্দী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। সমাজের পটভূমিতে লেখা 'শেঠ বাঁকেমলে'র চরিত্রের মাঝে তাঁর সমর্থ লেখনীর বিশেষভাবে পরিচয় পাওয়া যায়। তামিলের মহাকাব্য 'শিলয়াদিকরম' অবলম্বনে লেখা 'সোহাগকে নূপুর' উপন্যাসের পাত্র কৌলবন, কন্নগী ও মাধবীর চরিত্রের মধ্যে সাংসারিক বিষয়ভোগে নিমজ্জিত মানুষের জীবনযাত্রার ছবি ফুটে উঠেছে। হিন্দী উপন্যাসের সময়পর্বের বিবরণে 'একদা নৈমিষারণ্যে' বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। এই রচনার মধ্যে সোমাহুতি ভার্গব, ইজয়া ও সরযূ বশিষ্ঠের চরিত্র যাজ্ঞিক সংস্কারে প্রভাবিত, মতমতান্তরে ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত অথচ ভারতীয় সংস্কৃতির সংগঠন-মূলক সামাজিক সমন্বয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আছে। 'মানস কা হংস' উপন্যাসে লেখক তুলসীদাসের জীবনীকে নতুন প্রকাশভঙ্গীর সাহায্যে পাঠকগোষ্ঠীর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। লক্ষ্ণৌ শহরের কসমোপলিটন সমাজের নানা স্তরের মানুষকে কেন্দ্র করে লেখা তাঁর 'অমৃত ও বিষ' উপন্যাসের আত্মারাম, রদ্ধু সিংহ, পুত্তোগুরু ও লচ্ছুর চরিত্রের মধ্যে ভারতীয় নবযুবকের অস্থির মানসিক দিগন্তের ছাপ আছে। আধুনিক সমাজে ব্যাপ্ত নানা অশান্তি, চক্রান্তের জাল ও অসফলতার কাহিনী সহজেই পাঠকের দরদী হৃদয়ে সাড়া জাগিয়ে তোলে।

এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই যে নাগর মহাশয়ের 'বুঁদ আউর সমুন্দর' (বিন্দু ও সিন্ধু) তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসাবে উল্লেখনীয়।

যদিও 'অমৃত ও বিষ' লেখকের পুরস্কারপ্রাপ্ত ও বহু আলোচ্য উপন্যাস কিন্তু বর্তমান উপন্যাসে তিনি মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের যথাযথ চিত্রণের দ্বারা হিন্দী সাহিত্যভাণ্ডারকে এক অতুলনীয় উপহার দিয়েছেন। তিনি কোন এক বিশেষ রচনাশৈলীর ধরাবাঁধা গণ্ডীর মাঝে আটকা পড়ে যাননি। 'বিন্দু ও সিন্ধু'র বিষয়-বস্তু লক্ষ্ণৌ শহরের চৌক জীবনযাত্রার সীমারেখা ছাড়িয়ে গিয়ে পৌঁচেছে গোমতী নদীর ধারে পাগলাদের আখড়ায়, সজ্জন ও বনকন্যার মথুরা-বৃন্দাবন যাত্রা ও গোবর্ধন পর্বতে দুজনের প্রেমালাপে। লক্ষ্ণৌ শহরের গলিঘুঁজির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে অপরিচিত সজ্জনকে জেঠীর বসতবাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে নিয়ে এসে লেখক তাঁর প্রমুখ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে অসংখ্য প্রশ্নের মীমাংসা খোঁজার চেষ্টা করেছেন। চৌকের সম্পূর্ণ পটকথা, দৃশ্যাবলী, খুঁটিনাটি ঘটনা, ছোট ও বড় চরিত্রের টিপিকাল সংলাপ লেখকের কালি ও কলমে ধরা দিয়ে যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

'বিন্দু ও সিন্ধু'র মধ্যে নিহিত ব্যঞ্জনা খুবই অর্থবহ, বিন্দু ব্যক্তি এবং সিন্ধু সমাজের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দুটির পারস্পরিক সম্পর্ক আজ প্রায় শেষ হতে চলেছে। বর্তমান সমাজের ব্যক্তি সমাজের গতানুগতিক ধারাকে আর মানতে রাজী নয়। চাপা অশান্তির আগুনের ফুলকি পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের বাতাস লেগে জ্বলে উঠেছে। লেখকের মতানুসারে সিন্ধুর প্রতিটি বিন্দু তাদের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে যদি সত্যের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে পারে তাহলে তাদের পক্ষে সমাজে ঐক্যরসে সমন্বয় সৃষ্টি করা কঠিন হবে না। যে সমাজের জনজীবন মহাসাগরের উপমায় বিভূষিত, সেখানে কি মানুষের মধ্যে গড়া ভেদাভেদের দুর্ভেদ্য

প্রাচীরের কল্পনা করা উচিত? আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজে বিভিন্ন মানদণ্ডের কল্পনা করা কি সম্ভব?

উপন্যাসের তিনটি প্রধান চরিত্র সজ্জন, মহিপাল ও কর্নেল। বৌদির প্রতি তার পিতার অত্যাচারের প্রতিকার করার জন্য বনকন্যার চরিত্র এই তিনটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। জন্মদাতা পিতার বিরুদ্ধে তার সাহসিক অভিযানের মধ্যে আধুনিক নারীজাতির স্বতন্ত্র স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ, চক্রান্ত, রাজনীতির দলাদলি ও মিথ্যে আড়ম্বরের জালে দম বন্ধ হয়ে আসা চরিত্রগুলির মধ্যে বনকন্যার আদর্শ সত্যিই প্রাণবায়ুর সঞ্চার করেছে।

বনকন্যার ঠিক বিপরীত চরিত্র জেঠীর। একদিকে বনকন্যা আধুনিকা, সে সত্যিমিথ্যের মধ্যে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে নিজস্ব পথ বেছে নিতে সক্ষম, সম্পূর্ণ সমাজের সঙ্গে সে একাই যুঝে চলেছে, কোন বিরোধী শক্তিই তাকে তার সমাজ-সংগঠনমূলক কাজের পথ থেকে বিচলিত করতে পারেনি। অন্যদিকে, প্রাচীন সংস্কার ও নৈতিকতার ডোরে বাঁধা জেঠী তাঁর স্বামীর বংশকেও নির্মূল করার জন্য টোটকা করার সময় দ্বিধাবোধ করেন না। বেড়ালছানাদের প্রতি মায়ামমতায় ভরা জেঠী মানুষকে ক্ষমা করতে পারেন না। মানুষের মনের নানা মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতীক তাঁর চরিত্র বর্তমান উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। একদিকে স্বামী দ্বারকাদাসের আভিজাত্যে ভরা কৌলীন্যগত আত্মাভিমান আর অন্যদিকে ভাড়াটে বর্মা-দম্পতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, টোটকা শেখার আকর্ষণে নন্দর চরিত্রের সঙ্গে স্যাকরার পরিবার, আধুনিক সিনেমার প্রভাবে বড়বৌয়ের চরিত্রের পতন এবং পাড়ার ছেলেছোকরাদের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া, সখি

সম্প্রদায়ের পাণ্ডা, জলঘড়িয়াজী, ভিতরিয়াজী, কীর্তনিয়াজী ইত্যাদি মন্দিরের রাজনীতির সঙ্গেও জেঠী অতি গোপনভাবে জড়িয়ে আছেন। তাঁর জীবনের "শেষ-সাধ" হিসেবে রাধাকৃষ্ণর বিবাহের আয়োজন এবং এই অজুহাতে বাবারামের সঙ্গে বেয়ান সম্পর্ক পাতিয়ে লেখক তাঁর অদ্ভুত রচনাকৌশলের পরিচয় দিয়েছেন।

সজ্জন, কর্নেল ও মহিপাল তিনজনে বুদ্ধিজীবী-সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে— কিন্তু লেখক তাদের চরিত্রকে 'টাইপ' হতে দেননি। সজ্জন একজন বিখ্যাত শিল্পী অথচ চিত্রার সামনে সে এক কামনাদগ্ধ পুরুষ, শীলা স্বুইংয়ের 'দুর্জন' যোগায় হাসির খোরাক, বনকন্যার কাছে সে যথেচ্ছাচারী পুরুষ। সমাজকল্যাণের কাজে বনকন্যার নির্মল প্রেমের সুশীতল ছায়ায় সজ্জনের কায়া-কল্পের শেষ পরিণতি দেখতে পাওয়া যায় তার সম্পত্তিদানে।

স্পষ্টভাষী কর্নেল বন্ধুদের সুখদুঃখের মধ্যে সমান অংশীদার, সজ্জন ও মহিপালের বন্ধুত্বের সেতু, তাদের প্রত্যেকটি সমাজ-কল্যাণকারী কাজের সে সহকর্মী। দুই বন্ধুর তুলনায় শিক্ষিত না হলেও ব্যবহারিক বুদ্ধিতে সে সকলকে হার মানায়, সজ্জন-বনকন্যা এবং মহিপাল, শীলা ও কল্যাণীর ত্রিকোণসংঘর্ষের মধ্যে তার চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সামাজিক বিড়ম্বনার শিকার হয়ে যখন মহিপাল চরিত্রভ্রষ্ট হবার পর আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় তখন কর্নেল স্বর্গীয় বন্ধুর আত্মাকে যথাসাধ্য দায়মুক্ত করার চেষ্টা করেছে।

এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই যে প্রেমচন্দের পর হিন্দী সাহিত্যে কোন লেখক এত বড় ক্যানভাসকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লেখার চেষ্টা করেন নি। উপন্যাসের প্রথম দিকে সজ্জনের চরিত্রে লাগা

লাল গাঢ় রঙ যেন উপন্যাসের শেষের দিকে বাবারামের সেবাপরায়ণ আদর্শ ব্যক্তিত্বের সামনে নিরুপায় ও হতপ্রভের মতই ফিকে হয়ে এসেছে। সজ্জনের এই কায়াকল্পের মধ্যে লেখকের সুদৃঢ় রচনা-শৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দী উপন্যাসের জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হিসেবে তিনি সমাজে ছড়ানো পংকিলতা ব্যভিচার ও নিষ্ক্রিয়তাকে শেষ করে ধুয়ে মুছে ফেলতে চান, তাঁর এই চেষ্টার মধ্যে বিশেষ সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাবারামের দ্বারা প্রেরিত 'জনসেবা আন্দোলনের' মধ্যে এই সমাধানের বীজ পল্লবিত হতে দেখা যায়: 'যদি আপনারা কুটীর উদ্যোগ আরম্ভ করেন তাহলে শহরের পুরুষেরা বেইমানদের ফাঁসিকাঠে ঝোলার হাত থেকে রেহাই পাবে।'

—শিবপ্রসাদ সিং

এক

শীতের দুপুরে মিষ্টি রোদে প্রত্যেক বাড়িতে ছাদের আড্ডা ধীরে ধীরে বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। বাড়ির মেয়েরা অনেকে সেলাই বোনা, গম ঝাড়া, ডাল বাছা, শাক বাছা নিয়ে মশগুল, কেউ-বা এই ফাঁকে একটু রোদ পুইয়ে চোখ বুজে গড়িয়ে দিবানিদ্রার আমেজটা অনুভব করছে। স্কুল-পালানো বাচ্চাদের হৈচৈ শোনা যাচ্ছে, এরমধ্যে একদল ঘুড়িও ওড়াচ্ছে।

এদিক ওদিক, কোথাও অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধরা নিশ্চিন্ত মনে রোদে বসে এক এক করে তুলো ভরা লেপ আর উলের সোয়েটার আস্তে আস্তে খুলে, গেঁটে বাতে পঙ্গু আড়ষ্ট পাটাকে কোনমতে সোজা করে হাঁটুতে হাত বুলিয়ে নিচ্ছেন। শীতের হাত থেকে খানিকক্ষণের জন্য পরিত্রাণ পেয়ে মুখচোরা রোদকে বৃদ্ধরা মনে মনে আশীর্বাদ না করে পারছেন না। যাদের দুপুরের ভাত দেরীতে খাওয়া অভ্যেস, তারা তখনো ঘটী নিয়ে 'হর গঙ্গে' রব তুলে সশব্দে স্নানের পাট সেরে নিচ্ছে।

ফট ফট, খট খট, ঝন ঝন, ধম ধম নানা শব্দ, কোথাও বা

সিঁড়িতে ওঠানামা, কোথাও রাগ-অভিমান-মুখভারের পালা, আবার কোনখানে হাস্য-পরিহাসেভরা সপ্তসুরের গুঞ্জন আপনা হতেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, সেই সুরে পৃথিবীর প্রতিটি অণু যেন কানায় কানায় ভরে উঠেছে। কোলাহল-মুখরিত পৃথিবীর এই হয়তো নিয়ম, কোনখানের এক স্বরকে একটু ছুঁয়ে দিলেই সমস্ত স্বর একসঙ্গে ঝংকৃত হয়ে ওঠে।

লক্ষ্ণৌ শহরের এক পাড়ায় ভভুতি স্যাকরার ভরা যৌবনা দুই ছেলে-বৌ ছাতের কার্নিস থেকে ঝুঁকে গল্পে মেতে উঠেছে। নীচে ভভুতির দেয়ালে সেঁটে রাখা সস্তা কাঠের বাক্সর উপরে বসে প্রতিবেশিনী তারা প্রায় পড়শীর কার্নিস পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। ছোট বাচ্চার সোয়েটারে ফেলা ঘর গুনতে গুনতে সে বেশ ভ্রূ-কুঁচকে বললে— দেখো ভাই, সত্যি বলছি, কিছু মনে কোরো না, তারা·তারা ডাক পরের মুখে শুনতে একটুও ভাল লাগে না— ওঁর মুখেই মিষ্টি শোনায়।

বড় বৌয়ের ডান কানের জড়োয়া কানপাশায় রোদ এসে পড়ছে। ঘন ঘন মাথা ঝাঁকুনিতে হীরের নাকছাবিটা ঝকমকিয়ে উঠছে। ফর্সা গালের ওপর ডান হাতের পাতা চেপে বড় বৌ বিশেষ মুখভঙ্গি করে বললে— তাহলে তোমায় কী বলে ডাকব ভাই, অ্যাঁ? —মিসেস বর্মা বলতে পারো। আমিও তোমায় তাই বলে ডাকব।

ছোট বৌয়ের মোটা ঠোঁটের নীচের কালো তিলে ভাঁজ পড়ল, নাক সিঁটকে গেল, নাকের নাকছাবির হীরে ঝিলিক মারল, ভ্রূ অহংকারে বেশ কুঁচকে গেল, আবদারে ঘাড় বেশ খানিকটা কাত করে বললে— তা তুমি আমায় কী বলে ডাকবে? মিসেস

স্যাকরা? আমি কিন্তু এ নামে ভাই সাড়া দিতে পারব না। এ নামে ডাকলে আমার একটুও ভাল লাগবে না, বলে রাখছি।

—এতে খারাপ লাগার কী আছে রে? যার যা জাত তাই বলেই তো ডাকা হবে। তা ছাড়া আমরা কচু ঘেঁচু ছোট জাত নয়, রীতিমত বৈশ্য বামুন।

তারা কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়েছে। বেজাতে প্রেম করে বিয়ে করেছে। স্বামীর সঙ্গে প্রায়ই হজরতগঞ্জ, কোয়ালিটি, সিল্‌ভার স্নো রেস্তোঁরা, কফি হাউস গিয়ে বাইরের জগৎটাকে দেখার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছে। নিজের চেয়ে কম-লেখাপড়া-জানা এবং কম-স্বাধীনতার বাতাস লাগা ভভুতি স্যাকরার বৌদের দিকে নবযুগের আগমনী ঘোষণার চাউনি চেয়ে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে মমতামাখা স্বরে তারা বললে— আরে বোন, তুমিও যেমন, ছোট-বড়র কথা এখন কে মানছে? আমরা ভাই জাতবেজাত বলে কিছুই জানি না।

বড় বৌয়ের চোখে তারা হিরোইনের চেয়ে এক কাঠি কম নয়। তারার গর্বে গর্বিতা বড় গদগদ হয়ে বললে— আরে, তোমার মানা না মানার কথাই উঠছে না। তুমি তো ভাই হাতেনাতে দেখিয়ে দিয়েছ, সোয়ামীর সঙ্গে প্রেমসাগরে দিনরাত হাবুডুবু খাচ্ছ।

ছ'জনেই খিল খিল করে হেসে উঠল। তারা কেবল বড় বৌয়ের নজরেই নয়, নিজেও নিজেকে হিরোইন মনে করে থাকে। তারার সুঠাম শ্যামবর্ণ দেহের দিকে ওগো-মরিমরি-ভাবে চটুল চাউনি হেনে বড় বললে— যাই বলো ভাই, লাভ ম্যারেজ বেশ মজার ব্যাপার। আমি যখন ক্লাস এইট-এ পড়ি তখন এক ছেলের সঙ্গে বেশ 'ইয়ে' হয়েছিল।

কিছুক্ষণের জন্য বড় বৌয়ের 'বলাবলির ধার ধারি না' অথচ 'লাজেমরি' চাউনি বিগতদিনের স্মৃতির মাঝে হারিয়ে গেল। ছোটর চোখে 'মাগো কী হবে গো' ভাব ফুটে উঠল।

দুই আঙুলের লাল পালিশ করা নখ মুচকি হাসিতে আধখোলা ঠোঁটের ওপর যেন জড়োয়া পাথরের মত সেট হয়ে গেল। ক্লাসে প্রথম হওয়া ছাত্রীকে যেভাবে অধ্যাপিকা পিঠ চাপড়ে হাসেন, ঠিক সেই সাবাসী ভাবটা তারার হাসিতে ফুটে উঠল।

নীচের ছাদে ছোট খাটিয়াতে শুয়ে বড় বৌয়ের তিন মাসের কোলের মেয়েটি তারস্বরে কেঁদে চলেছে। চার বছরের বড় ছেলে পায়ের দিকে বিছানায় জ্বরে বেহুঁশের মত পড়ে আছে। একমনে হিঙ্গাষ্টকচূর্ণ হামানদিস্তেতে কুটতে কুটতে শাশুড়ী ডাক দিলেন—শুনছ, মেয়ে সেই কখন থেকে কাঁদছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল যে।

ওদিকে তারা বড় বৌকে জিজ্ঞেস করছে— তোমার লাভারটি কেমন ছিলেন গো?

বাচ্চা মেয়েটি হাত পা ছুঁড়ে বেশ জোরে কান্না জুড়ে দিয়েছে। ঠাকুমা একমনে চূর্ণ তৈরী করে চলেছেন। এমন সময় পিসী নন্দ শীতে কাঁপতে কাঁপতে, শাড়ি কোনমতে গায়ে জড়িয়ে মুখে পান টিপে আর ডান হাতে চারটে পান নিয়ে নীচে থেকে ছাদে উঠে দু'দণ্ড মার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে, তারপর পা বাড়িয়ে বললে—জেঠীর বাড়ি যাচ্ছি।

—ওখান থেকে বড়কে পাঠিয়ে দিস। গল্পগুজবে এমনই মেতে আছে সব, পেটের ছেলেপুলের কথাও মনে থাকে না।

নন্দর বয়স মাত্র সাতাশ, কিন্তু এই বয়েসেই যেন তার রসকষ

শুকিয়ে গেছে। নিজের সমবয়সীদের সঙ্গে সে বড় একটা মেলা-মেশা করে না, তাদের ছেলেমেয়েরাও তার দু'চক্ষের বিষ। অষ্টপ্রহর মনে মনে গুমরানো তার স্বভাব, কঠোর ব্রত-উপবাসে মুখের রঙ প্রায় পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে। একদিকে ধর্মকর্ম আর অন্যদিকে পরনিন্দায় সুপটু নন্দ, নিজের চেয়ে বয়েসে বড়দের মধ্যে বসে সর্বদাই পরলোকের চিন্তায় মগ্ন থাকে।

জেঠীর বাড়ি যাবার জন্য নন্দ ছাদে গেল, সেখানে দুই বৌ গল্পে মজে আছে। সন্ধানী শিকারী বেড়ালের মত আস্তে আস্তে সে পা টিপে টিপে এগুতে লাগল। নন্দর জন্য পরনিন্দার মালমশলা বেশ তৈরী হয়ে আসছিল— ঠিক এমনি সময় ছন্দপতনের মত নীচে থেকে মার স্বর ভেসে এলো— ও বড় বৌ, বড় বৌ।

শাশুড়ীর ডাকে দুই বৌ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই সামনে রায়বাঘিনী ননদকে চোরের মত ঘাপটি মেরে আসতে দেখে তাদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। নন্দ হঠাৎ ধরা পড়ে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে জেঠীর কার্নিসের দিকে পা বাড়াল।

দুই

জেঠী স্যার রাজাবাহাদুর আগরওয়ালের প্রথম পক্ষের স্ত্রী। রাজাবাহাদুর লক্ষ্ণৌ শহরের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। ইংরেজ আমলে ডেপুটি কমিশনার থেকে চিফ সেক্রেটারী আর হোমমেম্বার

পর্যন্ত, সংযুক্ত প্রদেশের গভর্নর থেকে দিল্লীর ভাইসরয় সকলের কাছেই তাঁর ছিল অবাধ গতি। আজ স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী তাঁর নাগালের বাইরে বটে তবুও তাঁর দাপট একটুও কমে নি। দিল্লীর এবং স্টেটের বড় বড় অফিসার এবং মন্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে এখনো তাঁকে 'রাজা সায়েব' বলে সম্ভাষণ করে থাকেন। তিনি নিজের কাজ হাসিল করার আর্ট বেশ ভালভাবেই জানেন। এ বিষয় তিনি আইনের মারপ্যাঁচ এড়িয়ে চলতে ভালবাসেন। বড় বড় শঙ্করাচার্যরা রাজাবাহাদুরের দান-ধ্যানের তারিফ করে থাকেন। প্রতি বছর তাঁর বাড়িতে সাধুসমাগম হয়। কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির তৈরী করিয়েছেন। কিন্তু মন্দির ভগবানের নামের ধারে কাছে না গিয়ে 'আগরওয়ালা মন্দির' নামেই প্রসিদ্ধ হয়েছে। লোকেরা বলে রাজাবাহাদুরের নতুন বাড়ির চত্বরে যে লক্ষ্মীর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে সেখানে অষ্টপ্রহর প্রদীপ জ্বলে, তার কাজলে নাকি কালি নয় গেরুয়া রঙ দেখা যায়। গলির মধ্যে জেঠীর শুচিবাইয়ের সোরগোল আর তাঁর ফড়িংয়ের মত লাফানী দেখে পাড়ার বৃদ্ধরা অনেক সময় ভাবেন, কপালের লিখন কে খণ্ডাবে! ধর্মপ্রাণ, এককালে স্বামীসোহাগী জেঠীর আজ এই দুর্গতি!

জেঠী যখন বৌ হয়ে দ্বারকাদাসের বাড়ি এসেছিলেন তখন দু'বেলা দু'মুঠো জুটত না। পৈতৃক সম্পত্তির বেশীর ভাগটাই বাইজীর পায়ের মলের গুঞ্জনেই শেষ হয়েছিল, বাদ বাকীটা বাবার সময় ঘুচে মুছে গেল। পূর্বপুরুষের বসতবাড়ি (যেখানে এখন জেঠী থাকেন) পুরোনো দেনার দায়ে নীলাম হয়ে গেল। দ্বারকাদাসের মা আর অবিবাহিত দুই বোন পাশের একটি ছোট

বাড়িতে কোনমতে জীবনযাপন করতেন। দ্বারকাদাসের সে সময় মাত্র চোদ্দ বছর বয়স। এক আত্মীয়ের সঙ্গে তিনি সোনারুপোর দালালির কাজ শিখতে লাগলেন। কোনমতে বড় বোনের বিয়ে হয়ে যাবার পর তাঁর নিজের বিয়ে হল। জেঠী হাঘরের কুললক্ষ্মী হয়ে এ বাড়িতে পা দিলেন।

জেঠীর বাপের বাড়ি হাতরশ শহরে। এককালে তাঁরা বড়লোক ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁদের পড়তি অবস্থা। মা বাবা ছোটবেলায় মারা গেছেন। পরিবারের মধ্যে তিনি একমাত্র কোলের শিশু, তাই সকলেরই চোখের মণি ছিলেন। বিশেষ করে ঠাকুমা ঠাকুরদাদার অতিরিক্ত স্নেহের ফলে ছোটবেলা থেকেই একগুঁয়ে আর বদরাগী হয়ে গেছেন। যখন কাকাদের ছেলেরা তাঁর একছত্র রাজত্বে অংশীদার হতে আরম্ভ করল তখন তিনি সত্যিই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। অত্যধিক-আদরে-মানুষ জেঠীর মুখটা অন্তরের জ্বালায় নিমের চেয়েও তেতো হয়ে উঠল। যতদিন ঠাকুমা ঠাকুরদাদা বেঁচে ছিলেন, কারুর সাহস ছিল না তাঁকে কিছু বলে। এরপর আরম্ভ হল জ্বালাতন ও অত্যাচারের পালা। খোঁচা মারা স্বভাবের জন্য উনি সবার চোখের কাঁটা হয়ে গেলেন। সকলে তাঁকে যত তাচ্ছিল্য করতে লাগল তাঁর মনও তত ঘৃণায় ভরে উঠল। মানুষের সঙ্গ থেকে দূরে তিনি একদম একলসেঁড়ে হয়ে গেলেন। দ্বারকাদাসের মত গরীব ছেলের হাতে তাকে দিয়ে কাকা এমন নিশ্চিন্ত হলেন যে দ্বিতীয়বার ভুলেও তিনি মেয়ে-জামাইকে ডাকার নাম মুখে আনলেন না।

বিয়ের পর দ্বারকাদাসের পাথর চাপা কপাল হঠাৎ খুলে গেল। দালালিতে বড় বড় রাজা-নবাব-পয়সাওয়ালাদের দামী জিনিসপত্তর

জলের দামে তাঁর হাতে এল। ধীরে ধীরে পসার বাড়ল এবং তিনি স্যাকরার একটি ছোট দোকান করে নিলেন। দ্বারকাদাস এ কথা একশোবার মানতেন যে তাঁর এই দিন-পাল্টানোর মূলে তাঁর পত্নীর ভাগ্যই প্রবল, তাই জেঠীর কড়া কথার বিষ তিনি শিবের মতই মুখবুজে সহ্য করে নিতেন।

প্রথম মহাযুদ্ধে দ্বারকাদাসের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী বিশেষ সুপ্রসন্ন হলেন। সেইসময় তিনি একটি পুরোনো বাড়ি কিনলেন আর তার নীচে গুপ্তধন খুঁড়ে পেলেন। এরপর দ্বারকাদাসের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ বড়লোক হবার পর তাঁর উড়ু-উড়ু মন, মন-পবনের দাঁড়ে বসে এমন এক কাল্পনিক সহধর্মিণীর ছবি আঁকল, যে তাকে দেবে সম্মান ও ভালবাসা আর নতুন বৈভবের সন্ধান।

বিয়ের বেশ কিছুদিন পরে একবার জেঠী সন্তানসম্ভবা হয়েছিলেন। জেঠীর শাশুড়ী ওঁর প্রতি সদাই বীতরাগ ছিলেন। কিন্তু তিনিও সেসময় আদর-যত্নের কসুর করেন নি। এরপর যেদিন জেঠী একটি কন্যারত্নকে জন্ম দিলেন সেদিন সারা বাড়ির আদর-যত্নের স্রোত যেন এক নিমেষে শুকিয়ে গেল। আঁতুড়েই শাশুড়ীর কড়া কথা জেঠীর কানে আসতে লাগল। বাড়ির লোকদের আচরণে মনে হল যেন সবাই মিলে তাঁর মেয়েটিকে গলা টিপে শেষ করে দিতে চায়। তাই আশঙ্কায় তিনি স্বামী, শাশুড়ী, ননদ এমনকি চাকর-বাকরদের পর্যন্ত ঘৃণা করতে শুরু করলেন। শিশুকে নিয়ে তিনি একা বন্ধ ঘরে দিন কাটাতে লাগলেন। সারা পৃথিবীটাই যেন তাঁর শত্রু। বেশীর ভাগ সময় বন্ধ ঘরে বসে মেয়েকে আদর ও খেলা দিতেন। স্বামীর অনেক বোঝানো, অনুনয়-বিনয় সবই ব্যর্থ

হয়ে গেল। সেই মেয়ে আট মাসের হয়ে মারা গেল। জেঠীর শোক যেন সারা সংসারের শান্তিকে শুষে নিল। সেইসময় অটুট বৈভবের মাঝে কুলপ্রদীপের অভাবটা দ্বারকাদাসের মনে উঠতে বসতে খোঁচা দিতে লাগল। ব্যথার যাতনা দিন দিন যেন বাড়তেই লাগল। হতাশ হয়ে একদিন দ্বারকাদাস দ্বিতীয় বিয়ের কথা ভাবলেন। যেদিন টোপর মাথায় দিয়ে দ্বারকাদাস ছাদনা-তলায় দাঁড়ালেন সেই রাত্রিতেই জেঠী বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।

জেঠী সোজা গিয়ে উঠলেন পুরুত ঠাকুরের বাড়ি। পুরুতমশাইকে গায়ে পড়া অতিথির ভার থেকে মুক্ত করার জন্য দ্বারকাদাস জেঠীকে অনেক বোঝালেন। আটদিন পর জেঠী এই শর্তে রাজী হলেন যে পুরোনো বসতবাড়ি যেটা দ্বারকাদাস আবার কিনে নিয়েছেন সেখানে জেঠী থাকবেন এবং ভরণপোষণ, তীর্থ-ধর্ম করার খরচের জন্য ছুশো টাকা মাসোহারা নিয়মিতভাবে পাঠানো হবে।

তেত্রিশ বছর ধরে সে ব্যবস্থা বাঁধা গতের মত ঠিক চলে আসছে। এই কয় বছরে ধর্মরক্ষক, গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক, দানী ধ্যানী স্যার দ্বারকাদাস আগরওয়ালা কে. সী. আই. ই.র প্রথম পক্ষের স্ত্রী জগৎ জেঠী ক্যাঁটকেঁটে, ডাইনি, একলসেঁড়ে ইত্যাদি শতমুখে শত নামে চিহ্নিত হয়ে সারা পৃথিবীর অস্পৃশ্য হয়ে আছেন। জেঠীর নামের সঙ্গে নানা রকম গুণতুকের অজস্র কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে। প্রবাদ আছে কিছুদিন জেঠী ঠিক রাত বারোটার সময় এক মেথরের বাড়ি গুণতুক শিখতে যেতেন। জেঠীর কোমরে কালো সুতোয় বাঁধা ছোট কাঁচির ভয়ে সারা পাড়া থরহরি কম্প। কারুর শিয়রে, খাটে সিঁদুর লাগিয়ে, কারুর বালিসে সওয়া গজ লম্বা কালো সুতো সুঁচে পরিয়ে বেঁধানো, কারুর শিয়রে সজারুর

কাঁটা, কারুর নতুন বৌয়ের উড়নির কোণা কাটা, কোন ছোট বাচ্চার মাথায় তেল ছুইয়ে মারণ মন্তর পড়া, কোন মেয়ের সিঁথির চুল কেটে তাকে বাঁজা করা, কারুর বাড়ির দরজায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত প্রদীপ জ্বালানো, তুক করা প্রদীপ চৌমাথার মোড়ে রেখে আসা, এভাবে জেঠী সর্বদাই প্রত্যেকের অকল্যাণ কামনাই করে থাকেন। অনেকবার গুণতুক করার সময় পড়শীরা জেঠীকে হাতে-নাতে ধরেছে, কত ঝগড়া হয়েছে, কত বাড়ির দরজা জেঠীর মুখের ওপর চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেছে। এর ফলে, পাড়ার সমস্ত বিপদ-আপদের অপবাদের ভাগী এখন জেঠী।

রোদে চুল শুকুতে শুকুতে জেঠী চারিদিকের সোরগোলে বিরক্ত হয়, ঘন ঘন কাঁচাপাকা চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে আপন মনে বক বক করে চলছেন— আ মলো যা, জাহান্নামে যাক সব, রক্তবীজের ঝাড়, সাত জন্মের শত্তুর, যেখানে একটু বসব মাথা একেবারে খেয়ে ফেলবে— হায়, হায়।

জেঠী সারা পৃথিবীটারই বিরুদ্ধে। প্রত্যেকের প্রতি তাঁর অভিযোগ। তাঁর সারা জীবনের অভিসম্পাতের ঠাঁস বুনোন দড়ির সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে হনুমানকেও নিজের লেজ গুটিয়ে আসন পিঁড়ি হয়ে বসে পড়তে হবে, কিন্তু জেঠী হার মানবেন না। পাড়ার মেয়েবৌয়েরা ঝম্পন বজাজের ছাদে উঠে জোরে জোরে হাসছে। সকলেই জেঠীর সাত জন্মের শত্তুর শাঁকচুন্নীর দল। আঁতুড়ে বোধহয় দাই এদের গলার ঘড়ঘড়ি বাঁশ দিয়ে খুলেছিল। বাবা! কী দমকা হাসির আওয়াজ সারাক্ষণ, হি-হি-হি হেসেই চলেছে সব। ইতিমধ্যে আবার জেঠীর ছাদের কার্নিসে বসে 'কর্মনাশা কাক' পচ করে বদকর্ম করেই উড়ে গেল। ওধারে

প্রতিবেশীর রেডিওতে গান বেজে উঠল, 'হম তুমসে মহব্বত করকে সনম' চুলোয় যাক সব বেটা সনমের দল, গুয়ো বামনির ছাদে শাশুড়ী-বৌয়ের কচকচানিতে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেল, বুড়ি রাঁড় মরতে বসেছে, তবু কি গলা! উফ্, লালে দলালের ছেলে ছাদ থেকে চেঁচিয়ে উঠল— আরে হারামজাদী, এখনো সাবান দিয়ে গেলি না? আমার নাইবার জল ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে। জেঠীর কানে যেন গরম তেল চুইয়ে পড়ল— ও মাগো মা, রামো রামো, বেহায়া কোথাকার, ডাকাতের মত চেঁচানি শোনো একবার। হে ভগবান, কুলে পিদিম জ্বালাতে যেন কেউ না থাকে, ভর তুপুর বেলা নাইতে বসা, ম্লেচ্ছর দল সব। হারামজাদী ভভুতি স্যাকরার তুই বৌ চোখের সামনে মূর্তিমতী সঙের মত দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও তু'দণ্ড তিষ্ঠুবার জায়গা নেই। উঃ যেমন এরা আমায় ত্যাক্ত বিরক্ত করছে, এদের সাতপুরুষ যেন নরকে যায়। গায়ে পোকা পড়ুক, মড়া ঢাকা কাপড়ও যেন না জোটে···আবার···ওই দেখলে···আবার এলো পোড়ারমুখী, তোর সারা শরীরে পোকা পড়ুক···।

মরা ইঁতুর মুখে করে বেড়াল লাফ মারলে, বকবক ভুলে জেঠী জোরে চেঁচিয়ে বাঁশ নিয়ে মারতে ছুটলেন। বেড়াল সিঁড়ির দিক থেকে দৌড়ে জেঠীর ছাদ থেকে এক লাফে ভভুতির ছাদের দিকে দৌড় দিল। ঠিক সেই সময় নন্দ ওদিক থেকে লাফ মেরে এদিকে আসার চেষ্টা করছিল, বেড়ালটাকে এত কাছে লাফাতে দেখে সে চমকে উঠল।

জেঠী নন্দকে দেখে বললেন— নন্দ, তুই ছুঁয়ে ফেললি না কি, হতভাগী? যা নেয়ে আয়।

—আরে না না জেঠী, ভগবানের দিব্যি, ও তো আমার থেকে বেশ দূরেই লাফিয়েছিল—তুমি তো দেখছিলে জেঠী— বাব্বাঃ, আমার বুক ধড়ফড় করছে, মুখে শিকার নিয়ে তোমার এখান থেকে গেছে, না জেঠী? উপরকার ছাদ থেকে তিন সিঁড়ি নামতে নামতে হাতে যে পান ছিল সেটা সে জেঠীর দিকে বাড়িয়ে বললে, নাও পান খাও।

পান দেখে জেঠীর মুখের থমথমে ভাব খানিকটা কেটে গেল। বাঁশকে দেওয়ালের কোণে দাঁড় করিয়ে উঠোনের রকে রাখা কলসী থেকে জল গড়িয়ে হাত ধুতে ধুতে জিজ্ঞাসা করলেন, বেড়াল ছুঁয়ে যায় নি তো? সত্যি বল?

—না না জেঠী। এতবড় দিব্যি দিলুম, আরে, আমি তো নিজেই সব রকম আচার বিচার মেনে চলি। আমার বাড়িতে পানের বাটা আলাদা ঠাকুর ঘরে রাখা থাকে।

জেঠী আঁচল দিয়ে হাত মুছে আঁচল দিয়েই পান ধরে মোলায়েম স্বরে গলা নামিয়ে বললেন, "জয় শ্রী হরি।" নন্দও "জয় শ্রী হরি" বলে কোমর থেকে দোক্তার ডিবে বার করলে।

দু'জনে সূর্যের দিকে পেছন করে একটু সরে বসল। নন্দ ডিবে থেকে এক চুটকী দোক্তা আর দু'টুকরো সুপুরি মুখে দিয়ে পানকে একটু গালে নেড়েচেড়ে নিয়ে কোমরে ডিবে গুঁজতে গুঁজতে বলল, জেঠী, তোমার দয়ায় আজ পর্যন্ত সনাতন ধর্মে আমার পুরো আস্থা রয়েছে। সকালে গোমতী নদী থেকে চান করে সোজা ঠাকুর ঘরে চলে যাই, কারুর সাতেপাঁচে থাকি না, সাড়ে তিন ঘণ্টা শুধু ঠাকুরের সেবায় কাটিয়ে দিই।

—কত ঠাকুর রেখেছিস লো? চুলে আঙুল চালাতে চালাতে জেঠী জিজ্ঞেস করলেন।

—আমাদের ওখানে? রাধামাধবের যুগল মূর্তি, লক্ষ্মীনারায়ণ, বাল মুকুন্দ, গণেশ, নাড়ুগোপাল, বিষ্ণুপদি, বদ্রীনাথ জগন্নাথের নুড়ি, মহাদেব শালগ্রাম— আ—র—ব্যাস এতগুলো আছে, বাকী সবার ছবি টাঙিয়ে রেখেছি।

—আমার কাছে গণেশ নেই, আগে ছিল। সেদিন হতচ্ছাড়া ইঁদুর নিয়ে গেল। মাথায় কাপড় টেনে জেঠী বললেন।

—অন্য আনিয়ে নাও জেঠী, গণেশ তো ঠাকুরের আসনে নিশ্চয় থাকা চাই— উনিই তো সিদ্ধিদাতা।

—আমার সিদ্ধি টিদ্ধি দিয়ে কী হবে? ভাগবত গীতায় লেখা আছে না যে, ভগবানের পায়ে অটল ভক্তি রাখো, এ যেন নাড়ির যোগাযোগ, যুক্ত অথচ মুক্ত।

—হ্যাঁ জেঠী, এই ভক্তি পথ যদি ধরা যায় তাহলে সব জন্মের সংস্কার সুধরে যাবে। সেদিন কথকতাতে শুনছিলাম—

—আরে কথকতা কোথায় হচ্ছে?··· জেঠী নন্দর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন। জেঠী নিত্য গোমতী নদীতে চান করতে যান না। উনি বাড়ির বাইরে বড় একটা পা দেন না। সকাল বেলা একটু গোকুল মন্দিরে দর্শনে যান। তখুনি সাত জন্মের শত্তুর পাড়ার গলির ছেলেমেয়েরা, বখাটে ছোঁড়ারা জেঠীর মুখ থেকে গালাগালি শোনার জন্য জেঠীকে ঢিল মারার পর চারদিক থেকে ঘিরে জেঠীকে ছুঁয়ে দিতে আসে। 'জেঠী ছুঁয়ে দিলাম, ছুঁ ছুঁ। জেঠী কবে মরবে?' চ্যাঁচামেচিতে জেঠীর রাস্তায় হাঁটা মুশকিল করে তোলে। সারা রাস্তা সকলের পিণ্ডি চটকাতে চটকাতে জেঠীর প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসার জোগাড়। পৃথিবীটাকে উনি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবল নন্দর সঙ্গেই

তাঁর বনিবনা হয়। নন্দই বাড়ি বয়ে এসে সারা পাড়ার কেচ্ছা ফেনিয়ে ফেনিয়ে তাঁকে শুনিয়ে যায়।

—ও জেঠী, বানের গলিতে কাল থেকে এক কথক ঠাকুর এসেছেন। এত সুন্দর কথকতা করেন তোমায় কী বলব। তা, উনি বলেন যে সংস্কারই মানুষ জন্ম সার্থক করে।

—সংস্কারই তো সবকিছুর মূল কিন্তু মলো যা, আজকাল সংস্কারই যে সব বিগড়ে গেছে, দেখো না, হতভাগী পন্নোর মেয়ে বি. এ., এম. এ. পাস করে অফিসে চাকরী করতে যায়। আবার একটা বাইসাইকেল কিনেছে।

—ছ্যা-ছ্যা— তা আর বলতে জেঠী, ঘোর কলিকাল— কেউ আর কাউকে টিপ্‌পুনি কাটতে পারবে না। আমার বাড়িতেই বা কী কম? শঙ্কর আর শঙ্করের বউ সকালে আটটার আগে বিছানা ছাড়েন না। স্টোভ এনেছে শঙ্কর, ডিম, মাছ পাউরুটি আর না-জানি কত কি ওর বৌ তৈরী করে। ভাতারের সঙ্গে বসে বসে খায়। দেখে দেখে মনিয়ার বৌও ছোট বৌয়ের সাথে মিলে লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে আরম্ভ করেছে। ওদের গুরু হলেন তোমার নতুন ভাড়াটে গিন্নী— কত আর বলব।

—পাপের পুঁটলী, সর্বনাশ হবে— সোয়ামী ইস্তিরীতে মিলে কুষ্ঠ হয়ে মরবে।

জেঠী নিজের ভাড়াটে বর্মা পরিবারকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। যেদিন ভদ্রলোক বেজাতের মিসেস বর্মাকে আর্যসমাজ মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করে নিয়ে এলেন সেই মুহূর্তে জেঠীর দরজা ওঁদের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। মিস্টার বর্মা বেশ ভাল রেডিও মেকানিক এবং তার একটি ছোট দোকানও আছে। দোকানটি বেশ ভাল

চলে। বাবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে হন্মে হয়ে বাড়ি খোঁজের সময় বাড়ি অ্যালটমেণ্ট কমিটির মেম্বরদের কাছে ছোটাছুটি করেছিলেন। এক পরিচিত ভদ্রলোক আশা দিয়েছিলেন যে খালি বাড়ির সন্ধান পেলে তিনি পাইয়ে দেবেন। খুঁজতে খুঁজতে রায়বাহাদুর দ্বারকাদাসের পুরোনো বসতবাড়ির সন্ধান পেলেন। বিরাট চার উঠোনের বসতবাড়ি অনেক বছর থেকে বন্ধ পড়ে আছে। রায়বাহাদুরের প্রথম পক্ষের স্ত্রী জেঠী একদিকটায় থাকেন। সারা বসতবাড়ি 'ভূতের আড্ডা' বলে বিখ্যাত। বসত-বাড়ির সঙ্গে রায়বাহাদুরের কোন সম্পর্ক নেই, জেঠীর একছত্র রাজত্ব। যদিও বাইরে দিকের ঘর, দোকান এবং পুরোনো গোয়াল ঘরে জেঠী ভাড়াটে বসিয়েছেন, কিন্তু বাড়ির ভেতরদিকে ভাড়াটে বসাতে একদম নারাজ। যেদিন মিস্টর বর্মা অ্যালটমেণ্ট কমিটির জোর দেখিয়ে ভাড়াটে হয়ে ঢুকলেন, সেইদিন থেকে উঠতে বসতে জেঠী বর্মা দম্পতির মুণ্ডুপাত করছেন।

জেঠীর দরজার কড়া নড়ে উঠল। জেঠী নন্দর দিকে তাকিয়ে বললেন— দেখে আয় তো কে পোড়ামুখো অসময় দরজা খট খট করছে।

নন্দ এসে জানালে যে নতুন ভাড়াটে, গোয়াল ঘরের ওপরের ঘর ভাড়া নিতে এসেছে।

তিন

রাজাবাহাদুর স্যার দ্বারকাদাস আগরওয়ালের পূর্বপুরুষের গোয়াল ঘরের দালানের ওপরের ছোটঘর আর ছাদের ভাড়াটে হয়ে সজ্জন ভাবছে— সে মস্ত বড় ভুল করে ফেলেছে। স্থানীয় অলিগলির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ছবি আঁকার ইচ্ছায় সে এখানে এসেছিল। সাহনজফ রোডে সজ্জনের নিজের বিরাট অট্টালিকা দাঁড়িয়ে আছে। আমীনাবাদ, কেসরবাগের বাড়ি থেকে প্রায় মাসে সাত-আটশো টাকা ভাড়া আসে। পৈতৃক সম্পত্তি চীনের মজবুত দেওয়ালের মতই পৃথিবীর সব অভাবের হাত থেকে সজ্জনকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সুন্দর ল্যাণ্ডস্কেপ আর পোট্রেট ছবির শিল্পী হিসেবে তার নামডাক হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানের, জঙ্গল পাহাড়, ঐতিহাসিক আর সাংস্কৃতিক জায়গার অনেক ছবি সে এঁকেছে। অমরনাথ থেকে কন্যাকুমারী আর দ্বারকা থেকে মণিপুর-আসাম পর্যন্ত, চারিদিকের পরিক্রমা সে শেষ করে ফেলেছে। নিজের দেশের সংগীত, সংস্কৃতি, প্রাচীন ঐশ্বর্য দেখে সজ্জন যতই প্রভাবিত হয়েছে ততই বর্তমান সংস্কৃতির দেউলেপনার কারণ জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। খজুরাহো, অজন্তা, এলোরা, চিদম্বরম, তাঞ্জোর, মাদুরা, কোনারক, জগন্নাথ, আবুতে প্রাচীন পাথরের কাজের কারিগর, অজন্তার শিল্পীরা আজ কোথায়? নতুন অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে এ রিক্ততা কেন? জীবন-

ধারার উৎস কেন শুকিয়ে যাচ্ছে? আশ্চর্য, এই দেশে আজ সে নিজের নতুন ছবির বিষয়বস্তু খুঁজে পাচ্ছে না কেন? এই সমস্যার উত্তরই তাকে টেনে এনেছে এই গলিতে। বর্তমান অর্থহীন, যুক্তিহীন, বাতিল সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে আছে যে সমাজ, তারই মুখোস সে খুলে দেখাতে চায়, নিজের আঁকা ছবিতে। এইসব এলোমেলো চিন্তাধারার মধ্যে হঠাৎ একদিন সজ্জনের মনে হল, যে পরিবেশের মধ্যে সে আছে, সেখানে তার জীবনের গতির সঙ্গে গ্রাম বা শহরের গলিঘুঁজির জীবনের কোথাও কোন মিল নেই। কেবল তাদের সঙ্গে এই নিয়ে চর্চা করাটাই যথেষ্ট নয়, তাদের মধ্যে একজন হয়ে জীবনযাপন করলে তবেই সে বুঝতে পারবে তাদের সুখ দুঃখ, ব্যথা বেদনার কাহিনী। ইতিমধ্যে একদিন কোণের চশমার ফ্রেম তৈরী দোকানের সরদারজী যখন তাকে এ গলিতে তারই বাড়ির কাছে একখানা ঘর পাইয়ে দেবার কথা তুলল সেদিন সজ্জন সত্যিই বেশ খুশী হয়েছিল। ঘর ভাড়া নেওয়ার সময় এ কথা একবারের জন্যও তার মনে আসে নি যে তাকে ঘর পাইয়ে দিয়ে সরদারজী তাঁর পড়শীকে জব্দ করার রাজনীতিক মোহরার এক চাল চেলে দিয়েছে।

গোয়াল ঘরের দুদিকে লম্বা লম্বা দালান, নীচে দু'খানা ঘর আর একদিকের দালানের ওপর একটি ছোট ঘর। নীচের দু'খানা ঘরে দুই পরিবার থাকে। দুজনেই সরদারজী, একজন ছুতোর আর অন্যজন ঠেলায় মশলা নিয়ে বিক্রি করে। মশলাওয়ালার অবিবাহিত শালা ওপরের ঘরে থাকে। ছুতোর সরদারজীর চেয়ে মশলাওয়ালা সরদারজীর পরিবারের সাইজটা ছোট, অথচ তার চেয়ে বেশী জায়গায় বেশ হাত-পা ছড়িয়ে নিয়েছে।

হুট করে একদিন শালামশাই প্রেমের চক্রব্যূহে ফেঁসে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে, সরদার থেকে সোজা 'মোনা' হয়ে ফিরলেন। এতদিন তার রোজগারের বেশীর ভাগটাই ভাগ্নে ভাগ্নীর ওপর খরচ হ'ত, সেটা এখন 'অন্যস্থানে' খরচ হতে লাগল। হঠাৎ তিনি একদিন না বলে কয়ে উধাও হয়ে গেলেন। মশলাওয়ালা সরদারজী সেই ঘর আর ছাদ তবু দখল করে বসে রইল। দুই সরদারজীতে একদিন এই নিয়ে বেশ হাঙ্গামা হয়ে গেল। মশলাওয়ালা জানালে যে অন্য ভাড়াটে না আসা পর্যন্ত সে ঘরটা খালি করবে না। দুই ভাড়াটের গোলমালের মধ্যে জেঠী চুপ করে আছেন, কেননা মশলাওয়ালা সরদারজী ছুতোর সরদারজীর বিরুদ্ধে জেঠীর কানে প্রায়ই ফুসমন্তর দিয়ে থাকে। নতুন ভাড়াটের গন্ধ পেলেই, মশলাওয়ালা তখুনি নানা ছুতোয় তাকে ফটকের বাইরে থেকেই বিদেয় করে দেয়।

মশলাওয়ালার কীর্তিকলাপ দেখে ছুতোর সরদারজী একেবারে তেলে বেগুনে হয়ে আছে, ঠিক এমনি সময় সজ্জনের ঘরের দরকার দেখে, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করার সুবর্ণ সুযোগ আপনা হতেই তার মুঠোয় এসে গেল। সজ্জন আর জেঠীর দরদী সাজলেই ছুতোর সরদারজীর মনের কামনা পূর্ণ। তারপর তাকে আর পায় কে। সাত টাকা মাসে ভাড়া একেবারে মুহূর্তে— পঁচিশ টাকায় উঠে গেল। সজ্জন সানন্দে ঘাড় নাড়তেই ছুতোর সরদারজীর আনন্দে বত্রিশ পাটি বেরিয়ে এল। গোকুল মন্দির যাবার রাস্তায়, ছুতোর সরদারজী কথায় কথায় নতুন ভাড়াটের কথা তুললে, একথা সেকথার পর জেঠী বেশ খুশী মনে সায় দিলেন। পরের দিন দুপুরে সজ্জন যখন ঘর দেখতে গেল, তখন মশলাওয়ালা ঠেলা নিয়ে

বেরিয়েছে। তার সরদারনীর ওজর আপত্তির পরোয়া না করে ছুতোর সরদারজী সজ্জনকে দিয়ে একমাসের আগাম ভাড়া জেঠীকে দিইয়ে দিল।

পরদিন সকালে দুজন বন্ধুর সঙ্গে যখন সজ্জন ঘর দেখতে গেল তখন মশলাওয়ালা বাড়িতেই ছিল, সে বেশ ভাল ভাবেই জানিয়ে দিলে যে সে কিছুতেই তাকে ঘর দেখাবে না। এ জায়গা কেবল গেরস্তকেই দেওয়া যেতে পারে। সজ্জন রাগে ফেটে পড়ল, তার বন্ধু কর্নেল আর মহিপালও মশলাওয়ালার কথা শুনে বেশ গরম হয়ে উঠল। ওদিকে ছুতোর সরদারজী ফট করে জেঠীর কাছে গিয়ে বেশ ভাল করে ফোড়ন দিয়ে এল। জেঠী হরিনামের ঝুলি ছেড়ে মশলাওয়ালাকে বাপান্ত করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। মশলাওয়ালা নিরুপায় হয়ে ঘর ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ল।

মামুলী ধরনের তৈরী ছোট একটি ঘরে সজ্জনের মত বড়লোক ভাড়াটে দেখে আশেপাশের পাড়া-পড়শীরা সকলেই যে যার মন্তব্য করতে আরম্ভ করল। পাড়ার অনেকেই সজ্জনের নাম এর আগেও শুনেছে, ভভুতি স্যাকরার ছোট ছেলে শঙ্করলালকে সঙ্গে নিয়ে পাড়ার কজন ছেলেছোকরা তার সঙ্গে দেখা করে গেল। গলির জনজীবনকে ক্যানভাসে চিত্রিত করার মহৎ সংকল্পকে তারা বেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করতে আরম্ভ করল। সজ্জনের মহৎ উদ্দেশ্য নিন্দুকদের মুখে আর-এক নতুন রঙে চিত্রিত হয়ে পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল। মশলাওয়ালা, আর কিছু লোক মন্তব্য করলে যে পাড়ার মেয়ে-বৌদের ভুলিয়ে খারাপ পথে নিয়ে যাওয়াই নাকি সজ্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য, ছবি আঁকা বাহানা ছাড়া আর-কিছুই নয়।

অনেকের ধারণা যে শিল্পী হতে গেলেই চরিত্রহীন হতে হয় আর চরিত্রহীন না হলে শিল্পী হওয়া যায় না। এই নিয়ে বেশ হৈ-হুজ্জং হল, স্থানীয় খবরের কাগজের সম্পাদকের নামে এই নিয়ে লেখালেখি চলল। সজ্জনের মত ধনী যুবকের ব্যভিচারের আস্তানা বন্ধ না হলে অনশন করার হুমকিও ছাপানো হল।

সব-কিছু দেখেশুনে সজ্জন একেবারে অবাক! তার শিল্প-সাধনার বিষয় জনতাকে জানাতে হবে, খবরের কাগজে সেও নিজের উদ্দেশ্যের কথা খোলাখুলি ভাবে লিখবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই! অকারণে পেছনে ফেউয়ের মত লাগার মানুষের এই স্বভাবকে সে কিছুতেই মুখ বুজে বরদাস্ত করবে না। পাড়ার লোকেদের আপন করে নিতেই হবে, তাদের সন্দেহযুক্ত মনকে ধুয়ে-মুছে আয়নার মত স্বচ্ছ করে দেবে সে।

সন্ধে হয়ে এসেছে। সজ্জনের সিগরেটের প্যাকেট ফুরিয়ে গেছে। বাজার থেকে নতুন প্যাকেট আনার জন্য নীচে নামতেই দেখলে সামনে দ্বারকাদাস দাঁড়িয়ে। একদিকে দুর্গন্ধে ভরা গলি, অন্যদিকে বৈভবশালী রাজাবাহাদুর, দুই পরস্পর-বিরোধী অবস্থান একই জায়গায় দেখে সজ্জনের মত শিল্পী যেন হঠাৎ হকচকিয়ে গেল! রাজাবাহাদুরের এই বসতবাড়ি আর জেঠীর সঙ্গে তার সম্বন্ধর বিষয় সে আগেও শুনেছে।

—আরে আপনি? তাঁকে দেখে সজ্জন বললে। রাজাবাহাদুর সাহনজফ রোডে তার পড়শী। দুই বাড়িতে আজও সেই স্নেহ-ভালবাসার সম্পর্ক চলে আসছে। সজ্জন তাঁকে 'কাকাবাবু' বলে, কেননা রাজাবাহাদুর তার বাবাকে 'দাদা' বলে ডাকতেন।

দ্বারকাদাস সজ্জনকে দেখে সংকুচিত হয়ে গেলেন। ধরা গলায়

দু'পা এগিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন— তুমি এখানে কি করছ?

—আজ্ঞে, আজকাল আমি এখানে— ওই— ওপরকার ঘরে কাজ করছি। এখানকার গলির জীবন স্টাডি করছি।

—তুমি জানো, এই বসতবাড়ি আমারই পূর্বপুরুষের?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এখানে আসার পর জানতে পারলাম। আমি নিজেই আপনার কাছে সাহায্য চাইতে আসব ভাবছিলাম, আসলে কিছু ভুল-বোঝাবুঝির দরুন, পাড়ার লোকেরা আমাকে বিরক্ত করছে।

সামনে দাঁড়িয়ে এক যুবক তাঁর সাহায্য চাইছে, দ্বারকাদাসের সুপ্ত পৌরুষ যেন জেগে উঠল। সাহস করে তিনি এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়লেন।

—কে রে? হতচ্ছাড়া, কর্মনাশা, খট খট করে শেকল নাড়লে কে? ভেতর থেকে জেঠীর খনখনে আওয়াজ ভেসে এল।

—দরজা খোলো, অনেক চেষ্টা করে দ্বারকাদাস তাঁর কঠোর হুমকি দেয়া স্বরকে সহজ করে আনলেন।

জেঠি বকবক করতে করতে এলেন। দরজা খুলতেই সামনে স্বামীকে দেখে তিনি একদম চুপ মেরে গেলেন। আজ হঠাৎ চৌদ্দ বৎসর পর স্বামী স্ত্রী দুজনে দুজনকে কাছে থেকে দেখছেন। এত বছর পরে স্ত্রীকে কাছে পেয়ে দ্বারকাদাসের মনের সুপ্ত কোমল ভাবের জায়গায় ভয়েরই সঞ্চার হল, অজানা আশঙ্কায়, তাঁর বুকটা দুলে উঠল। কথা আরম্ভ করার ছুতো খুঁজে বললেন এই ছেলেটিকে চেনো? আমাদের কম্নোমজের নাতি।

—হবে, আমার তাতে কী? বলতে বলতে জেঠী ভেতর দিকে

পা বাড়ালেন, দ্বারকাদাসও ভেতরে গেলেন। বিনা কারণে সজ্জনও পেছনে পেছনে ভেতরে গিয়ে হাজির হ'ল।

চারিদিকে স্যাঁতসেঁতে ভাব, ছোট দালান, সামনে উঠোনে হ্যারিকেন রাখা আছে, ডানদিকে জ্বলন্ত উনুন।

হ্যারিকেনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে থালায় আটার তৈরী ছোট ছোট পুতুল দেখেই দ্বারকাদাসের মনটা ছ্যাঁত করে উঠল। জেঠী থালা উঠিয়ে দালানের থামের কাছে রেখে হ্যারিকেন উঠিয়ে দালানে রাখলেন। জেঠীর ছোট নারকোল দড়ির দোলনার মত খাটিয়াতে পাতা নোংরা বিছানার একদিকে দ্বারকাদাস জড়সড় হয়ে বসলেন। সজ্জন তাঁর গা ঘেঁষে বসল। জেঠী খাটিয়া থেকে একটু দূরে মাটিতে বসতে বসতে বললেন— কেন এসেছ? দ্বারকাদাস কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন— তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম— এই জানকী সরনের··· থালায় রাখা আটার পুতুলের দিকে সজ্জন একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। জেঠী শিল্পীর চেয়ে কম নয়, আশ্চর্য— কী সুন্দর আকৃতি তৈরী করেছেন। পুতুলকে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে তার, আনন্দ এবং আশ্চর্যের মিশ্রিত অনুভূতিতে সজ্জনের শিল্পীমন ভাবুক হয়ে উঠল।

জেঠী রাগে থর থর করে কেঁপে উঠলেন। দ্বারকাদাসের মুখের কথা মুখেই থেকে গেল, জীবনে তিনি কখনও কারুর মুখে যা শোনেন নি, আজ তাঁকে তাই শুনতে হল। সজ্জনও তার জীবনে প্রথম এত অশ্রাব্য গালাগালি শুনছে।

স্বামী-স্ত্রীর হাঙ্গামার মধ্যে থেকে সে প্রায় ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল, গরম মেজাজের পত্নী আর শান্ত মেজাজের স্বামীর এই নাটকীয় একতরফা দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখার তার মোটেই ইচ্ছে নেই।

দ্বারকাদাস তবুও দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি আজ স্ত্রীর কাছে নিজের পরিবারের আর নাতির জীবন ভিক্ষা চাইছেন। সামান্য আটার পুতুল আজ গভর্নর, মন্ত্রী, হাকিম, গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছে সম্মানিত দ্বারকাদাসকে জেঠীর সামনে কাকুতি মিনতি করার জন্য বাধ্য করেছে। বাজার থেকে সিগরেট কিনে সজ্জন ঘরে ঢুকল। কর্নেল আর মহিপাল তার প্রতীক্ষায় বসে আছে।

শ্রীনগীনচাঁদের আসল নামটা কেউই জানে না, সকলে কর্নেল বলেই জানে। কর্নেল, লক্ষ্ণৌ শহরের বেশ পুরোনো নামকরা ওষুধের দোকানের মালিক। সমাজকল্যাণ কাজের জন্য মন খুলে চাঁদা দিতে পেছপা হয় না। আজ থেকে ছ-সাত বছর আগে মহিপালের বন্ধু হিসেবে সজ্জনের সঙ্গে তার আলাপ হয়। সে আলাপ এখন বেশ পাকা ডোরে বাঁধা 'এয়ারী' হয়ে গেছে। লেখক মহিপাল যদিও দু'জনের চেয়ে গরীব, কিন্তু খুব পরিশ্রমী আর বন্ধুদের জন্য সদাই জান হাজির টাইপের লোক, তিনজনেই হরিহর আত্মা।

সজ্জন ঘরে ঢুকতেই কর্নেল জিজ্ঞাসা করলে, 'বোর মহাকবির' সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল তোমার ?

—না, কেন, এখানে এসেছিল নাকি ?

—হ্যাঁ, আমি বেশ পট্টি পড়িয়ে বিদেয় করে দিয়েছি। শালা এখানেও বোর করার জন্য হাজির হয়েছিল। তোমার আহাম্মক পড়শীরা খবরের কাগজে সম্পাদকের নামে চিঠি দিয়ে এই আড্ডার নাম ঠিকানা ছাপিয়ে এই গোল পাকিয়েছে। কবি মহারাজ কিছুতেই যেতে রাজী ছিলেন না। অনেক কষ্টে বিদেয় করা গেছে।

সিগরেটে আগুন ধরিয়ে গায়ের কাপড়টা জড়িয়ে সজ্জন গম্ভীর

হয়ে ভাবতে লাগল। কর্নেল তার মুখের দিকে ভাল ভাবে তাকিয়ে বললে— আজ আবার কিছু ঘটেছে না কি?

—না, কিছু ঘটে নি··· দ্বারকাদাসজী এখানে এসেছেন।

—দ্বারকাদাস, মানে রাজাবাহাদুর?

—হ্যাঁ, নিজের সুয়োরানীর মহলে বসে আছেন। সত্যি ভাই, জেঠী মেয়েমানুষটি একটি অদ্ভুত ক্যারেক্‌টর, গুণতুকের কেমন পুতুল তৈরী করেন, দেখার মত।

কিছুক্ষণ আগের ঘটনাটা সজ্জন শোনাল। কর্নেল চিন্তিত হয়ে বললে— তুমি পুতুল ছুঁয়ে ভাল কর নি।

—ব্যাটা, আমি তার কি জানি, আমি ভেবেছি জেঠী একা বসে এই নিয়ে সময় কাটান। সত্যি বলছি, মহিপাল, আমি খুব খুশী হয়েছি কিন্তু··· সজ্জন হাসতে লাগল। হাত বাড়িয়ে অ্যাসট্রেতে সিগরেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললে— আজ নিরেট ট্রাডিশনাল ইণ্ডিয়ান স্টাইলের গালাগাল শুনেছি, যা শুনে কানে আঙুল দিতে হয়।

ছাদে হঠাৎ মানুষের আকৃতি দেখা গেল। স্যার দ্বারকাদাস দাঁড়িয়ে আছেন।

সজ্জন আর কর্নেল দু'জনেই বিনয়ের সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

রাজাবাহাদুর কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা সজ্জনকে ইশারায় ডেকে বললেন— এদিকে একটু শোনো তো বাবা!

সজ্জন তখুনি উঠে বাইরে গেল। তার কাঁধে হাত রেখে সিঁড়ির দিকে এগুতে এগুতে দ্বারকাদাস মনের কথা ফাঁস করলেন— আজ যা কিছু হয়ে গেল, দেখো যেন সাতকান না হয়।

—না কখনো নয়, আপনি সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

—ওঁর মাথার স্ক্রু একটু ঢিলে আছে।

—আজ্ঞে, তা আমি জানি।

তোমায় দুঃখের কথা আর কত বলব, সব এই কপালের গেরো, যাক। ভুলেও কিন্তু তুমি তোমার প্রাণের বন্ধুকে পর্যন্ত এ বিষয় কিছু বলে ফেলো না যেন। আমি জানকীসরনকে বলে যাব তোমার যাতে কোন কষ্ট না হয়।

সজ্জন তাঁকে গলির মোড় পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে এল। দ্বারকাদাসের দাম্ভিক মুখাকৃতি আজ চিন্তামগ্ন, বিষাদের রেখা সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। ফিরতি পথে সজ্জনের মনে একই প্রশ্ন উঁকি মারছিল রাজাবাহাদুর কি সত্যিই সুখী?

চার

লালে দলাল আর তার গিন্নিকে গুণতুকের জোরে ভবসাগর পার করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা জেঠীকে দিয়ে নন্দ করিয়েছে। ছ'বছর আগে, যেদিন ভভুতি স্যাকরার বড়ছেলে মনিয়ার বিয়ের ধুমধাম ছিল, সেইদিনই বাড়ির গয়না চুরি হয়ে যায়। মা আলাদা ডিবেতে সোনার কোমরপাটা, গলার হাঁসুলী আর চন্দনহার মেরামত করিয়ে পালিশ করাবেন ভেবে রেখে দিয়েছিলেন। যে রাত্তিরে চুরি হল, পরের দিন সকাল থেকেই বাড়ির চাকর গায়েব। ফাটকের

শেকল খোলা দেখে সকলে একবাক্যে চাকরকেই চোর অপবাদ দিলে। ব্যবসা সংক্রান্ত কারণে ভভুতি স্যাকরা পুলিসে রিপোর্ট লেখানো উচিত মনে করলেন না, নন্দর মা মাথা খুঁড়ে, মুখে তালাচাবি লাগিয়ে বসে রইলেন। চাকরের সঙ্গে ভাগ-বাটরায় কোমরপাটা নন্দর ভাগে পড়ল। লালে দলালের গিন্নীর সঙ্গে তখন নন্দর খুব ভাবসাব ছিল। নন্দ তাকেই কোমরপাটা বিক্রী করতে দিয়েছিল। এত বছরে নানা বাহানা ছাড়া নন্দর হাতে একপয়সাও আসে নি। সবার সামনে এ নিয়ে নন্দ মুখ খুলতে পারে না। চারদিন আগে গোমতীতে চান করার সময় লালে দলালের গিন্নীর সঙ্গে এই নিয়ে বেশ বচসা হয়ে গেছে। লালে দলালের গিন্নী নদীর ধারে লোকজনের ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে নন্দকে চোর উপাধি দিয়ে অনেক দিনের চুরির রহস্য ফাঁস করে দিলে। নন্দর চুপচাপ মুখ চুন করে গুমকিল খাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। নন্দর অনেক কাকুতি মিনতির পর, জেঠী লালে দম্পতিকে প্রাণে শেষ করার পুতুল তৈরী করে দিতে রাজী হলেন। সজ্জন আর দ্বারকাদাস যখন জেঠীর বাড়ি ঢুকেছিলেন, তখন তিনি সেই আটার পুতুল তৈরী করায় ব্যস্ত ছিলেন।

দ্বারকাদাস চলে যাবার পর জেঠী আবার নিবিষ্ট হয়ে পুতুল তৈরীর কাজ সেরে ফেলায় মন দিলেন। নন্দ ওপরের সিঁড়ির পাশে লুকিয়ে আড়ি পেতে স্বামী-স্ত্রীর কথা শুনে নিয়ে এমনভাবে এসে দাঁড়ালে যেন ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানে না। আড়ি পেতে কথা শোনা নন্দর মজ্জাগত দোষ। দ্বারকাদাসের গাঁই গুঁই করে খোসামুদি করা দেখে জেঠীর মন খুশীতে ভরে উঠেছে, দ্বারকাদাস আজ বাজি হেরে গেছেন এই ভেবে জেঠী দ্বিগুণ উৎসাহে

মন্তর পড়ে শত্তুরকে মারার জন্য প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন, বর্মা দম্পতির মধ্যে ঝগড়ার কাঁটার বীজ পোঁতার জন্য সজারুর কাঁটা বের করলেন, লালা জানকীসরণের (যাঁর এইটুকু অপরাধ যে তাঁর বাড়ি আজ বিকেলে দ্বারকাদাস গিয়েছিলেন) বাড়িতে রোগের উৎপাত করাবার জন্য তাঁদের বাড়ির চৌকাঠে কালো তিলের পুড়িয়া বেঁধে রেখে এলেন, বিকেলের কাণ্ডর উচিত সাজা দেবার জন্যে সজ্জনের পুতুলও তৈরী করা হয়ে গেছে। জল্লাদের মত একের পর এক প্রত্যেকের অশুভ চিন্তা করে তবে জেঠীর মন ঠাণ্ডা হল।

নন্দর হাতে সব গুছিয়ে দিয়ে তাকে বিদেয় করে, চান করে, শাড়ি শুকিয়ে যখন জেঠী বিছানায় গেলেন, তখন কোতোয়ালির ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজল।

শোবার ঘণ্টা দেড়েক পরেই দুই বেড়ালের মল্লযুদ্ধের শব্দে জেঠীর ঘুম উড়ে গেল। অন্ধকারে বেড়ালের চকচকে দুই চোখ দেখে জেঠীর বুকটা কেমন যেন করে উঠল। দুই বেড়ালে রাগে গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে, প্রতিহিংসার দ্বিগুণ আক্রোশ নিয়ে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছে। জেঠীর গুণতুক-টোটকা-ভরা চোখের চাউনিতে ভয়ের ছায়া নেমে এল। ছোট বড় নানা আকারের বেড়াল যেন তাঁর চোখের সামনে ছুটোছুটি করছে। দুই বেড়ালের ঝুটোপুটির মধ্যে যখনই কোন বেড়াল জেঠীর দিকে তাকাচ্ছে তিনি যেন কিছুতেই সে চাউনি সহ্য করতে পারছেন না। অজস্র মন্তর পড়া সুঁচ সেই চাউনির মধ্যে থেকে যেন ঠিকরে ঠিকরে বেরিয়ে এসে সোজা তাঁরই মনের মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে। বুড়ো হাড়ের রক্ত ভয়ে হিম হয়ে গেল, মনের আক্রোশ গলায় এসে বেশমের মত আটকাল, ঘড়ঘড়ানির একটা অস্পষ্ট শব্দ ছাড়া আর

কিছুই গলা দিয়ে বেরুলো না। রাগে দুই বেড়াল সারা দালানে লাফালাফি করছে। লাফাতে লাফাতে তারা জেঠীর খাটিয়ার কাছে এসে গেল। বেড়ালের গোঁ গোঁ ঘাউ ঘাউ শব্দে জেঠীর দাঁত কপাটির হি হি হি শব্দ তলিয়ে গেল। আত্মরক্ষার জন্য জেঠীর হিংসাভাব জেগে উঠল। বুড়ো শরীরের সব ক্ষমতা সঞ্চয় করে তিনি জোরে বালিশটা ছুঁড়ে বেড়ালকে মারলেন, বেড়াল মারার প্রায়শ্চিত্তে সোনার বেড়াল দান নিয়মের কথাও এ সময় তাঁর মনে রইল না।

জেঠীর হাতে বালিশের মার খেয়ে বেড়ালের মল্লযুদ্ধে রীতিমত ব্যাঘাত হল, দুজনেই উঠানের দিকে এক ছুট দিলে। এবার জেঠীর ধড়ে প্রাণ এল। খাটিয়ার শিয়রে রাখা ছোট লাঠি নিয়ে তিনিও উঠানে বেড়ালের মতই লাফ দিলেন। এক বেড়াল সোজা উঠোন থেকে, অন্যটা ভয়ে দালানে এক চক্কর লাগিয়ে সিঁড়ির দিকে পালালো। জেঠী পেছনে পেছনে সিঁড়ির দিকে ছুটলেন। উত্তেজনায় ধপ ধপ করে তাড়াতাড়ি সব সিঁড়ি পেরিয়ে ছাদে পৌঁছে গেলেন। হাড় কাঁপুনে শীতের রাতে ছাদে আর কার্নিসে দুই বেড়ালের আর জেঠীর দাপাদাপির ছায়া পড়ছে। আশেপাশের ছাদ নিঝুম ভাবে এই ভুতুড়ে কাণ্ড দেখে মাঝরাতের স্বপ্নের ঘোরে যেন আঁতকে উঠছে, হঠাৎ শীতের ভোররাতে তাদের গায়ের লেপটা যেন কেউ টেনে নিয়েছে। বকবক করতে করতে জেঠী নীচে নেবে দরজায় শেকল তুলে দিলেন। বকতে বকতে হাঁপাতে হাঁপাতে যখন শোবার দালানে এলেন হঠাৎ পা গিলগিলে ঠাণ্ডা একটা জিনিসে পড়ল, জেঠীর পায়ের আঙুলে টান ধরল। ঘেন্নায় তাঁর নাক সিঁটকে গেল, মুখ দিয়ে বেরুলো 'উহু:

পোড়াকপাল আমার, বেড়ালগুলো আমার দম বার করে দিলে।' পায়ের পাতায় ভর দিতে দিতে কোন গতিকে খাটিয়ার কাছে রাখা হ্যারিকেন পর্যন্ত পৌঁছুলেন। হ্যারিকেন জ্বালিয়ে আবার তেমনি করেই ঘটনাস্থলে ফিরে এসে দেখলেন, এক সদ্যোজাত বেড়ালছানার লাশ পড়ে আছে কিন্তু তার ধড়ে মাথা নেই। বাড়ির চারিদিকে মোটা পেটের বেড়াল ঘুর ঘুর করার কথা জেঠীর মনে পড়ে গেল। 'মরুক গে যাক'।

ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচাতে বাঁচাতে কোন গতিকে জেঠী নালার কাছে গিয়ে পা ধুয়ে হ্যারিকেন নিয়ে ঠাকুরঘরে ঢুকলেন। উঁচুতে রাখা হাতপাখা নামিয়ে হাতে নিলেন। পাখার উপরে রেখে মরা বেড়ালের বাচ্চাকে তুলে ফেলার কথা ভাবার সঙ্গেই জেঠীর মনে এক হিংসুক কুটবুদ্ধি জেগে উঠল। তাড়াতাড়ি সিঁড়ির নীচের জায়গায় নিজের প্যাটরার মধ্যে থেকে টোটকার বাক্স বার করে তার ভেতর থেকে একটু সিঁদুর, একটু কালো তিল নিলেন, গুণতুকের জন্য আলাদা রাখা আটা নিয়ে প্রদীপ তৈরী করলেন। পাখার উপর বেড়ালের কাটামাথা সিঁদুর, তেল ছিটানো লাশ নিয়ে জেঠী তারার দোরগোড়ায় রেখে এলেন— রাঁঢ় খুব পেট ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, এবার টেরটি পাবেন।

জেঠী বেড়ালের বাচ্চার লাশের সদ্‌গতি করে এলেন। বাড়ির আবর্জনা ঘরের চৌকাঠের বাইরে যাওয়ার সঙ্গেই জেঠীর কাজও হাসিল হ'ল, এক ঢিলে জেঠী দুই পাখি মারলেন।

দালান ধুতে গিয়ে জেঠী দেখলেন যে বেড়ালের সদ্যোজাত তিনটি ছানা কুঁকড়ে পড়ে আছে। জেঠী রাগে ফেটে পড়লেন।

—আঃ মলো যা, সবাই মিলে আমাকেই জব্দ করছে, সাত

জন্মের শত্তুর সব, অলিগলি ঘুরে শেষকালে মরতে আমারই বাড়িতে বিয়ুতে এলো। আবাগী— গায়ে পোকা পড়ুক, শীতের রাত্তিরে ছুটিয়ে মারলে। হাতে ঝাঁটা নিয়ে খাটিয়ার কাছে জেঠী বসে পড়লেন। বেড়ালের মুণ্ডপাত করতে করতে তাদের বাড়ির বাইরে ফেলার উপায় জেঠী ভাবছিলেন। টুকরির কথা মনে এল কিন্তু চান করতেই হবে ভেবে ঝাঁটা একদিকে রেখে তিনটে ছানাকে জেঠী আঁচলে তুলে নিলেন। জলে ভেজা কনকনে ঠাণ্ডা হাত লাগতেই বেড়াল ছানারা শিউরে উঠল, জেঠী সেটা বেশ অনুভব করলেন। ঠাণ্ডায় জড়সড় বেড়ালছানাদের চোখ তখনো ফোটেনি, তারা জেঠীর পেটের কাছে নড়াচড়া করছে। তিনটি জীবন্ত প্রাণের ধুকধুকী জেঠী পেটের কাছে বেশ বুঝতে পারছিলেন। বাইরের বারান্দা পর্যন্ত যেতে যেতে হঠাৎ নিজের মরা মেয়ের কথা তাঁর মনে পড়ল।

জেঠীর পা যেন অসাড় হয়ে গেল, তারপর কোনমতে অনেক কষ্টে বন্ধ দরজা পর্যন্ত পাকে টেনে নিয়ে গেলেন। নিজের সেই বাচ্চা মেয়ের মুখ মনে আসতেই জেঠীর পা কিছুতেই আর দরজার চৌকাঠের বাইরে গেল না।

বেড়াল ছানারা জেঠীর কাছেই আশ্রয় পেল।

* * *

ভোর পাঁচটার সময় গোমতী গিয়ে পূজার্চনা করার জন্য যেই লালে দলালের বৌ দরজা খুললেন, সামনেই চৌকাঠের সামনে রাখা পুতুল দেখে ভয়ে, দু'পা পিছিয়ে পট্ করে বাতির সুইচ টিপে দিলেন। আলোতে পরিষ্কার নিজের পরিবারের নিকুচির ব্যবস্থা দেখে প্রায় ডুকরে চেঁচিয়ে উঠলেন— হায় রাক্ষুসী, আরে অ বহুআ— বহুআ।

—কী হয়েছে বৌ? ভেতর থেকে বৃদ্ধার ক্ষীণ স্বর ভেসে এল।

—আরে, চটপট এখানে এসো, সর্বনাশ হয়ে গেল, বলতে বলতে শ্রীমতী লালে নিজের বিরাট শরীর নিয়ে কোনমতে টাল সামলাতে সামলাতে ভাঙা গলায় বিড়বিড় করে উঠলেন, হে সত্যনারায়ণ স্বামী তোমার কথা শুনব— হে বজরঙবলী সওয়া পাঁচ টাকার প্রসাদ মানছি— হে মাতেশ্বরী আমাদের রক্ষা করো মা, হুঁ হুঁ হুঁ...

বহুআ শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে ভেতর থেকে এলেন —আরে কী হল বৌ?

—দেখো বহুআ, ভাল করে দেখো দিকিন, কোন নিপুত্তি রাঁঢ় আমাদের দরজায় পুতুল রেখে গেছে। হে ভগবান, যে আমাদের অমঙ্গল কামনা করেছে তাদের উপর আগে বাজ পড়ুক, ছেনাল, চোট্টী মাগী— নিশ্চয় ঐ নন্দর কাজ— জেঠীকে দিয়ে করিয়ে রেখে গেছে।

—হারামজাদীর গুষ্টি জ্বলেপুড়ে শেষ হবে, আবাগীর বেটি, সারা জীবন পরের মন্দই করে গেল। নাকে-মুখে কাপড় চাপা দিয়ে দরজার ফাঁক থেকে বহুআ গায়ের ঝাল ঝাড়লেন।

—এ বহুআ, একটু উঠিয়ে রাস্তার মোড়ে রেখে এসো-না, আমার গোমতী চানের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে যে।

বহুআ শীতে আগেই কাঁপছিলেন এবার ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে গেল। বললেন— মেথর এসেই উঠিয়ে নিয়ে যাবে বৌ, এর মধ্যে কোন গরু বাছুর এসে যদি খেয়ে যায় তাহলে পাপ আপনি বিদেয় হয়ে যাবে— বলতে বলতে ভেতরে চলে গেলেন।

লালে গিন্নীর কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল— বুড়ির রকম-সকম দেখো, আজ বাদে কাল চিতেয় উঠবে। বহুআ ভেতরের দরজার কাছে গুম হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। লালে গিন্নী শেষ বাক্যবাণ ছাড়লেন— আরে বহুআ, টোটকা গুণতুক বুড়ো মানুষদের ভয় পায়, কিছু হবে না, একটু ছুঁয়ে দেখ-না··· আমার চানের দেরী হয়ে যাচ্ছে যে।

বহুআ চুপ করে বাড়ির ভেতর দিকে পা বাড়াচ্ছেন দেখে লালে গিন্নী রাগে ফেটে পড়লেন— কী দিনকালই এল, চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে সব বসে আছে, কত ভালভাবে বললুম— বহুআ একটু উঠিয়ে রেখে এসো— বহুআ কানে তুলো গুঁজে চলে গেল— অ্যাঁ, আমি এদের জন্যে এত করে মরি, চার ডবল জিলিপি আনিয়ে এঁর নাতিপুতিকে দি— অ্যাঁ— দেখ দিকিন, সেই আমাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলে গেল। এদিকে আমার রোজের নিয়ম ভঙ্গ হয়ে যাবার জোগাড়।

ওপরতলা থেকে লেপের মধ্যে উসখুস করে লালে দলালের আওয়াজ শোনা গেল— আরে, কী হল?

সন্তো ওপরের জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে— মা, আমি আসব?

—তুমি আর এসে কী করবে মা? নন্দ রাক্ষুসীর কারসাজি, ভগবান করুন ওর মা-বাবার যেন রাত না পোহায়, সারা গুষ্টি যমের বাড়ি যাক্··· আহা, আমার চানের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে··· লোকে ভাড়াটে রাখে যে আপদ বিপদে কাজে লাগবে, বিপদে আপদে যদি এসেই না দাঁড়াল, তাহলে এমন ভাড়াটেয় আমার দরকার কি? বহুআ আজিই আমার ঘর খালি করে যাও— এমন ভাড়াটে আমার দরকার নেই।

লালে গিন্নীর বাজখাঁই গলা শুনে পাড়াপড়শীরা যে যার লেপের মধ্যে চমকে উঠল। দু'তলা থেকে কর্তা, তিনতলা থেকে ছেলে —কী হল—কী হল? চেঁচিয়ে চুপ হয়ে গেল, কেউ নীচে নামল না, লালে গিন্নী আবার জোরে পা ফেলতে ফেলতে সদর দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

ঘন কুয়াশায় ঢাকা গলিতে রোদ চিক চিক করছে। গলি বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। বন্ধ দরজা এক এক করে খুলছে। পাড়ার মেয়েরা লালে গিন্নীর রাগের কারণ জেনে নিয়ে বাসীমুখে পরনিন্দায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওপর থেকে লালে, সন্তো, শম্ভু সকলে নীচে নেমে এসেছে। ধীরে ধীরে বাড়ির পুরুষদের কানেও কথা পৌঁছে গেল। পৃথিবীর কেচ্ছা কাহিনী শুনতে আর বলতে সকলেই মগ্ন। গলির মোড়ে রামলোটন মহারাজের গলা শোনা গেল— চাই চা গরম— বিস্কুট চাই। সাধা গলায় শাহজীর ভজন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল— গুরু নে কহা থা মেরী ঝোলী ভরকে লানা রে। জেঠীর ছুঁ ছুঁ শব্দ গলিতে শোনা যাচ্ছে, কিন্তু এখনো মেথরানীর দেখা নেই। শম্ভু সামনের ভোলাকে, ভোলা সামনের বাড়ির সিরিকিশনকে ডেকে বলে দিল, যাতে গলিতে এলেই মেথরানী আগে লালে দলালের বাড়ি ঢোকে।

রাস্তা চলতি সকলের মধ্যে লালে দলালের দরজায় রাখা পুতুল নিয়ে কানাঘুষো চলছে। পুতুলের আশেপাশে দাঁড়িয়ে ভীড় এমনভাবে দু'টি পুতুলের দিকে তাকিয়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকাচ্ছে, যেন তারা দু'টি জলজ্যান্ত মরা মানুষের লাশ। নানা-রকম মুখরোচক গুজব রটানোর পর শেষকালে গলির মোড়ে মেথরানী দেখা দিল।

পুতুল সরতেই লালে গিন্নী ঝটাপট বালতিতে জল এনে দরজায় হুড়হুড় করে ঢেলে দিলেন, তারপর কামানের মুখ থেকে বারুদের মত ছিটকে চৌকাঠের বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

নন্দর বাবা ভভুতি নীচের কলে বসে হাতে মাটি করছে। মনিয়ার বড় ছেলে ঠাকুমার আঁচল ধরে জিলিপি খাবার জেদ ধরেছে। ঠাকুমা বার বার তাকে বোঝাচ্ছেন যে জ্বর গায়ে খেতে নেই, চুপচাপ দু'দণ্ড বিছানায় শুয়ে থাকলে জ্বর নিজেই পালিয়ে যাবে।

বড়বৌ ছোট মেয়েকে পায়ে বসিয়ে নাচাচ্ছে, মনিয়া লেপের ভেতর থেকে মেয়েকে কাতুকুতু দিয়ে হাসাচ্ছে। বাচ্চার নরম ঘাড় হাসিতে একদিকে কাত হয়ে যাচ্ছে। বাচ্চার পায়ে ঘুঙুর আর হাতে সোনার বালা হাসির সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠছে। বড়ও বাচ্চাকে আদর করছে।

ওদিকে শঙ্করের ঘরে তখনো সকাল হয় নি। নন্দর গোমতি থেকে চান করে ফেরার সময় হয়ে গিয়েছে। চাকর প্রায় অর্ধেকের চেয়ে বেশী উঠোন ঝাঁট দিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ ভভুতির ঘরের মাঝ দালানে দাঁড়িয়ে এটম বোমার মত লালে গিন্নী ফেটে পড়ে ভভুতির বাড়িকে নিমেষে হিরোসিমায় পরিণত করে দিলেন। কলের কাছে বসা ভভুতি গিন্নীকে লক্ষ্য করে চেঁচালেন— কই, তোমার রাক্ষুসী মেয়ে কই? তোমার আদরের মেয়ে?··· আমার বাড়িতে নিজের চৌষট্টি কলা দেখিয়ে এসেছে— যে আমার বাড়ির অমঙ্গল ভেবে গুণতুক করায় তার বংশে সাঁঝের বাতি দিতে কেউ থাকবে না বলে গেলুম কিন্তু··· হায় হায়, আমি আবার কার পাকা ধানে মই দিতে গেলাম যে

জেঠীকে দিয়ে গুণতুক করিয়ে আমারই দরজায় পুতুল রেখে এল। আসুক এদিকে চোর ছিনাল, নিজের চাকরের সঙ্গে ভাব করে নিজের বাড়ি চুরি করিয়ে এখন আমার ওপর গুণতুক করাচ্ছে, আমি কেন চুরির কোমরপাটা বেচবার জন্য রেখে নিলাম না। আ মলো যা, চুরির ধনে আমি কেন হাত দিতে যাব, আমাদের বাড়ির কায়দার খেলাপ হবে না? আমরা চুরির মাল রাখি না, যাদের বাড়ি চুরির রোজগারে চলে তাদেরই বাড়ির মেয়েরা বিয়ে-করা ভাতার ছেড়ে সব বাড়ি উঁকিঝুঁকি মারে, এখন শাক দিয়ে মাছ ঢাকার জন্য ভক্ত সেজেছেন— চোর কোথাকার।

লালে গিন্নীর এটম বোমার সামনে নন্দর মার মেশিনগানের ফিটফিটুনি শোনাই যাচ্ছে না। ভভুতি কানে তুলো দিয়ে চুপচাপ দাঁতন করে যাচ্ছে। মনিয়া, মনিয়ার বৌ তেতলা থেকে ঝুঁকে নীচে দেখছে। যুদ্ধের মাঠে নন্দ এসে যেই গাণ্ডীবে টঙ্কার দিলে, শঙ্কর আর শঙ্করের বউ ধুপধাপ করে নীচে নেমে এল। নন্দ মুখ খিস্তির ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ছে, মাঝে মাঝে মার মেশিনগানের ফিট-ফিটরি শোনা যাচ্ছে, কিন্তু লালে গিন্নীর নতুন বৈজ্ঞানিক যুগের এটম বোমার সামনে মা-মেয়ের গাণ্ডীব আর ব্রহ্মাস্ত্র খেলনার মতই ভেঙে গেল। নন্দ যতই আস্ফালন দেখাক মিথ্যার বালুতে বেশীক্ষণ টিকতে পারল না। তিনতলা থেকে মনিয়া লালে দলালকে বেইমান প্রমাণ করার জন্য নীচে নেমে এল। শঙ্কর পকেটে হাত দিয়ে বিনা পয়সার তামাশা দেখছে। বউ দু'জনে ছাদে দাঁড়িয়ে ফুসফুস করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে।

ছোট বললে— বাব্বাঃ সন্তোর মা ঝগড়া করতে মজবুত— ওর মুখের সামনে দাঁড়ায় কার বাপের সাধ্যি।

—যা বলেছ ভাই— তোমার আমার যদি কেউ অমঙ্গল কামনা করে রাগ হবে না? নন্দদি ভীষণ কুচুক্করে— সকলের সঙ্গে হিংসে ঝগড়া, মন্দ করা ছাড়া কাজ নেই···ষোলো কলা পূর্ণ, মিটমিটে ডান একটি। নীচে উঠানে ঝনঝনাৎ শব্দে পুজোর রেকাবি ফেলে দিয়ে, নন্দ শাপশাপান্ত আরম্ভ করে দিলে। মা-বাবার সামনে নিজের সাফাই গাইবার জন্যে গালাগালির সঙ্গে চোখের জল ফেলতে লাগল।

মিইয়ে আসা গলার আওয়াজে জোর দিতে গিয়ে লালে গিন্নীর গলায় বিষম লেগে গেল। রাগে ঘেন্নায় হাঁপাতে হাঁপাতে ভীম-কায় দেহ ফুলে ফুলে উঠছে।

তারা চোরের মত নিজের ছাদের কার্নিস টপকে ভভুতি স্যাকরার ছাদে পৌঁছে গেল। ছোট আর বড়কে হাতছানি দিয়ে ডাকলে। যুদ্ধের কারণ শুনে তারা বললে— আমার দরজার সামনেও রাখা ছিল। সকালে উঠে দুধ নেবার জন্য দরজা খুলতেই সামনে দেখে শিউরে উঠেছিলাম, গয়লা কত কী ভয় পাইয়ে গেল।

—ভয় পাওয়ার কথাই তো। তোমার আটমাস যাচ্ছে আর ···বড়র মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তারা বললে— উনি এসব কথা তুড়িতে উড়িয়ে দিলেন, সব সুপারস্টিশন, এসব কথায় কান দিতে নেই, আজকালকার দিনে···।

নীচের শোরগোল পুরোনো সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেল। ছোটবড় ছুটে এসে জানলার গরাদ ধরে নীচে ঝুঁকে পড়ল। তারা ছাদে বসে কৌতূহলভরা চাউনি নিয়ে বড় ছোটকে দেখছে।

নীচে লালে গিন্নী লাফিয়ে নন্দর গলা টিপে ধরলেন। নন্দ কাতরাতে কাতরাতে দুই হাত দিয়ে শ্রীমতী লালের চিবুক চেপে

পুরো শক্তি দিয়ে তাকে পেছনে ধাক্কা দেবার চেষ্টা করছে। ভভুতি, নন্দর মা, মনিয়া, শঙ্কর, সকলের সমবেত শব্দ বেশ হৈ-হল্লার মত শোনা যেতে লাগল। মনিয়া এগিয়ে নিজের বোনকে কোন গতিকে লালে গিন্নীর কবল থেকে ছাড়িয়ে নিলে। লালে গিন্নী যেই মনিয়ার দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকালেন, মনিয়া মারমুখো হয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। ভভুতি ছুটে গিয়ে ছেলের হাত ধরে পেছনে সরিয়ে লালে গিন্নীকে বললেন— আমরা তোমার সামনে জোড় হাত করছি— বহুজী— যা ভুলচুক হয়েছে ক্ষমা কর··· নন্দ, তুই এখান থেকে যা, মনিয়া, একে উপরে নিয়ে যা, হারামজাদী চুপ থাক না, বকবক করেই আছে সব সময়।

শনিগ্রহের মত দুষ্টগ্রহ লালে গিন্নীকে ভভুতির বাড়ি থেকে অনেক কষ্টে বিদায় করা হল।

ছোট বড় আবার রিপোর্টিংয়ের জন্য ছাদের ওপর উঠে গেল।

একথা-সেকথার পর ছোট বললে— আজ লালে গিন্নীর গলা-টিপুনিতে যদি নন্দর ইহলীলা শেষ হয়ে যেত, আমি খুব খুশী হতাম। আমার উনি নিজের বোন হলেও নন্দকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। আজকাল ভাসুরও রেগে থাকেন।

—কোমরের গয়না চুরির কী ব্যাপার? তারা জিজ্ঞাসা করলে।

—আমাদের বিয়ের আগে এ বাড়িতে বেশ বড় রকমের চুরি হয়েছিল। শাশুড়ী সমানেই বলেন যে চাকরে করেছিল। যাক্, এত বছর পরে জানা গেল যে নন্দরানী কারচুপি খেলেছিলেন।

—তাহলে চাকরের সঙ্গে কি···? তারার কৌতূহলভরা প্রশ্নের অর্থ বুঝে নিয়ে ছোট বললে— হবে হয়তো, যে নিজের ভাতার ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে চুরি করাতে পারে, সে সব পারে।

বড় মাথা নেড়ে দিয়ে বললে— আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। নন্দ পুরুষ মানুষ একদম সহ্য করতে পারে না— আমার স্কুলের এক টীচারের ঠিক এই স্বভাব ছিল।

নীচেকার দোতলায় আবার ঝগড়া ঝালিয়ে উঠেছে। দু'বছর আগের চুরির লোকসানের কথা ভেবে নন্দর মার মনে মায়ের মমতার চেয়ে লোকসানের আঁকড়া সুঁচের মত বেশী বিঁধতে লাগল। ওদিকে মনিয়া রাগে ফেটে পড়ল, একে লোকসান তার ওপর অপমানের জ্বালা। নন্দ একাই একশো হয়ে সকলের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মত উঠোনে নেচে বেড়াচ্ছে।

মিস্টার বর্মাকে তাঁর বাড়ির ছাদে দেখা গেল। বড় বৌ তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানলে। ছোট বৌ ছাদ থেকে সজ্জনের ঘরের দিকে ইশারা করে বললে— দিদি, দিদি, ওর বাড়িতেও পুতুল রাখা।

বড় চিবুকে হাত রেখে বললে— হায়, হায়, জেঠী রাক্ষুসী সকলকে খাবে, কাউকে ছাড়বে না।

পাঁচ

সামনের অশ্বত্থ গাছটা অনেক কাটা ঘুড়ি, মাকড়সার জাল, পাখির বাসা, কাঠবেড়ালির আর পাখিদের খাওয়া দানার ভুসিতে ভরা, কত বছর থেকে এই পাড়ার লোকদের সুখ-দুঃখের সাক্ষী

হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাড়ার বৃদ্ধরা ছোটবেলায় একে 'গঙ্গে ভুরে ভাঁড়ের অশ্বত্থ' নামেই জানত, কিন্তু যে দেয়াল কোনকালে গঙ্গে ভুরের মালিকানার সীমানায় ছিল সেখানে আজ ছেদালাল ইন্সিওরেন্স এজেন্টের আধিপত্য হয়ে গেছে। মিউনিসিপ্যালিটি রেজিস্টারে বাড়ির নম্বর ফোরটোয়েন্টি, ছেদালাল বাবুর আসল খ্যাতিটা যেন নম্বর প্লেটের সঙ্গেই চকচক করছে। এই গাছের তিনদিকে রাজাসাহেবের পূর্বপুরুষেরা পাকা চবুতরা তৈরী করিয়ে পাথরের মণ্ডপে মহাবীরের মূর্তি স্থাপন করিয়েছিলেন। উৎসাহী ভক্তের দল মহাবীরকে সিন্দুরী রঙের পোষাকে ও সোনালী-রুপোলী রাঙতা দিয়ে এমন সুন্দর সাজিয়েছে— যে গলিতে ঢুকলেই, ভক্তিতে গদগদ ভক্তের দল সেদিকে একবার তাকালে আর চোখ ফেরাতে পারে না। চবুতরায় বসা ভক্তের দল সদাই দিশাহারাদের দিশা দেখানোর পুণ্য কাজে ব্যস্ত।

মণ্ডপের ডান দিকের বড় গলির ভেতরের মোড়ের মুখে এই চবুতরা ধীরে ধীরে পাড়ার আড্ডার জায়গা হয়ে গেছে। তার সামনে একটু উঁচু জায়গা থাকায় সেখানে বেশ রোদ আসে। পাড়ার দু-একজন হুঁকো নিয়ে, কেউ নিমের দাঁতন, কেউ খবরের কাগজ, কেউ তরকারী ফলের ঝুড়ি, কুলপিমালাই, জিলিপি, তিলের পাপড়ি, রেওড়ি, তিলের লাড্ডু, চিনেবাদামের বরফি নিয়ে প্রায়ই চবুতরার ওপরে এসে বসে।

মণ্ডপের বাঁ দিকে, সামনে গলিতে ঢোকার মুখেই একটু ছোট ছাউনি দেয়া জায়গা আর তার পাশেই গোয়ালঘরের ছোট ফাটকটি দূর থেকে যেন বসা গালে কোটরগত দুটি চোখের মত চকচক করছে। চবুতরার এ দিকটা বড় একটা কেউ আসে না তাই

মঙ্গলবার ছাড়া সপ্তাহের বাকী দিনে এ দিকটা ঝিমিয়ে থাকে। মঙ্গলবারে বসন্ত মালী ফুলমালা, বাতাসা, বেসনের নাড়ু আর ছোট ছোট প্যাঁড়া নিয়ে এসে বসে। ক'বছর থেকে এক বুড়ো সিন্ধি নিজে ছোট টিনের প্যাঁটরা খুলে বসা আরম্ভ করেছে। অশ্বথ গাছের নীচে বিরাজমান দেড় ফুটিয়া গদা-পর্বত-ধারী বজরঙবলীর চারিদিকে এত নাম যে কয়েকবার প্রায় বক্স অফিস 'হিট' হতে হতে বেঁচে গেছেন।

সকাল সাড়ে নটার রোদ চবুতরা থেকে নেমে সারা গলিটায় ছড়িয়ে পড়েছে। হনুমানজীর ঝকঝকে মণ্ডপের কিছু দূরেই বেশ চড়চড়ে রোদ এসে গেছে। তুলোর জামার ওপরে কোট পরে, মোটা সোনালী ফ্রেমের চশমা লাগিয়ে, নীলার রুপোর আংটি পরে, গলায় মাফলর আর পায়ে গরম মোজা পরে, নিজেকে রীতিমত শীত প্রুফ করে চবুতরায় মাতুরের উপর বসে লালা মুকুন্দীমল হুকোতে গুড় গুড় টান দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে কাশির দমকও সামলে নিচ্ছেন। চবুতরায় ঠেস দিয়ে চেয়ারে বসে অফিসের বড়বাবু রামস্বরূপ খবরের কাগজ দেখায় ব্যস্ত। মহাবীরজীর মন্দিরের পাশের উঁচু ঢিবিতে ঠেসান দিয়ে ভগবানদীন মাখনওলা বসে, মুকুন্দীমলের বাড়ির থালায় মাখনের পোয়া, পোয়া বাটি ওজন করে রেখে চলেছে। সাত বাটি মাখন রেখে দেবার পর আট নম্বরের বাটি দাঁড়িপাল্লায় রেখে দাঁড়ি দেখছে।

লালা মুকুন্দীমলের নজর সমানে দাঁড়িপাল্লার দিকে রয়েছে। যেই ভগবানদীন এক চামচ মাখন বাটি থেকে তুলেছে, মুকুন্দীমল হৈ হৈ করে উঠলেন— ধ্যাত্, শালা ব্যাঞ্চো, এক এক চামচ মাখন তুলে নিয়ে মুনাফা করার মতলব ভাঁজছে, ব্যাটা ফের বাটিতে রাখ।

মুচকি হেসে মাখন আবার বাটিতে রাখতে রাখতে ভগবানদীন বললে— আরে, লালা, এক এক চামচ করেই মুনাফা হয়, বড় মুনাফা বড় লোকেরাই…।

—দেখ, দেখ, ব্যাটাচ্ছেলে আবার মুখ চালিয়ে যাচ্ছে। গান্ধীজী এমন স্বাধীনতা দিইয়ে গেছেন বড়-ছোট ভেদাভেদ আর রইল না, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা বলছে— আরে মুনাফা গ্রাহককে খুশী করলে তবে হয়।

লালে দলাল গরম কাপড় গায়ে দিয়ে ভেতরের গলি দিয়ে এলেন। সামনেই তিন মূর্তির সঙ্গে জোড়হাত করে জয় রামজী সম্ভাষণ হ'ল। বাবু গুলাবচন্দ বললেন— কি খবর? তোমার ওখানে আজ সকাল সকাল কী হয়েছিল?

—হাঁ, শুনলাম জেঠী তোমার ওখানে গুণতুক করে রেখে গেছেন? গুলাবচন্দের প্রশ্নের সুরে নিজের সুর মেলালেন বাবু রামস্বরূপ।

—আরে বাবা, পাড়ার নোংরামির কথা কত আর বলব। হাজার বার বাড়ির লোকেদের বারণ করেছি যে ছোটলোকদের সঙ্গে মিশবে না, চার পয়সা কামিয়ে নিলেই কেউ হঠাৎ ভদ্রলোক হয়ে যায় না লালা মুকুন্দীমল… ঠিক বলেছি কি না?

— হ্যাঁ ভাই বাবু গুলাবচন্দ। কিছু শুনেছ? হঠাৎ বাবু ছেদালাল বাইরে থেকে আসতে আসতে বললেন।

কয়েক জোড়া চোখ একসঙ্গে বাবু ছেদালালের দিকে ঘুরে গেল। বাবু ছেদালাল, বাবু গুলাবচন্দের চেয়ারের পিঠে হাত রেখে বললেন— আজ সকালে কোম্পানী বাগানে যে ছেলের লাশ পাওয়া গিয়েছে…

—লাশ? বাবু ছেদালাল এক নজরে সকলের প্রশ্নভরা চাউনির

দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ! আপনারা জানেন না? সকাল সকাল বেশ ভীড় হয়ে গিয়েছিল। সদ্যোজাত শিশুর লাশ ছিল মশাই। জগদম্বা সহায় মাস্টার আর তার ভাইপোর বিধবা বৌটা ধরা পড়েছে।

—জগদম্বা সহায়, এই আমাদের··· ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই যে ভেঁরোজী গলিতে থাকে। যার ছেলে অর্ধেক পাগল, মেয়ে কম্যুনিস্ট—সেই শালা ভাইপো বৌয়ের সঙ্গে ···ছ্যা-ছ্যা, হদ্দ করে দিলে মশাই। বাবু গুলাবচন্দের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে বাবু ছেদালাল চবুতরার উপরে বসে পড়লেন। বাবু গুলাবচন্দ তাঁর মুখোমুখি বসার জন্য তাড়াতাড়ি নিজের চেয়ারটি ঘুরিয়ে নিলেন।

লালা মুকুন্দীমল হাই তুলে, তুড়ি বাজিয়ে বললেন—আরে, হবে মাথা আর মুণ্ডু, ধর্মকর্ম দুনিয়াতে কিছু রইল না।

—কিন্তু ভাই আমি বলব যে বেশ তাড়াতাড়ি শালাদের ধরে ফেলেছে, কাল সকালে ঘটনা ঘটেছে আর···

—আরে, বাবু শালিগরাম ধরিয়েছে। ছেদালাল জানালেন।

—আচ্ছা! বেলুনের মত গোল মুখ ফুলিয়ে বাবু রামস্বরূপ ঘাড় নাড়লেন—এ ঐ নেতা শালার কারসাজি, নিজে ব্যাটা বেইমান এখন সাধু সাজছে—দু'বার রেফিউজিদের হাতে, মেয়ে-ঘটিত ব্যাপার নিয়ে বেদম পেটানি খেয়েছে···

—হ্যাঁ, তারপর কি হল? জগদম্বা সহায় আর তার ভাইপো বৌয়ের? বাবু গুলাবচন্দ জিজ্ঞেস করলেন।

—পুলিস ডাক্তার নিয়ে এসেছে। ভেঁরোজী গলিতে পা ফেলার জায়গা নেই। ছেদালাল খবর দিলেন।

মাথায় গোলটুপি, চওড়া কপালে চন্দনের ফোঁটা, রুপোর ফ্রেমে বাঁধানো নীল কাঁচের চশমা, মুখে মায়ের দয়ার হাল্‌কা দাগ, বড় বড় গোঁফ, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ চেহারা, লম্বা চওড়া শরীরে উলের চোগা, জরী লাগানো গায়ের কাপড়, চকচকে পালিশ করা পাম্পশু, মুক্তো মুগার জড়োয়া আংটি, হাতের রুপোর বাঁট বাঁধানো ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী গলিতে ঢুকলেন।

—আসুন মহারাজজী, নমস্কার। লালা মুকুন্দীমল দূর থেকেই সাদর সম্ভাষণ জানালেন। সকলেই একসঙ্গে হাত জোড় করলেন।

—সুখে থাকো। শাস্ত্রীজী হাঁটতে হাঁটতে প্রতি অভিবাদন জানিয়ে বললেন।

—বসুন মহারাজ, রাজাসায়েবের বাড়ির পাঠ শেষ হয়ে গেল?

—হ্যাঁ।

—এখন ওঁর নাতির শরীর কেমন? কাল অবস্থা বেশ খারাপ ছিল।

—না তেমন কিছু নয়, তবে হ্যাঁ, জ্বর রয়েছে। ব'লে শাস্ত্রীজী নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। লালা মুকুন্দীমল আবার প্রশ্ন করলেন— আর রাজাসাহেব কোন দলে? কংগ্রেস না জনসংঘ?

শাস্ত্রীজী আবার ফিরে আসতে আসতে বললেন— কথাটা এই মুকুন্দীমল, ধনী আর বেশ্যা দুজনেই নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে পেছপা হয় না।

—আরে, বসুন বসুন— লালা মুকুন্দীমল বেশ জোর দিয়ে কথাটা বলেই নিজের বাড়ির দিকে চেয়ে চেঁচালেন, ভগোতি, আরে ও ভগোতিয়া, পান নিয়ে আয় আট-দশটা, হাত ধুয়ে কিন্তু··· আর কারুর হাতে তাড়াতাড়ি এক ছিলিম তামাক পাঠিয়ে দে।

তারপর চেয়ারে বসে শাস্ত্রীজীকে বললেন— লাখ কথার এক কথা বলেছেন শাস্ত্রীজী— কিন্তু এক ধনী কেন, সকলেই আজকাল নিজের স্বার্থপূরণে ব্যস্ত।

—জ্ঞানী আর যোগীরাই প্রকৃত স্বার্থরক্ষা করেন আর বাদ বাকী সবাই স্বার্থের নামে অনর্থ বাধায়···আর···

—নমস্তে, বাবু সায়েব। আসুন, আসুন— বাবু রামস্বরূপ সজ্জনকে ডাক দিলেন।

এদের বেশীর ভাগ লোকের সঙ্গেই সজ্জনের মুখচেনা আছে কিন্তু ভালভাবে কাউকেই চেনে না। বাবু রামস্বরূপের ডাক শুনে সে একটু হকচকিয়ে গেল বটে কিন্তু মনে মনে বেশ খুশী হল। দুইহাত জোড় করে বিনয়ের অবতার হয়ে এগিয়ে গেল। সকলে তার দিকে চেয়ে দেখলেন। বাবু রামস্বরূপ সাদর সম্ভাষণ জানানো ভঙ্গিতে বললেন— আজকে কাগজে আপনার বিষয়ে প্রবন্ধ বেরিয়েছে।

বাবু রামস্বরূপের ডাক শুনে সজ্জন মনে মনে ভেবেছিল যে কাল হয়তো দ্বারকাদাস তার বিষয় কিছু বলে গেছেন। কিন্তু যখন দেখল যে কাগজে ছাপা তার কীর্তির জন্য সকলে তাকে খাতির করছে, সজ্জন মনে মনে বেশ খুশী হলেও চেহারায় যথেষ্ট বিনয়ের ভাব এনে বললে— আজ্ঞে, সেটা তো···

লালে কৌতূহল ভরা নজরে, বাবু গুলাবচন্দ ভদ্রতার মূর্তি হয়ে আর বাবু ছেদালাল বেশ বাঁকা চোখে তার দিকে তাকাতে লাগল। নীল চশমার আড়ালে শাস্ত্রীজীর দৃষ্টি এক লহমার জন্য সজ্জনের মুখের ভূগোল আঁচ করে আবার নিজের গম্ভীর চেহারায় লীন হয়ে গেল। লালা মুকুন্দীমলের মোটা চশমা তাঁর গোল চেহারায় বেশ এঁটে বসেছে। রুপোর রেকাবিতে পান এল।

বাবু রামস্বরূপ-রেকাবিতে এক নজর বুলিয়ে নিয়ে বললেন—শাস্ত্রীজী, ইনি আমাদের ভারতের মস্ত একজন শিল্পী, সজ্জন বর্মা, আজকাল আমাদের পাড়াতেই···

অনেকক্ষণ থেকে কৌতূহল চেপে থাকা মুকুন্দীমলের ঘাড় স্প্রিংয়ের মত উছলে উঠল— আচ্ছা, তুমিই কন্নোমলের নাতি? কাল বিকেলে জানকীসরণ তোমারই কথা বলছিলেন বটে।

কন্নোমলের নামে শাস্ত্রীজীর ধ্যান ভঙ্গ হল, নীল চশমার মধ্যে দিয়ে সজ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, আরে— আমাদের দুই বাড়ির মধ্যে এককালে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বড় কম বয়সে মারা গেল বেচারা। আমার হিসেবে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে গত হয়েছে, কি বল সজ্জনজী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, উন্নিশো দুইয়ে মারা গেছেন। সজ্জন বলল।

মুকুন্দীমল বললেন— বড় কাঁচা বয়সে চলে গেল বেচারা—ছেলেটিও বাপের মত কম আয়ু পেল— মদেতেই সব শেষ হয়ে গেল। স্বর্গগত পিতার বিষয় লজ্জাজনক উক্তি শুনে সজ্জনের মাথা হেঁট হয়ে গেল, সে মাথাটা নীচু করেই রইল।

শাস্ত্রীজী বললেন— কন্নোমল স্কুলে আমার সঙ্গে পড়ত। আমার থেকে বছর দেড়েক বড় ছিল। ওর বাবা তখন এই 'চৌকে' থাকতেন। সেসময় তাঁর দবদবা নবাব-বাদশাহের চেয়ে কিছু কম ছিল না।

—হ্যাঁ জানি, খুব হোমড়া চোমড়া গোছের লোক ছিলেন। আমাদের এখানে উনিই প্রথম বিলেত বেড়াতে যান। ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করেন নি, ব্যাঙ্কো। সাহনজফের ওদিকটায় বিরাট বাড়ি তৈরী করিয়েছিলেন। বড় বড় জজ-হাকিম তাঁর বাড়ি যেতেন, লাটের ওখানে তাঁর বিশেষ খাতির ছিল, নামডাক ছিল খুব।

বাবু রামস্বরূপ দেখলেন বাঃ মজা তো বেশ। তিনি ডেকে এনে বসালেন সজ্জনকে আর এই দুই বুড়োতে মিলে তার সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিচ্ছে, টপ করে তাই বলে উঠলেন— নামডাকে ইনি পূর্বপুরুষদের ছাড়িয়ে গেছেন, এঁর বিষয় কাগজে আর্টিকেল বেরিয়েছে, সেদিন 'ইলস্ট্রেটেড উইক্‌লীতে' এঁর ছবি দেখলাম।

লালে বললেন— সত্যি? তা মশাই, আপনি ফোটোগ্রাফার না ছবি আঁকেন? একজন শিল্পীর বিষয় এ ধরনের বেখাপ্পা প্রশ্ন শুনে সজ্জন হকচকিয়ে গেল।

লালা মুকুন্দীমলের হুকোর তাজা ছিলিম এল। লালাজী চাকরকে হুকোটা সরিয়ে নলটা একটু নীচে নামিয়ে দিতে বললেন। এই গণ্ডগোলের মধ্যে সজ্জন নিজের গলার স্বরকে রীতিমত মোলায়েম করে নিয়ে বললে— আজ্ঞে, আমি তুলি দিয়ে ছবি আঁকি।

লালা মুকুন্দীমল তাজা ছিলিমে টান দিতে গিয়ে অনেক কষ্টে তার লোভ সামলে মুখটা উঁচু করে বললেন— আরে তুলির ছবি তৈরী করত আমাদের এখানে পণ্ডিত রামনাথ গোঁসাই, সোঁধী টোলাওয়াল, হাতীর দাঁতের উপর এমন সব ছবি তৈরী করেছিল, আজকাল সে-সব কে পারবে?

লালার হুকো গুড় গুড় করছে। এই সমাজের সঙ্গে এতটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট ভেবে সজ্জন যাবার জন্য উসখুস করে উঠল। তার মনে হল এদের মধ্যে কেউ তার আপন নয় সকলেই পর, দম যেন বন্ধ হয়ে এল। কোনমতে হাত জোড় করে সজ্জন বললে— আজ তাহলে উঠি, আবার কোনদিন আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। সকলকে নমস্কার জানিয়ে সজ্জন এগিয়ে গেল। শাস্ত্রীজী

বললেন— হ্যাঁ, নিশ্চয় এসো, আমি খুবই আনন্দিত হব— দীর্ঘায়ু হও, ভগবান করুন দশের মধ্যে এক হও।

শাস্ত্রীজীর গম্ভীর আওয়াজে সজ্জন যেন আপন জনের ছোঁয়া পেলে। যেতে যেতে হঠাৎ সে নীচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে শাস্ত্রীজীকে টিপ করে প্রণামটা করে নিলে। আজ পর্যন্ত মা ছাড়া আর কাউকে সে প্রণাম করে নি।

শাস্ত্রীজীর নীল চশমা আঁটা দৃষ্টি একবার সজ্জনের ঘরের দিকে গেল তারপর চবুতরায় বসা সকলের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— এই ছেলেটি এখানে কী করতে আসে?

বাবু গুলাবচন্দ বললেন— জানি না। যখন পাড়ার লোকে এর বিরুদ্ধে কাগজে ছাপিয়েছিল তখন ছেলেটির স্টেটমেণ্ট পড়েছিলুম যে গলিঘুঁজির জীবনকে ক্যানভাসে চিত্রিত করার জন্য এখানে সে এসেছে। এখানকার ভারতীয় রীতিনীতি নিজের চোখে দেখতে চায়। ছেলেটি জেঠীর ভাড়াটে।

লালে জোরে হেসে উঠলেন—তা পাড়ার জেঠীর ছবি তৈরী করেছে?

বাবু ছেদালাল মুখ টিপে হেসে বললেন— যেদিন জেঠীর ছবি তৈরী করতে পারবে সেদিন পাড়ার তরফ থেকে আমি সোনার মেডেল প্রেজেণ্ট করব।

—আরে চললে কোথায়? তোমার জন্যে শাস্ত্রীজীকে ধরে করে বসালুম আর তুমিই পালাচ্ছ? বসো, বসো, হ্যাঁ ভোট কাকে দেবে ঠিক করেছ?

ইলেক্‌শনের আলোচনা আরম্ভ হ'ল। সজ্জন হাতে পুতুলের থালা নিয়ে চবুতরার কাছ দিয়ে যাচ্ছে দেখে লালে দলাল ঘাড় উঁচু

করে বললেন— আচ্ছা, আপনার বাড়িও পুতুল সাজিয়ে রেখে গেছে নাকি মশাই? আমি ভাবলুম বুঝি আমার বাড়িতেই…

সকলেই সজ্জনের দিকে তাকালে। লালা মুকুন্দীমল হেসে বললেন— কি ব্যাপার ভাই? বাড়িউলির তুকতাক নাকি? কোথায় চলেছ?

মুখ টিপে হেসে সজ্জন বললে— আর বলেন কেন? আমি এখান থেকে গিয়ে দেখি কাকেদের আসর জমেছে। আশেপাশের ভাড়াটে বাড়ির মেয়েরা নালিশ করল যে কাকে চারিদিকে এঁটো-কাঁটা ছড়িয়ে দিয়েছে। তারা সকলেই ভয়ে সিঁটিয়ে আছে দেখে ভাবলুম যে এটাকে ফেলেই আসি।

—আপনি নাস্তিক না কি মশাই? আপনার ভয়ডর বলে কিছু নেই? এই সকাল সকাল…

—এই ভারতীয় ঐতিহ্যই না আপনি রক্ষা করতে চান— বাবু ছেদালালজী?

বাবু গুলাবচন্দের কথা শুনে রামস্বরূপ হি হি করে হেসে বাবু ছেদালালের দিকে এইবার-ধরা-পড়েছে ভাবে তাকাতে লাগলেন। আধখাওয়া পুতুলের দিকে এক নজর তাকিয়ে সজ্জন মৃদু হাসল। বাবু ছেদালাল জোর গলায় বললেন— আমরা এ কথা কখনো বলি না যে আমাদের ধর্মের ভেতরে যে অধর্মের বীজ ঢুকে গেছে তাকে আমরা শেকড় থেকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করব না, কিন্তু আমাদের আসল ধর্ম রক্ষা করা আমাদের পরম কর্তব্য।

—ঠিক কথা বলছ— লালে দলালের মুখ ধর্মের কথায় আবেগে লাল হয়ে উঠল— আমি ভাই শাস্তরের কথা বলতে পারি ধর্মরক্ষা করা নিশ্চয় উচিত। এই বাবুসায়েবের লম্বা লম্বা কথার

ভোজবাজিতে তো আমাদের মনে নতুন সাহস জন্মাবে না, যে ফস্ করে পুতুলের থালা উঠিয়ে ফেলে দেব।

—শুনলে বাবু ছেদালালজী? বাবু গুলাবচন্দ আবার টিপ্পনী কাটলেন— আমাদের সৌভাগ্য যে শাস্ত্রীজী আজ আমাদের সঙ্গে বসে আছেন—আপনি বলুন মহারাজ কোন শাস্ত্রে লেখা আছে?

শাস্ত্রীজী ঘন গোঁফের ফাঁকে হেসে নিয়ে বললেন— লালে শাস্ত্রের কথা তো বলছে না, ও বলছে শাস আর তড়ের কথা তাই নয়?

সকলে হো হো করে হেসে উঠল। লালা মুকুন্দীমল্ল পান-দোক্তা খাওয়া ছোপমারা দাঁতের ফাঁকে হেসে ভুঁড়িটি দুলিয়ে বললেন, বাহঃ মহারাজ কী মার্কামারা কথাই বলেছেন মাইরি। হাঃ হাঃ হাঃ।

লালে দলাল হকচকিয়ে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। বাবু ছেদালাল দুই হাঁটুকে হাতের জালের মধ্যে জড়িয়ে বসলেন, তাঁর চোখের মধ্যে জয়-পরাজয়ের ভাবটা মিনিটে মিনিটে ঝিলিক মারছে। কিন্তু মুখে কোন কথা নেই। বাবু গুলাবচন্দ আর বাবু রামস্বরূপ নিজেদের দল ভারী দেখে মনে মনে খুশী না হয়ে থাকতে পারলেন না। শাস্ত্রীজী দলালের দিকে চেয়ে বললেন— আমি তোমার উচ্চারণে দোষের জন্য ঠাট্টা করছি না ভাই, কিছু মনে কোরো না, আমি কিন্তু নিজের কথার মধ্যেই তোমার কথার অর্থ বার করার চেষ্টা করছি। এ দেশে এক ধর্ম তো নয়, যত বাড়ি তত ধর্ম— বাড়ি-বাড়ি ধর্ম, এমনকি শাশুড়ী-বৌয়ের ধর্মও আলাদা আজকাল। আবার শাশুড়ীর কানে বৌ গুরুমন্ত্র দিচ্ছে। বৌয়ের ধর্মে দীক্ষিতা শাশুড়ীর দল বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। সকলেই শাস্ত্রীজীর মুখে মজার উক্তি শুনে না হেসে পারলে না, কিন্তু শাস্ত্রীজীর কথা

বলার গম্ভীর ভঙ্গীতে ব্যাঘাত ঘটিয়ে হো হো করে হেসে ওঠার সাহস কারুর নেই। শাস্ত্রীজী বলে চললেন— বাকী রইল ওড় (আস্তানা)। তা হিন্দু আর খিস্টানদের প্রত্যেক দেবদেবীরই নিজস্ব আস্তানা আছে। মুসলমানদের পীর ইলাহী ওঝা মোল্লা সব যে যার নিজের আস্তানা তৈরী করে বসে আছে। এক বইতে পড়ছিলাম যে বম্বেতে খিস্টানদের মাউণ্ট মেরী নামে এক দেবী আছেন, হিন্দুরা তাকে মৌতমাবলী বলে পুজো করে থাকে। মুসলমান শাসনকালে আমাদের উপনিষদের মত আল্লোপনিষদ নামে নতুন রচনা হয়েছিল। আমাদের দেশের জাতুমন্তরে মুসলমানী প্রভাব দেখা যায়। একসময় এক চেতরাসী সম্প্রদায় দেখা দিল তারা অদ্ভূত এক নতুন মতের প্রচার করল যে চতুর্মুখী ব্রহ্মাকে বাদ দিয়ে তার জায়গায় একমুখী আল্লা আর ত্রিমুখী দত্তাত্রয় এই দুজনকে বসানো হোক। এভাবে তারা এক নতুন চতুর্মুখী সৃষ্টি-কর্তার সৃষ্টি করলে। পরমেশ্বর শব্দকে বিষ্ণুর সমকক্ষ মেনে নিলে। শিব খোদার হাতে সংহার করার কাজ ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধি ঘোঁটার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

সকলে হেসে উঠল। বেদম হাসির ধাক্কা সামলাতে গিয়ে সজ্জন পুতুলের রেকাবি চবুতরায় রেখে দিলে। শাস্ত্রীজীর কথা শুনে সে বেশ মজা পেয়েছে। বাবু ছেদালালও প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন। বাবু গুলাবচন্দ আর বাবু রামস্বরূপ এত জোরে খিল খিল করে হেসে উঠলেন যেন খেলার মাঠে জিতে এসেছেন। লালে দলালের মাথায় কিছুই ঢুকল না, হাবাগোবার মত মুখ করে রইলেন। লালা মুকুন্দীমল কিছু ঠিকমত বুঝতে না পারায় বোকার মত কাষ্ঠহাসি হেসে সকলের হাসির সুরে সুর

মেলালেন। কষ্ট করে হাসলেন বটে কিন্তু লালা মুকুন্দীমল গায়ের ঝাল না ঝেড়ে পারলেন না— হিন্দু ধর্মের পতনের কারণ আপনারাই, আপনাদের হাতেই এর সর্বনাশ হয়েছে, মহারাজ। যেমন ব্রাহ্মণেরা চালালো ধর্ম সেইরকম চলল— সমাজ শালা কী করবে?

লালে দলালের চোখ রেকাবির দিকে গেল, তাড়াতাড়ি বললেন— বাবুমশাই মাপ করবেন— এটা মহাবীরের স্থান···

—আজ্ঞে মাপ করবেন, আমার ভুল হয়ে গেছে। বলতে বলতে রেকাবি উঠিয়ে সজ্জন বললে— আমি এটাকে চৌমাথার মোড়ে রেখে আসব, সেখানে কারুর আপত্তি হবে না নিশ্চয়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ব্যস্, এই একটু আগে গেলেই কলের কাছে চৌমাথা— ব্যস! ঐখানে রেখে দিয়ে হাত ধুয়ে ফিরবেন।

কাকে ঠোকরানো ভাঙাচোরা পুতুল নিয়ে হাঁটতে সজ্জনের ভীষণ লজ্জা করছে। নিজেকে যেন কিম্ভূতকিমাকার লাগছে। গলিতে যেতে যেতে বাড়ির দরজা-জানলায় দাঁড়ানো জোড়া জোড়া সব চোখ যেন তাকেই দেখছে মনে হচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল এখানেও তার কাছে একটা চাকর থাকা দরকার। পাড়ার লোকেদের ওর প্রতি ব্যবহারের মাথামুণ্ডু সে কিছুই বুঝতে পারছে না। কখনো মনে হয় এরা বড় আপনার আর কখনো ঠিক তার বিপরীত··· এই দেশ আর সমাজ চিড়িয়াখানার মতই, যাকে দূর থেকে দেখে আনন্দ পাওয়া যায়, বেশী কাছে গেলে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া যায় না। এ কাজ একদিনে হবার নয়, এর জন্যে রীতিমত সময় চাই। আমাদের কুসংস্কারের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। আমাদের সমাজকে ভুল পথ থেকে সরিয়ে সোজা পথে আনতে হবে। শাস্ত্রীজী ঠিক বলেছেন তাই বোধহয় সে তাকে নিজের

অজান্তেই প্রণাম করে ফেলেছিল।... হঠাৎ সে এত ভাবুক হয়ে উঠেছে কেন? যাক শাস্ত্রীজীর সেটা প্রাপ্য, আবার তাঁর সঙ্গে সে দেখা করবে। মহিপালের ধারণা ভুল, ধীরে ধীরে সে সকলের সঙ্গে মিলে মিশে নিশ্চয় জমিয়ে নিতে পারবে।

এদিক সেদিক দেখতে দেখতে ভাবতে ভাবতে সজ্জন চৌমাথার দিকে হাঁটতে লাগল।

ছয়

ইলেকশনে নির্বাচনপ্রার্থীর নাম, দলের চিহ্ন আর শ্লোগান, মা বোন তুলে গালাগালি, অমুকের সঙ্গে তমুককে জড়িয়ে কুৎসা কাহিনী, অজীমুশানের দঙ্গল, বিড়ি, জাতুলোশন, অখণ্ড সংকীর্তন, সিনেমা, গরমী সুজাকয়ের ওষুধের পোস্টার, পানের পিক— জনজীবনের বিভিন্ন ভাবনা দিয়ে দেয়ালের গায়ে লেখা খবরের কাগজের লাইন শেষ হল। হাতে রেকাবি নিয়ে সজ্জন কলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

সামনের বাজারের গলির দিক দিয়ে চারজন পাহারাওয়ালা বেশ স্ফূর্তির সঙ্গে এদিকেই আসছে, তাদের পেছনে ছোটখাটো ভিড়ও আছে। পুলিস দেখে দেখে চোখ সওয়া হয়ে গেছে। ডিউটিতে চৌমাথার মোড়ে দাঁড়ানো পুলিস, কোতোয়ালি, থানাতে, মাঠে কুচকাওয়াজ করতে করতে, বড়লোকের বাড়ির বিয়েতে ব্যাণ্ড বাজনা

বাজাতে, এক্কা-টাঙ্গা-রিক্সাওয়ালাদের কাছে সকলের চোখ বাঁচিয়ে 'কিছু হাতের তেলোয় রাখো' ইশারা করতে প্রায়ই এদের দেখা যায়। কিন্তু গলিতে একসঙ্গে চারজনের গপে হাঁটা মানে কোন অশুভ সংকেত। সমাজে মানুষ তার তীক্ষ্ণ ন্যায়বুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজেদের আশেপাশে ন্যায়রক্ষক এই পুলিসবাহিনীর সৃষ্টি করেছে। পুলিস সোজা ডানদিকের গলিতে ঢুকল, এই গলিতেই লালা জানকীসরণ, বর্মা, ভভুতি স্যাকরা এঁরা সবাই থাকেন।

হাতের রেকাবির কথা ভুলে গিয়ে সজ্জন পুলিস আর মানুষের ভীড় দেখতে লাগল। সামনের গলি দিয়ে মিস্টার বর্মা আর রাধেশ্যামকে এদিকেই আসতে দেখা গেল। মিস্টার রাধেশ্যাম এই সবে বি. এ. পাস করেছে, সরকারী অফিসে কেরানীগিরির জন্য হালেই পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিয়েছে। সে নিজেই নিজেকে আদর্শবাদী বলে প্রচার করে, সকলকে বলে বেড়ায় যে সে একজন পাকা সোশালিস্ট। রাধেশ্যাম শঙ্করলালকে সঙ্গে করে একবার সজ্জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তাই তাকে চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি হাতজোড় করল। সজ্জনও বেশ বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার করতে গিয়ে কেবল মাথাটাই একটু হেঁট করল।

এতক্ষণে সজ্জনের হুঁশ হল সে যে হাতে রেকাবি ধরে আছে, হাতটা একটু উঁচু করে লাজুক ভাবে হেসে বললে— এ পাড়ায় প্রথম সাবজেক্ট পেয়েছি— কিন্তু এ কী ব্যাপার? গলিতে পুলিস কেন? রাধেশ্যাম তাড়াতাড়ি হাত উঁচু করে বললে— মশাই, এক জগদম্বা সহায় মাস্টার আছে, পারভার্ট লোফার শালা…

সজ্জন হাতের রেকাবির কথা ভেবে বললে— মাপ করবেন, আমি একটু রেকাবিটা গলির মোড়েতে রেখে আসি।

মিস্টার বর্মা শশব্যস্ত হয়ে বললেন— আরে না না, এখানেই নালীতে ফেলে দিন।

কেউ কিছু বলবে না তো? কলে কাপড় কাচছে লোকটির দিকে তাকিয়ে সজ্জন বললে।

—আরে না, না, আপনি নিশ্চিন্ত মনে ফেলে দিন।

সজ্জন ভাঙা ম্যানহোলের পাশে রেকাবি ফেলে দিয়ে কলে হাত ধুয়ে নিলে, তারপর একটু কাছে সরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে— হ্যাঁ, তা কী ব্যাপার?

সেই মাস্টার মশাইয়ের ভাইপোর জোয়ান বিধবা বৌ ছিল বেচারী। তিন-চার বছর আগে বিয়ে হয়েছিল, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বর মারা গেল। মাস্টার জগদম্বা সহায় তাকে আশ্রয় দিলেন, ইদানীং তার উপর নিজের অধিকার জাহির করে নিয়েছিলেন, আমাদের সমাজের এই মস্ত ট্র্যাজেডী, এঃ রাম রাম, বলতে বলতে রাধেশ্যাম রাগে ঘেন্নায় উত্তেজিত হয়ে উঠল।

সজ্জন জিজ্ঞেস করলে— তারপর কী হল? মিস্টার বর্মা আবার কথার খেই ধরে আরম্ভ করলেন— কাল রাত্তিরে তার প্রসব হল, ছেলে হয়েছিল। এরা তার গলা টিপে কম্পানি বাগের নালায় ফেলে দিয়েছিল। আজ সকালে পুলিস খবর পেয়ে এখানে রেড করতে এসেছে।

—কিন্তু পুলিস কী করে খবর পেলে··· সজ্জন উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলে।

বাবু রাধেশ্যাম একদম পলিটিক্যাল ভুরু নাচিয়ে উত্তেজিত ভাবে

বললেন— এদেশে সব সময়ই ঘরের শত্রু বিভীষণ লঙ্কাধ্বংস করছে। মশাই, এসব শালিগরাম বেটার কারসাজি। জগদম্বা সহায়ের মেয়ে কম্যুনিস্ট, ওর বাড়িতে আজকাল পার্টির ড্রামার রিহার্সাল চলছে। শালিগরাম কখনো দুধ খাইয়ে কালসাপ পুষবে ভেবেছ? এ এলাকা থেকে নির্বাচনপ্রার্থীদের হাঁড়ির খবর তার নখদর্পণে, শত্রুর খবর কেউ লুকোতে পারবে তার কাছ থেকে? ওটা কংগ্রেসের গেস্টাপো মশাই। এই ইলেক্‌শনে যদি পাব্লিক এই মাকড়শার জাল না ছিঁড়তে পারে, তাহলে আমি তো বলব…

গলিতে আসা-যাওয়া সমানে চলছে, কিন্তু কলের কাছে জল ভরবার জন্যে বালতি নিয়ে তখনো কেউ আসে নি। হঠাৎ মিস্টার বর্মার কানে পরিচিত গলার স্বর ভেসে এল, সামনের গলি দিয়ে এক ভদ্রলোক হনহনিয়ে এদিকেই আসছেন— সে আগুনে পুড়ে মরেছে বর্মাজী।

—অ্যাঁ, কে?— সজ্জন, রাধেশ্যাম, বর্মা সকলেই সমস্বরে প্রশ্ন করলে।

—সেই মেয়েমানুষটি, যেই ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যে তাকে ডাকা হল অমনি বাহানা করে ওপরের রান্নাঘরে গিয়ে কেরোসিন তেল ঢেলে… আর বেশী শুনে লাভ নেই কিছু। জগদম্বা সহায়ের মত বেহায়াকে সোজা ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দেওয়া উচিত।

—কিন্তু সেই মেয়েলোকটির কি হল? সজ্জন ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি বুঝে ফেলার চেষ্টা করছে।

—মিনিটের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল মশাই, চারিদিকে পোড়া গন্ধের চোটে টেঁকা দায়। পুলিস দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার আগেই সে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল, পুড়ে একেবারে ভাজা-

ভাজা হয়ে মাংসের দলা পাকিয়ে গিয়েছিল। কাপড়চোপড় সব পুড়ে একেবারে উলঙ্গ···

—আপনি নিজে চোখে দেখেছেন? সজ্জন জিজ্ঞেস করলে।

—হ্যাঁ, না, আমি নিজে তো··মোটা, ট্যারা চোখের এক উকিলনন্দন রসিয়ে কথাটার ঘোঁট পাকাবার চেষ্টায় ছিল। সজ্জন অনুভব করল যে এই লোকটি পুড়ে যাওয়া মেয়েলোকটির বর্ণনা করতে গিয়ে এক গোপনীয় আনন্দের আস্বাদ নিচ্ছে।

—আপনি আমায় একবারটি সেখানে নিয়ে যেতে পারেন?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাধেশ্যামের মুখের উত্তর কেড়ে নিয়ে মিঃ বর্মা বললেন।

হাঁটতে হাঁটতে রাধেশ্যাম বললে— ভীষণ ভীড় হবে, আপনি সেখানে কিছুই দেখতে পাবেন না।

—দেখার কী আছে, একটু লোকজনের হাবভাব দেখব, কথা শুনব— সজ্জন রাজপথের দার্শনিকের মত মুখভঙ্গি করে বললে।

স্যাঁতসেঁতে অসূর্যম্পশ্যা গলির বাড়িঘর, চারিদিকে সরু সরু নোংরা গলির জাল আর সেইখানে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিষয় রাধেশ্যামের টিকাটিপ্পনি শুনতে শুনতে মন্দির, মহাবীরের সিন্দূর মাখানো মূর্তি, ফুলমালা দিয়ে সাজানো সৈয়দের থালা, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ধুলোয় ভরা এ দেশের শিশুদের লাট্টু ও গুলি খেলা দেখতে দেখতে, এইটুকু সরু জায়গার মধ্যে গরুর গুঁতোর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে, তিন-চারটে সঙ্গীসাথী সমেত সজ্জন এক খোলা ময়দানে এসে হাঁফ ছাড়ল। মানুষজনের ভীড় দেখা যাচ্ছে।

সামনের পুরোনো বাড়ির দরজায় দুজন সেপাই দাঁড়িয়ে কাউকে

ভেতরে যেতে মানা করছে। বাঁদিকে খোলা ময়দান আগে রাস্তা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। রাস্তায় পুলিসের 'পিক-আপ ভ্যান' দেখা যাচ্ছে। ময়দানে বেশ কয়েকজনে মিলে জটলা পাকাচ্ছে।

ইতিমধ্যে দারোগামশাই দরজা থেকে বেরিয়ে এক সেপাইকে কিছু হুকুম করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সে একছুটে পিক-আপ ভ্যানের কাছে চলে গেল। তারপর দারোগামশাই উপস্থিত জনতার দিকে তাকিয়ে এক ধমক দিলেন— এখানে নাড়ু বিলি হচ্ছে? হাঁ করে সব তাকিয়ে— যান··· ওহো— আপনিও এসেছেন? সজ্জনকে দেখেই দারোগার স্বর মোলায়েম হয়ে এল।

সজ্জন এগিয়ে গিয়ে দারোগার সঙ্গে 'সেকহ্যাণ্ড' করলে। তার পেছনে পেছনে বর্মা আর রাধেশ্যামও হাজির হয়েছে।

—কেমন আছে?

—হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেব, প্রোসীডিওর পুরো করতে হবে তো, কিন্তু বাঁচবে বলে মনে হচ্ছে না।

—খুব বেশী পুড়েছে?

—হ্যাঁ, কিন্তু পোড়ার চেয়ে শক্ লেগেছে বেশী। এখুনি অনেক রকম ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে সিংক করে যাচ্ছে মনে হচ্ছে— বলতে বলতে দারোগা ভেতরে চলে গেলেন। সজ্জন আমতা আমতা করে বললে, আমি···।

—আসুন, আসুন মশাই— দারোগা সজ্জনের হাত ধরে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে চললেন। ফাটকের ভেতরে ছোট জায়গার মধ্যে তিনখানা বাড়ি। মাস্টার জগদম্বা সহায়ের পূর্বপুরুষের বৈভব আজ ধ্বংসপ্রায়, জায়গায় জায়গায় চুন বালি খসে গিয়ে পাতলা পাতলা ইট দাঁত বার করে তাকিয়ে আছে। সামনের বাড়িতে,

বাড়ির মালিক নিজে থাকেন। প্রথমে ঢুকতেই নকশাকাটা বারান্দা, বাঁ দিকে ভারী সদর দরজা, ডান দিকে বেশ বড় কামরা রয়েছে।

সারা বাড়িতে পুলিসের পায়ের খটখট শোনা যাচ্ছে। বাড়ির মেয়ে কম্যুনিস্ট দলের লিস্টে আছে। তাই এই অজুহাতে তারা সারা বাড়ি তচনচ করে ফেলছে। খানা তল্লাসীতে কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

এরা বাইরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই দারোগা ভেতরে ঢুকল, তাকে দেখে সেপাই বারান্দায় দাঁড়িয়ে গেল। দারোগা মশাই তার কাছে যেতেই সেপাই সেলুট মেরে বললে— কোতোয়ালিতে খবর দেওয়া হয়েছে হুজুর। মীর্জাজী অ্যাটেণ্ড করেছিলেন হুজুর। তিনি খবর দিয়েছেন যে এখুনি অ্যাম্বুলেন্স পাঠাচ্ছেন হুজুর।

—ঠিক আছে, দারোগাজী বললেন— আর শোনো, ওদিক থেকে দুটো চেয়ার টেনে আনো।

সেপাই বড় কামরার দিকে চলে গেল। দারোগা মশাই সজ্জনকে বললেন— বিশ্বাস করুন, সকাল থেকে এক পেয়ালা চা পেটে পড়ে নি। এ শালা পুলিসের চাকরী। সকালে একটু খবরের কাগজটা নিয়ে বসেছিলুম আর শালিগরাম এসে গেলেন। ইলেক্‌শনের বিষয় কিছু দরকারী কথার পর তিনি জানালেন যে এ বাড়িতে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রচার সামগ্রী পাওয়া যেতে পারে। খবরটা পাওয়ামাত্র আপনি বুঝতেই পারছেন, চা আর খবরের কাগজ সব মাথায় উঠে গেল। তখুনি ড্রেস পরে বেরিয়ে পড়লুম। সেপাই চেয়ার নিয়ে এল। বসতে বসতে সজ্জন পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করলে। হাতীর দাঁতের গোপুরম্ আকারের সিগারেট কেস সে মহীশূর থেকে অর্ডার দিয়ে তৈরী করিয়েছিল।

মাঝখানে সুন্দর নটরাজের মূর্তি। সজ্জনের হাত থেকে কেসটা নিয়ে একটু উল্টে-পাল্টে দেখে কেসটা খুলে সজ্জনের দিকে বাড়িয়ে দারোগা বললেন— মৈথলী সরনের একটা লাইন আছে না— হাইস্কুলে পড়েছিলাম— 'পাই তুজিহ সে বস্তু বহ কৈসে তুহ্মে অর্পণ করু' ?

সজ্জন একটা সিগারেট নিয়ে পকেট থেকে লাইটার বার করল। দারোগা মশাইয়ের পদবী শুক্লাজী, তিনি নিজের জন্য একটা সিগারেট নিয়ে একবার কেসটাকে ভালভাবে দেখে বললেন— আপনারা আর্টিস্ট মানুষ মশাই, কোথা কোথা থেকে সব জিনিস জড়ো করেন।

চোখ নিজেই পছন্দমত জিনিস খুঁজে নেয়— সিগারেট জ্বালাতে জ্বালাতে সজ্জন বললে।

শুক্লাজী দরজায় দাঁড়ানো সেপাইকে হাঁক দিলেন— শের আলী।

—জী হুজুর। শের আলী তাড়াতাড়ি কাছে এল।

—এবার একটু ভেতরে গিয়ে দেখে এসো, শালী মরল কিনা?

শের আলী চলে গেল। সজ্জন বললে— পুলিসের চাকরীতে মানুষের মন থেকে করুণা বোধহয় একদমই উবে যায়।

—আর কি করব? রোজ এই তামাশা দেখতে হয়। কখনো কখনো সজ্জন মশাই, এই চাকরী করতে করতে মনে হয় যে মানুষ আর মনুষ্যত্ব বলে দুনিয়ায় কিছু নেই। পুলিসের রোজনামচা খুলে দেখুন, মনে হবে যে এইটাই সত্যি, বাকী ধর্ম-কর্ম, ভাল ভাল কথা, আর্ট কালচার সব বাজে ভড়ং। এইসব লম্বা লম্বা কথা হাজার বছর ধরেও মানুষের মনে কোন রেখাপাত করতে পারে নি··· · হাঁ কি ব্যাপার?

শের আলী দারোগাজীকে কথা বলতে দেখে চুপচাপ দরজার কোণে দাঁড়িয়ে ছিল।

—ডাক্তার সায়েব বলছেন হুজুর, যে এখনো সঠিক কিছুই বলা যাচ্ছে না।

শালী আজ ক্ষিদেয় মারবে দেখছি— হারামজাদী .....

আপনাকে গালাগাল করার অধিকার কে দিয়েছে? পেছনের ঘরের দরজায় দাঁড়ানো ফর্সা মেয়েটি দারোগাকে প্রশ্ন করলে।

শুক্লাজী ভ্রূ কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে এমনভাবে তাকালেন যেন তাঁর পৈতৃক অধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করেছে। সজ্জন চেয়ারে বসে ফর্সা মুখটি সোজাসুজি দেখতে পাচ্ছিল। সজ্জন এই মেয়েটিকে এর আগেও এক-আধবার দেখেছে, হয়তো কথাও বলে থাকবে, কিন্তু পরিচয় নেই। মেয়েটির গোলগাল চেহারা আর বড় বড় ভাসা ভাসা চোখে আবেগের রক্তিম আভা ফুটে উঠেছে।

দারোগা মশাই একটু মুচকি হেসে বললেন— কী করব বলুন। আমাদের এর আগের কর্তারা ইংরেজ ছিলেন, তাঁরা গালাগাল ছাড়া কথা বলতেন না। নতুন কংগ্রেসী মালিকও দিচ্ছেন। আপনাদের কম্যুনিস্ট রাজত্ব এলে হয়তো অভ্যেস বদলাতে হবে।

মেয়েটি সজ্জনের মুখের দিকে পরিচিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে, বড় কামরার দিকে যেতে যেতে বললে— তখন আপনাদের মেরে মেরে অভ্যেস ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে।

দারোগা মশাই কোনমতে রাগের রাশ টেনে সংযত হয়ে সজ্জনের দিকে চেয়ে কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন— আরে তাইতো আমরা কম্যুনিস্ট রাজত্ব আসতে দিতে নারাজ, কি বলেন?

সজ্জন গলা নামিয়ে বললে—মাপ করবেন, গালাগালি দিয়ে কথা বলাটা আমারও ধাতে সয় না।

—হ্যাঁ বদ অভ্যেস নিশ্চয়, কিন্তু মশাই, পুলিসের চাকরী করতে হলে গালাগালের নামতা মুখস্থ করা ছাড়া অন্য কোন গতি নেই।

বাইরে থেকে সেপাই এসে খবর দিলে—হাসপাতালের গাড়ি এসে গেছে হুজুর।

দারোগামশাই বললেন—এসে গেছে তা আমি কি করব? ডাক্তার সায়েবকে জিজ্ঞাসা করুন, রুগীকে নিয়ে যাবার বিষয় তাঁর মতামতটা কি। থাক, আমিই কথা বলছি, আপনি এখানেই বসুন সজ্জনবাবু।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বসে আছি, না-হয় এবার উঠি…

—আরো একটু অপেক্ষা করুন, আমি এলুম বলে।

দারোগা মশাইয়ের পেছনে পেছনে সেপাইও চলে গেল। সজ্জন পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করতে করতে ভাবল, বাজে চক্করে ফেঁসে গেলুম। হঠাৎ ভেতরের মেয়েলোকটির কথা মনে এল, কে জানে কেমন আছে সে? আগুন লাগাবার আগে তার হাত-পা কেঁপেছিল কি? কল্পনা করতে গিয়ে সজ্জনের সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে ফর্সা মেয়েটি এসে খালি চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়েছে। সজ্জন তাকে দেখে ভদ্রলোকের মত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—আসুন।

—আপনি এখানে কি করতে এসেছেন? ইংরেজিতে রুক্ষভাবে প্রশ্ন শুনে সজ্জন চমকে উঠল। তার উত্তর দেবার আগে মেয়েটি আবার প্রশ্ন করলে—পুলিসের লোকদের সঙ্গে ঘোরাফেরা আপনি

কবে থেকে আরম্ভ করেছেন? মাপ করবেন, আমি খুব সোজাসুজি প্রশ্ন করছি।

সজ্জন গভীরভাবে জবাব দিলে— সকলের মত আমিও খবরটা শুনে এসেছি। মিস্টার শুক্লা আমাকে টেনে ভেতরে নিয়ে এলেন— এঁর সঙ্গে আমার আগে থাকতেই পরিচয় আছে।

—আচ্ছা, তার মানে পুলিসের লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে পরের অসহায় অবস্থা দেখে নিজের লাভের খাতায় যোগ দেবার লোভে এখানে এসেছেন নাকি? মেয়েটি বেশ রূঢ়ভাবে বলল।

সজ্জন মাথা হেঁট করে বলল— আমার ভুল হয়ে গেছে, মাপ করবেন, আমি চলে যাচ্ছি।

—আমি আপনাকে চলে যেতে বলছি না— আগের চেয়ে গলার স্বর একটু নামিয়ে মেয়েটি বলল— অন্য কোন সময় আপনি এলে আমি সৌভাগ্য মনে করতুম···আপনি জানেন যে অপরাধী আমার বাবা আর বৌদি?

—না, আমি এ কথা একেবারে জানি না। একটা কথা বলব, যদি আপনি কিছু মনে না করেন, আপনার সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় নেই। আগে এক-আধবার দেখেছি এই পর্যন্ত, আপনি বোধহয় কম্যুনিস্ট পার্টিতে কাজ করেন?

—আজ্ঞে না, আমি কম্যুনিস্ট নই, কিন্তু পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখি এই পর্যন্ত।

—আপনি হয়তো জানেন না নিজের বাড়িতে বিপদ ডেকে আনার অনেকটা কারণ আপনি নিজেই? বাড়িতে কম্যুনিস্ট পার্টির লোক জড়ো হয়, এইজন্যই বাড়ির উপর পুলিসের নজর ছিল। এটাই আপনার অপরাধ···

অপরাধ কার? আমার বাবার না বৌদির? প্রশ্ন শুনে সজ্জন এক সেকেণ্ড চুপ করে ভেবে নিয়ে বলল— দুজনেরই, কিন্তু আপনার বৌদি এসময়…

—সে আমার বাবার কৃতকর্মের ফলভোগ করছে— বলে মেয়েটি যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলল— বৌদির অপরাধ কী ছিল বলতে পারেন? ভরা যৌবনে বিধবা হওয়া, না মা হয়ে…

সজ্জন বুঝতে পারল যে মেয়েটি বেশ উত্তেজিত হয়ে রয়েছে, সে বাহানা পেলেই মনকে হাল্কা করার জন্য ভেঙে পড়বে। তাকে শান্ত করার জন্য বেশ মোলায়েম গলায় সজ্জন বলল— না, সেজন্য তাঁকে আমি মোটেই অপরাধী মনে করি না, তবে হ্যাঁ— শিশুহত্যা করা…

—সে আমার বাবা করেছেন। তিনি বৌদির উপরে অনেক অত্যাচার করেছেন, আমি জানি তাই আমি বলছি।

মেয়েটির ফর্সা রঙ উত্তেজনায় আবার লাল হয়ে উঠল। আবার ভেতর দিকে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বলল— আমি আগেই বলেছি, বৌদির এইটুকু অপরাধ যে তিনি ইকনমিক্যালি ফ্রী ছিলেন না।

মেয়েটি মেঝের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সজ্জন চুপ করে একদৃষ্টে তার দিকে তাকাতেই দণ্ডিতা অপরিচিতার জন্য তার মনে সহানুভূতি জেগে উঠল। এই ফর্সা মেয়েটির আলুথালু কোঁকড়া চুল, ভাসাভাসা দুটি বড় বড় চোখ, উত্তেজনায় রক্তিম গোলাপের মত মুখের দিকে চেয়ে যেন তার মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল। নিজের মানসিক দুর্বলতার কথা ভেবে, সে নিজেই লজ্জিত হয়ে মাথা নীচু করে বসে রইল।

—আপনি দয়া করে পুলিসকে বলে দিন যে তারা যেন এখুনি

এখান থেকে চলে যায়। এদের জন্যে আমরা ভাল করে কাঁদতেও পারছি না।

বড় বড় চোখের কোণে জল দেখা দিল, ঠোঁট আর নাক কেঁপে উঠল, সজ্জন তাড়াতাড়ি এক নজর মেয়েটিকে দেখে নিয়ে চোখ নামিয়ে নিল— ছিঃ ছিঃ নারী কি কেবল ভোগের জিনিস?

মেয়েটি তাড়াতাড়ি বড় কামরার দিকে চলে গেল।

সাত

অল ইণ্ডিয়া রেডিও লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, পাটনা থেকে আপনাদের পছন্দমত সিনেমার গানের অনুষ্ঠান আজকের মত এখানেই শেষ···

তারা উঠে গিয়ে রেডিওর কাঁটা লাহোর স্টেশনে লাগিয়ে দিল।

"ছম ছম ছম বাজে পায়ল মোরী।
আজা চোরী চোরী, আ জা চোরী চোরী।"

হিন্দুস্থান রেডিও সিনেমার গানের সুরের তার ছিড়ে দিতেই পাকিস্তান রেডিও ছেঁড়া তারে নতুন সুর দিয়ে শ্রোতাদের কানে মধু ঢালতে লাগল।

তারা পালঙ্কে ঠেস দিয়ে বসল। ছোট বৌ পালঙ্কের পায়ের দিকে মাথার নীচে হাত রেখে শুয়ে আছে। বড় বৌ মোড়া কারপেটকে দিব্যি আরাম-চেয়ারের মত করে, পা মুড়ে তার উপরে চড়ে পালঙ্কে ঠেসান দিয়ে বসেছে। তারা এসে বসতেই ছোট

কথাটা পাড়ার জন্যে উসখুস করে উঠল— আমি দেখেছি নন্দ দিদির সোয়ামীকে। আমার মাসীর বড় ভাজের ভাইঝির সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়েছে। একটু সেকেলে ধরনের কিন্তু লোকটি ভালো, দেখতে শুনতে বেশ।

—আরে ওর সামনে সাক্ষাৎ কামদেব এসে দাঁড়ালেও নাক উঁচু করেই থাকবে··· নচ্ছার মাগী।··· এই··· তোমাকে একটা কথা বলাই হয়নি— ইলেকট্রিকের কারেন্টের মত তড়াক করে উঠে বড় বৌ পালঙ্কের ওপরে চড়ে বসল। বড়র আওয়াজ আর ফুর্তি দেখে শুয়ে-থাকা ছোটর শরীরে যেন সুড়সুড়ি লাগল, সেও তখুনি উঠে সোজা হয়ে বসল।

নিতান্ত কুশ্রী মেয়েও অন্তঃসত্ত্বা হলে লাবণ্যময়ী হয়ে ওঠে। আসন্নপ্রসবা তারা ভারী দেহখানা নিয়ে সামান্য পা মুড়ে বসে উৎসুকভাবে তাদের দিকে তাকাল।

বড় বৌ পা-টাকে বাবু হয়ে বসার মত মুড়ে নিয়ে ডান দিকের হাঁটুকে মুড়ে তার ওপর হাত রেখে আঙুল নাচাতে নাচাতে ফিস-ফিস করে বললে— নন্দ দিদির বাক্সে ফোটো পাওয়া গেছে পুরো এক ডজন সেট কা সেট।

—কিসের ফোটো? ছোট ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি জানবার জন্য উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলে। তারার চোখে প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিল।

—যত খারাপ খারাপ ফোটো যা বাজারে পাওয়া যায়···উফ্··· আমার শরীর কেমন করে ওসব দেখলে। বড়র সারা দেহে কামাগ্নির ঢেউ খেলে গেল আর চোখে নেবে এল নেশার আবেশ।

তারা জিজ্ঞেস করলে— তুমি ফোটো নিজের চোখে দেখেছ?

—আরে, হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই। সকালে আমার উনি নন্দদিদির সব

জিনিস খানাতল্লাসী করে নিলেন যদি আরো কিছু চুরি করে থাকেন। বেশ হাঙ্গামা বেধেছিল। ছোটকে জিজ্ঞাসা করো, ওঁর মেজাজ তুমি তো জানোই, রাগলে কার বাবার সাধ্যি থামায়। স্বয়ং লাট এসে দাঁড়ালেও চুপ করবে না।

মনিয়া বেশ রসিক, বৌয়ের মন রাখার আর্টে সে সিদ্ধহস্ত কিন্তু তবু বড় বৌয়ের মনের অতৃপ্ত বাসনাকে সে সম্পূর্ণভাবে পূরণ করতে পারে নি। স্বামীর পৌরুষের সামনে সদাই ভয়ে থরহরি কম্প, তাই অবিবাহিত দেওর শঙ্করলাল ছিল তার অনুরাগের পাত্র। নন্দ এ বাড়ির বিষবৃক্ষ, বৌয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের কান ভাঙানো তার প্রধান কাজ। ননদের এই কূটবুদ্ধির ফলে কতবার স্বামীর হাতে বড় বৌ বেদম মার খেয়েছে।

ছোট বৌ ঘরের বাইরে মিস্টার বর্মার আওয়াজের সঙ্গে স্বামীর গলার স্বর শুনে খুশী হল। আরাম চেয়ার থেকে উঠে দরজার কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বর্মাকে নমস্কার করে যেই সে স্বামীকে কিছু বলতে যাবে, মিস্টার বর্মা বললেন—দেখুন, আপনার ফেরারী কয়েদীকে ধরে এনেছি।

ছোটর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। তারা ছোটর দিকে তাকিয়ে মস্‌করার হাসি হাসলে। শঙ্করলাল বর্মাকে বললে—আরো দুজন পালানো কয়েদী একে অন্যকে খুঁজে নিজেরাই হাকিমের এজলাসে হাজির হয়ে গেছে।

চারজনের হাসির শব্দ শোনা গেল। ঘরের পালঙ্কে পায়ের পাটিতে হেলান দিয়ে বসে বড়র কান সমানে বাইরের কথা শোনার জন্য খাড়া হয়ে আছে। তারা, আর ছোট বিশেষ করে ছোট জায়ের প্রতি মনের কোণে হিংসে মাঝে মাঝে জেগে উঠলেও বড়

বৌ মনে মনে তাকে স্নেহ করে। ছোট আর তারা দুজনেই, যেন বড়র নিজের মনের অভিব্যক্তির মাধ্যম। তাদের রসরঙ্গে এতক্ষণ নিজেকে ভুলে ছিল।

দেওরের আওয়াজ কানে এল— চলো স্বরূপ, বাড়ি গিয়ে ঝটপট তৈরী হয়ে নাও, তারপর…

—পাঁচ মিনিট দাঁড়ান। চা খেয়ে যাবেন, তারার আওয়াজ ভেসে এল।

—না, না, বাজে বাজে আপনাকে কষ্ট দেওয়া।

শঙ্করের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মিস্টার বর্মা বলে উঠলেন— আরে, বসুন বসুন— আপনাদের ছুতো করে আমার ভাগ্যেও এক কাপ চা জুটে যাবে, না হলে ইনি আমাকে…

—শুনছেন মিসেস বর্মা। আপনার বিরুদ্ধে নালিশ হচ্ছে।

—আপনিই শুনুন, যে অকৃতজ্ঞ, তার কথায় আবার কান দিতে আছে কখনো।

তারার আওয়াজ ধীরে ধীরে দূরে চলে গেল। হাল্‌কা হাসির আওয়াজের পর মিস্টার বর্মার গলার আওয়াজ বড়র কানে এল। তিনি তার দেওরকে জিজ্ঞেস করছিলেন— সিনেমা দেখার প্রোগ্রাম আছে নাকি?

—হ্যাঁ, আমার বন্ধু— হয়তো নাম শুনে থাকবেন— বিরহেশ, তিনি 'বাহার আইয়ে' সিনেমার গান লিখেছেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজকাল চলছে, বইটা কেমন? বর্মা জিজ্ঞেস করল।

'শুনছ?'— দূর থেকে তারার আওয়াজ বড়র কানে ভেসে এল, সে অনুমান করলে যে তারা রান্নাঘরেই আছে। দূর থেকে মিস্টার বর্মার আওয়াজ শোনা গেল— শঙ্করবাবু, এখুনি আসছি।

—শুনছেন মিস্টার বর্মা— শঙ্করলাল বললে— বসুন, বসুন, কোথায় যাচ্ছেন, কোন কষ্ট করতে হবে না।

—না, না, কষ্ট কিছু নয়, এই গেলুম আর এলুম বলে, মিস্টার বর্মার আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

নিশ্চয়ই মিষ্টি কিনতে ছুটে থাকবে, বড় ভেবে নিলে। শঙ্করলাল তারাকে বলছে— মিসেস বর্মা, আপনি বেচারাকে মিছিমিছি পাঠালেন।

—সে কী কথা? কালেভদ্রে রাস্তা ভুলে আপনাদের এদিকে আসা হয়— আরে ও ছোট, ভেতর থেকে মোহিনীকে ডাক দাও তো, পর্দার বিবি হয়ে ভেতরে বসে আছেন কেন?

—বৌদি এখানেই আছে? বৌদি, ও বৌদি— শঙ্করলাল ডাক দিলে। আওয়াজের সঙ্গেই খবরের কাগজ ওলটাবার শব্দ হল।

বড় সংকোচের সঙ্গে উঠে ঘরের দরজার কাছ পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়াল। দালানে সোফায় শঙ্করলাল বসে আছে। বৌদিকে দেখে মুচকি হেসে বললে— তুমি এমন অগম্য হয়ে লুকিয়ে বসে আছ কেন? স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করছিলে নাকি? আমি এদিকে ঘরের এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্যন্ত খুঁজে বেড়াচ্ছি।

"রেডিও পাকিস্তান থেকে বলছি, আপনারা এবার কিছু ফিল্মি রেকর্ড...

—মোহিনী, একটু রেডিও বন্ধ করে দাও তো, তারা রান্নাঘরের দালানে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে। ছোট স্টোভ থেকে চায়ের জলের কেতলী নামিয়ে দুধ চাপিয়েছে। বড় বৌ ভেতরে গিয়ে রেডিও বন্ধ করে এসে, দেওরের কথার উত্তর দিল— যে তোমার

হৃদয়ে লুকিয়ে আছে তার খোঁজেই এখানে এসেছ, বাজে আমার নাম করে কেন দয়া দেখাচ্ছ ?

রেডিও বন্ধ হয়ে গেল। দালান থেকে শঙ্করলালের আওয়াজ ভেসে এল— আরে, সে তো খোলাখুলি সকলের সামনেই আছে— স্বপ্নরাজ্যের সাত দরজার মধ্যে তুমিই লুকিয়ে বসে আছ।

বড় হাসতে হাসতে বাইরে এল। শঙ্করলাল তাকে দেখেই নিজের কথা শেষ করলে— আমার দাদার স্বপ্নের রাজত্ব জুড়ে বসে আছ তুমি, ঠিক বলেছি কিনা ?

বড় আড়চোখে দেখলে, তারা আর ছোট দুজনেই মুচকি হাসছে। বড় তাদের দিকে তাকিয়ে তারাকে রোমান্টিক সুরে বললে— শুনেছ এর কথা ? মিথ্যের জাহাজ, মিথ্যে বলায় এম. এ. পাস করেছে আমার লালাজী। একবার মুখ থেকে বেরুলো না যে চলো বৌদি তোমায় সিনেমা দেখিয়ে আনি, কেবল লম্বা লম্বা কথা বলেই খালাস··· বলতে বলতে বড় দালানের দিকে এগিয়ে গেল।

—বৌদিদের নেমন্তন্ন দিতে হয় না, তারা নিজেরাই ঘাড় ধরে আদায় করে নেয়। আমার মনে হয়, মিসেস বর্মা নিশ্চয় আমার কথায় সায় দেবেন।

মিস্টার বর্মা ঘরে ঢুকলেন। তারা স্বামীর হাত থেকে খাবারের ঠোঙা নেবার জন্য উঠানে নেমে এল। ছোট চায়ের সরঞ্জাম ট্রেতে সাজাচ্ছে। বড় তার পাশে বসে আছে, বর্মাকে দেখে ফট করে একটু ঘোমটা টেনে নিলে। মিষ্টি আর নোনতার ঠোঙা গিন্নির হাতে দিয়ে মিস্টার বর্মা শঙ্করলালের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন— কোন্ কথায় সায় দেওয়া হচ্ছিল শুনি ?

—কিছু না, এক বৌদির বাড়াবাড়ির ফয়সলা অন্য বৌদিকে দিয়ে করাচ্ছিলাম, শঙ্কর হাসতে হাসতে উত্তর দিল।

বর্মা সোফা থেকে মাথা ঘুরিয়ে রান্নাঘরের দিকে চেয়ে বললেন—আচ্ছা আপনার বৌদি এখানেই আছেন, কিন্তু যাকে ফয়সলার অধিকার দিলেন তার যোগ্যতা আগে আন্দাজ করা উচিত ছিল।

—মিস্টার বর্মা, মেয়েদের অযোগ্য বলবেন না, আমাদের সংবিধান হিসেবে এরা সমান অধিকারের ভাগীদার।

তারা চায়ের ট্রে গোলটেবিলটাতে রেখে দিয়ে বললে— এসব কথা সভ্য আর শিক্ষিত লোকের মাথাতেই ঢোকে মিস্টার লাল, গোঁয়ারদের শুনিয়ে আর কি হবে? বলতে বলতে তারা নিজের স্বামীর দিকে মধুর কটাক্ষ হানলে। শঙ্করলাল আর বর্মা সেই চাউনির অর্থ বুঝে মনে মনে না হেসে পারলেন না।

—বাস্, আমার থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেছে মিসেস বর্মা।

ছোট, মিষ্টি আর নোনতার প্লেট সাজিয়ে নিয়ে এল। খাবার-দাবার দেখে শঙ্কর দ্বিগুণ উৎসাহে বললে— আমাকে যদি আমার স্বরূপ গোঁয়ার বলে দেয়, তা হলে···

—যে যেমন হবে, তাকে তাই বলা হবে— ছোটর উত্তর শুনে সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে রস-বিভোর মনিয়া গিন্নী জোরে এক দীর্ঘশ্বাস ফেললে, বাব্বাঃ তার স্বামী যা রাগী, ভুলে সে কখনো হাসি-মস্করার ছলেও তাকে গোঁয়ার বলার সাহস করে না। তখুনি তারা তাকে ইশারায় কাছে ডাকলে। চোখের ইশারায় বড় উত্তর দিলে— না, আমার লজ্জা করছে।

চেয়ার ছেড়ে শঙ্করলাল বললে— আসুন মিসেস বর্মা, আপনি এখানে ভালো করে বসুন।

—আপনার বৌদিকে ডাকুন, তিনি লজ্জায় ঘরের কোণ নিয়েছেন।

বড় তারার দিকে চোখ পাকিয়ে দেখল। শঙ্কর হাঁক দিলে— বৌদি, শোনো লক্ষ্মীটি, এবার এসো। তারা শঙ্করলালের পাশে সোফায় ধপ করে বসে পড়ল। ছোট পেয়ালায় চা ঢালছে।

বড় শঙ্করলালকে বাঁকা চোখে দেখে আড় ঘোমটা টানতে টানতে উঠোন পেরিয়ে এল।

—আমার বৌদির গ্যাকরা আপনারা বুঝবেন না, দাদা এঁকে ভীষণ লাই দিয়ে মাথায় চড়িয়ে রেখেছেন।

বড় দালানে এসে সকলকে নমস্কার করে তারার পাশে গিয়ে বসল। তারা মিষ্টির প্লেট শঙ্করলালের দিকে এগিয়ে দিলে, ছোট বর্মাকে চায়ের পেয়ালা ধরালে।

স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে বসে চা খাওয়ার সুযোগ মনিয়ার বৌ জীবনে এই দ্বিতীয়বার পেয়েছে। একবার যখন সে স্কুলে পড়ত তখন খ্রিস্টান দিদির বাড়িতে তাঁর নিকট আত্মীয় দম্পতির সঙ্গে বসে অভিজ্ঞতা, তখন সাতপাকের নিয়মকানুনের কঠিন বন্ধনের অভিজ্ঞতা তার ছিল না। তারা আর ছোট দুজনেই তার চেয়ে বেশী স্বাধীনতা উপভোগ করেছে। সকলকে চা দিয়ে ছোট তার কাছে এসে বসল।

জলযোগের পর্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বর্মা দম্পতি সিনেমা যাওয়ার কথা তুললে।

—আপনাদের সেই কবি মহারাজ, যিনি এই সিনেমার গান লিখেছেন বললেন, তাঁর পাসটাস নিয়ে··· বর্মার মনের কিন্তু ভাবটা বুঝে নিয়ে তাড়াতাড়ি শঙ্করলাল উত্তর দিলে— না, না, পাসটাস নয়, তিনি অনেক আগ্রহ করে বলেছিলেন। আমিও ভাবলুম আজ রবিবার, এমনিতে প্রত্যেক রবিবারে আমরা সিনেমা দেখতে যাই। আসুন, চলুন মিসেস বর্মা, আজ আমরা আপনাদের সিনেমা দেখিয়ে আনব।

বর্মা দম্পতি একে অন্যের চোখের ইশারায় অনুমতি নিয়ে রাজী হয়ে গেল।

শঙ্করলাল বড়কে বললে— চলো, বৌদি মেমসায়েব, তোমায় আজ ঘুরিয়ে নিয়ে আসি। ঘাবড়িয়ো না, দাদার হুকুমনামা আনিয়ে দেব।

হুকুম কথাটা শুনে মনিয়ার বৌ লজ্জা পেলো। দু'জোড়া চোখের সহানুভূতিপূর্ণ চাউনি সুঁচের মত তার সর্বাঙ্গে বিঁধে গেল— হা ভগবান— আমি কত অসহায়, উঁচু সোসাইটির লোকেদের নজরে আমি কত হীন হয়ে যাচ্ছি কেবল নিজের স্বামীর দোষে। তার যেন মাথা কাটা গেল, এদের সামনে মাথা তুলতে পারছে না। সকলে উঠে দাঁড়াল, সে সবার শেষে ঘর থেকে বেরুল।

আট

ম্যাটিনি শো শেষ হতেই সিনেমা হলের ভেতর থেকে মোটা পাম্পের জলের তোড়ের মত ভীড় হরহর করে বাইরে বেরিয়ে এল। শঙ্কর আর বর্মা-পরিবারের টাঙ্গা এসে সিনেমা হলের সামনে থামল। শঙ্কর টাঙ্গা থেকে নেমে ভাড়াটা চুকিয়ে দেবার জন্য পার্স খুলতেই অন্য টাঙ্গা থেকে নিজের গিন্নী আর বড়র সঙ্গে নামতে নামতে মিস্টার বর্মা শশব্যস্ত হয়ে বললেন— আমি দুজনকেই পেমেণ্ট করে দিয়েছি— তারপর শঙ্করের টাঙ্গাওয়ালার দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিলেন— তুমি এর কাছ থেকে নিজের পয়সা নিয়ে নিয়ো।

শঙ্কর পার্স বন্ধ করতে করতে হেসে বলল— আপনি বড় ব্যস্তবাগীশ লোক মশাই, আচ্ছা আমি তা হলে ছুটে টিকিট কেটে আনি।

—আমি যাচ্ছি, বর্মা এগুতেই শঙ্কর তাকে বাধা দিয়ে বললে— মিস্টার বর্মা, প্লীজ— শঙ্কর তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল।

তিনজন মহিলা সঙ্গে নিয়ে মিস্টার বর্মা ধীরে ধীরে হাঁটছেন। তিনজনেই পুরুষদের নজর এড়িয়ে মেয়েদের হালফ্যাশনের জামা-কাপড় দেখতে দেখতে তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলছে। লম্বা লম্বা কোঁকড়া চুল, ছোট ছোট চোখে চশমা আঁটা, গরম কুর্তা, চুড়িদার

পাজামা, পায়ে মোজা আর পেশোয়ারী চটি, বাঁহাতে চেস্টার আর ডান হাতে ফাইভ-ফাইভ-ফাইভের টিন হাতে করে এক ভদ্রলোক শঙ্করলালের সঙ্গে এলেন। শঙ্করলাল বেশ উৎসাহের সঙ্গে ভদ্রলোকটির পরিচয় করাল— মিস্টার বর্মা, ইনি সেই প্রসিদ্ধ কবি বিরহেশ যিনি এই ছবির গান লিখেছেন। আর ইনি হচ্ছেন মিস্টার ত্রিভুবননাথ বর্মা— কেসরবাগের অজন্তা রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের মালিক, ইনি মিসেস তারা বর্মা। আমার বৌদি··· মিসেস মোহিনীলাল আর ইনি··· আপনারা কবিরা রসে ডুবে যাকে নানা নামে ডেকে থাকেন, আমার তিনি মানে মিসেস স্বরূপকুমারী লাল।

তারা বেশ বড় গলায় নমস্কার জানাল, ছোটর নমস্কারে যেন খুশী উথলে উঠল, বড় লজ্জার আড়াল নিয়ে হৃদয়ের ধুকধুকী কোনমতে চেপে কেবল হাতজোড় করে কবিমশাইকে নমস্কার করল। প্রত্যুত্তরে বত্রিশ পাটি দাঁতকে খোলের মধ্যে রেখে যতদূর খোলা যায় ততদূর পর্যন্ত খুলে নরম নরম দুটি হাত এক বিশেষ মুদ্রায় বিচিত্র ভঙ্গীতে, লেখক, আর্টিস্ট, নেতা, উপনেতা সকলের এক পেটেণ্ট মার্কা হাসি ছড়িয়ে বিরহেশ সবাইকে নমস্কার জানালেন। মিস্টার বর্মাও কবি বিরহেশকে দেখে একেবারে গলে পড়লেন। বিরহেশ সেই কোটির দেবতা, আশি পারসেণ্ট চাকুরে বাবুদের চক্ষু সদাই যাঁকে একবারটি দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে। মেয়েদের কথা না-হয় ছেড়ে দেওয়া গেল, কেননা বেশীর ভাগ বাড়ির ঝি-বৌ সাত সকালে উঠে ভগবানের নাম করার বদলে— বেইমান বলমা— জা জা— রেকর্ড শুনতে আর তার সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন্ন করতে বেশী ভালোবাসে। সিনেমার অভিনেতা-

অভিনেত্রীদের চৌদ্দপুরুষের হাঁড়ির খবর সংগ্রহ করে এরা ট্যাঁকে গুঁজে রেখে দিয়েছে। দরকার হলেই কুলজি খুলে বলতে পারে—কে কত টাকার কণ্ট্রাক্ট সই করেছে, কোন্ ছবিতে কে হিরোর চান্স পেয়েছে, কার সঙ্গে কার ইয়ে চলছে অথবা কার প্রেম আজকাল ধোঁকার সিন্ধুতে ঝাঁপ দিয়ে খাবি খাচ্ছে, সব আপ-টু-ডেট হিসেব। সিনেমা জগতের অনেক প্রোডিউসার, ডিরেক্টর, প্লেব্যাক সিঙ্গার, মিউজিক ডিরেক্টার, ক্যামেরাম্যান, লেখক, কবিরা হয়তো অহংকারের সঙ্গে মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বলে যে তাদের নাম প্রত্যেক বাড়িতেই রামনামের মতই প্রাতঃস্মরণীয়। সিনেমা দেখার রোগে প্রায় শহরের আশি পারসেণ্ট লোক ভুগছে, তাদের ধ্যান-জ্ঞানের এই একই লক্ষ্য। তারা, ছোট আর বড় সকলেই কবি বিরহেশের দর্শন পেয়ে মনুষ্যজীবনটাকে সার্থক মনে করছে। শঙ্করলাল বেশ গর্বের সঙ্গে বুক ফুলিয়ে বলল— কেবল আমার জন্যই ইনি এখানে এসেছেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজকে দু-তিনজন অফিসার বন্ধু জোরজার করে আমায় গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে এল। তারা সকলে অনেক করে বলল যে আজ তোমার সঙ্গে একসঙ্গে বসে রুপালী পর্দায় তোমার নাম দেখব। এখানে এসে আমি তাদের স্পষ্ট বলে দিলুম যে আমায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দাও কেননা আমার আর-এক বন্ধু শঙ্করলাল এখুনি এসে পড়বে, তার সঙ্গে আজ ছবি দেখব বলে প্রমিজ করেছি। আমার নিশ্বেস ফেলার অবসর হয় না, আজ আপনার সঙ্গে ছবি দেখার বাহানায় একটু জিরিয়ে নেব।

এতখানি ভূমিকা করার পর কবি মহারাজ উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে তাঁর শ্রীমুখের দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করলেন। শঙ্করলাল হাত বাড়িয়ে বলল— আসুন, চলা যাক।

বিরহেশমশাই আশেপাশে গোপ-গোপিনীদের নিয়ে এগিয়ে চললেন।

কর্নেল কার-পার্কে গাড়ি দাঁড় করাল। ও আর সজ্জন দুজনেই গাড়ির কাঁচ বন্ধ করে গাড়ি থেকে নামল। গাড়ি বন্ধ করার জন্য কর্নেল চাবির গোছা থেকে গাড়ির চাবি আলাদা করছে। ইতিমধ্যে সজ্জন গাড়ির ওপাশ থেকে উঁকি মরলে— বাঃ বাঃ চারিদিকে লোক গিজগিজ করছে আর তার মাঝখানে মহাকবি বোর! কবি বিরহেশকে দেখেই সজ্জনের বেপরোয়া চোখের চাউনি হঠাৎ সজাগ হয়ে গেল।

—এই কর্নেল, ফিরে চলো ভাই, এখানে আর নয়। সজ্জনের উদাস চোখে-মুখে আর গলার আওয়াজে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল।

—কেন? ভ্রূ কুঁচকে কর্নেল জিজ্ঞেস করল।

—উফ্ ভাই আর নয়, ডবল বোর হয়ে যাব। সজ্জন ছোট বাচ্চার মত আবদারের স্বরে বলে উঠল। কর্নেল গাড়ি বন্ধ করে চাবির গোছা পকেটে রেখে এগুতে লাগল। সজ্জন তেমনি আবদারের স্বরে বলল— একে বোম্বাইয়া ছবি, সৌন্দর্যবোধে একেবারে ভ্যাসকা কুমড়ো, তায় আবার গোদের ওপর বিষফোড়া তোমার পছন্দ, তৃতীয় এই বোর মহাকবির দর্শন।

বোরের নামে কর্নেলের হাসি পেল। আশেপাশে বোরের নামগন্ধ না পেয়ে জিজ্ঞেস করল— আরে কোথায় সে?

—ওই যে সামনে সিঁড়ি চড়ছে, ভাই, আমার মন একদম দমে গেছে। এর থেকে চলো গোমতীর ধারে একান্তে গিয়ে চুপচাপ বসে গল্প করা যাক। সজ্জনের কথায় মনে হল যেন সে বেশ ক্লান্ত হয়ে গেছে।

—তুমি নিজেই আজ নিজের চারিদিকে বোরিয়ত ছড়িয়ে বেড়াচ্ছ।

আমার আজ সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করছে— বাঃ যখন এসে পড়েছি তখন দেখেই যাব। ঐ বোর ব্যাটাকে ধারেকাছে ঘেঁষতে দেব না, তুমি দেখে নিও।

এদের নজর বাঁচিয়ে সজ্জন আর কর্নেল হলের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। টিকিট চেকার টিকিটের অর্ধেক ছিঁড়তে ব্যস্ত, ঠিক সেইসময় মহাকবি বোর সজ্জনকে দেখতে পেল।

বিরহেশদলের সব ক'জোড়া চোখ একসঙ্গে এক নতুন উৎসাহে সজ্জনকে দেখল। ছোটখাটো স্বাস্থ্যকর চেহারা, ফর্সা মুখে ভালো স্বাস্থ্যের আভা, গালের হাড় একটু উঁচু, পশমীনার শেরওয়ানি, ঢিলেঢালা পাজামা পরা, হাতে ওভারকোট নিয়ে সজ্জন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সকলে তাকে নমস্কার করল। সজ্জন তাড়াতাড়ি কোনমতে হাতজোড় করে হলের ভেতর যাবার জন্যে পা বাড়াল। বোর ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়িয়ে কোটের ওপর পড়ে যাওয়া কেকের গুঁড়ো ঝেড়ে নিয়ে চোঁ চোঁ করে কফির পেয়ালা খালি করে দিল। ছোট বৌ উঠে দাঁড়িয়ে মাথার উড়নি ঠিক করে নিয়ে অহেতুক খক্‌খক্ করে একটু কেসে নিলে, সবুজ সাদা পাথর বসানো জড়োয়া আংটি পরা আঙুলে রুমাল ধরে মুখ পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে, লিপস্টিক লাগা ঠোঁটের কথা মনে হতেই দাঁতে চেপে ক্ষান্ত হল। বড় নমস্কার করার পর আর-একটু ছোটর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি তার ভাগের কেক শেষ করতে ব্যস্ত।

বড়র মনময়ূর আনন্দে ডানা মেলে নাচছে। নারগিস, সুরাইয়া, দিলীপকুমার, দেবআনন্দ, নিম্মী, প্রেমনাথ আরও যত বড় বড় নামী কতজনের নাম রুপালী পর্দায় ফুটে উঠবে, তাদের প্রিয় বন্ধু কবি বিরহেশের সঙ্গে একসঙ্গে বসা, তাঁর শ্রীমুখ থেকে ছবির গান

শোনা, এত সৌভাগ্য তার পোড়া কপালে লেখা ছিল। এসব যেন তার স্বপ্নেরও অতীত। অতিরিক্ত উৎসাহের বেগ সামলাতে না পারায় তার চেহারা আধ পাগলাটে মত হয়ে গেছে। বোর বলল— আরে তুমি··· আপনি! ভালোই হল তুমি এসে পড়লে সজ্জন··· আর কর্নেল আপনি যে! সত্যিই তোমাদের দেখে আনন্দ পেলাম।

শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে সজ্জনকে বলল— আমার বাড়ির সব আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য উৎসুক হয়ে আছে— বলে সে ছোট আর সকলকে আসবার জন্য ঈশারা করল। সজ্জন উদাসীনভাবে লৌকিকতার পর্ব শেষ করে হলের ভেতর যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

মিস্টার বর্মা বললেন— মিঃ সজ্জন, আমার ওয়াইফ আর মিসেস লাল আপনার হাতে আঁকা পেনটিঙ দেখতে চাইছেন, আজ সকালে খবরের কাগজে আপনার বিষয় আর্টিকেল···

—আরে যখন হুকুম করবেন তখন এঁর হাতের ছবি দেখানোর ভার আমার— বিরহেশ কোঁকড়া চুলে ঝাঁকুনি দিয়ে আরো কিছু বলতে যাবে, এমন সময় সজ্জনের গম্ভীর মুখাকৃতি দেখে কর্নেল জোড় গলায় ধমক দিলে— বোরেশ!

এ নামে ডাকায় বিরহেশের সমস্ত উৎসাহ পুঞ্জীভূত ফেনার মতই মিলিয়ে গেল।

—মিস্টার বর্মা, আপনি একদিন সকলকে নিয়ে আমার ওখানে আসবেন। তবে দয়া করে আগে একটু খবর পাঠিয়ে তবে আসবেন, এসো কর্নেল।

দুজনে ভিতরে চলে গেল।

নিজেদের টিকিট নিয়ে ভেতরে যেতে যেতে শঙ্করলাল বিরহেশ সকলেই দেখল, যে সজ্জন আর কর্নেল দুজনে বক্সে বসে আছে।

ব্যালকনিতে বসতে বিরহেশের মানে বাধছে কিন্তু ভক্তবৃন্দের জেদের সামনে নিরুপায় হয়ে চুপ করে বসতেই হবে। বড়, তারা আর ছোটর পরে একটা সীট ছেড়ে দিয়ে শঙ্করলাল আর বর্মা গিয়ে বসল। ছোট নিজের সীট ছেড়ে গিয়ে বরের পাশে বসতেই তারার পাশের সীট কবির জন্য খালি হয়ে গেল।

—এখুনি আসছি, ব'লে কবি সজ্জনের বক্সের দিকে ফড়িংয়ের মত লাফাতে লাফাতে গেলেন।

বোরকে কাছে আসতে দেখে কর্নেল আর সজ্জন, দুজনেই বিরক্ত হয়ে গেল।

—হেঁ, হেঁ··· আপনাদের এখানে পদার্পণ করায়··

সজ্জন কর্নেলের উরুতে চিমটি কাটলে। কর্নেল ভ্রূ কুঁচকে বললে— বোরেশ, এখান থেকে যাও, আমাদের বিরক্ত কোরো না, যাও, যাও।

—যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি, বলে বিরহেশ পেছনের সীটে বসে দীনভাবে হেসে বললেন— ভাই সজ্জন, এই ছবিতে মানে এই ছবিতে আমার একটা গান···

—ওহো এ ছবিতেই আছে নাকি? সজ্জন তার দিকে না তাকিয়ে বললে।

—এটা যদি আগে জানতুম তাহলে আসতুম না, আচ্ছা এবার আপনি আসুন তা হলে ঝটপট। কর্নেল বললে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ যাচ্ছি, এ ছবিতে মিউজিক ডিরেক্টর আমার টিউন···

—'বোরেশ!' কর্নেল আবার চোখ রাঙালো। বিরহেশ হাত

জোড় করে বললে— কর্নেল সায়েব, আপনি দয়া করে সকলের সামনে আমায় এ নামে ডাকবেন না। যদি ইচ্ছে হয় তাহলে একা থাকলে তখন মাথায় একশো জুতো···

—আচ্ছা, তা হলে তাড়াতাড়ি পিট্‌টান দাও এখান থেকে।

—হ্যঁা, হ্যাঁ।

—বো···

বোরেশ উঠে চলে গেল। চিত্রা রাজাদানের বক্সের ওখানে গিয়ে নিজের গানের চর্চা কর'র ইচ্ছে ছিল কিন্তু রাজাদানের ঘন ঘন গোঁফ নাড়া দেখে বেশী কিছু বলার সাহস পেল না।

তৃতীয় বেল বাজল। রেকর্ড বাজা বন্ধ হয়ে গেল, বিরহেশ নিজের লাইনের সীটে বসার জন্যে ফিরে এলেন। চারজোড়া পায়ের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলতে বলতে গলে গিয়ে বিরহেশ সোজা বড়র কাছে গিয়ে থামলেন। খালি সীটের দিকে ইশারা করে তারাকে বললেন— প্লীজ মিসেস— হ্যাঁ, আমি এখানেই বসব, পর্দা থেকে চোখের অ্যাঙ্গেল ঠিক হচ্ছে, আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো? আপনার?

বিরহেশ বসতে বসতে তারা আর বড়কে বেশ বিনম্রভাবে জিজ্ঞেস করে নিলে তারপর কোলে ওভারকোট রেখে তার ওপর সিগারেটের টিন রাখতে রাখতে শঙ্করের দিকে চেয়ে বললে— আপনারা একটু দূরে হয়ে গেলেন।

দূরের কল্পনা ছোটর মনে সবচেয়ে বেশী খোঁচা মারল। ভাগ্যের বিড়ম্বনা, বিরহেশ তারই বরের বন্ধু অথচ গলা নামিয়ে তারাকে বললে— ছবিতে এক জায়গায় আমি অভিনয় করেছি— আপনি চেনার চেষ্টা করবেন।

—সত্যিই ?

—কি— কি ? ছোট তারাকে কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে। তারা ছোটকে জানালে যে, মিস্টার বিরহেশ নিজে ঐ ছবিতে অভিনয় করেছেন।

—আচ্ছা। ছোট উৎসাহের সঙ্গে খবরটা স্বামীকে সরবরাহ করলে, তখুনি কথাটা সাতকান হয়ে গেল। প্রত্যেকেই নিজেদের সৌভাগ্যের কথা ভেবে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাচ্ছে। বড় অনেক চেষ্টা ক'রে কান লাগিয়ে কিছু না বুঝতে পেরে সোজাসুজি বিরহেশকে প্রশ্ন করলে— আপনি এদের কী বললেন ?

বিরহেশ তার দিকে মাথা বেশ খানিকটা কাত করে বললে— আমি ঐ ছবিতে এক জায়গায় অভিনয় করেছি, ডিরেক্টর আর বাকী লোকেরা পেড়াপেড়ি করায় ছোট একটু রোল করে দিলাম।

দ্বিগুণ আগ্রহে বড় বললে— শুনছেন, যেখানে আপনার সীনটা আসবে, একটু আমায় বলে দেবেন, কেমন ?

—কেন ? আপনি নিজে আমায় চিনতে পারবেন না ?

অন্ধকারের কাছে বসা 'প্রসিদ্ধ মানুষটির' দিকে সলজ্জভাবে তাকিয়ে বড় বললে— আপনাকে হুবহু এমনটি দেখাবে ?

—হুবহু··· হাঃ হাঃ হাঃ, হ্যাঁ হুবহু।

বড়র ফর্সা আর সুশ্রী চেহারা আর সরল প্রশ্ন শুনে বিরহেশ বেশ মনভোলানো হাসি হেসে উঠল। বড় লজ্জা পেয়ে গেল।

নিউজরীলে পণ্ডিত নেহরু খেলাধুলার উদ্‌ঘাটন করছেন।

'বহার আইরে' সেন্সর সার্টিফিকেট দেখার সঙ্গেই সকলের চোখ এমন ভাবে ঠিকরে পড়ল যেন অর্জুনের লক্ষ্যভেদের অধ্যায় আজ আবার পুনরাবৃত্তি হবে।

লক্ষ্যভেদ হল, বিরহেশের নাম সকলের চোখের সামনে জ্বল জ্বল করে উঠল। ভক্তের দল ধন্য হয়ে গেল। নামটা দেখেই কবি বিরহেশ সিগারেটে এক লম্বা টান দিয়ে হাতটা নিচু করতে গিয়ে অসাবধানে বড়র হাতের কব্জীতে ছুঁয়ে গেল। দুজনেই ফস করে হাতে টেনে নিলে, বিরহেশ ঝুঁকে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন— পুড়ে যায় নি তো?

—না, না। অধীর আনন্দে বড় উত্তর দিলে। এই মুহূর্তে যদি বিরহেশ তাকে সত্যিই পুড়িয়ে মারত তা হলেও হয়তো সে তাকে এই উত্তর দিত, না-না—।

নিজের সীন আসার আগে বিরহেশ তারাকে জানিয়ে দিলে, তারপর বড়র দিকে মাথা কাত করে তাকে সুখবরটা দিলে। তারা নিজের লাইনে সকলকে খবরটা সরবরাহ করে দিল। সকলে নিশ্বাস বন্ধ করে চোখের পাতা না ফেলে এমন ভাবে প্যাঁট প্যাঁট করে চেয়ে রইল যেন সংসারের অষ্টম আশ্চর্য এখুনি তাদের সামনে প্রকট হবে।

হিরোইনের আশীর্বাদের পার্টিতে অনেক অতিথিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন মহাকবি বিরহেশ, হিরোইনকে কনগ্রাচুলেশন জানিয়ে একপাশে চেয়ারে বসে পড়েছেন। এরপর দু-তিনবার তাঁর চেহারা রুপালী পর্দায় ঝিলিক মারল।

নিজের শ্রীমুখখানা দেখে বিরহেশ গলা নামিয়ে বললেন— এবারে এই অধমকে চিনতে পারলেন?

ইণ্টারভেলের সময় বড়র সঙ্গে চোখাচুখি হতেই কবি মহারাজ আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন।

নয়

সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে কর্নেল আর সজ্জন হজরতগঞ্জের দিকে চলল। উঁচু উঁচু গগনচুম্বি বড় বড় বাড়ির পাশ দিয়ে, তাদের গাড়ি রাস্তার চক্কর কেটে অন্যদিকে মুড়ল। পাশাপাশি চৌমাথার মাঝের খালি জায়গায় মোটরের লাইন দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে আলোর ঝলমলানি, হাল আমলের ফ্যাশন, নারী-পুরুষের যৌবন-সম্ভার, সৌন্দর্য আর সুগন্ধে ভরা হজরতগঞ্জের কোলাহল শীতকালের নিঝুম রাতে যেন মিইয়ে গিয়েছে। একমাত্র মেফেয়ার সিনেমা হলের চোখ ঝলসানো আলোর ঝলমলানি, অস্তাচলে যাবার আগে সূর্যের শেষ রশ্মিটুকুর মত টিমটিম করছে। লালবাগের দিকে গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে কর্নেল বললে— একটু থামো, আমি নিজের কোটটা নিয়ে নি। ড্রাইওয়াশ করতে দিয়ে গিয়েছিলুম। তোমার ওখান থেকে ফিরতি পথে হয়তো দোকান…

আমাকে এখানেই নামিয়ে দাও, তুমি ওদিক থেকে বেরিয়ে যেয়ো।

—কেন?

—আমি একটু পায়চারি করতে করতে যাব। গাড়ি থেকে নেমে সজ্জন ফুটপাথের দিকে তাকাল।

কর্নেল তার মনমরা ভাব দেখে বললে— আজ সারাদিন তোমার মুখখানা শুকিয়ে আছে দেখছি, কিছু হয়েছে না কি?

সজ্জন তাড়াতাড়ি ফুটপাথের দিকে এগিয়ে চলল। আজ সকাল থেকেই সজ্জনের যেন দম আটকে আসছে। সকাল থেকে তার ভাবুক মনের ওপর যেন পর পর হাতুড়ি পেটা চলেছে। সকাল সকাল মহিপাল তাকে যা নয় তাই বলে তার মন-মেজাজ খারাপ করে দিল। তারপর পুতুল নিয়ে গলি পার হতে গিয়ে তার ভীষণ লজ্জা আর গ্লানি বোধ হয়েছিল। জগদম্বা সহায়ের মেয়েটিও তাকে বেশ হু'চারটে কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য সেই মেয়েটির প্রতি তার মনের কোণে যে বাসনার আগুন জ্বলে উঠেছিল, তাকে ফুঁ দিয়ে নেভাতে তার বিবেক সমানে যেন হাতুড়ির মত ঠকঠক শব্দে তাকে সজাগ করে দিচ্ছে। গোদের ওপর বিষফোড়া, আজই চিত্রা বাড়ি বয়ে এসে তার চরিত্রের বিষয় কতরকম ইঙ্গিত করে গেল।

বত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আইবুড়ো কার্তিক হয়ে থাকার জন্য, তার কাম-জীবন একটু অনিয়মিতভাবেই চলছে। হয়তো অনেকদিন সে কোন মেয়ের কাছাকাছি আসার সুযোগ পায় না, কিন্তু সুযোগ পেলেই বড় বাড়াবাড়ি করে ফেলে! জীবনে সে তিন রকমের মেয়েদের সংস্পর্শে এসেছে— যারা প্রেমকে পয়সার তুলাদণ্ডে মেপে ব্যাবসা করে, দ্বিতীয়, যারা প্রেমোপহার পেলেই খুশি, আর যারা রইল তাদের সঙ্গে তার শুধু শিষ্টাচারের সম্পর্ক। মায়ের স্থান তার জীবনে সবচেয়ে উঁচুতে, সে তাঁকে শ্রদ্ধা করে। নারী জাতির প্রতি সেই শ্রদ্ধাই আজ তার গালে চড়ের মত এসে বেজেছে। মায়ের কথা মনে হতেই সে ব্যাকুল হয়ে উঠল।

সজ্জনের মা, এগারো বছর আগে স্বর্গে গেছেন। তার বাবা শ্যাম মনোহর বর্মা সৌখিন মানুষ ছিলেন। বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেছিলেন বটে, কিন্তু একদিনের জন্যও কাছারির মুখ দেখেন নি। নাচ, মুজরা, গান, মদ আর নানারকম শখে তিনি প্রায় আট-দশ লক্ষ টাকা খোলামকুচির মত উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বাড়ির অন্তঃপুরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল না কিন্তু যেদিন ভেতরে পা দিতেন সেদিন চাকর-বাকর থেকে নিয়ে মা পর্যন্ত ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতেন। বাবার রাগী স্বভাব আর বিনা কারণে মাকে যাচ্ছেতাই করা দেখে সজ্জন মনে মনে বাবাকে ঘৃণা করত। মা তার খুব শান্ত ছিলেন, তবু বাবার হাতে অকারণে মার খেয়ে মরতেন। নানা ব্রত আর উপবাসের কঠোর নিয়মের মধ্যে তিনি দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করে যেতেন। সজ্জন একদিনের জন্যও মাকে বাড়ির চৌকাঠ পেরোতে দেখে নি। একবার কথায় কথায় মা তাকে বলেছিলেন— মরার সময় আমার শাশুড়ী বলে গিয়েছিলেন : বৌমা, ঘর-দোর সামলে রাখবে, ভাঁড়ারের চাবি সব সময় নিজের কাছে রেখো আর বাড়ির চৌকাঠ কামড়ে পড়ে থেকো। সজ্জনের মা শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর কথা মেনে চলেছিলেন।

সজ্জনের ঠাকুরদাদা রায় বাহাদুর কন্নৈমল 1902 সালে বত্রিশ বছর বয়সে মারা যান। শ্যাম মনোহর তখন মাত্র বছর দেড়েকের দুগ্ধপোষ্য শিশু। সমস্ত সম্পত্তি কোর্টে চলে গেল। সেই সুযোগে শ্যাম মনোহর প্রাপ্তবয়স্ক হবার আগেই তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা লক্ষ লক্ষ টাকা হজম করে ফেললে। সজ্জনের ঠাকুমা নিজের চোখের সামনে সব-কিছু নয়-ছয় হতে দেখে মাথা চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতেন, তাঁর মনে একটাই সান্ত্বনা ছিল যে নাতি দাদুর মত

বুদ্ধিমান হবে। শ্যাম মনোহর জেদ করে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত চলে গেলেন। তার পরেই ঠাকুমা মারা গেলেন। তখনকার কথা সজ্জনের বেশ মনে আছে। বিলেত ফেরত শ্যাম মনোহরের ভোল একদম পাল্‌টে গেল। প্যারিসের নাইট ক্লাবের নেশায় তাঁর মন মজে গেল। উঠতি বয়সের বল্‌গাহীন ঘোড়া অন্ধের মত ছুটে চলল।

তার বাবা আর ঠাকুরদাদা কম্নেমল, তুজনেই বত্রিশ বছর বয়সে ইহলীলা সাঙ্গ করেছিলেন। বাবা যখন মারা যান, সজ্জন তখন সিনিয়ার কেম্‌ব্রিজের ছাত্র। তেরো বছরের কিশোরের মনে জীবন নিয়ে জিজ্ঞাসা জেগে ওঠা স্বাভাবিক। জীবন মৃত্যু, স্বাধীনতা দাসত্ব, রাজনীতি-কূটনীতি, ভারত আমাদের দেশ, এধরনের নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য তার কিশোর মন চঞ্চল হয়ে উঠল।

বাবার মৃত্যুর পর তার বিয়ের জন্য মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সজ্জন আইবুড়ো কার্তিক থাকার জেদ ধরে বসল। মার পছন্দমত মেয়ে তার মনে ধরবে না, বড় হয়ে সে নিজে পছন্দমত দেখে শুনে যাচাই করে তবে বিয়ে করবে এ কথা সে কিছুতেই খোলাখুলি ভাবে মাকে জানাতে পারল না। তিন বছর পরে গোঁফের রেখার সঙ্গেই তার মনে নতুন আত্মবিশ্বাসের অঙ্কুর ফুটে উঠল। পরের মুখে ঝাল খাওয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ নয়, অতএব ভাবী বধূর রূপ আর গুণের কদর সে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারেই করবে। পুরোনো আমলের উপোসকরা, আচার-বিচারের নিয়ম মেনে চলা সহধর্মিণী তার মোটেই পছন্দ নয়। লেখাপড়া জানা, নতুন সভ্যতার আলোয় দীক্ষিত, সুন্দরী, চালাক চতুর মেয়েই তার

জীবন সঙ্গিনী হতে পারে। সাতপাকে ধরা দেওয়ার আগে একটু আধটু রোমান্স করার বাসনা তার মনে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল।

হঠাৎ একদিন মা তার পায়ে ধরে কেঁদে পড়লেন— বাবা, তোমার কাছে একটা ভিক্ষে চাইছি, বাবার মত কুপথের দিকে এগিয়ে যেয়ো না যেন। সারা জীবন আমি কেঁদে ভাসিয়েছি··· তুমি আর আমাকে···।

মাকে সে ভীষণ ভালোবাসত। এটা হয়তো তার মনের বিচিত্র গতি, যে গুণের জন্য সে মাকে শ্রদ্ধা করে এসেছে ঠিক তার বিপরীত গুণের অধিকারিনীকে সে পত্নীরূপে কল্পনা করেছে। চরিত্রহীন বাবার সামনে তার মার শক্তি দেখে সে আশ্চর্য হয়ে যেত। বাঘের মত রাগী বাবা, মার অপার সহ্যশক্তির সামনে যেন নিস্তেজ হয়ে যেতেন। এইজন্যেই সে বাবাকে কোনদিন ভালোবাসতে পারে নি, ঘৃণার চোখেই দেখেছে। বাবা ছাড়া বাকী সকলকেই সে উচিত সম্মান দিত, শ্রদ্ধা করত। মমতাময়ী মা সবার সুখদুঃখের ভাগীদার ছিলেন। তিনি শুচিবাইগ্রস্ত ছিলেন কিন্তু সজ্জন তাকে কতবার তাদের ঝিয়ের গয়ের পরিষ্কার করে দিতে দেখেছে। ঝি ক্ষয়রুগী ছিল তাই ভয়ে কেউ তার ছায়া মাড়াত না।

মমতাময়ী মায়ের দাবিটি রক্ষাকবচের মতো তার চরিত্রকে ঘিরে রেখেছে। মার সামনে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে বাবার মত অধঃপাতের রাস্তায় সে কোনদিন যাবে না। সেই প্রতিজ্ঞা পালন করতে গিয়ে সে নিজের অন্তরের অন্তর্ঘাতে নিজেই জ্বলে পুড়ে মরেছে। বাচ্চাবেলা থেকেই তার ছবি আঁকার শখ ছিল।

মনের নানা রকম এলোপাতাড়ি চিন্তার মধ্যে জন্ম নিলে এক নতুন মানুষ। আর্টিস্ট সজ্জন।

সিনিয়ার কেম্‌ব্রিজ পাস করার পর সে আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে গেল।

বাবা যাবার ঠিক ছয় বছরের মাথায় মাও চলে গেলেন।

সজ্জনের দুনিয়া যেন ফাঁকা হয়ে গেল। মনের শূন্যতাকে ভরে তোলার জন্য সে তুলি হাতে ধরল।

মার মৃত্যুশয্যায় দেওয়া প্রতিশ্রুতির মূল্য সে দেয় নি। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে বাবার মত খরচে অভ্যেসের ধারে কাছে দিয়ে সে যাবে না। জমি-জমার হিসেব, চাকরবাকরদের কাজ দেখা, খরচা-টরচার দিকে নজর রাখায় সে বেশ ওস্তাদ ছিল। সম্পত্তি বাড়ুক কিন্তু যা আছে সেটা যাতে বজায় থাকে এ বিষয় সে সদাই সজাগ থাকত। সব দিক থেকে বাঁধাধরার মধ্যে থাকার এ চেষ্টায় তার মনের সংযমের বাঁধ অন্যদিক দিয়ে ভেঙে দুকূল ছাপিয়ে বয়ে চলল— নারীর প্রতি আকর্ষণ, তাকে কাছে পাওয়ার কামনা, জৈবিক ক্ষুধার তাড়নায় সে অসংযমী হয়ে গেল।

পাঁচ বছর আর্ট স্কুলে পড়ে পাস করার পর, কিছুদিন ভবঘুরের মত এদিক সেদিক বেড়ানোর আনন্দ আর অভিজ্ঞতার পর সে ভেবে দেখল যে বিয়ে করাটাই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। নেহাৎই যদি করতেই হয় তা হলে তিরিশের পর করা উচিত— কেননা তখন পরিপক্ক বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করার কাজ সহজ হয়ে যায়। নিজের আঁকা ছবির গুণে যতই তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল ততই তার মনের একাগ্রতা নিজের স্বার্থকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। এই কারণে সে নারীকে দৈহিক ক্ষুধা মেটাবার

এক মেশিনের চেয়ে বেশী মূল্য দিতে পারে নি। নিজের উদার হৃদয় আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য সে মাঝে মাঝে ভারতীয় আর পাশ্চাত্য জীবনের আদর্শের বিভিন্ন উপমার মালা দিয়ে নারীজাতিকে সাজাবার চেষ্টা করত। আজ সেই ওপরের কলঙ্কের খোলস ফেটে গিয়ে আসল রূপটা প্রকাশ পেয়েছে। এক অজানা মেয়েমানুষ অত্যাচার সহ্য করতে করতে শেষকালে আর না সহ্য করতে পেরে যেভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে, সে কথা ভাবলেই তার হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ক্ষণিকের জন্য জগদম্বা মাস্টারের সুন্দরী মেয়েকে দেখে তার মনের যে কামাগ্নি জ্বলে উঠেছিল, তার জন্য সে সত্যিই অনুতপ্ত।

মানুষ যখন নিজের মনের কাছে ধরা পড়ে যায়, নিজেকে যখন মানুষ চোর বলে ভাবে, তখন নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানোর কাহিনী সত্যিই বড় করুণ। প্রথমে যখন সে নিজেই নিজেকে ধোঁকা দিয়ে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে, তখন সে নিজেকে খুব চালাক ভাবে। এর পর শুরু হয় আসল যুযুৎসু প্যাঁচ। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের ভয়ে সে ছুটতে আরম্ভ করে। কোনমতে নিজেকে না বাঁচাতে পেরে শেষকালে সে আপ্রাণ ছুটতে ছুটতে পাগল হয়ে যায়। ক্লান্তিতে তার সর্বাঙ্গে ব্যথা, প্রাণ রক্ষা করার গোলকধাঁধায় পড়ে সে কেবলি মাথা খুঁড়ে মরে। আজ সজ্জনের মানসিক অবস্থা অনেকটা তাই। বুনো মোষ হঠাৎ বাঁধা পড়লে যেমন নিজের মুক্তির জন্য ফোঁস ফোঁস করে রাগে পাগল হয়ে যায়, তেমনি আজ সজ্জনের অন্তর মনে সংঘর্ষ চলেছে মুক্তির জন্য, সীমাবদ্ধ মন আজ ছটফটিয়ে উঠেছে। নানারকম চিন্তা মাথায় নিয়ে সে ঠিকই তার গন্তব্য পথের দিকে পা চালিয়ে চলছে।

একটু শীত করতেই সে চেস্টারটা গায়ে দিল। সাহনজফ রোডের দু'পাশে সারি সারি খালি বাড়ি, রাস্তার ওপর উদাসীন ভাবে সজ্জন হেঁটে চলেছে।

সামনের গাড়ির হেডলাইট সোজা এসে তার চোখে পড়তেই, সে চমকে উঠে একবার গাড়িটাকে দেখে নিয়ে আবার আপন মনে হাঁটতে লাগল।

গাড়ি তার কাছে এসে থামতেই হঠাৎ যেন বাস্তব জগতে ফিরে এসে মেয়েলী গলায় দমকা হাসির শব্দ শুনে গাড়ির দিকে তাকাল।

ওহ্, শীলা! তার ধড়ে প্রাণ এল। গাড়িতে মহিপাল আর ডাক্তার শীলা দুইং বসে আছে। নিজের এই অসুস্থ মানসিক অবস্থায় এই মুহূর্তে দুই বন্ধুর দেখা পেয়ে তার ভালোই লাগল। হাত বাইরে বার করে শীলা তার ওভারকোটের কলার টানতে টানতে বললে— কোথা থেকে আসা হচ্ছে মশাই ?

সজ্জন হালকা মনের স্বস্তি নিয়ে বললে— আরে! তোমরা কোথা থেকে ?

মহিপাল মুচকি হেসে উত্তর দিলে— শয়তানের কাছ থেকে। ডাঃ শীলা মহিপালের কনুইয়ে ধাক্কা দিয়ে মিষ্টি হেসে বললে— নিজের গুপ্ত স্বর্গের ঠিকানা সবাইকে দিতে নেই মশাই, তা হলে ইনিও ঈশ্বরের বাগানে আপেল খেতে হাজির হবেন।

ঈশ্বরের বাগানের আপেলের কথা শুনতে সজ্জনের ভাল লাগল না, রাগে মাথার শির টনটন করে উঠল। ম্লান হেসে বললে— এসো, আমার এখানে দুমিনিট বসো। কফি খাবে? যদি অন্য কিছু খাবার ইচ্ছে থাকে তারও ব্যবস্থা হতে পারে।

—বড্ড দেরী হয়ে যাবে, কি বল ডাক্তার? কটা বাজল?

—ঠিক এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট, বেশী দেরী হয় নি। এসো মশাই, আমরা দুজন তোমার এখানে একটু আস্তানা গেড়ে বসি।

—না ভাই, অন্য কোনদিন আসব। শীলার কোন ভাবনা নেই, বাড়িতে গিয়ে কারুকে সাফাই দিতে হবে না। ওদিকে বাড়িতে আমার গিন্নী যক্ষিনী হয়ে আমার পথ চেয়ে বসে আছেন। সজ্জন গাড়িতে উঠে বসল। মহিপালের কথায় কান না দিয়ে শীলা স্টিয়ারিং ব্যাক করতে লাগল।

—মহিপাল, তোমার ছবি আঁকব একদিন। তুমি ঠিক সেই মানুষের মত, যে আগুন ও জলের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে।

—থাক্, থাক্ ভাই, শীলার মত তুমিও ঠাট্টা শুরু করলে। এ ভদ্রমহিলা, না অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, না ঝলসে যাওয়ার মত গরম।

—বাস্-বাস্ মাপ করুন, আমার হয়ে ওকালতি করতে হবে না। ইনি আমার দিকে মোটেই ইশারা করে কথাটা বলেন নি, তাই না দুর্জন ?

—নিশ্চয় নয়, তুমি জানো যে মেয়েদের আমি কত সম্মান দিয়ে থাকি— বলতে বলতে সজ্জনের মনের কোণে চিত্রা আর জগদম্বা সহায়ের মেয়ের ছবি ভেসে উঠল।

সজ্জনের বাড়ির দরজায় পৌঁছে গাড়ির হর্ন বাজল।

—সত্যি বলছি, শীলার হৃদয় আর্টিস্টের মত নরম আর বৈজ্ঞানিকের মত ঠাণ্ডা মাথা। মহিপালের কথা শুনে শীলা খুশি হয়ে বলল— আমার পেশাও তাই, আর্ট প্লাস সাইন্স।

—তুমি আমাকে উত্তেজিত করতে চাইছ শীলা? আজকাল

বেশীর ভাগ ডাক্তার জল্লাদের চেয়ে কম নয়— হয়তো তুমিও তাদের মতই একজন···। চৌকিদার ছুটে এসে ফাটক খুলে দিল।

*　　　*　　　*

নিস্তব্ধ নিঝুম মাঝ রাত্তিরে সজ্জন জগদম্বা সহায় মাস্টারের কলঙ্কের কাহিনী তাদের শোনাচ্ছে। হুইস্কি পেটে পড়তেই অজানা যুবতীর প্রতি অত্যাচারের কথা শুনে শীলা আর মহিপালের চোখ ছলছলিয়ে উঠল।

—তার জন্যে চোখের জল ফেলার দরকার নেই মহিপাল, আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে পুড়ে মরার সময় তার একটুও কষ্ট হয় নি, সে তখন এক আবেগের···।

—আত্মহত্যার আবেগ চোখের জলের শক্তি দিয়েই বাড়ে সজ্জন, এভাবে কেন কেউ প্রাণ হারাবে বলতে পার? শিশু পৃথিবীতে জন্ম নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এভাবে তার দম বন্ধ করে মেরে ফেলা নৃশংসতা নয়? এ খবর তুমি আমি সকলে শুনে বরদাস্ত করে চুপ করে যাব? মারবেলের টেবিলে জোরে ঘুঁষি মেরে মহিপাল উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠে ঘরে পায়চারি করতে লাগল। হুইস্কির নেশা তার রাগী স্বভাবে ঘি ঢালার কাজ করেছে। বার বার সে দৃশ্যের কল্পনা তার মনে কাঁটার মত খচখচ করছে, যে দেহে ছোট স্ুঁচ ফুটলে মানুষ ব্যথায় ইস্ করে ওঠে তাকেই নিজের হাতে আগুন লাগিয়ে শেষে··· (মহিপাল কেঁদে ফেলল) হায় ভগবান, এমন যেন শত্রুরও না হয়।

মহিপালের কল্পনাশক্তি দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে। ছোট একটি শিশুর গলায় সে একটি কাঠের হাত দেখতে পাচ্ছে— তার কানে

ভেসে আসছে শিশুর কান্নার আওয়াজ। শোক, ঘৃণা আর ক্রোধের অনুভূতি যেন সাহিত্যিক মহিপালকে পিষে মারছে।

এতক্ষণে সজ্জনের চিন্তাধারার 'মোড়' খুঁজে পেল। মহিপালের যুক্তি শুনে তার মনোবল যেন ফিরে এল। সকালের খবরটা শোনার পর থেকে তার মনের মধ্যে করুণা আর সহানুভূতি সমানে তোলপাড় করছিল, সেই উত্তাল তরঙ্গ ক্রমশ শান্ত হয়ে আসছে। আজ সারাদিন ধরে নিজের মনে যে মাকড়শার জাল সমানে বুনে চলেছিল, তার হাত থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। সজ্জনের উন্নত মন পরের সুখদুঃখের কারণ যেন খুঁজে পেয়েছে। এই মুহূর্ত তার কাছে বড়ই মূল্যবান। সে এটাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। সে নিজের জীবনের খাতায় অঙ্ক কষে দেখলে— না, না, সে লোক হিসেবে এতটা খারাপ নয়··· খারাপ নয়।

মহিপাল উঠে দাঁড়াতেই শীলা তার দিকে গম্ভীরভাবে তাকাল। অসংখ্য প্রশ্ন তার মনে তোলাপাড়া করছে। তার জীবনে এমন অনেক সন্ধিক্ষণ এসেছে যখন মানুষের জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে একাই লড়েছে। জীবনকে বাঁচাতে হবে এই তার মূলমন্ত্র। তাই বোধহয় আজ করুণায় তার মন বিগলিত।

মহিপাল উত্তেজিতভাবে পায়চারি করতে করতে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পাশের চেয়ারের হাতলের ওপর একটা পা তুলে দিয়ে, মুঠো হাতের ওপর চিবুক রেখে ঘুমন্ত কম্পানীবাগের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে অনেক দূরে তাকিয়ে রইল; অনেক কিছু দেখার চেষ্টা করছে সে। যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি তার ভাবুক মনকে অক্টোপাসের মত পিষে মারছে।

—ডাক্তার হিসেবে বলছি, এধরনের ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য কি? এই ছুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আমাদের কী করা উচিত?

—শিক্ষার অভাবই এর প্রধান কারণ, আমাদের দেশের লোকেরা বড্ড ব্যাকওয়ার্ড। সজ্জন গম্ভীরভাবে উত্তর দিল।

—শিক্ষা? কোন্ শিক্ষার কথা তুমি বলতে চাইছ? পরিবর্তনশীল সময়ের সঙ্গে আমাদের তাল রেখে চলতে হবে। সরকারের উচিত এদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করা; মানবতার মূলমন্ত্রে এদের দীক্ষিত করা। মানবতার মূল্য এদের মাথায় ঢোকাতেই হবে। জানলার কাছ থেকে সরে আসতে আসতে মহিপাল বলল— এদের বোঝানো যাবে কি করে? কি উপায় আছে আমাদের কাছে?

—কেন? সরকার টিচার রাখুক, আর্ট এবং কালচারাল শো-র আয়োজন করুক, স্ত্রী-পুরুষের স্বেচ্ছাসেবকদল তৈরী করুক, যারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রার বিষয়ে তাদের বোঝাবে।

—ফাঁকা উপদেশ দিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। তোমার বন্ধু বলল যে আমি একজন জল্লাদ, অথচ ভেবে দেখ, তো জেনেও লোকেরা আমার কাছে আসে। আমি জানি যে ছুনিয়ায় মানুষের প্রাণ বাঁচানোর চেয়ে বড় ধর্ম আর নেই তবু এইটাই আমার পেশা, কেননা তার থেকেই টাকা রোজগার করে আমার জীবন চলে। লেখাপড়া করে কত টাকা আর সময় নষ্ট করেছি তার বদলে ফীস নেব না কেন? আমি স্বচ্ছলভাবে জীবনযাপন করতে চাই। তোমাদের ঐ রামকৃষ্ণ মিশন, গান্ধীয়ান বা খ্রীস্টান মিশনারিদের মত সন্ন্যাসিনী হয়ে সেবাধর্মের সিন্ধুতে হাবুডুবু খেয়ে কাজ করার ইচ্ছে আমার নেই··· তোমরাই কি জোর দিয়ে আমাকে বলতে পারবে যে ডাঃ সুইং, গরীবদের ফ্রী দেখ? যদি আমি

তোমাদের কথা মেনে চলি তা হলে গরীবদের লম্বা লম্বা লাইন দেখতে দেখতে শেষকালে বড়লোক, যারা ফীস দিতে পারে, তাদের দেখার বেলায় আর হাতে সময়ই থাকবে না।

শীলা নির্বিকারভাবে বিষণ্ণ মহিপালের মুখের ভাবটা লক্ষ্য করার চেষ্টা করছে। মহিপাল গম্ভীর হয়ে বসে আকাশপাতাল ভাবছে। সজ্জন বললে— সত্যি গভীর সমস্যা বটে। ব্যক্তিগত স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দেওয়াই মানুষের স্বভাব। হাজারের মধ্যে দু'একজন সাধু পুরুষ এই চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম। কিন্তু তারা সংখ্যায় এত নগণ্য যে প্রায় আঙুলে গোণা যায়। যেদিন ব্যক্তিগত স্বার্থকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়ার শ্লোগান বদলে যাবে সেদিন তার সঙ্গেই হিউম্যান ভ্যালুজ বদলে যাবে। সমাজের ভিত্তিটাকেই নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। এই অসংখ্য নরনারীকে নতুন পথের সন্ধান দিতে হবে— বলতে বলতে সজ্জনের গলার স্বর কেঁপে উঠল। চিত্রার মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই হঠাৎ তার অপরাধী মন বিচলিত হয়ে উঠল।

—বদলানো যেতে পারবে না কেন? অত্যাচার করা, অন্যের অসহায় অবস্থার সুযোগ নেওয়ার অভ্যেস আমাদের একেবারেই ছেড়ে দিতে হবে। যদি তোমরা নিজের থেকে না ছাড়তে রাজী হও তাহলে মেরে মেরে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে। মহিপাল উত্তেজনার আবেগে বললে।

সজ্জনের যেন কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়ল— তুমি এমন করে মিঠেকড়া কথা শোনাচ্ছ যেন সব দোষ আমার। সজ্জন কোনমতে দেঁতো হাসি হাসছে দেখে শীলাও হাসল। কিন্তু মহিপাল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বললে— তোমরা সবাই অত্যাচারীর দল। শুধু

তোমাকেই ইঙ্গিত করছি না বরং সম্পূর্ণ সমাজের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছি। অত্যাচার করা আর অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে যাওয়াই আমাদের জন্মগত অভ্যেস। কোনদিন সুযোগ পেলেই, যারা এতদিন মুখ বুজে সব-কিছু সহ্য করে এসেছে, তারা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অত্যাচারীদের গলা টিপে ধরবে। তুমি দেখে নিয়ো, আর বেশীদিন নয় সজ্জন। চারিদিকে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে, যে-কোনদিন কালবৈশাখী ঝড় উঠতে পারে।

শীলা আঙুল মটকাতে মটকাতে বললে— তুমি ভাবছ যে এদেশে কম্যুনিস্ট রাজত্ব হবে? অসংখ্য নির্দোষ মানুষের রক্তের নদী বয়ে যাবে? কোন্ পার্টি পাওয়ারে আসবে এখন তা বলা মুশকিল। আমি কোনদিনই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম না, তবে এটা আমি মানি যে মার্কসের থিওরি অনুসরণ করে রাশিয়া, চীন আর ইটালি নতুন ভাবে গড়ে ওঠায় অন্য দেশের জনসাধারণের চিন্তাধারায় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সর্বহারার জাত আজ ফণা উঠিয়ে মণিহারা সাপের মত ফোঁস ফোঁস করছে, এবার এদের চেপে রাখার শক্তি কারুর নেই— আর আমাদের সমাজের নারী জাতিও এই সর্বহারাদের দলে, তারা আজ পর্যন্ত অনেক সহ্য করে এসেছে ··· সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

সজ্জনের চোখের সামনে তার মায়ের মুখখানা ভেসে উঠল— উফ্ তিনিও এই সমাজব্যবস্থার হাতের পুতুল ছিলেন।

শীলা বললে— নারীজাতির বিষয় তুমি একটু বেশী রোমান্টিক ভাবে ভাবছ মহিপাল। বর্তমান সমাজের মেয়েরা লেখাপড়া করে, আগের চেয়ে অনেক বেশী প্রগতিশীল আর সভ্য, অনেক বেশী স্বাধীন, আমি দেখছি যে শিক্ষায় তারা···

মহিপাল উত্তেজিত ভাবে বেশ রূঢ় গলায় বললে— তারা কজন? তাদের মধ্যে তুমি একজন যার ফীস বত্রিশ টাকা, বাদবাকী বেশীর ভাগ সেই দলেই আছে যারা আগুনে পুড়ে মরছে।

শীলা গলা নামিয়ে বললে— তুমি জেদের মাথায় যা নয় তাই বলছ মহিপাল, এ ধরনের পাঁচ-দশটা কেস নিশ্চয় হয় তাই বলে…

—না না, ব্যাপারটা ঠিক উল্টো, পাঁচ-দশটা বাড়ি ছাড়া বাকী দেশের প্রত্যেক বাড়িতে জল্লাদেরা বেশ তৃপ্তির সঙ্গে জবাই করে চলেছে।

সজ্জন উপহাস করে বললে— তোমার বাড়ি?

মহিপালের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, ঢোঁক গিলে গলার স্বরকে মোলায়েম করে সংযত ভাবে উত্তর দিলে— হ্যাঁ, আমি নিজেই এক জল্লাদ।

—কেন? সজ্জন হুমকি দিয়ে অপরাধীকে প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলে। অন্যের অপরাধের আড়ালে তার নিজের অপরাধী মন, যেন অভদ্রতার সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

—সজ্জন, সত্যি বলছি, আমি বিয়ে করে সুখী হতে পারিনি। মা-বাবার ঠিক করা বিয়ের পরিণাম বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যা হয়, আমারও তাই হয়েছে। ধার নিয়ে সুদ দেওয়ার মতই কোন গতিকে দিনগত পাপক্ষয় করে যেতে হয়। এর ফলে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একে অন্যের চোখের আড়ালে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

শীলা প্রতিবাদ জানালে— পুরোনো প্রথার চেয়ে লাভ ম্যারেজের পরিণাম কিছু ভালো হয় না। নতুন নতুন যতদিন পর্যন্ত তারা রোমিও জুলিয়েট হয়ে থাকতে পারে ততদিন মন্দ কাটে না। কিন্তু কিছুদিন পরেই ছাড়াছাড়ি, আপসের মধুর সম্বন্ধের ছন্দপতন,

ডাইভোর্স ছাড়া আর কোন রাস্তা থাকে না। আমার এতদিনের অভিজ্ঞতায় মনে হয় বিয়ের প্রথাই সব রোগের মূল। একবার যদি এই প্রথাকে উপড়ে ফেলে দেওয়া যায় আর যদি মেয়েদের আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করে দেওয়া যায় তাহলে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নিজের থেকেই নির্মল হয়ে যাবে।

মহিপাল রেগেমেগে বললে— তাহলে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সম্বন্ধ কী হবে? কেবল দেহ ভোগ···?

—আমাদের সমাজে আজ কী হচ্ছে? একশোর মধ্যে নব্বইজন স্ত্রী-পুরুষ নিজের স্বার্থের জন্য অন্যকে ব্যবহার করছে না?

সজ্জন টেবিল থেকে সিগারেট কেস ওঠাতে ওঠাতে বলল— আজ তা নিজের চোখে দেখে এলাম।

—আরে, আমি তোমাকে বলছি। আমার চোখের সামনে আজ পর্যন্ত অনেক বাড়ির পর্দা ফাঁস হয়েছে। প্রথমে আমি গর্ভপাত করাতে রাজী হতাম না, তারপর ভেবে দেখলুম যে পশু-পক্ষীরা পর্যন্ত জৈবিক ক্ষুধা অনুভব করে। আমাদের আদম আর ইভের সন্তানেরা বিয়ের লাইসেন্স না নিয়ে যদি এই সাধারণ স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক সম্বন্ধের ফলকে পাপ বলে মনে করে তা হলে আমি তাদের আহাম্মুকির সুযোগ নিয়ে দু পয়সা রোজগার করব না কেন?— বলতে বলতে শীলা তার মানসিক উত্তেজনাকে চাপা দিতে হুইস্কির গেলাসে লম্বা এক চুমুক দিলে।

সজ্জন যেন তার হারানো কথার খেই খুঁজে পেয়েছে, বিয়ে আর তার আচরণসংহিতা মানুষের মনকে নীচু দিকেই নিয়ে যায়। এসব ভণ্ডামির শেষ হওয়া উচিত।

—আরে, সব গলেপচে ভুস হয়ে যাবে। পুরুষ আর স্ত্রী

যেদিন সমানভাবে উচ্চশিক্ষিত হবে সেদিন এই আচরণসংহিতা নিজের গলায় নিজেই দড়ি দিয়ে মরবে।

—আচ্ছা, এবার তাহলে ওঠা যাক যক্ষ মশাই। শীলা মহিপালের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললে— ঘড়ির কাঁটার দিকে নজর আছে? ওদিকে বাড়িতে তোমার পথ চেয়ে বিরহিণী বসে আছেন।

দুজনের অস্ফুট হাসি শোনা গেল। মহিপাল অপ্রস্তুত হয়ে ঘড়ি দেখল, রাত তখন একটা বেজে চল্লিশ মিনিট।

দশ

ফুটপাথের ধারে একপাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে, গাড়ির দরজা খুলে দিতে দিতে শীলা মহিপালের দিকে তাকিয়ে বললে— বাড়ি গিয়ে কিন্তু তোমার মিসেস ডার্লিংয়ের ওপর অহেতুক ঝাঁঝ ঝাড়ার চেষ্টা কোরো না যেন, সত্যিই আজ বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

—হ্যাঁ, কিন্তু মাঝে মাঝে একটু আধটু দেরী হয়ে গেলে ক্ষতি আছে কিছু? সত্যি বলছি, আমি যদি আর্টিস্ট হতাম তাহলে আমার ছবির রঙ ভরার সময় তুলিটা বেশ করে কাদামাটি রঙে ডুবিয়ে নিতাম। কেবল বোধহয় হৃৎপিণ্ডটাই উজ্জ্বল, আর মাথা? সেটা কোনমতে টাল সামলে চলছে বটে তবে নানা চিন্তার

জালে এমনিই জড়িয়ে রয়েছে, ওঃ··· শীলা তুমি আমার অবসাদের মুহূর্তের সঙ্গিনী আর কল্যাণী··· সে আমার দেউলে জীবনের নিষ্ঠা। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো— এ জীবনে তোমাদের দুজনের ঋণ আমি শোধ করতে পারব না।

শেষ হয়ে আসা ব্যাটারির টর্চের মত মহিপালের চোখে অবসাদের ছায়া নেবে এল। শীলা মহিপালের গালে টোকা মেরে বললে— খোসামুদি করায় ওস্তাদ, এখন তুমি নিজের শরীরের দিকে একটু নজর দাও তো, হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা উজাড় করে ঢেলে দাও সাহিত্যের ভাণ্ডারে··· বাকী যা আছে সব ভুলে যাও।

অন্ধকারের মধ্যে মুহূর্তের জন্য যেন দুজোড়া চোখের পাতা একে অন্যের স্পর্শে তাদের হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। শীলার দুটি চোখের মণিতে ভালোবাসার জ্যোতি আর মহিপালের চোখে শ্রান্ত পথিকের বেদনা। চিরন্তন প্রেমের আবেগে শীলার অধর অব্যক্ত আনন্দে কেঁপে উঠল কিন্তু মহিপাল যেন এই পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে শূন্যতার রাজ্যে সাঁতার কেটে চলেছে। হায় রে ভাগ্যের বিড়ম্বনা!

—আবার কবে দেখা হবে?

—কিছু লিখব ভাবছি— মহিপাল গাড়ি থেকে নামতে নামতে উত্তর দিলে।

—আমার এখানে চলে এসো, দুপুরে খেয়েদেয়ে আমার বাড়িতে বসে লিখো।

—একবার সমাধিতে ধ্যানস্থ হলে সাধু স্থান ত্যাগ করে না তা জানো?··· যদি বিকেল পর্যন্ত তোমার ওদিকে আসার ইচ্ছে হয় তাহলে টেলিফোন করে সোজা চলে আসব।

—না, তা হবে না, কাল বিকেলে তোমায় আসতেই হবে—কাল ক্রিসমাস ইভ···।

—ওহো, এই দেখো, আমি একেবারেই ভুলে গেছি··· আসব ···কাল তাহলে আমি··· সন্ধে সাৎটা নাগাত পৌঁছে যাব।

দুজনের 'গুড নাইটের' মৃদু আওয়াজ গাড়ির স্টার্টের আওয়াজে মিলিয়ে গেল। শীলার গাড়ির পেছনের লালবাতির দিকে মহিপাল কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর হতাশ হয়ে সে অসাড় পাদুটোকে টানতে টানতে বাড়ির গলির দিকে চলল। বড় রাস্তা থেকে পাশের সরু গলিতে নামার জন্য পুরোনো ইট বাঁধানো তিন ধাপ সিঁড়ি আছে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে পা দিতেই সেই ছোট্ট গলির নিঝুম রাতের সঙ্গে মহিপালের মনের শূন্যতা যেন মিশে একাকার হয়ে গেল। ঘুমন্ত গলির প্রতিটি বাড়ির বন্ধ দরজা যেন তাকে এক অজানা মায়াপুরীতে পা দেবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। দু'পাশে উঁচু উঁচু বাড়ির দেয়াল যেন শীতের রাতে গা ঢাকা দিয়ে ঘুমিয়ে আছে। এই গণ্ডিবদ্ধ জীবনযাত্রার হাত থেকে সে কি কখনো মুক্তি পাবে? পৃথিবীর সীমানা কত বিরাট? তার কল্পনা করা কত কঠিন··· মহিপাল আপন মনে ভেবে চলেছে— আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র দেশবিদেশের সীমিত সাম্রাজ্যের পরিধি ছাড়িয়ে সম্পূর্ণ মানবজাতিকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

সরু গলির মধ্যে গোরু এমুড়ো ওমুড়ো জুড়ে আধিপত্য জমিয়ে বসে আছে। পাশের গলি থেকে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ তার থেকে দু'হাত দূরে, ওপরতলা থেকে ধপ করে কিছু পড়ার শব্দে মহিপালের কান খাড়া হয়ে উঠল। সে চমকে উঠল, সেই শব্দে নিস্থুতি রাতের স্তব্ধতা ভঙ্গ হয়ে গেল। এত রাত্তিরে

কে জেগে আছে? কী জিনিস পড়ল? গলির আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে যেন তার চোখের সামনে সাদা একটি ছোট পুঁটলি ভেসে উঠল। তার মনে হল পুঁটলির মধ্যে সদ্যোজাত শিশুর লাশ আছে, তার অসাড় পায়ে যেন হঠাৎ বিদ্যুতের গতি দেখা দিল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে কাছে যেতেই সে নিজের আবিষ্কারে নিজেই হেসে ফেলল— একটি পুরোনো তেলচিটে তুলো-বের-করা বালিশ। মানুষের কাণ্ডজ্ঞান দেখে সে সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে।··যাক···এই বিরাট পৃথিবীতে সে একা, সম্পূর্ণ একা, একাই তাকে শরীরের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে··এই ঘুমন্ত মায়াপুরীর বন্ধ দরজা আর বাড়ির ঘেরা দেয়ালের ভেতরে কত চেনা-অচেনা, নাম-জানা বা অজানা মনের কাহিনী ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় আছে, এসবের খোঁজ কে রাখছে? মহিপালের কল্পনায় চোখের সামনে যেন এক এক করে সব বন্ধ দরজা নিজে থেকেই খুলে গেল। কেউবা পুরোনো ময়লা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে খড়ের বিছানায়, কেউ তুলোর লেপ নিয়ে ভালো কাঠের পালঙ্ক বা ভাঙা খাটিয়াতে শুয়ে আছে, ঘুমন্ত পাড়ার ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কেউ হয়তো বিরহের আগুনে জ্বলেপুড়ে সারারাত চোখ চেয়ে কড়িকাঠ গুণছে। কেউ হয়তো বাহুবেষ্টনে প্রেমালাপে মত্ত হয়ে বিনিদ্র রজনী উপভোগ করছে। এই সারি সারি বাড়ির মধ্যেই জগদম্বা সহায়ের মত কত পুরুষ জৈবিক ক্ষুধার বশবর্তী হয়ে পাপাচার করছে। কত মেয়েদের এই ক্ষণিক মুহূর্তের দৈহিক সুখের মূল্য কাল আগুনে পুড়ে শেষ হবে।

মহিপালের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। সারা শরীরে টান ধরছে।

ভেবে দেখতে গেলে এ জীবনটা সত্যিই এক জটিল সমস্যা। এখানকার বাসিন্দাদের জীবনের সমস্ত সমস্যা, গলিঘুঁজি, রাস্তা-ঘাট, বাজার, পুরোনো প্রথা আর ইতিহাসের জর্জরিত পাতা নিয়ে এই পাড়া। মানুষ আর শয়তান এখানে একসঙ্গে বাস করে। বড়লোকের অট্টালিকা থেকে নিয়ে গরীবের কুঁড়েঘরের পর্যন্ত এখানে পাড়া হিসাবে একই নাম-ঠিকানা। ভদ্রলোককে নিজের ভদ্রতার পরীক্ষা এখানে চারজনের মধ্যে রোজই দিতে হয়, চোর বদমাইস, খুনী সব একই গলিতে গায়ে গায়ে রয়েছে।

…সময়ের চক্রের সঙ্গে সমস্যার রূপ বদলাতে থাকে। বড় বড় অট্টালিকার জায়গায় দেখা দেয় ভাঙাচোরা স্তূপ, কিছুদিন পরে সেই জায়গায় আবার নতুন বাড়ি তৈরি হয়… নতুন পুরোনোর এই লীলাখেলার মাঝে নতুন আশার স্পন্দন নিয়েই এই গলির জীবনচক্র চলতে থাকে। মানুষের জীবনযাত্রার চিরন্তন রহস্য পৃথিবীর বুকে ঘড়ির টিকটিক শব্দের মত একইভাবে চলেছে।

বাড়ির দরজার কাছে পৌঁছে মহিপাল থমকে দাঁড়াল, কড়ায় হাত রেখে স্বগতোক্তি করল— মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে না তো? নিজের মনকে আবার বোঝাল— অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। মহিপালের চেহারায় সংকোচ দেখা দিল, সে কোনমতে কড়া ধরে নাড়া দিলে।

—কে? ভেতর থেকে কল্যাণীর আওয়াজ শোনা গেল।

—আমি।

খট করে কপাটের খিল খোলার শব্দ হতেই দালানের বাতি তার চোখে এসে পড়ল। এক মিনিট স্বামী-স্ত্রীতে চোখাচোখি হল, কিন্তু পরমুহূর্তে চোখ বাঁচিয়ে মহিপাল বৈঠকখানার দরজা

খুলে সুইচের দিকে হাত বাড়াল। বাইরের দরজার খিল বন্ধ করে কল্যাণী মৃদু গলায় স্বামীকে প্রশ্ন করলে—এখানে পড়বে?

—লিখব। ভারী গলায় মহিপাল স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে টেবিলের সমস্ত কাগজপত্তর এমনভাবে ওলটপালট করা আরম্ভ করলে, যেন তার কোন বিশেষ দরকারী কাগজ হারিয়ে গেছে।

—আমাকে দুটো পান সেজে দিয়ে যেয়ো। কল্যাণীর দিকে পেছন ফিরে মহিপাল বললে।

—পানের কৌটো সামনেই রাখা আছে।

পানের কৌটো থেকে একসঙ্গে চারটে খিলি মুখে পুরে দিয়ে মহিপাল এমন নিশ্চিন্ত মনে চিবুলো, যেন চোর চুরি করে চোরাই-মাল সমেত তার আস্তানায় পৌঁছে গেছে। স্ত্রীকে শোবার ঘরের দিকে যেতে দেখে সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। একটু দোক্তা মুখে দিয়ে পানকে আরো ঝালিয়ে নিলে।

দুদিন থেকে বাড়িতে স্বামী-স্ত্রীর ভেতরে রীতিমত খটাখটি চলেছে। কাল দুপুরে বেশ ঝড় বয়ে গেছে, আজ সকালেও প্রভাতী সূর্যি নমস্কারের পরেই পালা আরম্ভ হয়েছে। দুপুরে আধখাওয়া ভাতের থালা সরিয়ে দিয়ে সে চলে গিয়েছিল। কাল থেকে সংসার খরচ নিয়ে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা চলেছে। দেড়মাস হল, তার আয় থেকে ব্যয় বেশী। সেপ্টেম্বর মাসে বড় মেয়ের ডবল নিমোনিয়া হয়েছিল, অনেক চিকিৎসা করে তবে সে সুস্থ হয়েছে। কর্নেল আর ডাঃ শীলার জন্য চিকিৎসার বেশীর ভাগ খরচের হাত থেকে সে রেহাই পেয়েছিল বটে কিন্তু মানসিক অশান্তির দরুন এতদিন কিছু লিখতে পারেনি। নভেম্বর মাস থেকে তার ভীষণ টানাটানি

চলছে। ডিসেম্বর মাসে তার লেখা বইয়ের রয়েলটির প্রায় দেড় পৌনে দুহাজার টাকা তার পাওনা ছিল, কিন্তু সেদিন পাবলিশার্সের চিঠি পেয়ে তার সে আশায়ও ছাই পড়েছে। তারা চিঠিতে জানিয়েছে যে বাজার মন্দা চলছে, তাই টাকা ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চ মাসে পাঠাবে।

মহিপালের বাড়িতে নয়জন প্রাণী, দুবেলা দু'মুঠোর জন্য অন্তত-পক্ষে সাড়ে তিন বা পৌনে চারশো টাকার দরকার। তার দুই ছেলে হর্ষবর্ধন, শ্রীবর্ধন আর ভাগ্নী শকুন্তলা— তিনজনেই ইণ্টার-মিডিয়েটে ফাইনাল ইয়ারে পড়ছে। পনেরো বছরের রাজ্যশ্রী নাইন্থ ক্লাসের ছাত্রী, সিদ্ধার্থ ক্লাস ফাইভে, সাত বছরের তপোধন ক্লাস টুতে আর অনামিকা মাত্র এক বছরের দুগ্ধপোষ্য শিশু।

মহিপাল রেডিওর জন্য নাটক, মাসিক পত্রিকার জন্য গল্প ইত্যাদি লেখে। ইদানীং পাঁচ ছয় মাস থেকে একটি স্থানীয় খবরের কাগজ 'হাসির তুবড়ি' কলমে লিখে প্রায় মাসে দেড়শো টাকার বাঁধা আয় হয়ে গেছে। বাজারে তার সব মিলিয়ে এগারোখানা বই প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তার থেকে আয় বড় একটা হয় না। বর্তমানে (প্রকাশকদের মতানুসার) বাজারে রসাপ্লুত সাহিত্যের চাহিদাই বেশী, মহিপালের উপন্যাসে সেই রসের নিতান্তই অভাব। সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা ভালো উপন্যাস বিক্রি হয় কিন্তু··· এই কিন্তুর উত্তর পেতে হলে মাসিক পত্রিকার সমালোচনার পৃষ্ঠা ওলটাতে হবে। যে লেখকদের রচনার ভালো সমালোচনা ছাপা হয় না, সে লেখকের খ্যাতি আর পসার দুটোই কমে যায়, দোকানে তার বইয়ের মলাটে ধুলো জমতে থাকে। মহিপালের রচনা এই শ্রেণীভুক্ত তাই এই নিয়ে সে অনেক কটূক্তি করে থাকে। তার

মতে, যে লেখকরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে চুপপাপ কোনরকম বোঝাপড়া করে নিতে পারে, তাদের খ্যাতি আর পসার অন্যদের থেকে বেশী হয়। মহিপালের পক্ষে এধরনের বোঝাপড়া করা সম্ভব নয় সেজন্য তার নাম আজ পর্যন্ত কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত হয়নি। এইভাবে লেখক সমাজ থেকে নিজেকে জাতিচ্যুত করে সে এক কোণে চুপচাপ বসে আছে। দিনের পর দিন তার এই একগুঁয়ে স্বভাব তাকে মানসিক শূন্যতার দিকে নিয়ে চলেছে। অভাব-অনটনের বোঝা দিনের পর দিন ভারী হয়ে চলেছে। সংসারের চাহিদা তাকে হাঙরের মত গ্রাস করে ফেলবে। ইদানীং এর কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কখনো কখনো সে হঠাৎ বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে। কল্পনার মায়ানগরী থেকে বাস্তব জগতের ধরাতলে পা দিলেই সে নিজেকে দোষী মনে করে, ভগবান রাম, বুদ্ধ, মহাবীর, যীশু, গান্ধী আর প্রাচীন ঋষিদের ত্যাগের কথা ভেবে, আবার দ্বিগুণ উৎসাহে লিখতে আরম্ভ করে। তার দৈনিক জীবনধারা এইভাবে বয়ে চলেছে। ভাবুক মনের রচনাশক্তি আর অফুরন্ত কল্পনার স্রোতের কিনারে দাঁড়িয়ে সে আকণ্ঠ পিপাসার যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে মরছে।

বৈঠকখানা থেকে কল্যাণী চলে যেতেই মহিপালের মনের সাধুভাব আবার চাড়া দিয়ে উঠল। এতদিন পরে সে হঠাৎ আবিষ্কার করল যে কল্যাণীকে বড় বুড়ী বুড়ী দেখাচ্ছে। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে তার মাথার চুলে পাক ধরে গেছে, মুখে বয়সের রেখা ফুটে উঠেছে। স্ত্রীর অকাল বার্ধক্যের জন্য সে নিজে দোষী! এ কথা ষোলো আনা ঠিক যে সাহিত্য বা আর্টের বিষয়

সে কল্যাণীর সঙ্গে চর্চা করতে পারে না। কল্যাণী সব সময় ঘরসংসারের সমস্যা, আত্মীয়স্বজন আর লৌকিকতার কথাই দিনরাত তার কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করতে থাকে। কিন্তু তার মত একনিষ্ঠতা সবার মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। পরিবারের প্রত্যেক প্রাণীকে সুখী করার জন্য সে দিনরাত হাড়ভাঙা খাটছে। কল্যাণীর ত্যাগের সামনে মহিপালের মাথা নিজে থেকেই নত হয়ে যায়।

কল্যাণী একহাতে রেকাবিতে দইবড়া আর অন্যহাতে জলের গেলাস নিয়ে ঘরে ঢুকল। হঠাৎ ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় মহিপাল চমকে উঠল। কল্যাণীর আসার পূর্বসূচনা যদি সে পেত তাহলে হয়তো লেখার টেবিলে ঝুঁকে পড়ে ধ্যানস্থ হওয়ার অভিনয় করতে পারত, কিন্তু এ যেন সে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে। কাগজ কালি-কলম থেকে দূরে দেয়ালে বালিশে ঠেসান দিয়ে চুপচাপ সে প্রায়শ্চিত্ত করার মুডে বসে ছিল। পুরুষ মানুষ তার আত্মম্ভরিতায় আঘাত সহ্য করতে পারে না তাই সে নিজের মানসিক অবস্থা জীবনসঙ্গিনীকেও জানাতে নারাজ। এইজন্যই কল্যাণীকে আচমকা ঘরে দেখে সে থতমত খেয়ে গেছে।

কল্যাণী টেবিলে জলের গেলাসটা রেখে কোণের ছোট স্টুল থেকে খবরের কাগজ উঠিয়ে জিজ্ঞেস করলে—এটা পেতে দেব? তোমার কাজের নয় তো?

—পেতে দাও, এটা কি? বেসমের হালুয়া? মহিপাল তাড়াতাড়ি পিকদানি উঠিয়ে পান দোক্তা থুথু করে ফেলে দিয়ে গেলাশের জলে কুলকুচো করে নিলে।

হালুয়া আর দইবড়ার রেকাবি রাখতে রাখতে কল্যাণী বললে—

বড় ছেলে অনেক দিন থেকে বলছে যে হালুয়া খাব, তাই আজ ভাবলুম যে হালুয়া আর কড়াইয়ের ডালের দইবড়া করে ফেলি।

—বাঃ বেশ গরম গরম··· খেতে খুব ভালো হয়েছে। এলাচদানা চিরৌঞ্জিদানা শুকনো নারকেল কুরো দিয়ে তৈরী বেসমের হালুয়া মহিপালের প্রিয় ডিশ।

কল্যাণী বললে— এখুনি ইলেকট্রিক হীটারে গরম করে এনেছি ···সকালে তুমি থালা সরিয়ে উঠে গেলে, আমার সারাটা দিন বিশ্রী কাটল··· কথা শেষ করার আগেই তার গাল বেয়ে জল গড়াতে লাগল। কান্নার বেগ চাপতে গিয়ে তার ঠোঁট থর থর করে কেঁপে উঠল। মহিপালের মন সহানুভূতিতে ভরে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে— আচ্ছা! বড় ছেলের নাম করে আমার মানভঞ্জনের পালা হচ্ছে?

কল্যাণীর শুকনো মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। মহিপাল রসিকতা করে বলল— দেবী, আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন, এবার তুমিও এক চামচে···

—না, না, আমি খাব না।

—কেন? ছোঁয়া গেল নাকি? আরে বাবা, রান্নাঘরে না খেয়ে যদি বৈঠকখানায় বসে খাও তাহলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

—আমি তোমাকে মানা করেছি? আমার আচার-বিচার তোমার জন্যেই···

—চুলোয় যাক তোমার আচার-বিচার— খাও— আদর করে মহিপাল চামচে স্ত্রীর মুখের কাছে ধরতেই সে নাকমুখ সিঁটকে একটু পেছনদিকে মাথা কাত করে দৃঢ়স্বরে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে

মাথা নাড়লে—না, না। রাগে মহিপালের ভ্রূ কুঁচকে গেল, কিন্তু কোনমতে নিজেকে শান্ত করে সে গম্ভীর ভাবে বললে—স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন, বিবেকানন্দ কে ছিলেন জান?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছবিতে দেখেছি।

—আমাদের হিন্দুধর্ম আর আমাদের ভগবানের বিষয় তিনি বলে গেছেন যে আমাদের ভগবান ডাল-ভাতের হাঁড়ি, আর হিন্দু-ধর্মের প্রকৃত রূপ কী শুনতে চাও?

কল্যাণী স্থাণুর মত স্বামীর মুখের দিকে উৎসুক ভাবে চেয়ে আছে।

—আমাদের সনাতন হিন্দুধর্মের অবস্থা ঠিক সেই হিজড়ের মত যে নাকের কাছে আঙুল নিয়ে চোখ নাচিয়ে আশেপাশের ভীড়কে সচেতন করে বলে—দূরে সর, দূরে সর, ছুঁয়ে ফেলো না যেন, আমি একেবারে পবিত্রতার অবতার।

ধর্মকে নিয়ে এ ধরনের হাসিঠাট্টা কল্যাণীর যেন ভালো লাগছে না, তার ধর্মভীরু মন অজানা আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে উঠছে। মুখের কথা শেষ করে মহিপাল আধখাওয়া হালুয়ার প্লেট সরিয়ে দিয়ে দইবড়া খেতে খেতে কল্যাণীর প্রতিবাদ শোনার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে তার মুখের দিকে চাইলে। কল্যাণীর স্বর কাঁপছে—দেখো, আমরা গেরস্থ মানুষ, ভগবান নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করাটা ঠিক নয়, ভীষণ পাপ হয়।

—পাপ, শালা তোমার ওই রান্নাঘরের আচার-বিচারের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। এটা ছুঁয়ে দিলে সেটা ছুঁয়ে দিলে—রামঃ রামঃ। একটা কথার উত্তর দেবে? তুমি হালুয়া রান্নাঘরে রাঁধো কেন? সেখানে পিঁড়ি পেতে বসে খাও আর সকলকে

পরিবেশন করো কেন? তোমার আচার-বিচারের মাপদণ্ডে তাহলে এটাও পাপ? স্বামীর প্রশ্নে কল্যাণী থতমত খেয়ে বললে— কেন?

—আরে, এটা আরব দেশের মুসলমানদের খাওয়া বুঝলে?

—তাতে আমার কি? মুসলমানরা তাদের বাড়িতে রান্না করে। আমরা পাঁচজনে আমাদের রান্নাঘরে রাঁধি।

—তাই তো আমি তোমায় প্রশ্ন করছি যে রান্নাঘরেই বা রাঁধা কেন আর এই 'পাঁচজন' শব্দের প্রতিটি অক্ষরে পবিত্রতা-অপবিত্রতার গন্ধ পাও কেন?

—না তো··· কল্যাণীর মুখে আর কথা জোগাচ্ছে না। হঠাৎ মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলে সে মহা মুশকিলে পড়েছে।

—না মানে? যদি শব্দ অপবিত্র নয় তবে তুমি গাজর খাও না কেন? এতে 'গ' শব্দ আছে বলে? দইবড়া খাও কেন? (উত্তেজনায় দইবড়ায় বড় কামড় দিয়ে) বাঃ বেশ নরম হয়েছে।

—বড়ায় 'গ' আবার কোথা থেকে এল? দইবড়ার প্রশংসা শুনে খুশি হয়ে কল্যাণী মুখ টিপে হাসলে।

—তেলুগু ভাষায় হয়— সে তুমি বুঝবে না। যাও, দুটো বড়া আর একটু লাল লঙ্কার গুঁড়ো তার ওপর ভালো করে ছড়িয়ে ঝটপট নিয়ে এসো।

কল্যাণী হেসে ফেলল— এত রাতে আর খেয়ো না। আমার মন কেমন করছিল তাই দুটো নিয়ে এলাম। বাকী কাল সকালে খেয়ো।

—গিন্নীর আজ্ঞা শিরোধার্য— বলে মহিপাল একচামচে দই মুখে দিলে। স্ত্রীর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টার ছলে যে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা হয়েছিল

সে বিষয়ে সে গভীরভাবে ভাবতে আরম্ভ করলে—হালুয়া বিদেশী খাওয়া, তবু আজকে ভারতের প্রতি রান্নাঘরে সে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। এইভাবে প্রত্যেক দেশের পাকপ্রণালী, আচার-বিচার, থাকা পরা অন্য দেশের খাওয়া-পরার সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে যায়। এই বড়া ভারতে কোন স্ত্রী বা পুরুষ প্রথমে তৈরী করে থাকবে, তারপর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় নানা ভাবে তাকে তৈরী করার পর আমাদের আজকের সম্পূর্ণ ভারতের পাকপ্রণালীতে সে বিশেষ স্থান পেয়ে গেছে। এইভাবে ধীরে ধীরে সংস্কৃতির বিকাশ আর প্রসার হয়। বিচিত্র মানবজীবনের গতি, কত জটিল অথচ কত সরল। ·

কল্যাণীর গলার আওয়াজে মহিপালের চিন্তার সূত্রে টান পড়ল। —আজ বিকেলের দিকে পার্বতীর মা এসেছিল, বেচারাদের সংসারের অবস্থা খুবই খারাপ, সেই শুনে অবধি আমার মন কেমন করছে।

—কি হয়েছে? মহিপাল হালুয়ার প্লেট হাতে নিলে।

—কী আর বলি? পার্বতীর বাবা এমনই বাপ যে সন্তানকে খালি পেটে ঘুম পাড়িয়ে নিজে ফুর্তি করছে, হায় ভগবান, সাতজন্ম নরকেও জায়গা হবে না, বাপ না কসাই?

পার্বতী পাড়ার দফতরী বাবুর বড় মেয়ে। আঠারোর কোঠায় পা দিয়েছে কিন্তু না হয়েছে লেখাপড়া, না হয়েছে বিয়ে। তার পেছনে পাঁচ ভাই-বোনের লাইন। মহিপালের বাড়ির গা ঘেঁষে পার্বতীর মাসী থাকে। পাঁচ বছর হল মেসো জলন্ধরে বদলী হয়ে গেছে। তিনি সেখান থেকে নিয়মিত মোটা টাকা সংসার-খরচ পাঠান বটে কিন্তু সে টাকা সোজা মাসীর বাক্সে চলে যায়। পার্বতীর বাবার সামান্য আয় থেকেও বেশীর ভাগটাই মাসী

হস্তগত করে নিচ্ছে। পার্বতীর মা নিজের ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে বোনের সংসারে লাথি ঝাঁটা খেয়ে মরছে। পাড়ার অলি-গলিতে শালী আর জামাইবাবুর প্রেমের গল্প সকলের রসনার খোরাক জোগাচ্ছে।

মহিপাল খালি রেকাবি খবরের কাগজের উপর রেখে জলের গেলাসের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে বললে— কোন নতুন ব্যাপার হয়েছে না কি?

—আরে, এ মাসের মাইনে সবটাই শালীর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। পার্বতীর মা আমার কাছে কতই-না কাঁদলে, যে, ভাই, আমি সব সহ্য করতে পারি কিন্তু পেটের ছেলেমেয়েকে ক্ষিদেয় চেঁচাতে দেখে কি করে চুপ করে থাকি বলো তো?

মহিপালের মন আর শরীর পাথরের মত হয়ে যাচ্ছে। কল্যাণী ধরা গলায় বললে— আমায় বললে যে তোমার কর্তার কত জায়গায় চেনাশোনা আছে, বড়লোকেদের মধ্যে ওঠাবসা করেন, আমার কোন ছেলের যদি একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে দিতে পারেন তাহলে আমরা দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খাওয়া আর ছেঁড়া···।

কান্নায় কল্যাণীর বুক ভেসে যাচ্ছে। কান্নার আবেগে গলার স্বর বুজে গেল। মহিপাল চুপচাপ পাথরের মূর্তির মত বসে আছে। কোনমতে কল্যাণী নিজেকে সামলে নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বললে— আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। নিজের ছোট ছোট সন্তানকে বাড়ির বাইরে উপার্জন করতে পাঠাবার কথা বলার সময় মায়ের বুকে কেমন শেল বেজে থাকবে··· বলতে বলতে সে আবার কেঁদে ফেলল। গভীর নিশ্বাস ফেলে মহিপাল বললে—

পেট, [illegible] এই পাপী পেট করায়। মাও নিজের বুকে পাথর চাপা দিয়ে নেয়··· ইচ্ছে করছে এই ব্যাটা দীপনারায়ণকে গিয়ে বেশ উত্তম মধ্যম পেঁদিয়ে দি··· মারতে মারতে তার সব কলকব্জা ঢিলে করে···

এক মুহূর্তে মায়া মমতা একদিকে ফেলে দিয়ে গিন্নীর মত কড়া হুকুমের স্বরে কল্যাণী ফরমান জারি করলে— খবরদার, তোমাকে আগে থেকে বলে রাখছি, ছনিয়ার ঝঞ্ঝাটে পড়ার কোন দরকার নেই। আমাদের পরের ধানে মই দিতে যাবার কী দরকার? আমাদের যতটুকু করা উচিত ছিল ততটুকু করে দিয়েছি। তুমি কেন ছনিয়া শুদ্ধ লোকের শক্রতা কুড়োতে যাবে? বলতে বলতে কল্যাণী ভেতরে চলে গেল।

মহিপাল একা বসে নিজের আচরণের উৎসমূল সন্ধান করতে আরম্ভ করলে। আমিও কি দীপনারায়ণের মত ছোটলোক নই? নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করি, তার আড়ালে অনেক পাপাচার করছি। যদিও আমি বাজে খরচ করি না তবু নিজের ছেলেমেয়েকে ছবেলা পেট ভরে ভালো খেতে পরতে দিতে পারি না··· কাল ক্রিসমাস ইভে শীলাকে কিছু উপহার দিতে হবে··· পকেটে মাত্র পাঁচটি টাকা পড়ে আছে আর পয়লা তারিখে কিছু প্রাপ্তিরও আশা নেই। দৈনিক কাগজের বাঁধা আয় আট-দশ তারিখের আগে হাতে আসে না। এ কয়টা দিন সংসার খরচের কী ব্যবস্থা হবে?

কল্যাণী ঘটিতে করে জল নিয়ে এল। পিকদানি সামনে রেখে স্বামীর হাতমুখ ধোবার জল দিতে গিয়ে মুখের কাছে দাঁড়াতেই হাল্কা গন্ধ নাকে গেল, কল্যাণী নাক সিঁটকাতেই মহিপাল চুরির দায়ে ধরা পড়ায় অপ্রস্তুত হয়ে বললে— ম্যাডাম্,

আজ একটু খেয়ে ফেলেছি, সজ্জনের বাড়ি··· সকলে অনেক আগ্রহ করে বললে।

পিকদানি কোণে রেখে বাঁ হাতে জল ঢালতে ঢালতে কল্যাণী অনুযোগের স্বরে বললে— ওরা বড়লোক তাই ওসব ছাইভস্ম গেলে আর সঙ্গে ভালো ভালো জিনিস খায়। তুমি ওইসব খেয়ে খেয়ে দেখো না শরীরের কী হাল করেছ।

—তুমিও যেমন, আমি রোজ রোজ খেতে যাচ্ছি? হ্যাঁ, কাল আর পরশু দুদিন ক্রিসমাস, আগে থেকেই জানিয়ে রাখলুম, একটু খাব— রাগ করবে না তো? টেবিল থেকে পানের কৌটো আর দোক্তার ডিবে এগিয়ে দিয়ে কল্যাণী বললে— যদি রাগ না করো তাহলে একটা কথা বলি।

—বলো।

—থাক্, আর বলে কাজ নেই, দু'দিন পরে এতক্ষণে আমার গ্রহ-নক্ষত্র একটু প্রসন্ন হয়েছে। পান খেয়ে দোক্তার ডিবে স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে হেসে মহিপাল বললে— অভয় দিচ্ছি দেবী, মনের কথা নির্ভয়ে বলো।

—শকুন্তলার বিয়ের কথা ভাবছিলুম, ভালোটা কারুর চোখে পড়ে না, মন্দটা তখুনি আঙুল দিয়ে দেখাবে— বলতে বলতে সামনের চেয়ারে কল্যাণী পা-দুটো তুলে দিয়ে বসল।

বালিশে ভালো করে ঠেসান দিয়ে বসতে বসতে মহিপাল বলল— আরে, আমরা বাংলার শুক্লা বামুন— কোন্ ব্যাটার এত সাহস যে আমাদের দিকে আঙুল ওঠায়!

কল্যাণী ফিক করে হেসে ফেললে— বাব্বাঃ, বাংলার শুক্লা বামুন এমন ঘাড় উঁচু করে কথা বলছেন যেন প্রপিতামহের তালুকদারি

সব তোমার নামেই লেখা আছে। (ক্রমশ গম্ভীর হয়ে) যদি আজ ট্যাঁকে লক্ষ দুলক্ষ থাকত তাহলে আমাদের সামনে কেউ চোখ তুলে তাকাবার সাহস করত? আমাদের গট্টু বড়লোক, যাই করুক থাকবে সেই বালা। সেদিন মুল্লারের মা আমাকে শুনিয়ে বলছিল··· তোমার বিষয়, যে তোমার নাকি নামডাক আছে, কিন্তু বড়লোক তো নও, আমাদের কাছে কী আছে যে ভাগ্নীর বিয়ের দেনা-পাওনার ব্যবস্থা করব।

মহিপালের মন মুল্লারের মা আর সারা সমাজের প্রতি ঘৃণায় বিষিয়ে উঠল। তার ছোটভাই লক্ষ্ণৌ শহরের মস্ত নামী ডাক্তার, ডাঃ জয়পাল শুক্ল (ডাকনাম গট্টু)। তার সাংসারিক প্রতিপত্তির সামনে নিজের কথা ভাবতেই যেন অজস্র নাগফণীর কাঁটা তার হৃদয় ঝাঁঝরা করে দিল। আর্থিক অভাব-অনটনের সামনে তার সাহিত্যিক বৈভব হার মেনে গেছে। উত্তেজনায় আর উদ্বেগে সে সোজা হয়ে বসে জোর গলায় বললে— আমিও দেখে নেব আজ থেকে দশ বছর পরে কে বড়লোক হবে, গট্টু না আমি? এ পয়সার দুনিয়া বেশীদিন টিকবে না। আজকে সমাজের শাসন বেইমান ডাকাতদের হাতে। তাদের হাতেই আমাদের জনজীবনের মর্যাদার মাপকাঠি, যারা ক্ষণিকের এ চোরাকারবারির মধ্যে নিজেদের মোটা পয়সা চালাবার চেষ্টায় আছে তারা ভুলে যাচ্ছে যে কোটি কোটি লোক পেটে ক্ষিদের জ্বালা নিয়ে পাগলের মত তাদের পেছনে ছুটে আসছে। তারা যখন এই আঙুলে গোনা বড়লোকদের পুড়িয়ে শেষ করে দেবে তখনই আমাদের দেশের মেয়েরা পাবে সত্যিকারের মর্যাদা, সে হবে··· অমূল্য··· চোর বদমাইসের দল··· আমার অভাব নিয়ে ঠাট্টা করছে?

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সে তক্তপোষ থেকে উঠে ঘরে পায়চারি আরম্ভ করলে।

কল্যাণীর মাথায় স্বামীর লম্বা লম্বা কথা ঢুকল না বটে কিন্তু তার মুখের হাবভাবে সে বেশ ভয় পেয়ে গেছে। সে নিজেই দিনরাত অভাব-অনটনের মধ্যে পিশে যাচ্ছে। সে দেখেছে আর অনুভব করেছে যে পৃথিবীতে ভালো লোকের মূল্য নেই, বেইমান লোকেরাই বেশ চড়চড় করে বেড়ে যাচ্ছে··· এ নিয়ম কবে বদলাবে? না, যা চিরাচরিত ভাবে চলে আসছে তাই চলবে? সবই রাধা-মাধবের ইচ্ছা।

স্বামীর অবস্থা দেখে তার মন বিচলিত হয়ে উঠল, সত্যিই সে বেচারা দুঃখী, দিনরাত এত খাটাখাটুনির পরে দুদণ্ড বিশ্রাম পায় না। লেখাপড়ার কাজে একটু ঘি দুধ না খেলে কি আর মাথা চলে? কিন্তু এক ছটাক ঘি তার ভাগ্যে জোটে না। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে।

বিষম মানসিক পরিস্থিতির মধ্যে সময়ের কাঁটা যেন আর এগুতে চায় না, স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মন আর মাথা সমস্যার ভারে যেন নুয়ে পড়েছে। ঘরের ভেতর কেবল মহিপালের পায়চারির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ কল্যাণীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মহিপাল বলল— বাস্, আমি ঠিক করে নিয়েছি, কালই শিবচরণ দুবের ছেলের সঙ্গে কথা পাকাপাকি করে ফেলব। ছেলেটি বড় ভালো, এ বছর ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বেরুবে, নিজস্ব বাড়ি-ঘরদোর আছে, আত্মীয়স্বজন সকলেই খুব ভদ্র।

মহিপালের উদ্বিগ্ন ভাব দেখে কল্যাণী একটু মৃদু আপত্তির সুরে

বললে— শিবচরণ হবে আমাদের চেয়ে এক শ্রেণী নীচু ঘরের বামুন, আমি কিন্তু গোত্রকুল সব দেখে তবে বিয়ে দেব।

মহিপাল রাগে ফেটে পড়ল— যাও, তাহলে খুঁজে নিয়ে এসো তোমার লক্ষ্ণৌয়ের কোন বাজপেয়ী ঘরের রত্ন— রাজা হরিশ্চন্দ্র— দেনাপাওনার ফিরিস্তির কী হবে?

—তোমার কি মনে হয় যে শিবচরণ কিছু চাইবে না?

—না, সে একেবারে খাঁটি লোক, আমি তার জীবনের সিদ্ধান্ত, আচার-বিচার সব খুব ভালো করে দেখেছি আর বুঝে নিয়েছি।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কল্যাণী বললে— সমাজে মুখ দেখাব কি করে? যদি আজ শকুন্তলার বাবা-মা বেঁচে থাকত তাহলে নিজের মেয়েকে নীচু ঘরের বামুনের হাতে দিত?

—তাহলে ট্যাক থেকে বার করো পনেরো-কুড়ি হাজার। লোকেরা ছেলেমেয়ের বিয়েতে অহংকার আর লক্ষ্মীর গাঁঠছড়াই বাঁধে— নীচ, ছোটলোক সব, মনুষ্যতা বলে এদের কিছু নেই। সেই তেওয়ারিজীকে চেনো তো? তাঁর কাছে ছেলের ঠিকুজী চাইতে গেলে এক মুখ হেসে বলবেন নগদ পঁচিশ হাজার আর আপনার মেয়েকে যা দেবেন ·· ইনি কলেজের প্রিন্সিপাল, বড় লেখক, ইনি সভ্য সমাজের মাথা? ছি-ছি।

উত্তেজিত মহিপাল ছোট ঘরের পরিধির মধ্যে যত তাড়াতাড়ি পারে পায়চারি করছে। হঠাৎ সে কল্যাণীর চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রেখে ভ্রূ কুঁচকে বললে— ভালো করে শুনে নাও, শকুন্তলার বিয়ে শিবচরণের ছেলের সঙ্গে হবে আর ঠিকুজী-ফিকুজী আমি কিছু মেলাব না। যদি এই নিয়ে বেশী ঘ্যানর ঘ্যানর করো তাহলে অন্য জাতে বিয়ে দেব। জাতি-বিচার

মানামানির কথা ছেড়েই দাও, আমি এসব ঘৃণার চোখে দেখি—বুঝলে? আমার কথা কানে যাচ্ছে কি না? কল্যাণী ভয়ে কাঠ। মহিপালের প্রশ্নের উত্তরে চুপ করে যাওয়া ঠিক নয় ভেবে সে কোনমতে সাহস করে উত্তর দিলে— নিজের ছেলেমেয়ের বিয়েতে যা ইচ্ছে তাই করো কিন্তু শকুন্তলা পরের ধন। আজ যদি তোমার বোন বেঁচে থাকত তাহলে তার পরামর্শে তুমি যেখানে হয় বিয়ে দিতে পারতে···।

—আবার তুমি সেই ছোট-বড়র ল্যাঠা নিয়ে বসলে? আমি বার বার বলছি যে জাতে কেউ কারুর চেয়ে ছোট বা বড় হয় না।

—ছোট-বড়র কথা রাখো, কিন্তু যদি শকুন্তলাকে নীচু কুলে দাও তাহলে আমি বিষ খেয়ে মরব।

—দেনা-পাওনা কোথা থেকে আসবে শুনি?

—একা তুমিই গরীব বামুন না? কত আছে আমাদের মত, তাদের বাড়ির মেয়েরা সব আইবুড়ো বসে আছে?

—যারা আমাদের শ্রেণীভুক্ত, তারাই আজ মৃতপ্রায় হয়ে ধুঁকছে। তুমি কখনো খোঁজ নিয়েছ যে তারা কিভাবে বিয়ে-থা দিচ্ছে? বারো মাসের তেরো পাব্বন তারা কিভাবে করে যাচ্ছে? ধার করে— চিন্তায় মাথা খারাপ করে, চোখের জলে হাবুডুবু খেয়ে, পরের সামনে অপমানিত হয়ে। আমার এত মনোবল নেই যে মাথার ওপর দুশ্চিন্তার বোঝা নিয়ে, দিনরাত সুদ আর আসলের হিসেব গুনতে থাকব।

কল্যাণী স্বামীর দুঃখ দেখে অস্বস্তি বোধ করছে। তার নাস্তিক ধরনের কথাবার্তা সে কখনোই সহ্য করতে পারে না। যখন মহিপাল তার প্রতি অত্যাচার করে, তাকে অপমানিত করে, তখন

সে তার স্বামীর স্বভাবের সেই রূপটাকে সহজভাবেই মেনে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ সমাজে বড়লোক, মধ্যবিত্ত আর গরীব সকলের চার দেওয়াল দিয়ে ঘেরা বাড়ির মধ্যে একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি চলেছে— মেয়েদের ওপর পুরুষের শাসন। মহিপাল, তার স্বামী যে অক্ষতহৃদয় নয়, সে যে চরিত্রহীন, এ কথা সে মর্মে মর্মে বোঝে। এইটুকু তার মনের সান্ত্বনা যে গোঁড়া সনাতন ধর্মের পুরুষেরা প্রায় বেশীর ভাগই মাতাল, চরিত্রহীন। সে সহ্য করতে পারে না কেবল মহিপালের বড় বড় বুলি। নিজের চব্বিশ বছরের বিবাহিত জীবনে সে একটা দিনের জন্যও স্বামীর চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেনি। কত বছর ধরে তার মনের কোণে একই প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারছে, যে তার স্বামীর নাস্তিকতায় ভরা রচনার জন্য কি লোকে তাকে সম্মান করে? এইসব কথা রচনায় লিখলে মানসম্মান পাওয়া যায়? এত বছর ধরে ইনি নিজের মতামত লিখে চলছেন, সকলে সম্মান করছে অথচ সমাজ সেই পুরোনো পরিপাটি বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যেই চলেছে। এঁর কথার দাম প্রগতিশীল লোকেরা দিয়ে থাকে বটে কিন্তু সবই যেন তার কাছে বড় অর্থহীন। পৃথিবীতে ভগবানের তৈরী নানা রকমের ধর্মকর্ম, নানা মত, জাত-বেজাত সব এক মিনিটে শুধু এঁর কথায় সব ওলট-পালট হয়ে যাবে? সমাজ নিজের মন্থর গতিতে যেমন চলছিল তেমনি চলবে। সকলেই ধারদেনা করে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিচ্ছে তবে ইনি একাই সে নিয়মের ব্যতিক্রম কেন? কল্যাণী হাঁটুতে হাত বুলোতে বুলোতে দুঃখিত স্বরে বললে— ধারদেনা যাই করো তবু আমার শকুন্তলা তো উঁচু কুলে যাবে। নিজের ছেলেমেয়ের বিয়ের সময় মেথরের ঘর দেখো— আমি মরে গেলেও টু শব্দ

করব না, চুপচাপ গঙ্গার ধারে চলে যাব। ছোট বোনের একটি মাত্র গচ্ছিত ধনকে সনাতন ধর্মের রীতি অনুসারেই বিয়ে দেব— আমার এ কথাটা ভালো করে শুনে নাও। কল্যাণী উঠে দাঁড়াল।

শকুন্তলার বিয়ে, দেনাপাওনা আর স্ত্রীর কড়া কথা, সব মিলিয়ে মহিপাল তিক্ত বিরক্ত হয়ে উঠল। স্ত্রীর চেয়ারের কাছে টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবল পৃথিবীতে নারীজাতিকে বোঝা শক্ত। আদিকাল থেকেই স্ত্রী-চরিত্রকে বোঝার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান সমাজে নারীজাতি এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে ত্রিশঙ্কু হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে আমাদের দেশে এ অবস্থা প্রকৃত রূপে ফুটে উঠেছে। চোখের সামনে ঘরে ঘরে কত মেয়েমানুষ অপমানিত হয়ে লাথি ঝাঁটা, গালাগালি খেয়ে মুখবুজে পড়ে আছে। কেবল গরীব আর মধ্যবিত্ত ঘরেই নয়, বড় বড় সভ্য পয়সাওয়ালা বামুনদের বাড়িতেও সকলের নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে যাওয়া আর ভোগের বস্তু হয়ে থাকাই মেয়েদের জীবনের করুণ কাহিনী। তাদের সমাজ কেবল একটা কাজের জন্যই পুরস্কারস্বরূপ তাদের সম্মান দেয়, তারা মা— তাদের বংশধরের জন্ম দেওয়ার যন্ত্র মাত্র, এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। পুরুষ জাতটা ভালোভাবেই জানে যে স্ত্রী না হলে তাদের সংসার অচল। তবু নারীজাতির এত অপমান! এর পরেও সমাজ ভাবে যে তারা নারীকে যোগ্য মর্যাদা দিচ্ছে!

সমাজের পাথরের ভিত্তির ওপর সংস্কার, ধর্মকর্ম, আচার-বিচারের কল্পনা গড়ে উঠেছে, জনজীবনের সেই ভিত্তিতেই যেন ফাটল ধরেছে।

কল্যাণীকে উঠতে দেখে মহিপালের চিন্তাধারার ছন্দপতন হল— কি হল? কোথায় চললে?

এতগুলো কড়া কথার পর এই সহজ প্রশ্ন শুনে কল্যাণী হেসে ফেললে— হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ, এবার শুতে চলি, তা না হলে এখুনি আবার তোমার তর্জনগর্জন আর কোঁচকানো ভ্রূ দেখতে হবে। অধেক রাত্তিরে পাড়ার লোকের ঘুম নষ্ট হবে। মহিপালও হেসে ফেললে। কল্যাণী আবদারের সুরে বললে— তোমার কি? হাঁক-ডাক করে চলে যাও, আমাকেই পাড়াপড়শির কথা শুনতে হয়, বলে, আরে তোমার কর্তার মাঝে মাঝে মাথায় ভূত চাপে না কি?

মহিপাল অপ্রস্তুত হয়ে মুচকি হেসে উত্তর দিলে— তার মানে তোমার সঙ্গিনীরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে?

কল্যাণী খিলখিল করে হেসে উঠল, শাড়ির আঁচল দাঁতে চেপে বললে— আমার সঙ্গিনীদের দোষ দিচ্ছ? তোমার নিজের ছেলে-মেয়েরাই তামাশা করে, আমায় বলে, মা চুপ করো, তা না হলে এখুনি এটম বোমা ফেটে পড়বে।

মহিপাল হো হো শব্দে হেসে উঠল— সত্যি, আমি তোমার উপর অনেক অত্যাচার করি। ভগবানই জানেন তোমাকে দুঃখ দিয়ে আমি নিজেকে নিজেই দুঃখ দি। তুমি ছাড়া আমার কে আছে বলো? কল্যাণীর অস্তিত্বেই মহিপালের অস্তিত্ব।

কল্যাণী চোখ বন্ধ করে শান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল।

কোলের মেয়ের কান্নার আওয়াজ ভেসে এল, কল্যাণী তাড়াতাড়ি এঁটো বাসন ওঠাতে ওঠাতে বললে— যদি হাতে কিছু কাজ না থাকে তাহলে একটু ওপরে গিয়ে দেখো। তিনটে বাজে বোধহয়।

—আমার ঘুম পাচ্ছে, তুমিই যাও।

এগারো

পঁচিশে ডিসেম্বরের প্রভাত, সকাল নটা বেজেছে। কর্নেল আর সজ্জন দুজনে শিবনাথ শাস্ত্রীর বাড়ি থেকে ফিরছে। কুয়াশা স্তবকে স্তবকে সরে গিয়ে হাল্কা সোনালি রোদ দেখা দিয়েছে, কিন্তু স্যাঁতসেঁতে গলি তখনও তার নাগালের বাইরে।

কর্নেল বললে— ভাই, আজ ভীষণ ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে আশেপাশে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে। সজ্জনের একাগ্রতা ভঙ্গ হচ্ছে না দেখে কর্নেল অন্য কথা পাড়ল— তুমি যাই বলো ভাই, যদি কেউ সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে তাহলে জ্যোতিষ বিদ্যা খুব ভালো জিনিস। আমি আজ শাস্ত্রীজীর ভক্ত হয়ে গেছি।

—হ্যাঁ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে লোকটি উদার আর জ্ঞানী। আজকে মহর্ষি ব্যাসের পাপপুণ্যের ব্যাখ্যা শুনে আমার মনের সব প্রশ্নেরই সমাধান খুঁজে পেলাম— খুব গুণী লোক, একেবারে জলের মত সহজ খোলসা করে সব বুঝিয়ে দিতে পারেন।

—তা আর বলতে, দোকানের চুরি, লব্বুতে আমাদের ভাগ-বাটরা, আমার গিন্নীর নাক-মুখের সঠিক বর্ণনা সবকিছুই বলে দিলেন। তুমিই বলো, এই জ্যোতিষ বিদ্যে কেউ অবিশ্বাস করতে পারে?

সজ্জন হেসে বললে— আমার বিষয় উনি এক অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

কর্নেল সজ্জনের কাঁধে হাল্কা ধাক্কা দিয়ে হেসে বললে— অদ্ভুত মানে? শালা, তোমার আর মহিপাল দুজনেরই বেশ দুর্গতি হওয়া চাই। তবেই তোমরা জব্দ হবে।

—আচ্ছা, খুব প্রাণের এয়ার তুমি যা হোক, আমার নামে টি টি পড়ে যাবে আর উনি খুশী হবেন।

—বন্ধু বলে খারাপ কাজেও সায় দিতে হবে নাকি?

—তিনি সে কথা জোর দিয়ে বলেননি যে কোন খারাপ কাজে আমার নাম জড়িত হবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ উনি তো বলছেন যে একবার মুখে চুনকালি মেখে তারপর তুমি প্রসিদ্ধ হয়ে দশজনের একজন হবে।

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করতে করতে সজ্জন বললে— কবি নরেন্দ্রর এক লাইন আজ বার বার মনে পড়ছে— 'বন্ধ কলি সা রাজ'না তেরে খোলে সে খুল পায়েগা'। কর্নেলের দিকে সিগারেট কেস বাড়িয়ে নিজে একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটের কোণে চেপে বললে— সেইজন্যে ঠিকুজি বিচার করানো আমি একেবারেই পছন্দ করি না। ভবিষ্যৎ অন্ধকারের গহ্বরে থাকাই ভালো।

সিগারেট জ্বালাবার জন্য একদিকে দুজনে দাঁড়িয়ে গেল। সিগারেট লাইটার পকেটে রেখে যেই দুজনে হাঁটতে আরম্ভ করবে এমন সময় সামনে থেকে কারুর বাড়ির চাকর যেতে যেতে তাদের দেখে থমকে দাঁড়াল— বাবুজী, এ গলিতে ডাক্তার সাহেবের বাড়ি কোনটা?

—কোন্ ডাক্তার? উৎসুক হয়ে কর্নেল জিজ্ঞেস করলে।

—সায়েব, তিনি দই বিক্রি করেন।

উত্তর শুনে কর্নেল আর সজ্জন প্রথমটা চমকে উঠল। পরমুহূর্তেই রাগে তার গা জ্বলে গেল, মামুলী একটা চাকর তার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা জুড়ে দিয়েছে— বেআদপ কোথাকার, ইয়ারকি করার জায়গা পেলে না?

—না হুজুর— সে নিজের দুই কান মলে হাত জোড় করে বললে— আমার মাথাই ভোঁ হয়ে গেছে হুজুর, মালিক বললেন— যা ছুটে গিয়ে ডাক্তারের দোকান থেকে দই কিনে আন। আমার কোনো···

—তোমার মালিক আচ্ছা আহম্মক লোক তো, ডাক্তারের দোকানে আজ পর্যন্ত দই দুধ বিক্রি হয়েছে কখনো? কর্নেল এগিয়ে চলল।

এক লালাজীর কানে কথা যেতেই তিনি চাকরকে আঙুলের সংকেতে ডাকলেন, ডাক্তার ময়রার দোকান জিজ্ঞেস করছ? ওই বাঁ দিকে চেয়ে দেখো— ওই দোকানটা।

চাকর হতভম্বের মত ডাইনে বাঁয়ে চারদিকে চোখ বোলাচ্ছে দেখে লালাজী বিরক্ত হয়ে বললেন— আরে বাবা, চোখের মাথা খেয়ে ওদিকে দেখো, রেশনের দোকানের পর খটিকদের দোকানের লাইন দেখা যাচ্ছে তার গায়েই দোকানটা এইখান থেকে দেখা যাচ্ছে।

কর্নেল আর সজ্জন এগিয়ে চলল। কর্নেল হেসে বললে— আচ্ছা মজার ব্যাপার দেখেছ? শালা ময়রার নাম ডাক্তার।

—যদি এক ওষুধ-বিক্রেতা কর্নেল হতে পারে তাহলে···

—আমি জানতুম তুমি ঠিক এই খোঁচা দেবে— কর্নেল লজ্জিত হয়ে গেল।

ময়রা অথচ ডাক্তার উপাধিতে ভূষিত ব্যক্তিকে দেখার জন্য, সজ্জন দুপাশে গলির প্রত্যেকটা দোকান দেখতে দেখতে হাঁটছে। সরু গলিতে কুকুর, গোরু, আর মানুষের ভিড়ের মধ্যে সার্কাসের মত সাইকেল চালাবার চেষ্টা করছে।

শাস্ত্রীজীর গলির মত এই গলিটা রোদের নাগালের বাইরে নয়। বাঁদিকের আটার চাকিতে আপাদমস্তক আটার বর্ম পরা মজুরদের দেখে সজ্জনের মনে এক বিচিত্র অনুভূতি হল। ডানদিকে সরু মত গলি, তারপর দর্জির দোকান— মেশিনের ঘড়ঘড়, মুসলমান দর্জিরা দাড়িতে মেহেদির রঙ লাগিয়ে দরজার কপাটে ঠেসান দিয়ে সেলাই করছে, মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেবার ছলে হুঁকোতে টান দিয়ে নিচ্ছে। বড় দর্জির চেলা-চামুণ্ডারা কাটাকুটি করায় ব্যস্ত। দর্জির দোকানের পর এক বাড়ির দরজা, তারপর দর্জি, খটিক, মণিহার, বদ্যি, তারপর বাড়ি। বাঁদিকে আটার চাকির পরেই মুদির দোকান— দামোদর, এক পোয়া বেসম দিয়ো তো। দু আনার কিশমিশ, আরে আমার জিনিস তাড়াতাড়ি দাও, হ্যাঁ নিন মশাই, নিন বাবু, আরে ফিটকিরি বার করো ভেতর থেকে··· ইত্যাদি আওয়াজের পরই রাজবদ্যির সাইনবোর্ড ঝোলানো দোকান। রাজবদ্যি মশাই পাগড়ি মাথায় দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে রুগীর প্রতীক্ষায় গুম হয়ে বসে আছেন। তাঁর পাশেই খটিকদের দোকান, এক হিজড়ে, মেয়েদের সাজ করে পান সাজতে ব্যস্ত। এর পরেই বহুপ্রতিক্ষিত ডাক্তার ময়রার দোকান দেখা গেল। দোকান বেশ বড়, গদির ওপর ভূধরের চেয়ে বড় নাদুস বিরাট বপু, গায়ের

রঙ আলকাতরার চেয়ে এক পোঁচ বেশী তো কম নয়, গোল গরম টুপি দিয়ে প্রায় নাক-কান ঢাকা ডাক্তার ময়রা দাঁড়িপাল্লা হাতে নিয়ে জিলিপি ওজন করতে ব্যস্ত। তার হাবভাব দেখে সজ্জন কৌতূহলের স্বরে কর্নেলকে বললে— ভাই, এর দোকান থেকে নিশ্চয় কিছু কেনা উচিত। মানুষ তো নয় যেন খাসা জাপানী বোমা।

দোকানের সামনে উঁচু পেতলের তাকে মিষ্টির থালা সারি করে সাজানোর ব্যবস্থা আছে। শিব, হনুমান, গান্ধী, নেহরু, নেতাজী, শিবাজী আর রানা প্রতাপের ছবি দেয়ালে টাঙানো রয়েছে। শিবের ছবিতে ছোট একটি গাঁদা ফুলের মালা ঝুলছে। বাইরে পেতলের দু'টো ঘণ্টা ঝুলছে। সে সময় দোকানে ভিড় অল্প ছিল। কর্নেল বললে— জিলিপি নিয়ে চলো। নাক-কান ঢাকা গোল টুপির ছাঁদার মধ্যে থেকে ডাক্তার সায়েবের চ্যাপটা নাক উঁকি মারছে, ছোট ছোট মিটমিটে চোখে রুপোর ফ্রেমের চশমা আঁটা, কাঁচাপাকা গোঁফ আর মোটা মোটা ঠোঁটের আশেপাশে পানের পিক লেগে আছে। গ্রাহকের সংখ্যা বেশী নয় কিন্তু খুব চেঁচামেচি আর হৈহল্লা হচ্ছে। ডাক্তারের হাত তার মুখের চেয়ে কম স্পীডে চলছে। সজ্জন তাকে জিলিপি আর আলু ভাজা অর্ডার দিল।

পেছনের গলির রোয়াকে বসে রোদে হাত-পা ছড়াতে ছড়াতে এক বুড়ো বক্‌বক্ করছে— আরে জোয়ান বয়সে সকলেই গোঁফে তা দিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে। শেষ বয়সে ধীরে ধীরে এক এক করে শরীরের সব ইন্দ্রিয়— দাঁত, কান, চোখ, হাত পা সব জবাব দিয়ে দিচ্ছে··· হাতে পায়ে গাঁটে গাঁটে এমন ব্যথা, একটু নাড়লেই, উফ্‌ বাপ-চৌদ্দপুরুষের নাম মুখে এসে যায় ··কেউ এক

গেলাস জল পর্যন্ত জিজ্ঞেস করে না, নিজেকেই গড়িয়ে নিতে হয়। এই বয়সটা পার করা সত্যিই বীরোচিত কাজ, যার-তার কর্ম নয় ভাই, বুঝেছ? আমার তিরানব্বই বছর বয়স, যম শালা আমার নামের কাগজটা হারিয়ে বসে আছে···

তাদের কথোপকথন শুনে সজ্জনের মনে হল, হয়তো সেও একদিন এদের মত বুড়িয়ে যাবে··· সত্যি জীবনের শেষ ক'টা দিন কাটাতে বেশ বুকের পাটার দরকার হয়।

—আরেঁ বাঁবু সেঁদিঁনের রাঁবড়িঁর ছঁআনা দিঁয়ে গেঁলে নাঁ?

সজ্জনের দিকে ইশারা করে কর্নেল ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলে—কাকে বলছেন? একে?

সজ্জন চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে— আমি—আমি আপনার দোকানে এর আগে কখনো পা দিইনি।

—বাঁঃ তুঁমি সেঁদিন রাঁবড়ি নিঁয়ে গেলেঁ— এই পঁরশু দিঁনেরঁই কঁথা— এঁ ভাবঁবেন নাঁ যেঁ ডাঁক্তারের কিঁছু মঁনে থাঁকে নাঁ।

হঠাৎ এ ধরনের মিথ্যে অপবাদ শুনে সজ্জনের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। দোকানের পাশেই ফর্সা চেহারার এক লালাজী ডাক্তারের মত হাল্কা তুলোর টুপি মাথায় দিয়ে পান চিবুচ্ছিলেন। সজ্জনের মত 'ভদ্রলোকের' অবস্থা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি তিনি ডাক্তারকে এক ধমক দিয়ে বললেন— তোমার মতিভ্রম হয়েছে? বাহাত্তুরে পড়লে নাকি? আফিংয়ের নেশায় মানুষ চিনতে পারো না?

সজ্জন তার দিকে চেয়ে সাফাই জানানোর স্বরে বললে— দেখুন আমি আজ প্রথম বার এখানে এসেছি।

—প্রঁথম বাঁর? তুঁমি রোঁজ ধাঁরে জিঁনিস নিঁয়ে যাঁও নাঁ?

কর্নেল হেসে ফেললে— আরে ভাই, তোমার চিনতে ভুল হয়ে গেছে ডাক্তার, এঁর শিরায় শিরায় পুডিং প্রবাহিত হচ্ছে, তোমার ওই রাবড়ি ইনি খান না বুঝলে ?

চাকর গরম গরম জিলিপির থালা ডাক্তারের কাছে রাখতে রাখতে বললে— মিছিমিছি আপনি মুখ খারাপ করছেন, এ সেই ভদ্রলোক নয়।

ঝটকা মেরে ডাক্তার নিজের চাকরের ওপর গরম হয়ে চেঁচালে— আঁমাকে বোঁকা বাঁনাচ্ছে ব্যাঁটাচ্ছেঁলে, ইঁনি বঁামা বাঁবুর ছেঁলে নঁয় ?

লালাজী দমকা হাসিতে ফেটে পড়লেন— আরে ভাই ডাক্তার, এবার ইঁটের চশমা তৈরি করাও। কাঁচের চশমায় তোমার মত আফিংখোরের কাজ চলা মুশকিল।

তারপর হেসে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বললেন— সব সময় এঁর একই অবস্থা, রাত্তির বেলা আফিংয়ের ঝোঁকে কারুকে জিনিস কম আর কারুকে বেশী ওজন করে দিয়ে থাকেন। রাত্তিরে একজনকে ধারে জিনিস দিয়ে পরের দিন সকালে অন্যকে পাকড়াও করেন। রোজের এই কচকচানি লেগেই আছে এই দোকানে। ডাক্তার মশাইয়ের জুড়ি সারা শহরে আর দ্বিতীয়টি নেই।

এগিয়ে যেতে যেতে সজ্জন কর্নেলকে বললে— এখন সত্যিই দুঃখ হয় যে জীবনের অনেকটা সময় বৃথাই বেরিয়ে গেল। বাস্তব জীবনের নায়ক-নায়িকারা এই অলি-গলির মধ্যেই আছে, বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত জীবনের চিত্র এইখানেই এসে দেখতে পাওয়া যায়।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার সামনে বেশী লম্বা লম্বা বুলি কপচাবার

দরকার নেই। শালা পৃথিবীসুদ্ধ্ নোংরামি এখানে আর তুমি বাস্তব জীবনের চরিত্র খুঁজে বেড়াচ্ছ।

কর্নেলের কথা সজ্জনের গায়ে লাগল কিন্তু সত্য বড়ই কটু, তাই সে নিরুত্তর রইল।

হাঁটতে হাঁটতে কর্নেল বললে— ব্যাটা মহিপালের খোঁজখবর নেই, পরশু দুপুরে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। পরশু রাত্রিতে চাটুর উল্টো পিঠের সঙ্গে আমার বাড়ি এসেছিল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা আমি জানি। শুক্লাজী মহারাজ ক্রিসমাসের উৎসবে চোখে কানে আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। সকালে তাই বেশ দেরীতে বিছানা ছাড়েন।

—ঘুমুতে দাও বেচারাকে, নিদ্রাদেবীর কোলে অনেক দুঃখী চোখ বুজে কিছুক্ষণের জন্য আরাম পায়। আজকাল মহিপালের মন মেজাজ ভালো নেই।

সজ্জনের গলির রোয়াকে আসর বেশ জমে উঠেছে। আজ মঙ্গলবার তাই বসন্ত মালী ফুল বেলপাতা নিয়ে বসে আছে আর তার কাছেই পণ্ডিত মহিপাল শুক্লা, বাবু হয়ে বসে গল্পে মেতে আছেন। দুজনকে সামনে দিয়ে আসতে দেখে বাবু ছেদালালজী চেঁচিয়ে ডাক দিলেন— 'আসুন আসুন, আমাদের সৌভাগ্য, এবার ভালো করে বসা যাক।

সজ্জন সকলকে নমস্কার করলে। কর্নেল হাসতে হাসতে গুলাবচন্দের পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে তার মাথায় এক হাল্কা চাঁটি মেরে বললে— বলুন বড়বাবু, আপনাদের খবর সব ভালো? সজ্জন, তুমি বোধহয় জানো না যে গুলাবের সঙ্গে আমার গালাগালির আত্মীয়তা আছে। গুলাবচন্দ কিছু জবাব দেবার

আগেই লালা মুকুন্দীমল হুঁকোর নল ছেড়ে দিয়ে বললেন—আরে ভাই নগীনচন্দ!

—আজ্ঞে।

বাবু রাধেশ্যামের সংকেত পেয়ে ছেদালাল বাড়ির ভেতর থেকে দুটো চেয়ার আনার জন্যে হাঁক দিলেন।

লালা কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলে— বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের অভিনন্দন সমারোহে স্টেশনে যাওনি? তুমি তো কংগ্রেসের একজন মস্ত ভক্ত না?

—হ্যাঁ লালাজী, যাব ভেবেছিলাম তারপর ভাবলুম জনসংঘের দিক থেকে এমন নামকরা মহিলা কেউ আসবে না। আমরা সেখানে গেলে আপনারা মুখ ভেঙাতেন, তাই ভেবেচিন্তে যাওয়া ক্যান্সেল করে দিলুম।

সজ্জন মহাবীরের মন্দিরের দেয়ালে ঠেসান দিয়ে মহিপালের কাছ ঘেঁষে বসে পড়ল। মহিপাল মৃদু স্বরে তার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলে— হাতে কি?

—জিলিপি। কাল বিকেলে শীলার ওখানে গিয়েছিলে?

মহিপাল ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। দুজনে চোখাচুখি হতেই সে মুচকি হাসল। লালা মুকুন্দীমল কর্নেলের ঠাট্টার উত্তর দিতে দিতে বললেন— আরে আমরা কেন কিছু মনে করতে যাব? জনসংঘ নয় কিন্তু এই পাড়াতেই কম্যুনিস্টদের মধ্যে ওই ধরনের মহিলা এগিয়ে আসছেন, তিনি আজকাল পাড়ার মাতব্বর হয়েছেন। নিজের বাড়িতেই পার্টির লোকেদের নেত্য আরম্ভ করিয়ে দিয়েছেন। সাপের পাঁচ পা দেখেছেন।

সজ্জনের টনক নড়ল। লালা মুকুন্দীমল বাবু ছেদালালের দিকে

চেয়ে বললেন— আরে ভাই, সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের কাগজ যে বিলি হচ্ছিল, সেটা কোথায় ?

কর্নেল উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলে— কম্যুনিস্টদের কোন হ্যাণ্ডবিল না কি ?

ছেদালাল পকেট থেকে কাগজ বার করলেন। বাবু রাধেশ্যাম মাথা নেড়ে বললেন— ভাই সে আর বলতে, নির্ঘাত শালিগরামের বদমাইসি, ইলেক্‌শনের চক্করে অপরাধীকে ছাড়িয়ে নিরপরাধীকে···

—এ আপনার কেমন ধারা কথা হল ? প্রাণ বেরুবার আগে সে নিজে স্টেটমেণ্ট দিয়ে গেছে— কাগজের ভাঁজ খুলতে খুলতে ছেদালাল তাঁর মতামত প্রকাশ করলেন।

—স্টেটমেণ্ট না মাথা আর মুণ্ডু।

ছেদালালের চাকর অন্দরমহল থেকে দুটো ফোল্‌ডিং চেয়ার নিয়ে এল। লালা মুকুন্দীমলের আর তর সইছে না, তিনি সকলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন— আরে ভাই, আগে শুনতে দাও, গুলাবচন্দ, তুমি একটু ভালো করে পড়ে শোনাও দেখি।

গুলাবচন্দ শশব্যস্ত হয়ে বললেন— পণ্ডিতজীকে দাও, ইনি এত বড় নামী লেখক তাঁর সামনে আমি···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মহিপাল তুমিই শোনাও— চেয়ার টানতে টানতে কর্নেল উৎসুক হয়ে বললে।

লালা মুকুন্দীমল তাঁর বাড়ির দিকে মুখ করে চেঁচালেন— আরে ভগোতিয়া, পান দিয়ে যা চটপট··· হ্যাঁ পণ্ডিতজী মহারাজ, তাহলে শোনান।

মহিপাল পড়তে লাগল : " 'রহস্য উদ্‌ঘাটন'— রুসী এজেণ্টদের

জঘন্য কার্যকলাপ। কম্যুনিস্টদের থেকে সাবধান থাকুন। গত রবিবার 23শে ডিসেম্বর কম্পনীবাগানের কাছে বাদশাহী নালায় এক সদ্যোজাত শিশুর লাশ কুকুরে আর শেয়ালে নিয়ে টানাটানি করছিল। এ-খবর পাড়ার সকলেই জানে। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে আমাদের সরকারের কর্তব্যপরায়ণ পুলিস তৎপরতার সঙ্গে এই অমানুষিক হত্যার খোঁজ করেছে। আমাদের পাড়ার যোগ্য এবং সুপরিচিত অধ্যাপক বাবু জগদম্বা প্রসাদ সহায়ের বিধবা ভাইপোবৌ (যে আত্মহত্যা করেছে) যশোদা দেবী এ পাপ করেছিলেন। এই কলঙ্ক কাহিনীর সঙ্গে পূজনীয় জগদম্বা প্রসাদজীর নাম যেভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে, তাতে মনে হয় জনতার মধ্যে এ বিষয় যথেষ্ট ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

"আমাদের দেবতুল্য বাবু জগদম্বা সহায়জীর নামের সঙ্গে হয়তো এ কলঙ্ক চিরদিনের জন্য জড়িয়ে যেত, যদি আমাদের শহরের রত্ন ও লোকসেবক বাবু শালিগরামজী তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় সময়মত না দিতেন। পুলিসের কর্মকর্তারা আমাদের প্রশংসার পাত্র। আপনারা জানেন আসল অপরাধী কে? কে সে নীচ অধম ব্যক্তি, যার ছুটি অপরাধের জন্য আমাদের ধর্মপরায়ণ জনতা আজ ক্ষুব্ধ। এ বিষয় আমরা নিজেদের মতামত না দিয়ে স্বর্গীয়া যশোদা দেবীর মৃত্যুর পূর্বের স্টেটমেণ্ট প্রকাশিত করছি। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অস্ফুটস্বরে তিনি পুলিসকে বলেছিলেন 'ভল্লেবাবু আর আমার ননদ, দুজনেই কম্যুনিস্ট পার্টির (দেশদ্রোহী পার্টি) সদস্য। আমার ননদের সঙ্গে ভল্লেবাবুর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসতেন। একদিন তিনি আর আমার ননদ বনকন্যা, দুজনে মিলে আমাকে তাদের জালে ফাঁসিয়ে দিল।

নানারকম হুমকির ভয়ে আমি সম্পূর্ণভাবে তাদের কথামত চলতে বাধ্য হলাম। যেদিন আমি অন্তঃসত্ত্বা হলাম, বাড়ির সকলেই লোকলজ্জার ভয়ে চুপ মেরে গেলেন। কাল বিকেলে আমার পাপের পুঁটুলি ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গেই দেবতুল্য খুড়শ্বশুর ভল্লেবাবুকে ডেকে পাঠালেন। যখন ভল্লেবাবুকে ছেলে নিয়ে যাবার কথা বলা হল, তিনি তাকে হত্যা করে ফেললেন। আমি লজ্জায় মুখ না দেখাতে পেরে প্রাণ দিচ্ছি।'

এক অবলার করুণ কান্না শোনার পর আমাদের ন্যায়প্রিয় জনতার কি মনোভাব? এই কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যরা বিদেশী সভ্যতার আবহাওয়ায় মানুষ, এরা ভগবান, ধর্মকর্ম পাপপুণ্য, বিবেক কিছুর ধার ধারে না। এরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নীচ কাজ করতেও পেছপা হয় না। আপনারা মনে করবেন না যে এ হ্যাণ্ডবিল আমাদের দিক থেকে ইলেক্‌শনের সময়ের স্টাণ্ট হিসেবে ছাপা হয়েছে। এটা আমাদের জনপ্রিয় দেশনেতা বাবু শালিগরামের অন্তরের ব্যথা, আমরা প্রত্যেকের মনে সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে চাই। যেদিন থেকে পাড়ায় এই ঘটনা ঘটেছে সেদিন থেকে বাবু শালিগরামজী অষ্টপ্রহর শোকসাগরে ডুবে আছেন। তিনি কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, নিজের পাড়ায় দ্বিতীয়বার 1942 সালের বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি কিছুতেই হতে দেবেন না। জনতার কাছে আমাদের একমাত্র প্রার্থনা যে এ বিষয় আমাদের প্রিয় নেতার হাত মজবুত করুন, তাঁকে আপনাদের সমর্থন জানান।”

মহিপাল আবার কাগজ ভাঁজ করলে। এই লম্বাচওড়া বর্ণনার মধ্যে একটি ছোট কথা সজ্জনের মনে আঁচড় কেটে গেল—

জগদম্বাসহায়ের মেয়ের নাম বনকন্যা। মিস বনকন্যা সেদিন বলেছিল, হত্যা আমার বাবা করেছেন, আমি সব জানি, আমি সবকিছু ফাঁস করে ছাড়ব। বনকন্যার সেই রাগে রক্তিম ফর্সা সুন্দর মুখখানি বার বার সজ্জনের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। এই হ্যাণ্ডবিলে সত্যিই যথেষ্ট নোংরামির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সব মিথ্যে, সব মনগড়া।

—এ একেবারে নিছক মিথ্যে কথা, টপ করে সজ্জন তার মতামতটা বলে ফেললে। বাবু ছেদালাল মহিপালের কাছ থেকে মোড়া কাগজটা নিয়ে পকেটে রাখলেন। সজ্জনের মুখের ভাব বাবু ছেদালালের সন্ধানী চোখ এড়াতে পারল না। লালা মুকুন্দীমলের গুড়গুড় বন্ধ হয়ে গেল। বাবু গুলাবচন্দ বললেন—'যাক্ এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই যে'…

—হ্যাঁ, আমি নিজে জগদম্বা মশাইয়ের বাড়ি গিয়েছিলুম। সাব-ইন্‌সপেক্টর শুক্লা আমাকে সব বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলেছে। আর-একটা ভাববার কথা যে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত যশোদাদেবী বেহুঁশ ছিলেন, ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে ডাইং ডিক্লারেশনের জন্য শুক্লা তখন বেশ চিন্তিত ছিল।

লাল মুকুন্দীমল বিজ্ঞের মত চোখ নাচিয়ে বললেন— হ্যাঁ, কিছুটা মিথ্যে হতে পারে, তবে যা রটে তা কিছু তো বটে। আজকাল ইলেকশনের সময়টাই এমন যে কোন পার্টির বিরুদ্ধে মিথ্যে প্রচার করা কিছু আশ্চর্য নয়। তবে এ কাজ যে কম্যুনিস্টদের নয়, এর কোন প্রমাণ আছে?

বাবু রাধেশ্যাম চটে উঠে বললেন, মশাই, আপনারা কম্যুনিস্টদের বদনাম করছেন কেন? জগদম্বা সহায়ককে না চেনে এমন লোক

আছে? মহা ছোটলোক— তাকে দেবতুল্য মানুষ বানাতে চাওয়া হয়েছে আর শালিগরামের প্রশংসা করা হয়েছে।

কর্নেল মেজাজ ঠাণ্ডা করার জন্য বলল— আরে আপনি পলিসিটা বুঝলেন না? ভল্লেবাবুর হাতে প্রায় দু হাজার ভোট— মেথর চামার আর রিক্‌শাওয়ালাদের ইউনিয়নের। শালিগরাম এমন সুবর্ণ সুযোগ হাত থেকে ফস্কে দিতে পারে? হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে কম্যুনিস্টদের ভোট নষ্ট করবার এটা একটা ছুতো ছাড়া কিছু নয়।

—আপনার কথা একদম টু দি পয়েণ্ট কর্নেল, তবে এই হাঙ্গামার পর অনেক ভোট কেটে যাবে— দুদিন পরেই দেখতে পাবেন। বলে ছেদালাল সিগারেটের ছাই ঝেড়ে নিলেন।

মুকুন্দীলাল হঠাৎ যেন দিব্যদৃষ্টি পেয়েছেন— হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা, আমার মনে হয় এসব ভোট এবারে জনসংঘই পাবে।

কর্নেল তার নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশ করলে— এ আপনার ভুল ধারণা। মেথর আর রিক্‌শাচালকের মধ্যে অনেক মুসলমান আছে তারা কোনদিনই জনসংঘকে ভোট দেবে না। ষোলো আনা সত্যি কথা আপনি টুকে রাখুন যে ভোট কম্যুনিস্টদের ছিল, এখন হয়তো কংগ্রেস তা পেতে পারে।

— এবার আমি কিছু···

বাবু, গুলাবচন্দের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মহিপাল বললে— আমরা যাই কিচিরমিচির করি-না কেন, এসব দু-চারদিনের হুল্লোড় ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু এ হুল্লোড়ের মধ্যে সমাজের এত বড় জঘন্য পাপ যদি ঢাকা পড়ে যায়, সেটা কি আপনারা সহ্য করবেন? ইতিমধ্যে পানের রেকাবি এসে গেল। সকলে এক এক খিলি

মুখে দিয়ে রেকাবি সরিয়ে দিলে। মুকুন্দীমল পান গালে দিয়ে বললেন— ভাই পণ্ডিতজী, এ কেমন ধারা কথা হল? এ সংসারে তো এসব চলছেই। এমন ঘটনা এই প্রথম শুনলে না কি? আমি ঐসব দেখতে দেখতে বুড়ো হয়ে মরতে বসেছি।

—কত আর শুনবেন? যতদিন না সমাজ থেকে এই পাপ নির্মূল হবে ততদিন পর্যন্ত এ ইলেক্‌শন আর রাজনীতি ভাঁওতা ছাড়া কিছুই নয়।

—হ্যাঁ, একেবারে মগের মুল্লুক আর কি? যার গায়ে শক্তি আছে তার সাত খুন মাপ। এসব ভগবানের লীলাখেলা চিরদিন চলছে আর চলবে। যে-কোন পার্টি আসুক, পাপপুণ্যর ব্যাখ্যা আর প্রজার চরিত্র বদলাবে না। এদেশে রাম আর কৃষ্ণর মত অবতার জন্মালেন তবু এ সমাজে কোন পরিবর্তন হল না— আর আশাও নেই।

—বলো মহাবীরের জয়, বলো বজরঙ্গবলির জয়, প্রভু কৃপা করো— বলতে বলতে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে কেবল ধুতিকে কোনমতে আঁট করে কৌপীনের মত জড়িয়ে পৈতেতে চাবির গোছা কাঁধে ঝুলিয়ে এক ভক্ত এসে হাজির হলেন। হাড়-কাঁপুনে শীতে জড়সড় হয়ে ভক্ত মহারাজ বিশেষ ভঙ্গিতে বুক পিঠ আর ঘাড়কে টান দিয়ে সোজা করার চেষ্টা করে জয়ধ্বনি দিলেন।

বাবু রাধেশ্যাম ভক্তির উত্তেজনায় গদগদ হয়ে একটা পান মুখে ফেলে আর-একটা ওঠাতে ওঠাতে বললেন— পরিবর্তন আসবে বাবা, নিশ্চয় আসবে। এবার কম্যুনিস্টরা এসে প্রতাপ দেখাবে, আর বড়লোকদের দিন ঘনিয়ে এল বলে।

বাবু রাধেশ্যামের কথা শুনে গুলাবচন্দ হেসে ফেললেন।

—সারাদিন তুমি কমরেড স্টালিন হবার স্বপ্ন দেখছ। কথায় আছে অতি বাড় বেড়ো না ঝড়েতে পড়িবে, ছেলেমেয়ে, ঘরসংসার আর চাকরী-বাকরীর৷ দিকে মন দাও ভাই, এটা কংগ্রেসের রাজত্ব বুঝলে ?

—রাজত্ব যারই হোক, তাতে কার কি এসে যায়? জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরলে আপনা থেকেই মুখ খোলে— মহিপাল বললে— আমি নিজে কম্যুনিস্ট নয় কিন্তু বিশ্বাস করুন, যখন শুনি রাশিয়াতে বেকারি নেই, সকলে পেটভরে দুবেলা খেতে পায়, তখুনি আমার মনে হয় ভারতে কম্যুনিজম আস্বক।

ঠিক সেই সময় পেছনের গলি থেকে একটি মহিলা প্রায় ছুটতে ছুটতে এলো। বয়স আঠাশ থেকে ত্রিশের মধ্যে, বড় বড় পটল-চেরা চোখ, রঙ শ্যামবর্ণ, টিকল নাক মুখ, বেশ মিষ্টি চেহারা। গলিতে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ধর, ধর— মহিলাটি তৎক্ষণে লালা মুকুন্দীলালের কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। লালাজীর চোখ-কান-ঢাকা টুপি, মোটা চশমার ফ্রেম আর সাদা গোঁফ সবেতে যেন একসঙ্গে টান ধরল। মহিলাটি সোজা তাঁর মুখে থু থু করে থুথু ফেলে অন্য দিকে ঘাড় ফেরাতেই যে যার সরে পড়ার তালে হুড়বড় করে পালানো আরম্ভ করে দিয়েছে। সজ্জন রোয়াক থেকে নীচে নেমে তার দিকে এগিয়ে গেল। প্রায় আশী বছরের ধনী মানী বৃদ্ধ লালা মুকুন্দীমলের আত্মমর্যাদা আজ বিপন্ন। তাড়াতাড়ি স্কার্ফ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করার টাল সামলাতে না পেরে হুঁকো মাটিতে ধরাশায়ী হ'য়ে পড়ল।

সজ্জনকে দেখেই মহিলাটি তার দিকে ভালো করে তাকাল। গলিতে নানারকম আওয়াজের সঙ্গে ছোটাছুটির আওয়াজ কাছেই

শোনা যাচ্ছে। প্রায় সত্তর বছরের সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ দৌড়ুতে দৌড়ুতে চেঁচাচ্ছেন— 'ধর মাই ডিয়র— ধর, থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।'

—মাই ডিয়র— বলে মহিলাটি সজ্জনের সঙ্গে হাতাহাতি করার চেষ্টা করতেই সে তাড়াতাড়ি তার কব্জি চেপে ধরে এক ধমক দিয়ে উঠল, খবরদার।

—আর কখনো এমন কাজ করব না, কখনো থুথু ফেলব না, এবারটি মাপ করুন, প্লীজ আমাকে ছেড়ে দিন, মারবেন না।

বৃদ্ধ ততক্ষণে কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছেন। কর্নেল আর গুলাবচন্দ মন্দিরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, ছেদালাল আর রাধেশ্যাম রোয়াকে বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, আর মহিপাল তাদের পাশেই বসে আছে। বসন্ত মালী প্রসাদের পেঁড়া আর ফুল-মালা দুহাত দিয়ে ঢেকে হাঁটু গেড়ে ভয়ে সিটিয়ে কোলাব্যাঙের মত উবু হয়ে বসে আছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখে মুকুন্দীমল বললেন— উকিল মশাই— ইনি— আপনার সেই পাগলি?

—মশাই আপনি আমার ফাদার, ব্রাদার সবকিছু— সজ্জনের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে করুণ স্বরে মহিলাটি বললে— আমাকে আমার রাজেশের কাছে নিয়ে চলুন। রাজেশ আমার প্রিয় রাজেশ। আমার জীবনের ধন— হায়— আমার সবকিছু পুড়ে শেষ হয়ে গেল— এখানে, হ্যাঁ দেখুন, বুকে আগুন জ্বলছে—আমার হাত ছেড়ে দিন— আমি আপনাকে দেখাব কোথায় জ্বলছে— ধু ধু করে শ্মশানের আগুন।

—আচ্ছা, আচ্ছা— এবার বাড়ি ফিরে চলো মা। শ্বশুর উকিল মশাই মিনতির স্বরে বললেন— বাড়ি চলো, নিজের জামাকাপড় নিয়ে তবে তো রাজেশের কাছে যাবে।

—না, আমি যাব, আমার স্বামী ক্যাপ্টেন। তিনি আমাকে শাড়ি দেবেন, তার সঙ্গে মোটরে বসে ঘুরে বেড়াব। আমি গিয়ে রাজেশের গলা জড়িয়ে ধরে বলব— মহিলাটি সজ্জনের গলা জড়াবার চেষ্টা করতেই সে এক ঝাঁকুনি দিয়ে তার হাত ছাড়িয়ে দিয়ে বললে—'বাড়ি চলুন'।

—না, আমাকে সেখানে নিয়ে যাবেন না— আপনি ভদ্রলোক, আমাকে সাহায্য করুন। সেখানে গোপু আছে সে নিজের স্ত্রীকে বুকে জড়িয়ে আদর করে। আমাকে এরা পায়খানায় বন্ধ করে রাখে। এই বুড়ো শ্বশুর আর শাশুড়ী আমায় মেয়ের মত স্নেহ করে অথচ এদের শরীরে এতটুকু দয়ামায়া বলে কিছু নেই। রাত্তির বেলা দুই বুড়ো বুড়িতে…

সজ্জন ঠাস করে মহিলার গালে কষে এক চড় বসিয়ে দিলে, সে ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে সজ্জন উকিল মশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললে— আমাকে মাপ করবেন।

—না বাবা না। উপকৃত স্বরে উকিল মশাই কৃতজ্ঞতা জানালেন।

—বাড়ি চলুন, সজ্জনের কথামত মহিলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে আর বিড়বিড় করতে করতে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। উকিল মশাই কোন দিকে না তাকিয়ে চুপচাপ ক্লান্তভাবে পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলেন।

—আমি তোমার সঙ্গে যাব? কর্নেল সজ্জনকে জিজ্ঞেস করলে।

—না, না, এখুনি এলুম বলে— সজ্জন মহিলাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গেল।

বারো

ফিরে এসে খালি রোয়াকের দিকে তাকিয়ে সজ্জন তার ছোট্ট ঘরের দিকে পা বাড়াল। দূর থেকেই তার ঘরের হাট করে খোলা দরজা দেখা যাচ্ছে। দৈনন্দিন অভ্যাস অনুযায়ী ঘরে ঢুকতেই মহিপাল আর কর্নেলের জায়গায় একা বনকন্যাকে বসে থাকতে দেখে তার নিরানন্দ মনে হঠাৎ আনন্দের সঞ্চার হল। বনকন্যা চেয়ারে বসে 'দি স্টোরী অফ পেন্টিং'-এর পাতা ওলটাচ্ছে। টেবিলের এক কোণে জিলিপির ঠোঙা রাখা আছে। মনের উপচে পড়া খুশীর জোয়ারের বেগ কোনমতে সামলে নিয়ে, সে বিনয়ের অবতার হয়ে তাড়াতাড়ি হাত জোড় করল। প্রতি-নমস্কার করে বনকন্যা মুচকি হেসে বললে— সেদিন হঠাৎ আপনি আমাদের বাড়ি এসে···

—তাই বুঝি আজ আপনি সারপ্রাইজ ভিজিট দিতে এসেছেন? আমার দুই আহাম্মক বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছি না, তারা কোথায় ডুব দিল?

হায় রে, বিচিত্র মানুষের মনের গতি, হঠাৎ দু মিনিটের পরিচয় আর চোখের ভালো লাগার গাঢ় রঙের সামনে, অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের রঙ নিমেষে ফিকে হয়ে গেছে। তাদের বরাত জোর বলতে হবে যে আজ তারা কেবল 'আহাম্মক' হয়েই ছাড়ান পেয়ে গেছে।

—হ্যাঁ, মহিপালবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমি যখন ঘরে ঢুকেছিলুম তখন আপনার দ্বিতীয় বন্ধুটি এখানেই ছিলেন।

—কোথায় গেল? আপনাকে কিছু বলে গেছে? আঙুল দিয়ে টেবিলের দিকে সংকেত করে বনকন্যা বললে— কিছু লিখে রেখে গেছেন বোধহয় ওখানে।

বম্বে আর্ট সোসাইটির নিমন্ত্রণপত্রের খামের ওপরে মহিপাল লিখে রেখে গেছে— তোমার জীবনে, আজকের দিন চিরস্মরণীয় হয়ে থাক্। তোমাদের এ মিলন মঙ্গলময় হোক।

পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সজ্জনের শিরা-উপশিরায় আনন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেল। আনন্দের আতিশয্যে অস্ফুট স্বরে বন্ধুদের 'শালা বদমাইস' নামে সম্বোধন করলে।

খাম ছিড়ে ভেতরে নিমন্ত্রণ পত্রের উল্টো পিঠে মহিপালের হাতের লেখা— তোমার ঘরে জিলিপি দেখে জিভে জল আসছিল কিন্তু নিরাশ হয়ে চলে যেতে হচ্ছে। তোমার ডায়ারির পাতায় পাতায় আমার জিলিপি ত্যাগের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখো। ক্রিসমাসের উপহার দিয়ে গেলাম— একাকী তুমি আর তোমার··· চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে তো? আমরা প্রার্থনা করছি ভগবান তোমাকে সুবুদ্ধি দিন।

নীচে কর্নেল লিখে গিয়েছে 'ব্যাটা, কম্যুনিস্ট হয়ে যেয়ো না যেন।'

ফর্সা, টিকল নাক, সুশ্রী বনকন্যার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ সজ্জনকে এতই প্রভাবিত করে ফেলেছে যে তার চোখেমুখে আনন্দ উপচে পড়ছে। সে লজ্জিতভাবে বললে— আমার এই দুই বাহন এক নম্বরের গাধা, কেবল যাচ্ছি লেখার মানে? কোথায় যাচ্ছে,

কখন দেখা হবে সব-কিছু লেখা উচিত ছিল। আজকের ক্রিসমাস ডে মাটি করে দিলে।··· বলতে বলতে সজ্জন বনকন্যার কাছেই পাশ বালিশটায় ঠেসান দিয়ে বসে পড়ল। বনকন্যা বললে—আপনার দ্বিতীয় বন্ধু মহিপালবাবুকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন। উনি থাকলে আমার ভালোই লাগত। প্রেমিকের ঠুনকো সন্দিগ্ধ মন কাঁসার বাসনের মত ঝনঝনিয়ে বেজে উঠল, হঠাৎ তেঁতো হয়ে যাওয়া মুখের স্বাদকে ঠিক করে নিয়ে সজ্জন জিজ্ঞেস করলে—কেন? মহিপালের সঙ্গে কোন বিশেষ দরকার ছিল না কি?

—না, তিনি আমার প্রিয় লেখক, এর আগে ওঁর লেখা কয়েকখানা বই পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে।

উত্তর শুনে সজ্জন অসন্তুষ্ট মুখে সন্তুষ্টির ভাব ফুটিয়ে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করলে।

বনকন্যা হাসল— নির্বোধ লোকেদের মধ্যে একজন হয়ে দাঁড়াতে চাই না, তাই মহিপালবাবুর সঙ্গে আমার দেখা করার প্রোগ্রাম আজ পর্যন্ত মুলতুবি রেখে দিয়েছিলুম।

—তাতে কি হয়েছে? কখন দেখা করার ইচ্ছে বলুন, তাকে কান ধরে আপনার সামনে হাজির করার ভার আমার, কেমন? দুজন হয়তো বাড়ির দিকেই গেছে, শুভস্য শীঘ্রম— চলুন এখুনি যাবেন না কি?

বনকন্যা একটু সংকুচিতভাবে মাথা নাড়লে— না, না, এ সময় আমি আপনার কাছে একটু বিশেষ কাজে এসেছি।

সজ্জনের মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। — সেই হ্যাণ্ডবিলের কথা বলছেন?

—হ্যাঁ।

—এখুনি পাড়ায় শুনে এলাম। যা নোংরা ভাষার প্রয়োগ করা হয়েছে তাতে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা বেশ করে এক পোঁচ চনুকালি আমাদের মুখে মাখিয়ে দেবে।

—যাক সেসব কথা ছাড়ুন, আপাতত একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। বলতে বলতে বনকন্যা চিন্তার ভারে যেন নুয়ে পড়ল। দুই পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কেটে চলেছে। এতক্ষণে সজ্জন তার মুখখানা ভালো করে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেলো— কটা কটা কোঁকড়া চুলে দুই কান ঢাকা, তার সুন্দর মুখে বেশ মানিয়েছে। মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী— আহাহা, বেচারি কত দুঃখেই না আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছে।

উদ্‌বেগের সঙ্গে সজ্জন জিজ্ঞেস করলে— আপনি এ বিষয় যা সাহায্য চাইবেন আমি প্রস্তুত আছি। বনকন্যা তার চোখে চোখ রেখে দুঃখিত স্বরে বললে— আমি নিজের সুনাম-দুর্নামের কথা ভাবি না, কেবল আমার স্বর্গীয়া বৌদির জন্য ন্যায় ভিক্ষা করছি।

—কিন্তু শেষ নিশ্বাস ফেলার আগে তিনি যে পুলিসের সামনে…

বনকন্যা ফিকে হাসি হেসে বললে— বাবু শালিগরাম কেবল শাকের আঁটি দিয়ে ভাজা মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন। আমার বাবার সঙ্গে তাঁর সব বিষয় প্রায়ই মতের মিল হয়। আজ খুনী আসামী ফাঁসিকাঠ থেকে নিরপরাধ ঘোষিত হয়ে বাড়ি ফিরে আসছে, নতুন স্বাধীনতায় হয়তো ন্যায়ের এই নতুন পরিভাষা। বৌদি বেচারি মরেও পার পায় নি, মড়ার হাত টেনে বুড়ো আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়েছে। সেদিন এক ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিসের অফিসারেরা, ডাক্তার আর এক দেশভক্ত নেতা, সকলে মিলে ন্যায়ের

গলা টিপে তাকে মুহূর্তে শেষ করে দিলে। মৃত্যুপথযাত্রী শেষ সময় পর্যন্ত তার দেহ দিয়ে সমাজরক্ষকদের সেবা করে গেছে।

—উফ্, বদমাইসের হাড় বকধার্মিকের দল সব।

—ইলেক্‌শন প্রচারের হাড়িকাঠে, নিরপরাধীকে চড়িয়ে দেওয়া হয়তো আজকের সভ্য সমাজের নতুন আবিষ্কার। আজ সকাল বেলা ভল্লেবাবু আর দু-তিনজন বন্ধু ছাপা হ্যাণ্ডবিল নিয়ে এসেছিলেন। এই হ্যাণ্ডবিলে ভল্লেবাবুর মান-সম্মান বাঁচাবার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। আমার সই চাইছিল, আমি মানা করে দিলুম। আচ্ছা বলুন তো, একটি মহিলার সম্মানের চেয়ে পার্টির নাম-সুনামটাই বেশী হল? এ অন্যায় সমাজের প্রতি অন্যায় নয়?

সজ্জন গম্ভীর চিন্তাগ্রস্তভাবে আপন মনেই প্রশ্নের উত্তর হাতড়াচ্ছে।

—সকলেই যে যার নিজের স্বার্থে মশগুল। সত্যি বলছি, মানুষ জাতটাকে বিশ্বাস করতে আর প্রবৃত্তি হয় না। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে লেখা কাগজ বার করে সজ্জনের হাতে দিতে দিতে বনকন্যা বললে— এ বিষয় নিয়ে আমি ক'লাইন লিখে এনেছি। আপনি কোন ভালো খবরের কাগজে এটা ছাপিয়ে দিতে পারেন?

সজ্জন নিবিষ্ট মনে ফুলস্কেপ কাগজের চার পাতা পড়তে আরম্ভ করল। বনকন্যা ঘরের চারিদিকে নজর বুলিয়ে নিতে নিতে মাঝে মাঝে সজ্জনের মুখের ভাবটা লক্ষ্য করে নিচ্ছে।

সবটা পড়ার পর ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সজ্জন বলল— খুব ভালো লিখেছেন, কিন্তু আমার মতে এটা খবরের কাগজে দেবেন না। ইলেক্‌শনের হুল্লোড়ে চাপা পড়ে যাবে।

—কিন্তু অন্য কোন উপায় নেই।

—মহিপালের সঙ্গে যাকে দেখেছিলেন— কর্নেল, তাকে আমি বলে দেখব··· অমীনাবাদের ওষুধের দোকানের মালিক, ইলেকৃশন প্রচারের নানা প্যাঁচ সে বেশ বোঝে। এখুনি গিয়ে আমরা সকলে, আমি, আপনি, কর্নেল, মহিপাল এক জায়গায় বসে ভেবেচিন্তে কোন-না-কোন রাস্তা বের করব। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে দৈনিক হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে যেন এটা তলিয়ে না যায়, তা হলে জনতার মনে কোন আঁচড়ই কাটবে না।

—ওহ্, আপনাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার নেই, আমার যে উপকার আজ আপনি করলেন তার জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

দাম্ভিক মনের ওপর ভদ্রতার অঙ্কুশের বাড়ি পড়তেই সজ্জন যেন নিজের হারানো চৈতন্য আবার ফিরে পেল— ছি, ছি, আমাকে এত ছোট ভাববেন না। এ জগতে কে কার উপকার করে আর কে কৃতজ্ঞ থাকে এর হিসেব নিকেশ কে রাখে?

বনকন্যার চোখেমুখে কৃতজ্ঞতার ভাব ফুটে উঠেছে।

জিলিপির ঠোঙা থেকে জিলিপি প্লেটে বার করতে করতে সজ্জন বললে— আসুন একটু কিছু মুখে দিন, যাঃ জিলিপি একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এর সঙ্গে এক কাপ চা চলবে তো?

—আমি এখুনি চা তৈরী করছি— বলে বনকন্যা উঠে দাঁড়াল। সজ্জন বাজার থেকে দুধ কিনে আনতে গেল, বনকন্যা চায়ের সরঞ্জাম ছোট টেবিল থেকে তুলে নিয়ে সাজাতে ব্যস্ত। আজ সজ্জন সোজা কর্নেলের বাড়ি থেকে শাস্ত্রীজীর ওখানে চলে যাওয়ার দরুন ফেরতা পথে দুধের বোতল নিয়ে আসতে পারে নি।

* * *

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সজ্জন বললে— আপনার এখানে আসার ঠিক কিছুক্ষণ আগে সমাজসেবার বেশ তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। এই গলিতে একটু এগিয়ে গিয়ে এক উকিলমশাই থাকেন। বয়স হয়েছে কিন্তু কথায়-বার্তায় ভদ্রলোক বেশ আমুদে। তাঁর ছোট ছেলের বৌ পাগল হয়ে গেছে, গলিতে খুব উৎপাত আরম্ভ করে দিয়েছিল। তাকে কোনমতে কণ্ট্রোলে আনার জন্য গালে ঠাস করে চড় বসাতে হল— ইশ, জীবনে আজ পর্যন্ত মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলিনি। এখনো পর্যন্ত হাতের তেলো যেন ঝনঝন করছে।

—কেন পাগল হল ?

—আপনার বৌদির ওপর এক ধরনের অত্যাচার হয়েছিল, এর ওপর আর-এক ধরনের হচ্ছে। কিন্তু দুই কেসেরই বেদনার উৎস এক। সজ্জনের চোখেমুখে বেদনার অবসাদ নেমে এলো। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল— উকিলমশাইয়ের সন্তানের সংখ্যা তিন হলেও, আজ তাঁর কাছে কেউই থাকে না। বড় ছেলে বিলেতে ডাক্তারি পড়তে গিয়ে সেখানেই প্রাকটিস জমিয়ে নিয়েছে। তার বউ ছেলেমেয়েরা সেখানেই চলে গেছে। কখনো মাঝে মাঝে চিঠি আসে কিন্তু সে না আসারই সমান। দ্বিতীয় ছেলে আই. সি. এস. এক হোমরা-চোমরা অফিসার। এই স্যাঁতসেঁতে সরু গলি আর সেকেলে মা-বাবার সঙ্গে তাঁর বনিবনা হওয়া অসম্ভব তবে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠিয়ে তিনি সন্তানের কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তৃতীয়টি মিলিটারিতে আছে, তাঁর মেজাজও তেমনি রাশভারী— কথায় কথায় বোমা ফাটান। নিজের খুড়তুতো বোনের সঙ্গে বেশ কিছুদিন রোমিও জুলিয়েট ড্রামা

করার পর শেষকালে বিয়ে করে ফেললেন। অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করা বউ আজ বেকার মালের মত শ্বশুরবাড়ির এক কোণে পড়ে আছে। ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখে বুড়োবুড়ি মানসিক উদ্‌বেগের শিকার হয়ে গেলেন। ফলে আরম্ভ হল বউয়ের উপর কড়া পাহারা। সর্বক্ষণ মনের সমস্ত ইচ্ছাকে দমন করতে করতে তার অবস্থা আজ এতদূর গড়িয়ে গেছে।

সজ্জন চা খেতে খেতে আবার বনকন্যার মুখের দিকে তাকাল।

সরলভাবে কন্যা জিজ্ঞেস করলে— কি হবে? আর কতদিন এ অত্যাচার এমনভাবে চলতে থাকবে? এর শেষ কবে হবে?

—নিশ্চয়, নিশ্চয় হবে।

—কিন্তু কি করে হবে এইটাই আমার মাথায় ঢুকছে না। আমার কম্যুনিস্টদের সঙ্গে ওঠা-বসা আছে সেটা বোধহয় আপনি··· আপনার রাজনৈতিক দলাদলির বিষয় নিজস্ব মতামত থাকতে পারে।

—সে কথা থাকতে দিন। কোন পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ কে কেমন পরখ করার আমি পক্ষপাতী নই।

—আমি এইজন্যে কম্যুনিস্ট পার্টির কথা তুললাম কেননা আজকাল এর নাম শুনলেই সকলে আঁতকে ওঠে। ভল্লেবাবু একজন ভালো সোশ্যাল ওয়ার্কার, লেখাপড়া জানেন এবং চিন্তাধারা প্রগতিশীল। আমি আজ পর্যন্ত তাঁকে সম্মানের চোখে দেখে এসেছি কিন্তু আজকের কথাবার্তা শুনে আমার মনে হল, যেন এ সে মানুষই নয়। দুই ব্যক্তি যেন সম্পূর্ণ আলাদা। সজ্জন বুদ্ধিমানের মত হেসে ঘাড় কাত করে বললে— রাজনীতির বিষয় কিছু বলতে চাই না, তবে এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই যে, কম্যুনিস্টরা লোক হিসেবে মোটেই সুবিধের নয়।

—আপনার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল— বনকন্যার বুকে সজ্জনের কথা শেলের মত আঘাত করেছে। সে বলে উঠল— অনেকদিন ধরে যে প্রশ্ন আমার মনের ভেতর গুমরে মরছে, আজকের ঘটনার পর সেটার উত্তর যেন আমি খুঁজে পেয়েছি। রাজনৈতিক পার্টির হৈ চৈ ফুটবল ম্যাচের মতই, জনতা সেই ফুটবল আর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজের স্বার্থ অনুযায়ী তাদের ঠোকর মেরে ম্যাচ খেলে চলেছে। এ ইলেক্‌শন আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক নতুন রহস্য আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে।

সজ্জন মন দিয়ে শুনছে। কন্যা বলে চলেছে— ভল্লেবাবু কাগজে যা কিছু লিখে এনেছিলেন তাতে আমার বাবা আর বউদির কেচ্ছার সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি মিথ্যে প্রচারের কারণ বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। আমি প্রশ্ন করেছিলাম— এক মহিলার মর্যাদাহানি হতে দেখে আপনারা ওরকম অনুত্তেজিত ছিলেন কি করে? উত্তর পেলাম, পার্টি এই আদর্শ অনুসরণ করার চেষ্টা করছে, পার্টির জয়ে সমাজের জয়, সেই আদর্শ সমাজকে নতুন দিশা দেখাবে। সত্যি বলছি, এ উত্তর আমার বিচলিত মনকে সান্ত্বনা দিতে পারে নি। মানুষের যে বেদনা সামগ্রিক ভাবে দেখে নিয়ে এই সিদ্ধান্ত তৈরী হয়েছে সেটা সবটাই ফাঁপা, তার মধ্যে সত্যিকারের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন নেই। নিজের উৎসের সন্ধানে বর্তমান দেশের রাজনীতি ক্লান্ত হয়ে মাথা খুঁড়ে মরছে।

—খাঁটি কথা বলেছেন। এইজন্যে রাজনীতি আমার চুচক্ষের বিষ, বলতে বলতে সজ্জন কেতলি ওঠাল।

—কথায় কথায় চা একেবারে ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে, আবার তৈরী করব?

—আপনার জন্যে তৈরী করে দেব? আমি··· হ্যাঁ, মনটা আমারও ভারী হয়ে গেছে··· দেখুন না চা কফি সিগারেট এসব অবসর সময়ের সঙ্গী। মন যখন কোন গম্ভীর বিষয় নিয়ে ডুবে থাকে তখন এসব একদম ভালো লাগে না। বলতে বলতে সজ্জন সিগারেট কেস বার করার জন্যে পকেটে হাত পুরে দিলে। কন্যা ফট করে বলল— হাত ধুয়ে আসুন আগে। জিলিপির রসে চটচট করছে।

লজ্জিতভাবে বাঁ হাত দিয়ে কেসটা বার করতে করতে সজ্জন বললে— এসব পড়ে রয়েছে, তু পেয়ালা চা তৈরী করে ফেলুন, কিন্তু আগে খেয়ে নিন।

—না, না, অনেক খাওয়া হয়ে গেছে।

—না, না, কোন কথা শুনব না। অন্যায়ের সঙ্গে একবার যখন সুন্দ উপসুন্দের লড়াই করতে বেরিয়ে পড়েছেন, তখন দয়া করে নিজে কোন অন্যায় করবেন না। পুরুষের মত সমান অধিকার চাইছেন তখন সমানে সমান হয়ে জলখাবারটাও শেষ করে ফেলুন। সজ্জন বেশ অভিনয়ের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে ফেললে।

মুচকি হেসে কন্যা বললে— নিজের বেলায় যখন তখন ন্যায়বিচার চাইছেন, অথচ আমি কিছু বললে তখনই ঘাড় নেড়ে দেবেন, তাই না? নারীসুলভ লজ্জা অভিমানে তার ফর্সা মুখখানা টাটকা গোলাপের মত রক্তিম হয়ে উঠেছে। সজ্জন হেসে ফেললে— আমাকে পরীক্ষা না করেই পাস-ফেলের হিসেব করে ফেললেন?

প্রসঙ্গ বদলে কন্যা বললে— আপনাকে নয়, সারা পুরুষ জাতটাকেই সম্বোধন করে বলেছিলুম।

—দেখুন, এখানে যদি আপনি জাতিভেদের কথা বলেন তাহলে আপনার সঙ্গে আড়ি হয়ে যাবে কিন্তু। মেয়েরাও কারুর চেয়ে কম যায় না, কত বাড়িতে দেখেছি মেয়েরা পুরুষদের ভেড়া বানিয়ে রেখে দিয়েছে, তাদের কথায় পুরুষেরা কান ধরে ওঠবস করছে।

কন্যা খিল খিল করে হেসে উঠল।

—এই সেদিন এক উর্দু উপন্যাস পড়ছিলুম, তাতে এক বুড়ো মিয়াঁকে তার প্রেমিকা, একজন বেশ্যা, নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের মন-মেজাজ খুশী করার জন্য গাছে চড়া আর নামার হুকুম জারি করলে…

কন্যা হাসতে হাসতে বলল— ও আহাম্মক লোকটার যোগ্য কাজই ছিল ওটা। তবে মেয়েমানুষটি একেবারে কঠোর, জল্লাদ ছিল বলতে হবে।

জলখাবারের পালা শেষ হল। ঠোঙা বাইরে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আবার কেতলিতে জল চাপানো হল। সজ্জন বিছানায় ভালো করে ঠেসান দিয়ে বসে সিগারেট ধরিয়ে, বাদশাহী চালে, জোরে এক টান দিলে। আজ বনকন্যার উপস্থিতিতে নিরানন্দ ঘরে আনন্দের হাট বসেছে।

হঠাৎ সজ্জন জিজ্ঞেস করলে— আপনার নামটা, আপনার মা-বাবা রেখেছিলেন?

—কেন? কন্যার চোখেমুখে কৌতূহল ফুটে উঠেছে। সজ্জন ঠোঁটে সিগারেট চেপে বেপরোয়া ভাবে উত্তর দিলে, এ নাম আমাদের সমাজে প্রায় অচল, তাই না? কখন নাম বদলালেন? হাইস্কুলের পরীক্ষার সময়?

—আপনি জ্যোতিষবিদ্যে জানেন বুঝি ?

—আপনার মাথায় গজিয়েছিল না অন্য কেউ···

—আমার মাথায় গজিয়েছিল, নামটা ভালো নয় ?

—হাঁ, ভালোই— তবে চলতি ভাষায় যেন কেমন বেখাপ্পা, বড় খটখটে··· মানেটা আবার তেমনি জঙলী মেয়ে। দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল।

কন্যা একটা ছবির দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করলে— এ সত্যনারায়ণের ছবি না ? ·· সুন্দর হয়েছে··· বেশভূষা সব মারাঠি, কোথায় স্কেচ করেছিলেন ?

—কোল্‌হাপুরে।

—গরীবদুঃখীদের সঙ্গে থাকতে আপনার দ্বিধা বা সংকোচ নেই দেখে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত হয়েছি।

—আপনার কল্পনায় যদি আমি বাধার সৃষ্টি করি মাপ করবেন, সত্যি যদি মনের কথা জানতে চান তাহলে বলব, ওদের সঙ্গে মেলামেশায় আমি বেশ দ্বিধা বোধ করি।

—তাহলে ?

—কিন্তু মনোবল দিয়ে সেই আবরণ ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করি।

—সত্যিই যদি আপনি বিজয়ী হতে চান তাহলে অজন্তা-ইলোরা গুহা ছেড়ে ঢুকে পড়ুন জীবন্ত মানুষের গুহায়। আমাদের দেশের বড় বড় নেতার চোখের সামনে তুলে ধরুন এদের জীবনযাত্রার জীবন্ত ছবি। কন্যা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

—আপনি আমাকে প্রেরণা দিচ্ছেন ? আমি এই মিশন নিয়েই এ পাড়ায় এসেছি। তবে অজন্তা-ইলোরার ছবি আঁকা যে একদমই বাজে তা নয়।

—আমি ঠিক তা বলছি না।

—অজন্তা-ইলোরা থেকে যদি সত্যিকারের প্রেরণা নিতে পারা যায় তাহলে, আমাদের জীবন অনেক সুন্দর আর উপযোগী করা যেতে পারে।

—আমি…

—আপনাকে সত্যি বলছি, গুহা দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার চোখের সামনে মিশরের পিরামিডের ছবি ভেসে উঠেছিল। একটু ভেবে দেখলেই দুটোর মধ্যে পার্থক্য বেশ বোঝা যায়। একদিকে ইজিপ্টের পুরুষেরা সারি সারি পাহাড় দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে যা আজও তাদের শক্তি আর প্রতিভার নমুনা হিসেবে আমাদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। ওরা নকল পাহাড়ের মধ্যে মড়ার জায়গা সুরক্ষিত করে রেখেছিল। অন্যদিকে আমাদের দেশের পূর্বপুরুষেরা পাহাড়কে কেটে কেটে কত সুন্দর লেখাপড়ার, ধ্যানের জায়গা তৈরি করে গেছেন। এবার দুই সভ্যতার বিভেদ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছেন বোধহয়? আমাদের এখানে আমরা দেখি প্রতি পদে আর্টের সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ। আমাদের আর্ট অতি সুন্দর কিন্তু তা চোখে ধাঁধা সৃষ্টি করে না, তার মধ্যে আমরা দেখি সত্য শিব আর সুন্দরের অদ্ভুত প্রকাশ। দুই সভ্যতার আধার শিলায় কত প্রভেদ। সজ্জনের অনর্গল বক্তৃতায় কন্যা প্রভাবিত হল। সেও নিজের কথার মায়াজালে যেন নিজেই জড়িয়ে পড়েছে।

একটু থেমে কন্যা বললে— ঠিক বলেছেন। আপনার অনুভূতি দিয়ে আজ আপনি আমাকে অনেক উঁচুদরের কষ্টিপাথরের সন্ধান দিয়েছেন, আমি কখনও ভুলব না— কিন্তু একটা কথা কিছুতেই

আমি বুঝে উঠতে পারি না। একদিকে সাহিত্য, শিল্প আর গভীর দর্শনশাস্ত্র অন্যদিকে বাড়ি বাড়িতে সত্যনারায়ণ, নানা কুপ্রথা, আমার বউদি আর আপনার সেই পাগল মহিলা, আমার বাবা, ভাই···

—আপনার ভাই? কেন তিনি আবার কী করলেন? সজ্জনের প্রশ্নে হঠাৎ কন্যার মুখের রঙ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, অস্ফুট স্বরে বললে— আমার বাড়ি সত্যিই এক চিড়িয়াখানা। আমার ভাই এক অদ্ভুত মানসিক রোগে আক্রান্ত··· কী বলে বোঝাই আপনাকে, আপনি সমাজকে কাছে থেকে দেখে বুঝতে চান তাই আপনাকে বলছি, আমার বউদি নর্মাল মেয়েমানুষ নয়··· মানে···

চমকে সজ্জন কৌতূহলের স্বরে জিজ্ঞেস করলে— তার মানে?

কন্যা নিজের মনের আবেগ সামলে নিয়ে বললে— ভগবানের এক বিচিত্র বিচার, হ্যাঁ, এ জাতীয় মেয়েদের···

—ওঃ বুঝেছি, হিজ···

—হ্যাঁ, একটু তফাত আছে, এদের দেহ মেয়েদের মতই বিকশিত হয়।

—এ বিয়ে কেমন করে হল?

—যেমন ধাপ্পা দিয়ে হয়ে থাকে। মা-বাবার হাতে পনেরো হাজার টাকা এল আর দাদা হাতে কিছু না পেয়ে রোজ বউদির হাড়গোড় ভাঙছে। এ বিষয় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে দাদা সত্যিই খুব আঘাত পেয়েছে। তার মন শিশুর মত নরম। আজকাল ফিটের ব্যারামে ভুগছে। যখন ফিট হয় তখন রাক্ষসের মত ব্যবহার করে। একদিন রাত্তিরে ঘুমন্ত বউদির বিনুনি কাঁচি দিয়ে কেটে রেখে দিয়েছিল। একদিন ভোরবেলা তাকে গোমতীর

ধারে চান করাতে নিয়ে গিয়ে বললে, চলো আজ দুজনেই মাথা কামিয়ে ফেলে ডুবে মরি···

—আহা হা!

—সেখানে এক নাটক আরম্ভ হয়ে গেল। শেষকালে বেগতিক দেখে বউদি বুদ্ধি করে দাদাকে বললে, আগে তুমি কামিয়ে ফেলো তারপর আমি। দাদা মাথা কামাতে বসতেই পেছন থেকে বউদি পালিয়ে রিকশায় বসে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি এল···

—আমাদের বাড়ি রোজই কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হয়··· আর··· লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়··· আমার বাড়ি এক গোলকধাঁধা ·· আমার জেঠী আর আমার মায়ের মধ্যে সাপে নেউলের সম্পর্ক। জেঠী নিজের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য নিজের এক দূর সম্পর্কের বিধবা বউয়ের সঙ্গে দাদার পরিচয় করিয়ে বাড়িতে অনাচার করাবার চেষ্টা করেছিলেন। দাদা ধর্মভীরু প্রকৃতির, তাই বউদির সায় নিয়ে ভেবেচিন্তে বিয়ের প্রস্তাব করে ফেলল। ইতিমধ্যে জেঠীর আসল চাল আমার মায়ের চোখে ধরা পড়ে গেল। মার মনটা খোলামেলা কিন্তু নিজের আধিপত্য জমাবার জন্যে হেন কাজ নেই যা করতে পারেন না। উনি আমার বাবাকে উস্কে উস্কে অধঃপাতের রাস্তায় নিয়ে গেলেন কেবল জেঠীকে ছোট করার জন্য, তাকে নিজের মতই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারার জন্য, এ ছাড়া তার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সজ্জন বললে— মিস কন্যা, আপনার প্রতি সত্যি সহানুভূতিতে মন ভরে উঠছে।

—ধন্যবাদ, আমি কিন্তু সহানুভূতি চাই না। আমি একাই একশো হয়ে লড়ে যাব। আমার এতক্ষণের বকবকানির অর্থ হল

এই যে অজন্তা-ইলোরাতে আমাদের সংস্কৃতি জড় পাথরের মধ্যে চেতনা সঞ্চার করতে পারে, কিন্তু আমাদের উঁচু উঁচু আদর্শ সমাজে কোন নতুন শক্তি না জাগিয়ে ক্রমশ লোপ পেতে বসেছে, এর কারণটা কি? আমাদের মধ্যে এত নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও কেন আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনা যাচ্ছে না।

কন্যার কথায় সজ্জন চিন্তিতভাবে বললে— আমি কিছুতেই মানতে রাজী নই যে আমাদের জাতীয় চরিত্র বলে কিছু নেই। যে দেশের চরিত্র দুর্বল, তাদের মধ্যে কালিদাস, বাল্মীকি আর ব্যাসের মত কবি জন্মগ্রহণ করতেই পারেন না। আমাদের ইতিহাসের পাতায় সম্রাট অশোকের মত রাজা, বুদ্ধ আর গান্ধীর মত মহাপ্রাণ রয়ে গেছেন। গোটা দেশের সঙ্গে আপনার বাড়ির আবহাওয়ার তুলনা করাটা আপনার মস্ত ভুল। আমার মা আর তাছাড়া কত লোক আছে, এই তো আজ সকালেই গুন্নোমলের ওখানে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী থাকেন, বড় বিদ্বান, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি দেশের পুরোনো ট্রাডিশনের বিষয় অনেক জ্ঞানের কথা শোনালেন, এর পরেও আমাদের ক্ষমতাকে অক্ষমতা বলে মেনে নিতে বলবেন?

চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে কন্যা উত্তর দিলে— আমি অস্বীকার অথবা স্বীকার করার কথা বলছি না। আমি বলতে চাই যে আমাদের সমাজের মধ্যে নিশ্চয় বিপরীত ধারা কোনখানে অন্তঃসলিলা হয়ে বয়ে যাচ্ছে, তাই যা-কিছু নৈতিক আদর্শ সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। চায়ে চিনি কম হয়নি তো?

—না, ধন্যবাদ, একটু বেশী মিষ্টি হয়ে গেছে, আপনি বোধহয় হুচামচে দিয়ে ফেলেছেন। যাক্ বেশ ভালোই লাগছে।

ঠাট্টা গায়ে না মেখে কন্যা বললে— দেখুন, সত্যনারায়ণের কথার মধ্যে কি আছে? কোটি কোটি বাড়িতে শ্রদ্ধাবনতভাবে শোনা হয়। আমি এর মধ্যে কোন আদর্শ খুঁজে পাই না। সম্পূর্ণ কথা আগাগোড়া পড়ার পর না সত্য, না নারায়ণ, কারুরই দর্শন হয় না।

সজ্জন কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইল— আরে— সব সময় কম্যুনিজমের একই পটপটানি আর ভালো লাগে না, (প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য) এই যাঃ শুধু কথা দিয়েই পেট ভরবে নাকি?

—কেন? এখুনি জলখাবার খেলুম যে?

—আরে সে তো নস্যি, ওইটুকুতে পেট ভরে? বেলা দুটো বাজল, এতক্ষণ পর্যন্ত অভুক্ত থাকলে আপনার বাড়িতে কেউ কিছু বলে না?

ধীরে ধীরে চায়ে চুমুক দিতে দিতে কন্যার মুখ কঠিন হয়ে গেল—আগে রাগ করতেন— পরশু থেকে সব সম্পর্কই চুকে গেছে। বাড়ির দরজা আমার জন্য বন্ধ হয়ে গেছে।

—কবে?

—পরশু।

—বেশী ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল না কি?

—হ্যাঁ,··· তা··· বাবু শালিগরামের বর্ণনা অনুসারে আমার বাড়ির প্রত্যেকেই বাবাকে দেবতুল্য বলতে ব্যস্ত। সকলে বউদি আর ভল্লেবাবুকে দোষী ঠাওরাচ্ছিল, আমি পুলিসের সামনে মুখ না খোলার প্রতিজ্ঞা করলুম।

—ইস নরাধম সব··· তাহলে এখন আপনি আছেন কোথায়? কম্যুনিস্ট পার্টি···

—না, না, পরশু রাত থেকে আজ দুপুরের আগে পর্যন্ত এক বন্ধুর বাড়িতে ছিলুম। তার বাড়ির লোকেরা আপত্তি করাতে সেখান থেকে এক কমরেডের বাড়ি চলে গেলুম। এবার ভাগ্য কোথায় নিয়ে যায় দেখুন। চোখের সামনে সবই অন্ধকার। হতাশভাবে নিশ্বাস ফেলে কন্যা চাপা কান্নার বেগে ভেঙে পড়ল।

সজ্জন উদ্‌বিগ্নভাবে বললে— না, না, আপনার কোন কষ্ট হতে দেব না, আমার এত বাড়িঘরদোর থাকতে আপনি…

—কিন্তু আপনার বাড়িতে আমি কেন থাকব?

—কেন?

—বেশ গভীরভাবে দুমিনিট ভাবলেই এর উত্তর নিজেই খুঁজে পাবেন— কন্যার গলার স্বরে দৃঢ়তার স্পষ্ট ইঙ্গিত।

সজ্জন গম্ভীর হয়ে বললে— আমি আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি না তা নয়। যা-কিছু আপনি প্রতিদিন প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন তারপর পুরুষকে সন্দেহের চোখে দেখার অধিকার আপনার আছে। আমি পুরুষ হিসাবে খারাপ হতে পারি— তবু মিস বনকন্যা— আমার মধ্যেও কোন গুণ আপনি পেতে পারেন।

চোখের বড় বড় পাতা সজ্জনের মুখের ওপর নিবদ্ধ করে কন্যা মুচকি হেসে বললে— যদি এ ভরসা মনে না থাকত তাহলে সাহায্য চাইতে এখান পর্যন্ত ছুটে আসতাম না।

—আচ্ছা, তাহলে এবার উঠুন, চলা যাক।

—কোথায়?

—আমার বাড়ি, আজ পঁচিশে ডিসেম্বর, আমার বাড়িতে আপনার নিমন্ত্রণ।

—আমি একটু পুতুলের এগ্‌জিবিশন দেখতে যাব।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাহলে আপনার সঙ্গে আমিও একটু ঘুরে আসি। রাস্তায় মহিপাল আর কর্নেলকে ডেকে নেওয়া যাবে।

—সজ্জনবাবু— আমি…

—দেখুন, আর-কোন ওজর আপত্তি শুনব না। আজকের নিমন্ত্রণ আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। আপনি পুরুষদের মধ্যে ওঠাবসা করেন না? তাছাড়া সেই হ্যাণ্ডবিলের বিষয় নিয়ে আপনাকে কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

কন্যার সঙ্গে বাইরে রাস্তায় পা দিতেই সজ্জন তার জীবনে প্রথমবার এক নতুন অনুভবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে, আজ জীবনে প্রথমবার সে নারীকে তার উচিত মর্যাদা দিতে এগিয়ে এল।

তেরো

1951 সালে নির্ভেজাল সত্যি খবর শুনে চারিদিকে সোরগোলের সৃষ্টি হয়েছে। ইলেকশনের হৈ-হুল্লোড়ে আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ প্রায় দিশেহারা, এমনি সময় 31 ডিসেম্বরের দৈনিক খবরের কাগজ পড়ে লক্ষ্ণৌ শহরের তামাম মানুষের পিলে চমকে উঠল।

শহরের শেষ সীমানায় রেল লাইনের ধারে একটি মৃতদেহ মাটি-চাপা অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। কুকুরের দল তাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছে দেখে আশেপাশের ছেলে-ছোকরাদের টনক

নড়ল, সঙ্গে সঙ্গে খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। প্রায় তিনদিন ধরে গর্তের মধ্যে পড়ে থাকায় মৃতদেহটিতে পচন ধরেছে। যুবতীর বয়স বছর পঁচিশ, গায়ে আকাশী রঙের ভয়েলের শাড়ি, হাতে প্লাস্টিকের চুড়ি। তার এক পায়ের একপাটি স্যাণ্ডেল কাছেই পড়ে ছিল।

1952 সালের সুপ্রভাতের আগেই মৃত যুবতীর মনগড়া কেচ্ছাতে সারা গলি বাজার সরগরম হয়ে উঠেছে। ইলেকশন প্রায় কাছে এসে গেছে, তাই কংগ্রেস রাজত্বের দায়িত্বহীন কাণ্ডকারখানা হিসেবে এই খবরের সঙ্গে নানা গুজবের লতাপাতা গজাতে বেশী সময় লাগল না। পুলিস হয়রান হয়ে গেছে, কিন্তু যুবতীর নাম-ঠিকানা খুঁজে বার করা তখনও সম্ভব হয়নি। কেউ তাকে হিন্দু আর কেউবা মুসলমান সাব্যস্ত করতে বদ্ধপরিকর। কারুর মতে তার হত্যা চলন্ত ট্রেনে গলা টিপে বা বিষ দিয়ে করা হয়েছে।

...চারিদিকে অলস ভাব, দৈনন্দিন কাজে কারুর রুচি নেই। প্রত্যেকেই নতুন বছরের প্রথম দিনকে পুরোনো বছরের গাঁঠছড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখতে চায়। জনসাধারণের জীবন আর্থিক অনটনের চাকিতে পিষে প্রায় গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজের শোষিত বর্গ আজ ধুঁকে ধুঁকে এগিয়ে চলেছে। প্রত্যেক সংসারে ছুবেলা ছুমুঠোর চিন্তা আগেই ছিল, তাতে গোদের ওপর বিষফোড়া হয়ে দেখা দিয়েছে ইলেকশন। প্রত্যেক পাড়ায় লাউড স্পীকার, নানা সভার চেঁচামেচিতে কানের পর্দা ছিঁড়ে যাবার জোগাড়। রাজনীতির কচকচানিতে একে অন্যকে জনসাধারণের চোখে ছোট করার প্রাণপাত চেষ্টা চলছে।

নতুন বছরের প্রথম রাত যেন সারা শহরের হৃদয়ের বেদনাকে

আঁচলে লুকিয়ে নিয়েছে। বাজারে প্রায় বেশীর ভাগ গ্রাহকের সংখ্যা তাদের যারা ধার নিয়ে বিয়ে পৈতের উৎসব সেরে ফেলার ব্যবস্থা করছে, দাঁত খিঁচিয়ে কাষ্ঠহাসির মধ্যে লুকিয়ে আছে দেনা-শোধের চিন্তার আগুন।

চৌমাথা দিয়ে নদীর ঢেউয়ের মত সাইকেল, রিকশা, টাঙ্গা, পায়ে-হাঁটা লোকের ভীড় অনবরত চলেছে। অসংখ্য মানুষের নানারকম শব্দ ঠিক যেন শেঠজীর কারখানার হুড়হুড়ানির মত শোনাচ্ছে। উৎপাদনের ফিরিস্তি দেখলে বোঝা যায় যে কার্যক্ষমতার ব্যয় উৎপাদনের থেকে অনেক বেশী।— তাহলে উৎপাদন হচ্ছে কেন? শেঠজীর আত্মমর্যাদাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য? কতদিন এভাবে চলবে? আর বেশী দিন নয়।

রেস্তোঁরায়, পানওয়ালার আর ময়রার দোকানে রেডিওতে খবর আসছে। বাজারের রাস্তা পেরিয়ে বাড়ির গলি পর্যন্ত রেডিওর অটুট স্বর সমানে সকলের কানে অমৃত ঢালার কাজ করে চলেছে। কোন কোন রাস্তার এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত একই বেতার কেন্দ্র খোলা রয়েছে। খেলাধুলোর খবর আসছে— ভারত আর ইংল্যাণ্ডের ম্যাচের আজ তৃতীয় দিন। রায়, উমরিগর, হাজারে কেবল আঠাশ রান করে একঘণ্টায় আউট হয়ে গেল। মঞ্জেরেকর আটচল্লিশ রান করে আজকের প্রাণহীন খেলায় প্রাণ এনেছে, এবার শুনুন আজকের আবহাওয়ার খবর···

রেডিওতে সময় সংকেত ভেসে এল। আগামী নতুন প্রোগ্রাম শোনার আশায় সজ্জন আর কন্যা দুজনেই উৎসুক হয়ে বসে আছে। বিগত চার-পাঁচদিনের মধ্যে তাদের পারস্পরিক ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। একে অন্যকে বুঝে ফেলার

পালা প্রায় অনেকটা শেষ হয়ে এসেছে। রেডিও অ্যানাউন্সার বললে— আপনারা অল ইণ্ডিয়া রেডিও লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, পাটনা শুনছেন— এবার মহিপাল শুক্ল তাঁর নতুন রচনা পড়ে শোনাবেন— শ্রীমহিপাল শুক্ল···

সজ্জন সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসল। কন্যা একদৃষ্টে রেডিওর দিকে চেয়ে আছে যেন সেটটাকে গিলে ফেলবে। মহিপালের স্বরের সঙ্গে যেন সে তাকে স্বশরীরে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। তার আওয়াজ বেশ মিষ্টি অথচ ভারী। প্রত্যেকটা কথা যেন হৃদয়ে মোচড় দিয়ে ওঠে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন সে বড় ক্লান্ত, কোনমতে টেনে টেনে বলার চেষ্টা করছে। রেডিও ঘড়ঘড় করে উঠল।

চোখ চেয়ে সজ্জন কন্যাকে বললে— আওয়াজ একটু ঠিক করে দিন— ধন্যবাদ।

মহিপাল তন্ময় হয়ে গল্প পড়ছে—তার গল্পের বিষয়বস্তু হল— আদিম যুগে সত্য আর শ্রেষ্ঠতার জন্য স্ত্রী-পুরুষের সংঘর্ষ— গল্প পড়া শেষ হল।

—শ্রীমহিপাল শুক্ল তাঁর লেখা গল্প এতক্ষণ আপনাদের শোনাচ্ছিলেন— মেয়েলী নাকী ঘ্যানঘ্যানানিতে সকলের ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল।

—কেমন লাগল গল্প? সজ্জন টেলিফোনের কাছে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলে।

—মজার ছিল— ভালোই লাগল— কন্যা তখনও গল্পের বিষয় ভাবছিল।

সজ্জন টেলিফোন করে সেখানের ডিউটি অফিসারকে ডাকল।

কন্যা সোফা থেকে উঠে রেডিওগ্রামের কাছে দাঁড়াল— আপনার ঐ খেয়াল ভালো লাগছে?

টেলিফোনের রিসিভার কানে লাগিয়ে অসম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে সজ্জন বললে— আমার একই খেয়াল পছন্দ, আমাদের দুজনের খেয়াল বুঝেছেন? হ্যাঁ— হ্যালো— মহান লেখক মশাই, দিন দিন নাম চারিদিকে ছড়িয়ে— কেন? উত্তরে বেশ ঘা কতক দিতে ইচ্ছে করছে, লজ্জা করে না, প্রায় পাঁচ-ছদিন হল তোমার দেখা নেই, হ্যাঁ, হ্যাঁ, রামো রামো— তবে তো বেশ পরিশ্রম করছ, আহাম্মক, তাই তো তোমায় কত বোঝাই যে এত বেশী টানা ভালো নয়— হা-হা-হা ভেরী গুড— এখুনি এসো— আমার মতামত? এখানে এলেই শুনতে পাবে। তোমার একজন মস্ত বড় ভক্ত— আচ্ছা, নাও টেলিফোনেই শুনে নাও (টেলিফোনের রিসিভার কন্যার হাতে দেওয়ার জন্য একটু কোমর হেঁট করে) এদিকে আসুন, আপনার সঙ্গে প্রসিদ্ধ লেখকের পরিচয় করিয়ে দিই।

ক্লাসিকাল সংগীতের বড় একঘেয়ে প্রোগ্রাম হচ্ছে— দুত্তোর— কন্যা উঠে গিয়ে রেডিওর কাঁটা কর্ণাটকী সংগীতে ঘুরিয়ে দিলে।

সজ্জন টেলিফোনে— ভাই মহিপাল— কথা বলো— হ্যাঁ এ প্রান্তে মিস বনকন্যা আর ও প্রান্তে আমার এক আহাম্মক লেখক বন্ধু— বলতে বলতে রিসিভার কন্যার হাতে ধরিয়ে দিলে।

কন্যা একগাল হেসে রিসিভার হাতে নিয়ে— নমস্কার, অ্যাঁ (হাসি) না না, আমি সত্যি মনে করিনি— আপনারা দুজনে প্রাণের এয়ার, প্রাণ খুলে পরস্পরকে যা ইচ্ছে বলুন— আমি কেবল আপনাদের গুণগ্রাহী— হ্যাঁ, ভালো লাগল— খুব ভালো বলতে পারছি না— এরচেয়ে আপনার 'দেবতা' গল্প বেশী ভালো লেগেছিল।

হঠাৎ এরোপ্লেনের ঘোঁ ঘোঁ শব্দে রিসিভারের আওয়াজ তলিয়ে গেল। সজ্জন এরোপ্লেন দেখার কৌতূহল চাপতে না পেরে এক ছুটে বাইরের ব্যালকনিতে গিয়ে কৌতূহলভরা চোখে আকাশের দিকে তাকাতে লাগল। অস্পষ্ট আওয়াজে বিরক্ত হয়ে বনকন্যা রিসিভার রেখে দিলে। মুহূর্তের জন্য বেতারকেন্দ্রের প্রোগ্রাম, দুটি এরোপ্লেনের কর্কশ ধ্বনির সামনে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। ইতিমধ্যে বেতারকেন্দ্রের টেলিফোন ক্রিং ক্রিং শব্দে বেজে উঠল, কর্নেল ফোনে মহিপালকে ডাকছে। রিসিভার ধরে মহিপাল বললে— এখানেই থামব? কেন? আমি সজ্জনের বাড়ি যাচ্ছি— এ্যাঁ, এয়ারপোর্ট থেকে বলছ? সেখানে মরতে কেন গেলে?

আকাশে এরোপ্লেন ঘোঁ ঘোঁ শব্দে, বনবন করে শহর পরিক্রমা করছে। উনিশ শো বাহান্ন সালের শীতের সন্ধে, হঠাৎ আকাশে সোরগোলের শব্দে মিইয়ে পড়া শহরটি যেন আচমকা জেগে উঠেছে। পাঁচ মিনিট পর্যন্ত এরোপ্লেন একইভাবে পরিক্রমা করে চলেছে, বনবন শব্দে বাজার হাটের হট্টগোল নিমেষে থেমে গেছে, শীতের প্রকোপে যারা লেপের ভেতর আশ্রয় নিয়েছে, তারা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। চারিদিকে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, এরোপ্লেন হ্যাণ্ডবিল ফেলছে। চতুর্থীর এক ফালি চাঁদের জ্যোৎস্নার আলোয় সাদা সাদা হ্যাণ্ডবিল পায়রার মতো শহরের আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে।

একসঙ্গে অসংখ্য হাত আকাশের দিকে কাগজ লুফে নেবার জন্য উঠে গেছে। কাগজের টুকরো উড়তে উড়তে ইলেকট্রিকের পোলের ওপর পর্যন্ত আসতেই সকলের চোখের সামনে রহস্যের

বর্ম খুলে পড়ল। ছোট বইয়ের অস্তিত্বকে সব ক'জোড়া চোখই এবার চিনে ফেলেছে।

যাদের হাতের মুঠোর মধ্যে সহজেই ছোট বই এসে ধরা দিয়েছে তারা এমনি আনন্দে আত্মহারা যেন এখুনি তারা ডার্বী লটারির টাকা পেয়েছে। হাতাহাতি ধাক্কাধাক্কি গালাগালি হৈচৈতে চারিদিকে হুলুস্থুল বেধে গেল। মিনিট পাঁচেক চিৎকার চেঁচামেচি চলল। যাদের হাত খালি রয়ে গেছে তারা হন্যে হয়ে পাগলের মত এদিক-সেদিক ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিয়েছে। যারা উর্দু পড়তে জানে না অথচ দৈবদুর্বিপাকে তাদের ভাগ্যে সেই ভাষার কাগজ জুটেছে, তারা তখুনি হুড়বড়িয়ে পাড়ায় উর্দু লেখাপড়া জানা লোকের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। উর্দু জানা হাতে হিন্দীর কাগজ বাড়ির বাচ্চাদের ঘুম নষ্ট করে দিল, আধঘুমন্ত চোখ রগড়াতে রগড়াতে তারা বিছানায় বসে স্কুলের হিন্দী জ্ঞানের পরীক্ষা হিসেবে জোরে জোরে পাঠ শোনাতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে জনসাধারণের অবশ হাতে পায়ে যেন বিদ্যুতের শক্তি এসে গেছে। কয়েক মিনিটের ভেতরে প্রচার পুস্তিকা হাতাবার জন্য ছোটখাটো কতই না দুর্ঘটনা ঘটে গেল। খানিক পরে যে যার গ্রুপে বসে মনোযোগ সহকারে আগাগোড়া পড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। পুস্তিকার ওপরের মলাটে তিনটে ঘোমটা দেয়া পেন্সিলের স্কেচ— নীচে বড় বড় অক্ষরে ছাপা 'অবগুণ্ঠন সরাতে হবে— সরাতে হবে ভাই'— লেখিকা : কুমারী বনকন্যা।

নিজের বাড়ির ঘটনার ফিরিস্তি দেবার পর শেষে বনকন্যা লিখেছে, 'পুরুষজাতটার প্রতি আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। যাদের জিভ একবার মানুষের শোষিত রক্তের আস্বাদ পেয়েছে,

তারা কখনো শোষণ ছাড়তে পারে না। আমি আবেদন জানাচ্ছি আমার বোনদের উদ্দেশে, যারা স্কুল-কলেজে পড়ে গৃহে বন্দিনীর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে। আমার মতে তাঁদের 'প্রেম' শব্দের মায়াজালে জড়ানো সমাজবিরোধী বিষধরের দংশন থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে। অত্যাচারী শাসক শোষিতকে পরাধীন করার আগে তার নৈতিক মনোবলকে ভেঙে শেষ করে দেয়। নারীজাতির করুণ ক্রন্দনে ভরা ইতিহাসের পাতা এ বিষয়ের সাক্ষী। বিবাহের মন্ত্রে কপচানো নারীর অধিকার আজ উপহাসের সামগ্রী হয়ে গেছে। ভারতের পুঁথিতে লেখা গণতান্ত্রিক শাসন প্রণালী আজ বিদেশে সম্মান পাচ্ছে কিন্তু এখানে অবস্থা ঠিক তার বিপরীত। বড় বড় ভাষণে জোর গলায় বলা হয় যে-গৃহে নারীকে সম্মান দেওয়া হয়, সেখানেই দেবতার বাস। কিন্তু এই চলতি কথার সারতত্ত্ব কেউ মানতে রাজী নয়। নারীজাতিকে সম্পূর্ণ পদদলিত করে রাখাই আমাদের সমাজের মহান ধর্ম। ধর্ম, ন্যায়, রাজত্ব করা সবই পুরুষের অধিকারে। পুরুষ অসহায় স্ত্রীকে যদি বাক্‌জালে জড়িয়ে পিষে মারে তাহলে সে বেচারিকে দোষী ঠাওরানো কি ঠিক? ধর্ম, প্রথা আর আচার-বিচারের মায়াজাল সরিয়ে দিতে হবে। আমাদের অধিকার হাসিল করার জন্য আমরা সমর প্রাঙ্গণে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যও প্রস্তুত আছি।

'আমি যেদিন আমার বাবার অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ খোলার চেষ্টা করেছিলুম সেদিন স্বর্গীয়া বউদি আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছিলেন। শত চেষ্টার পরেও আমি তাকে বুঝিয়ে উঠতে পারিনি যে অত্যাচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত জাগিয়ে

তোলায় মানহানি হয় না। অত্যাচারীর সামনে মূক ছাগলের মত বলি হয়ে যাওয়াই প্রকৃত মানহানি। স্ত্রীর আশেপাশে 'প্রেমের' মায়াজাল বিছিয়ে তাকে পুরুষ দিতে চায় বিশ্বাস, প্রতিদানে চায় তার দেহ— চিরজীবনের সঙ্গিনী করার মিথ্যে ভাঁওতা দিয়ে তাকে নিয়ে যায় অধঃপাতের পথে। একদিন সেই প্রেম অমৃতের বদলে গরল হয়ে স্ত্রীর গলা দিয়ে নেমে যায়। প্রেমের বেদিতে তার বিন্দু বিন্দু রক্তের ফোঁটা চোখের জলে ধুয়ে যায়— এই ন্যায়? এই কি প্রেমের প্রকৃত রূপ? অষ্টপ্রহর বসে চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কি কোনই গতি নেই তার? দাম্ভিক, ছলকপটতায় পারদর্শী পুরুষের জন্য চোখের জল তার গালেই শুকিয়ে যায় তবু সে বিচার পায় না। তার জীবনের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেমের আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। আসুন— এ নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে অভিযান আরম্ভ করতে হবে, অবগুণ্ঠন সরাতে হবে। যেদিন নারীজাতি সম্পূর্ণ এক হয়ে একস্বরে অত্যাচার দমনের আহ্বান জানাব, সেইদিন হবে স্ত্রীজাতির জীবনের সুপ্রভাত।'

নীচে মহিপাল, সজ্জন আর কর্নেলের সই দিয়ে জনসাধারণের প্রতি আবেদন লেখা— 'বনকন্যার লেখায় কোন রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি নেই, অতি সহজ সরলভাষায় নারীজাতির প্রতি অত্যাচারের বিশদ বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আপনাদের কাছে আমাদের করবদ্ধ প্রার্থনা যে আপনারা এ বিষয় গভীরভাবে বিবেচনা করুন। বর্তমান সমাজের নারী আজ আপনাদের কাছে ন্যায় ভিক্ষা চাইছে, তাদের হৃদয়ের স্পন্দনের অনুভূতি আপনারা বনকন্যার লেখার মধ্যে দিয়ে অনুভব করবেন। জনতার দরবারে ন্যায় ভিক্ষার জন্যই আমাদের এই আবেদন।'

সজ্জন আর কন্যা দুজনে ধ্যানমগ্ন হয়ে পুস্তিকা পড়ছে। পড়া শেষ হতেই সজ্জন হেসে ফেলে বললে— এ ব্যাটা কর্নেলের আক্কেলখানা দেখুন একবার, সারাজীবন আহাম্মকই থেকে গেল। আমার আর মহিপালের নাম মিছিমিছি মাঝেখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এর কোন মানে হয়? উঃ একেবারে বাজে স্টেটমেণ্ট।

—আমার মনে হয় এর জন্য মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। যাই বলুন, কর্নেল মানুষটি ভালো, কেমন বুকঠুকে এগিয়ে এসেছেন। লাইটার দিয়ে সিগারেট জ্বালিয়ে সজ্জন বললে— হ্যাঁ, সেদিন ক্রিসমাসের দিন আপনার সামনেই তার হাতে আপনার লেখাটা দিয়েছিলুম, তারপর থেকে ব্যাটাচ্ছেলে একটা খবরাখবর পর্যন্ত দেওয়া দরকার মনে করলে না।

—এ কথা আপনি আমায় বিশ্বাস করতে বলেন? মুখ টিপে কন্যা হাসি চাপার চেষ্টা করছে। তার চোখে মান-অভিমান বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ছায়া ঝিলিক মারছে। সজ্জন মন্ত্রমুগ্ধের মত তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। উঃ মেয়েদের এই ফাঁদটুকু অপূর্ব। আজ তাদের মধ্যের ব্যবধান ঘুচে গিয়েছে। এই মধুর অনুভূতিকে সে চিরজীবনের জন্য নিজের স্মৃতির কোটরে সঞ্চয় করে রাখবে।

—এই স্কেচটা আপনার হাতের তৈরী···

সজ্জন অকারণে কাষ্ঠহাসি হেসে বললে— যে ভাবে ছাপা হয়েছে তাতে কর্নেলের আঁকা মনে হচ্ছে না? আমার স্কেচের খাতা থেকে কোন্ সময় চুরি করে নিয়ে গেছে, হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে, বটেশ্বর গ্রামের মেলায় এই স্কেচ এঁকেছিলাম। আরে আমায় যদি একবার বলত তাহলে তখুনি নতুন স্কেচ এঁকে দিতুম।

—কেন, ভালোই তো হয়েছে··· ওঁর বেশ কিছু খরচ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

—তাতে কি? খরচের জন্যই তো মানুষ উপার্জন করে।

—না, তা নয়, নিজের স্বার্থের কথা সকলেই বড় করে ভাবে কিন্তু অন্যের স্বার্থকে বড় করে ভাবার মত মন কজনের আছে বলতে পারেন? কোন উদ্দেশ্যের জন্য খরচ করা আরোই কঠিন নয় কি?

কন্যার সামনে নিজের এবং বন্ধুদের মহানতার পরিচয় দেবার জন্য সজ্জন আকুলিবিকুলি করে উঠল। সে বোঝাতে চায় যে তারা সকলেই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য প্রাণ দিতেও পেছপা হবার পাত্র নয়। সজ্জন দু' হাত আকাশের দিকে তুলে বলল— আমার জীবনে চিরদিনই এটাই উদ্দেশ্য ছিল এবং আজও তা আছে। যাদের মন উদার আমার মনের মিল ঠিক তাদের সঙ্গেই হয়, প্রত্যেক অ্যাভারেজ মানুষের চরিত্রে এই গুণের সমাবেশ হওয়া অত্যন্ত দরকার।

কন্যা খুসী হয়ে সজ্জনের মুখের দিকে তাকাল। সজ্জনের সঙ্গে তার মানসিক যোগাযোগ অতি নিকটের হয়ে গিয়েছে। তার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণের সামনে চিরন্তন চাওয়া-পাওয়ার যেন যবনিকা উঠে গেছে। হঠাৎ সে নিজেকে বড় দুর্বল মনে করল। কন্যার হাবেভাবে তার হৃদয়ের কথা বুঝে নিয়ে সজ্জন মনে মনে আনন্দিত হল, কন্যার আকর্ষণে আছে প্রেমের অনুভূতি, সে তার জীবনের চলার পথের সত্যিকারের পাথেয়। কন্যার সামনে তাকে বার বার নিজের মনকে বশে রাখতে হচ্ছে। প্রসঙ্গ পালটাবার জন্য বললে— আপনার লেখাটা সত্যি খুব ভালো হয়েছে। এটা পড়ে জনসাধারণ নিশ্চয় প্রভাবিত হবে।

কন্যা বিষণ্ণভাবে মাথা নীচু করে বললে— কিছুই ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আপনাকে আমার মনের গোপন কথা বলব? যতদিন পর্যন্ত এই অত্যাচারর রহস্যোদ্‌ঘাটন হয়নি আমি সমানে ছটফট করেছি। আপনি কল্পনাই করতে পারেন না যে সেদিন লেখা নিয়ে এখানে আসার আগে, আমার মনের ওপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে গিয়েছিল। আপনার আর কর্নেল সায়েবের সান্ত্বনায় আমি যেন হারানো মনোবল ফিরে পেয়েছিলুম। অন্যায়ের সঙ্গে যুঝে যাবার ক্ষমতা পেয়ে আমার মনে হল— আমি প্রতিকার করতে পারব। এখন ভাবছি এর পর কি? পুস্তিকা পড়ার পর দু' চারদিন রসিয়ে রসিয়ে সকলে চর্চা করে তারপর সবই ভুলে যাবে— কারুর হয়তো এ কথা ভুলেও মনে আসবে না যে সত্যি একটি মেয়ে এমনভাবে প্রাণ দিয়েছিল। সময়ের চক্রযানে কত নাম-না-জানা পাপের মাংসপিণ্ড এইভাবে পিষে মরবে।

নিজের প্রিয়া— হ্যাঁ প্রিয়াই তো— তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সজ্জন উত্তেজিত ভাবে বুক ঠুকে বললে— না, না, আমরা শেষবিন্দু পর্যন্ত অন্যায়কে সমূলে শেষ করার জন্য যুদ্ধ করে যাব।

কন্যা ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে— কিন্তু এসব হবে কেমন করে? আমাদের বেশীর ভাগ রাজনৈতিক দল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্ধের মত ছুটে চলেছে…।

—ছুটতে দিন— ছুটতে দিন, জনসাধারণ নিজের থেকেই তাদের হুট আউট করে দেবে।

—হুট আউট করে সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায় না। সামাজিক চেতনায় আমূল পরিবর্তন দরকার, তা না হলে এ অন্যায় চলতেই থাকবে। রাজনীতিকে উঠতে বসতে আমরা যতই

গালাগালি করে থাকি-না কেন, আমাদের সমাজের স্টিয়ারিং হুইল রাজনীতির হাতে এটা ভুলে গেলে চলবে না।

—আমি মানতে রাজী নই, সভ্যতা—

—হাঁ, সভ্যতা পেট্রোলের মতই জরুরি; পেট্রোল না থাকলে গাড়িই অচল। কিন্তু তাই বলে কি আপনি স্টিয়ারিং হুইলের কম মূল্য দেবেন? যতদিন-না সমাজ এতটা সংস্কৃত ও সভ্যভব্য হয়ে উঠছে যে সেক্রেটারিয়েট, পুলিশ বা মন্ত্রীদের ওপর নির্ভর না করেই অনায়াসে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে, ততদিন রাজনীতির এতটাই মূল্য থাকবেই। অন্ততঃপক্ষে একশো বছর তো দুনিয়ার এই হাল থাকবেই।

কন্যা চুপ করে গেল। সজ্জনও গভীর চিন্তায় তন্ময়। মনের এ গভীর চিন্তাটা আরও একটু প্রকাশ না করে থাকতে পারল না কন্যা, বলল—যে কোন দলের হোক-না কেন আমাদের রাজনৈতিক নেতারা নতুন এই সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতেই পারে না। আমাদের দেশের নেতাদের মাথায়ই ঢোকে না যে, সাংস্কৃতিক বিকাশ না ঘটলে পলিটিক্সে স্পিরিচুয়াল ফোর্স আসতেই পারে না। আর এটা না এলে পলিটিক্স চিরকালই পাওয়ার পলিটিক্স হয়ে থাকবে।

—আপনি তাহলে আধ্যাত্মিক ফোর্সে বিশ্বাস করেন? আমি ভাবতুম কম্যুনিস্টরা ওসব মানে না।

কন্যা হেসে ফেলল— কম্যুনিস্টরা না মানুক কিন্তু সাধারণ মানুষ তো মানে? আর তাছাড়া কম্যুনিস্টরাও মানে। কারণ প্রত্যেকের জানার ও মেনে নেবার রীতিটা তার নিজস্ব জিনিস। সত্যি বলছি, আত্মা, আধ্যাত্মিক শক্তি এসব কথার মানে ঠিক ঠিক না

বুঝলেও মনের ভাব প্রকাশ করার সময় আপনা হতেই জিভের ডগায় এসে যায়।

সজ্জন কন্যার দিকে কটাক্ষ করে গলার স্বরকে যথাসাধ্য মোলায়েম করে বললে— হ্যাঁ, নিজের বিষয় আমি ঠিক এই কথাই বলতে পারি— আমার স্পিরিট, আত্মা, ভগবান— যা-কিছু সব এক জংলী মেয়ে···।

বনকন্যার চোখে অনুরাগ মাখানো এক ঝিলিক নিমেষে খেলে গেল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে গম্ভীরভাবে সে মাথা নীচু করে মেঝের দিকে তাকাল।

দরজার বাইরে কর্নেল আর মহিপালের গলার আওয়াজ ভেসে এল। কর্নেল বলছিল— আরে বাবুমশাই— কাল সারা শহরে এর প্রভাব দেখে নিয়ো।

দুজনে ঘরে ঢুকতেই বনকন্যা নমস্কার করে উঠে দাঁড়াল। মহিপাল গম্ভীর চালে ওকে দেখল। কর্নেল আপনজনের মত তার দিকে তাকিয়ে সহজ হাসি হাসল।

—বলুন, আজকের তামাশা কেমন লাগল? কর্নেল কন্যাকে জিজ্ঞেস করল।

কন্যা উত্তর দেবার আগেই সজ্জন মহিপালের দিকে চেয়ে বললে— ভাই, কোন ভালো উকিলের সন্ধান দিতে পারো?

মহিপালের উত্তরের অপেক্ষা না করে উৎসাহের সঙ্গে কর্নেল দুজনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে— উকিল? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখুনি ফোন করব? কেন দরকার আছে কিছু?

—হ্যাঁ, তোমার ওপর 'চারশো-বিশির' মোকদ্দমা দায়ের করব ভাবছি। সজ্জন মুখটাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে বললে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়, দাও ঠুকে ব্যাটাচ্ছেলেকে। জিভ কেটে লজ্জিত হয়ে মহিপাল কন্যার দিকে চেয়ে বললে— মাপ করবেন, মুখ ফসকে শব্দটা বেরিয়ে গেল।

কন্যা মুচকি হাসল। সজ্জন টেবিল থেকে ছোট্ট পুস্তিকাটি হাতে নিয়ে বললে— এই দেখো, স্টেটমেণ্টের কোন মাথামুণ্ডু আছে? আমাদের নাম ছাপিয়ে বসে আছে। সজ্জনের কথা শুনে কর্নেল অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

মহিপাল বিজ্ঞের মত বললে— সারা রাস্তা আমি বকতে বকতে এসেছি। একেবারে— তার সঙ্গে আমার নামটা···

—ভাষা দেখবেন না, অর্থ ভেবে দেখুন। ভাষার ভুল বড় বড় সাহিত্যিকেরাও করে থাকেন, ইনি সারা শহরে নতুন চেতনার সঞ্চার করে দিয়েছেন— সকলে চমকে উঠেছে, এটা কম প্রাপ্তি মনে করেন?

কর্নেল আনন্দে আটখানা হয়ে হো হো করে চেঁচিয়ে উঠল— বাস, বাস, বাস, দীর্ঘজীবী হউন, আমার তরফ থেকে বুদ্ধিজীবীদের যা হিট করেছেন, এরা গাছের আম গোনে না খালি পাতাই দেখে বেড়ায়। সব বড় বড় আর্টিস্ট নাম করা···

—যাক্ আপনার সম্মানে আজ একে ছেড়ে দেওয়া গেল··· আপনি বেশ ভালো লেখেন কিন্তু। মহিপাল কন্যার খোশামুদি করার ভঙ্গিতে বললে। কন্যা বিনয়ে মাথা নীচু করে উত্তর দিলে —অনেক ভুল আছে নিশ্চয়, ছাপাবার আগে একবার আপনাকে দেখিয়ে নেব ভেবেছিলুম কিন্তু হয়ে উঠল না।

সজ্জন তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল— হ্যাঁ, আমার মতে লেখা বেশ হয়েছে কিন্তু এর মাথায় ভূত চেপেছে যে কারুকে আগে দেখিয়ে মতামতটা জেনে নিলে ভালো হত।

—বাবুজী এটা পলিসির ব্যাপার। ইলেক্‌শনে পুস্তিকার তত মূল্য নেই। আমাদের কোন্ পুস্তিকাটা বেরোবে কেউ যেন না জানতে পারে। পাবলিকের ওপর এটার কিন্তু ভয়ানক একটা প্রভাব পড়বে। কর্নেল বলে উঠল।

—প্রভাব না ছাই।

—কাল দেখে নিয়ো।

—না, প্রভাব নিশ্চয় হবে, কন্যার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সজ্জন মুচকি হেসে বললে— এখুনি তুমি বলছিলে যে কিস্‌সু হবে না?

কন্যা লজ্জা পেয়ে সজ্জনের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বললে— যান, 'উল্টা বুঝিলি রাম' আপনার সেই অবস্থা— আমি বলছিলাম যে কর্নেল দাদার খরচটাই জলে না যায়।

—ঠিক কথা, সমাজে পরিবর্তন আনতে হলে, বদলাতে হবে তার রূঢ় আস্থাকে। এরজন্যে চাই ব্যাপক সংগঠন আর আন্দোলন। মহিপাল তার মতামত প্রকাশ করলে।

খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক কথার পর সকলেই যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল— দরজা পর্যন্ত কর্নেল আর মহিপালকে ছাড়তে এসে সজ্জন জিজ্ঞেস করলে— কত খরচ পড়ল কর্নেল?

—কেন, তুমি পেমেণ্ট করবে নাকি?

—হ্যাঁ।

কর্নেল মহিপালের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললে— শুনলে নবাব-পুত্তুরের কথা? (সজ্জনকে) মশাই এখন সবে কলির সন্ধে, এরপর আপনার প্রিয়াকে হাজার দু'হাজারের উপহার দিতে হবে, তখন? বিল কেটে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব?

—হ্যাঁ ভাই, যা বলেছ। আমারও মনে হচ্ছে যে এ বিয়ে না হয়ে যায় না, বেশ মেয়েটি না?

বন্ধুদের হাসি-ঠাট্টা তার মন্দ লাগছিল না, সে হেসে বললে—তোমাদের মাথার ঘিলুতে নানারকম পোকামাকড়ের উপদ্রব হচ্ছে—আমি বেচারিকে একটু সাহায্য···

—হ্যাঁ, তুমি একেবারে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। কর্নেল হেসে বললে। মেয়েটি সত্যিই পছন্দ করার মত। কম্যুনিস্টদের মত খটখটে নয়, চোখে বেশ লজ্জাভাব আছে।

ছুজনকে বিদায় দিয়ে সজ্জন কন্যাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গেল। দশটাকা মাসে ভাড়া দিয়ে একটি ছোট্ট কুটির নিয়ে কন্যা থাকছিল। গাড়ি থেকে নামার সময় কন্যার হাতে বড় খাম ধরিয়ে দেবার জন্য সজ্জন বললে— এটা রেখে দাও।

—এটা কি?

—রেখে দাও না।

—টাকা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাজে লাগবে।

—না।

—দেখো, আমি বেঁচে থাকতে তুমি কষ্ট পাবে এ আমি সহ্য করতে পারব না।

—আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।

—তোমার কাছে হাত খরচের টাকা আছে?

কন্যা চুপ করে রইল।

—তবে? এটা রেখে দাও। কোন আজেবাজে কথা মনে এনো না কিন্তু।

—না, নমস্কার, কন্যা ধীরে ধীরে কুটিরের দিকে পা বাড়াল।

সজ্জনের জীবনে আজ প্রথম পরাজয়। বৈভবের ভস্মস্তূপে আজ সে সোনার কণা খুঁজে পেয়েছে, আজকের অভিজ্ঞতা তার জীবনে শাশ্বত সম্পদ হয়ে থাকবে।

চৌদ্দ

বন্ধ ঘরে বেড়ালের তিনটে ছানার চোখ ফুটতেই তারা জেঠীর খাটিয়াতে চড়ে উৎপাত আরম্ভ করে দিয়েছে। একদণ্ড তারা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে জানে না। তাদের চিন্তায় জেঠীর মন-মেজাজ সদাই খিঁচিয়ে থাকে। হুলো বেড়ালের ভয়ে নালীর জল বেরুবার মুখে পাথর চাপা দেওয়া, সিঁড়ির দরজার শেকল সব সময় বন্ধ। বেড়ালছানাদের মাকে পর্যন্ত জেঠী দুচক্ষে দেখতে পারেন না। অনেক কষ্টে যদিও বা মায়ের ভাগ্যে তার বাচ্চাদের দুধ খাওয়াবার সুযোগ হয়, কিন্তু জেঠীর নজরে পড়লে আর রক্ষে নেই, তাঁর ঠেঙানি খেয়ে মিউ মিউ করে তাকে পালাতে হয়।

অন্ধকার ঘরে বেড়াল ওপরের তাক থেকে এক লাফ মেরে সোজা কলসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মাকে দেখতে পেয়েই খাটিয়ায় বসা তিন বেড়ালছানা মিলে মনের আনন্দে মিউ মিউ করে উঠল। বেড়াল জেঠীর খাটে আরাম করে শুয়ে বাচ্চাদের

চুকচুক করে দুধ খাওয়াচ্ছে। একজন বাচ্চা মায়ের পিঠে চড়ে দুধ খাবার চেষ্টায় ধীরে ধীরে সরে আসতে গিয়ে ল্যাদব্যাদ করে খাটিয়ার নীচে এসে পড়ল। তিনজন বাচ্চাকে একসঙ্গে কাছে পেয়ে বেড়াল আনন্দে ল্যাজ নাড়ছে।

জেঠী বাজার থেকে তাদের জন্য মাটির ভাঁড়ে দুধ নিয়ে আসছেন। পরভু তাড়াতাড়ি গালে পান টিপে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে, একেবারে খলীফা তমোলীর রক থেকে এক লাফে জেঠীর মুখের গোড়ায় এসে, তাঁর লাঠি ধরে বসে পড়ল। হঠাৎ আক্রমণের টাল সামলাতে না পারায় জেঠীর ভাঁড় থেকে একটু দুধ ছলকে মাটিতে পড়ে গেল।

পরভু বললে— জেঠী শুনছ? গঙ্গার মুখো পা হয়ে রয়েছে তোমার, দুধটুধ বাচ্চারাই খায়। ভাঁড় এদিকে দিয়ে যাও, ওই দেখো দুধ ছলকে গেছে।

জেঠী রাগে ফোঁস করে উঠলেন। পরভু আবার খোঁচা মেরে বললে— রাগ দেখালে তোমারই ক্ষতি, আমার কি? যেটুকু দুধ আছে তাও পড়ে যাবে।

জেঠী আজ ভীষণ মুশকিলে পড়ে গিয়েছেন। জীবনে প্রথমবার সম্মুখ রণক্ষেত্রে পরাজয় স্বীকার করে চুক্তি করতে বাধ্য হলেন, নাকমুখ সিঁটকে বিরক্তিভরা স্বরে বললেন— ছাড়, ছাড় বলছি, পোড়ারমুখো বাচ্চাগুলো ক্ষিদেয় বসে আছে হয়তো।

—আরে— বাবাঃ আমিই তো তোমার একমাত্র পুষ্যিপুত্র, এ আবার চোরের উপর বাটপাড়ি করতে কে শালা এসে জুটেছে? যাক গে দেখা যাবে— যদি কেউ সাহস করে অনধিকার চেষ্টা করেও থাকে তাহলে তার সঙ্গে বোঝাপড়া না করে ছাড়ছি না।

তুমি চোখ বুজলেই যা-কিছু সম্পত্তি আছে সব আমার, বুঝেছ? গলির দুধারের দোকানীরা সকলেই মজা পেয়ে হাসছে। আশে-পাশের অহেতুক বত্রিশ পাটি দাঁতের সারি দেখতে দেখতে জেঠীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত রাগে থর থর করে কেঁপে উঠছে, কিন্তু দুধ পড়ে যাবার ভয়ে তিনি কোনমতে নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করছেন। তাঁর মুখের তুবড়ি ছোটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ঠাস করে হাতের লাঠি ছেড়ে দিয়ে জেঠী এগিয়ে গেলেন। পরভু স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে জেঠী রাগে দিশেহারা হয়ে লাঠি ছেড়েই চলে যাবেন। লাঠি ঠক করে মাটিতে গিয়ে পড়ল। পরভুর হাতের কব্জিতে ঝাঁকুনি লাগল, উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বললে— আচ্ছা, আচ্ছা— রাগ করছ কেন? লাঠি নিয়ে যাও— ও জেঠী!

জেঠী ততক্ষণে বেশ ক'পা এগিয়ে গিয়েছিলেন, থমকে দাঁড়িয়ে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বললেন— বাড়ি এসে দিয়ে যাবি বুঝেছিস? তা না হলে কাল ভোরে আর দেখতে হবে না— তোর বংশে সাঁঝের পিদ্দিম দিতে কেউ থাকবে না।

ভয়ে পরভুর বুক দুরু দুরু করে উঠল। মুহূর্তে হাসিঠাট্টা সব কর্পূরের মতই উবে গেল। সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দেঁতো হাসি হেসে বললে— তুমি কাল আমার বংশে আগুন লাগাবে আমিই আজ সব চুকিয়ে দেব। এই পড়ে রইল তোমার লাঠি, ইচ্ছে হয় উঠিয়ে নাও। আমার বয়ে গেছে তোমার বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসতে।

জেঠী মহাবীর মন্দিরের রকের পাশ দিয়ে তাঁর বাড়ির ফটকে যাবার জন্য মোড় ঘোরবার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারের মধ্যে জটলা

আরম্ভ হয়ে গেল। সকলেই এ বিষয়ে একমত যে জেঠীর পেছনে লাগা মানেই মৌচাকে ঢিল মারা। পরভু মশাই বেঁকে বসেছেন দেখে ধর্মভীরু এক স্যাকরা তার ছেলের হাতে লাঠি দিয়ে জেঠীর বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

তড়বড় করতে করতে যেই জেঠী বাড়িতে পা দিলেন ওমনি দুই বেড়ালছানা লাফ মেরে খাটিয়ার তলায় আশ্রয় নিল। তৃতীয় ছানাটি পেটভরে দুধ খেয়ে কোন সময়ে আমেজে চোখ বুজতে গিয়ে ব্যালেন্স হারিয়ে খাটিয়ার নীচে পড়েছিল, জেঠীকে বারান্দায় পা দিতে দেখেই সে কুঁই কুঁই করতে করতে একদিকে ছুটে পালাল। খাটিয়াতে দুই ছানায় যুযুৎসু প্যাঁচ খেলতে খেলতে লদরবদর করে তৃতীয় ভাইয়ের সন্ধানে লাফ দিয়ে নীচে এসে দৌড় দিল। এ সময়ে নিয়ম মত তারা দুধ খেতে পায় এ জ্ঞানটা তাদের বেশ টনটনে আছে। তাদের মধ্যে হাড়গিলে বাচ্চাটি এক জায়গায় বসে টুকুর টুকুর দেখছে, বাকী দুজন সারা ঘর আর বারান্দাকে প্লেগ্রাউণ্ড ভেবে ম্যাচ খেলা আরম্ভ করে দিয়েছে।

ম্যাচ খেলে একটু চাঙ্গা হয়ে নিয়ে দুজনে জেঠীর পা চেটে চেটে তাঁর হাঁটাই মুশকিল করে তুলেছে। ভাঁড় থেকে মেঝেতে একটু দুধ ফেলে দিয়ে কোনমতে পা বাঁচাতে বাঁচাতে জেঠী দালানে উঠলেন। বারান্দার থামের কাছে রাখা অ্যালুমিনিয়মের প্লেটে দুধ ঢেলে দিয়ে তিনজনকে উঠিয়ে দুধের কাছে রেখে এলেন।

ইতিমধ্যে দরজার শেকল নাড়ার শব্দ হল। মানুষের গন্ধ পেয়ে জেঠীর মন-মেজাজ আবার বিগড়ে গেল।

—জেঠী, ও জেঠী, তোমার লাঠি নিয়ে নাও— আওয়াজ শুনে

গালাগাল দিতে দিতে জেঠী দরজার দিকে ধম ধম করে পা ফেলতে ফেলতে চললেন। সেদিন রাত নটা পর্যন্ত বাজার সরগরম রইল। চারিদিকে গুজব রটে গেল যে পরভুর বদলে ভুল করে পরশোত্তম স্যাকরার ছেলের ওপর জেঠী মন্ত্রপড়া তিল ছিটিয়ে দিয়েছেন। তার অবস্থা খারাপ, ওঝা, ডাক্তার দুই এসেছে। ভভুতি স্যাকরা সারা দিনের বেচাকেনার হিসেব নিকেশ বাক্সে ভরে চাকরের মাথায় চাপিয়ে সঙ্গে চৌকিদার নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। গলির মোড়েই তাঁর কানেও এ খবর পৌঁছুল। পরশোত্তমের দোকানের সামনে তার ছোট ভাইয়ের কাছে থেমে খবরাখবর জিজ্ঞেস করলেন। সকলেই জেঠীর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছে। ভভুতি বললেন— একটু বাড়ি হয়ে এখুনি এলুম বলে।

ভভুতির বাড়িতে এ সময় নন্দ আর বড় বউ ছাড়া কেউ নেই। শঙ্কর নিজের বউকে নিয়ে সেকেণ্ড শো সিনেমা দেখতে গেছে। নন্দর আম্মা তার আদরের নাড়ুগোপাল নাতিকে নিয়ে আজ ছ দিন হল, ভগ্নিপতির শ্রাদ্ধে কাঁসগঞ্জ গেছেন। মনিয়া কাল জিনিসপত্তর কিনতে কলকাতায় গেছে।

মনিয়ার হাতে মারধোর খেয়ে চুরির রহস্য ফাঁস হওয়ার দিন থেকে নন্দ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙাতে পারেনি। জেঠীর বাড়ি তার আনাগোনাও মনিয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। প্রথম দু'দিন সে মুখ থুবড়ে একাই বন্ধ ঘরে পড়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে সংসারের কাজেকর্মে মন বসাল। তাকে দেখলেই আম্মার মুখ তেলা হাঁড়ি হয়ে যেত। হতাশ হয়ে শেষকালে সে একটি ফন্দি খুঁজে পেল। মনিয়ার ছেলেকে সে আপ্রাণ ভালোবাসতে লাগল। বাৎসল্য-প্রেমের মরানদীতে আবার জোয়ার দেখা দিল। মনিয়ার নাইবার

খাবার সময় সে ইচ্ছে করে কাপড়-চোপড় নিয়ে কলে কাচতে বসে যেত। ইতিমধ্যে ভগ্নিপতির মৃত্যুর খবর পেতেই আম্মা কাঁসগঞ্জে চলে গেলেন। তাঁর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নন্দর চক্ষুলজ্জা ধীরে ধীরে কমে গেল, বউদিদের সঙ্গে সংসারের কাজে সাহায্য করতে লাগল। ছোট বউ সকালে দেরীতে উঠে চা-জলখাবারের পাট চুকিয়ে হাইস্কুল পরীক্ষার পড়া নিয়ে বসে, স্বামীর দেওয়া হোমওয়ার্ক শেষ করে পড়শী তারার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করতেই দিন কাবার হয়ে যায়। সংসারের কাজে সে বড় একটা হাত দেয় না। শাশুড়ী যেতেই মনিয়ার রাজত্বে ঘর-সংসারের ভার একেবারে হুড়মুড় করে একা বড়র মাথায় এসে পড়েছে তাই নন্দ এসে সাহায্য করায় ওর সঙ্গে বড়র বেশ জমে উঠেছে। বড় বউ আজকাল তার কোলের মেয়ের সোয়েটারের ঘর তুলে নতুন নমুনা শিখছে।

ভভুতি দরজার কড়া নেড়ে হাঁক দিলে— দরজা খোল। ঘরের ভেতরে নন্দ আর বড় খাটেতে পাশাপাশি শুয়ে খোশগল্পে মেতে আছে, একপাশে ছোট দোলনায় কোলের মেয়েটি দোল খাচ্ছে। রেডিওতে সিনেমার গান বাজছে।

অকেলে মে বো ঘবরাতে তো হোঙ্গে
মিটাকর মুঝকো তো পছতাতে হোঙ্গে
হমারী এয়াদ আ যাতী তো হোগী।

ভভুতি বাড়ি ঢুকেই তাড়াতাড়ি আগে বাক্সর তালা বন্ধ করল, তারপর খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে মেয়েকে ভেতর থেকে শেকল বন্ধ করার হুকুম দিয়ে, পরশোত্তম স্যাকরার ছেলের খবরাখবর জানবার জন্য বেরিয়ে গেলেন। ননদে ভাজে আবার নিশ্চিন্ত

মনে তেতলায় বড় ঘরে আড্ডা মারতে গেল। আড্ডায় নন্দর মন বসছে না, কেননা তার নোলা সপ্ সপ্ করছে মিষ্টির জন্যে। বড়র বারণ না মেনে সে নিজের গ্যাঁটের পয়সা বার করে বাইরে গলিতে বেরিয়ে গেল। সামনে বারান্দায় পাড়ার চৌকিদার দিব্যি বিছানা পেতে বসেছিল তাকে খোশামোদ করে আধসের মিষ্টি-নোন্তা মিলিয়ে আর আধ সেরটাক দুধ আনতে পাঠাল। কোলের মেয়ে একা ওপরে আছে ভেবে বড় তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে আবার ওপরে উঠে গেল। নন্দ সেখানেই চৌকিদারের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

বড় বউ একলা ভয় পায় তাই কাল থেকে ননদে ভাজে একসঙ্গেই শুচ্ছে। আম্মা যেতেই নন্দ তার সঙ্গিনী হিসেবে বড়কে খুঁজে পেয়েছে। পরস্পর স্নেহের রঙীন চশমায় সে যেন বড়কে নতুন রূপে দেখছে।

রোজগেরে বড় ভাইকে নন্দ কিছুতেই নারাজ করতে চায় না, মনিয়ার মন নরম, একটু খোশামোদেই গলে যায়। বিয়ের পর মনিয়া নতুন বউয়ের ভালোবাসায় হাবুডুবু খেত আর নন্দ কথার মারপ্যাঁচে বড়র মনের গোপন কপাট খোলার চেষ্টা করত। কিছুদিন পরে মনিয়ার জীবনের নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল। নানা ফন্দিফিকির করে নন্দ বন্ধু সন্তোষ বউয়ের সঙ্গে মনিয়ার গোপন মেলামেশার সুযোগ করে দিয়ে ক্রূর হাসি হাসল। সেদিন থেকে বড়র সঙ্গে তার শত্রুতা, লাগানি-ভাঙানি করে বড়র জীবন সে বিষময় করে তুলল। এরমধ্যে নাটকীয় সংঘাতের মতই একদিন মনিয়া আবার স্ত্রীর আঁচলের তলায় আপনা হতেই ধরা দিল। সেদিন থেকে ভাইবোনের মনকষাকষি আরম্ভ হল। হোঁচট খেয়ে মনিয়া

সাবধান হয়ে গেল, তাই সে বোনের দালালি করার প্রবৃত্তিকে দমন করার চেষ্টা করছে। বোন ভাইকে তোয়াক্কাই করে না, কেননা সে বাবার আদুরে মেয়ে। ভাই বোনে দুজনেই দুজনের গোপন কাহিনী জানে কিন্তু মুখে আনার সাহস নেই। এতদিন অপরাধের ভার দু দিকেই সমান চলছিল, কিন্তু ইদানীং নন্দর দাঁড়িপাল্লা ভারী দেখে মনিয়ার পোয়া বারো হল। সেদিন চুরির অজুহাতে নন্দর ঘর খানাতল্লাসী করতে গিয়ে তাকে একা পেয়ে সে বেশ ধমক দিয়েছে। নন্দের বাক্সে অশ্লীল ছবির গোছা বেরুতেই মনিয়া হিংস্র পশুর মত আস্ফালন করে বললে— এখুনি তোমার মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিতে পারি তা জানো? তুমি যদি আমার বিষয় কিছু বলতেও যাও, লবডঙ্কা, কেউ বিশ্বাস করবে না। কানে সরষের তেল দিয়ে ভালো করে শুনে রাখো যে আমার সঙ্গে শত্রুতা করে এ বাড়িতে থাকা অসম্ভব, চুলের মুঠি ধরে বিদেয় করে দেব। এ ভেবো না যে বাবা তোমাকে বাঁচাতে আসবে।

নন্দর গোপন রহস্যের দড়ি কঞ্চি মনিয়ার হাতে আসতেই সে ভাইয়ের অনুগত হয়ে গেল। নিজের পক্ষকে মজবুত করার জন্য বড়র সঙ্গে ওঠাবসা বাড়িয়ে দিল। মেসোর প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হবার সঙ্গেই নন্দর দুষ্ট গ্রহ কেটে গেল, আম্মার অনুপস্থিতিতে মনিয়াকে সন্তুষ্ট করার সুযোগ আপনা হতেই তার হাতে এসে গেল।

আজকাল ননদে ভাজে গলায় গলায় ভাব। সকালে উঠে বড়কে বলতে শোনা যায়— যে যাই বলুক আমাদের ননদিনী রায়বাঘিনী বটে কিন্তু লোক খারাপ নয়। ভালো সোসাইটিতে মিললে মিশলেই শুধরে যাবে।

মিষ্টি নোস্তা আর দুধের ঘটি নিয়ে নন্দ তর তর করে ওপরে উঠে গেল। বড় একা ঘরে ক্ষণিক স্বাধীনতার হাওয়া গায়ে লাগিয়ে আপন মনে গুন গুন করে বিরহেশের লেখা গানের লাইন গাইছে— 'সির সে কফন লপেটে নিকলে হৈঁ পেয়ার করেঁ'।

ননদ-ভাজে রসিয়ে রসিয়ে নানা গল্প জুড়ে দিল। নন্দর পাকা ঘুঁটির সামনে বড়র চাল কাঁচা হয়ে যাচ্ছে। ভূত আর বর্তমানের কাহিনী শুনে বড়র মন বিচলিত হয়ে গেল, সে হড়বড় করে তার মনের সব গোপন কথা নন্দর সামনে খুলে ধরল।

আম্মা প্রায়ই নন্দর বিষয় কথা হলেই বলে থাকেন— নন্দর পেট থেকে কথা বার করার সাধ্যি কার আছে? কাঁসগঞ্জ যাবার পূর্বে দুই বউকে ননদের দিক থেকে সতর্ক থাকার উপদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। ছোট বউ বেশ চালাক চতুর কিন্তু বড় একটু বোকা বোকা, তাকে সহজেই ভুলিয়ে ভালিয়ে কথাচ্ছলে হাত করা যায়।

অলিফ লয়লার প্রেম-কাহিনী থেকে আরম্ভ করে সাত সমুদ্র তেরো নদীপারের ভালোবাসার গল্প ঝেঁটিয়ে রসিয়ে রসিয়ে নন্দ বড়কে শোনাচ্ছে। কনুইয়ে ভর দিয়ে পেটের ওপর বালিশ রেখে বড় তন্ময় হয়ে তার মুখের প্রত্যেকটি কথা যেন গিলছে। প্রেমে অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেবার জন্য সগর্বে নন্দ বলল— আমি কুটনির কাজও করে থাকি, জানো? কেন করব না, এই ব্যাটাচ্ছেলে পুরুষেরা যদি করতে পারে তা আমরা কিসে কম? যাকে ভগবান রূপ দিয়েছে সে গয়না পরবে না কেন? পুরুষ জাতকে বিশ্বাস নেই, তাই মেয়েদের উচিত সব সময় পা থেকে

মাথা পর্যন্ত নিজেকে সোনায় মুড়ে রাখা। নিজের সঞ্চিত ধনের জন্য এমন গুপ্ত জায়গার সন্ধান করা উচিত, যেখানে রাখলে কাক-পক্ষীতেও টের না পায়। কথার পিঠে কথা হতে হতে ফস করে নন্দ বড়কে চিমটি কেটে বলল— আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন? কারুর সঙ্গে মনের মিল হলে টপ করে আমাকে জানিয়ে দিয়ো— ব্যস, তারপর দেখো কেমন ভেলকি বাজি খেলে সব ঠিক করে দেব।

নন্দর আশকারা পেয়ে বড় ধীরে ধীরে তাকে বিরহেশ-প্রেমোপাখ্যান শুনিয়ে ফেললে। নন্দর হাতে বড়র নাড়ি ধরা পড়ে গেল। সেই সময় ওপরে কারুর পায়ের ধম ধম শব্দে ছাত কেঁপে উঠল। ভয়ে দুজনের বুক থরথর করে উঠল, শুকনো গলায় কোনমতে ঢোঁক গিলে নন্দ কাঁই কাঁই করে ডাক দিল— শঙ্কর, ও শঙ্কর! পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে জেঠীর ছাদে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

জেঠী নিজের লেপের মধ্যে বেড়ালছানাদের নিয়ে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। বেড়ালছানাদের চোটে সারাদিন একদণ্ড বিশ্রাম করতে পান না। বালতি বালতি জল দিয়ে হাগামুত পরিষ্কার করতে করতেই দিন কাবার। পুজো করতে বসেও জেঠীর শান্তি নেই, রাত্তিরেও কোলের মধ্যে কুঁই কুঁই করতে থাকে। তাঁর লেপের ভেতরে রীতিমত কুরুক্ষেত্র বেধে যায়। জেঠীর শীতে ভাঁজ করা শরীরকে রণক্ষেত্র ভেবে নিয়ে বাচ্চারা যুদ্ধে মেতে ওঠে।

আজ জেঠী নিবিষ্ট মনে একটি বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে যেন তার চোখে দর্শন পেলেন তাঁর সাক্ষাৎ নাড়ু গোপালের। ভক্তিরসে বিভোর হয়ে, চোখ বন্ধ করে তাকে

জড়িয়ে লেপের মধ্যে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আজ প্রথম দিন তাঁর চোখের পাতায় ঘুম নেমেছে।

হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই জেঠী দেখলেন যে তাঁর মুখে কাপড় ঠাসা। মুখে কাপড় জড়িয়ে জল্লাদের মত দুটো লোক তাঁর খাটিয়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তারা লেপ সরিয়ে একদিকে ফেলে দিয়ে, মায়াদয়াহীন হয়ে ছোটছোট বেড়ালছানাদের ঘাড় ধরে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আলনায় টাঙানো গায়ের কাপড় দিয়ে জেঠীকে ভালোভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিল, কেবল নিশ্বাস নেবার জন্য মুখটাই খোলা রইল।

জেঠীর চোখের সামনে তাঁর গেরস্থালীর এক-একটি জিনিস উঠিয়ে তারা ফুটবলের মত কিক্ মেরে ছত্রাকার করে দিল। টোটকার বাক্স হাতের কাছে পেতেই, তারা সিঁদুরের পুড়িয়া ঘি দিয়ে গুলে জেঠীর চুলে নাকে মুখে বেশ করে মাখিয়ে, তার ওপর কারিগরী করে কাজলের আঁচড় কেটে নাক চোখ এঁকে দিলে। তারপর জেঠীর টাকার থলি নিয়ে তারা তাঁর চোখের সামনে উধাও হয়ে গেল। খালি বাক্সে পড়ে রইল কিছু তিল আর ধান।

বেড়ালছানারা খাটিয়ার কাছে বসে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে কুঁই কুঁই করছে।

পনেরো

বনকন্যার সঙ্গে সজ্জনের আলাপ মৌখিক পরিচয়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। মেয়েদের সঙ্গে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক সজ্জনের জীবনে এই প্রথম নয়, কিন্তু এ যেন নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন অনুভূতির মায়াজালে জড়ানো।

আজ পর্যন্ত যে কয়েকজন মেয়ের সম্পর্কে সে এসেছে তারা সকলেই এক এক করে তার স্মৃতির অতলে হারিয়ে গেছে, কিন্তু এ নতুন সম্পর্ক তেমন ঠুনকো নয়। কন্যার আকর্ষণ তার জীবনের নতুন অধ্যায়ের সাদা পাতায় লেখা ছন্দে সাজানো ফুলের মত। প্রথম দিনের আলাপ থেকেই যেন কন্যা তাকে প্রতি পদে চ্যালেঞ্জ দিয়ে চলেছে। বন্ধুবান্ধব সকলেই চোখমুখে ইঙ্গিত করে প্রায়ই হাসিঠাট্টা করে থাকে। প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণের শেষ পরিণতি বিয়ে-থা করে গেরস্থ হওয়া, এ কথা সবার মত সেও বেশ ভালো-ভাবেই বোঝে, সেজন্যই বুঝি তার স্বপ্নজড়িত চোখে ভবিষ্যতের রাঙা কল্পনা উঁকিঝুঁকি মারছে। সাতপাকের বন্ধনের বিষয় সে কোনদিনই জোর গলায় প্রতিবাদ জানাতে পারেনি। দিনরাত একই সমস্যা বিভিন্ন রূপ ধরে তার সামনে প্রশ্নচিহ্নের মত এসে দাঁড়িয়েছে। পরস্পরের প্রতি এই আকর্ষণের পরিণতির বিষয় কি কন্যাও তার মত ভাবছে? সে কেবল তাকে দিয়ে নিজের হিসেবের খাতায় লাভের অঙ্কটাই বাড়াতে চাইছে না তো?

আঁচলের মোহে ফেঁসে সে ভুল পথে পা বাড়াচ্ছে না তো? নানা আশঙ্কায় তার মন থেকে থেকে বিচলিত হয়ে উঠছে।

কর্নেল বুদ্ধি খাটিয়ে কন্যার রচনাকে আজ প্রসিদ্ধির চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। কাল সকালে দেশের দৈনিক খবরের কাগজে ছাপার পর বিশেষ আলোচনা এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। শহরের দৈনিক কাগজে নতুন বছরের প্রমুখ ঘটনা হিসেবে তার রচনার উল্লেখ করা হয়েছে। বনকন্যা দেখেছে সারা শহরে 'তার নামের জয়জয়কার। সকালে ঘুম থেকে উঠেই চেনা-পরিচিতের দল উৎসাহের সঙ্গে তাকে সকাল সকাল এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেছে। কাগজের রিপোর্টারেরা এসে তার সাক্ষাৎকার লিখে, তার ছবিও তুলেছে। নিজের চারিদিকের বাতাবরণ দেখে বন-কন্যার চোখেমুখে আনন্দ যেন উপচে পড়ছে। সারাদিনের হট্টগোলের পর একা থাকার একটু সুযোগ পাওয়ামাত্রই সজ্জনের টনক নড়ল। নতুন বাতাস গায়ে লাগা মাত্রই বনকন্যা যেন এ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বদলে গেছে। সে কোনমতে সজ্জনের চোখ এড়িয়ে, সংক্ষেপে কথা সেরে নিয়ে দূরে চলে গেলেই যেন বাঁচে। কন্যা গাড়ি থেকে তার সঙ্গে একসঙ্গে নামতে রাজী হল না বরং একাই নেমে পায়ে হেঁটে চলে গেল। সকাল থেকে মনের গভীরে সজ্জন যে কল্পনাকে পোষণ করেছিল কন্যা তাকে আহত করে চুরমার করে ভেঙে দিয়ে গেছে। সে ভেবেছিল আজ তার নায়িকাকে সঙ্গে নিয়ে সে একটু বেড়িয়ে আসবে। আজ সে হবে তার নায়িকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক। ক্লাবে রেস্তোরায় বাজারে হাটে শহরের অলিতে গলিতে তার নামের সঙ্গে বনকন্যাকে নিয়ে আলোচনা শুরু হবে। লোকে বনকন্যার সঙ্গে সজ্জনকে দেখে

নিজেদের কপাল চাপড়াবে কিন্তু সব কল্পনাই নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। যেতে যেতে কন্যা তাকে একটা কথা বলে যেতে ভোলেনি— মহিপালবাবুর 'দেবতা' গল্পে এক জায়গায় বেশ মজার উক্তি আছে— পড়লে আপনারও ভালো লাগবে— ভগবান যখন কোন সাধু ব্যক্তিকে সাজা দেন, তখন আগে তাকে দেবতার পদে ভূষিত করেন। তার কথার মধ্যে লুকোনো শ্লেষ যেন সুঁচের মত তার মনে বিঁধে গেছে। সেই থেকে সজ্জন সেই সুঁচের খচখচানির যন্ত্রণা যেন সব সময়ই অনুভব করছে। গ্লানিতে তার মন ভরে উঠল। কন্যা তার সংকীর্ণ মনের আভাস পেয়ে হয়তো কোনদিনই তার কাছে আসবে না— নানা সাত-সতেরো এলোমেলো চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। বিষণ্ণ মনের হারিয়ে যাওয়া মনোবলকে ফিরে পাবার জন্য সে বেশ কিছুক্ষণ একা থাকতে চাইল। ঘর থেকে টেলিফোন বাইরে রেখে, চাকরদের হুকুম দিল যেন কেউ এলে তাকে বিরক্ত না করা হয়, এমনকি, কর্নেল, মহিপাল আর মেমসায়েব এলেও না। ঘরের ভেতরে একা বসে বসে সে কথায় কথায় চাকরদের ধমক দিল, মদ খেলো, রান্নাঘরে বার বার নতুন নতুন খাবার তৈরী করার অর্ডার দিল, বাড়ির প্রতিটি প্রাণীকে উদ্‌গ্রীব আর শশব্যস্ত করে তারপর ক্ষান্ত হল। অশান্ত মনকে শান্ত করার জন্য শেষকালে সে রেডিওর চাবি জোরে ঘুরিয়ে পট করে বন্ধ করে দর্শনশাস্ত্রের বইয়ের পাতা ফড় ফড় করে ওল্টাতে আরম্ভ করল।

গীতায় আছে কাম থেকে ক্রোধের উৎপত্তি হয় আর ক্রোধই বুদ্ধিবিভ্রম ঘটাবার কারণ। বিচলিত মনকে শান্ত করার জন্য সজ্জনের মনও গীতার এই লাইনটায় এসে যেন কিছুটা মনের শান্তি

খুঁজে পেল। মনে মনে ভেবে ঠিক করল কামকে পরাজিত করার সংকল্প সে নিশ্চয় নেবে। নারীর কল্পনা থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করবে। এক জায়গায় ভগবান বুদ্ধ আর শিষ্য আনন্দের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে—

—ভন্তে! নারী জাতির প্রতি ব্যবহারের মাপদণ্ড কি?

—অদর্শন— অর্থাৎ চোখে না দেখা।

—হঠাৎ দর্শনের উপায়?

—কথা না বলা— বাক্যকে নিয়ন্ত্রিত করো।

—যদি ঘটনাচক্রে কথা বলতেই হয় তখন?

—মন বিচলিত না করা।

—এবার থেকে সজ্জন এই পথই অবলম্বন করবে। নারী তাকে ফাঁদে ফেলার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে কিন্তু এবার সে তার বিচলিত মনে অঙ্কুশ লাগাবে। সে ব্রহ্মচর্য পালন করবে। নিশ্চয় করবে। ব্রহ্মচর্য আমাদের দেশের সংস্কৃতির মহান আদর্শ, আমাদের উচিত তাকে জিইয়ে রাখা, তাকে গতি প্রদান করা। এ পথের নতুন অভিজ্ঞতা হয়তো তাকে নতুন পথের সন্ধান দেবে, জীবনের মূল্যকে হয়তো সে বেশী ভালোভাবে বুঝতে শিখবে। পাতা ওলটাতেই দেখলে— এক জায়গায় বুদ্ধ বলে গেছেন— প্রাণীমাত্রেই গতিমান কিন্তু দিশেহারা। যদি গতির সঙ্গে সংযম আর সাধনার দম্ভ না থাকে, মায়ামোহমুক্ত সেবা ধর্মে দীক্ষিত, উচিত আত্মসম্মান জ্ঞান অথচ বিনয়ী, ক্ষত্রিয় ধর্মের জ্ঞান অথচ অহেতুক শস্ত্র গ্রহণ না করাই অসীমের সাক্ষাতের পথ। সজ্জনের চোখে এক নতুন অনুভূতির ঝিলিক দেখা দিল। সে তখুনি নিজের মনকে বোঝালো— বনকন্যা মেয়ে, সে

একজন অসহায় মেয়ের সাহায্য করেছে মাত্র— পরোপকারে পুণ্যার্জন হয়।

আজ সকালের কাগজে সম্পাদকীয় কলমে কন্যার লেখার প্রশংসা বেরিয়েছে। সম্পূর্ণ ঘটনার এনকোয়ারির আবেদনের সঙ্গেই সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে যে তারা যেন নির্বাচন প্রচার-প্রণালীতে মনুষ্যত্বের গলা. টিপে না ধরে। চিরাচরিত পদ্ধতিতে চলা সমাজের বিশ্বাসকে হারিয়ে রাজনৈতিক দলেরা মড়ার মত নির্জীব হয়ে যাবে।

সজ্জনের মনে কন্যার প্রতি হিংসে ভাব জেগে উঠল, তখুনি সে মনকে বোঝালো সে এখন ব্রহ্মচর্য পালন করছে, কন্যা যেই হোক— যেখানেই থাক্, তাতে তার কী আসে যায়? কোনমতে বিচলিত মনকে সামলে নিয়ে সে আবার তার নিত্য নিয়মে বাঁধা জীবনধারায় গা এলিয়ে দিল। এত বছর পরে হঠাৎ তার মনে জেগে উঠল মায়ের প্রতি ভালোবাসা। ওঃ কতদিন সে মায়ের ঠাকুরঘরের দিকটাই মাড়ায়নি। বাড়ির দালানের পাশেই সুন্দর শ্বেতপাথরের ঠাকুরঘর, তার প্রপিতামহী তাদের আদিবাড়ির নমস্য বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। বিলেত থেকে ফিরে আসার পরে ঠাকুর ঘরের দরজা কন্নোমলের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্বামীর স্পর্শ থেকে তার মা দূরে থাকতেন। বংশপরম্পরার নিয়ম অনুযায়ী ঠাকুরসেবার ভার বাড়ির বউয়ের হাতে এল আর তিনি শেষ পর্যন্ত সে নিয়মের ব্যতিক্রম হতে দেননি। মায়ের সময়ের পুরুত ঠাকুরের ভাইপো আজকাল পূজা-অর্চনার ভার নিয়েছে। প্রতিদিন ঠাকুরের ভোগ আর চণ্ডিপাঠের পর সে এসে সজ্জনকে প্রসাদ আর চরণামৃত দিয়ে আশীর্বাদ করে যেতে ভোলে

না। বাস্ এইটুকুই সজ্জনের ধর্মর সঙ্গে সম্পর্ক। ভগবানের অস্তিত্বের বিষয় গভীরভাবে চিন্তা সে কোনদিনই করেনি। এমনিতে প্রায় কথায় কথায় সে ভগবান এবং ধর্ম নিয়ে খেলো কথা বলে থাকে। আজ স্নানের পাট চুকিয়ে যখন সে সোজা ঠাকুরঘরের দরজায় গিয়ে হাজির হল, চণ্ডিপাঠে আধঘুমন্ত পুরুত মশাই হঠাৎ সামনে ভূত দেখার মত আঁৎকে উঠলেন। মায়ের মৃত্যুর পর প্রথম ঠাকুরঘর দেখে তার চোখে জল এসে গেল। ঘরের আলো টিমটিম করছে, শ্বেতপাথরের ঠাকুরের রঙ বদ রঙ হয়ে গেছে। শিব ঠাকুরের মাথায় রুপোর জলের ছোট ঝারির ফুটোতে ময়লা জমে জল আটকাচ্ছে। বিগ্রহের মখমলের ওপর জরীর কাজ করা .চান্দোয়া যেন ধুলোয় মলিন আর বিবর্ণ দেখাচ্ছে। চান্দোয়ায় দেওয়া রুপোর ঠেকনো পরিষ্কার না করার ফলে কালো হয়ে গেছে। নিস্তেজ ঠাকুরঘরে ফুলচন্দনে সাজানো মূর্তি যেন প্রাণহীন ম্যাড়ম্যাড় করছে। সজ্জন পুরুত মশাইকে ধমক দিয়ে বললে— তুমি কোন্ ধর্ম মানো পুরুত মশাই? যাকে সব থেকে পবিত্র মেনে পুজো করো, তাকেই ময়লা করে এত অপবিত্র করে রেখে দিয়েছ? এই কাজের জন্য মাসে মাসে মাইনে নেবার সময় তোমার গায়ে একটুও আঁচ লাগে না?

পুরুতের হাত-পা ভয়ে ঠক ঠক করে কেঁপে উঠল। কতবার এর আগে সে এ বিষয় সজ্জনকে বলার চেষ্টা করেছে কিন্তু সে মাত্র তিরিশটা টাকার মাস মাইনের চাকর, মালিকের সামনে কথা বলার সাহস কোথায়?

সব চাকরবাকরদের চারদিকে ঝকঝকে তকতকে রাখার আদেশ দিয়ে সজ্জন মালিকে ডেকে বললে— কাল থেকে

নিয়মিতভাবে সুন্দর ভালো ফুল, ফুলের মালা, ফুলের তোড়া এখানে আসা চাই— যেমন মায়ের সময় হত, বুঝলে? যদি কাল পর্যন্ত এখানকার সব ব্যবস্থা ঠিক না হয় তাহলে আমি সকলের মাইনে থেকে এ মাসে পাঁচ পাঁচ টাকা কেটে নেব। আর— হ্যাঁ, পুরুত মশাই, তুমি ঠিক করে নিবিষ্ট মনে পাঠ করবে, এটা ঘুমের ক্লাস নয় বুঝেছ? যদি না পারো তাহলে কাল থেকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

—না না, কী বলেছেন হুজুর!

—বাজে বকবক শুনতে চাই না আমি, ঠিকমত উচ্চারণ করে শুদ্ধ পাঠ করাতে চাই, নিষ্ঠার সঙ্গে সব কাজ হওয়া চাই বুঝেছ?

পুরুত, চাকরবাকর সকলকে ধমক দিয়ে তার দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হল মূর্তির ওপরে। তার মনে কণামাত্র ভক্তিভাবের সঞ্চার হল না। প্রাণহীন প্রতিমাকে দেখে কেন লোকে ভাবে বিভোর হয়ে ওঠে? আশ্চর্য মানুষের মন, নিতান্ত পৌত্তলিকতা হলেও সেই পুতুলের গায়ে আঁচড় লাগলে বা ভেঙে পড়লে খানিকটা তার মন নিয়েই পড়ে বুঝি। তার ঠাকুমা মা সকলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে বসে থাকতেন। বাড়িতে ইলেকট্রিকের পাখা ছিল অথচ মা ঠাকুরের সামনে হাতপাখা নাড়তেন। ভারতের অনেক মন্দিরে সে গেছে কিন্তু সেখানে প্রত্যেক মূর্তিকে শিল্পীর চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছে, তার মধ্যের ভগবানকে দেখার চেষ্টা করেনি। সেখানে পূজারী আর পাণ্ডাদের অনাচার আর অত্যাচার সে স্বচক্ষে দেখেছে। কেন লোকে মন্ত্রমুগ্ধের মত দেবস্থানে যায়, এ প্রশ্নের উত্তর সে কিছুতেই খুঁজে পায়নি। পেতলের বড় বড়

পটলচেরা চোখের রাধাগোবিন্দের মূর্তি, শালগ্রাম, ছোট ছোট নানা আকারের নুড়ি, গণেশ, শিবের জটা থেকে গঙ্গাবতরণের দৃশ্য ·· সব যেন নিষ্প্রাণ, তবু রোজ কতলোক তাদের নিয়মিতভাবে দেখে তাদের সামনে মাথা নত করে।

সজ্জন যেন হঠাৎ তার মানসিক রোগের ওষুধ হাতের কাছেই পেয়ে গেল। সে মনে মনে ভেবে ঠিক করে ফেলল যে কাল থেকে সে এখানে এসে নিয়মিতভাবে ধ্যান করবে। সে যে এই কঠোর নিয়ম পালন সহজ ভাবেই করতে পারবে এতটা আত্মবিশ্বাস তার ছিল।

আজ সকাল থেকে তার জেদী স্বভাব আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সজ্জন রীতিমত প্রতিজ্ঞা করল, এবার যদি কখনো বনকন্যা তার কাছে আসার চেষ্টা করে, সে তাকে বন্ধুর চেয়ে বেশী কিছু মনে করবে না। একবারটি সেও বুঝুক যে জেদের সামনে তার আকর্ষণের কোন মূল্য নেই।

বিরক্ত হয়ে, বাড়ির দুজন চাকর, বালতি, ফুল, ফুলের তোড়া সব-কিছু নিয়ে সে চৌমাথার গলির ঘরের দিকে পা বাড়ালো। আজ সে একেবারেই অন্দর-বাইরের ময়লা ধোয়ার জন্য মালকোঁচা মেরে বেরিয়ে পড়েছে— ব্রহ্মচর্য পালনের নেশাকে সে জিইয়ে রাখতে চায়।

চাকরদের সঙ্গে নিয়ে সে আজ প্রথম নিজের গলির ঘরে ঢুকেছিল। ড্রাইভার ছাড়া অন্য চাকরেরা কেউ তখনো এ গুপ্ত জায়গার সন্ধান পায়নি। তারা দুজনে দুর্গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে মনিবের সঙ্গে গোয়ালঘরের দিকে এগিয়ে চলল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে যেতে হঠাৎ জেঠীর খোলা ঘরের দিকে সজ্জনের

নজর পড়ল। চাকরের মাথায় ফুলের গোছা দেখে সে ভাবল জেঠী হয়তো কিছু ফুল পেলে খুশী হয়ে যাবেন। চাকরদের হাতে চাবি দিয়ে, ঘর ধোয়ামোছা করার জন্য বলে ছোট্ট বাঁশের টুকরিতে বাছা বাছা ফুল নিয়ে সে তাঁকে দিতে এগুলো। বারান্দায় পা দিতেই তার মনে এল যদি গালাগালি দিয়ে সম্ভাষণ হয় তাহলে ? যাক গে দেখা যাবে— যা থাকে কপালে!

উঠোনে বেড়ালছানারা লাইন দিয়ে ব'সে আছে— তাকে দেখেই কুঁইকুঁই করে তারা তার পায়ের আশেপাশে চক্রব্যূহ রচনা করে ফেলল। ব্যূহ ভেদ করার চেষ্টায় সে দু'পা এগুচ্ছে আর চার-পা পেছুচ্ছে। হঠাৎ সামনে বারান্দার থামের কাছে খাটিয়াতে বাঁধা জেঠীর দিকে তার নজর পড়ল। জেঠীর ভয়ানক হনুমানের মত সিন্দূরে মাখা মুখ দেখে সে আঁৎকে উঠল। হাড় জিরজিরে নুয়ে পড়া জেঠীর শরীরে এই ভীষণ মেক-আপ দেখে সে ভাবল হয়তো জেঠী পরপারে চলে গেছেন! তাঁর পার্থিব শরীরটাই এখানে পড়ে আছে। ইতিমধ্যে জেঠীর স্পন্দনহীন শরীরে প্রাণের সাড়া দেখা দিল— মাথা একটু নড়ে ওঠার সঙ্গেই সাদা সাদা চোখ পিটপিটিয়ে উঠল। সে সাহস করে কোনমতে এগিয়ে গিয়ে জেঠীর মুখে ঠাসা কাপড় বার করলে। এতক্ষণে জেঠীর চোয়াল ধরে গিয়েছিল তাই তিনি কিছুক্ষণ হাঁ করা মুখ বন্ধ করতে পারলেন না। জেঠীর বাঁধন খুলে দিয়ে সজ্জন তাঁর হাতে পায়ে আর মুখে মালিশ করতে লাগল।

মালিশ করার ফলে রক্তপ্রবাহ ধীরে ধীরে ঠিক হ'ল কিন্তু তবু চোয়াল স্বস্থানে ফিরে আসছে না দেখে সজ্জন তাড়াতাড়ি গলায় মালিশ করতে লাগল। জেঠী কিছু বলার জন্য ছটফট করে উঠলেন।

সজ্জন তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল— 'ডাক্তার ডেকে দেব?' জেঠী দুর্বল হাত নেড়ে মানা করলেন। উঠোনে বেড়াল ছানাদের দেখে তিনি শুকনো গলা দিয়ে বিচিত্র স্বর বার করলেন।

কিছু বুঝতে না পারায় সজ্জন বললে— আমি এখুনি সেঁকের ব্যবস্থা করছি, দরকার হলে ডাক্তার ডেকে আনব।

জেঠী সমানে উঠোনের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে কিছু বলে যাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁর মনের কথা সজ্জনের মাথায় না ঢোকায় সে উত্তর দিল— আমি আপনার ছেলের মত, লজ্জা পাবেন না।

জেঠী বার বার হাত উঠিয়ে উঠোনের দিকে ইশারা করছেন। চাকরদের ডাকার জন্য সজ্জন বাইরে বেরিয়ে গেল কিন্তু এবারে সে আগের চেয়ে সেয়ানা হয়ে গেছে। কোনমতে পা টিপে টিপে একধার দিয়ে উঠোনটা পেরিয়ে গেল, বেড়ালছানারা অন্য দিকে উৎপাত করতে ব্যস্ত।

যখন চাকর আর স্টোভ নিয়ে সজ্জন ফিরে এল তখন জেঠী খাটিয়ায় উঠে বসে নিজের মাথা আর মুখে ঝাঁকুনি দিয়ে চোয়াল ঠিক করার চেষ্টা করছিলেন। সে তাড়াতাড়ি খুব খানিকটা মালিশ করে, স্টোভ জ্বালিয়ে চাকরের মাফলার গরম করে সেঁক দিতে লাগল। জেঠী আড়ষ্ট জিভকে কোনোমতে চালাবার চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ কোঁৎ করে বলে উঠলেন··· দুধ। জেঠী হয়তো দুধ খেতে চাইছেন ভেবে সে তাড়াতাড়ি চাকরকে বাজারে পাঠাল। জেঠী আঁচলের গেরো খুলতে চেষ্টা করলেন।

দু' মিনিট সজ্জনের মুখের দিকে চেয়ে জেঠী ক্লান্তভাবে বললেন— কন্নোমলের নাতি। আবার নিঃশ্বাস নিতে নিতে— নন্দর

বাপ এসেছিল। নিঃশ্বাস নিয়ে আবার চুপ করে গেলেন। জেঠীর সিন্দুর-মাখা মুখে সে দেখতে পেল আদিম পূজারিনীর ছায়া।

জেঠী কোনমতে হাত-পা সোজা করে উঠে দাঁড়িয়ে উঠোনে যাবার জন্য পা বাড়াতেই তাড়াতাড়ি সজ্জন এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরে নিয়ে যেতে লাগল। রোয়াকে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে জেঠী বেড়ালছানাদের আঁচলে উঠিয়ে নিলেন। আঁচলের গেরো থেকে পয়সা বার করে সজ্জনের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে বললেন— একটু দুধ আনিয়ে দাও।

—আনতে দিয়েছি।

—এদের জন্য চাই।

চাকর ফিরে আসা পর্যন্ত জেঠীর নতুন রূপের দিকে তাকাতে তাকাতে সজ্জন ভাবছে— জেঠী সকলের শত্রু, গালাগালি ছাড়া দুটো ভালো কথা বলতে জানেন না। প্রত্যেকের অশুভ কামনা করতে করতে দিনরাত জাদু-টোটকার ব্যবস্থা করেন। অথচ তাঁর প্রাণ আটকে আছে এই বেড়ালছানাদের মায়ায়? তাদের খিদের চিন্তায় তিনি অস্থির। মানুষের জীবনে কত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে— এই পবিত্র সৌন্দর্যের অধিকারী হয়েও সে হিংসা শত্রুতা আর ঘৃণার জাল নিজের আশেপাশেই নিজেই বুনে চলেছে। তার মন জেঠীর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠল।

জেঠীর আঁচলে বেড়ালছানারা আনন্দে একে অন্যের গায়ে লদরবদর করে পড়ছিল। দুটি তাঁর আঁচলে, তৃতীয়টি হাত বেয়ে কাঁধে চড়ে চোখ বুজে ঝিমুচ্ছে। আদরে জেঠীর ঘাড় তৃতীয় বেড়ালছানাটির ওপর কাত হয়ে পড়েছে। কাগজ-পেন্সিলের জন্য

সজ্জনের আঙুল কেঁপে উঠল। অদ্ভুত মেক-আপের ভয়ংকরতার সঙ্গে এক করুণাময়ীর মূর্তি, হায় রে বিধির বিড়ম্বনা!

চাকর দুধ নিয়ে এল। আঁচলে বাচ্চাদের নিয়ে জেঠী উঠে প্লেটে দুধ ঢেলে নিয়ে সজ্জনকে বললেন— এবার তুমি যাও।

—একটু দুধ আপনিও মুখে দিন।

—আরে হাড় হাবাতে, আমার আজকে সকালে দর্শন করা হল না। হারামজাদার গুষ্টি ওলাউঠায় মরবে। তুমি তোমার দুধ নিয়ে যাও। যাও।

বেড়ালছানারা ক্ষিদের চোটে তাড়াতাড়ি চোঁ চোঁ করে দুধটুকু শেষ করে নিয়ে খালি প্লেট চাটছে। সজ্জন আর তার চাকরদের বিদেয় করে জেঠী সদর দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকে হন্যে হয়ে নিজের বাক্সের ওলটপালট জিনিসের মধ্যে কিছু খুঁজছেন। ঠাকুরের কাছে আলসেতে রাখা তাঁর জমা পয়সা সেখানেই পড়েছিল। পয়সা দেখে জেঠীর ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। তাঁর রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ধন দেখে নিয়ে তিনি চারিদিকের ছোট ছোট ব্যাঙ্কে রাখা খুচরোর সন্ধান করে ঘুরতে লাগলেন। জাঁতা মাটি থেকে উপড়ে ফেলে তার নীচে লুকোনো মাটির হাঁড়ি উধাও হয়ে গিয়েছে। পয়সার লোভে মিছিমিছি তারা উনুনও ভেঙে ফেলেছে। চোরে দালানের ভেতরের ছোট ঘরের মেঝে পর্যন্ত চারিদিকে খুঁড়ে ফেলেছে। হ্যারিকেন জ্বালিয়ে জেঠী দেখলেন— ন্যাকড়ায় বাঁধা রুপোর টাকা গায়েব। অনেকক্ষণ সবকিছু খুঁজেপেতে দেখলেন। হতাশ হয়ে বিষণ্ন মুখে মাথায় হাত দিয়ে মেঝেতে বসে পড়লেন। বেড়ালছানারা তাঁর আশে-পাশে খেলে বেড়াতে লাগল।

চারিদিকে ছড়ানো জিনিসপত্তর, জেঠী আবার গুছিয়ে জায়গায় রাখতে আরম্ভ করলেন। রান্নাঘরের দালানে ছড়ানো আটা চাল ডালের টিন, মশলার কৌটো আর ছ্যাঁদা মাটির ঘড়াকে আবার যথাস্থানে সাজিয়ে রাখলেন। ঘরদালান ধুয়ে স্নান করে নিয়ে সজ্জনের দেওয়া ফুল ঠাকুরের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে, তিনি তাড়াতাড়ি সজ্জনের ঘরের দিকে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। ইতিমধ্যে চাকরে ঘরদোর ছাত সব পরিষ্কার তকতকে করে ঘরে ফুলের তোড়া সাজিয়ে রেখেছে। দরজায় জেঠীকে দেখে সজ্জন থতমত খেয়ে বললে— আসুন আসুন, ভেতরে আসুন জেঠী।

মেঘে ঢাকা মুখ আরো কঠিন করে জেঠী উত্তর দিলেন —ব্যাটাচ্ছেলেরা আমার তিন হাজার দুশো টাকা চুরি করে পালিয়েছে— মরুক! এদের সারা গায়ে কুষ্ঠ থিতিয়ে যখন রস গড়াবে তখন আমার প্রাণ জুড়োবে— তুমি দেখে নিয়ো।

সজ্জন ভাবল হয়তো চোরে জেঠীর কাছে পাই পয়সা ছাড়েনি তাই এদিক-সেদিকের কথা বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ ফস করে জেঠী তাকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন— তুমি বিয়ে করেছ ?

—না, এখনো পর্যন্ত একাই আছি।

—আরে, আমার এখানে গোকুল মন্দিরে একজন আসে, আমাদেরই স্বঘর। তার মেয়ে বেশ ভালো, খুব সুন্দরী আর সংসারের কাজে চৌকস। ক্লাস ছয় পর্যন্ত ইংরেজী পড়েছে বাড়িতেই। তুমি যদি হ্যাঁ বলো তাহলে কথা পাড়ি।

—না, জেঠী না, এখন বিয়ে করব না।

—এখন করবে না তো কি বুড়ো বয়সে ছাদনাতলায় দাঁড়াবে ?

কল্লোমল ধর্মভ্রষ্ট ছিল, তুমিও তাঁর যোগ্য বংশধর হবে ভাবছ নাকি ?

সজ্জন একগাল হেসে বললে— না জেঠী তা নয়— আমি বেশ সাদাসিদে ভাবে জীবন কাটাচ্ছি।

—রান্না কে করে বাড়িতে ? পণ্ডিতের হোটেলে খাও না কি ?

—না, না, আমার বামুন ঠাকুর রান্না করে, কখনো কখনো আমিও রান্নাঘরে গিয়ে হাতাখুন্তি চালিয়ে নি। জেঠীর সামনে নিজের পবিত্রতার বর্ণনা করতে গিয়ে সজ্জনের হাসি সামলানো দায় হয়ে উঠল।

জেঠী উৎসাহের সঙ্গে কথা তুললেন— তুই যদি রামচন্দরের মেয়েকে বিয়ে করতে রাজী থাকিস তাহলে (গলা নাবিয়ে) একশো তোলা সোনা তোর বউয়ের মুখ দেখানিতে দেব, দেখ, আমাকে যতই কেউ লুটেপুটে পালাবার চেষ্টা করুক— গোকুলনাথ আমার রক্ষাকর্তা, হারামজাদাদের বংশ শেকড় সুদ্ধ উপড়ে না যদি দি তাহলে আমার নামই··· কিন্তু তুই বাপু কল্লোমলের বংশধর, বিয়ে করে ফেল— একশো তোলা··· ।

সজ্জন আর জেঠী মাথা তুলে দেখলে, সামনেই দরজায় বনকন্যা দাঁড়িয়ে। সজ্জন কিছুটা নিজের জন্য আর কিছু জেঠীর কথা ভেবে ঘাবড়ে গেল। জেঠী তার দিকে কৈফিয়ত চাওয়ার দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। কন্যা, সামনে পাতা মাদুরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। জেঠী প্রশ্ন করলেন— এ আবার কে ? কন্যাকে সামনে পেয়ে সজ্জনের মন ধীরে ধীরে গলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। হঠাৎ মুখে কোনো কথা না জোগাতে পারায় সজ্জন বলে উঠল— ইনি আমাদেরই বাড়ির মেয়ে।— ইনি, ইনি এঁর বাপের বাড়ি অন্য শহরে।

—এখানে শ্বশুরবাড়ি বুঝি? কোথায় বিয়ে হয়েছে?

সজ্জন কন্যাকে কথা বলতে না দিয়ে নিজেই মিথ্যের পাহাড় তৈরী করে ফেলল! হঠাৎ কন্যার খালি হাত দেখে তার মাথায় প্ল্যান এসে গেল— সে তাড়াতাড়ি তার হাতে চুড়ি না থাকার ঘটনাকে কাজে লাগানোর চেষ্টায় বেশ ফূর্তির সঙ্গে উত্তর দিল— ইনি এখানে মেয়েদের স্কুলে অধ্যাপিকা— এঁর শ্বশুরবাড়ির সকলেই গত হয়েছেন।

—তা তোর কাছে কেন?

—কাজ শেখবার জন্য এসে থাকি মাসিমা— কন্যা মনে মনে ভাবল যে জেঠী হয়তো সজ্জনের কেউ নিকটআত্মীয়া তাই সে তাঁকে মনজোগানো উত্তর দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছে।

জেঠী ফট করে জিজ্ঞেস করে বসলেন— তাহলে তুই বিধবা বিবাহের চক্করে পড়বি নাকি?

—না, না, জেঠী আমি শিক্ষক, দশ টাকা মাস মাইনে নিয়ে কেবল পড়াই এই পর্যন্ত।

জেঠী কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ধাঁধা মেটাবার চেষ্টা করে উঠতে উঠতে বললেন— তোকে যে কথা বলেছিলুম সেটা মনে রাখিস আর ভালো করে ভেবে দেখিস, তবে সাত কান করিস না যেন।

—না, জেঠী আপনি যদি হুকুম দেন তাহলে পুলিসে রিপোর্ট লিখিয়ে আসি?

—না, না, পুলিস কী করবে? আমি নিজেই হাড়হাবাতেদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেব। বলতে বলতে জেঠী বাইরে চলে গেলেন।

—ইনি কে? কন্যা সজ্জনকে প্রশ্ন করলে।

সজ্জন হেসে উত্তর দিলে— ভারতমাতা।

কন্যা তার অর্থ ঠিকমত বুঝলে না, তবু এই হাড় জিরজিরে বুড়ির মধ্যে ভারতমাতার কল্পনা মাত্রেই সে না হেসে থাকতে পারল না। কৌতুকের স্বরে বললে— আপনি এতগুলো জলজ্যান্ত মিথ্যে কথা আমার বিষয় কেন বললেন।

প্রশ্ন শুনে সজ্জন হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিল— যদি সত্যি বলে দিতাম তাহলে আমার আপনার বিষয় তাঁর ধারণা কিছু ভালো হত?

হঠাৎ সজ্জনের মুখে আপনি সম্বোধন কন্যার কানে বাজল। সজ্জনও একদিকে নিজের প্রতিজ্ঞা আর অন্যদিকে কন্যার স্নিগ্ধ সহজ আর সরল আকর্ষণের মায়াজালে ধরা পড়ে গিয়ে ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলছিল। কন্যা ভাবলে যে তার কালকের ব্যবহারে হয়তো সে রেগে আছে। কন্যা তার রাগের কারণ গবেষণা না করে বললে— আমি এখুনি কর্নেলদার ওখানে গিয়েছিলুম। আজ সকাল সকাল মথুরা থেকে এক ভদ্রলোক (ঠোঁটের কোণে হেসে) কর্নেলদার সঙ্গে আমার ঘর খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির হয়েছিলেন।

সজ্জন ততক্ষণে মনে লাগাম দিয়ে নিয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছে। ওরা তোমার— আপনার ঘরের ঠিকানা জানল কি করে?

—কাল খবরের কাগজে পড়ে এসেছিলেন। প্রথমে আমার বাড়ি গেলেন সেখানে অপমানিত হয়ে ফেরার পর কেউ তাঁকে কর্নেলদার ঠিকানা দিয়েছিল। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমার ওখানে গিয়েছিলেন। কন্যা ব্যাগ থেকে কয়েকটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে সজ্জনকে দিতে দিতে বললে— এটা বউদির চিঠি— নিজের বান্ধবীকে লিখেছিলেন।

সজ্জন চিঠি পড়তে লাগল। মাজাঘষা মেয়েলি হাতের লেখার করুণ কাহিনী— আমি রাক্ষসের পাল্লায় পড়ে গেছি। ত্রিভুবন লালাজীর স্ত্রীর ব্যাপার একটু গোলমেলে তাই তিনি আমার সঙ্গে বিধবা বিবাহ করতে রাজী ছিলেন। শাশুড়ীর মত ছিল না কিন্তু তিনি ত্রিভুবনকে তাঁর বশে আনার জন্য জবরদস্তি মাথা নেড়ে সায় দিলেন। এ বাড়ির লোকেদের লীলাখেলার কথা কত আর তোমাকে লিখব। ত্রিভুবনের মনে কোন প্যাঁচ না থাকায় সে ভরা হাটে হাঁড়ি ভাঙার মত আমাদের বিয়ের কথা বেশ জোর গলায় সকলকে জানিয়ে দিলে। খুড়শ্বশুর আর খুড়শাশুড়ী উনুনের চেলা কাঠ নিয়ে আমায় মারতে এলেন। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে শাশুড়ীও মার খেলেন। তারপর সেই খুড়শ্বশুর— সেই শয়তানকে এ নামে সম্বোধন করতে আমার জিভ যেন খসে যাচ্ছে— মার-ধোর জোর জবরদস্তি করে আমার সর্বনাশ করল। ভগবান মিথ্যে, পাথরের বিগ্রহ চুপ করে সব অত্যাচার দেখল। ত্রিভুবন বাপের সামনে মুখ খুলতে পারল না। কন্যা, আমার ননদ সব সময়ই আমার সুপারিশ করে থাকে কিন্তু একা সে বেচারীই বা কত লড়বে? মনের কথা তোমাকে লিখে একটু মন হাল্‌কা হল। তুমি কিন্তু ভাই এ চিঠির জবাব দিয়ো না কেননা যদি রাক্ষসের হাতে এসে পড়ে, তাহলে আমায় আর আস্ত রাখবে না।

চিঠি কয়েকবার পড়ার পর সজ্জন মাথা নিচু করে গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

—কর্নেলদা বলছেন যে এই চিঠি দেখালে বাবাকে এখুনি ফাঁসানো যেতে পারে, উনি আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের ওখানে নিয়ে

যাচ্ছিলেন, আমি বললুম আগে আপনার মতামতটা জেনে নিয়ে তারপর যা হয় করা যাবে।

সজ্জন শ্লেষ মাখা স্বরে বললে— কর্নেল ঠিকই পরামর্শ দিয়েছে, আপনার ওখানে যিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি কে জানতে পারি?

সজ্জনের রূঢ় শ্লেষ-মাখানো কথা শুনে কন্যা নিজের আঙুলের নোখ দাঁতে কাটতে কাটতে বললে— বউদির সেই বান্ধবীর স্বামী, বান্ধবী বেচারী ছ'মাস থেকে খাটে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে। ভদ্রলোকটি আমাকে সাহায্য করতে রাজী আছেন। তিনি বলছেন যে দরকার হলে কাছারির হুকুম নিয়ে মথুরায় গিয়ে তাঁর স্ত্রীর স্টেটমেণ্ট করিয়ে দিতে পারেন— যদি আমি— আমরা বলি তাহলে।

—তাহলে আপনার কী মত?

—আপনি? যা ভালো বোঝেন।

পকেট থেকে সিগারেট বার করে চোখেমুখে দার্শনিক হাবভাব ফুটিয়ে সজ্জন বললে— আমার বলাবলির কথা এর মধ্যে উঠছে কোথায়? এটা সম্পূর্ণ আপনার নিজস্ব ব্যাপার।

—সম্পূর্ণ একা আমারই? মনুষ্যত্বের নয়?

—না, আমি অন্য হিসেবে বলছিলাম। আপনার বাবা, আপনার পরিবারের মান-ইজ্জতের ব্যাপার কী না তাই…

—বাবার মান ইজ্জৎ? কন্যা আবেগে চেঁচিয়ে উঠল— তাদের ইজ্জতের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে ফেলছেন কেন? তারা কাল থেকে আমার ইজ্জৎ খারাপ করার জন্য আমার পেছনে গুণ্ডা লাগিয়ে দিয়েছে। তারা আমার অসম্মান করার ফিকির আঁটছে।

মান-অভিমানের পালা এক মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল, ঘাবড়ে গিয়ে সজ্জন বললে— তোমার কোন ক্ষতি করেনি তো?

—কাল রাত্তিরে আমার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বাবা খুব লম্ফঝম্ফ করছিলেন। নাক কাটিয়ে দেবার ধমকি থেকে আরম্ভ করে কোন খারাপ কথা মুখে আনতে সংকোচ করেন নি। আমি তবু দরজা খুলিনি।

—তারপর?

—তারপর উনি চলে গেলেন। তাঁর যাবার পরই তাঁর গুণ্ডার দল বন্ধ দরজার সামনে অকথ্য ভাষায় কিছু কিছু বলা আর শেকল ঠক ঠক করা আরম্ভ করে দিলে। কুলিমজুরদের বস্তি, তাই তারা সহজেই শালিগরামের কথায় আর পয়সার জোরে আমার বিরুদ্ধে নেচে উঠেছে। তাদের পুঁচকে বাচ্চারা পর্যন্ত আমার ঘরের সামনে যা-তা বলতে থাকে। সেদিন কর্নেলদা গিয়েছিলেন সেই থেকে একটু··· আমি এখনও ঘরে যাইনি। কন্যার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। নতুন ব্রহ্মচারীর আসন টলে উঠল। ব্রহ্মচর্যের পথে এগিয়ে যেতে যেতে আবার নারীর আকর্ষণের টান। সজ্জন উত্তেজিত হয়ে বললে— আপনি সেখানে থাকতেই বা গেলেন কেন? আপনাকে কতবার অনুরোধ করেছি, আপনি বোধহয় ভেবেছেন আমি অন্যদের মত বাউণ্ডুলে আর চরিত্রহীন।

—না, না, কখনো এ কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

—তবে কী ভাবছেন? আমার এত বড় বাড়ি পড়ে আছে— মানুষজন বিনে খাঁ খাঁ করছে। আপনি যদি বলেন তাহলে বাড়ির একটা দিক আপনার জন্যে খালি করিয়ে দিতে পারি— আর যদি

এর থেকে বেশী কিছু চান, তাহলে নিজের পয়সায় মাঝখানে দেওয়াল তুলে দেব। বাস্ দেয়ালের ওদিকটা সম্পূর্ণ আপনার নিজস্ব থাকবে। কন্যা হেসে ফেলে বললে— দেখুন, আপনার এই অকারণে রাগ হওয়ার কারণ কিছু বুঝতে পারলুম না। আমি কিন্তু কিছুই মনে করিনি – বুঝেছেন ?

কন্যার কথা শুনে সজ্জন একদম বেকায়দায় পড়ে গেল— তার বুকের ভেতরটা ছলাৎ করে উঠল। প্রতিজ্ঞা তার পায়ে পায়ে এসে বাধা দেবার চেষ্টা করে চলেছে অথচ তার মন সেই নারীর আকর্ষণে বাঁধা দেবার জন্য ছটফটিয়ে মরছে। উফ্ আজ তারা একে অন্যের এত নিকটে তবু দুজনেই আত্মপ্রকাশের জন্য ছটফট করছে। বিচিত্র মানুষের মনের গতি !

আপনার এত বিরাট বাড়ির এক ভাগে থাকার মত অবস্থা আমার নয়। আপনি আমার মন ভুলিয়ে রাখার জন্য যদি মাসে দশ টাকা ভাড়া বলেন তাহলে সেটা কি ঠিক হবে।

আমি আমার ভাড়া দেওয়া বাড়িগুলোর মধ্যে একটা আপনাকে দিচ্ছি না— আর চাইলেও এখন কোনোটাই খালি নেই। আমি আপনার বন্ধু হিসেবে আজ বিপদের দিনে আপনার পাশে দাঁড়াতে চাই—সাহায্য করতে চাই মাত্র। এই যন্ত্রণার হাত থেকে অন্ততপক্ষে আপনি রেহাই পাবেন। ভাবুন, এই চিঠি নিয়ে যদি কেউ আপনার ওপরে হামলা করে তাহলে ? সেখানে সব সময় আপনাকে প্রাণ হাতে নিয়ে থাকতে হবে।

—আপনি আমাকে তুমি বলতে বলতে আবার আপনির পর্যায়ে কেন নিয়ে গেলেন ?

—আমি আজকাল 'দেবতা' হয়ে গেছি, রূঢ়ভাবে সজ্জন যেন

কথা ছুঁড়ে মারলে। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ থাকার পর কন্যা একটু কেসে, ঢোক গিলে বললে— একটা কথা বলব?

—কী?

কন্যার ফর্সা মুখ লাল হয়ে উঠল— যখন আপনার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় তখন এক ভদ্রলোকের কাছে বিপদে সাহায্য চাইতে আসা ছাড়া আর কোন অভিসন্ধিই আমার মনে ছিল না। আম'দের এই আলাপে এত তাড়াতাড়ি যে এক নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠবে এ আমি ভাবতেই পারিনি। আপনার ওপর কোন দোষারোপ করতে চাই না তবু আমার যা মনে হচ্ছে, আমায় আজ খোলাখুলিভাবে বলতে দিন। আপনি আমাকে সামান্য বন্ধুর চেয়ে অন্য কোন মর্যাদা দিতে ইচ্ছুক— তাই নয় কি? এই ধাঁধার জবাব আমি ভেবে পাচ্ছি না।

—আপনি যদি সত্যি কথা পটপট করে বলে ফেললেন তাহলে আমিও শুনিয়ে দি কেমন? আপনি নিজের ব্যবহারে হাবেভাবে সে কথা জানান নি? কন্যা লজ্জিত হয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল মেঝেতে ঘষতে লাগল।

—হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি যে সচ্চরিত্র সাধু না হলেও আমি চরিত্রহীন পাষণ্ড নয়। তোমাকে আমি যে চোখে দেখতাম— কাল পর্যন্ত দেখেছি, তার বিষয় এত তাড়াতাড়ি কিছু ধারণা করে নেওয়া ভুল হবে। যদি আমার কোন ভুল হয়ে থাকে, জোড়হাতে মাপ চাইছি ম্যাডাম। আমি যে নারীজাতিকে শ্রদ্ধা করি সেটা আমায় প্রমাণ করতে দাও।

—বিশ্বাস করুন, আপনাকে আমি কখনো অবিশ্বাস করিনি— আজ থেকে আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল ..।

—হ্যাঁ, যা বলছিলাম— এই চিঠিটার কী করতে হবে ?

সজ্জন নিজের মনের নাগাল ধরার চেষ্টা করতে করতে বললে— চলো, কর্নেলের কাছে গিয়ে আজই এর বিহিত করে ফেলতে হবে। (উঠে দাঁড়িয়ে) কিন্তু এখন তোমার আস্তানা কোথায় ? আমি কিন্তু তোমায় সেখানে থাকতে দিতে পারি না।

মাথা হেঁট করে কন্যা স্মিত হেসে বললে— আজকের মত হয় আপনার বাড়ি, নাহয় কর্নেলদার বাড়ি, কাল কিছু একটা ব্যবস্থা করে নেওয়া যাবে কিন্তু সে ভার আপনারই।

—আমার কেসরবাগের বাড়ির ওপরতলা করার নক্‌শা পাস হয়ে গেছে। আমি তোমার জন্য নতুন ফ্ল্যাট তৈরী করিয়ে দেব, তত দিন··· ততদিন তুমি আমার বাড়িতেই থাকতে পারো। কর্নেলের ওখানে তোমার থাকায় আমার কোন আপত্তি নেই তবে ওর স্ত্রী পুরোনো আচার-বিচার মেনে চলে তাই ·· আমি চাই না যে তোমার বিষয় কারুর মনে কোনরকম ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়।

—কিন্তু আপনার বাড়িতে থাকলেই কি লোকে আমায় ছাড়ান দেবে ? কাল আমার বাবাই কত কথা শুনিয়ে গেলেন। যাক গে সে-সব কথা— আপনি যা ভালো বুঝে ঠিক করে দেবেন তাই হবে।

কন্যার মুখ থেকে তার মনোমত জবাব পেতেই সজ্জনের মন আনন্দে ভরে গেল। সমাজের সব বাধা অতিক্রম করে এ মুহূর্তে কন্যাকে আপন করে পাবার ইচ্ছে সজ্জনের মনে বলবতী হয়ে উঠেছে।— হঠাৎ তার কানে বেজে উঠল মহাত্মা বুদ্ধের অমৃত বাণী ·· মন বিচলিত কোরো না আনন্দ।

ষোলো

সজ্জনের দৈনন্দিন বাঁধাধরা জীবনযাত্রায় আজ হঠাৎ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। কর্নেলের বাড়ি সকালের জলখাবার খেয়ে তার গলির স্টুডিয়োতে যাবার বদলে সে নিজের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। কাল থেকে মনিবের মতিগতি বদলেছে, ধর্মে পুজোআচ্চায় মন বসেছে দেখে আজ প্রভুভক্ত চাকরের দল পরম নিষ্ঠায় কাজে মন দিয়েছে। ঠাকুর ঘর আয়নার মত ঝকঝক করছে। বড় বড় কাপড়ের ফালিতে বাঁধা ঝাড় ফানুস খুলে পরিষ্কার করা হয়েছে। চান্দোয়াতে রুপো পালিসের হাত পড়ে চকচক করছে। বিগ্রহের আসনের পাশের থামের কাছে তৈরী শ্বেতপাথরের নারী মূর্তিটির রঙ আজ যেন বেশ সাদা দেখাচ্ছে। বিগ্রহের গলায় তাজা ফুলের মালা শোভা পাচ্ছে। গাঁদা ফুলের লম্বা লম্বা জালির মত গাঁথা মালা দিয়ে ঠাকুর ঘরের দরজা সাজানো। আজ পুরুতমশাই সময়ের আগে আগে এসে ভক্তিভরে বিগ্রহকে স্নান করিয়েছেন। বিগ্রহকে নতুন সুন্দর পরিধান পরিয়ে তিনি মহা আড়ম্বরের সঙ্গে গলা ফাটিয়ে জয় জগদীশ হরে ওঁমঃ জয় জগদীশ হরে— ভক্তজনো-কে সংকট ছিন মে দূর করে··· আরতি গাইছেন। দরজায় সজ্জনকে দেখেই যেন সামনে সাক্ষাৎ শমন দেখার মত পুরুতমশাই ঘাবড়ে গেলেন। কোনমতে ঢোঁক গিলে গিলে পুজোটা শেষ

করলেন। সজ্জন এক মনে বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে রইল— আজ এখানে তাকে দেখে মায়ের আত্মা নিশ্চয় শান্তি পাচ্ছে। পুরুতের দাঁত চেপে ঢোক গিলতে গিলতে আরতি গান শুনে তার হাসি পাচ্ছে, এই ধর্মের দালাল ব্রাহ্মণটির মনে কি সত্যিই ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা আছে?

নিজের ধর্মনিষ্ঠার কথা চিন্তা করতে করতে সে বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে আসতেই চাকর তার হাতে চিট ধরিয়ে দিয়ে গেল, বাবু শালিগরাম জয়সওয়াল আর জানকীসরণ তার প্রতীক্ষায় বাইরের ঘরে বসে আছেন।

—কতক্ষণ হল এসেছেন?

—কুড়ি মিনিট বোধহয় হুজুর···

—চা দিয়ে এসেছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওদের কী বলেছ?

—বলেছিলাম যে এখন মনিব ঠাকুরঘরে আছেন।

—ঠিক আছে, সজ্জন কাপড় ছাড়তে লাগল।

তাকে বৈঠকখানায় ঢুকতে দেখেই, তারা দু'জনে বৈষ্ণবী বিনয়ের অবতার হয়ে প্রায় মাটিতে মিশে যাবার জোগাড়। বাবু শালিগরামের সঙ্গে তার পরিচয় নেই তবে জানকীসরণের সঙ্গে মাঝে মাঝে রাস্তাঘাটে দেখাসাক্ষাৎ হলে হাত তুলে নমস্কার-হয় এই পর্যন্ত।

সজ্জন হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে বলল— মাপ করবেন, আপনাদের বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে।

ছিপছিপে চেহারা, পেন্সিলের মত গোঁফ, পাতলা নাক— প্রৌঢ়

লালা জানকীসরণ শশব্যস্ত হয়ে বললেন— আরে না, না, সত্যি বলতে আমরা খুব আনন্দিত যে তুমি পুজোআচ্চা করো। বাবু শালিগরাম, কটা ঘন গোঁফ, সাদা ধবধবে টুপি, চশমা নাকের ওপর স্বস্থানে রাখতে রাখতে দীনভাবে বললেন— হেঁ হেঁ, আরে কেন করবে না, ছেলে কোন্ বংশের? তারপর ইয়ে মানে এত বড় আর্টিস্ট— সরস্বতী বন্দনা করেই আর্টের সাধনা হয়— হেঁ হেঁ হেঁ।

জানকীসরণ ছড়ির রুপো-বাঁধানো বাঁটটায় হাতের ভর দিয়ে বললেন— আমরা খুব আনন্দিত যে আমাদের বাড়ির ছেলে দশ-জনের মধ্যে একজন হয়েছে। একদিন রাজা সায়েব নিজে এসে তোমার বিষয়ে আমাকে সব বলে গিয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই তোমার খবরাখবর জিজ্ঞেস করে থাকেন। হ্যাঁ, আজকাল আমাদের পাড়াতেও তুমি কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করেছ শুনতে পেলাম।

—হ্যাঁ, রাজামশাই আমার গুরুজন, আমার প্রতি তাঁর বিশেষ দয়াদৃষ্টি— সজ্জনের গলার স্বর কৃতজ্ঞতায় ভরা।

বাবু শালিগরাম মোসাহেবি ভঙ্গিতে দাঁত বার করে বললেন— আমরা এঁর দুই বন্ধুকে বেশ ভালোভাবেই চিনি কিন্তু এনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়ে ওঠেনি। আহা হা যেমন নাম তেমনি খুন, হেঁ হেঁ হেঁ···

বাবু জানকীসরণ নড়েচড়ে বসে, গোপন চুক্তি ফাঁস করার ভঙ্গিতে বললেন— আমি আজ একটা প্রস্তাব নিয়ে তোমার কাছে এসেছি, আমরা পরশু শালিগরামকেও রাজী করিয়েছি। আমি সকলকে বুঝিয়ে বললাম, রাজনীতি সবসময় চলতেই থাকে কিন্তু জনতা জনার্দনের জন্য সমাজ-কল্যাণের কাজ হওয়া নিতান্তই

দরকার। ইনি রাজী, এখন তোমার মতামতটা জানতে এসেছি। মহিপাল আর কর্নেলের মতামতটা পরে জেনে নেওয়া যাবে।

সজ্জন বেশ আন্দাজ করলে যে এঁরা সেই হাওয়াই পুস্তিকার টানে এখানে এসে হাজির হয়েছেন। —আমি যে-কোন ভালো সমাজ-কল্যাণের কাজের জন্য আপনাদের সঙ্গে আছি—বলুন আমায় কী করতে হবে?

শালিগরাম মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—আমরা মশাই রাজনীতির পোকা। আমরা জলসা করা আর লম্বা বক্তৃতা করতেই জানি। আপনার কাছে জানতে এসেছি যে এ ছাড়া আর কী কী করা উচিত।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি তো অনেক ঘুরেছ। লেখাপড়া করেছ, মাথা খেলিয়ে এমন কিছু উপায় আবিষ্কার করো যাতে এই নিদ্রিত জনতা জাগরিত হয়ে ওঠে। আমার মতে সেই যে নিসাতগঞ্জে পুতুলের প্রদর্শনী হয়েছিল সেইটাই আমাদের পাড়ায় আনলে কেমন হয়?

—তাতে বিশেষ কিছু লাভ হবে বলে মনে করেন? অনেকে দেখে নিয়েছে আর তাছাড়া আপনাদের পুতুল খেলার বয়েস পেরিয়ে গেছে।

—হেঁ হেঁ হেঁ আমি পরামর্শ দিয়েছিলুম যে আপনার ছবির প্রদর্শনী হওয়া উচিত, তাহলে সকলেই আর্টের প্রগতির বিষয় অনেক কিছু জানার সুযোগ পাবে।

বাবু জানকীসরণ উৎসাহের সঙ্গে বললেন—আমরা রাজা সায়েবকে দিয়ে উদ্‌ঘাটন করাব। এ মাসের কুড়ি তারিখ পর্যন্ত যদি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু খুবই ভালো হয়… হ্যাঁ, তা ভাই

সজ্জন, তুমি কিছু ছবি যদি জোগাড় করতে পারো তো ভালো, তা না হলে কেবল তোমার আঁকাই দিয়ে দিয়ো। হ্যাঁ, একটা গান্ধীজীর ছবিও চাই নিশ্চয়।

তারা দু'জনে মিলে এতক্ষণে সজ্জনের মন-মেজাজ বেশ কাবু করে ফেলেছে। একটু মুখ টিপে হেসে সজ্জন বললে— এ প্রদর্শনী আপনাদের ইলেকশনের প্রচার-প্রণালীর মধ্যে একটি নয় তো? —দু'জনে একটু থতমত খেয়ে নিজেদের সামলে নিলে। বাবু শালিগরামের মুখে চিন্তার ছায়া দেখা দিল। জানকীসরণ কাষ্ঠ-হেসে বললেন— হ্যাঁ, তা খানিকটা ঠিকই বলেছ তবে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জনতার সেবা।

নিজের এবং শহরের অন্য আর্টিস্টদের ছবি সংগ্রহ করে প্রদর্শনী করার ভার সজ্জন আনন্দে ঘাড়ে নিয়ে নিল। যেতে যেতে শালিগরাম প্রদর্শনীর হ্যাণ্ডবিলে তার এবং তার দুই বন্ধুর নাম ছাপার অনুমতি নিয়ে যেতে ভুললেন না। কন্যার কাছে গিয়ে তাকে সমস্ত কথা খুলে বলার জন্য সজ্জন মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে তাকে ভালোভাবে বোঝাতে চায় যে প্রদর্শনীর জন্য যেন সে মনে কোন ভুল ধারণা নিয়ে বসে না থাকে। বাবু শালিগরামের জালে নিজে ধরা দেবার বদলে সে তাঁকেই তার জালে জড়িয়ে ফেলবে।

ফেরার সময় লালা জানকীসরণ সজ্জনের গাড়িতে এলেন। ঘরে এসে বাসী ফুল দেখেই সজ্জনের জেঠীর কথা মনে পড়ল। জেঠী আর তাঁর বেড়ালছানারা যেন এক অদ্ভুত নাটকীয় সংঘাত, যে এত ঘৃণ্য সে কখনো করুণাময়ী হতে পারে? তাই যদি সম্ভব, তবে সে নিজের ব্যভিচারী মনকে কেন সদাচারী করতে

পারবে না। তার স্মৃতির কোঠায় কন্যার মুখ কেন বার বার ভেসে ওঠে? তার ভালো বা মন্দ লাগায় তার কী আসে যায়? মন থেকে এলোমেলো চিন্তা দূর করে দিয়ে সে একাগ্রমনে জেঠীর ছবি আঁকতে বসল।

মহাকবি বিরহেশ ধীরে ধীরে তার ঘরের দিকে আসছে দেখে সজ্জন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। মুখে কিছু না বলে সে চুপচাপ এঁকে চলল।

হেসে মহাকবি বোর বললে—আমি আগেই ভেবেছিলুম যে এ সময় আমাদের সজ্জন মশাই আর্টের সাধনায় মগ্ন আছেন নিশ্চয়··· অ্যাঁ, এটা কী ছবি?

মনে হ'ল বলে দেয়— তোমার মাথা··· কিন্তু সে মুখে কিছু না বলে তাড়াতাড়ি ব্রুশ চালাতে লাগল।

বিরহেশ বাইরের দরজায় ঠেস দিয়ে বসে পড়ল। পাশের বাড়ির বউয়ের দিকে বার বার আড় চোখে চাইতে চাইতে আর মাঝে মাঝে নিজের রচনা শোনাতে শোনাতে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিল।

ইশারায় বোঝাতে না পেরে সজ্জন তাকে সোজাসুজি বলল—বিরহেশ, এ সময় আমি একটু একা থাকতে চাই, আবার অন্য কোনদিন এলে ভালো করতে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অন্য দিন আসব, কিন্তু ভাই, তোমার এখানে এলেই নতুন প্রেরণা পাই। এখানে এসে নতুন স্ফূর্তি, নতুন চেতনা, নতুন প্রাণের সন্ধান পাই— আমি তোমাকে বিরক্ত করব না—আমি একদম মুখ বন্ধ করে বসে থাকব।

কিছুক্ষণ মহাকবি বোর চুপচাপ বসে বড়কে দেখে সময়

কাটালেন, তারপর ধীরে ধীরে শুরু হল গুন গুন গান। হঠাৎ কবির মনে চায়ের পিপাসা জেগে উঠল— চা তৈরী করব? আমার মুড আসছে, বলেই সজ্জনের উত্তরের প্রতীক্ষা না করে স্টোভ জ্বালিয়ে, জল চাপিয়ে দিয়ে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে— ভাই সজ্জন, শোনো, গালিব ঠিকই বলে গেছেন।

ইস্ক পর জোর নহী হৈ বো আতিশে গালিব—

কি লগায় না লগে আউর বুঝায় না বনে

—আঃ সত্যি বলছি এবার তুমি দেখবে আমার অমর রচনা।

সজ্জন কিছু বলছে না দেখে বোর মশাই সোজা দরজায় গাল ঠেকিয়ে বড়র দিকে তাকিয়ে গুনগুনিয়ে গান ধরলে— বাট তুমারি তকতে পেয়ারী। অঁখিয়া হারী অঁখিয়াঁ হারী। গরম গরম চা পেটে পড়ল। সজ্জনের সিগারেটের পুরো প্যাকেট ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেল। জানলা, দরজার ফাঁক সব জায়গায় দাঁড়িয়ে বিরহেশের কবি হৃদয় গান শুনিয়ে দিলে। একবার জানলায় মেয়েলী মুখ দেখেই খট করে প্রেমিক মশাই উটের মত গলা বাড়ালেন কিন্তু সেখানে নন্দর চেহারা দেখতে পেয়ে আবার বিরহের গানের রেকর্ড চালু হল।

সিঁড়ি দিয়ে ছাতে যেতে যেতে সজ্জন মহাকবির মানসিক অবস্থা এবং তার মরিয়া হয়ে গান গাওয়ার ভঙ্গি দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল। ইতিমধ্যে দরজায় কারুর পায়ের শব্দ শোনা গেল।

বিরহেশের মাথায় এক চাঁটি মেরে মহিপাল বললে— একটু পা মোড়ো তো মশাই, ভেতরে যাব। দরজা আটকে বসে সত্যাগ্রহ করছ নাকি?

—গুরু, গুরু— চট করে বিরহেশ মহিপালের হাঁটু জড়িয়ে ধরল,

লম্বা ঝাঁকড়া চুলে ঝাঁকানি দিয়ে মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতর থেকে দীনভাবে দেখে বললে— গুরু দর্শন হয়ে গেল এবার আমার সব কাজ ফতে।

পায়ের শব্দে কন্যার আগমনের আশায় একজোড়া চোখ নিরাশ হয়ে গেল। তবু বন্ধুদের দেখে সে একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

মহিপাল ক্লান্ত হয়ে ধপ করে বালিশ নিয়ে বিছানায় বসে পড়ল। বিরহেশ কৃতাঞ্জলি ভঙ্গিমায় বললে— গুরু, আজকাল নতুন গান লিখছি। সজ্জন ভদ্রতার মুখোস খুলে ফেলল, বললে— বিরহেশ, মহিপালের সঙ্গে আমার একটু দরকারী কথা আছে।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনারা কথা বলুন, আমি ছাদে চলে যাচ্ছি। আজকে গুরুর কৃপায় হয়তো আমার গান লেখা হয়ে যাবে··· আশীর্বাদ করুন গুরু মহারাজ, এ গান যেন আমার অমর গীতি হয়ে থাকে। এরপর সোজা ট্রেনে বসে বম্বে।

নাক মুখ সিঁটকে সজ্জন গলা নামিয়ে বলল— এ ব্যাটা ছিনে জোঁক, কারুর কথা কানে তোলে না, কর্নেলকে যা একটু ভয় পায়··· আরে তুমি আজ এত গম্ভীর কেন? বউদির সঙ্গে কুরুক্ষেত্র হয়েছে নাকি?

মহিপাল ঘাড় নাড়ল।

—তোমার নিশ্চয় কিছু হয়েছে, কাল কর্নেল বলছিল তোমার শালার বিয়ে হচ্ছে?

—হ্যাঁ, কাল বিয়ে হয়ে গেল, আজ বাসী বিয়ের খাওয়াদাওয়া।

একটু গম্ভীর হয়ে চিন্তা করে সজ্জন বললে— বিয়েতে কাল উপহার দিতে হয়েছে কিছু— তাই নয়?

—দিয়ে দিয়েছি।

সজ্জন সিগারেট কেস বার করে বিরক্তিতে প্রায় গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল— এই বোর···

—গুরু একটা সিগারেট এদিকে, বলতে বলতে মহাকবি আবার ঘরে ঢুকল। মহিপালের সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে হেসে বিরহেশ বললে— আমার কাজ এই গান লেখা।

—তোমার সংসার চলে কী করে? ছ'বেলা পেটের ব্যবস্থা হয় কোথা থেকে? আমি শুনেছি তুমি বিবাহিত, বাচ্চাকাচ্চাও আছে।

—বাচ্চারা সব তাদের দাদামশাইয়ের কাছে থাকে। আপনাকে দুঃখের কাহিনী আর কত শোনাব। আমার স্ত্রী এমনই অজমূখ যে তার সঙ্গে এক জায়গায় থাকলেই আমার কবিতা টবিতা সব লাটে উঠে যাবে।

—ছেলেমেয়ে কটি?

—গুরু তোমার আশীর্বাদে গুনে এই পাঁচটি। মহিপাল 'সংখ্যাটি' শুনে রাগে ফেটে পড়ল— পাঁচ পাঁচটা এণ্ডিগেণ্ডি আর তুমি বেকার বসে আছ? তোমার লজ্জা করে না? তাদের খরচা চলে কেমন করে?

বিরহেশ উত্তর না দিয়ে সিগারেটে কষে টান মারল। মহিপাল সজ্জনকে বললে— যদি বিশেষ কাজ না থাকে তাহলে তোমার বাড়িতেই চলো, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

—চলো, এখানে একজনের আসার কথা ছিল। মহিপাল কথার অর্থ বুঝে নিয়ে বললে— আসব বলে গেছে বুঝি?

বিরহেশ যেন সজ্জনের বদান্যতাকে চ্যালেঞ্জ দিলে— ভাই যাবার সময় কিন্তু ঘরের চাবিটা আমায় দিয়ে যেয়ো।

রাগে, বিরক্তিতে সজ্জন ফেটে পড়ল— এটা ধর্মশালা নয় বুঝলে?

বিরহেশ হেঁ হেঁ করার আগেই মহিপাল সজ্জনের কাঁধে হাত দিয়ে বললে— উঠে পড়া যাক। আমার মন একদম এখানে টিকছে না। রাগে হয়তো কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে দু-একটা চড়ই কষে দেব।

বিরহেশ সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ ছাদে চলে গেল। সজ্জন মনে মনেই বিড়বিড় করতে লাগল— জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলো, এলেই মন-মেজাজ খারাপ করে দিয়ে যাবে।

—তুমিই তো একে মাথায় চড়িয়েছ, মহিপাল বললে।

কথার প্রসঙ্গ বদলে সজ্জন সকালের কথাটা পাড়ল— সকালে বাবু শালিগরাম আর লালা জানকীসরণ এসেছিলেন আমার বাড়িতে। তারা পাড়ায় একটা আর্ট একজিবিশন করতে চায়।

—করতে দাও শালাদের।

—আমাদের কনভেনর করতে চান।

—না, না, আমি এসব ছোটলোকদের কোন কাজের মধ্যে থাকতে চাই না। এক বড়লোক আর এক কংগ্রেসী দু'জনেকেই বিশ্বাস নেই। সময় সুযোগ পেলেই ফোঁস করবে।

সজ্জন হেসে ফেলল— আমার মতে এসব সেই কন্যার লেখা হাওয়াই হামলার প্রতাপ, তবে আমি অনুমতি দিয়ে দিয়েছি··· সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হয়ে যাক।

—তুমি নিজেকে বড় চালাক ভাবো তাই না? দেখো, দড়ির চেয়ে কঞ্চি বড় না হয়ে যায় আবার।

—না, না, সে সবের কোন ভয় নেই আমাদের, ওদের সঙ্গে কোন গোপন রাজনৈতিক চুক্তি তো হতে যাচ্ছে না। এই সুযোগে পাড়ার সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে যাবে—এই আর কী।

—তার জন্যে অন্য পথ অনেক আছে। এদের নামের সঙ্গে নিজেদের নাম জড়িয়ে খারাপ বই ভালো হবার কিছু আশা নেই।

বিরহেশ কার্নিশে ঠেসান দিয়ে সামনের বাড়ির জানলার দিকে চেয়ে গান ধরেছে—

নহী আয়ে অব তক জো থে আনেওয়ালে।
কহাঁ ছিপ গয়ে মুঝকো তড়পানে ওয়ালে॥
অজব মোহিনী ডাল দী এয়ার তুনে।
কি মরমরকে জীতে দিল দেনে ওয়ালে॥

মহিপাল আর সজ্জন বাইরে বেরিয়ে গেল। সজ্জনের তালা বন্ধ করার আওয়াজে জানলা দিয়ে মহাকবি শ্রীমুখ বাড়িয়ে তাকালেন। তালা বন্ধ করে সজ্জনও পরে জানলার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল, প্রেমের অগ্নিতে দগ্ধ মহাকবি গদগদ কণ্ঠে একের পর এক শোনা রেকর্ডের গান গেয়ে চলেছেন।

সজ্জন তাকে নীচে নেমে আসার জন্যে হাঁক দিতেই মহিপাল বেশ রূঢ়স্বরে বলে উঠল—আচ্ছা আচ্ছা, এখন গলা কাঁপিয়ে গানের ন্যাকরা একটু বন্ধ করো। সোজা নীচে নেমে এসো দয়া করে, আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বিরহেশ কোনমতে টপ করে চাবি নিয়ে আবার যেই আনমনা হয়ে সিঁড়ি চড়তে যাবে তখুনি হয়ে গেল এক প্রলয় কাণ্ড, অন্যমনস্ক, সিঁড়ির প্রথম ধাপ থেকে দ্বিতীয় ধাপে পা দেবার

বদলে পা গিয়ে পড়বি তো পড়, পড়ল তৃতীয়টাতে, টাল সামলাতে না পেরে কবি মশাই সোজা সজ্জনের ঘাড়ে এসে পড়লেন। পিছনে মহিপাল দাঁড়িয়েছিল, সে কোনমতে দু'হাত দিয়ে দেয়াল ধরে টাল সামলে নিলে। সজ্জনের কাঁধে বেশ চোট লাগল। সরদারের বাড়ির সকলে— কী হয়েছে, কী হয়েছে? চেঁচাতে চেঁচাতে এসে দাঁড়াল। রাগে মহিপালের মাথার ঘিলু ফেটে পড়ার উপক্রম। এক হাতে বোরের চুলের মুঠি ধরে ঠাস ঠাস করে বেশ করে চড়িয়ে মহিপাল বললে— অন্ধ, চোখ-কানের মাথা খেয়েছ? মারের চোটে কবিতার ভূত ভাগিয়ে দেব জানো?

বোর মশাই গুরুর পা ধরে মিন মিন করার চেষ্টা করতেই মহিপাল তাকে জোরে এক ধাক্কা মেরে সজ্জনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।— হো হো কী মজা— মার খেয়েছে, তালি বাজিয়ে সরদারের বাচ্চারা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

বিরহেশের ওপর হাত চালিয়ে মহিপালের মন বিষণ্ণ হয়ে গেল। তার শালার বিয়ের বরযাত্রী এই শহরেই এসেছে। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সে বড় একটা যায় না কিন্তু এখানে না গেলে নয় তাই গিয়েছিল। মেয়েদের বাড়ি গিয়ে সেখানে বাসী বিয়ের কুপ্রথার বিরুদ্ধে আলোচনা করতে করতে সে হয়তো কয়েকটা কড়া কথা বলে ফেলেছিল। তার কটূক্তি শুনে উত্তেজিত হয়ে এক টিকিবাঁধা ব্রাহ্মণ খেতে খেতে তার দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃতি করে বললেন— নাস্তিক, ছ্যা, ছ্যা, সনাতন ধর্মের নিন্দে করছ? প্রথমে এক বড়লোক শেঠকে ফাঁসিয়ে বেশ কিছুদিন সংসার চালিয়ে নিলে, তারপর এখন লেডী ডাক্তার জুটিয়েছ। পয়সাই দেখলে, রামো রামো, খৃস্টানের সঙ্গে এক থালায় খায়,

লজ্জার মাথা খেয়েছে মশাই। মহিপাল রাগে ফোঁস ফোঁস করছে দেখে তাড়াতাড়ি তার শ্বশুর জামাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন।

ভোর হতেই কল্যাণী সতীনের কথা বলে বলে ফোড়ন কাটতে শুরু করে দিয়েছিল। আজ সে মনমরা হয়ে ঘুরছে। মানসিক শান্তির বদলে দেখা দিলেন মহাকবি বিরহেশ, উফ্, তার মাথার শির যেন ছিঁড়ে যাবে মনে হচ্ছে।

সজ্জন তাকে বোঝালে— রাগ সামলাবার চেষ্টা করতে শেখো মহিপাল।

—আরে, ধুৎ, জীবনে বীতরাগ হয়ে পড়েছি।

দু'জনে চুপচাপ গলি পেরিয়ে এগিয়ে গেল।

সতেরো

মহিপাল আর তার দুই দিদি এবং ছোট ভাই ছেলেবেলা থেকে মামার বাড়িতেই মানুষ হয়েছে। তার দাদামশাই বনেদি বংশের জমিদার, আর বাবা ছিলেন জেলা হাইস্কুলের হেডমাস্টার। বাবা স্পষ্টবক্তা, চরিত্রবান এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। মহিপালের মাঠাকরুনের স্বভাব ছিল ঠিক তার বিপরীত। বড় ঘরের মেয়ে, বাবা আর বড় ভাইয়ের অতি আদরে লালিতা পালিতা কন্যা হিসেবে তাঁর স্বভাবে অনেক দোষ ছিল। তিনি

বেশীর ভাগই বাপের বাড়িতে পড়ে থাকতেন, তাঁর দাপটের সামনে মামা মামী সকলেই হার মানতেন। বাপের বাড়িতে ছিল তাঁর একছত্র রাজত্ব। অন্দরমহলের কুটনীতির মারপ্যাঁচে তাঁর বেশ হাতযশ ছিল তাই তাঁকে কেউ বড় একটা সুনজরে দেখত না।

মহিপালের দুই দিদির বিয়ে বেশ ভালো ঘরে মামারাই ঠিক করেছিলেন। তাঁদের বাড়ি থেকেই বিয়ে হওয়ার দরুন নিজেদের যোগ্য মর্যাদানুযায়ী ধুমধাম খরচপত্তর বেশ ভালোই করেছিলেন। মহিপালের বিয়েও বেশ বড় ঘরেই হয়েছিল কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পরেই তার ভাগ্যচক্রের গতি পালটে গেল। বাবা মারা গেলেন, এক বছরের মাথায় বড় মামাও স্বর্গে গেলেন। তার মার কপালেও ভাঙন ধরল— বড় মামার মৃত্যুর সঙ্গেই নিমেষে সংসারের ভোল পালটে গেল। যে সংসারে একদিন তিনি কর্তৃস্থানীয়া হয়ে রাজত্ব করছিলেন, সেখানে এখন তিনি চোখের জলে বুক ভাসাতে লাগলেন। বাড়ির লোকেরা যারা তাঁকে মনে মনে ঘেন্না করত অথচ মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস পায়নি, তারা একজোট হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াল। লজ্জায় আত্মগ্লানিতে কারুকে মুখ দেখাতে না পেরে একদিন মা ঘরের কোণে গলায় দড়ি দিয়ে সব দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন।

মা যাবার পর মহিপাল, তার স্ত্রী এবং ছোট ভাই জয়পালের পক্ষে সে সংসারে থাকা দুষ্কর হয়ে উঠল। মামীরা ননদের সন্তানদের সে বাড়িতে থাকা দায় করে তুলল। সে সময় মহিপাল ইণ্টারের ছাত্র আর ছোট ভাই জয়পাল ক্লাস নাইনে পড়ত।

মহিপাল ছোটবেলা থেকেই সাহিত্যের অনুরাগী। মাকে সে মান-সম্ভ্রম আর শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে কিন্তু বাবাকে সে সত্যি

ভক্তি করত, ভালোবাসত। বাবার কথা ভাবলেই তার সংবেদনশীল বুকটা টনটন করে উঠত। ছোটবেলায় তার মনে হত সে ছুটে চলে যাবে বাবার কাছে, তার কোলে উঠে বসবে, কিন্তু মার জেদের সামনে হার মেনে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। বাবা শান্তশিষ্ট, গম্ভীর বিদ্বান পুরুষ ছিলেন। তাঁর লেখা কবিতার সংগ্রহ সে নিজের বইয়ের আলমারীতে যত্নের সঙ্গে রেখে দিয়েছে। ইতিহাস সমাজশাস্ত্র এবং শিক্ষার বিষয়ে তাঁর সারগর্ভ রচনা দেশের বড় বড় নামী পত্রিকাতে বিশেষ স্থান পেয়েছে। ছোটবেলা থেকেই বাবার মত নামী লেখক হবার আশা তার মনে জেগে উঠেছিল। বাবাই ছিলেন তার আদর্শের প্রতীক, গাইডলাইট। তার মামারা যখন খাজনা আদায় করার জন্য নিরীহ চাষীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার, জোর জুলুম চালাতেন, তখন তার ভাবুক বিদ্রোহী মন সমকালীন সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি ঘেন্নায় ভরে উঠত। তার মামারা কেন এই কঠোর পরিশ্রমী গ্রামবাসীদের ওপর অত্যাচারের হাত ওঠাতে দ্বিধা বোধ করে না— এই ধরনের নানা এলোমেলো প্রশ্ন তার মনে প্রায়ই জেগে উঠত। চাষীদের পিঠে সপাং সপাং বেতের প্রহার, উলটো করে গাছে টাঙিয়ে নীচে ধুনি জ্বালিয়ে ধোঁয়া দেওয়া, বিনা পয়সায় ব্যাগার খাটিয়ে নিয়ে ক্ষিদেয় মারা, বাড়িঘরদোর লুটপাট করানো ইত্যাদি নানা অমানুষিক অত্যাচার দেখে দেখে তার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠত। তার চোখের সামনে তার তিন মামা মিলে কতবার গাঁয়ের যুবতী মেয়েদের বেইজ্জতি করেছে। কথায় বলে স্বভাব না যায় মলে, সেই অবস্থা তার প্রৌঢ় মেজু মামার। বুড়ো বয়সেও তিনি কুমারী মেয়েদের

সর্বনাশ করে পৈশাচিক আনন্দ পেতেন। তাঁর মেয়ের বয়সী ছোট ছোট মেয়েদের তাঁর দৈহিক কামনা মেটানোর সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করার সময়, হয়তো তিনি কোনদিনই তাঁর বিবেকের দংশন অনুভব করেন নি।

বছরে দু'বার, পুজো ও গ্রীষ্ম-অবকাশের সময় সে চলে যেত বাবার কাছে। সবুজ মাঠে বড় বড় গাছের ছায়ায় লুকোচুরি খেলতে তার বড় ভালো লাগত, তাই মামার বাড়ি ফিরে এসে সে ছটফট করে উঠত, পিঞ্জরে আটকানো পাখির মত তার দম বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হত। জমিদারিতে দিনরাত কেবল মদ, সিদ্ধি, গাঁজা, মারপিট, অত্যাচার, ব্যভিচার, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি পঙ্কিলতা দেখে দেখে তার মন উত্তেজিত হয়ে উঠত। তার বিদ্রোহী মন অব্যক্ত বেদনায় মুখ ফুটে কিছু প্রতিবাদ না করতে পারায় এক নতুন পথের সন্ধান পেল। জীবনের সেই সন্ধিক্ষণে মূক মানুষের ভাষা হয়ে সাহিত্য তার জীবনে এল। প্রথমে কয়েকটি ছোট ছোট কবিতা রচনা করার পর সে গল্প লেখা আরম্ভ করলে। বাবার ডায়ারি লেখা অভ্যাস ছিল, সেই দেখে সেও তার ডায়ারি লেখা আরম্ভ করল। জীবনের অভিজ্ঞতা ডায়ারির পাতায় বাঁধা পড়ে জোগাতে লাগল তার ভাবপ্রবণ মনের খোরাক। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার আগে পর্যন্ত তার লেখা গল্প— 'চাঁদ' আর 'সুধা'র মত পত্রিকায় স্থান পেয়েছিল।

মা গত হবার পর মামার বাড়িতে সে অপমানিত বোধ করতে লাগল। হঠাৎ একদিন সংসারে জোর ঝগড়াঝাঁটি হতেই সে পরীক্ষার ফল বেরুবার প্রতীক্ষা না করেই, নিজের বালিকাবধূকে নিয়ে জীবিকা উপার্জনের সন্ধানে লক্ষ্ণৌ চলে এল।

তখন 1930, আন্দোলন চলছে, নিঝুম দেশে সাড়া জেগে উঠেছে। 'সুধা' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে চল্লিশ টাকা মাস মাইনায় সে কাজ আরম্ভ করল। হিন্দী জগতের বড় বড় নামকরা সাহিত্যিক ও কবি মুন্সী প্রেমচন্দ, নিরালা, সুমিত্রানন্দ পন্ত, রূপনারায়ণ পাণ্ডে, কৃষ্ণবিহারী মিশ্র, এঁদের দর্শন করে সে নিজেকে ধন্য মনে করল। সাহিত্য সৃষ্টির পথে সে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। কবি নিরালার সঙ্গে পরিচয় তার জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করলে। মাস মাইনের গণ্ডিতে বাঁধা চাকরিতে আত্মপ্রকাশের পথ বন্ধ, তবু আর্থিক অনটনের জাঁতায় পেষা সাহিত্যিক সেই গণ্ডির মধ্যেই অসহায় হয়ে পড়ে ছিল। তিন মাস পরে মহিপাল তার গর্ভবতী স্ত্রী আর ভাইকে নিয়ে অমীনাবাদে এই ছোট ভাড়াটে বাড়িতে চলে এল। তখন তার হাতে স্ত্রীর গয়না ছাড়া আর কোন সম্বল নেই।

মামার বাড়ি থেকে সে ভগবান ভরসায় বেরিয়ে পড়েছিল। ছোট ভাইকে সে আবার স্কুলে ভর্তি করিয়ে তাকে উচ্চশিক্ষার আশ্বাস দিলে। মহিপাল নিজে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে লাগল। 'সুধা' পত্রিকার চাকরির সঙ্গেই সে ইতিহাস এবং অন্য স্কুলের কোর্সের বই, প্রকাশনের জন্য লেখা আর অনুবাদ করা আরম্ভ করল। কপিরাইট বিক্রি করে আর মাসে দু-একটা গল্প লিখে সে প্রায় একশো টাকা উপরি রোজগার করতে লাগল।

তখন দিনকাল মন্দ ছিল না। পত্রিকার সংখ্যা ছিল গোনা-গুনতি আর নামকরা সাহিত্যিকেরা উঠতি সাহিত্যিকদের সাহায্য করায় পেছ-পা হতেন না।

মহিপালের রচনায় ছিল সঞ্জীবনী শক্তি আর বুকে ছিল এগিয়ে

চলার অদম্য সাহস আর আশা। তার ভক্ত পাঠক এক যুবকের সঙ্গে তার পরিচয় ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হল। যুবকের নাম রূপরতন, তার বাবা শেঠ ভজগোবিন্দ দাসের শহরে লেনদেনের কাজ। রূপরতন নিজে এক কাপড়ের কলের মালিক, তাছাড়া বদ্যিদের মাসমাইনেতে রেখে নানারকম আয়ুর্বেদের ওষুধ তৈরী করিয়ে বাজারে বিক্রি করেন। বড় বড় নেতাদের ওষুধের কারখানা দেখিয়ে সার্টিফিকেট লিখিয়ে নেওয়াতে তিনি একেবারে ওস্তাদ। এটা থেকে তাঁর বেশ মোটা মাসিক আয় হয়। রূপরতন কংগ্রেসের সহৃদয় যুবক নেতা, পার্টির কোষাধ্যক্ষ, আবার ভাগে বিলিতী মদের দোকানও চালান। ব্যবসায়ী রূপরতন মিষ্টভাষী, কথাবার্তায় তুখোর আর নবযুবকদের পথপ্রদর্শক একজন সমাজবাদী নেতা।

মহিপালের সঙ্গে রূপরতনের আলাপ হয় জিমখানা ক্লাবে। মহিপালের দূর সম্পর্কের মামাতো ভাইয়ের বিশেষ বন্ধু এবং দু'জনে এক সঙ্গে লক্ষ্ণৌ ইউনিভারসিটিতে পড়তেন। মহিপালের চালচলনে বেশ বড়লোকী ভাব আছে তাই ক্লাবে গিয়ে সে সহজেই সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব জমিয়ে নিতে পারে। লক্ষ্ণৌ এসে পুরোনো শখ মেটাতে আর সংসারের খরচের কথা ভেবে সে খাদি পরতে আরম্ভ করেছিল। পয়সার অভাব ঢাকার এই উপায় হয়তো সবচেয়ে ভালো। ধীরে ধীরে রূপরতন আর মহিপাল এক গেলাসের ইয়ার হয়ে গেল, তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হল। রূপরতনের খবরের কাগজ বের করার প্রস্তাবে মহিপাল আনন্দে উল্লসিত হয়ে সায় দিলে। রূপরতনের বাবার কাছে এক দেনাদারের প্রেস বন্ধক পড়ে ছিল। রূপরতন তাড়াতাড়ি দেনার টাকা বাবাকে

চুকিয়ে দিয়ে বাকী কানুনী মারপ্যাঁচ সোজা করিয়ে প্রেসের মালিক হয়ে বসলেন।

সাপ্তাহিক 'নবচেতনা' প্রকাশিত হল। মহিপাল সম্পাদক হিসেবে কাজ করতে লাগল। তার রচনার জন্য কাগজ তিনবার মামলার ঝামেলায় ফেঁসে গেল বটে, কিন্তু অন্যদিকে গ্রাহক সংখ্যা চার গুণ বেড়ে গেল। পরে রূপরতন সম্পাদক মশাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এ বিষয়ে রাজী করিয়ে নিলেন, রচনার দৃষ্টিকোণ প্রকাশনের বাঁধাধরা নিয়মের সীমা যেন অতিক্রম না করে। 'নবচেতনা' অফিসে প্রগতিশীল যুবকদের আড্ডা হতে লাগল। সাপ্তাহিক হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

রূপরতন এই প্রেসকে সমাজবাদের প্রতীক হিসেবে খুলেছিলেন, অতএব ছোট থেকে বড় সব কর্মচারীকেই সেই মন্ত্রে দীক্ষিত করে তাদের দিয়ে বেগার খাটিয়ে নিতেন।

মহিপালের জীবনযাত্রা বেশ কাটতে লাগল। মাসে পাঁচশো বেতন অথচ হাতে আসে মাত্র দুশো, বাকীটা ত্যাগ ও তপস্যার হিসেবের খাতায় কেটেকুটে ব্যালেন্স সাফ। রূপরতনের চালাকি মহিপাল একদম বুঝতে পারত না। মহিপালের সমাজবাদের প্রতীক প্রেসের জন্য ত্যাগ দেখে বাকী সব কর্মচারীরা ত্যাগ ও তপস্যার মালা জপতে বাধ্য হল। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে ঘুরে মহিপাল রচনার পর রচনা লিখে যেতে লাগল। গ্রামের চাষীদের দুঃখের করুণ গাথা, কলকারখানার মজুরদের জীবনের সংঘর্ষ তার লেখনীতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। রূপরতন তাঁর নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য বড় বড় ব্যবসাদার, শিল্পপতির বিরুদ্ধে মালমশলা মহিপালকে জুগিয়ে যেতেন। তার রচনায় ছিল শোষিতের জীবন-

স্রোতের গভীর প্রবাহ, ঢেউয়ে ঢেউয়ে নানা জটিলতা, প্রতিটি বাঁকে দুঃখের অনুভূতিতে জড়ানো রক্তের মত সহজাত অথচ রহস্যময় চিত্রকল্পের সজীব রূপ। জয়পাল ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাস করে ডাক্তারিতে ভর্তি হল। স্ত্রীর সঙ্গে চিন্তাধারা বিনিময় না হওয়ায় তার মিল হতে গিয়েও হত না, তাই সংসারে অশান্তি লেগেই থাকত। মহিপাল কিন্তু পথভ্রষ্ট হয়ে একেবারেই চরিত্রহীন হয়নি, রূপরতনের কামিনী আর সুরার মধ্যে সে কেবল দ্বিতীয়টিকেই বরণ করেছিল।

1936 সালের ইলেকশনে 'নবচেতনা' পুরোদমে আখড়ায় নেবে পড়ল। রূপরতন কংগ্রেস টিকিটে এম. এল. এ. হলেন। রাজনীতির নতুন খোলস পরে তিনি তাঁর সাপ্তাহিকের নীতি সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্ধারিত করার প্রস্তাব আনলেন। অফিসের ছোট ছোট কথায় টীকা-টিপ্পনি আরম্ভ করলেন। ত্যাগের নামে সমস্ত প্রেস-কর্মচারীদের দু' বছরের বেশী মাইনে সমাজবাদী নেতার উদরস্থ হল। এতদিনে রূপরতনের চালাকি প্রেসের সকলেই ধরে ফেলেছিল কিন্তু মহিপালের ভদ্রতা, স্পষ্টবাদিতা আর ত্যাগে মুগ্ধ হয়ে তারা এতদিন মুখ খোলেনি। এবার সকলেই রূপরতনের পলিসি খোলাখুলিভাবে জানতে চাইলে। বেগতিক বুঝে এবার তিনি স্পষ্ট ভাষায় 'না' বলে দিয়ে এতদিনের নাটকের পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিতে বাধ্য হলেন।

মহিপাল হঠাৎ আকাশ থেকে পড়ল। সে রিজাইন দিলে। রূপরতন তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে অনেক প্রলোভন দেখালেন, কিন্তু মহিপালের মন কোন কথাতেই টলল না। অন্য কর্মচারীদের পক্ষ সমর্থন না করে কেবল নিজের

স্বার্থকে সর্বোপরি রাখায় সে কিছুতেই সায় দিতে পারল না। হরতাল, হৈচৈ আরম্ভ হতেই রূপরতন পুলিসের হুমকি দেখালে, অনেকে ধরা পড়ল কিন্তু মহিপাল ধরা দিল না। মামলাটা চেপে যাওয়ার কিছুদিন পরেই রূপরতন তার সঙ্গে সব সম্পর্ক চিরদিনের মত ছিন্ন করে দিলেন। তার তাসের প্রাসাদ নিমেষে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

পণপ্রথার বিরুদ্ধে নিজের যুক্তির সমর্থনে মহিপাল তার ভাইয়ের বিয়েতে এক পয়সা পণ নিলে না। ডাক্তার জয়পালের স্ত্রী রূপবতী এবং গুণবতী। ডাক্তারী পাস করার পর সে ভাইকে উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত যাওয়ার পরামর্শ দিলে। ভাগ্যের বিড়ম্বনা একেই বলে, যখন বিলেত যাওয়ার সুযোগ এল তখন সে কপর্দকহীন। ভাগ্যের কাছে মহিপাল হার মানতে রাজী নয়, বউয়ের গায়ের গয়না বেচে, তাকে নিরাভরণ করে, ভাইকে বিলেত পাঠিয়ে দিলে। কথায় বলে যখন দুঃসময় আসে তখন একা আসে না, তাই তার এই দুঃখের কূলকিনারা হবার আগেই মেজদিদি হঠাৎ বিধবা হলেন। মাথায় বজ্রপাত হল, মেয়ে শকুন্তলাকে নিয়ে সে তার আশ্রয়েই ফিরে এল। এতজন প্রাণীর ভরণপোষণের ভার তার একার মাথায় এসে পড়ল। দিনরাত কঠিন পরিশ্রম করেও মাসে দেড় পৌনে দু'শোর বেশী উপার্জন করতে সে সক্ষম হল না।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে গেছে, সব ব্যবসা কেঁপে উঠেছে। চারিদিকে কালোবাজারীর বাজার গরম। যুদ্ধ মহিপালের জীবনে আরো বিপর্যয়ের সৃষ্টি করল। একদিকে বাজারদর হু হু করে বেড়ে গেল, আর অন্যদিকে সংসার প্রায় অচল হয়ে পড়ল। ঐ দুঃসময়ে

জয়পাল সুদূর বিলেতে থাকায় তার মন সব সময়ই আকুলিবিকুলি করতে লাগল। 1941 সালে জয়পাল বিলেত থেকে পাস করে ফিরল। ভাইকে কাছে পেয়ে মহিপালের ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। ভাইয়ের পসার জমানোর অভিপ্রায় নিয়ে আবার সে লজ্জার মাথা খেয়ে রূপরতনের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। নেতার প্রভাবে জয়পাল মেডিকেল কলেজে চাকরি পেল। এতদিন পরে মহিপাল একটু নিঃশ্বাস ফেললে; কিন্তু হায় রে বিধির বিধান! দুই জায়ে অবনিবনার সূত্রপাত হতেই জয়পাল যেন অন্য মানুষই হয়ে গেল।

1942 আন্দোলনে মহিপালের জেল হল, তার এই কঠিন সময়ে জয়পাল তার পরিবারকে নিরাশ্রিত একা ছেড়ে চুপচাপ আলাদা হয়ে গেল। দু'বছর জেলে রোগ ভোগ করার পর যখন সে ফিরে এল, দেখতে পেল তার এতদিনের গড়া তাসের ঘর ছত্রভঙ্গ হয়ে আছে। টাকাপয়সা উপার্জনের প্রতিযোগিতায় তাকে সকলেই পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। লোকেদের ব্যাঙ্কে টাকা রাখার জায়গা নেই। তার আশেপাশের কত পোড়ো জমিতে সুন্দর অট্টালিকা তৈরী হয়েছে। পাড়ার একটি হাড়গিলে ছেলে আজ রেশন ইন্সপেক্টর হয়ে বেশ নাদুসনুদুস হয়ে ঘুরছে। ছোট ভাইয়ের আজ বাড়ি গাড়ি সবই আছে। জেল থেকে ফেরার ক'দিন পরে জয়পাল এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু' মিনিট দেখা করে সেই যে গেছে, দ্বিতীয়বার দাদার মরা-বাঁচার খোঁজখবর পর্যন্ত করতে আসেনি। জয়পাল বাইরে লোকেদের কাছে বলে বেড়াচ্ছে দাদা আমার জন্যে কী করেছেন? যদি আমার বিয়েতে দস্তুরমত পণ নিতেন, তাহলে আমার বিলেতে যাওয়ার খরচা তাঁর ঘাড়ে

পড়ত না। তিনি যদি পাগলের মত তাঁর আদর্শের জন্য সবকিছু ত্যাগ করেন, তাহলে এতে আমার করার কিছুই নেই।

বন্ধু রূপরতন, নিজের মায়ের পেটের ভাই, সকলের কাছ থেকে আশার বিপরীত ব্যবহার পেয়ে মহিপালের মাথা ঘুরে গেল। যুদ্ধের সময় এবং পরেও অনটনে সে একেবারেই ভেঙে পড়ে মেজাজী অস্থির স্বভাবের হয়েছে। কর্নেল আর সজ্জনের মত অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে হাত পাততেও তার আত্মসম্মানে বাধে। ডাক্তার শীলার বন্ধুত্বের সঙ্গে সে সমানে প্রতিযোগিতা করার চেষ্টাই করে চলেছে। কর্নেল, সজ্জন, শীলা সকলেই জানে, যে দৈনন্দিন জীবনের অভাব অনটন, দুঃখ, মানসিক উদ্বেগে, অন্তর্দ্বন্দ্বের জটিলতায় উজ্জ্বল প্রদীপটি আজ অন্ধকারে নিবু নিবু হয়ে আছে। তাই তারা সর্বদাই তার আত্মমর্যাদা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করে।

সভায় বসে এহেন লোকের আত্মমর্যাদাকে ঘা দেবার চেষ্টা করা, সে যে পয়সাওয়ালা শেঠ আর মালদার ডাঃ শীলার মাল লুটেপুটে নিচ্ছে এ কথা বলাটাই তার প্রতি অন্যায় করা। মহিপাল তার দুর্নাম শুনে প্রায় পাগল হতে বসেছে।

গলিতে মহিপাল আর সজ্জন পাশাপাশি চুপচাপ অন্যমনস্ক হয়ে হেঁটে চলল। মহিপালের বিষণ্ণ মলিন মুখের দিকে তাকিয়ে সজ্জন বললে— কী হয়েছে? বলো-না ভাই··· তোমাকে আজ অন্যদিনের চেয়ে বেশী আপসেট দেখাচ্ছে, আমি জানি তুমি আমার দেওয়া সাহায্য হাত পেতে নিতে পারবে না··· বাড়িতে খরচায় টানাটানি না?

মহিপাল তার কাঁধে হাত রেখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে উত্তর

দিল—আপদে বিপদে তোমাদের কাছে আসব না তো যাব কোথায়? পৃথিবীতে আমার আর আছেই বা কে?

গলি সরগরম, বাজারে সব রকম নতুন পুরোনো আলোচনা রসিয়ে রসিয়ে ফেনানো হচ্ছে। হাওয়াই প্রচার-পুস্তিকা থেকে আরম্ভ করে শাকসব্জির বাজার দর, কোন কিছুর আলোচনাই বাকী থাকছে না। এক জায়গায় আধভাঙা রোয়াকে বসে জটলা হচ্ছে—ধর্ম থেকে আরম্ভ করে ইলেকশনের প্রচার-প্রণালীর সমালোচনা শুনতে শুনতে মহিপাল রাগে ক্ষেপে উঠে বললে—আমার হাতে যদি দু'দিনের জন্যেও শাসনদণ্ড আসে, তাহলে এই ধর্মের অবতারদের সোজা চৌমাথায় দাঁড় করিয়ে জুতোপেটা করিয়ে দি··· যত সব পাজির দল।

সজ্জন হাসল—আরে যেতে দাও ভাই, এরা আবার তোমার পাকা ধানে কবে মই লাগাতে গেল?

—কেবল আমার একার কথা হচ্ছে না, এরা সম্পূর্ণ মানবতার অকল্যাণ করতে বদ্ধপরিকর। পঙ্কিল আচার-বিচারের কুলজি নিয়ে এরা সমাজ আর সংস্কৃতির শত্রু হয়ে দিনরাত ঘুরছে।

—তোমার শালার বিয়েতে চিরাচরিত প্রথার পালন দেখে মাথায় রক্ত উঠে গেছে নাকি? তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা, মানে বরপক্ষ থেকেই সব প্রথা পালনের নির্দেশ ছিল নিশ্চয়, নয় কি?

হাঁটতে হাঁটতে মহিপাল বললে—ব্রাহ্মণরা বলে তারাই সমাজের বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিত্ব করে অথচ বাস্তবে দেখতে পাবে যে এদের চেয়ে নীচ, দাম্ভিক, মূর্খ হয়তো জংলীদের মধ্যেও নেই। আমার ওপর ·· দোষারোপ করতে সাহস করে, যে আমি

শীলার পয়সায় মজা মারছি? রূপরতনের কত মাল লুটেপুটে নিজের ঘরে রেখেছি··· উফ্ আর ভাবতে পারছি না।

কটু সত্য শ্রুতিমধুর হয় না। মহিপাল যদি এসময় রাস্তায় না থাকত তাহলে নিশ্চয় সজ্জনের ঠাট্টাকে শ্লেষ ভেবে রাগে চেঁচিয়ে উঠত। সে বিরক্ত হয়ে বললে— এই আহাম্মক হাড় হাবাতের দল নীচ, নোংরামিতে ভরা, এঁরা সনাতন ধর্মের ব্যাখ্যা করতে আসে কোন্ মুখে? আমার মিথ্যে দুর্নাম রটাবার চেষ্টা? আমার যদি সেই স্বভাব হত তাহলে আজ মহিপাল শুক্লা লক্ষপতি হয়ে মসনদে বসে থাকত। গরীব লেখক হয়ে চটি টানতে টানতে হাঁটত না।

—আরে তুমি ক্ষেপে গেলে নাকি? কেন রাগ করছ? পৃথিবীর নিয়মই এই, যদি কেউ কারুকে একটু এগুতে দেখে, অমনি তাকে ল্যাং মেরে চিৎ করার চেষ্টা করে। এদের একবার দেখিয়ে দাও যে তুমি সংকটে যুঝতে জানো, তুমি হার মানার পাত্র নয়।

মহিপালের রাগ ঠাণ্ডা হয়ে এল। গম্ভীর ভাবে হাঁটতে হাঁটতে বার বার কবি নিরালার লেখা একটি কবিতার লাইন তার মনে আসছিল, সত্যি জীবনের চলার পথে ক্লান্ত পথিক কবির বাণীতে পায় এক বিচিত্র শান্তি। লোক-লৌকিকতার মোড়কে বাঁধা মনের রাহুমুক্তি ঘটে।

লড়না বিরোধ সে দ্বন্দ্ব সমর,
রহ সত্য মার্গ স্থির নির্ভর···

আঠারো

বনকন্যা আজ এখনো এলো না। তার থাকার ঠিকমত ব্যবস্থা হল কিনা কে জানে। একবার ছুটে গিয়ে তাকে দেখে আসার তীব্র ইচ্ছা জেগে উঠল সজ্জনের মনে— হ্যাঁ, একবারটি গেলে হয়, বিপদের সময় তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সাহায্য করা উচিত— না, না, সে তার আত্মমর্যাদায় ঘা দিতে চায় না— ও বাবাঃ যা অভিমানী মেয়ে।

সজ্জন গাড়ি নিয়ে সেই বস্তির দিকে গেল, যেখানে কন্যা ঘর ভাড়া করেছিল। আশেপাশের লোকেরা তাকে জানাল যে কাল রাত্তিরে জিনিসপত্তর গাড়িতে তুলে নিয়ে সে ঘর খালি করে চলে গেছে। অচেনা অজানা গাড়ির মালিকের প্রতি সজ্জনের মনে ঈর্ষার সঞ্চার হল কিন্তু পরমুহূর্তে ব্রহ্মচর্য পালনের প্রতিজ্ঞা মনে পড়তেই সে সংযত হল। দূর ছাই, যেখানেই যাক আর যার সঙ্গেই যাক আমার মাথা ব্যথা কিসের? নতুন ব্রহ্মচারী তার অস্থির মনকে সাত-পাঁচ বোঝাবার চেষ্টা করছে বটে কিন্তু মন কন্যার কাছে যাবার জন্য ছটফট করছে।

ফিরে এসে সে সোজা কর্নেলের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল। মহিপাল আগে থেকেই বসে ছিল। কর্নেলের মন-মেজাজ গরম, কেননা একটু আগে মহিপাল সজ্জন-শালিগরাম

চুক্তির খবর তাকে দিয়েছে। সজ্জনকে ঢুকতে দেখেই কর্নেল রাগে ফেটে পড়ল— তুমি কাকে জিজ্ঞেস করে এসব গোলমালের মধ্যে পড়তে গেলে শুনি? আমার পরিশ্রম পণ্ড করে দিতে চাও, তাই না?

সজ্জন তার ভুল বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করল। একবার যখন সে হ্যাঁ বলে দিয়েছে তখন তার দৃঢ় হয়ে থাকাই উচিত। বিশেষ করে মহিপালের সামনে সে কিছুতেই নিজের ভুল স্বীকার করে ছোট হতে চায় না। সে রুক্ষভাবে উত্তর দিল— তুমি যদি এর মধ্যে না পড়তে চাও, এসো না, বাস্ খালাস, আমি যা করেছি ঠিক করেছি। বেশ ভেবেচিন্তেই করেছি।

—ঠিক করেছ মাথা আর মুণ্ডু। তুমি এ ফাঁদের মধ্যে কেন পা দিতে গেলে? সকাল সকাল শালিগরাম আর জানকীসরণ ঘুঘুর মত তোমার বাড়ি গিয়ে হাজির হল আর ওমনি তাদের মুখ দেখেই তুমি গলে গেলে? এটা তোমার মাথায় ঢুকল না যে বিন্নোর ব্যাপার যেটা এখন চলছে, তার পরিণাম কী হবে?

'বিন্নো' নামটা তার কানে বাজল। পরক্ষণেই সে বুঝতে পারল যে কর্নেল আদর করে কন্যার ডাকনাম 'বিন্নো' রেখেছে। এই নতুন ডাকনাম শুনেই কন্যাকে নিয়ে আবার চিন্তা শুরু হল। কন্যা এখন কোথায়? নিজের ভুলের জন্য সত্যিই সে দুঃখিত। সকালে তাদের প্ল্যান সমর্থন করার সময় কন্যার কথা যে তার একেবারে মনে আসেনি তা নয় কিন্তু তবু যে সে কেন আহাম্মকের মত হ্যাঁ বলে ফেলল। ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্য, সে পাগল হয়ে যায়নি তো? তার মাথা ঠিক আছে তো? যতই সে এ বিষয় ভাবতে

চাইছে ততই যেন যন্ত্রণায় তার মাথা ফেটে যাবে মনে হচ্ছে—তার মনের স্থৈর্য কোথায় গেল? রাগে উত্তেজিত হয়ে কর্নেলকে সে বিজ্ঞের মত উত্তর দিলে— আমি এ বিষয় অনেক ভেবেছি, নিজের পরম শত্রুকেও যে মিত্র ভেবে হাত মেলাতে পারে, সেই মানুষের মত মানুষ। এই আমাদের দেশের সভ্যতা। আমরা আমাদের কন্যার কেসও লড়ে যাব আর প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করব। তোমাদের মন বড়ই ছোট— সংকীর্ণ মন নিয়ে ভাবা একজন আর্টিস্টের ধাতে সয় না বুঝেছ?

—সাবাস, আমার সঙ্গদোষে বুলি কপচাতে শিখে গেছ দেখছি—মহিপাল গম্ভীরভাবে বললে— তোমার স্বরে যদি একটুও খাঁটি কথার আওয়াজ পেতাম তাহলে সত্যি বলছি ভাই, এই এখানে এখুনি তোমায় ঢিপ করে প্রণাম করে ফেলতাম।

লজ্জায় রাগে সজ্জন থরথর করে কেঁপে উঠল। তার মনের ভাব মুখে ফুটে উঠবে, ঠিক এমনি সময় দরজার চিক থেকে সে দেখতে পেল, বনকন্যা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছে। সজ্জন আরাম-চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে চিক উঠিয়ে বললে—তুমি এখানে? আমি তোমাকে ওখানে দেখতে গিয়েছিলুম।

কন্যা ঠোঁট কামড়ে মুখটিপে হাসল। মহিপাল তাড়াতাড়ি কন্যাকে নমস্কার করে উঠে দাঁড়াল। কর্নেল চেয়ারে বসে বসেই হেসে বললে— তোমাকে এখানে দেখে আর্টিস্ট মশাইয়ের মাথা ঘুরে গেছে। আজ খুব কাজ করে এসেছেন নবাব পুত্তুর, আবার আমাদের শোনাতে এখান পর্যন্ত কষ্ট করে এসেছেন।

ঘরের কোণের চেয়ার টেনে বসতে বসতে কন্যা সজ্জনের দিকে চেয়ে বললে— কর্নেলদা আমাকে এইখানে ওপরে থাকার অনুমতি

দিয়েছেন। কাল ইনি জেদ করে গাড়ি নিয়ে গিয়ে আমার জিনিস-পত্তর তুলে এনে এখানে সব ঠিকঠাক করে দিয়েছেন।

কর্নেল হেসে মহিপালের দিকে তাকিয়ে বললে—প্রথমে খুব মুখ চালালে। কম্যুনিস্টরা বাক্‌পটু হয় তো? আমি সোজাসুজি বলে দিলাম—আগে জিনিসপত্তর নিয়ে এসো তারপর যত ইচ্ছে পটপটানি কোরো—আমার এ হুকুম তোমাকে মানতেই হবে—আমি তোমার দাদা নই? শালিগরাম ব্যাটা আর এর বাবা দু'জনেই হাতে কামড়াচ্ছে। বিশ্বাস নেই, যে-কোন সময় কিছু করতে পারে। এদের চক্করে পড়ে ওর পিষে মরার জোগাড়।

—বেশ করেছ, তোমার ওপরের ঘর তো খালিই পড়ে আছে।

—হ্যাঁ, সস্তা কাঠের এই বাক্সপেঁটরা সব পড়ে আছে। আজ সকালে পেছনে আস্তাবলে রাখিয়ে দিয়েছি। বিন্নোর জন্মে ওপরে একখানা ঘর, বাথরুম সব-কিছুর ব্যবস্থা আছে।

তার সঙ্গে থাকলে লোকে দুর্নাম রটাত? এখানে বেশ চুপচাপ সুড়সুড় করে থাকতে চলে এল, মুখে রা নেই। আশ্চর্য, কর্নেলের বাড়িতে থাকলে লোকে মুখে আঙুল রেখে চুপ করে থাকবে? তবে তার প্রতি কন্যার মনে এ অবিশ্বাস কেন? সজ্জনের মনে ঝড় বয়ে গেল। শালিগরামের সঙ্গে চুক্তির কথা নিশ্চয় এরা বলবে। তার মনে সকলের প্রতি বীতরাগে ভরে উঠল। ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাবার কথা যে মনে এল না তা নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই যেন তার হাত-পা অবশ হয়ে গেল, সে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল।

—বিন্নো বাইরে বেরোচ্ছ না কি?

—হ্যাঁ, এই যাব আর আসব।

—আমি চৌকিদারকে বলে দিয়েছি তুমি যখনই আসবে, তোমার জন্যে গেটের তালা খুলে দেবে।

কন্যা হেসে বললে— আমার সেকেণ্ড শো সিনেমা দেখার শখ নেই যে মাঝরাতে এসে চৌকিদারকে তালা খুলতে বলতে হবে।

মহিপাল প্রথমবার কন্যাকে 'তুমি' সম্বোধন করে বললে— তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি ভাই, কর্নেলের এসব কথায় পলিসি থাকে, এর ধারণা যে কম্যুনিস্ট মেয়ে রাতভর কাস্তে আর হাতুড়ি নিয়ে চরে বেড়াবে।

কন্যা খিল খিল করে হেসে উঠল। কর্নেল লজ্জা পেয়ে বললে— এইসব লেখক আর আর্টিস্টদের কথায় কান দিয়ো না বিন্নো। এরা সব সময় বাজে কথা ছাড়া কাজের কথা বলতেই জানে না।

কন্যা আড়চোখে সজ্জনের চিন্তায় ঘোরালো মুখের হাবভাব ভালোভাবে লক্ষ্য করছিল। সজ্জন মাথা হেঁট করে মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। কর্নেল আর মহিপাল কন্যার মনের গভীরতাকে মেপে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে। কন্যার আড়চোখে সজ্জনের দিকে তাকানো আর সজ্জনের মাথা নীচু করে বসার দৃশ্য দেখে মহিপালের মনে কবিতার লাইন ছন্দোবদ্ধ হয়ে গেল। এই মুহূর্তে কন্যার সামনে শালিগরামের প্রদর্শনীর কথা তুলে সজ্জনের মুখোস খুলে দিলে কেমন হয়। অনেক কষ্টে মনের ইচ্ছে চেপে মহিপাল কন্যাকে জিজ্ঞেস করলে— তোমার কেসের কী হল?

কন্যা চমকে উঠে সজ্জনের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে মহিপালের মুখের ভাব বোঝার চেষ্টা করল। কর্নেল উত্তর দিলে— আমি আগে উকিলদের পরামর্শ নিয়ে দেখি। এর বউদির আত্মীয়স্বজন

কাল সব এসেছিলেন। তাদের সূর্য-হিন্দু হোটেলে ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আজকে সারাদিন আমার ছোট গাড়ি দিয়ে তাদের শহর ঘুরতে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম··· হ্যাঁ, ভাই সজ্জন তোমাকে একটা সুখবর দিতেই ভুলে গেছি— বিন্নো গাড়ি ড্রাইভ করা শিখছে আজকাল। শিউমঙ্গল আজকে বলছিল যে দিদিমণি বেশ শিখে ফেলেছে।

সজ্জন ভাবলেশহীন চোখে কন্যার দিকে তাকিয়ে দেখল, কন্যা মুখ টিপে হেসে তার কাছে সাবাসী পাবার অপেক্ষায় চাইল।

সজ্জনের মনের ঝড় কিছুটা শান্ত হল। দু'জনের মনের ভাবটা বুঝতে পেরে মহিপাল ভাবলে— মেয়েটি চালাক কম নয়। সজ্জনকে বিয়ে করে কম্যুনিস্টের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে এখুনি গাড়ি চালানো শিখছে।

কর্নেল প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে নিজের কথা আরম্ভ করল— আমি একবার ব্যারিস্টার ধবনকে জিজ্ঞেস করে দেখি। উনি ষোলো আনা ঠিক পরামর্শ দেন। এ ভেবো না যে একা শালিগরামের সঙ্গে লড়লেই কাজ হাসিল হবে। এ সময় ইলেকশনের পুরো মেশিন আমাদের টক্কর দিতে এগিয়ে আসবে। এরোপ্লেনে প্রচার-পুস্তিকা ফেলার প্রভাব আশাতীতই হয়েছে, শহরের জনজীবনে এক নতুন আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। কাল আমি এদের বিরুদ্ধে দরকারী কাগজ হস্তগত করেছি, তার প্রতাপে এদের আসন এবার টলল বলে। সব দেবদেবীর কাছে মানত করেছি··· হ্যাঁ, আচ্ছা সজ্জন— আমি তোমার এবং শালিগরামের গোপন চুক্তিকে মেনে নিতে রাজী আছি। এই সুযোগে জনতার সামনে আমরা নিজেদের কেসের বিষয় ভালো করে বোঝাবার

চান্স পাব। এরা মিটমিটে ডান, আমাদের মিত্র হয়ে গলায় ছুরি চালাবার প্ল্যান করেছে। আমরা তেমনি এদের সাত ঘাটের জল খাইয়ে চুবিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব। দু' একদিনের মধ্যে শালিগরাম এদিকে নিশ্চয় আসবে, দেখা হতেই প্রথমে বেশ কড়া দু'চারটে কথা শুনিয়ে দেব। বলব, একজন আর্টিস্টের ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে আমাকে সকলের নজরে ছোট করার চেষ্টা— আমিও তোমাকে দেখিয়ে দেব যে শত্রুর ভালো কাজে আমরা সহযোগিতা করতে পেছ-পা হই না।

সজ্জনকে বেশ খুশী খুশী দেখাল, কন্যার মুখে প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিল, আর মহিপাল কর্নেলের সমর্থন করাটা মোটেই ভালো চোখে দেখল না।

মহিপাল কন্যাকে বললে— তুমি বোধহয় জান না। বাবু শালিগরাম, যিনি শহরের অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন মাথা, লেনদেনের কারবারে যাঁর খাতায় সুদের অঙ্কটাই মোটা, কালকে তিনি সজ্জনকে খুশী করার জন্য তার কাছে চিত্রের প্রদর্শনীর প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। একজন আর্টিস্টকে লোভের পিচ্ছিল পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্ল্যানে তাঁরা সফল হয়েছেন।

বনকন্যার মুখের রঙ কালো হয়ে গেল, সজ্জন রাগে উত্তেজিত হয়ে উঠল। কর্নেল তাড়াতাড়ি মহিপালের শ্লেষের ভাব কাটাবার জন্যে বললে— তুমি কথাটা ঠিকমত বোঝাতে পারলে না মহিপাল, সজ্জন ঠিকই বলেছিল, আমাদের মন বড় সংকীর্ণ। হ্যাঁ, বিন্নো, সজ্জন ঠিকই বলেছে যদি কেউ কোন ভালো কাজের প্রোপোজাল নিয়ে তার কাছে আসে তাহলে রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যে না থেকে তাদের কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত।

কন্যার চোখে সন্দেহ আর সমর্থনের ছায়া একসঙ্গে ঝিলিক মারল। কন্যার সামনে মনের কথা খুলে বলার জন্য সজ্জন ব্যাকুল হল। চারজোড়া চোখের অব্যক্ত ভাষা হয়তো হাজার চেষ্টা করলেও বোঝাতে পারা অসম্ভব। কন্যার মনোভাব বুঝে সজ্জন বললে— উনি আমার চিত্রের প্রদর্শনীর প্রস্তাব নিয়ে সকালে আমার কাছে এসেছিলেন। ওঁদের প্ল্যান আমি তখুনি বুঝে ফেলেছিলাম। আমি চট করে ওদের কাউন্টার প্রোপোজাল দিলাম যে পাড়ার সব মেয়েদের সেলাই বোনা ইত্যাদি সব রকম হাতের কাজের প্রদর্শনী করা হোক। পাড়ার লোকেরাই নির্ণায়ক হবে। আমি আমার মার নামে পাঁচশো টাকা প্রাইজের জন্য দেব। নতুন আর্টিস্টদের আঁকা ছবি জোগাড় করে আমি এখানকার লোকদের দেখাতে চাই, এই সুযোগে তারা নতুন আর্টকে বুঝতে শিখুক। জানকীশরণের বড় হলঘরে চিত্রের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। আমার কিছু ভুল হয়েছে? মহিপাল বলছে যে আমি বাকী সবাইয়ের চোখে ধুলো দেয়ার চেষ্টা করেছি, ব্যাপারটা ঠিকমত না বুঝে মিথ্যে অপবাদ দেওয়া কি উচিত?

—আপনি যা ভালো বোঝেন, আমার মনে হয় আপনার প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত কাজই আপনি করেছেন, আমায় কী করতে হবে বলুন? কন্যা সজ্জনকে প্রশ্ন করলে।

—এসব ক্ষণিক উত্তেজনা ছাড়া কিছুই নয়। ইলেকশনের দাঁওপ্যাঁচের কথা কেন তোমাদের মাথায় ঢুকেও ঢুকছে না? মহিপাল তার মতামত প্রকাশ করলে।

—আরে রাখো— রাখো, ওসব ছোট কথায় মন দিতে নেই।

আমাদের প্রদর্শনী দেখে সকলের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। এবার কিন্তু ভাই আমরা এক নতুন পার্টি গড়ব, যাদের মনুষ্যত্বের আস্থায় বিশ্বাস আছে তাদের সংঘবদ্ধ করব। আমরা বিশেষ কোন রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে নিজেকে জড়িত না করে জনতার বিশাল সিন্ধুর মধ্যে ডুব দেব, তাদের ভালোভাবে বাঁচার অধিকারের জন্য যুঝে যাব। আমরা নিজেদের অধিকারে কোনরকম আঁচ লাগতে দেব না, কি বিন্নো? তোমার কী মত?

মহিপাল চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বললে— বিন্নো আর কি বলবে? এখানে বসে লম্বা লম্বা কথা। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি করতে গিয়ে শেষকালে দেখবে যে তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় শালিগরাম বেশ খানিকটা ষাঁড়ের গোবর পুরে দিয়েছে। আহা হা, বেচারা বনকন্যা, মাঝখান থেকে তার ত্রিশঙ্কু অবস্থা হয়ে যাবে, দেখে নিয়ো তোমরা। ব্রাহ্মণের কথা মনে থাকে যেন।

সজ্জনও উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে— আমার বেদবাক্য তাহলে শুনে যাও, ব্রাহ্মণের কথা মিথ্যে প্রতিপন্ন করার মত মনোবল সজ্জন রাখে। তোমাদের কাছে মিথ্যে দম্ভ করার মত ইতর মন আমার নয়।

মহিপাল নাকমুখ বিকৃতি করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কন্যার মন বিষিয়ে দেবার চেষ্টা দেখে সজ্জন আপন মনে স্বগতোক্তি করে বলল— ইডিয়ট কোথাকার। নিজে নোঙরহীন নৌকার মত ভেসে চলেছে, অন্যকে উপদেশ দিচ্ছে। কর্নেল হেসে ফেলল— আরে ছাড়ো ছাড়ো, তুমিও যেমন, ওর কথায় কান দিতে আছে? মহিপাল লোক খারাপ নয়, মনটা কোমল

কিন্তু জিভে লাগাম নেই বলে সকলে ওকে ভুল বোঝে। দরকারের সময় লেখক মশাই প্রাণ দিয়ে কাজ করবেন। পৃথিবীতে শিশুর মত সরল সুন্দর নিষ্পাপ কজন আছে?

—সকলেই মাটির মানুষ হয় না তবু মহিপালবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি। মন উজ্জ্বল না হলে কেউ স্বনামধন্য সাহিত্যিক হতেই পারে না।

তর্কবিতর্কে সজ্জনের দম বন্ধ হয়ে এল। তার দুর্বল মন মিথ্যে অহংকারের ভাঁজে মুড়ে শক্ত হয়ে গেছে। কন্যা তার সঙ্গে একা রাস্তায় বেড়াতে চায় না। ব্রহ্মচর্য ভেঙে তার মন কন্যার মোহিনী রূপে ধরা দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। কথা খুঁজে না পেয়ে সে ফস করে বেকুবের মত প্রশ্ন করলে— তোমার রান্না···

কর্নেলদা মানা করছেন। আমি কিন্তু দু' একদিনেই নিজের হাঁড়িকুড়ি নিয়ে রান্না আরম্ভ করে দেব।

—ততদিন তোমার খাবারদাবারের ব্যবস্থা?

—কাল রাত্রে দাদার কাছেই খেয়েছিলুম।

মুচকি হেসে সজ্জন কটাক্ষ করে বললে— কর্নেল জৈন ধর্ম মানে। এর চক্করে পড়ে শেষকালে মাছ মাংস ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে যেয়ো না যেন।

সকলে হো হো করে হেসে উঠল। কোনমতে হাসি থামিয়ে কর্নেল বললে— তোমরা মাছ-মাংসের ভক্ত তাই আমাদের নিরামিষ রান্নার আস্বাদ তোমাদের বোঝানো আমার কর্ম নয়। চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সে বললে— আমি একটু ধবন সাহেবকে টেলিফোন করে আসি।

কন্যাকে একা পেয়ে সজ্জন তাকে প্রশ্ন করলে— তুমি সত্যি মন থেকে আমার কথার সমর্থন করেছিলে?

—কোন্ কথার ?

—এই শালিগরামের সঙ্গে···

—আপনার মন এত সন্দিগ্ধ কেন ?

সজ্জন নিজের চেয়ার ছেড়ে কন্যার পাশের চেয়ারে বসতে বসতে বললে— আজ থেকে আমি তোমার কেনা গোলাম।

—আমি গোলামের পায়ের বেড়ি কেটে দিয়ে তাকে মুক্ত করায় বিশ্বাস করি সজ্জনবাবু।

—সে কথা ষোলো-আনা ঠিক, তবু আমি যে দাসত্বের কথা বলছি তাকে তর্কের জালে জড়িয়ে ফেলে প্রেম আর মনুষ্যত্বের বাঁধনে বাঁধা মানুষ আকাশে উড়ে যেতে চায় না, সে চায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়তে। কাল তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে যে আমার বাড়িতে থাকবে ?

কন্যা মাথা নীচু করে দৃঢ় স্বরে বললে— আমার নিজের বাড়ি ভেবেই থাকতে রাজী হয়েছি।

সজ্জন কন্যাকে আপাদমস্তক দেখতে দেখতে বলল— এ এক বিচিত্র অনুভূতি। অঞ্জলি ভরে ভালোবাসা পাওয়ার জন্য উতলা হয়ে উঠে আকাঙ্ক্ষিতের সম্মুখীন হয়ে কেন সে বোবা হয়ে যায় ? জীবন-রহস্যের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য আমার মত তোমার মনও ব্যাকুল হয়ে ওঠে না ?

কন্যা প্রশ্নসূচক চাউনিতে খানিক সজ্জনের দিকে তাকিয়ে বললে— আমার মাথার ঠিক নেই। আমি যেন আজ সব বিশ্বাসই হারিয়ে ফেলতে বসেছি। ভালোবাসতে আমারই কি ইচ্ছা হয় না তবু আজ পর্যন্ত এর থেকে আমি দূরে থাকারই চেষ্টা করেছি। আমার মনের গভীর অন্তরালে লুকিয়ে আছে

এক অসমাপ্ত স্বপ্ন, আমি সেই স্বপ্নকে সফল করতে চাই। আমার বিপদের সময় আপনি পরম মিত্র হয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন তবে হয়তো কৃতজ্ঞতার ভারে আমি এত বেশী নুয়ে পড়েছি যে…

—এতে কৃতজ্ঞতার কথা আবার কোথায় এল?

—আপনার মনে না আসতে পারে তবে আমার মনে এটা আসা স্বাভাবিক।

—স্বাভাবিক কেন?

—আপনার সঙ্গে এর আগে কোন চেনা পরিচয়, কোন আত্মীয়তাই ছিল না। আমরা আজ যে আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা পড়েছি…সেটা শূন্যতা, তাই নয়?

সজ্জন চমকে উঠল— শূন্যতা কেন?

কন্যা উত্তেজিত হয়ে বলল— হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি বলছি মস্ত বড় জীরো, এই পরিচয়ের এর চেয়ে অন্য পরিভাষা আছে কিছু?

কন্যার উত্তর শুনে সজ্জন হতভম্ব হয়ে গেল।

কন্যা আবার আরম্ভ করল— প্রেমের আবেগে প্রাণ দিতে দ্বিধা বোধ না করা জীবনের রিক্ততা নয়?

সজ্জন বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করলে, কেন?

—কেন জানতে চান? লায়লা মজনুর অমর প্রেম কাহিনী দিয়ে, অমর প্রেমগীতি রচনা হয়েছে, অথচ ওরা বিয়ের বাঁধনে বাঁধা পড়ে নি বলেই অমর গীতি রচনা সম্ভব হয়েছে।

সজ্জন গম্ভীর ভাবে চিন্তা করে বলল— জীবনের রিক্ততাকে অনুভব করেই মানুষ তাকে পূর্ণ করার পরিশ্রম করে। লায়লা মজনুর ভালোবাসাই আজ গানে অমর হয়ে আছে।

কন্যা মুখে হাত দিয়ে কেসে নিয়ে দু' মিনিট চুপ করে থেকে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে বললে— যে অনুভূতিকে কবিরা ছন্দে বাঁধার চেষ্টা করেছে তাকে আমি ভুল আর ভ্রান্তির জাল মনে করি। আঁকাবাঁকা কথা বলার ধরন আমি মোটেই পছন্দ করি না— সোজা কথা হল স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কের শেষ পরিণতি বিয়ে··· আপনার আমার মধ্যে এখনো সে সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

সজ্জনের বুকে কন্যার প্রতিটি কথা শেলের মত বাজল।

দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে কন্যা ঘাড় বেঁকিয়ে বললে— স্ত্রী-পুরুষের এই নিকটতম সম্পর্ক বড়লোকের, আর্টিস্টদের খেলার জিনিস নয়, দু'জনকেই অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়, জীবনের সবরকম পরিস্থিতির কষ্টিপাথরে নিজেকে ঘষে মেজে দেখতে হয়।

কন্যা চলে গেল। তার ব্যবহারে সজ্জন জ্বলে উঠল, উফ্ কী দাম্ভিক মেয়ে। ওকে কন্যা খেলনা ভেবেছে না কি? কেন ছলনার ফাঁদে ফেলে সে তার স্বপ্নকে চুরমার করে দিতে চাইছে। যতই সজ্জন দূরে সরে যেতে চায়, ও কেন তার জীবনে এসে কাঁচা সুতোয় বাঁধা তার প্রতিজ্ঞাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে দিতে চাইছে।

হঠাৎ কর্নেল অন্ধকার ঘরে লাইট জ্বালিয়ে হো হো করে হেসে বলল— কি হল আর্টিস্ট মশাই? প্রেম নিবেদন কেমন হল? তোমাদের সুযোগ দেবার জন্যেই আমি একটু আড়ালে চলে গিয়েছিলুম।

ভারী গলায় সজ্জন বললে— যা করেছ তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ— আহাম্মক শালা···

উনিশ

কর্নেলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমীনাবাদ পার্কের জমজমাট রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উত্তেজিত মহিপালের সারা শরীরে অবসাদ নেমে এল। সে আজ নিজেকে একটা নোঙরহীন নৌকো ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছে না। ভাবনার ছোট ছোট টুকরো সে এতদিন সংগ্রহ করে বেড়িয়েছে, আজ সে একটা পোড়ো ভগ্নমূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তার রক্তের মধ্যে ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনতে পাচ্ছে। দেহের সঙ্গে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলিও ভারী হয়ে এসেছে। জীবনের সুখের পসারহাট নৌকোয় তোলার সময় সে বুঝতে পেরেছে তার লোকসানের অঙ্কটাই বেশী। জীবনের জুয়া খেলায় সে বাজি হেরে গেছে, আজ পাশার শেষ বাজিও সে হারতে বসেছে। সামনের বড় অট্টালিকায় ঝোলানো নিম টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মতই তার অসফলতার কাহিনী যেন আজ সবার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে।

তার জীবনের দিনগুলি যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। তাতে গতি নেই কেন? না, না, পৃথিবীতে ভদ্রলোক হয়ে বেঁচে থাকা এক বিড়ম্বনা। সাদাসিধে মানুষকে সকলেই ঠকাবার চেষ্টা করে। শেঠ রূপরতন আর তার ছোট ভাই গট্টু, দু'জনেই তাকে ঠকিয়েছে এ কথা আজ কেউ বিশ্বাস করবে না। দিনরাত

তাকেই দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা সকলের। সকলে মিলে প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে শেঠ এবং ডাঃ শীলার যা কিছু আছে সব মহিপাল লুটেপুটে খেয়েছে আর এখনো খেয়ে চলেছে। শীলাকে দেওয়া তার প্রতিদানের খবর কেউ জানতে ইচ্ছুক নয়। সে একজন কপর্দকহীন লেখক, তার প্রতিদানের মূল্য বোঝার সময় কার আছে? বিবাহিতা স্ত্রী আর ছোট ছোট বাচ্চাদের আধপেটা খাইয়ে সে বাকী টাকাপয়সা খোলামকুচির মত ফুর্তি করে উড়িয়ে দিচ্ছে।

সামনে ভগত পানওয়ালার দোকানে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে, এরাই কাল তার শালার বাসি বিয়েতে ছিল। তাদের চেহারা দেখামাত্র মহিপাল চোরের মত মুখ লুকিয়ে হন হন করে প্রায় ছুটতে আরম্ভ করে দিল। কেসরবাগের চৌমাথায় বাসের হর্ন শুনে সে যখন থমকে দাঁড়াল তখন সে রীতিমত হাঁপাচ্ছে। কেন সে এত ভীতু হয়ে গেছে? এমন করে পালিয়ে বেড়ালে সে কি দুর্নামের হাত থেকে রেহাই পাবে? কপালের ঘাম মুছে ফেলে সে ভাবতে লাগল— আর কতদিন মুখ লুকিয়ে ঘুরে বেড়াব? পৃথিবীতে বহুপত্নী, উপপত্নী, অবৈধ সম্পর্কের তালিকায় ভুক্ত কতজন তাদের উপভোগের জন্য মেয়েদের সাপ্লাই পর্যন্ত করে থাকে, সে কি তাদের চেয়েও অধম? না না, সে নিষ্পাপ, তার আর শীলার সম্পর্ক লৌকিক প্রথার বিরুদ্ধে হলেও তা পাপ নয়। আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে পর্যন্ত বহুপত্নী প্রথা ছিল, অনেক মুনিঋষি পর্যন্ত বহুপত্নীবাদের সমর্থন করেছেন। শীলার সঙ্গে সে অগ্নিসাক্ষী রেখে সাতপাক ঘোরেনি বটে তবু সে তাকে মনে মনে বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে থাকে।

সে নিজের মনেই তর্ক চালাতে লাগল। শীলার নীরব দাবিকে সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারল না। কল্যাণীর সঙ্গে তার সাতপাকের বন্ধনের সম্পর্ক, সমাজ আর পরিবারের ইচ্ছায় সে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সমাজের স্বীকৃতির অভাবে শীলা তার ছেলেমেয়ের মা হওয়ার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

নিজের ছেলেমেয়ের মায়ের মর্যাদা শীলাকে দিয়ে ফেলে তার মন আপনা হতেই চনমন করে উঠল। না··· না··· খেয়ালের মাথায় সে এসব আবোল তাবোল ভাবছে—যদি শীলার গর্ভে তার শিশুসন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহলে কেমন হয়? কল্যাণীর ছেলেমেয়ে, শীলার শিশুসন্তান। দু'জনেরই ছেলেমেয়ের পিতা সে একা! অদ্ভুত অনুভূতি! হঠাৎ রাজা দশরথের গল্প তার মনে পড়ল—বহুপত্নীবাদের চরম পরিণতি—উফ্ তিন স্ত্রীর চার সন্তানের পিতা হওয়ার কী দুর্গতি।

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে ভিক্টোরিয়া পার্কে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবসাদে তার হাত-পা অবশ হয়ে এল। নিজের শরীরের ভার কোথাও রাখতে পারলে যেন সে বাঁচে। পার্কের সিঁড়িতে ঠেসান দিয়ে সে ধপ করে বসে পড়ল। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে নিলে। শীতকালে নিঝুম রাত, চারিদিকে নিস্তব্ধতার রাজত্ব, সে একা বসে বসে এলোমেলো চিন্তার জাল বুনে চলেছে। প্রায় ঘণ্টা খানেক সে পাথরের মত বসে রইল। তার সংবেদনশীল মনে রাজ্যের আশঙ্কা। সারা রাত সে কোথায় কাটাবে? কার উপর সে নির্ভর করতে পারে? বাড়ির কথা মনে পড়তেই কল্যাণীর মুখখানি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। না না, সে কিছুতেই তাকে এ মুখ দেখাতে

পারবে না, নিজের বিবাহিতা স্ত্রী, তার ছেলেমেয়েদের মাকে বাড়িতে রেখে সে অন্য মহিলার অবৈধ সম্বন্ধ ছিন্ন করতে পারছে না। তার ছেলেমেয়েরা মনে মনে বাবার বিষয় কী ধারণা পোষণ করছে? কল্যাণী মূর্খ, তবু তার প্রতি নিজের ব্যবহার মোটেই ভদ্রোচিত নয়। মানসিক উদ্‌বেগে মহিপালের অবশ শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগল।

চার বছর আগে কল্যাণীর বড় অসুখ করেছিল, সে পেটের যন্ত্রণায় ভুগছিল। সেই সময় কর্নেলের সঙ্গে ডাঃ শীলা, তার স্ত্রীর চিকিৎসা করতে আসে। ডাঃ শীলাকে পেয়ে সে যেন জীবনের হারানো সুর খুঁজে পেল। ধীরে ধীরে তার আর শীলার মাঝখানে বুদ্ধিগত সম্পর্ক গড়ে উঠল। কর্নেল ডাঃ শীলার সামনে তার বন্ধুর প্রশংসায় সদাই পঞ্চমুখ। শীলার বেশ মার্জিত রুচি, হিন্দী সাহিত্যে প্রেমচন্দের লেখা দুটো-একটা এবং শরৎচন্দ্রের হিন্দী অনুবাদ দু-একটা পড়ে ফেলার সুযোগ তার হয়েছে। সাহিত্যের এইটুকু সঞ্চিত ভাণ্ডারের ওপর তাদের বন্ধুত্ব গাঢ় থেকে প্রগাঢ় হয়ে চলল। কর্নেলের কাছ থেকে টাকা ধার করে মহিপাল নিজের লেখা বইয়ের সেট কিনে শীলাকে উপহার দিলে। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হতেই শীলা তার কাছ থেকে আর ভিজিট নিত না। তারই পরিশ্রমে কল্যাণী রোগমুক্ত হল। ধীরে ধীরে কল্যাণী আর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শীলা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। লেখক এবং ব্যক্তি হিসেবে শীলার চোখে মহিপাল শ্রদ্ধার পাত্র। শীলার সৌজন্য, বুদ্ধির বিকাশ এবং তার সাহিত্যে রুচি যেন মহিপালের শুষ্ক জীবনকে নতুন প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে তুলল। মহিপাল মাঝে মাঝে তার সঙ্গে কফি হাউসে বসে কফিও খেত। সজ্জন

আর কর্নেলের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল। এইভাবে দিন এগিয়ে চলল।

একদিন মহিপাল একা কফি হাউসে বসে ছিল। শীলা এল। সেদিন তার মনটা ভালো ছিল না। কোথাও নিরিবিলিতে কিছু সময় কাটাবার প্রস্তাব করতেই শীলা তাড়াতাড়ি গাড়ি স্টার্ট করলে। ছ'জনে গাড়ি থেকে নেমে এক জায়গায় একটু নিরিবিলি দেখে গিয়ে বসল। মহিপালের চোখে দেখা দিল নতুন প্রেমের অভিব্যক্তি। তাদের দুজনের মধুর সম্পর্ক প্রেমে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই কারণে মহিপালের পত্নীর প্রতি নিষ্ঠায় ফাটল ধরল। সেই থেকে দীর্ঘ চার বছর কেটে গেছে কিন্তু তাদের সম্পর্কের নতুনত্বকে সময়ের উইপোকা কাটতে পারে নি। আজও তার প্রেমে সেই প্রথম পরিচয়ের মধুরতা। শীলার চটুল ভাব-ভঙ্গিমার মাঝে সে পেয়েছে হারিয়ে যাওয়া পথের সন্ধান। মহিপাল বেশ একটু উগ্র প্রকৃতির। তার এই স্বভাবের জন্য শীলার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলেও কোনদিন ঝগড়াঝাঁটি হয় নি। শীলার শান্ত, স্নিগ্ধ স্বভাবের সামনে তার উগ্র প্রকৃতি ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে যায়। শীলা কোনদিন মহিপালের বাড়ির কথা, তার সংসারের খরচপত্তর, আর্থিক অবস্থা জানার চেষ্টা করে নি। দুজনে নিজের নিজের কাজেকর্মে ব্যস্ত।

স্মৃতির মণিকোঠায় শীলার নাম আসতেই মহিপাল ভাবলে—তার বাড়িতেই রাতটা কাটালে কেমন হয়?

মহিপাল উঠে দাঁড়াল। একবার তার পা যেন এগুতে গিয়ে ভারী পাথরের মত নিশ্চল হয়ে গেল। সজ্জনের বাড়ি যাবার কথা সে ভাবতেই পারে না, কেননা তার মতে সে একজন

হিপোক্রাট ছাড়া কিছুই নয়। কর্নেল একগাদা উপদেশ ঝাড়বে। এক শীলার বাড়ি ছাড়া আর কোন গতি নেই।

সে কোনমতে দৃঢ় নিশ্চয়ের সঙ্গে পা বাড়াল। দু'পা এগুতেই তার পায়ের গতি মন্থর হয়ে এল— সে শীলার বাড়িতেই থাকবে? তার সেখানে থাকা কি যুক্তিসংগত হবে? তীব্র অবসাদে তার সারা শরীর মড়ার মত প্রাণহীন হয়ে গেল। তার জীবন অর্থহীন হয়ে গেছে, সে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে, সে পালিয়ে যাবে। শীলাকে শেষ বারের মত দেখার তীব্র ইচ্ছে তার মনে জেগে উঠল।

শীলার বাড়িতে পৌঁছে চাকরদের কাছে জানতে পারল যে মিস সাহিবা তখনো ভিজিট থেকে ফিরে আসেন নি। চাকরকে কফি তৈরী করতে বলে সে গিয়ে সোজা সোফায় কাত হয়ে পড়ল। পনেরো-কুড়ি মিনিটেই শীলা ফিরে এল। শীলার খোঁপায় তিনটে হলদে গোলাপ শোভা পাচ্ছে আর কানে হীরার কানপাশা জ্বলজ্বল করছে। সে গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকল। মহিপালকে দেখেই তার চোখেমুখে আনন্দ উপচে উঠল।

—ইউ রাস্কেল, এত রাত্তিরে এখানে বসে কী করছ? গিন্নী বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে না কি?

মহিপাল ফ্যাকাশে হাসি হেসে উত্তর দিলে— হ্যাঁ।

—সত্যি বলো, ঝগড়া হয়ে গেছে?

—না না, আজ বিকেলে দুই বন্ধুর একজনের সঙ্গেও দেখা হল না। একাই পায়চারি করতে করতে বেশ কিছুক্ষণ ভিক্টোরিয়া পার্কে বসে রইলুম। তারপর ইচ্ছে হল তোমার সঙ্গে একটু দেখা করে যাই। তোমার খাওয়া হয়েছে?

—এত তাড়াতাড়ি? তোমার খাওয়া হয় নি নিশ্চয়।

—তাই তো জিজ্ঞেস করলাম।

—আবদুল!

'জী মেম সাব'— দূর থেকে আওয়াজ ভেসে এল। মহিপালকে হাসতে দেখে শীলা জিজ্ঞেস করলে— হঠাৎ হাসলে যে বড়?

—আবদুল তোমায় মিস বলে ডাকল, তাই। শীলা জোরে হেসে বিছানা থেকে বালিশ উঠিয়ে মহিপালের দিকে ছুঁড়ে মারলে। আবদুলকে সামনে দেখে নিজেকে সামলে নিয়ে শীলা গম্ভীর ভাবে বললে— সাহেব এখানে খাবেন, আজ কী কী রান্না হয়েছে?

—মুরগী।

—ঠিক আছে, টেবিল সাজাও··· দাঁড়াও, মহিপাল, কিছু ড্রিঙ্ক নেবে না কি?

—নিশ্চয়।

আবদুল শীলার কাছ থেকে দেরাজের চাবি চেয়ে নিয়ে আলমারী থেকে গেলাস আর হুইস্কি বার করে টেবিলে রাখল।

ডিনার টেবিলে বসতে বসতে শীলা প্রশ্ন করলে— তোমার উপন্যাসের কী হল?

—ইদানীং মুড আসছে না।

—কতদিন?

—এই পনরো-কুড়ি দিন।

—এতদিনে কত পাতা লিখেছ?

—চুয়ান্ন পাতা মাত্র।

—লেখা বন্ধ করে দিলে কেন?

—বিশেষ কোন কারণে নয়। রেডিওর অনেক কাজ পেয়েছিলুম, তারপর রোজের দিনমজুরী থেকে ফুরসত পাই না।

—বেশ ভালো লেখা হচ্ছে, ওটা শেষ করে ফেলো।

ছুরি দিয়ে মুরগী কাটতে কাটতে মহিপাল মুখ বিকৃতি করে বললে—ওহঃ সে দেখা যাবে। শেষ হয়েই যাবে, কে পরোয়া করে।

—বাঃ, এ আবার একটা কথার কথা হল? সব লেখক যদি তোমার মত ভাবতে আরম্ভ করে তা হলে সাহিত্যের কী হবে?

—তুমি চিরাচরিত ঘষামাজা কথা বলছ। ঘ্যানর ঘ্যানর করে লেখক আর আর্টিস্টকে জবরদস্তি করে কিছু করানো যায় না। লেখকের মনের আকস্মিক অনুভূতি দিয়ে সৃষ্টি হয় সাহিত্য।

—আজকাল তোমার বিশেষ পরিস্থিতি কী, জানতে পারি?

—বিশেষ আর কি, শকুন্তলার বিয়ের চিন্তা। রোজ ঠিকুজি দেখানো, খোশামুদি করা, এইসব নিয়ে মন-মেজাজ একদম ভালো নেই।

—শকুর বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে?

—আগে মোটা ব্যাঙ্কব্যালেন্সের ব্যবস্থা করি তবে তো এগুবো। মার্কেটে ছেলেদের উঁচু দাম দিয়ে কেনার জন্য পকেট গরম রাখতে হবে তো। আশ্চর্য সমাজের নিয়ম, ছেলে কেনার পরও মেয়েপক্ষকে মাথা নিচু করেই চিরজীবন থাকতে হয়।

—তুমি জাত-বেজাতের চক্করের মধ্যে যাচ্ছ কেন? তোমার মত লোকেরা যদি এগিয়ে না আসে তা হলে সামাজিক প্রথায় পরিবর্তন কারা আনবে?

—আরে, আমার কথা কে শুনছে? তোমার ওই কল্যাণী

নাকে কাঁদছেন বিষ খেয়ে প্রাণ দিয়ে দেব তবু এক কাঠি নীচু বংশে মেয়ে দেব না।

কল্যাণীর হুবহু নকল করা দেখে শীলা হেসে উঠল— তুমি কল্যাণীর যা নকল করো, বাবাঃ, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা, এবার দেখা হলে সব বলে দেব।

—আবহুল! শীলা জোরে হাঁক দিলে।

—হুজুর।

—মিয়াঁ, গেলাসে একটু ঢেলে দিয়ে যাও।

—বহুত আচ্ছা হুজুর।

—আমি তোমার চিন্তার কারণ বেশ বুঝতে পারছি, ছেলেপক্ষ পণ চাইছেন নিশ্চয়।

—চাইতে দাও শালাদের। গেলাসে তরল পদার্থ পেটে যেতেই মহিপালের চোখে রঙিন নেশার ছোঁয়া লাগল— আমি এসব নিয়ে চিন্তা করা ছেড়ে দিয়েছি। কল্যাণীর যদি গরজ থাকে নিজেই করে নেবে— এই আবহুল, আরো একটু ঢালো। আবহুল তখুনি খানিকটা হুইস্কি ঢেলে সোডার বোতলের ছিপি ফট করে খুলে ফেলল।

—মহিপাল, তুমি বড় বাড়াবাড়ি করছ কিন্তু।

—না, আই নীড ইট— আবহুল, মিস সায়েবকে দাও।

—না।

—আমার সঙ্গ দেবে না?

—না, সকালে উঠে রুগী দেখতে যেতে হবে।

—এক পেগ।

—আবহুল, তুমি যাও, সোডা খুলে দিয়ে যাও। আবহুলকে

বিদেয় করে শীলা হু'জনের গেলাসে এক এক পেগ ঢাললে। গেলাসে চুমুক দিয়ে খাবার খেতে খেতে শীলা প্রশ্ন করল— একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—কি?

—আমার অনেক টাকা ব্যাঙ্কে পড়ে আছে, খরচ করায় সাহায্য করতে পারবে?

—না।

—আগে আমার কথা ভালো ভাবে বোঝবার চেষ্টা করো, একজন ভালোলোক সিলেকশনে আমায় একটু সাহায্য করে দেবে।

—প্ল্যানটা কি?

—আমি পাবলিকেশনের কাজ করতে চাই। তুমি আমাকে তোমার সব বই ছাপার অধিকার দিয়ে দাও। সব জায়গার স্টক কিনতে আমি রাজী আছি। যে এডিশন বাজারে ফুরিয়ে গেছে, আমি নতুন করে ছাপাব। পাবলিকেশনের ব্যবসা বোঝে, এমন একজন ভালো ম্যানেজার রাখতে চাই। কি ব্যাপার? চুপ করে আছ? সাহায্য করবে তো? আগেই তোমাকে জানিয়ে রাখি এটা স্রেফ আমার ব্যবসায়ী ফর্মুলা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই মাগ্যির দিনেও লোকে এক-আধটা বই নিশ্চয় কিনে পড়ে, তা ছাড়া মার্কেটে রিসার্চ করে আমি বিক্রি বাড়ানোর এমন স্কীম দেব যে তুমি হাঁ হয়ে যাবে।

মহিপাল হো হো করে হেসে উঠল— তোমার কাছে হাত না পাততেই লোকে হুর্নাম রটাচ্ছে। এরপর তোমার পয়সায় আমার বই ছাপা হয়েছে শুনলে তো আর রক্ষা নেই।

—ওহঃ, মহিপাল, তোমাকে কিছু বোঝাতে যাওয়া ভীষণ শক্ত।

জীবনের অধেকটা এমনি কাটিয়ে দিলে, আর কতদিন এভাবে চালাবে? আমি অনেক ভেবেচিন্তে স্কীম তৈরী করেছি, আমাদের দু'জনেরই লাভ হবে।

—আমাকে শুনিয়ে কিছু লাভ হবে না।

—তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন, আমরা দু'জনে সুখে-দুঃখে পরস্পরের বন্ধু, অন্যের কথায় কান দেবার দরকারটা কি?

—আমি দুনিয়াকে ভয় পাই না শীলা, আমার বিবেক সারাক্ষণ আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকায়।

—ভয় ডর তুমি পাও না, আসলে বুদ্ধিশুদ্ধি বলে তোমার ঘটে কিছুই নেই— হেসো না, হাসবার কথা নয়— সিরিয়াসলি বলছি— তোমার এই মরচে ধরা বুদ্ধির জন্য তুমি সাত ঘাটের জল খেয়েও কূল কিনারা দেখতে পাচ্ছ না। দেখ— স্কুল-কলেজে এমন ব্যবস্থা করা হবে তোমার লেখা বইয়ের যে সবচেয়ে ভালো সমালোচনা করবে সে প্রথম পুরস্কার পাবে। তোমার বই কিনে পড়ার জন্য লাইন লেগে যাবে। খাঁটি সোনার স্ফুরণই আলাদা।

স্কীম শুনে মহিপাল যেন নিজের হারানো অস্তিত্ব ফিরে পেল। তার সারা জীবনের সুপ্ত বাসনাকে শীলা সাকার রূপ দিতে চায়। কিন্তু না, না, নিজের প্রসিদ্ধির জন্য সে নিজের মর্যাদা বিকিয়ে দিতে পারবে না। শীলাকে নিরুৎসাহ করার জন্যে বললে— দেখো, এ কাজে প্রচুর সময় আর পরিশ্রমের দরকার। তোমার হাতে সময় কোথায়?

—তুমি কি করে বুঝলে যে এ কাজের জন্য আমি সময় বার করতে পারব না। তুমি একজন ভালো বিজনেস ম্যানেজার আমাকে জোগাড় করে দাও, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তুমি রয়েলটি পাবে আর আমার ব্যাঙ্কের পয়সা ভালো কাজে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। সত্যি বলছি, এই মাগ্যিগণ্ডার দিনে তোমার বইয়ের বিক্রি চার ডবল হয়ে যাবে।

—খুব হয়েছে, এবার অন্য কথা বলো।

—আমি দরকারী কথাই বলছি।

—আমি যতদিন বেঁচে আছি ততদিন এ স্কীম কোল্ড স্টোরেজে সযত্নে তুলে রেখে দাও। আমার মরার পর বার কোরো, কেমন?

—মহিপাল, তুমি আজ পর্যন্ত আমার কোন কথাতেই কান দিলে না।

—মহিপাল গেলাসে চুমুক দিয়ে ফিকে হাসি হেসে বললে—যাকগে, আজ আমি তোমার যে-কোন কথা মেনে নিতে রাজী, তবে সেটা আজই পূর্ণ হওয়া চাই।

—তার মানে?

—আজ আমি তোমার কাছে চির বিদায় নিতে এসেছি।

শীলা থ হয়ে গেল — তোমার এ কথার মানে কি?

* * *

দুজনে শীলার খাটে বসে আছে, একই লেপের মধ্যে। তার জন্যে মহিপালকে দুনিয়ার লোকের কথা শুনতে হচ্ছে, শীলার চোখে জল এল। হঠাৎ মহিপালকে জড়িয়ে ধরে বললে—দুনিয়াকে যা ইচ্ছে তাই বলতে দাও।

—দুনিয়ার কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু কল্যাণী আর ছেলেমেয়েদের কানেও কথাটা উঠেছে। তোমাকে ওরা আর সুনজরে দেখতে পারবে না, তাই আজ দুজনের মধ্যে একজনকে ত্যাগ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। কিছুদিন পরে যখন

দুর্নামের ফেনা ধীরে ধীরে থিতিয়ে যাবে তখন আবার আমরা দেখাসাক্ষাৎ আরম্ভ করতে পারি, লোকেরা তখন আমাদের বেহায়া ভেবে চুপ করে যাবে।

শীলা সোজা হয়ে বসতে বসতে বললে— আমরা দুজনে দুজনকে বুঝি, তবে কেন আমরা সত্যিটাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছি? তুমি আমায় আজ একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে? আমি কোনদিন কল্যাণীর অধিকার কেড়ে নেবার চেষ্টা যখন করিনি তখন আজ কেন তার জন্যে তুমি আমার অধিকার কেড়ে নিতে চাইছ?

—তুমি কল্যাণীর কাছ থেকে আমায় ছিনিয়ে নিয়েছ শীলা। যে মানুষের ওপর আজ কুড়ি বছর ধরে তার একারই অধিকার ছিল, আজ তুমি তার অংশীদার হতে চাইছ, তাই না?

—কল্যাণীর কথা উঠছে না। তোমায় কাছে পাবার জন্য আমার প্রচেষ্টার সাধনায় আজ সে কেন ভাগীদার হবে? আমাদের বয়স ছেলেখেলার নয়, কাঁচাপাকা চুল নিয়ে ছেলেমানুষী করা মানায় না। আমরা যেমন ছিলাম তেমনি থাকব— যা চলছিল তা চলবে, বুঝলে? কথা দাও তুমি ভীরু কাপুরুষের মত পালিয়ে বেড়াবে না?

মহিপালের সুপ্ত পৌরুষ জেগে উঠল— হ্যাঁ, আমি কথা দিচ্ছি আমাদের সম্বন্ধ অটুট থাকবে। আত্মমর্যাদার মূল্যকে সে নেশার ঘোরে হারিয়ে দিতে রাজী নয়, সে জ্ঞান তার টনটনে— শীলা, তোমাকেও পাকা কথা দিতে হবে যে আর কখনো আমার সামনে তুমি ওইসব ছাইভস্ম বিজনেসের কথা মোটেই তুলবে না। তুমি 'লক্ষপতি' হতে পারো কিন্তু আমার নজরে তুমি কেবল শীলা।

—আচ্ছা, আর কখনো এ কথা তুলব না। এবারটি মাপ

করো লক্ষ্মীটি—বলেই শীলা মহিপালের বুকে মুখ লুকোলো। পুরুষের মন টলানোর বিদ্যে সে ভালোভাবেই জানে।

রাত তখন প্রায় দুটো। মহিপাল যাবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আর তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। রাস্তায় যেতে যেতে কোন-না-কোন রিকসা বা টাঙ্গা পেয়েই যাব।

শীতের রাত, মহিপাল গোমতী নদীর ধারে চারিদিক খোলা শিব মন্দিরে বসে কাটিয়ে দিলে। ঠাণ্ডা হাওয়া সোঁ সোঁ করে বয়ে যাচ্ছে। উঃ কী নিয়তি, সে নিজের দুর্বলতার কাছে আজ পরাজিত অপরাধী ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজের পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ব আছে। মুখ লুকিয়ে পালিয়ে বেড়ানো পাপ। ভোর হয়ে আসছে—না, না, পালিয়ে কতদূর সে যেতে পারে? পালিয়ে বেড়ানো তার বিলাসিতা নয়? তার বিবাহিতা স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের প্রতি তার নৈতিক কর্তব্য আছে, সেই ডোরকে ছিন্ন করে ফেলে দেওয়া কি এতই সহজ? তাকে জীবনের সঙ্গে সংঘর্ষ চালিয়ে যেতে হবে।

—বাড়ি যাব—কল্যাণীকে সব কথা খুলে বোঝাব তারপর দেখা যাবে।

দরজা পর্যন্ত পৌঁছে আবার মহিপাল ফিরে এল। দরজার কড়া নাড়ার সাহস পাচ্ছে না। সে সোজা কর্নেলের বাড়ির রাস্তায় এগিয়ে গেল।

কুড়ি

—আরে মশাই মেয়েটি ঠিকই বলেছে, আজকাল সাধু বৈরাগীদের কোন বিশ্বাস আছে?

চৌমাথার মোড়ের কাছে চায়ের দোকানে বেশ ভীড় জমেছে। মজা দেখার লোকের অভাব হয় না। ভীড়ের মধ্যে অনেকেই তামাশা দেখার আগ্রহে গুটি গুটি এগিয়ে চলেছে। একটি মেয়েলী গলা বেশ ঝাঁঝালো স্বরে ঝগড়া করে চলেছে। চারদিকে বেশ সোরগোল।

সজ্জন গাড়ি থেকে নেমেই হাঙ্গামার কারণ জানার জন্য এগিয়ে গেল। সামনে চেয়ারে বসে উকিল মশাইয়ের পাগল বউ হাউ হাউ করে কান্নাকাটি করছে। কাছেই কৌপীনধারী এক বাবাজী দাঁড়িয়ে হাসছেন। পরিচিত পাগলীকে এই ঘটনার নায়িকারূপে দেখে সজ্জন চুপচাপ মুখ বুজে বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। এই দৃশ্য দেখে তার সারা শরীর যেন শিউরে উঠল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে বউটার মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করলে—কি হয়েছে?

সজ্জনকে দেখেই বউটির যেন ধড়ে প্রাণ এল, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললে— ওঃ আপনি এসেছেন। আমাকে এই চণ্ডালের হাত থেকে বাঁচান। এ সাধু নয়, জহ্লাদ জহ্লাদ।

আমাকে বেশ্যা করে রাখতে চায়। আপনি বলুন— আমি কি বেশ্যা? আমাকে দেখে কী মনে হয়? আমি বড় ঘরের বউ। আমাকে এখুনি রাজেশের কাছে নিয়ে চলুন— আমার রাজেশ এই ব্যাটা সাধুকে সোজা গুলি করে মারবে। আমার রাজেশ ক্যাপ্টেন। সে এসে যখন এই ভীড়কে দেখবে, জানেন সে কি করবে? সোজা খট খট করে গুলি মেরে সকলকার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে, এই হারামজাদা সাধু…

গাগলী মুঠো পাকিয়ে বাবাজীকে মারার জন্য এগুতেই সজ্জন তার হাত ধরে ফেলে বললে— বাড়ি যাবেন?

—সেই বুড়োর কাছে? না, কখনো নয়। আপনি আমাকে রাজেশের ওখানে নিয়ে চলুন। এখুনি নিয়ে চলুন— বাস, কোন কথা শুনতে চাই না। এখানে আমি এক মিনিট দাঁড়াতে চাই না… চলুন, চলুন।

সজ্জন একবার সাধুকে আপাদমস্তক ভালোভাবে নিরীক্ষণ করলে। দন্তবিহীন চেহারায় বয়সের ছাপ আছে বটে কিন্তু শরীর লৌহ ধাতুর মতই পুষ্ট, রঙ বেশ এক পোঁচ কালো কিন্তু একটা চকচকে ভাব আছে। বাবাজীর দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে পাগলী সজ্জনকে বললে— এর দিকে তাকাচ্ছ কেন? এ আমার কী করবে? আমাকে আটকাবার ক্ষমতা এর আছে?

বাবাজী সজ্জনের দিকে চেয়ে বললেন— লোক দেখে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে— রাম রাম, আপনি একটু কষ্ট করে আমার সঙ্গে আসুন, ওর হাতটা ছেড়ে দিন।

ভীড় থেকে বেরিয়ে সজ্জন পাগলীর হাত ছেড়ে বাবাজীর সঙ্গে যাবার জন্য যেই এগুলো, ওমনি পাগলী খপ করে তার কনুই ধরে

চেঁচাতে লাগল— না, না, আপনি এই বাবাজীর সঙ্গে যাবেন না— আপনাকে ব্যায়াম করিয়ে, গাঁজা মাজা খাইয়ে মেরে ফেলবে।

বাবাজী যেতে যেতে চায়ের দোকানের চাকরকে বলে গেলেন— বাবা, এর দিকে একটু নজর রেখো।

সজ্জন পাগলীকে বোঝাবার চেষ্টা করল যে সে বাবাজীকে হাজতে বন্ধ করতে যাচ্ছে। বাবাজী হাজতে বন্ধ হলেই সজ্জন তাকে এরোপ্লেনে বসিয়ে রাজেশের কাছে নিয়ে যাবে। পাগলী সন্তুষ্ট হয়ে একদিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ভীড় থেকে বেরিয়ে সজ্জন আর বাবাজী দুজনে রাস্তার ধারে একদিকে দাঁড়িয়ে কথা আরম্ভ করলে। বাবাজী বললেন— রামজী, আমি মেয়েটির চিকিৎসা করছি। আপনি এর কোন আত্মীয় না কি ?

—আজ্ঞে না। একদিন ইনি গলি থেকে দৌড়ে যাচ্ছিলেন, আমি দেখতে পেয়ে এঁকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিলাম। তখুনি সব কথা জানতে পারলাম, এঁর শ্বশুর···

শ্বশুর মশাইকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলাম রামজী, যে আপনার বউ আশ্রম ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। বেচারা ভদ্রলোক বুড়ো মানুষ, হাটে বাজারে লজ্জায় দাঁড়াতে পারেন না তাই আসেন নি। আপনি তো জানেন, ভীড়ে ভালো মন্দ সব রকম লোকই জড়ো হয়। যে যা মুখে আসে বলতে থাকে, কার মুখে ধামা চাপা দেব বলুন ? মেয়েমানুষ রুগীর ওপর বল প্রয়োগ করা আমাদের নিয়মের বিরুদ্ধে। আপনি যদি কষ্ট করে একে ফুসলে ফাসলে ভুলিয়ে ভালিয়ে কোনমতে আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে যান, তা হলে বড় উপকার হয়।

—আমার কাছে গাড়ি আছে।

দন্তবিহীন মুখে হাসতে হাসতে বাবাজী বললেন— বাস বাস, তা হলে সব ঠিক আছে। আপনি নিজের গাড়ি নিয়ে আসুন আর আমি পা চালিয়ে আশ্রমে যাই। এই সামনে বাগান দেখছেন— তার পরেই সোজা রাস্তা, ঘাটের কাছেই আশ্রম।

নির্মল শিশুর মত সহজ বাবাজীর হাসি দেখে সজ্জন প্রভাবিত। তাঁর চোখের মণিতে যেন স্নেহরাশি ছলছল করছে। বাবাজী বললেন— সবই রামের ইচ্ছা, যা করেন মঙ্গলের জন্যে। আচ্ছা আসুন, আশ্রমে আবার দেখা হবে।

গাড়িতে বসে পাগলী খুব খুশী। গাড়িতে বসার আগে একবার সে একটু দ্বিধাবোধ করেছিল— আমি কি এমনিই যাব? আমার পায়ে স্যাণ্ডেল নেই, এই নোংরা শাড়ি, ছিঃ ছিঃ, ছেঁড়া শাড়ি পরে গাড়িতে বসব? না না, আমি গাড়িতে চড়ব না। সজ্জন তাকে অনেক করে বোঝালে যে সে তাকে এখুনি ভালো শাড়ি আর স্যাণ্ডেল কিনে দেবে। সজ্জন পাগলীকে শাড়ি আর স্যাণ্ডেল কিনে দিল।

শাড়ি স্যাণ্ডেল পেয়ে রাজেশের পাগলী বউ আনন্দে আত্মহারা। গাড়িতে বসে সে অনর্গল বকবক করে চলেছে— তার মধুর মিলনের রঙিন কল্পনায় সে বিভোর। সময় কাটানো সজ্জনের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। নরনারীর গোপন মধুর সম্পর্কের বর্ণনা পাগলীর মুখে শোনা সত্যিই যন্ত্রণাদায়ক। উঃ, তার মনের গোপন থেকে গোপন রহস্যকে এমন বিকৃত ভাবে দমন করতে গিয়ে সেও পাগল হয়ে যাবে না কি? হায় ভগবান, ভাবতে গেলে শরীর মন শিউরে ওঠে।

মেডিকেল কলেজ, পাকা বাঁধানো নালা, বড় ইমামবাড়া, মচ্ছিভবন পার করে গাড়ি ঘাটের কাছে গলির মুখে এসে দাঁড়াল। সামনের ল্যাম্প পোস্টের মত বাবাজী দাঁড়িয়ে, তাঁকে দেখেই হাউ হাউ করে পাগলী কেঁদে উঠল, না না, আমি কিছুতেই যাব না, যাব না।

গাড়ির দরজা খুলে পাগলীকে টেনে হেঁচড়ে বার করার চেষ্টায় বাবাজী তার গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিলেন। পাগলীর স্যাণ্ডেল, শাড়ি সব চারিদিকে ছত্রাকার হয়ে গেল। মারের যন্ত্রণা ভুলে বেচারী জিনিসপত্তর সামলাবার জন্য আতুর হয়ে উঠল। চড় খেতেই পাগলী বোবার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে। বাবাজী মোলায়েম গলায় পাগলীকে প্রশ্ন করলেন— এসব কি?

নিজের হাত বাবাজীর মুঠো থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে সে প্রায় গর্জে উঠল— আমার স্যাণ্ডেল, শাড়ি, রাজেশ আমাকে কিনে দিয়েছে।

—ইনি কিনে দিয়েছেন?

—না না, আমি পরপুরুষের দেওয়া কোন জিনিস কেন নেব? আপনি আমাকে ছাড়ুন। আমায় রাজেশ বলছে যে সে আমাকে শাড়ি স্যাণ্ডেল পরিয়ে…

—আচ্ছা যাও তোমায় ছেড়ে দিলুম। গাড়ির পেছনের সীট থেকে শাড়ি আর স্যাণ্ডেলের বাক্স উঠিয়ে নিয়ে বাবাজী বললেন— এসব জিনিস রাজেশ দিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—ইনি দেন নি না?

—না।

—আচ্ছা, তা হলে আমি এসব গোমতীর জলে ফেলে দিচ্ছি।

বাবাজীর কথা শুনে পাগলী আধমরা হয়ে গেল। তাঁর হাত থেকে প্রাণপণে নিজের জিনিস ফেরত নেওয়ার জন্য সে হাত পা চালাতে লাগল। তিনি মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বললেন—রামজী বড় উপকার করলেন, আসুন এবার আশ্রমে চলা যাক।

পাগলীর দিকে এক নজর দেখে সজ্জন বললে—না থাক্, আপনার এখানে অনেক পাগল আছে না কি?

—হ্যাঁ রামজী, আমি পাগলদের দুনিয়ার এক সেবক মাত্র, তাই এখানে ডিউটি দিয়ে থাকি। আচ্ছা এবার চলি তাহলে—রাজেশের দেওয়া জিনিস গোমতীর জলে ভাসিয়ে দি—জয় রামজী, উচ্চারণ করতে করতে বাবাজী জিনিস নিয়ে পাগলীকে ক্ষ্যাপাবার জন্যে উচ্চস্বরে বললেন—এই নাও ফেলে দি—ফেলে দি···

পাগলী ব্যাকুল হয়ে তাঁর পেছনে ছুটতে লাগল। সজ্জন হাঁ করে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছে। বাবাজী আর পাগলী দুজনে ছুটতে ছুটতে খরস্রোতা নদীর মত ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নিজের ঘরে এসে সজ্জন নির্জীবের মত অসাড় হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। রক্তহীন মুখে পাণ্ডুর ছায়া, মনে এক অদ্ভুত জ্বালা—উফ্ বনকন্যাকে ঘিরে তার মনে কাম বাসনার আগুন জ্বলে উঠেছে, সেই নিয়ে দিনরাত তার অন্তরমনে মানসিক সংঘর্ষ চলছে। কাল বিকেলে বনকন্যা তার প্রেমকে উপহাস করেছে। হুইস্কি সোডা মিলিয়ে গেলাস মুখের কাছে এনে আবার টেবিলে রেখে দিলে। চাকরকে ডেকে চোখের সামনে থেকে ছাইভস্ম

সরাবার হুকুম দিল। আজ মন্দিরে সে একাগ্রচিত্তে বসতে পারে নি। এবারে সে কন্যাকে দূর থেকেই বেশ কড়া কথা শুনিয়ে দেবে, তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না। জেঠীর পছন্দ করা মেয়ের গলায় সে মালা দেবে।

সজ্জন তার নিজের গড়া মনের জেদ, তর্ক, সংযম অসংযম, আশঙ্কা আর সমাধানের ঘন অন্ধকারে পথ হারিয়ে ঘুরে মরছে। পাগলীকে দেখার পর থেকেই তার মনে অজ্ঞাত ভয় ঢুকে গিয়েছে, হয়তো সেও তার মতই পাগল হয়ে যাবে। নানা এলেমেলো চিন্তার জাল বুনতে বুনতে তার দু'চোখে ঘুম নেমে এল।

মহাকবি বোর হেঁ হেঁ করতে করতে ঘরে ঢুকে সজ্জনকে ঘুমুতে দেখে নিশ্চিন্ত মনে জানালার দিকে চেয়ে গান ধরলে—

আ হা হা হা! ঠণ্ডী হওয়ায়েঁ লৌটকে আয়েঁ
হম হৈঁ য়হাঁ, তুম হো ওহাঁ— কৈসে বুলায়েঁ।

প্রথম গানের কোন প্রভাব হচ্ছে না দেখে দ্বিতীয় গানের লাইন শ্যামের বাঁশির মত বেজে উঠল।

উনকে বুলাবে পে ডোলে মেরা দিল—
যাউঁ তো মুশকিল ন যাউঁ তো মুশকিল।

এত গলা ফাটিয়ে তবু প্রিয়ার মুখচন্দ্রের দর্শন না পেয়ে কবি মহারাজ আবার অন্য গানের তান ধরল—

দিল কিসীকো দীজিয়ে, দিল কিসীকা লীজিয়ে
জিন্দেগী হৈ চারদিন, য়হী কাম কীজিয়ে।

দরজায় ঠেসান দিয়ে বসে কবি মহাশয় একের পর এক গানের কলি গেয়ে চলেছে। সজ্জনের ঘুমের ব্যাঘাত হল। চোখ

খুলতেই সামনে বোরকে গলা ছেড়ে গান গাইতে দেখে সে রাগে জ্বলে উঠল, পুরো দমে চেঁচিয়ে উঠল— গেট আউট, বোর, আই সে গেট আউট!

হঠাৎ সজ্জনের মুখে এধরনের বুলি শুনে বোরমশাই থতমত খেয়ে হাত জোড় করে গাঁই গুঁই করে বললে— হেঁ হেঁ আপনি ঘুমিয়েছিলেন? আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে আপনার ঘুম নষ্ট হয়ে যাবে। হেঁ হেঁ, আজকাল আমি অমর গীতি লেখার মুডে আছি কিনা তাই। নিজের অভদ্র ব্যবহারে সজ্জন নিজেই লজ্জিত হল। হাতে ঠোঙা নিয়ে বনকন্যা দরজার চৌকাঠে এসে থমকে দাঁড়াল। তাকে দেখেই সজ্জনের মনে পরস্পরবিরোধী ভাব জাগছে।

বনকন্যার দিকে চেয়ে বিরহেশ হাত জোড় করে বললে— আপনি হেঁ হেঁ, বনকন্যা, আমি এর আগে আপনাকে থিয়েটারে পার্ট করতে দেখেছি— হেঁ, হেঁ, সজ্জনবাবু আপনাকে প্রসিদ্ধির উচ্চ সোপানে পৌঁছে দিয়েছেন, ঠিক বলেছি কিনা?

কন্যা গম্ভীরভাবে 'হুঁ' বলে ভেতরে চলে গেল। ঠোঙা টেবিলে রেখে সজ্জনকে জিজ্ঞেস করলে, তোমার শরীর কেমন?

কন্যার মুখে 'তুমি' সম্বোধনে সজ্জনের দেহের রক্ত যেন ছলকে উঠল। কন্যার প্রেমের উত্তাপ অনুভব করে এক মিনিটের মধ্যে গলে জল হয়ে গেল।

—বিরহেশ, আমার শরীর ভালো নেই, আমি একটু একা থাকতে চাই বুঝলে? বলে সজ্জন বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজল।

কন্যা চিন্তিত হয়ে তার পাশে চেয়ার টেনে বসল। বিরহেশ

মুচকি হেসে চোখ টিপে, ভগবান করুন আপনার শরীর সুস্থ থাকুক, বলে ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে চলে গেল। তাকে ছাদে যেতে দেখে সজ্জন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। কন্যা আবার প্রশ্ন করলে—

—তোমার শরীর কেমন?

—আমি মরতে বসেছি, তোমার কি?

কন্যা মুখ টিপে হেসে বললে—আমি সঞ্জীবনী ওষুধ সঙ্গে এনেছি।

সজ্জনের দেহের অবসাদ এক মিনিটে ঘুচে গেল। ভুল বোঝাবুঝির পালা শেষ হলে সে যেন বাঁচে।

—জানো কন্যা, ছোটবেলায় আমার ধাইমা এক রাজকুমারীর গল্প শোনাতেন তার কাছে ছিল মরণকাঠি আর জীয়নকাঠি। সেই কাঠি দিয়ে ঘুমন্ত রাজকুমারকে জাগিয়ে তার সঙ্গে মন ভরে খেলা করে তাকে আবার মরণকাঠির ছোঁয়ায় ঘুম পাড়িয়ে সে চলে যেত।

সজ্জনের শিশুসুলভ ভাবভঙ্গি দেখে কন্যা প্রাণ খুলে হেসে উঠল। বাইরে ছাদে বসে প্রিয়ার দর্শনে ব্যাকুল বিরহী বিরহেশ গানের পর গান গেয়ে চলেছে। গান শুনে কন্যা বিরক্ত হয়ে সজ্জনকে প্রশ্ন করলে—ইনি আবার কে?

—আহাম্মক হতচ্ছাড়া একটা, পাগল করে ছাড়বে আমায়।

কন্যা গিয়ে ধড়াস করে জানালা বন্ধ করে দিল। টেবিলে পুরনো খবরের কাগজ পেতে ঠোঙা রাখতে রাখতে বললে—আমি চাকরি পেয়ে গেছি।

কন্যার কথা তীরের মত সজ্জনের মনে বিঁধে গেল। সে কেন

এতদিন কন্যার চাকরির চেষ্টা করেনি? তবে কি কর্নেলের চেষ্টায় সে চাকরি পেয়েছে? তার মনে অসংখ্য প্রশ্ন।

প্রসাদী ঠোঙার এক কোণে লাগানো সিঁদুর আঙুলে নিয়ে কন্যা সজ্জনের কপালে টিপ দিলে। তার শীতল হাতের স্পর্শে সজ্জন ভাববিহ্বল হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে বললে— আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। কন্যা গম্ভীর হয়ে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বললে— এখন এ কথা তোলার কোন মানে হয় না। হাত ছাড়িয়ে কথার প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বললে— মহাবীরের প্রসাদ।

সজ্জন প্রসাদের দিকে না চেয়ে আবার প্রশ্ন করলে— কোন মানে না হওয়ার কারণ জানতে পারি কি?

—আমরা পরস্পরকে কতটুকুই-বা জানি।

—এটা তোমার নিজস্ব মত, তুমি ভালোভাবেই জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি।

—নাও, চটপট করো, প্রসাদ গ্রহণে দেরী করতে নেই।

—তুমি আমার জীবনে ভগবানের প্রসাদের মতই এসেছ। আমি তা গ্রহণে দেরী করতে চাই না। সজ্জনের চোখে অতৃপ্ত বাসনা।

বাইরে থেকে বিরহেশের আওয়াজ ভেসে এল— বউদি, সজ্জনের জন্যে চা তৈরী হচ্ছে না কি? তা হলে আমার জন্যেও এক কাপ ভুলবেন না যেন।

কন্যা রেগে দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বললে— আপনি বড় অভদ্র লোক তো, আপনাকে এসব সম্পর্ক গড়ে ডাকার অধিকার কে দিলে?

—যেতে দাও, ভেতরে চলে এসো, সজ্জন কন্যাকে ডাকলে।

ও বাড়ির বড় বউ এসে জানলার গরাদ্ ধরে দাঁড়িয়েছে। বিরহেশ চাতকের মত সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। হাত জোড় করে কোনমতে কন্যার প্রশ্নের উত্তরে আনমনাভাবে বললে— আমি আমার অমর গীতি লেখার মুডে আছি। সে আমার হৃদয়ে আসন পাততে চাইছে। কন্যা বোরের পাগলামো দেখে বিরক্ত হয়ে ঘরে চলে এল। কন্যা যেতেই মহাকবি পট করে দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলে।

চার চক্ষুর মিলন, বড় বউ আর মহাকবি ইশারায় ভাব-বিনিময় আরম্ভ করে দিয়েছে। দু'জনের চোখে মুখে নানা ইশারা। বড়র দেহের বাঁকে বাঁকে উত্তেজনা। বিরহেশের শ্যেন দৃষ্টি এড়ালো না। সুতোয় বাঁধা কাপড়ের থলি মনোহরণ মন্ত্র নিয়ে বিরহেশের কাছে ঝুলতে ঝুলতে আসতে লাগল। এর আগে দু-তিনবার এই থলির সাহায্যে চিঠির আদানপ্রদান হয়েছে। এর আগের বারে বড়কে দেখিয়ে বিরহেশ থলিকে বুকে চেপে কতই-না আদর করেছিল।

চিঠি লুফে নেবার জন্য বোর সেই সিঁড়ির দিকে এগোলো। কিন্তু থলির সুতোকে ধরা মাত্রই কোথা থেকে ডাঃ শীলা খপ্ করে তার হাত চেপে ধরে ফেলল, তার পেছনে বর্মা। হঠাৎ আক্রমণে বিরহেশ হতভম্ব।

—এখানে কি হচ্ছে? ডাঃ শীলা বেশ উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করল। ওদিকে বর্মাকে দেখেই, বড় বউ জানলার কাছ থেকে উধাও। হাতেনাতে ধরা পড়ে বিরহেশ ঘেমে নেয়ে উঠল। মুখ দিয়ে কথা ফুটল না। ছাদে গোলমাল শুনে সজ্জন দরজা খুলে

সাদর অভ্যর্থনা জানালে— হ্যালো শীলা। সজ্জন বর্মাকে নমস্কার করে বিরহেশকে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কি?

কাঁদোকাঁদো হয়ে বোর বললে— আমার অমর গীতি এঁর হাত থেকে উদ্ধার করে দিন। ডাঃ শীলা থলি থেকে কাগজ বার করে পড়তে লাগল। লাইন টানা স্কুলের খাতার পাতা ছিঁড়ে মেয়েলী হাতের টানা লেখায় প্রেমপত্র পড়ে শীলা খিলখিল করে হেসে উঠল। সজ্জনের হাতে চিঠি দিতে দিতে বললে— এঁর প্রেমগীতি একটু পড়ে দেখো।

হঠাৎ কন্যার দিকে নজর পড়তেই শীলা ব্যাপারটা বুঝে নেবার চেষ্টা করল। দু'জনের কপালে ভিজে সিঁদুরের টিপ দেখে সে হেসে বললে— তুমিই মিস বনকন্যা— না? ঠিক ধরেছি কিনা বলো?

সজ্জন ভ্রূ কুঁচকে রাগতভাবে বললে— বিরহেশ, এসব কি হচ্ছে? ভদ্রলোকের পাড়ায় ছ্যাঁচড়ামো করে আমার সুদ্ধ বদনাম করিয়ে তবে তুমি ছাড়বে, যা দেখতে পাচ্ছি। আর যদি কখনো তোমায় এ তল্লাটের ধারে কাছে দেখেছি, তা হলে সোজা পুলিসে খবর দিয়ে দেব। এখুনি বিদেয় হও, যাও।

—যাচ্ছি, যাচ্ছি কিন্তু আমার চিঠি···

কবি মহাশয় ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। সজ্জন চিঠিটা বিরহেশের মুখে ছুঁড়ে মারল। বর্মা চিঠিটা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কড়া গলায় বললে— পাড়ার ইজ্জৎ কাগজের সঙ্গে বাইরে যাওয়া ঠিক নয়। এখানেই এটাকে শেষ করলাম। মানে মানে যাও এখান থেকে।

কন্যা আর শীলা দু'জনে কথা বলতে বলতে ভেতরে চলে গেল।

বর্মা চালাকি করে ছেঁড়া চিঠির ভাঁজ সামলে পকেটে পুরছে

দেখে বিরহেশ তার দিকে আগ্নেয় দৃষ্টি হেনে বললে— গরীবের প্রেম তোমাদের বড়লোকদের সহ্য হয় না। নিজেরা দরজা বন্ধ করে দিব্যি প্রেমালাপ করবে আর অন্যের বেলায়··· সজ্জন চোখ পাকিয়ে তাকাতেই বিরহেশ তর তর করে নীচে নেমে গেল। বর্মা সজ্জনের কাঁধে হাত রেখে নীচু গলায় বললে— এই ব্যাটার প্রেমালাপ চলছে পাশের বাড়ির কারুর সঙ্গে। এই চিঠিটা এসেছে বড় ভাইয়ের ঘরের জানলা থেকে। আপনার বদনাম হয়ে যাবে।

সজ্জন চিন্তা করতে করতে গম্ভীরভাবে বললে— সর্বনাশ করছে। এখানে ব্যাটা কোথা থেকে এসে নিশানা লাগাচ্ছে।

—এই রাস্কেল— আর্টের জায়গায় আজকাল প্রেমের ক্লাস খুলেছ নাকি? শীলা ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে বললে।

—তুমিও এখানে তোমার প্রেমিকের খোঁজে এসেছ না কি?

—এখানে কাছেই এক রুগী দেখতে এসে ভাবলুম তোমার এখানে একটু ঢুঁ মেরে যাই। ভালোই হল, তোমার সব খবরা-খবর স্বচক্ষে দেখে গেলুম, শীলা কন্যার দিকে চেয়ে সস্নেহে বলল। কন্যা সজ্জন দু'জনেই সলজ্জ হাসি হাসল।

—নাও, নাড়ু খাও, মহাবীরের প্রসাদ, ইনি চাকরি পেয়ে গেছেন।

—ভালো খবর, কোথায়? শীলা জিজ্ঞেস করলে।

—নবজীবনের সম্পাদকীয় বিভাগে, শীলার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কন্যা জিজ্ঞেস করল— আমার মনে হয় এবার এক এক কাপ চা খাওয়া যাক।

—আমায় মাপ করবেন। হাতজোড় করে বলে বর্মা।

—কেন? সজ্জন জিজ্ঞেস করল।

—এখান থেকে সোজা দোকানে যাব, বেশ দেরী হয়ে গেছে।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখনো কুড়ি পঁচিশ দিন হাতে সময় আছে। আপনি প্রসাদ মানত করে রাখুন, নিশ্চয় ছেলে হবে, কেমন? শীলা মুচকি হেসে বললে।

বর্মা হাসতে লাগল— সময় সুযোগ আসতে দিন, আপনার বাড়িতে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে হাজির হব। বর্মা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই শীলা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে সামনে কন্যাকে দেখে হেসে বলল— তুর্জন মশাইয়ের ভাগ্য খুব ভালো। মিস বনকন্যা স্টোভ ধরিয়ে মনোযোগ দিয়ে কেমন চায়ের ব্যবস্থা করছে··· দাও একটা নাড়ু খেয়ে দেখি··· মহিপাল কিন্তু সেদিন আমায় বলছিল যে কন্যা কম্যুনিস্ট।

—হ্যাঁ, আমি কন্যাকে জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলুম ও মঙ্গলবারে মহাবীর দর্শন মানে নাকি? পাশ বালিশে ঠেসান দিয়ে বিছানায় বসতে বসতে সজ্জন বললে।

কন্যা দুধের বোতল থেকে দুধ ডেকচিতে ঢালছিল, বললে— ভগবানের বিষয় আমি কখনো তেমন সিরিয়াসলি ভেবে দেখি নি। তাঁর অস্তিত্বকে কোন তর্ক দিয়ে ছোট করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবানই আমার সুখদুঃখের সাথী।

—ভগবানের বিষয় তর্ক করা নিছক ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার মতে মানুষ তার সারাজীবনের কাজের মধ্য দিয়ে ভগবানের সাধনা করে, শীলা বললে।

—মহিপাল এধরনের কথা প্রায়ই বলে। সজ্জন যেন শীলার ক্ষতস্থানে অস্ত্রোপচার করল।

—তুমি কি ভাবো আমি তার থেকে আলাদা? আমাদের চিন্তার গতি এক নয়?

—গ্রেট, একেই বলে বিশুদ্ধ প্রেম, কন্যাকে শুনিয়ে সজ্জন বললে, কিন্তু তার চেহারা যেন অনেকটা নিস্পৃহ।

—পৃথিবীতে, বিশেষ করে আমাদের ভারতে ঈশ্বরের নামের মহিমা চিরকালই ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে, এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

—বিজ্ঞান নিশ্চয় একদিন এ রহস্যের সমাধান করবে। তাতে হয় এই ধারণার পুষ্টি হবে অথবা তাকে চিরকালের মত কবর দেবে। আমরা আজ বিজ্ঞানের জগতে বাস করছি, পৃথিবী থেকে অনেক দূরে অন্য গ্রহ-উপগ্রহে যাওয়া যখন সম্ভব তখন এ রহস্যের মীমাংসা কেন হতে পারে না? দুধের ডেকচির দিকে কন্যা দৃষ্টি ফেরাল। দুধ এবার উথলাবে।

—তার আগেই যদি প্রলয় আসে, তা হলে? সজ্জন অনুরাগে ভরা চোখে কন্যার দিকে তাকালে।

—প্রলয় যদি আসেই তা হলে সৃষ্টির শেষদিনে আমি ঈশ্বরের সামনে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেব। খোদার সামনে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাব যে এই দুর্জন ভদ্রলোকটি একটি সুন্দরী, সাদাসিধে মেয়ের মন চুরি করে বসে আছে।

ইতিমধ্যে দুধ উথলে উঠতেই কন্যা আঁচল দিয়ে ডেকচি ধরে ধপ করে নামিয়ে মেঝেতে রাখল। চায়ের জলের জন্য সোরাই থেকে জল নিতে গিয়ে দেখল খালি। সজ্জন উঠতে উঠতে বললে— দাও, আমি ভরে নিয়ে আসি।

—কল কোথায়?

—নীচে।

—তুমি বসো, আমি নিয়ে আসছি।

—তুমি একা কোথায় যাবে? রেফিউজিরা তোমায় দেখেই চমকে উঠবে।

সোরাইয়ের কানা দু'জনের হাতে ধরা, দু'জনের চোখে রহস্যের ঝিলিক। কন্যার চোখে লজ্জা আর সংযমের কপাট। লজ্জায় ঘাড় নীচু করে কন্যা বলে— আমি এত ভয়ংকর দেখতে বুঝি?

—আর কেউ ভয় করুক আর না করুক, আমি ভীষণ ভয় পাই কিন্তু। সজ্জন তাড়াতাড়ি সোরাই নিয়ে জল আনতে গেল।

স্টোভের তেল পুড়ছে দেখে কন্যা নিভিয়ে দিলে। শীলা আদর করে কন্যার হাতে ফট করে এক চুমু খেয়ে বললে— তুমি বড় মিষ্টি, সত্যি ভাই, সজ্জন খুব ভাগ্যবান বলতে হবে। বাস, এবার তোমরা ঝটপট করে বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ো আর আমরা হৈ চৈ করে বেশ পেট পুরে খাওয়া-দাওয়া করি।

—এখন আমার ইচ্ছে নেই।

—কেন?

—আপনার সঙ্গে আপনার রুগীদের সম্পর্ক কতটা? কেবল ফীস আর ভিজিট এই নয়? কিন্তু যারা দিনরাত রুগীর সেবা করছে তাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক আপনার থেকেও ঘনিষ্ঠ, তাই নয়?

—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বিয়ের বন্ধন তোমার পক্ষে এক গভীর চিন্তার বিষয়। সত্যি বলো তো ভাই, যারা স্কুলের পরীক্ষার মত ধাপে ধাপে প্রেমের পরীক্ষা দিয়ে শেষকালে বিয়ের সার্টিফিকেট নেয় তুমি কি তাদেরই মধ্যে একজন? এই আহম্মুকীর কথায় আমার ভীষণ হাসি পায় কিন্তু। নিজের ওপর

ভরসা করো, তোমরা যখন দু'জনেই লেখাপড়াজানা, বুদ্ধিমান, তখন তোমাদের প্রেমের বন্ধন ঢিলে হয়ে পড়ার কোন কারণই আমি ভাবতে পারছি না।

—আমি আপনার কথায় সায় দিতে পাচ্ছি না।

—আমাকে বার বার আপনি না বলে তুমি বলো ভাই, মাই ডিয়র। তোমাকে আমার ভীষণ ভালো লেগেছে। আমাদের সম্পর্ক অটুট বাঁধনে বাঁধা হয়ে থাকবে। তোমায় আমি আগেই বলেছি যে আমি মনের টানে বিশ্বাস করি।

সোরাই নিয়ে সজ্জন ঘরে ঢুকল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে তার হাত থেকে সোরাই নিয়ে কন্যা চায়ের সরঞ্জাম করতে গেল। তাকে সাহায্য করার বাহানায় সজ্জন তার হাতের কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। শীলা সজ্জনকে বললে— দুর্জন মশাই, স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ নিয়ে জীবনে আমি অনুভব করেছি প্রেম থিয়োরি নয়, প্র্যাকটিস, প্রেমের মাত্রার ওপর পরস্পর সম্পর্কের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তোমার কি মত?

—আমি তোমার কথার বিপক্ষে যেতে পারি কখনো? বাহঃ, বেশ দামী কথা বলেছ, লাভ ইজ নট থিয়োরি বাট প্র্যাকটিস।

—দুর্জন, কাল পর্যন্ত যার ভিত্তিতে আমার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজ তা ভূমিকম্পে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। স্ত্রী বা পুরুষ দু'জনের জন্য বিবাহের প্রথা কষ্টকল্পিত নাট্যের অসংলগ্ন বিন্যাস নয়, তপস্যালব্ধ ধন। কেউ তাদের সম্বন্ধকে আইনের কষ্টিপাথরে কষে ঘৃণিত ইঙ্গিত করার সাহস করবে না। —বলতে বলতে শীলার চোখ জলে ঝাপসা হয়ে এল। সুখী একটি ছোট নীড় যেখানে কন্যা হবে সুগৃহিণী, সজ্জনের ভাবুক মনে ভবিষ্যৎ কল্পনার

ছবি। শান্ত গম্ভীর কন্যা কেতলীর দিকে চেয়ে শীলার কথা মন দিয়ে শুনছে। শীলার চোখের জল সজ্জনের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল।

হঠাৎ শীলা জিজ্ঞেস করলে— আচ্ছা দুর্জন, এখুনি যে প্রেমিক-প্রেমিকার রহস্য হাতেনাতে ধরা পড়ল, এরা দু'জনেই বিবাহিত, না?

—বিরহেশ ছেলেমেয়ের বাবা, আর যে মেয়ের সঙ্গে সে প্রেম করছে···

—সেও নেহাৎ খুকী নয়, এই না? চিঠির ভাষাতেই তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। পরের চিঠি এভাবে কেড়ে নেওয়া আমার পক্ষে মোটেই উচিত হয়নি··· নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করছে। সিঁড়ি দিয়ে আসার সময় স্বচক্ষে তামাশাটা দেখার পর আমার মাথায় বেশ রাগ চেপে গিয়েছিল। রাস্তা দিয়ে দেয়াল বেয়ে চিঠি আসা দেখে তোমার লম্বা ঝাঁকড়া চুলের প্রেমিক তখন আনন্দে আত্মহারা। আমার মতে এটা নিন্দনীয় কাজ, নয় কি?

—হ্যাঁ খুব খারাপ কাজ, লোকটাকে বেশ দু'ঘা বসিয়ে দেওয়া উচিত— স্টোভ বন্ধ করতে করতে কন্যা বলল।

—কেন? শীলার গলার স্বরে অব্যক্ত আর্তনাদ। চায়ের কাপ নেবার জন্য উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে কন্যা বললে— এরা প্রেমের পূজারী নয়, এরা দেহের ভিখারী।

—এতে ক্ষতিটাই বা কি? শীলা চাপা গলায় প্রশ্ন করল।

—ক্ষতির বিষয় জানতে চান? এই বাসনার বহ্নিশিখায় আমি আমার বাড়িতে দুটি প্রাণের আহুতি চোখের সামনে হতে দেখেছি। কত মেয়েরা এই পিচ্ছিল পথে একবার পা বাড়িয়ে চিরজীবনের মত এই গভীর খাদে পড়ে গেছে।

—এর জন্যে দোষী আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা। দেহের

ক্ষুধাকে ঘৃণিত চোখে দেখার কোন সঠিক কারণ আমি ভেবে উঠতে পারছি না— যদি পেটের ক্ষুধা মেটানো পাপকর্ম নয়, তবে দেহের ক্ষুধা মেটানো পাপ কেন?

—ডাক্তার, এসব তোমার মনের কথা নয়, আমার পরীক্ষা নেবার ছলনা মাত্র? কন্যার প্রতিটি কথা আগুনের ফুলকির চেয়ে কম মনে হল না। সজ্জন চুপচাপ বসে চা খেতে খেতে দু'জনের কথা শুনছে। কন্যার যুক্তি আর শীলার ফাঁকা তর্ক, দুই বিপরীত বিচারধারার মধ্যে সে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কন্যার প্রশ্নের উত্তরে শীলা ফিকে হাসি হেসে বললে— যদি আমি বলি এ আমার মনের কথা, তাহলে?

—তাহলে তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হতেই পারে না।

—এত ঘেন্না?

—এই তো আমার সঞ্চিত ধন।

—কখনো তাকে কোন কারণেই হারাতে রাজী নও?

কন্যা সজ্জনের দিকে একনজর দেখে বললে— এর উত্তর অন্য কোন সময় দেব।

—যাকগে, তবে একটা কথার উত্তর দেবে? মানুষের দুর্বলতার পেছনে কি লুকিয়ে আছে? যে লোকটি এখানে এসে পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করছে, হয়তো এর স্ত্রী একেবারেই গেঁয়ো ভূত। তাই বেচারা প্রেমের পিপাসা মেটাবার জন্যে...।

—তবু এ আমার সহানুভূতির পাত্র হতে পারে না। নিজের ক্ষুধার জন্য পরের জীবন নষ্ট করতে দ্বিধাবোধ করছে না।

—আমি এবার বুঝতে পেরেছি, তোমার আপত্তি কোন্‌খানে। বর্তমান সামাজিক গঠনে এরা মেয়েদের নষ্ট করার সুযোগ পাচ্ছে,

তাই নয়? ধরো যদি সমাজ-গঠনে আমূল পরিবর্তন এনে ফেলা যায়, তা হলে?

—তখনও ব্যভিচারীর জন্য ভদ্রসমাজে কোন স্থান থাকবে না। শীলা গম্ভীর, চুপ। কন্যা ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিতে দিতে সজ্জনকে জিজ্ঞেস করলে— আর-এক কাপ দেব?

সজ্জন কাপ এগিয়ে দিলে।

—কখনো কখনো এমনও হতে পারে, ধরো আমি বিবাহিতা, ছেলেমেয়ের মা, স্বামীকে ভালোবাসি অথচ সজ্জনের মত এক ভদ্রলোক আমায় প্রভাবিত করতে পারে। ভদ্রলোকও বিবাহিত, ধীরে ধীরে আমরা পরস্পরের বন্ধু হয়ে যাই— এরমধ্যে যদি কখনো আমরা দেহের···

—আমি তোমাদের দু'জনকেই তাহলে ঘেন্না করব।

শীলা হার মানা অনুনয়ের স্বরে বললে— তুমি বড় জেদী মেয়ে। ঘৃণা বড় জিনিস নয়। মানুষকে তার দোষগুণের সঙ্গে ভালোবাসতে শেখো, তাকে আপন করতে শেখো। মনুষ্যত্ব মানুষের চারিত্রিক পবিত্রতা থেকে অনেক বড়।

তালি বাজিয়ে সজ্জন হেসে বনকন্যার দিকে চেয়ে বললে— হিয়র হিয়র, এ ভেবো না আমি তোমার বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছি, কিন্তু শীলাকে বাহবা না দিয়ে পারছি না। সত্যি শীলা, তোমার মনটা খুব অনুভূতিশীল, স্পর্শকাতর। তবু একটা কথার উত্তর আমাকে দাও— তোমার মনুষ্যত্বের মাপদণ্ডে তোমার অনুভূতির স্থান কোথায়?

শীলাকে বড় করুণ দেখাচ্ছিল— পাপকে ঘৃণা করো কিন্তু পাপীকে ভালোবাসতে শেখো। তোমার প্রেমের স্পর্শে হয়তো সে কোনদিন তার ভুল বুঝতে পেরে প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে।

—আমি আপনার অহিংসা পথের পথিক হতে চাই না। পাপকে শেষ করার জন্যে পাপীর গর্দান কাটাই শ্রেয়।

শীলা নিজের দুর্বলতাকে ঢাকবার চেষ্টা করে মলিন হেসে বললে— এই মেয়ে তোমাকে বিয়ের পর পিঞ্জরে আটকে রাখবে, বুঝেছ দুর্জন মশাই?

কন্যা হেসে উত্তর দিলে— যদি পিঞ্জরে থাকতেই হবে তা হলে বিয়ে করার দরকারটা কি?

—নামটাই সজ্জন কিন্তু আসলে এ মোটেই তা নয়। তাই আমি একে দুর্জন বলে ডাকি।

শীলার উক্তি সজ্জনের গায়ে বিঁধল কিন্তু সে চুপ করে রইল।

—আপনি এঁকে কাল পর্যন্ত দেখেছেন, আমি এঁকে আজ এই মুহূর্ত থেকে দেখছি। বিগত দিনের কথা আমি জানতে চাই না, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কোনদিন এঁর জন্য আমার গায়ে কোনরকম আঁচড়··· আবেগে কন্যার গলার স্বর বুজে এসেছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। সজ্জন অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নড়েচড়ে বসল।

শীলা পাষাণের নিশ্চল প্রতিমার মত মাথা নীচু করে বসে রইল।

একুশ

আজ সারাদিন কন্যার উপস্থিতিতে সজ্জন এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন। ঝড়বাদলের আগে বাতাস যেমন ভারী হয়ে ওঠে, নারীর উপস্থিতিতে পুরুষের মনে আবেগের বশে দেখা দেয় উদ্বেগ আর আশঙ্কা। শীলা চলে যেতেই সজ্জন একটু ভালোভাবে হাত-পা ঝাড়া হয়ে বসতে বসতে বললে— আমার চরিত্রে যদি কোনদিন ব্যভিচার দেখতে পাও, তা হলে কী করবে কন্যা?

—বউদির মত আগুনে পুড়ে মরব। উত্তর শুনে সজ্জন কাঁচুমাচু হয়ে আমতা আমতা করে বললে— আরে ছিঃ, পাগল হয়েছ?

—পরের আগুন নিয়ে আলোচনা করা খুব সহজ, কিন্তু তোমার চরিত্রে আগুনের ছোঁয়া সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—কিন্তু ধরো, যদি আমাদের বিয়ে সম্ভব না হয় তা হলে?

—বিয়ে না হয় না হোক, তাই বলে এ সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে না। কন্যা হেসে ফেললে— এ সম্পর্কের সূত্রপাত আমিই করেছি, যদিও তাতে রূপ দিয়েছ তুমি। সম্পর্কটাকে বজায় রাখার ভার আমার, কিন্তু তাকে রূপেরসে পরিপূর্ণ করার ভার তোমার।

সারাদিন কন্যা তাকে নিজের কড়া শাসনে রাখার চেষ্টা করেছে। তাকে নিয়ে কর্নেলের কাছে যাওয়া, মথুরার উকিলকে নিয়ে

ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে গিয়ে স্বর্গীয়া বউদির হাতের লেখা চিঠি দেওয়া, পর পর সব কাজ সে বেশ নিপুণভাবে সেরে ফেলেছে।

ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কর্নেল কন্যাকে একটু বাজারের দিকে পাঠিয়ে দিলে, এতক্ষণে সজ্জন হাঁপ ছাড়ল। আজ সে নিশ্চিন্ত যে কন্যা তার জীবনে পাকাপাকি ঘর বাঁধবেই, তার লাগাম বড়ই শক্ত। এ কথা সত্য যে যতনে রতন মেলে কিন্তু মন দেওয়া-নেওয়ার মাঝে এই সংযমের বাঁধকে টিকিয়ে রাখা কি সম্ভব হবে? উফ্ আর যেন সে ভাবতে পারছে না, কন্যার আকর্ষণের জালে ছটফট করতে করতে শেষে সে কি পাগল হয়ে যাবে?

সজ্জন গাড়ি নিয়ে সোজা গোমতীর ধারে পাগলা আশ্রমে এসে হাজির হল। সেখানে অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা। পাকা বারদুয়ারীর চারিদিক আট-দশটা খাটিয়া পাতা, সামনে শুকনো ঘাসের ছাপ্পরের নীচে কৌপীনধারী যুবক রান্না করছে। মেয়েমানুষ রুগী ছাড়া বাকী সব পুরুষ রুগীদের মাথা ন্যাড়া আর কৌপীন আঁটা। ওপাশে কোণে মাটিতে জাঁতা পোঁতা রয়েছে। বাইরে একজন বৃদ্ধ সাধু গরম সোয়েটার পরে, কানে গামছা বেঁধে দু-তিনজনের সঙ্গে কথা বলেছেন। এক মারোয়াড়ী যুবক গীতা পাঠ করে উপদেশামৃত দিতে ব্যস্ত। বেঁটেখাটো এক বাঙালী ভদ্রলোক তাঁর সায়েবের গল্প শোনাতে মশগুল। থামে লোহার চেন দিয়ে বাঁধা এক পালোয়ান নিজেকে বন্ধনমুক্ত করার চেষ্টা করছে আর এক নিঃশ্বাসে হাজারটা গালাগালি দিয়ে বাবাজীর ভূত ভাগাচ্ছে। তার পাশে অন্য থামে বাঁধা এক জঙ্গলের ঠিকেদার হুমকি দিয়ে চলেছে—এ শালা পাকিস্তানী এজেন্ট।

রোজ রাত্তিরে এর এরোপ্লেন আসে। আমার আড়াই লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়েছে। মাঝ রাতে একে মেরে ফেলে আমরা উড়োজাহাজে পালিয়ে যাব। যোগাসনে বসার মত এক হাড়-জির-জিরে সিদ্ধি যুবক গালে জল ভরে গাল ফুলিয়ে বাবু হয়ে বসে আছে। দুজন মেয়েমানুষ গোমতী থেকে বালতি করে জল নিয়ে আসছে, তাদের মাথাও ন্যাড়া। ক্যাপ্টেন রাজেশের পাগলা স্ত্রী শুয়ে ছিল আর ঠিক সে সময় তার মাথার চুল কেটে দেওয়া হয়।

সজ্জনকে দেখেই বৃদ্ধ সাধু প্রসন্ন হেসে অভ্যর্থনা জানালেন, এতক্ষণে ওরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। —রামজী আপনি সকালে সময়মত এসে আমার অনেক উপকার করলেন। লক্ষ টাকা দিলেও খুসী হতাম না। সামনে বসা লোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন— এই রামজীই সকালে আমাকে বাঁচিয়েছে। এর কথার জালে পাগলী সুড়-সুড় করে চলে এল।

সামনে বসা পণ্ডিতজী টিপ্পুনি কাটলেন— পৃথিবীতে এখনো উপকারী জীবের সম্পূর্ণ অভাব হয়নি মহারাজ। আপনাদের পুণ্য প্রতাপের দৌলতে এখনো পৃথিবী টিঁকে আছে। আজ বাজারে কত লোকের মুখে শুনতে পেলাম যে হয়তো বাবাজী এই মেয়েমানুষটির ওপর অনুচিত··· আরে রামো রামো, আমি ভাবতেই পারি না, আপনার মত মহাত্মা···।

—আমি সেবক মাত্র, না সাধু না বৈরাগী। আমার গুরু আমাকে উপদেশ দিতে আর গুরুদক্ষিণা নিতে কার্পণ্য করেন নি। একহাতে দিয়ে অন্য হাতে ফেরত নিয়েছেন। যা উপদেশ দিয়েছেন তাই আবার বচনের মোড়কে বেঁধে ফেরত নিয়েছেন। উপদেশ দিয়েছিলেন যে দুনিয়াটাকে আমারই রূপ ভেবে কৌপীন

এঁটে তার সেবায় লেগে যাও, শেষ নিশ্বেস পর্যন্ত সেবায় যেন কোন ত্রুটি না হয়। আমি রামজী এইটুকুই জানি।

হঠাৎ সেই সিন্ধি যুবক একলাফে খাটিয়া থেকে উঠে নালীতে গিয়ে হড়হড় করে খানিকটা বমি করে ফেললে। মেঝে, তার কাপড়-চোপড় সব নোংরা হয়ে গেল।

—এ আবার কি করলে? বলতে বলতে বাবাজী হনহনিয়ে সেইদিকে গেলেন। সজ্জনের মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল—ওহঃ বাড়িতে একজন পাগলের দেখাশোনা করতে হলে বাড়ির লোকদের মাথা ঘুরে যায় আর এখানে কত পাগল। চারিদিকে মারপিট হৈ হল্লা, মুখ খিস্তি।

—আপনাকে কি দিয়ে খাতির করব রামজী? সিদ্ধির শখটখ আছে নাকি? আনাব একটু?

—না না, আপনার আশীর্বাদই যথেষ্ট, ব্যস্ত হবেন না।

—একটু তাহলে চা খেয়ে যেতে হবে। আমার আশ্রমে এলেন আর কিছু খাবেন না, সে কি কথা।

—আপনি উল্টো কথা বলছেন, আমার উচিত আপনার সেবা করা।

—রামজী, মানুষের উচিত মানুষের সেবাধর্মে দীক্ষিত হওয়া। সেবাধর্মের অভাবে মানুষ ভুলভ্রান্তির জালে জড়িয়ে পথ ভুলে যায়।

—আপনার কথার অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

—খাঁটি সেবক সর্বদা শান্ত আর সতর্ক থাকে। হাজার ভুল হলেও সে তার মনের শান্তি হারায় না রামজী।

—আপনি সেবক হতে কেন উপদেশ দেন? দাস মনোভাব থাকা কি সমীচীন?

মুচকি হেসে বাবাজী বললেন— একই কথা রামজী। প্রথম জীবনে আমি মোটর সারানোর কাজ করতাম। মালিকের সঙ্গে খটাখটি হতে সোজা বিন্ধ্যাচলে চলে গেলাম। ত্রিকূটিতে গিয়ে ধ্যান, নির্জলা উপোস, কতরকমই করলাম। সেখানেই এক মহাত্মার দর্শন, তিনি জ্ঞান অমৃত দিয়ে বললেন— নিজের ডিউটি ছেড়ে পালিয়ে এখানে কী করছিস? যা তুনিয়াতে গিয়ে প্রাণীর সেবা কর। গুরু ঠিকই বলেছিলেন নিজের ডিউটি না করে কেউ নিজের কর্তা হতে পারে না, আমি কিন্তু সেবকের পদমর্যাদাতেই সন্তুষ্ট…

বাবাজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সজ্জনের মন শ্রদ্ধায় নত হল। তাঁর সেবাধর্মে আছে তৃপ্তি, আছে বিশ্বজগতের আত্মচেতনা। আমি সজ্জন বর্মা কেন সাধুসন্ন্যাসীর চক্করে ঘুরে বেড়াচ্ছি? সেবাধর্মের মহিমা হয়তো বিবেকানন্দ, গান্ধীজীর মত ব্যক্তিত্বের থেকেও মহান। সেবা… হঠাৎ চাকরবাকর, ড্রাইভার, পুরুত, মালী, বাবুর্চী, দেওয়ানজী, ক্লার্ক, পাহাড়ী চৌকিদার— সকলের সমবেত চিত্র তার সামনে ভাসতে লাগল। সে নিজে একাই এতগুলো লোক খাটাবার জন্মসিদ্ধ অধিকার রাখে, তারা তাকে সর্বক্ষণ হুজুর মা বাপ মালিক বলে খোশামোদ করে থাকে। নম্রতার প্রতিদানে তাদের ভাগ্যে জোটে সজ্জনের বকুনি গালাগালি আর হুমকি। দূর থেকে ফুলের সুগন্ধ ঘ্রাণ নেওয়া সহজ, কিন্তু ফুলকে স্পর্শ করে আনন্দ উপভোগ করা ততই কঠিন। নিজের মনের বাসনার জ্বালায় আজ সে পরাজিত। নৈতিক মনোবল সে হারিয়ে ফেলেছে। সুদীর্ঘ বত্রিশ বছরেও সে নিজেকে চিনতে পারল না। এতদিন পর্যন্ত সে কি তার পাপের বোঝা বাড়িয়ে চলেছে? যা ভেবেছে তাই করেছে, অসংযত মনে সংযমের

লাগামের অভাবে সে ভুলপথে এলোপাথারি ঘুরছে, তা হলে কি সে খারাপ লোক— পাপী ?

—আপনি কিছু ভুল করেননি রামজী, অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সঞ্চয় করা ভুল নয়। আমার নিজের জীবনের ঘটনা শুনবেন ?

বাবাজীর মুখে তার মনের প্রশ্ন শুনে সজ্জন চমকে উঠল। বাবাজী বললেন— প্রথম জীবনে আমি মোটর মেকানিকের কাজ করতাম। সবে তখন এ দেশে নতুন নতুন মোটর গাড়ি এসেছে। হাতের কাজ জানা লোকের তখন অভাব। ইউরোপীয়ান সায়েবরা খুসী হয়ে বকুশিশ দিত। আমার সব মিলিয়ে প্রায় মাসে আড়াই শো টাকার মত রোজকার হ'ত। আমার মত গাঁয়ের ভূত পয়সার গরমে অহংকারে সাপের পাঁচ পা দেখল। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে দু'শো-আড়াই'শো টাকা মানে অনেক টাকা। হাতে দু'পয়সা হতেই সাহেব সাজার শখে কোট প্যাণ্ট পরলাম। দু'বেলা নিয়ম করে একসারসাইজ করা, সিদ্ধি ঘোঁটা, ঘি দুধ রাবড়ি খাওয়া, মানে রাজের হালে থাকতে লাগলাম। খরচখরচা বাদে বাকী যা একশো সওয়া শো বাঁচত, বাবাকে মনিঅর্ডার করে দিতাম। ভালো ভালো আহারের ফলে মুটিয়ে গেলাম। গোড়া থেকেই ডিউটি জ্ঞান আমার টনটনে। আদিম বাসনাকে সদাই উপেক্ষা করে চলার মত চরিত্রের মনোবল আমার ছিল। পালোয়ানী করার শখ ছিল তাই সর্বদাই বুক চিতিয়ে হাঁটতাম। একদিন একটি লোক আমার বিরুদ্ধে মালিকের কানে ভুজুংভাজং দিলে— আমার ওপরে মালিকের পয়সা চুরি করার অভিযোগ শুনেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। মিথ্যে বদনাম সহ্য করার পাত্র আমি নই। দিনের বেলা যে ট্রাকটা সারাচ্ছিলাম সেটাকেই

বিকেলে চালিয়ে দেখার বাহানা করে বেরিয়ে পড়লাম। নিজের ঘরের সামনে দাঁড় করিয়ে বেশ অনেকখানি সিদ্ধি খেলাম। তারপর মাঝ রাত্তিরে ট্রাক নিয়ে সোজা ফুটপাথের ওপর চালিয়ে দিলাম। সেই লোকটা খাটিয়া বিছিয়ে ফুটপাথের ওপর শুয়ে ছিল। বাস, আর দেখতে হল না, হাড়গোড় সব গুঁড়িয়ে গেল। আমি ফুল স্পীডে ট্রাক চালিয়ে দেয়াল টেয়াল ভেঙে সোজা কারখানায় এসে হাজির। আমার মালিক, এক ইংরেজ সায়েব সেই কম্পাউণ্ডেই থাকতেন। সোজা তাঁর কাছে গিয়ে সব ঘটনা খোলাখুলি ভাবে বলে দিলাম। সায়েব আমার কাজে খুব সন্তুষ্ট ছিল, তাই সব-কিছু শোনার পর বেশ চিন্তিত হ'ল। কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে সে আমাক বললে— আচ্ছা যাও, সত্যি কথা আমাকে বলে ভালোই করলে কিন্তু একজন খুনীকে কারখানায় রাখা আমার দ্বারা সম্ভব নয়·· যা বলছিলাম রামজী, মূর্খ মানুষ অভিজ্ঞতায় ঠেকে শিখে তারপর সদ্‌গুণ সঞ্চয় করার চেষ্টা করে।

বাবাজীর কাহিনী শুনে সজ্জনের মনে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল। খুনী আর সেবাব্রতধারী বাবাজী দুই রূপের কল্পনা তার মনে ধাঁধার সৃষ্টি করল। বাবাজীর জীবনের অদ্ভুত কাহিনী তার জিজ্ঞাসু মনকে প্রশ্নের কুয়াশায় ঘিরে ফেলল। তার মুখের দিকে চেয়ে বাবাজী বললেন— কুয়াশা যতই বাড়াবে ততই অন্ধকার হয়ে আসবে। যতই ছেঁটে ফেলার চেষ্টা করবে, ততই আলোকের সন্ধান পাবে।

বাবাজীর কথা শুনে সজ্জন আবার চমকে উঠল। তিনি হেসে বললেন— আশ্চর্য হবার এতে কিছুই নেই রামজী। তুলসীদাসজী ঠিকই বলে গেছেন, সকল পদারথ এ জগমাহী, কর্মহীন নর পাবত নাহী।

বসে বসে সজ্জনের চোখ ঘুমে বুজে এল। নানা চিন্তা তার মাথায়। তার মনে হল যেন বাবাজীর চোখের জ্যোতির আবেশে তার হৃদয় উন্মিলিত হচ্ছে। সে অনুভব করল যেন তার অন্ধকার হৃদয়ে জ্যোতির উৎসারণ হয়েছে, সেই আলোতে সে অন্তরীক্ষে বনবন করে ঘুরে চলেছে আর তাঁর দৃষ্টি অসীমকে ধরার চেষ্টা করছে। নিজের দাম্ভিক স্বভাবের জন্য সে সহজে পরাজয় স্বীকার করতে রাজী নয়। ভীষণ ঘুমে চোখের পাতা বুজে আসছে··· এমন সময় সামনে ছোট এলাচ, দারচিনি আর মৌরী দেয়া বেশ কড়া এক গেলাস চা দেখে তার ঘুমের ঘোর অনেকটা কেটে গেল।

বাইশ

বাবাজীর আশ্রম থেকে ফিরতি পথে রাস্তায় মহিপালের সঙ্গে দেখা। সে একমনে ছতর মঞ্জিলের পাশ দিয়ে মাথা হেঁট করে হেঁটে যাচ্ছিল। সজ্জনের ডাকে সাড়া দিয়ে বললে—যাক, ভালোই হল তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে। আমাকে শীলার বাড়ি পর্যন্ত ছেড়ে দিও। গাড়িতে মহিপাল একথা-সেকথার পর কন্যা আর সজ্জনের বিষয়ে তার মন্তব্য আরম্ভ করলে। শীলার সঙ্গে কন্যার তুলনা হতেই সজ্জন আর চুপ করে থাকতে পারল না—শীলাকে আমি শ্রদ্ধা করি কিন্তু কন্যার সঙ্গে তার

তুলনা করা নিরর্থক। আমার স্বর্গীয়া মা ছাড়া কন্যা নিষ্ঠায় অন্য মেয়েদের থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ।

—নিষ্ঠায় আমার বিবাহিতা স্ত্রীও কারো চেয়ে কম নয়।

—তবে? তাকে ছেড়ে শীলা…।

—শীলা আমার জীবনে নেশার অভাব মেটায়। তুমি জানো, আমি মদ খাওয়া বড় একটা পছন্দ করি না কিন্তু শীলার সঙ্গে আমার জীবনের উপরি নেশা নয়, সেখানে আমি পাই অন্তরের মিল। সজ্জন, তোমাকে মিথ্যে বলছি না, পকেট শূন্য অবস্থায় আমার জীবন-সংগ্রামের কাহিনী তুমি ভালোভাবেই জানো। আমার রিক্ত জীবনপাত্রে সে সুধা ঢেলেছে। আমার অন্তরে যে হাহাকার তার কল্পনা করা হয়তো তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না। বুকের কাছে তীব্র বেদনা। শীলা আমার অর্থহীন ক্লান্ত জীবনের মনোবল। কর্নেলকে দেখলে আমি আমার হারানো সুর খুঁজে পাই, কিন্তু তোমাকে দেখা মাত্রই মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। কিছু মনে করলে না তো?

—হতে পারে। কিন্তু নতুনত্বের আকর্ষণে নিরপেক্ষ হয়ে তুমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রীর চেয়ে শীলাকে বেশি মর্যাদা দিতে পারবে? আমি নিজেকেই নিজে চিনতে পারি না, তবু আজ আমার মন অতিরিক্ত চঞ্চল। মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানো? কন্যার মত মেয়েকে স্ত্রীরূপে পেয়ে আমি হয়তো সুখী হতে পারব না।

—কল্যাণীকে নিয়ে আমার যা সমস্যা, তোমারও ঠিক তাই না কি?

—আবার ভাবি যে কন্যার মত খাঁটি সোনার আভরণে হীরের জৌলুসের একান্ত প্রয়োজন। আমার ক্ষণিক দুর্বলতাকে জয়

করার পণ নিয়েই সে আমার জীবনে এসেছে। আমার চরিত্রের দুর্বলতা আমাকে হাজার টানার চেষ্টা করলেও আমি জানি যে শেষকালে কন্যার নিষ্ঠার সামনে তারা হাঁটু গেড়ে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

সজ্জনের কথা শুনে মহিপাল ছটফট করে উঠল— না না, কল্যাণীর জন্য শীলাকে ত্যাগ সম্ভব নয়।

গাড়ি থেকে নেমে মহিপাল শীলার কাছে এল, বুকে মুখ লুকিয়ে বলল— তুমিই আমার জীবনের দুর্বলতা, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।

তার চুলে আঙুল বোলাতে বোলাতে গভীর অনুরাগে শীলা বললে— ছেড়ে যাবার কথা তোমার মনে কেন ওঠে? অপবাদকে এত ভয়?

—না না, লোকের বলাবলির আমি পরোয়া করি না। সত্যি কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, আমার নিজের মন আমাকে ধিক্কার দেয়। বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর অন্তর্যামী, তাঁকে ভয় করি। পরের অধিকার কেড়ে নেওয়া পাপ ছাড়া আর কি?

—এ কথা মেনে নিতে পারলুম না। আমরা মনুষ্যজীবনের জন্মসিদ্ধ অধিকার চাইছি। আমরা দু'জনে পরস্পরের সুখ-দুঃখ-বেদনার সঙ্গী হয়ে বেঁচে থাকতে চাই। আমাদের এ সম্পর্ক পাপ নয়।

—হ্যাঁ, তবু কল্যাণীর কথা একবার ভেবে দেখেছ? তার জীবন কত একনিষ্ঠ, পবিত্র।

—ঠিক আছে, একনিষ্ঠ হয়ে থাকাই তার স্বভাব হয়ে গেছে।

সে বাঁধা পড়েছে সেই একই সংস্কারের ডোরে। সে তোমার বিবাহিতা স্ত্রী তবু আমরা তার চেয়ে আদর্শের মাপকাঠিতে কম কিসে? আমরা একনিষ্ঠতার দাস হয়ে বাঁচতে চাই না এই কি আমাদের অপরাধ?

—লোকেদের মত হয়তো আমারও স্বভাব হয়ে গেছে··· কিছু ভেবে উঠতে পারছি না। দুর্যোধনের মত মানসিক অবস্থার শিকার হয়ে গেছি। ধর্মকে জানা এবং বোঝা সত্ত্বেও তাতে বিশেষ রুচি নেই আর অধর্মের হাত থেকে রেহাইও পাচ্ছি না। মনের ডাকে ভেসে চলেছি (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) শুধু ভেসে চলেছি।

—এই দর্শনশাস্ত্র সব থেকে ভালো। মানুষ যদি তার ইমোশনল নীড্স বুঝতে শেখে, তবেই তার থেকে মুক্ত হতে পারে। তোমার কল্যাণী যদি আজ তোমার চরিত্রের এই অভাব পূরণ করতে সক্ষম হত, তা হলে আজ তুমিও একনিষ্ঠ হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে। এতদিনের পরিচয়ে তোমাকে চিনতে আশা করি আমার ভুল হয়নি, যে-কোন শ্রেষ্ঠ আদর্শবাদীর সামনে তুমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারো।

প্রশংসা শুনে মহিপাল আনন্দে আত্মহারা। আলিঙ্গনবদ্ধ মহিপাল আর শীলার হৃদয় একসঙ্গে ঝনঝনিয়ে বেজে উঠল।

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে মহিপাল শীলাকে বললে—শীলা, আমাদের বেশ বয়স হয়ে গেছে। তর্কবুদ্ধি অন্ধ যৌবনের তরঙ্গকে লাগাম লাগিয়ে রাশ টেনে ধরে। ভবিষ্যতের কল্পনা করা বৃথা, আমার বুদ্ধি যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। আমার বাড়ির লোকেদের কানে উঠেছে। একা কল্যাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে

তোমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা সম্ভব ছিল, কিন্তু ছেলেমেয়েদের সামনে তা কি করে সম্ভব? তারা আমাদের বিষয় কী মনে করবে? তোমাকে আমি আমার জীবনের প্রেরণা হিসেবে মর্যাদা দিয়ে থাকি আর তারা তোমায় নীচ, কুলটা, ঘর-ভাঙানি কত কী নাম দেবে—আমি তা কী করে সহ্য করব বলো? সংসার, ছেলে-মেয়েদের প্রতি কর্তব্যের আহ্বান শুনতে গেলে তোমাকে ত্যাগ করতেই হবে। যদি তোমার সঙ্গে সম্পর্ককে নিষ্ঠার ভিত্তি দিতে চাই তা হলে আমার সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

—কেন?

—তোমার কাছে থাকার সংকল্পের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার সংসারের ভবিষ্যৎ। তাদের থেকে আলাদা থাকতে গেলে আমাকে সংসার-খরচ হিসেবে মাসোহারা দিতে হবে··· তবু আমরা এক বাড়িতে, এক জায়গায় থাকতে পারব না। লোকেরা অপবাদ দেবে তোমার পয়সার লোভে আমি তোমার দরজায় পড়ে আছি।

—তুমি তোমার সংসার ছাড়তে যাবে কোন্ দুঃখে? এসব এলোমেলো কথা ভাবছ কেন?

—আর কী উপায় আছে বলো?

—ডোণ্ট বি ফানি মাই ডিয়ার—তুমি বড্ড বেশী ভাবুক হয়ে পড়ছ। কল্যাণী আর ছেলেমেয়েরা সূর্যের মতই তোমার জীবন আলোকিত করে রেখেছে। তাদের থেকে দূরে গিয়ে তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। আমরা, হ্যাঁ, আমরা নিজেদের সম্পর্ক শেষ করে ফেলতে পারি কিন্তু দু'জনেরই জীবন অর্থহীন হয়ে যাবে। তুমি ঠিকই বলেছিলে, আমাদের বয়েস হয়ে গেছে। এ

বয়সে আমাদের সম্পর্ক দৈহিকের চেয়ে মানসিকই বেশী। আজ থেকে আট-দশ বছর আগে যদি তোমার সঙ্গে এ ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠত, তা হলে হয়তো তোমার বিরহে কিছুদিন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে আবার নতুনের কল্পনায় ডুবে যেতাম। এখন, জীবনের যে সন্ধিক্ষণে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে চোখের জল ফেলে রিক্ত হাতে ফিরে যেতে আমি পারব না।

—শীলা, তাই করো। তোমার কাছে থাকলে আমি হয়তো সুখী হতে পারব কিন্তু তুমি অশান্তির আগুনে দিনরাত জ্বলে পুড়ে মরবে। তুমি ভেবে নাও যে আমি এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছি। কিছুদিন পরে ভালো দেখেশুনে কোন ভদ্রলোককে বিয়ে-থা করে শান্তিতে থাকার চেষ্টা কোরো। এবার কিন্তু জীবনের পাকা হিসেব-নিকেশ করে নিও। মানবসমাজে থাকতে গেলে বিয়ের বন্ধনে ধরা দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

—ভেবে নাও, আমার বিয়ে হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে আর কখনো এ-সব বাজে কথা মুখ দিয়ে বার করবে না বলে দিলাম কিন্তু।

—কর্নেল সায়েবের টেলিফোন হুজুর—চাকর দরজার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিল। দু'জনে চমকে দরজার দিকে তাকালে।

—কাকে চান? শীলা প্রশ্ন করলে।

—দু'জনেরই নাম বলছেন হুজুর।

—যাও, তুমিই কথা বলে নাও। আমি এখানে আছি। তাকে বলে দিও এ সময়ে আমি একটু একা থাকতে চাই।

শীলা টেলিফোন রিসীভ করতে অন্য ঘরে চলে গেল। মহিপাল

বিষণ্ণভাবে বিছানায় শুয়ে ভাবছে, হয়তো কেউ বাড়ি থেকে তার সন্ধানে কর্নেলের কাছে গিয়ে থাকবে। কাল সকাল থেকে বাড়ির মুখ দেখেনি। কল্যাণী, ছেলেমেয়েরা সকলেই চিন্তিত হয়ে আছে নিশ্চয়— যাকগে চিন্তা করুক, চরিত্রহীন বাপ তার ছেলেমেয়েদের সামনে কোন্ মুখে গিয়ে দাঁড়াবে? কল্যাণী নিজের বুদ্ধির দোষে এতবড় কাণ্ডটা নিছক বাধিয়ে ফেলল। তার মুখ এ জীবনে আর দেখব না।

শীলা ঘরে ঢুকে তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে— কাল রাত্তিরে কোথায় ছিলে?

মহিপাল উত্তর দিল না, চোখ বুজে শুয়ে রইল।

—কাল থেকে তুমি বাড়ি যাওনি, কাজটা ভালো করোনি কিন্তু। মহিপালের কপালে হাত বোলাতে বোলাতে বললে— একটু কিছু খেয়ে নাও, তারপর আমি তোমায় বাড়ি ছেড়ে আসব।

—না, বাড়ি যাব না। কাল সারারাত ঘুমুতে পারি নি। বাড়িতে গেলে আজ সারারাত ঝগড়াঝাঁটিতেই কেটে যাবে। আমি আজ এত ক্লান্ত হয়তো একটু কথা-কাটাকাটি সহ্য করতে পারব না। কর্নেলকে ফোন করে বলে দাও, বাচ্চাদের বলে দেবে তারা যেন আমার জন্যে চিন্তা না করে, আমি সজ্জনের বাড়িতেই রাত্তিরে থাকব।

কথা প্রসঙ্গে শীলা জেনে নিলে কাল সারারাত মহিপাল অনাথের মত শীতে কাঁপতে কাঁপতে কাটিয়েছে। সে তাকে যেতে দিল না।

আজ প্রথম মহিপাল শীলার বাড়িতে রাত কাটাবে।

তেইশ

শ্রীকৃষ্ণর লীলাভূমি মথুরা। কন্যার সঙ্গে এখানে এসেও সজ্জন যেন শান্তি পাচ্ছে না। আত্মহোমের বহ্নিজ্বালায় সর্বক্ষণ তার মন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। তু'দিন মথুরায় কন্যার সামনে সে যেন পরীক্ষার্থীর মত একের পর এক পরীক্ষাই দিয়ে চলেছে। মায়ের কৃষ্ণ-প্রেম, তার নিজের বৈষ্ণবী সংস্কার, তুয়ে মিলিয়ে ভগবানের পায়ে আত্মনিবেদনের জন্য যেন ছটফটিয়ে উঠছে।

সজ্জন নিজেকে অষ্টপ্রহর কন্যার সান্নিধ্য থেকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করছে। শ্রীকৃষ্ণের পায়ে আত্মসমর্পণ করে আবার নতুন করে ব্রহ্মচারী হওয়ার দৃঢ়সংকল্প করেছে। মথুরায় পৌছোবার পরই সে কন্যাকে বাড়িতে ছেড়ে একাই বেড়াতে বেরুল। বিশ্রাম ঘাট, দ্বারকাধীশ, কিশোরীরমন, বিহারীজী, রাধাকৃষ্ণের মন্দির ঘুরে ঘুরে দর্শন করে সে তার মনের সায়েবীভাবকে জলাঞ্জলি দিয়ে ফেললে। তার নিজের মধ্যে সেই অনন্ত মহাশক্তির দর্শনের জন্য সে ব্যাকুল, যার প্রতাপে এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে থেকেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাপুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন। সুরদাসজী আর মীরার ভক্তিস্রোতের রহস্য কি? জিজ্ঞাসু মনের সমাধানের জন্য সে প্রত্যেক মন্দিরে ঢুকে সেই ব্রজলালার দর্শনের জন্য আতুর

হয়ে ঘুরল, কিন্তু প্রত্যেক জায়গায় দেখতে পেল কেবল নিছক আড়ম্বর।

টাঙ্গাওয়ালা তাকে কৃষ্ণ ভগবানের জন্মভূমি দেখাতে নিয়ে চলল। কৃষ্ণের জন্মভূমি ভাবতেই তার মনে কৌতূহলের সঞ্চার হল। যে কৃষ্ণ ভগবান সাধারণ মানুষের মতই এই পৃথিবীর বুকে কংসের কারাগারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ঈশ্বরের অবতার রূপে আজ এই ভারতের ঘরে ঘরে তাঁর পূজার্চনা হয়। হঠাৎ মন্দিরের কাতারের মাঝখানে মসজিদ দেখে সে হকচকিয়ে গেল। টাঙ্গাওয়ালা ইতিহাসের ঘটনা শোনাতে শোনাতে মসজিদের দিকে সংকেত করে বললে— মোগল বাদশাহ ওরঙ্গজেব মন্দিরকে ভেঙে এখানে মসজিদ তৈরী করিয়েছিলেন।

সজ্জনের কানে যেন কেউ খানিকটা তপ্ত শীশে ঢেলে দিলে। বিজাতীয় একটা মনোভাব চাড়া দিয়ে উঠল। সহসা তার মনে হল যেন কৃষ্ণর এই লীলাভূমির ভগ্নস্তূপের মধ্যে পাথরের মসজিদের জায়গায় কন্যা দাঁড়িয়ে আছে। ওরঙ্গজেবের মসজিদের সঙ্গে কেন কন্যার ছবি তার মনে ভেসে উঠছে? মসজিদের কাছে ভগ্নস্তূপের ওপরে হাত রেখে সজ্জন মন দিয়ে কারাগার নিরীক্ষণ করতে লাগল· মসজিদের দিকে তাকাতেই রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। তার মনকে ভক্তিভাবের সোপানে নিয়ে যাবার পথে যেন একটি বাধার সৃষ্টি করছে, উফ্ বিরক্তিতে তার নাকমুখ আপনা হতেই কুঁচকে গেল।

প্রতিহিংসার শিখা তার মনে জ্বলে উঠল, দিল্লীর জুম্মা মসজিদ ভেঙে যদি সেই জায়গায় কেশবদেবের মন্দির তৈরী করানো যায়, তা হলে কেমন হয়? মুসলমানদের ধার্মিক অনুভূতিতে আঘাতটা

কেমন করে বাজবে? মুসলমানদের মধ্যে বড় বড় সুফী, ভক্ত জন্মেছে যারা মসজিদে খোদাকে দেখেছে। কবীর নির্গুণ রাম-রহিমকে চিনেছেন। মীরা যাঁর প্রেমে আত্মহারা, সুর তুলসী যার ভক্তিসিন্ধুতে ডুব দিয়ে ভাবসাগর পার হয়ে গেলেন— সেই এক ঈশ্বর।

মসজিদের প্রতি তার মনে প্রতিহিংসার ভাব জাগায় সে নিজেই লজ্জিত বোধ করল। জুম্মা মসজিদের জায়গায় মন্দিরের কল্পনা সত্যিই তার সংকীর্ণ মনের পরিচায়ক, কিন্তু এই মিথ্যে ধর্মান্ধতাকে সে যেন কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছে না। প্রত্যেক ধর্মের প্রতিক্রিয়াবাদী শক্তির সঙ্গে যুঝতেই হবে, এইটাই মনুষ্যধর্ম, এইটাই মানুষের কর্তব্য।

যা হয়ে গেছে যাকগে— অভিমান-ক্ষুব্ধ মন ভবিষ্যতে কন্যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না। তাকে ঘৃণা, না না, সে তাকে ঘৃণার পাত্র কিছুতেই মনে করতে পারে না। তাকে ঘৃণা করা অন্যায়, মস্ত বড় পাপ। কন্যাই তাকে তার চরিত্রের দৃঢ়তা দিয়েছে। সেই তাকে দিয়েছে নতুন জীবন, নতুন পথের সন্ধান। প্রতিদানে সে তাকে দিয়েছে তার সংকীর্ণ মনের পরিচয়। পরশু দিনের ঘটনার পর সে কন্যার সামনে যাবার সাহস পাচ্ছে না। কন্যাকে মহান ·· সে নীচ, তা হলে সে এত দাম্ভিক কেন? তার মনে অহংকার কেন দানা বেঁধেছে? তার পয়সা? না না, পয়সা দিয়ে সস্তা কেনার দিন ফুরিয়ে এসেছে, তবে? সে একজন বড় শিল্পী তাই? এই প্রশ্নের মীমাংসা খুঁজতে সে কি লোভের বশে তার মনের শান্তি হারাতে চায়?

আত্মগ্লানিতে তার সমস্ত শরীর জর্জরিত। ইংরাজী সভ্যতার

চটক ভক্তির সামনে বেশীক্ষণ মাথা তুলে টিকতে পারল না। ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে ভেসে যাবার কল্পনা বড়ই মধুর।

*　　　　*　　　　*

কালোঘন রাতের অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে আসছে। নানা চিন্তা-আশঙ্কায় কন্যা অস্থির— সজ্জন কোথায় গেলেন? কিছু বিপদ-আপদ ঘটেনি তো?

তার স্বর্গীয়া বউদির পঙ্গু বান্ধবী এর মধ্যে কতবার সজ্জনের খোঁজ নিয়েছে। বান্ধবীর স্বামী লালা মুরলী মনোহর বেচারা ক'বার দোকান থেকে এসে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। সকালের জলখাবার থেকে শুরু করে দুপুরের রান্নাবান্না সবই যেন কেমন ওলটপালট হয়ে গেছে। সজ্জন এ-বাড়ির হবু জামাই তায় আবার বড়লোক। সবাই চিন্তিত— কোথায় গেলেন? কেন এখনো ফিরলেন না? পুলিসে রিপোর্ট করা উচিত কি না?

কন্যা কোনমতে আবেগ সামলে কৃত্রিম হাসি হেসে সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করলে— উনি একজন বড় শিল্পী, হয়তো মন্দিরে ঘুরতে ঘুরতে বৃন্দাবন চলে গিয়ে থাকবেন।

রাত্রিবেলা শোবার ঘরে নিজেকে একা পেতেই কন্যার দু'চোখের বাঁধ ভেঙে পড়ল। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় তার মন দুলে উঠল— না না, সজ্জন তাকে এভাবে একা ছেড়ে যেতে পারে না, লক্ষ্ণৌ ফিরে গেলেন না তো? আজ তার সঙ্গে কোন কথা-কাটাকাটিও হয় নি— হ্যাঁ, পরশু সকালের ঘটনার পর থেকে তিনি যেন কেমন চুপ হয়ে গেছেন কিন্তু আমি তাঁকে আশ্বস্ত করার বহু চেষ্টাই করেছি— আমারই ভুল হয়েছে, হ্যাঁ ভুল আমারই।

কন্যার চরিত্রে অহংকারের মাত্রা বেশী। এই অহংকারের পেছনে আছে তার নৈতিক শক্তি। বাড়ির নোংরা পরিবেশের মধ্যেই তারা দুই ভাইবোন যৌবনে পদার্পণ করেছে। বড় ভাই বিয়ের ট্রাজেডীর সঙ্গে যুঝতে যুঝতে মানসিক সংযম হারিয়ে পাগল হয়ে গেল। তার অবস্থা দেখে কন্যা নিজের চালচলনে যেন আর-একটা কষে গেরো বাঁধল। এই ঘটনার পর থেকে সকলের সামনে খোলাখুলিভাবে সে গুরুজনদের কুকাজের নিন্দে করতে দ্বিধা বোধ করত না। তার প্রগতিশীল বান্ধবীর উৎসাহে ধীরে ধীরে ইণ্ডিয়ান পীপল্‌স থিয়েটার আর কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার যোগাযোগ হল। সে তার বিদ্রোহী মনের খোরাক পেল বটে কিন্তু তার গুরু আর দাদার সংস্পর্শে থাকার জন্য ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় সে সায় দিতে পারল না। যদিও তার প্রগতিশীল মন এতেই সন্তুষ্ট কিন্তু তার বৌদ্ধিক আর ভাবাবেগের বিচারধারার মধ্যে সদাই আলোড়নের সৃষ্টি হচ্ছে।

তার গোপন মনের রহস্যের হাঁড়ি সে মাঝ হাটে ভাঙতে চায় না। বাড়িতে দাদাকে সে সমীহ করে তাই তার সামনে সে কোনদিন কিছু বলতে সাহস করেনি। বাইরের কোন ব্যক্তির কাছে মনের গোপন তথ্য উজাড় করে সে তার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের ছায়া সৃষ্টি করতে চায় না। একদিকে বাবার বিকৃত কামক্রীড়া, কাকীমার চরিত্রহীনতা, তার সুন্দর দেহের আশেপাশে ভ্রমরের গুঞ্জন, অন্যদিকে ধর্ম এবং আদর্শের সংযম শিক্ষা—দুই বিরুদ্ধ গতির মাঝে সে যেন নির্বাক দর্শক। আজ পর্যন্ত সে সমাজকে যতটুকু দেখেছে তাতে তার ঘৃণার মাত্রা বেড়েছে বই কমে নি। ভারতীয় সমাজে পুরুষেরা সদাই নারী জাতিকে

পায়ের তলায় চেপে রাখার চেষ্টা করেছে। মাঝে মাঝে তার আত্মাভিমানী মন পুরুষের প্রতি বিদ্রোহ করার কথা ভেবে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। যদিও ইদানীং গত দু'বছর থেকে নানা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সে এক নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে, এবার সে ঠিক করে ফেলেছে যে যদি তার মতই কেউ সিদ্ধান্তবাদী পুরুষ তার জীবনে আসে, তা হলে সে তার গলায় জয়মালা দেবে। এই সিদ্ধান্ত নেবার পর থেকেই সে বেশ শান্ত ও গম্ভীর হয়ে গেছে।

বউদির আত্মহত্যার পর পুলিসের গোলমালের মধ্যে সজ্জনের সঙ্গে তার পরিচয়। আর্টিস্ট সজ্জনের খ্যাতি তার আগেই সে শুনেছিল। প্রগতিশীল ক্যাম্পের সকলেই তার মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। তার চিত্রের প্রদর্শনী একবার সে দেখেছে, দূর থেকে সে তাকে এর আগে কয়েকবার না দেখেছে তা নয়। খ্যাতি আর উচ্চ আদর্শের পটভূমিকায়, সাময়িক উত্তেজনার মুহূর্তে তার সঙ্গে সে পরিচিত হয়েছিল। সজ্জনের ব্যক্তিত্বে আছে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। কন্যার মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। সজ্জন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, বিয়ের প্রস্তাব করেছে।

কন্যা অনুভব করেছে যে জীবনে প্রথমবার সে কোন পুরুষের আকর্ষণে পুরোপুরি ভাবে ধরা দিল। আত্মমর্যাদার কড়া পাহারায় নৈতিক আদর্শকে এতদিন যেভাবে সে রক্ষা করে এসেছে আজ তাকে সহজে উজাড় করে এক পুরুষের পায়ে নিবেদন করার কল্পনায় তার দাম্ভিক মনে যেন ঘা লেগেছে। তার মত অদ্ভুত মেয়ের পাল্লায় পড়ে সজ্জনের বেশ দুরবস্থা।

বাপের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যখন সে কাহারদের কম্পাউণ্ডে

ঘর ভাড়া নিল, তখন পাড়ার কুকুরদের ঘেউঘেউ আর লোকজনের নোংরা ইঙ্গিতে কন্যা বেশ ভয় পেয়েছিল। এর ফলে ভাবতে আরম্ভ করেছিল যে আজকের যুগে পুরুষের ছত্রছায়া মেয়েদের জন্য অতি আবশ্যক। সজ্জনের প্রেমের বাঁধনে ধরা দিয়েও সে তার ভাড়াটে বাড়িতে থাকতে পারল না। অথচ কর্নেলের বাড়িতে থেকেও সে সব সময় যেন সজ্জনের আশ্রয়ে রয়েছে। সবই যেন কেমন আশ্চর্য— এতদূরে একা সজ্জনের সঙ্গে আসায় সে একটুও সংকোচ বোধ করে নি।

পরশু সজ্জন হঠাৎ যেন প্রলুব্ধ ব্যবসায়ীর মত তার অধিকার কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। তার প্রস্তাব শুনে হাজার মোড়কে সুরক্ষিত তার মন যেন হঠাৎ নেচে উঠেছিল। সজ্জনের প্রীতি-ডোরে বাঁধা মন, সেই বাঁধন খোলার কল্পনাকে মন ঠাঁই দিতে প্রস্তুত নয়। সজ্জনের মনে আঘাত দেওয়া তার মস্ত ভুল, এ কথা সে বার বার স্বীকার করছে— এখুনি এই মুহূর্তে যদি সজ্জন তাকে বধূরূপে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক থাকে, তা হলে সে এক-কথায় রাজী হয়ে যাবে।

কেন, কেন, আজ সে তাকে এ অবস্থায় ছেড়ে চলে গেল? যদি যাবারই ছিল তবে তাকে পরের বাড়িতে এভাবে ছেড়ে যাবার মানে? সকলের সামনে তাকে ছোট করার জন্য? সে চায় যে সকলে তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করুক? রমা বউদি তার বিষয় কী ভাবছে? দুজনে হয়তো তাদের শোবার ঘরে বসে এই নিয়েই আলোচনা করছে। কি করে আমি মুখ দেখাব···? এঁর জন্যে আজ আমি সবার সামনে অপদস্থ হলাম।

ডাঙায় তোলা মাছের মত কন্যা বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে

লাগল। কিছুক্ষণ কাঁদার পর তার মনের ভাব খানিকটা হাল্কা হল বটে তবে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পড়তে লাগল। তার মত লেখাপড়া জানা, দাম্ভিক, প্রগতিশীল মেয়ে আজ বিরহে কাতর। মার্কস্, গান্ধীর দর্শন, ইলেকশন— রাজনীতির কিচির মিচির, নারীমুক্তি আন্দোলন সব যেন এ মুহূর্তে তার সামনে অর্থহীন। তার এই নতুন চেতনায় নেশার আমেজ নেই, আছে হারিয়ে যাওয়া সুরের মূর্ছনা, বিরহে দগ্ধ রাধার অন্তরের হাহাকার আর চোখে প্রেমাশ্রুধারা! তার মনটা চৈত্রের ঘূর্ণিঝড়ের মতই আজ উদ্‌ভ্রান্ত।

* * *

সারাদিনের পর ক্লান্ত সজ্জন বৃন্দাবনের এক ধর্মশালায় রাসলীলা দেখছে। গুজরাতী শেঠ-শেঠানিদের ভক্তমণ্ডলীদের জন্য এই রাসের ব্যবস্থা তবু প্রায় তিরিশজন লোক জড় হয়েছে। সজ্জন সেই ধর্মশালার একটি ঘরে থাকার ব্যবস্থা করছিল। বৃন্দাবন দর্শনের পর সে হতাশ। এখানকার লোকগীত, লোক-নাটক সদাই ভারতের সাহিত্যকে প্রেরণা জুগিয়ে গেছে। যেখানে ঘরে ঘরে ভগবান কৃষ্ণের বাললীলার স্মৃতি, সেখানে সে প্রভুর দর্শন থেকে বঞ্চিত থেকে গেল। যে ভক্তির স্রোতে সে মথুরা থেকে বৃন্দাবন পর্যন্ত ছুটে এল, এখানে আসার পর চারদিকে ধর্মের অভাব দেখে তার ভক্তি প্রায় শুকিয়ে যাবার জোগাড়! বার বার তার এ কথা মনে হচ্ছে যে এটা পয়সা লোটবার ষড়যন্ত্রে ভরা তীর্থভূমি। ভক্তিরসে আপ্লুত নরনারীর মধ্যে সে আসল বৃন্দাবনের স্বরূপ খোঁজার ব্যর্থ প্রয়াস করছে। রামলীলার অর্কেস্ট্রা বাজতেই যে যার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল।

বন্দনা আরতির পর লীলা আরম্ভ হল। কৃষ্ণ নিজের আত্ম-প্রশংসায় বেশ কিছুটা লম্বা লম্বা বুলি আওড়ে গেলেন। সজ্জন বিরক্তি অনুভব করলে—তার মনে হচ্ছে রাসলীলা মণ্ডলীর প্রোপ্রাইটর আর এই-সব যত পাণ্ডা-পূজারী দলের পয়সা লোটবার মাধ্যম ছাড়া কৃষ্ণের অন্য কোন অস্তিত্বই নেই। যে ধর্মপ্রচারের বাহানা নিয়ে ঐ কপচানি, সে এখানে মন্দিরে আর প্রসাদে বিকিয়ে যাচ্ছে। মানসিক অবসাদে তার মাথা দপ্‌দপ্‌ করে উঠল। এই ধর্মের আসল রূপ কি? এই রূপই কি তার স্বর্গীয়া মায়ের এবং ভারতের কোটি কোটি নরনারীর সংস্কারের ফলে তাদের মজ্জাগত হয়ে গেছে?

বাঁশের মত লম্বা এক পুরুষ কেসরিয়া রঙের উড়ানি গায়ে, লম্বা ঘোমটা টেনে যশোদা মাতা সেজে দেখা দিলেন। তিনি ফাটা বাঁশের মত গলায় মুখস্থ বুলি আওড়াচ্ছেন—আজ আমার কানাই দুলাল কিছু মুখে না দিয়েই খেলতে বেরিয়ে গেল। পুত্রের জন্য ব্যাকুল যশোদা মাতা পায়চারি করতে লাগলেন। অন্যদিক থেকে ময়ূর-মুকুটধারী মুরলীধরের প্রবেশ, তাঁকে দেখা মাত্র যশোদা ককিয়ে উঠলেন—আয়রে বাছাধন আমার আয়, কোলে আয়। তুমি যে দিনরাত কেবল খেলেই বেড়াচ্ছ? দেখো বাবা, এত দূরে দূরে আর খেলতে যেও না, ভূত আছে, বাঘ আছে, জুজু আছে।

কৃষ্ণ হেসে—আরে মা কাকে এ-সব বলছ? চারবেদ সঙ্গে নিয়ে শঙ্খাসুর দানব জলে গিয়ে লুকিয়ে আছে। গভীর জলে যাবার সাহস কারুর নেই দেখে শেষকালে আমি মৎস্য রূপ ধারণ করে তাকে যমলোকে পাঠিয়ে এলাম। তোমার জুজু বুড়িকে কিন্তু কোথাও দেখতে পেলাম না।

—মৎস্য রূপে দানবকে তুমিই মারলে?

—হ্যাঁ মা, আমি।

—(চমকে) তুমি?

—(প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য) মা, আমি যমুনার তীরে গোরু-বাছুর নিয়ে চরিয়ে বেড়াই আর পাতালে গিয়ে কালীয়া নাগের দমন করে এলাম, কিন্তু কই, সেখানেও তোমার জুজু দর্শন হল না তো? এর পর ভগবান গড়গড় করে কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহ, বামন সব অবতারের বর্ণনা করতে লাগলেন।

যশোদা (আশ্চর্য হয়ে মুখে আঙুল দিয়ে) আরে, বাবা আমার বামন রূপ ধারণ করে বলি রাজাকে তুমিই ছলনা করেছিলে?

—হ্যাঁ মা।

—তা হলে তোমার চরণেই গঙ্গার উৎস?

—আরে না মা, আমাকে বাবা প্রায়ই এ-সব গল্প শোনান।

—আরে তাই তো বলি, সারাদিন খেলা আর খেলা। এর মধ্যে ছেলের মাথায় এত বুদ্ধি গজালো কবে?

সজ্জন মুগ্ধ হয়ে বসে আছে। আদিকাল থেকে মনুষ্যরূপী ভগবান পৃথিবীর কোলে জন্ম নিয়ে ইতিহাসের রচনা করে যাচ্ছেন তবু তাঁর মধ্যে অহংকার নেই, তিনি বিনয়ের অবতার। ধরিত্রী মাতা সদাই তার সেই বালগোপাল রূপই দেখছেন। বালগোপালের অদম্য বীরত্বের কাহিনী স্নেহময়ী মার কাছে বিশ্বাসযোগ্য নয়, কেননা মার কাছে সন্তান সর্বদাই শিশু।

সজ্জনের স্মৃতিপটে মার ছবি ভেসে উঠতেই তার চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠল। দর্শকেরা সবাই তার মত মাতৃপ্রেমের অনুভূতিতে গদগদ। সর্বশক্তিমান ভগবান তার ভক্তদের ভয়মুক্ত

করার চেষ্টা করছেন। মমতাময়ী মা তাঁকে জুজু বুড়ির ভয় দেখাচ্ছেন কিন্তু তিনি আনন্দে বিভোর।

সজ্জনের কূটবুদ্ধি দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রশ্নকে যাচাই করে দেখতে চায়। সর্বশক্তিমান ভগবান তারই হাতের তৈরী হাইড্রোজেন বোমা দেখে ভয় পেয়ে অজানা দেশে লুকিয়ে বসে আছেন কেন? যেদিন তিনি ভয়মুক্ত হয়ে আবার এই পৃথিবীর বুকে বালকরূপে জন্মগ্রহণ করবেন সেদিন নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি হবে। কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহ এই-সব অবতারের পর যেদিন 'অ্যাটমাসুর' সংহার করবেন, সেদিন ধরিত্রী মাতা সত্যিই সহজে ভয়মুক্ত হবেন। ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করা উচিত। ভগবানই মানুষের আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। ভগবানের বিভিন্ন অবতার, ভক্তিরস, দানবের সংহার ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। কন্যার কথা এক লহমার জন্যও তার মনে এল না।

সকালে উঠে সে মন্দিরের বাইরে পাথরের রোয়াকে বসে 'জ্ঞান ভাণ্ডারের' স্কেচ তৈরী করছে আর ওদিকে কন্যা তাকে হন্যে হয়ে নিধিবনে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কন্যা জেদ করে বৃন্দাবনে এসেছে। লালা মুরলীমনোহর অনেক করে তাকে বোঝালেন যে বৃন্দাবনের অপরিচিত গলিঘুঁজির মধ্যে মানুষ খোঁজা বড়ই কষ্টকর কিন্তু কন্যা কারুর কথা কানে তুললে না।

সজ্জনের খোঁজে কন্যা নিধিবনের চারিদিকে পাগলের মত ছোটাছুটি করলে। সেখানে তার দেখা না পেয়ে সে কিন্তু হতাশ নয়— তানসেন আর বৈজুবাওরার গুরুর তপোভূমি। এখানকার পাতায় পাতায় আছে মেঘমল্লারের জাদুর ছোঁয়া। নিধিবনে এসে সত্যিই মনে হয় যেন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ সামনে দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাচ্ছেন।

চারিদিকে ঘন লতাপাতা, ভগ্নস্তূপ, জায়গায় জায়গায় তিন-চারটে বৃক্ষ পরস্পর আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে সুন্দর আচ্ছাদন তৈরী হয়েছে। পাখির কিচিমিচি, নদীর কলরব আর বাঁদরের উৎপাত, হরিণ-শিশুর লাফালাফি— কন্যা এদের মধ্যে পেলে অসীম শান্তি।

হরিদাস বাবাজীর সমাধির ওপর এক সাধু বেসুরো গলায় গাইছে—

মাইরী সহজ জোরী প্রকট ভই যো রঙ্গী
গৌর শ্যামঘন দামিনী জৈ সৈ।
প্রথম হুঁ হুতি অবহুঁ আগে হুঁ
রহে হৈ ন টরি হৈ তৈ সৈ
অঙ্গ অঙ্গ কী উজরাই সুঘরাই
চতুরাই সুন্দরতা ঐসৈ।

সজ্জনের দেখা না পেয়ে কন্যার ব্যাকুল মন যেন গানের মধ্যে শান্তি খুঁজে পেল। তার আর সজ্জনের, স্ত্রী আর পুরুষের সম্পর্ক সমস্ত দেশকালের ব্যবধান ছাড়িয়ে চির পুরাতন হলেও নিত্য নতুন।

চব্বিশ

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক চিরাচরিত হলেও নিত্য নতুন। অটুট বন্ধনে বাঁধা দুটি হৃদয়।

মহিপালের মনে কালবৈশাখীর ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সমাজের ঝড়ো হাওয়া যেন তৃণের মত উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার শীলাকে,

তাকে আঁকড়ে ধরে রাখা মানে কল্যাণীর প্রতি অন্যায় করা। কল্যাণীকে সে অগ্নিসাক্ষী করে সমাজের সামনে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছে। তাদের দুজনের বন্ধন অটুট, পুরাতন হলেও নতুন। মানুষ একটানা নতুনত্বের স্রোতে ভেসে যেতে ভালোবাসে না, তাই সে ফিরে যেতে চায় তার পুরোনো আস্তানায়। ছেলেমেয়েদের কাছে, বাড়ি ফিরে যাবার জন্য মহিপাল কর্নেলের গাড়িতে উঠে বসল।

শালার বাসী বিয়ের দিন শীলা আর তার প্রেমের কুৎসা আর কলঙ্কের কাহিনী নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশ ফাটল ধরেছে। মনের গভীরে সে দু'দিন যাবৎ অনেকবার ডুব দিয়েছে। মহিপাল আর শীলা, সে আর কল্যাণী, উফ্ এ দোটানার মধ্যে সে বাঁচতে চায় না। অন্তর্দ্বন্দ্বের এই জটিলতার মধ্যে ভবিষ্যতের স্পষ্ট ছবি যেন বার বার অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সকালে, এই ঘণ্টাখানেক আগে—কর্নেল যখন তাকে নিতে শীলার বাড়িতে গিয়েছিল, তখন তার মনের একেবারে দেউলে অবস্থা। সমুদ্রের প্রচণ্ড জোয়ারভাটার মত ক্ষণিক উত্তেজনার পর আসে অবসাদ। শীলাকে ছেড়ে নিজের বাড়ি যেতেই হবে। শ্বশুরবাড়ির ভিটে ছেড়ে বাপের ভিটেয় যাওয়ার কল্পনা কত মিষ্টি, কত রোমাঞ্চকর। স্বামী-স্ত্রীর অটুট বন্ধনে বাঁধা সেই পুরাতন সত্যের চোখে ধুলো দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই।

সন্ন্যাস আর ভোগবিলাসের অতৃপ্তির মধ্যে দু'দিন কাটিয়ে সে আজ কর্নেলের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ বালক যেমন পুলিসের হাতে ধরা পড়ে সুবোধ বালকের মত সুড় সুড় করে মাথা হেঁট করে বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়, আজ তার অবস্থা অনেকটা সেরকম।

বিদায় মুহূর্তে শীলা শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিল, পর্বতের গায়ে যেন নির্ঝর ঝরনা বয়ে যাচ্ছে। মহিপালের ক্ষুব্ধ মন যন্ত্রণায় বার বার মোচড় দিয়ে উঠেছিল। বুকের সেই যন্ত্রণাই বুঝি স্ফটিকের মত দানা বেঁধেছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ধ্রুবতারার মতই সত্য এবং উজ্জ্বল। মহিপাল তার দরদী মনকে তাই বোঝাবার চেষ্টা করছে।

কর্নেলের ওষুধের দোকানে পেছনের ঘরে কল্যাণী ছোট ছেলে তপোধনকে নিয়ে বসে আছে। কর্নেল তাকে সেখানে ডেকে পাঠিয়েছিল। এই দু'দিনের তপস্যা কল্যাণীর ব্যক্তিত্বে যথেষ্ট পরিবর্তন এনেছে। গভীর বেদনায় অভিভূত তার গম্ভীর মুখ দেখে মনে হয় যেন সে সদ্যঃস্নাতা সাদা গোলাপের পাপড়ি। তপোধন চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে।

কঠিন মুখভাব নিয়ে মহিপাল আর তার পেছনে পেছনে কর্নেল ঘরে ঢুকল। এক সেকেণ্ডের জন্য কল্যাণী আর মহিপালের দৃষ্টি-বিনিময় হল কিন্তু পরমুহূর্তেই পরস্পর পরস্পরকে না দেখার ভান করল। নিমেষে যেন দুজনে নতুন করে নিজেদের চিনতে শিখলে কিন্তু তারা চোখাচোখি করার সাহস পেলে না। কল্যাণী মাথা নীচু করে মেঝের দিকে দেখছে, এই ফাঁকে মহিপাল তপোধনকে প্রাণভরে দেখে নিলে।

ছোট বাচ্চা হকচকিয়ে গেছে। মহিপালকে তার দিকে তাকাতে দেখে সে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষ্যাপা বাঘকে সামনে দেখার মতই তাকে দেখে তপোধনের হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। পিতৃস্নেহে জোয়ার এল। তার চোখে বাৎসল্যের ঝিলিক। অপরাধী পিতা আজ তার বাচ্চাদের সামনে ক্ষমাপ্রার্থীর মত দাঁড়িয়ে, 'হ্যাঁ,

এরা আমার ছেলেমেয়ে, আমি এদের পিতা, তাদের মা ভিন্ন অন্য স্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অন্যায়, পাপ, অপরাধ।'

পুরোনো প্রশ্ন মনে জাগা মাত্রই মনের ক্ষতস্থান আবার টনটনিয়ে উঠল। তপোধনের উপস্থিতির সামনে এক অপরাধী পিতা আজ লজ্জিত তবু কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে ছেলের তেল-না-দেয়া রুক্ষ চুলে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল— কিরে, আজ স্কুল যাবি না?

—এখুনি যাব।

স্ত্রীর দিকে চেয়ে— ছেলেমেয়েরা আজ কিছু না খেয়েই যাবে না কি?

কল্যাণী প্রথমে উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল। উত্তরের প্রতীক্ষায় অধীর মহিপাল রাগের মাথায় কিছু বলার আগেই কল্যাণী ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটতে কাটতে মৃদু গলায় উত্তর দিল— রজো আর শকুন্তলা বাড়িতে রান্নাবান্না করছে। তপু বাবা, চলো বাড়ি চলো, আমরাও এখুনি আসছি।

—হ্যাঁ, আমরা এখুনি আসছি। যাবার আগে তপু এমন দীন করুণভাবে একবার মা তারপর বাবার মুখের দিকে তাকাল যেন সে চোখের ভাষায় তার প্রতিবাদ জানাচ্ছে— আমার মাকে আর কষ্ট দিও না।

তপোধনের যাবার পর কেউই কোন কথা বলতে পারছে না। কল্যাণী মাথা নীচু করে বসে, মহিপাল চুলের বিলি কাটায় ব্যস্ত, কর্নেল ঠোঁট চেপে দুজনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ মহিপাল কর্নেলকে প্রশ্ন করলে— এরা মথুরা থেকে কবে ফিরবে?

—কাল নয়তো পরশু সকালেই এসে যাবে। বিন্নো কেবল চারদিনের ছুটি নিয়েছে।

হঠাৎ কল্যাণীর দিকে চেয়ে কর্নেল বলল— বউদি, যা হয়ে গেছে সে-সব নিয়ে আর মাথা খারাপ করার কোন মানে হয় না। এখন দুজনের নালিশ শোনা বা নালিশ করার সময় নয়, কেননা বাড়িতে বড় বড় ছেলেমেয়েরা আছে, তারা কি ভাবছে? তাদের কথা ভেবে আপনাদের খুব সামলে চলা উচিত।

—ইনি? এঁকে বলছ? এ জন্মের কথা ছেড়েই দাও ইনি চুরশী হাজার জন্মেও এ কথা ভেবে চলার পাত্রী নন। যে কথা আমি বলতে মানা করব, ইনি ঠিক দশ লক্ষ বার তাকে বলে তবে অন্নগ্রহণ করবেন। গিগাসো পাণ্ডেবংশের মেয়ের নাক সদাই উঁচু থাকা চাই, কথা মেনে চললে নাকটা কাটা যাবে না?

—মহিপাল, তুমি ভাই চুপ করবে একটু? এত বড় লেখক হয়ে…

—চুলোয় যাক লেখক, লেখকের কোন মান মর্যাদা বলে কিছু আছে? নিজের থাকার আস্তানা পর্যন্ত বরাতে লেখা নেই। যেদিন ইনি বিধবা হবেন সেদিন হাড়ে হাড়ে টের পাবেন— বলতে বলতে মহিপাল হন হন করে ঘরে পায়চারি করতে লাগল।

কল্যাণী মাথা হেঁট করে বসে আছে। কর্নেল কথার খেই ধরার চেষ্টায় কল্যাণীকে বললে— মহিপাল আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে বউদি কিন্তু সে আপনাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসে, এ কথা আমি এর সামনেই বলছি।

মহিপালের অপরাধী মন সমর্থন পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল— তুমি কেন, যদি স্বয়ং ব্রহ্মা এসে এঁকে এ কথা বোঝান তবু এঁর

মাথায় কিছুই ঢুকবে না। কথায় আছে না স্বভাব না যায় মরলে, ইজ্জত না যায় ধুলে, সেই হয়েছে এঁর অবস্থা। মুখের কথায় বোঝানো ছেড়েই দাও, আমার ব্যবহারেও এতদিনে আমি এঁকে বুঝিয়ে উঠতে পারলুম না। আমার ভালোবাসার মূল্য এঁর কাছে কানাকড়িও নেই। আর হবেই বা কেন (দাঁত পিষতে পিষতে) আমি যে এঁর গত জন্মের শত্রু। মোটা বুদ্ধি···

—মহিপাল।

—কল্যাণী আমার জীবন বিষময় করে দিয়েছে। কোনদিন আমার কথা মন দিয়ে শোনার বা বোঝার চেষ্টা করে নি। আমি একজন মানুষ— আমি কী চাই— আমার মনের চাহিদা···

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা, এবার আমার কথা শোনো।

—কর্নেল, আমি উত্তেজিত নিশ্চয় কিন্তু রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারাই নি। আমার সমস্ত গোপন কথা আজ কল্যাণীর সামনেই খোলা-খুলিভাবে তোমায় বলতে চাই। আজ আমার বেয়াল্লিশ বছর বয়স। ঝগড়াঝাঁটি করে ভুলে যাওয়ার বয়স নয় এ কথা তুমিও মানবে নিশ্চয়। এখন আমি একটু উত্তেজনার পরই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আমারও চাই মানসিক আর শারীরিক শক্তি। আর হয়তো আট-দশ বছর কাজ করতে পারব। জীবনকে সাফল্য-মণ্ডিত করার জন্য চাই শান্তি কিন্তু বাড়ির গৃহিণীর কাছে আমি পাই অশান্তি।

—কর্নেলদা, আপনি এঁকে বলে দিন, ইনি যেখানে শান্তি পান সেখানে···

—দেখো, শুনলে কর্নেল— শুনলে ?

—আমি বলছি তুমি চুপ করো মহিপাল। কর্নেল মহিপালকে

ধমক দিয়ে তারপর গলার স্বর মোলায়েম করে বললে— বউদির সঙ্গে আমায় কথা বলতে দাও, খবরদার মাঝখানে পট পট করার চেষ্টা কোরো না। হ্যাঁ, বউদি, দেখুন কথাটা একটু প্যাঁচালো, যদি আমার মুখ দিয়ে কোন অশোভন কথা বেরিয়ে যায় তাহলে মাপ করবেন। আমি মানছি মহিপালের চরিত্রে অনেক দুর্বলতা আছে, তবু এ কথা আপনাকে মানতেই হবে এর মত সাদাসিদে মানুষ আজকের জগতে আঙুলে গোনা যায়। আমি একটুও বাড়িয়ে বলার চেষ্টা করছি না, কিন্তু বউদি, সারাদিন দোকানে বসি, মানুষকে এক নজরে চিনতে পারি। মহিপালের গুণ আর যোগ্যতার সামনে বড় বড় লোকদের শ্রদ্ধায় মাথা হেঁট করতে দেখেছি।

আঙুলের ফাঁকে সিগারেট চেপে মহিপাল তন্ময় হয়ে প্রশংসা শুনছে। কর্নেলের প্রতি সে কৃতজ্ঞ। কর্নেল বলে চলেছে— বউদি, মহিপালের মত লেখকের সম্মান বিলেতেই সম্ভব। এর মত বুদ্ধিদীপ্ত লেখক যেভাবে জীবনের ব্যর্থতার সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে, তার চরিত্রের দু-একটি দুর্বলতাকে ক্ষমার চোখেই দেখা উচিত।

তিনজনেই মাথা নীচু করে ভাবছে। কর্নেল নবরত্নের জড়োয়া আংটি ডানহাতের আঙুল দিয়ে ঘোরাতে লাগল। ডান হাতের আঙুলে বেশ বড় দামী পাথর চক চক করছে। একটু কেসে গলা পরিষ্কার করে কর্নেল বললে— আমি এ কথা বলছি না যে আপনি মহিপালকে স্বেচ্ছাচার করতে দিন কিন্তু রাশ টানার সময় যদি একটু এর মুড দেখে বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে কোন গোলই বাধে না। বড় বড় ছেলেমেয়েদের সামনে আপনাদের

দুজনের ঝগড়া আর তার কারণটা ফাঁস হয়ে গেল, এটা কি ভালো হল? এখন দিনকাল মোটেই সুবিধের নয়, অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের বিপথে যেতে দেরী লাগে না।

কল্যাণী এতক্ষণ চুপচাপ কথাবার্তা শোনার পর সত্যি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে— এইজন্যেই এঁকে আমি বোঝাই যদি বদনামের কাজ কিছু করতে ইচ্ছে হয়, তাহলে আমায় বিষের পুরিয়া এনে দিলেই পারো, সব ঝামেলা চুকে যাবে। আমার সংসারে আমি কলঙ্ক বরদাস্ত করতে কিছুতেই রাজী নই, সে ছেলেমেয়েই হোক আর তাদের বাপই হোক।

কল্যাণীর জেদী আর গোঁয়ার স্বভাবের জন্যই সে তার সাহিত্যিক জীবনের প্রেরণা হতে পারেনি। সব ব্যাপারে সে তার বিরুদ্ধে, বিপরীত লক্ষ্যের দিকে তার দৃষ্টি— পতিব্রতা সতী অথচ মহামূর্খ কল্যাণী আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রেরণাকে এক মুহূর্তে মরুভূমিতে পরিণত করেছে, এই আমার স্ত্রী। রাগে মহিপাল চেঁচিয়ে উঠল— আমি তোমার বাপের কেনা চাকর নয় বুঝলে? তোমার যদি গরজ থাকে তাহলে আমার সঙ্গে থাকো নাহলে আমি তোমাকে এক মিনিটের জন্য বরদাস্ত করতে চাই না, দেমাক দেখাচ্ছে! নীচ, স্বার্থপর...

—কী যা তা বলছ, মহিপাল? কর্নেল মহিপালকে ধমক দিল। কর্নেল যখন ঝগড়ার মিটমাট করতে চায় তখন ওর কথা না শুনলে একজনকে তো শাসন করতেই হবে। কর্নেল সায়েব, লালা নগীনচন্দ্র আজ পর্যন্ত অনেক ঘরে অশান্তির আগুন নিভিয়েছেন। আদেশের স্বরে আঙুল নাচিয়ে কর্নেল বললে— দেখো মহিপাল, আমার ওপর বাজে মাতব্বরী করতে এস না,

বুঝলে? আমি এখন একদম সিরিয়াস মুডে আছি। আমি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর এই ঝগড়ার নিরপেক্ষ দর্শক, যা ঠিক তাই বলব। সমস্ত দোষ একা তোমার। যতবড় বুদ্ধিজীবী হও-না-কেন তুমি বউদির মত সতীসাধ্বী স্ত্রীর নখের যোগ্য নও।

মহিপালের হঠাৎ মনে হল যেন কর্নেল তার কথার মারপাঁচে তাকে ফাঁপরে ফেলতে চায়। সজ্জনের সামনে এ ধরনের কথাবার্তা সে হয়তো সহ্য করত কিন্তু কল্যাণীর চোখে তাকে তুচ্ছ করার চেষ্টা সে কিছুতেই মুখ বুজে সহ্য করবে না। কর্নেলকে শুনিয়ে দেবার জন্য মনে মনে কয়েকটা কড়া কথা ভাঁজতেই কর্নেল এক কথায় তার মুখ বন্ধ করে দিলে—লেখক হয়ে হয়তো তুমি মনুষ্যত্বকে চিনতে পেরেছ, কিন্তু মানুষকে তুমি আজও ঠিকমত বুঝে উঠতে পারো নি। মানলুম বউদি জেদী স্বভাবের, কিন্তু তুমি একটা মূর্খ। এত বছর একসঙ্গে থাকার পরও বউদিকে তুমি বুঝতে পারলে না, অথচ আমি বুঝে গেলাম। এর মত পবিত্র দেবী কোনদিনই নোংরামি বরদাস্ত করতে পারে না, বুঝলে মশাই? কতবার বুদ্ধিজীবী হিসেবে তোমাকেও আমি সমাজের এ ধরনের নোংরামি দেখে উত্তেজিত আর উদ্‌বিগ্ন হতে দেখেছি।

কর্নেলের স্পষ্ট কথায় মহিপালের ক্ষুব্ধ মন শান্ত হতে গিয়ে আবার উত্তেজিত হয়ে গেল—আমি সকলের সামনে উঁচু গলায় বলতে পারি যে কল্যাণী আমার তুলনায় বেশী একনিষ্ঠ। আমি আজ আঠারো বছর স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন করে এসেছি। আজও এই মূর্খ স্ত্রীকে আমি ভালোবাসি, তাকে শ্রদ্ধা করি। আজ কল্যাণীর সামনে স্বীকার করায় কোন লজ্জা নেই শীলার আর আমার সম্পর্কের মধ্যে আমি কোন নোংরামি

দেখি না, যে আমার শীলাকে ঘৃণার চোখে দেখে সে আমারও ঘৃণার পাত্র।

'আমার' শব্দটি উচ্চারণে মহিপালের স্বর পঞ্চমে উঠতে দেখে কল্যাণী দীর্ঘশ্বাস ফেলে করুণভাবে স্বামীর দিকে তাকালে— আমার ভরাডুবি হবে না তো কি? এ তুমি কী বললে?

উত্তেজনার আবেগে কথাগুলো মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়ার পর মহিপাল সত্যিই লজ্জিত। পরাজয়, করুণা আর প্রতিবাদের ভাষা কল্যাণীর চোখের জলে টলমল করছে। পুরাতন চিরাচরিত সত্যকে মহিপাল কিছুতেই মানবে না। যে-কোন নারী এবং পুরুষের প্রেম অটুট বন্ধনের ডোরে বাঁধা, তারা স্বামী-স্ত্রী নাইবা হ'ল। কল্যাণী সতী হয়ে আছে, থাকুক। আমরা পতিত হলেও মহান। শীলা আমার প্রেরণার স্রোত, তার হৃদয়ের আমি অধিপতি। সমাজ সেই সম্বন্ধকে অবৈধ ভাবে, সমাজ শালা আমার প্রেমকে অবৈধ ভাবে কোন্ সাহসে? মহিপাল সহসা উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে— কর্নেল, আমি যাচ্ছি। এঁকে বলে দাও আমার মাসিক আয়ের থেকে নিজের হাতখরচার জন্য সত্তর-আশি টাকার মত রেখে, বাকীটা সংসার-খরচের জন্য পাঠিয়ে দেব।

মহিপালকে দরজার কাছে যেতে দেখে কর্নেল তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলে— আজ থেকে তাহলে তুমি শীলার বাড়িতেই থাকবে ঠিক করলে না কি?

সহজ প্রশ্নের মধ্যে শ্লেষের আভাস পেয়ে মহিপাল রূঢ় গলায় উত্তর দিল— মেয়েমানুষের পয়সার জন্যে তার গোলামি করার মত কুকুর আমি নই।

—তোমার পরম শত্রুও তোমায় এ কলঙ্ক দিতে সাহস করবে না। নিজের সর্বস্বকে আঁকড়ে ধরার প্রাণপণ চেষ্টায় কল্যাণী ঠোঁট কামড়ে মনের আবেগকে সংযত করে বললে— তুমি চলে গেলে ছেলেমেয়েদের আমি কি জবাব দেব? ছুনিয়াকে এ মুখ দেখাব কি করে?

—কেন? তুমি সতীসাধ্বী স্ত্রী, সকলে দেবীর মত তোমায় পিঁড়িতে বসিয়ে পুজো করবে আর আমার মত বাউণ্ডুলের মুখে থু থু ফেলবে, এই না?

—আজ মুরাদাবাদের ছেলেপক্ষরা শকুন্তলাকে দেখতে আসছে, তাই আমি কর্নেলদাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলুম।

কল্যাণীর কথা শুনে মহিপালের মানসিক উত্তেজনা, প্রতিজ্ঞা, ভবিষ্যতের প্ল্যান সব এক মিনিটে কর্পূরের মত উবে গেল। জীবনের পটভূমিকায় বংশের ভবিষ্যৎ ভেসে উঠতেই তার দেউলে মন স্থাণুর মত স্থির হয়ে গেছে। স্ত্রী-প্রেম-প্রেমিকা সব স্বপ্ন যেন নিমিষে কঠিন বাস্তবের ধাক্কায় চুরমার হয়ে গেল। মহিপাল কোনমতে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দেয়ার জন্য বললে—কেউ আস্থক আর যাক, আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের এখানেই ইতি।

কর্নেল এগিয়ে এসে মহিপালের কাঁধে হাত রেখে বললে—মহিপাল, যাঃ, কি ছেলেমানুষী করছ? বউদির সঙ্গে ঝগড়া করে তুমি সাত সমুদ্র পার চলে যেতে পারো, কিন্তু ছেলেমেয়েদের কার ভরসায় রেখে যাবে? ঢের বীরত্ব হয়েছে, যাও এবার বাড়ি যাও। ছু'দিনে তোমার বাড়ির যা হাল হয়েছে স্বচক্ষে গিয়ে দেখোগে যাও!

—আমার মনের ওপর দিয়ে যে কী ঝড় বয়ে গেছে, তার কেউ খবর রাখে? কর্নেল, তোমায় আমি বলছি কল্যাণীর সঙ্গে বোঝাপড়া অসম্ভব।

—দেখো…

—দেখার এতে আর কিছু নেই। জীবনের চব্বিশ বসন্ত যে স্ত্রীর সঙ্গে কাটালুম সে যদি আজ পর্যন্ত আমায় ভুলই বুঝে গেল, তা হলে তার মুখ দেখার প্রবৃত্তি আর আমার নেই।

থাকবে কোথায়? শীলার কাছে যাবে? আমার বা সজ্জনের কাছে থাকলে তোমার মানে আঘাত লাগে। তা হলে—

মহিপালের চোখের সামনে গোমতীর ধারের শিবালয় ভেসে উঠল যেখানে সে পরশু সারারাত কাটিয়েছে, অশান্ত মনকে শান্ত করার সবচেয়ে ভালো জায়গা। এক নতুন আত্মবিশ্বাস, নতুন ফূর্তিতে তার অবসন্ন শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠল।

—আমার মত সাহিত্যিকের থাকার জন্য রাজমহলের দরকার হবে না। একটা কৌপীন এঁটে, শুকনো রুটি চিবিয়ে আর এক গেলাস ঠাণ্ডা জল ঢক ঢক করে খেয়ে নিলেই ব্যাস।

—এসব দর্শনশাস্ত্রের কপচানি আমারও বেশ জানা আছে, তবে আমি যেটা তোমাকে বলছি সেটা একটু চিন্তা করে দেখো। বাড়িতে আজ ছেলের বাড়ি থেকে লোকজন আসছে। কাল থেকে বউদি বেচারী কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেছে। যদি আমার মনের কথা জানতে চাও তাহলে বলি তোমায় ডাকার ইচ্ছে আমার একদমই ছিল না, কিন্তু বউদির অবস্থা দেখে আর চুপচাপ বসে থাকতে পারলুম না। যাক, আজ বউদির দর্শন হয়ে গেল, ভবিষ্যতে তোমার বাড়ি গেলে আর আমায় দেখে এক গলা

ঘোমটা টেনে আড়ালে চলে যাবেন না। কর্নেল ঠাট্টা করে কথার প্রসঙ্গ বদলাবার চেষ্টা করলে।

কল্যাণী আশ্বস্ত হয়ে নড়েচড়ে বসল।

—আচ্ছা বউদি, ম্লেচ্ছর বাড়ির চা খাবেন তো? যদি চায়ে আপত্তি থাকে তা হলে মিষ্টিমুখ তো করবেনই—বলতে বলতে কর্নেল লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একাঘরে স্বামী-স্ত্রী মুখোমুখি বসে। কল্যাণীর করুণ চাউনির সামনে মহিপাল যেন সব বাজি একসঙ্গে হেরে গেছে। স্ত্রীর সামনে আজ সে পরাজিত, কল্যাণী আজ বিজয়ী সিকন্দর আর সে পরাজিত রাজা পুরু।

* * *

বিচিত্র মানসিক পরিস্থিতির মধ্যে মহিপাল বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। নিজের ছেলেমেয়েদের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস সে যেন হারিয়ে ফেলেছে। বাড়ির দরজার চৌকাঠে এসে সে থমকে দাঁড়াল। বৈঠকখানার দরজার কাছে টাঙানো চিঠির বাক্সে কয়েকখানা চিঠি উঁকিঝুঁকি মারছে। কল্যাণীকে ডেকে বললে—বৈঠকখানার চাবিটা একটু পাঠিয়ে দাও। তুমি নিজেই দিয়ে যেও।

ততক্ষণ মহিপাল গলিতেই পায়চারি আরম্ভ করলে। পাড়ার একজন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তাকে দেখে নমস্কার করে দাঁড়িয়ে পড়ল—কি ব্যাপার পণ্ডিতজী, এবার ভোট কাকে দেবেন ঠিক করলেন?

—চুলোয় যাক ভোট, এ-সবে আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

ভদ্রলোক মুখ মচকে বললেন—হ্যাঁ খাঁটি কথাই বলেছেন, তবে আমি শুনলাম যে আপনি কর্নেলের সঙ্গে মিলে মিশে কম্যুনিস্টদের

সাহায্য করছেন? সেদিন এরোপ্লেন থেকে প্রচার-পুস্তিকা ফেলার কাজটা খুব জোরদার হয়েছে। এ বিষয়ে সকলেই একমত যে পার্টির এ ধরনের প্রচার-কার্য এই প্রথম দেখা গেল। আমি একবাক্যে আপনার সুখ্যাতি করে বলেছি যে এ পণ্ডিতজীর ব্রেন না হয়ে যায় না— হেঁ হেঁ হেঁ

রাগে মহিপালের পিত্তি পর্যন্ত চটে গেল, তবু চুপ করে থাকা ছাড়া অন্য উপায় নেই। কল্যাণীকে দরজার আড়ালে নড়তে চড়তে দেখে সে কোনমতে ভদ্রলোককে বিদেয় করে চাবি নেবার জন্য হাত বাড়ালে।

—এবার তুমি নেয়েধুয়ে ফেলো— ভেতরে যেতে যেতে কল্যাণী বলে গেল।

—আগে ছেলেমেয়েদের খেতে দাও।

—ওরা সকলে চলে গেছে। বাড়িতে এখন তপ্পু, রঞ্জো আর শকুন্তলা আছে।

—কেন?

—শকুন্তলাকে বাইরে যেতে মানা করলুম। ভাবলুম রঞ্জো আজ আমার সঙ্গে কাজে সাহায্য করবে।

কল্যাণী বাড়ির ভেতর যেতেই মহিপাল বৈঠকখানা খুলে ভেতরে ঢুকল। চিঠির বাক্সে কেবল দুখানা চিঠি আর একটি ম্যাগাজিন পড়ে আছে। নতুন ম্যাগাজিন আকর্ষণীয় প্রচ্ছদপট আর নানা রঙিন ছবিতে ভর্তি। পড়ার সামগ্রীর নিতান্ত অভাব। খাম খুলে চিঠি বার করতেই অল ইণ্ডিয়া রেডিওর বার্তা বিভাগের কণ্ট্রাক্ট হাতে এল। চতুর্থ মহাযুদ্ধ শীর্ষক। বার্তা সিরীজের প্রথম কণ্ট্রাক্ট পেয়েছে মহিপাল— বিষয় 'নরনারীর মধ্যে চতুর্থ মহাযুদ্ধ'।

মহিপাল একাই হেসে ফেললে— বিষয়টা খুবই মুখরোচক— স্ত্রী-পুরুষের মাঝেই নির্ঘাত চতুর্থ মহাযুদ্ধ বাধবে। পৃথিবীর আর্থিক অসামঞ্জস্য শেষ হবার পর এই সমস্যা সকলের সামনে বিকট হয়ে দাঁড়াবে। দ্বিতীয় খাম খুলতেই রহস্যের ধোঁয়া যেন এক মিনিটে পরিষ্কার হয়ে গেল। 'সাবিত্রীসমানেষু কল্যাণী' নীচে ইতি তোমার দাদা চিঠি পড়তেই মহিপালের আপাদমস্তক রাগে কেঁপে উঠল। কল্যাণী তার ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার চেয়ে পাঠিয়েছিল, তার উত্তরে সে তার আর্থিক অনটনের কথা জানিয়ে ক্ষমা চেয়েছে। মহিপালের বড়শালা লিখেছে তার বাবার অসম্মানজনক ব্যবহারের জন্য সে ছোট ভাইয়ের বিয়েতে লক্ষ্ণৌ যাচ্ছে না। সে বোনের চিঠিতে বিয়ের খবরাখবর জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। শেষের এক লাইনে লেখা— আমাদের লেখক জামাইবাবুর কি খবর? আজকাল সাহিত্যের বাজার মন্দা চলছে না কি?

রাগে মহিপাল দাঁতে দাঁত পিষলে। তার মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল। তার চোখে দেখা দিল হিংস্র চাউনি। বৈঠকখানার দরজা বন্ধ না করেই ভেতরের বারান্দা, উঠোন, সিঁড়ি সব পার করে সে সোজা এক নিঃশ্বাসে বড় ঘরে গিয়ে দম নিলে। সেখানে তপ্প বসে ছেঁড়া ঘুড়ি জোড়া দিতে ব্যস্ত। বাবার চেহারা দেখে সে ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে গেল। মায়ের কাছে শোনা রাক্ষসের গল্পর মতই মহিপালের জায়গায় সেই রূপের কল্পনা করা মাত্র তার শিশুমন ভয়ে দুরু দুরু করে উঠল। ভাঁড়ার ঘরের দিকে যেতেই দেখতে পেলে, কল্যাণী পান দোক্তা মুখে দিয়ে চিবুচ্ছে, পাশেই মামীর কাছে বসে শকুন্তলা অতিথিদের জন্য বেদানা ছাড়িয়ে রেকাবিতে রাখছে। রজো মায়ের সামনে বসে চায়ের সেট মেজে

ধুয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করছে। কল্যাণী মিষ্টির দোনা খুলে আলাদা আলাদা কাঁসার রেকাবিতে সাজিয়ে রাখার জন্য শকুন্তলাকে নির্দেশ দিচ্ছে। পাশেই মেঝেতে কোলের ছেলেটি ঘটিকে গেলাসের মধ্যে ফিট করতে ব্যস্ত। দরজায় মহিপালকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এক মুহূর্তে সকলের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। কর্কশ, কঠোর গলায় মহিপাল চেঁচিয়ে কল্যাণীকে বললে —আমার সঙ্গে এসো। স্বামীর রুদ্রমূর্তি দেখেই কল্যাণী ভয়ে কাঠ। তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে পেছনে পেছনে ছুটল, আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তার রক্তহীন মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে।

তেতলার একদিকে একখানা বেশ বড় সাইজের ঘর আছে। ভিড়ভাড় থেকে আলাদা মহিপাল প্রায় এখানে বসেই নিজের কাজ করে থাকে। কল্যাণী ভেতরে ঢুকতেই সে ধড়াস করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্ত্রীর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলে—তুমি তোমার দাদাকে টাকার কথা কিছু লিখেছিলে?

প্রশ্ন শুনতেই কল্যাণী একেবারে থ, মহিপাল আবার পঞ্চম স্বরে গলা চড়িয়ে বলল, টাকা পাঠাতে লিখেছিলে?

—গেল মাসে তুমিই বলছিলে যে বইয়ের রয়েলটী পেতে একটু দেরী হবে। এদিকে ছোটকার বিয়েতে ওরা সকলে এই শহরেই আসছিল তাই···

—ছোটকার বরযাত্রী এশহরে আসবার ছিল বা জঙ্গলে যাবার ছিল, সে কথা হচ্ছে না, তুমি বাইরের লোকের সামনে হাত পেতে আমার ইজ্জত লাটে ওঠাবে ভেবেছ?

—দাদার কাছে চেয়ে পাঠিয়েছিলুম।

—দাদা হোক আর শালা যেই হোক, আমাকে জিজ্ঞেস না

করে তোমার এ দুঃসাহস হল কি করে? তুমি আমাকে কেন বললে না? পরের সামনে আমাকে অপমানিত করার মানে?

—ভুল হয়েছে, দাদা···

—দাদার আদুরে বোন! ঠাস করে কল্যাণীর গালে কষে চড়, ছয় ছেলেমেয়ের মা, আটত্রিশ বছরের প্রৌঢ়া গৃহিণী, শারীরিক আর মানসিক আঘাতে যেন হতভম্ব হয়ে গেল— হারামজাদী তুই আমার ইজ্জত খারাপ করে তবে ছাড়লি, হারামজাদী তুই সতী সেজে বাহবা লুটছিস। তুই, তুই···

রঞ্জো দরজায় কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাবার হিংস্র চেহারা দেখে আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কা সে আগেই করেছিল। শকুন্তলা আর রাজ্যশ্রী সকলেই এখন বুঝতে পেরেছে যে ডাঃ শীলার সঙ্গে মহিপালের প্রেম এ বাড়ির ঝগড়ার প্রধান কারণ। কৌতূহল চেপে না রাখতে পেরে রঞ্জো দরজায় কান লাগিয়ে দাঁড়াবার জন্য একতলা থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছে। মায়ের চিৎকার, বাবার হুমকি, চুপ, খবরদার যদি বাইরে আওয়াজ, ফোঁস ফোঁস নিশ্বেস, অস্পষ্ট গালাগালি, ধাক্কাধাক্কি, চড়-চাপড়ের শব্দে ভয়ে রঞ্জো জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে চেঁচালে, বাবা বাবা, খোলো খোলো, মাকে মেরো না বাবা···ও শকুন্তলাদি, তাড়াতাড়ি এসো···

দরজা ফট করে খুলল। কল্যাণী দরজা খুলতেই রঞ্জো মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। দরজা খোলার আগে কল্যাণী নিজেকে অনেক সংযত করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু মেয়েকে বুকের কাছে পেয়ে তার দুঃখের বাঁধ ভেঙে গেল। মহিপাল দেয়ালের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েকে দেখেই সে বেশ লজ্জিত অনুভব করছে। গোলমাল শুনে শকুন্তলা অনামিকাকে কোলে নিয়ে ছুটে এল।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছে কল্যাণী মেয়েদের বললে— নীচে যা, আমি এখুনি আসছি।

মেয়েরা একপাও নড়ল না। মহিপাল দরজার দিকে এগুলো। রঞ্জো আর কল্যাণী দু'জনে ছাদে এসে দাঁড়ালে। মহিপাল এগিয়ে কল্যাণীর পা ছুঁয়ে বলল— আমায় ক্ষমা কোরো, বলে নীচে নেমে গেল। রাস্তার হট্টগোল, ভিড়ভাড়, কাছারীর কম্পাউণ্ড, শাহী ফাটক পার হয়ে মিউজিয়মের জনশূন্য পোর্টিকোর কাছে এসে মহিপাল ধপ করে বসে পড়ল। বিগত দিনের সঞ্চিত স্মৃতির ভাণ্ডার মিউজিয়মে যেন তার খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব আশ্রয় পেল। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, যেন তার বুক ফেটে চৌচির হয়ে গেল। তার পাপ-পুণ্য ধর্ম-অধর্মের ঝোড়ো শব্দ যেন কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে। তার আশ্রয় কোথায়? সে দয়ালু, বিবেকবান, সিদ্ধান্তবাদী অথচ বোকার মত সৎ ও অসতের দুরঙা চাদর গায়ে দিয়ে সে কি পেতে চায়? শূন্য, হায়রে অভাগা। তুই কোথায় যাবি? কি করবি? তুই কৌরবরাজ দুর্যোধনের মত ধর্মকে চিনিস কিন্তু তার দিকে এগোবার প্রবৃত্তি তোর নেই, অধর্মের জ্ঞানও আছে কিন্তু তার থেকে তোর নিবৃত্তি নেই। আমার হৃদয়ে দেবতা কেন মুখ বুজে বসে আছেন? কেন তিনি আমায় পথের সন্ধান দিতে চান না? তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে।

শকুন্তলার বিয়ে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, তাদের সুখ-সুবিধে, তাদের ভবিষ্যৎ, পত্নীব্রত ধর্ম, প্রেমিকের ধর্ম, সাহিত্যিক হিসেবে দেশের প্রতি তার কর্তব্য, অমর লেখক হবার আকাঙ্ক্ষা, সমৃদ্ধির মাঝে বাঁচার লালসা, তপস্বীর মত আশ্রমবাসী হয়ে সাহিত্য সাধনা করার স্বপ্ন, সারা জীবনের ব্যর্থতা ঝড়ের মত মহিপালের জীবনের

প্রেরণাকে চুরমার করে দিচ্ছে। অনেক কিছু স্বপ্ন দেখার পর সব যেন গুঁড়িয়ে গেছে। সাফল্যমণ্ডিত হয়ে বাঁচার ইচ্ছে তবু সফলতা তার নাগালের বাইরে। ভগ্নমূর্তির পাশে খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব, সব যেন ফেটে চৌচির, সবই অপূর্ণ। দীর্ঘশ্বাসের পর দীর্ঘশ্বাস, এই কি তার জীবনের পাথেয়? কে উত্তর দেবে? তার জীবনের রিক্ততাকে সে কি কেবল স্মৃতিমন্থন দিয়েই পূর্ণ করে যাবে।

পঁচিশ

গিরি-গোবর্ধনের কাছে বিশাল জলকুণ্ডের পাশে দীঘল গাছগুলোর ছায়ায় সজ্জন আর কন্যা খাওয়ার পর বিশ্রাম করছে। চারিদিকে ময়ূরের ডাক, পাখির মধুর কলরব, আকাশে বাতাসে বিচিত্র মাদকতা। কন্যা টিফিন-কেরিয়র বন্ধ করে একদিকে রাখল। কিছু দূরে তিন-চারটে বাঁদর খাবারের টুকরোর অপেক্ষায় বসে আছে। বাঁদরের ভয়ে কন্যার টিফিন-কেরিয়র শাল দিয়ে ঢাকা, দুজনে কৌটোর ভেতর থেকে স্যাণ্ডউইচ, প্যাঁড়া, সরভাজা বার করে মনের আনন্দে খাচ্ছে। কাছে রাখা ছড়ির ভয়ে বাঁদরের দল দূর থেকেই হুমকি দিয়ে ক্ষান্ত, কাছে আসার সাহস নেই। কৃষ্ণ কানাইয়ের জীবদের সন্তুষ্ট করার জন্য কন্যা আর সজ্জন দু'জনেই খাবারের টুকরো-টাকরা তাদের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে।

—কমরেড, প্যাঁড়া দু-একটা আরো এদের দিয়ে দাও।

—না, ঢের হয়েছে, নীচে ট্যাক্‌সি ড্রাইভার বসে আছে।

—কেন? সে নিজের খাবার সঙ্গে নিয়ে এসে থাকবে।

—তাতে কি? বেচারা রোজ ফল মিষ্টি কোথায় পায়?

—আর এই বাঁদরের দল···

—আমার কাছে পশুর চেয়ে মানুষ···

—কমরেড, গিরিরাজে এসে এ-সব বুলি ভুলে যাও, সব জীব মাত্রই সমান—

'সকলে সমান
সবে এক প্রাণ'

—ত্যাগ··· কমরেড, সিগারেটের জন্য মন আনচান করছে।

—আনচান করছে যখন, তখন ধরিয়ে নাও।

—না না, গোপালের এই পবিত্রভূমিতে···

—ধরিত্রী মাতাই গোপালের, পৃথিবীর কণায় কণায় তাঁর নিবাস।

—আচ্ছা বাবা আচ্ছা, আমিই হার মানছি।

দু-তিনটে প্যাঁড়া বাঁদরের দলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে কন্যা হেসে বললে— হাত জোড় করছি মহারাজ, আমার সঙ্গে হারজিতের সম্পর্ক দয়া করে রাখবেন না।

—কেন?

—আজ হার স্বীকার করে কাল আমাকে জেতার জন্য উৎসাহিত করবে— এই তো? তোমার শিল্পী মনের মুডের হাত থেকে আমায় রেহাই দাও দয়ানিধান।

মাটি থেকে কোট উঠিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বার করতে করতে সজ্জন বললে— আর্টিস্টকে বিয়ে করে তার জীবনসঙ্গিনী হতে চাও অথচ তার মুডকে এত ভয়?

—হ্যাঁ সত্যি ভয় করি। আর্টিস্ট মানুষের মুডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চতুর বারবনিতাই চলতে পারে, ভালো ঘরের গৃহিণীর কর্ম নয়। সে যত চতুর আর কর্মপটু হোক-না-কেন, হার মানতে বাধ্য হয়।

সজ্জনের রসিক মনে যেন হঠাৎ ব্রেক লাগল। সিগারেট ঠোঁটের কোণে চেপে বলল— তুমি সব আর্টিস্টদের এক লাইনে দাঁড় করিয়ে জবাই করে ফেলার মতলব করছ না কি? আমার মতে তাদের অন্তর বড়ই কোমল, খোলসটার ওপরে যাই…

—সেই জীবনের কথাই আমি বলছি। একা তোমার কথা নয়, আমার মনে হয় প্রত্যেক শিল্পীর জীবনে আছে এক বিরাট হাহাকার, রিক্ততা, তাই দুঃখের সঙ্গে সংঘর্ষ করার ফলে তার মন হয়ে ওঠে সংবেদনশীল। দাঁড়াও, আমায় বলে নিতে দাও, দুঃখের পাহাড়ের নীচে চাপা আর্টিস্টের দরদী মন শেষকালে হয়ে যায় পাথরের মতই কঠোর, পরের দুঃখে কাতর হবার মত অনুভূতি তখন চলে যায় তার নাগালের বাইরে।

—তোমার বলা শেষ হয়েছে?

—হ্যাঁ, কন্যা মুখ টিপে হাসল।

সামনে প্রাচীন গৌড় মঠের ভগ্ন দেওয়ালের দিকে নজর পড়তেই সজ্জন বললে— দেখো ডার্লিং, আর্টিস্ট কি মানুষ নয়? সাধারণ মানুষের চেয়ে ভিন্ন ধরাতলে তাকে তুমি রাখতে চাও কেন? আমি একজন আর্টিস্ট তবু তুমি আমি তোমার হতভাগিনী স্বর্গীয়া বউদি, তোমার বাবা, আমরা সকলেই এমনকি এই বাঁদরের দল, পাখিরা পর্যন্ত পেটের আর দেহের ক্ষিদে অনুভব করে। প্রত্যেক মানুষের মনে এক সংবেদনশীল হৃদয় আছে, আমার মনেও ঠিক সেই অনুভূতি…

—সংক্ষেপে কথা সেরে ফেললে ভালো হত না?

—সংক্ষেপে সারতে যাওয়া জীবনেরই এক অভিজ্ঞতা, টাইম কালচক্র…

—কালচক্র!

—হ্যাঁ, কালচক্রের অবিরাম গতি। সংসারের প্রত্যেক জীবমাত্রই সেই গতির দাস। মানুষ আর অন্য প্রাণীর মধ্যে তফাত শুধু বুদ্ধির, মানুষ নিজের বুদ্ধি দিয়ে কালচক্রের অভিজ্ঞতাকে অনুভব ক'রে তা বর্ণনা করার ক্ষমতা রাখে। অনুভূতি দিয়েই হয় তার রচনাশক্তির বিকাশ। মানুষের সম্পূর্ণ জীবন সেই অনুভবের বিরাট ইতিহাস।

—অনুভূতির বর্ণনা অনেকটা বোবার মতই নয়? মানুষের নিজের মনের অনুভূতি সব সময় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে না। আমার কথাই ধরো, আমার বিষয় তোমার মনের অনুভবের সঠিক বর্ণনা তুমি করতে পারবে? আমার রূপই একমাত্র চোখের উপজীব্য নয়। সৌন্দর্যের সঠিক বর্ণনা করা তোমার পক্ষে কি সম্ভব?

—না, আমার দৃষ্টিতে দৈহিক সৌন্দর্যবোধ জীবনের অনুভূতি নয়, কন্যা। আমি স্বীকার করছি তোমায় সামনে পেয়ে আমার মনের সুপ্ত বাসনা জেগে ওঠে। মনের সেই ইচ্ছা খুঁজে বেড়ায় তোমাকে কাছে পাওয়ার সুযোগ।

—সেই সুযোগের কল্পনাই জীবনের এক অনুভূতি নয় কি?

—হতে পারে, তার বিষয় আর একদিন কথা হবে। আজ আমি তোমায় বলতে চাইছিলুম যে সেদিন তোমার যে তিক্ত অনুভূতি হল…

—আমি যদি বলি যে সে অনুভূতি তিক্ত ছিল না, তাহলে?

—যাক সে কথা, আমার মতে সেদিন…

—তিক্ত নিশ্চয় হত যদি তুমি সেদিন প্রকাশ না করতে।

—তোমার কথায় অভিনবত্বের স্বাদ আছে কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন আচরণের উৎস কি তা তুমি গভীরভাবে ভেবে দেখার চেষ্টা কোরো। আমি কেবল অনুভবের কথাই বলছি, এখানে ভালো-মন্দের প্রশ্নই উঠছে না।

…বাঃ তুমি নিজেই ভালোমন্দের কথা তুলেছিলে, কন্যা ঠোঁট চেপে হাসল।

তার ঠোঁটের কোণের হাসির ঝিলিকে সজ্জনের প্রলুব্ধ মন যেন সাড়া দিয়ে উঠল। তার শিরায় শিরায় যেন সেই হাসির নির্ঝর ঝর্না কল কল বেগে প্রবাহিত হতে লাগল। রূপ, রস, সুগন্ধ, গুঞ্জন আর স্পর্শ— এই হাসির মধ্যে যেন সব একাকার হয়ে আছে। অন্তরের আনন্দের স্বাদ পেয়ে যেন তার সম্পূর্ণ বাহ্যিক জ্ঞান অসাড় হয়ে গেছে। তাদের দু'জনের মাঝে মাত্র গজ খানেকের ব্যবধান তবু সে যেন তার কত নিকটে, তার অন্তরের মাঝেই তার বাসা। তার জীবনের রিক্ত পাত্র আজ পরিপূর্ণ। তার মনের সমস্ত বিকার আজ শান্ত। গোবর্ধন, বড় বড় দীঘল গাছের ছায়া, পশুপক্ষী, গৌড় মঠ, আকাশ বাতাস সবের মধ্যে সেই একই রূপ পরিব্যাপ্ত— দু'জনের অস্তিত্ব আজ সেই রূপের মধ্যে মিশে গেছে। বিচিত্র অনুভূতি, বিচিত্র কালচক্রের গতি।

সজ্জনের চোখের ভাষার ইঙ্গিতে কন্যা যেন ধীরে ধীরে নিজেকে হারাতে বসেছে। সজ্জন তারই প্রিয়তম, সে তাকে চট

করে আদর করে গালে চুমু খেয়ে নেবে, ছিঃ ছিঃ এ-সব ছাইভস্ম কল্পনা তার মনে কোথা থেকে এল? বাসনার ছাই-ছাপা আগুন বাতাস পেয়ে আবার পুরোদমে জ্বলে উঠছে না কি? কল্পনার জাল তাড়াতাড়ি গোটাতে গোটাতে সলজ্জ হাসি হেসে কন্যা বলল— কি ব্যাপার! আর্টিস্ট অনুভূতির বর্ণনা করবেন না কি?

—তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করছি, তবে এ পরাজয়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে তোমার জয়, ঠিক বলেছি তো?

—আবার সেই জয়-পরাজয়ের ঝাঁপি খুলে বসলে? যাই বল-না কেন, আমি ভেবে ঠিক করেছি তোমার শিল্পী মুডের প্রত্যেক কথায় সায় দেওয়া আমার কর্ম নয়। এবার চলো ওঠা যাক।

—একটু দাঁড়াও, আমি রসখান কবির কবিতার লাইন মনে করছি।

—কবিতা?

—হ্যাঁ, ধেৎতেরী, পেটে আসছে মুখে আসছে না, কি মুশকিল।

—আমারও মনে আসছে না। আমার আবার কবিতা টবিতা মনে থাকে না। এইবার ওঠা যাক।

তেরে কহে সব সোয়াঁগ করোগী ·· হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে
মোর পন্‌খা সির উপর রাখিহোঁ গুজ কী মাল গলে পহিরোগী।
ওড়ি পীতাম্বর লয় লুকটি বন গোধন গোয়ালিনী সঙ্গ ফিরোগী॥
ভাবতো বোহী মেরো রসখান সো তেরে কহে সব সোয়াঁগ করোগী।
বা মুরলী মুরলীধর কা অধরান ধরী অধরান ধরোগী॥

—আহঃ কন্যা, এক সেকেণ্ড ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। সজ্জন কাগজ পেন্সিল বার করে স্কেচ করতে লাগল।

—তুমি···

—এক মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো।

স্কেচ তৈরী হচ্ছে। কৃষ্ণ মাথায় মুকুট, গলায় গুঞ্জমাল, পীতাম্বর, বাঁ হাতে লকুটিয়া আর ডান হাতে বাঁশি, শ্রীরাধার চোখে লাজ, ঠোঁটে বাঁকা হাসি, ভ্রূ একটু কোঁচকানো, দেহের ত্রিভঙ্গী মুদ্রা, ডান হাতের আঙুলে যৌবনের চপলতা।

বনকন্যার এ খেলা মন্দ লাগছে না। .শিল্পীর প্রেরণার বাজে কথার জাল থেকে নিজেকে সে মুক্ত রাখতে চায়। আজ সে শিল্পীর প্রেরণা নয়, এক সমর্পিতা নারী। যেদিন সে প্রথম দর্শনে সজ্জনের চোখে প্রেমের ঝিলিক দেখেছিল, সেদিন থেকেই অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে আছে তার দেহ মন। বহুবার মনের রাশ টানার চেষ্টা করেও সে পারে নি। সজ্জনের চোখের আড়াল হলেই যেন তার অতৃপ্ত অন্তরে আসে ভাবান্তর। নারীর অধিকার, পুরুষের অত্যাচার, পুরুষের প্রতি ঘৃণা, লেখাপড়া, চিন্তা-দর্শন, তার সমস্ত ইচ্ছা-অনিচ্ছা সজ্জনের সম্মুখীন হলেই যেন নিস্তেজ হয়ে যায়। সজ্জন তারই ইচ্ছার প্রতীক। যে নারী কোন পুরুষের আহ্বানে আজ পর্যন্ত সাড়া দেওয়া উচিত মনে করে নি, সজ্জনের সামনে আজ সে পুরোপুরি পরাস্ত। তার মনে পরাজয়ের গ্লানি নেই, পরশু রাতে চোখের জলে মান-অপমানের ভাবনা ধুয়ে মুছে গেছে। কাল দুপুরে একা বৃন্দাবনের গলিঘুঁজিতে ঘুরতে ঘুরতে তার চোখের সামনে ভবিষ্যতের ভয়াবহ ছবি ভেসে উঠেছিল, সংসার, পরিচিতদের থেকে দূর অনেক দূর চলে যাওয়ার কল্পনার মাঝে যেন সহসা সে শ্যামের বাঁশি শুনতে পেলে। সেবাকুঞ্জের পাশের গলি থেকে সজ্জন যেন তার নাম ধরে ডাকছে। সে নিজেই কিছুক্ষণ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে

পারে নি। সজ্জনকে ঘরের দরজার সামনে দেখে সে আনন্দের আতিশয্যে আত্মহারা হতে বসেছিল। দশহাত দূরে সজ্জনের কাছ পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা যেন তার হাতেপায়ে ছিল না, অবশ অসাড় দেহ নিয়ে সে কোনমতে দরজার কপাট ধরে টাল সামলে নিলে। তাড়াতাড়ি সজ্জন এগিয়ে এসে তাকে না ধরলে হয়তো সে মাথা ঘুরে পড়েই যেত। তার অবস্থা দেখে সজ্জনের ব্রহ্মচারী মনের বৈরাগ্য গলে জল হয়ে গেল। তার কঠোর মন ভূমিকম্পে ধসে যেতে বসেছে। সজ্জন সে সময় এক প্রৌঢ়া বাঙালী বিধবা বোষ্টুমির বাড়ি বসে রাধামাধবের ছবি এঁকে তাকে পাঁচ টাকা দিয়েছে। বোষ্টুমির সহস্র আশীর্বাদ শুনে সজ্জন সেই গলির দিকেই আসছিল। কন্যাকে তাড়াতাড়ি সঙ্গে করে সেই বাড়িতেই নিয়ে গেল। চতুর বোষ্টুমির রাধামাধবের আশীর্বাদে হাতে সদ্য পাঁচ টাকা এসেছে, আরো প্রাপ্তির আশায় সে কন্যার সেবায় ক্রুটি করল না। দালানের খাটিয়াতে তাড়াতাড়ি নিজের পুরানো কাঁথা বিছিয়ে দিলে, কুয়ো থেকে ঠাণ্ডা জল তুলে এনে খাওয়ালে, সজ্জনের কাছ থেকে কিছু খুচরো নিয়ে চট করে বাজার থেকে দুধ কিনে এনে গরম গরম চা তৈরী করলে, লুচি, পায়েস তরিতরকারী মুখরোচক রান্নাবান্না করে যশোদা মাতার মত স্নেহের সঙ্গে পিঁড়িতে বসে সজ্জনকে খাওয়ালে। উঠতে বসতে আশীর্বাদ, এখান-সেখানকার গল্প— করতে করতে বউয়ের সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন, বলে মিষ্টি ধমক দিতেও ভুলল না। বিদায়ের সময় শ্রীরাধামাধবের মালা সজ্জনের গলায় পরাতে পরাতে আশীর্বাদের পুঁথিমালা সবটা আওড়ে দিলে। সজ্জন নিজের পার্স কন্যাকে দিল, বোষ্টুমিকে

দক্ষিণা দেবার জন্য। বোষ্টুমির একাঘরে দুজনে চার ঘণ্টা পরস্পরের মুখোমুখি বসে কাটল তবু দুজনে যেন কথা খুঁজে পাচ্ছে না— কেমন আছ? ভালো আছি— কেন এলে? তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নাও— কন্যা আমায় ক্ষমা করো, ছাড়া কোন কথাই হল না। দুজনেই মৌন সমবেদনায় ব্যথিত, ভারাক্রান্ত! বিকেলে মথুরা থেকে ফিরে এসে বাড়ি যাবার আগে সজ্জন বাজার থেকে সাড়ে আটশো টাকার চারখানা শাড়ি, একখানা দামী শাড়ি কন্যার রমা বউদির জন্য আর তিনখানা কন্যার জন্য কিনলে। কন্যার পায়ে পুরোনো স্যাণ্ডেল দেখে আগ্রহ করে নতুন স্যাণ্ডেল কিনে দিলে। শাড়ি আর স্যাণ্ডেলের সঙ্গে ম্যাচ করা দামী ভ্যানিটি ব্যাগ, দামী শালও কিনতে ভুলল না। কন্যা দু-একবার চাপা গলায় প্রতিবাদ করলে বটে কিন্তু সজ্জনের আগ্রহের সামনে তার মুখে আর বেশী কথা জোগাল না। দুঘণ্টার মধ্যে প্রায় বারোশো টাকা খরচ হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে দুজনেই রমা বউদি আর মুরলীধরের মনের সন্দেহ হাবেভাবে মিটিয়ে দিলে। রাত্তিরে প্রিয়তমের ইচ্ছানুসারে সেজে, কন্যা তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেল।

সজ্জন তার রাধাকে রসখান কবির সবৈয়ার মতই চিত্রিত করেছে। রাফ স্কেচে ময়ূর-মুকুট, গুঞ্জমাল, পীতাম্বর মনোমোহন কৃষ্ণর সাজে রাধা, পুরুষ বেশে মুরলী ধরতে বারণ করা রাধার অপরূপ রূপ। সজ্জন নিজের শিল্পকলা দেখে যেন নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আজ থেকে পাঁচ-ছয়দিন আগে কন্যাকে তার বাড়িতে একা পেয়ে সে মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সেদিনের আর আজকের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত, কন্যার মুখের ওপর মুগ্ধ

দৃষ্টি ফেলে সে তাকে কাছে পাবার জন্য আকুল হয়ে উঠল। এই মুহূর্তে তাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে ঠিক পরীর মত। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে কন্যার গলা জড়িয়ে সে তাকে বুকের কাছে টেনে নিলে। বাহুবন্ধনে আবদ্ধ কন্যার সমস্ত অনুভূতি যেন আচ্ছন্ন হয়ে এল। দুই দেহের আগুন যেন ভাঁটির মত জ্বলে উঠেছে। গালে গরম গরম শ্বাস প্রশ্বাসের…

—দেখো, সব ব্যাটাবেটিদের কাণ্ডকারখানাটা একবার দেখো। বিলিতি মাছের টিন সব খালি করে ফেলে, এখন গিরিরাজে এসে চুমু খেয়ে আদর করার ব্যবসা চালু করেছে এরা।

মঠের এখানে দাঁড়িয়ে দন্তহীন গোঁসাইজী, জোরে জোরে কথাগুলো শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন। কন্যার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি চোখ নাক কান বন্ধ করে দিলে এক ছুট। সজ্জন ঘাবড়ে তাড়াতাড়ি স্কেচ বই, পেন্সিল, ক্যামেরা, ফ্লাস্ক, টিফিন-কেরিয়ার সব-কিছু গুটিয়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। খালি পায়ে কন্যা কাঁকড় পাথরে বেশী দূর ছুটতে পারল না। গাছের ঝোপঝাড়ের পাশে কন্যাকে দেখতে পেয়ে সজ্জন চেঁচিয়ে বললে—আরে, গুরু মশাই, দাঁড়ান, আমি আসছি।

কন্যার কাছে পৌঁছে ঠাট্টা করে বলল— বিলিতি নারী, টিনে বন্ধ মাছ সব সাবাড় করে কোথায় পালানো হচ্ছে?

—যাঃ কি বকবক করছ? তুমি লোক মোটেই সুবিধের নয়। কন্যা হেসে বললে।

—মানহানির মোকদ্দমা ঠুকে দেব। আমাকে মন্দ লোক বলার মানে? আমার মধ্যে মন্দটা কী দেখলে তুমি? বিলিতি নারী… টিনবন্ধ মাছ সাবাড় করে আমার পবিত্র কর্মকে মন্দ বলার দুঃসাহস…

—তুমি বড় দুষ্টু, কন্যা খিলখিল করে হেসে উঠল।

—অনেক ধন্যবাদ, থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি কমপ্লিমেণ্ট।

—ঠাট্টা নয়, আমার বুক এখনো ধড়ফড় করছে।

—বুকের আওয়াজ জীবনের চিহ্ন। তুমি একদম ভীতু।

—ভীতুই সই, এবার থেকে আমার মনকে শাসনে রাখব। তোমাকে সামনে পেলেই সব বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়।

—তুমি তিলকে তাল করার চেষ্টা করছ। আরে ব্যাটা ঘাটের মড়া যদি দেখেই নিয়েছে তাতে এত ঘাবড়াবার কি আছে? সজ্জনের চোখেমুখে বিরক্তিভাব ফুটে উঠল।

—তোমার পক্ষে হয়তো এটা ছোটখাটো মজার ব্যাপার, কিন্তু আমার জীবনের এ অতি পবিত্র অনুভূতি।

—পাগল হয়েছ তুমি? স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কের মধ্যে আবার পবিত্র-অপবিত্রের কোড এল কোথা থেকে? আসলে তোমার বাড়ির নোংরামি দেখে দেখে মাথার মধ্যে ভুল ধারণা ঢুকে গেছে। আমার হবু পত্নীর পবিত্রতার খেয়াল আমার যথেষ্ট আছে। আমি তোমাকে কোনদিন ধোঁকা দেব না।

কন্যা মাথা হেঁট করে শুনতে শুনতে সহসা ফিকে হাসি হেসে বললে— আমাকে দেবী শকুন্তলার মত কাঁদতে হবে না তো?

—কি?

—কারুর অভিশাপগ্রস্ত হয়ে যাই যদি?

—অভিশাপ, বর্তমান যুগে?

—দৃষ্টির শাপ এযুগেও লাগে।

—তোমার মন থেকে আমার প্রতি বিশ্বাস উঠে গেছে, নয়? পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সজ্জন বললে।

—বিশ্বাসই জীবনের অবলম্বন।

—এ কথা আমি স্বীকার করি আমার চরিত্র নিকোনো উঠোনের মত চকচকে উজ্জ্বল নয়। বড়লোকের একমাত্র ছেলে। অল্প বয়েসে বাবা-মাকে হারালে সচরাচর যা হয়ে থাকে, আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আমার চরিত্রে দুর্বলতার জন্যে হয়তো তুমি আঘাত পেয়েছ কিন্তু মানুষ হিসেবে আমি খারাপ নয়।

—খারাপ লোককে দেখে ভয় হয় না। কেননা তার ছায়া না মাড়িয়ে চলার চেষ্টা করা যায়। ভয় করে চরিত্রের দুর্বলতাকে, যে হাজার হাজার ভালো লোকের অন্তরে লুকিয়ে আছে, সময় সুযোগ পেলেই সহসা একদিন সে খপ করে তার শিকারকে বন্দী করে ফেলে।

কন্যার উপদেশ শুনে সজ্জনের প্রেমাসক্তি হাওয়াই ফানুসের মত আকাশে উড়ে গেল। তার বিদ্রোহী মন হাজার প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে— মদ খারাপ জিনিস কেন? গঙ্গাজল পবিত্র কেন? স্ত্রীপুরুষের দৈহিক সহজ আকর্ষণের ফলে দৈহিক মিলনে কোন দোষ আছে কি? চুম্বন করা কি পাপ? বিদ্রোহী মনের উদ্‌বিগ্নতাকে চাপা দেবার জন্যে সে কন্যাকে বললে— দাঁড়াও, আগে আমার কথা শোনো, তুমি যাকে খারাপ মনে করো সে শুধু সমাজের আহাম্মক বিজ্ঞদের লম্বা লম্বা কপচানি ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি তোমার মত ঠিক হয় তাহলে বুদ্ধ আর শঙ্করাচার্য পর্যন্ত নারীর বিরুদ্ধেই বলে গেছেন, নারী নরকের দ্বার, সমস্ত পাপের মূলে নারী, এবার তোমার কিছু বলার আছে?

—বুদ্ধ আর শঙ্করাচার্য যদি নারী হতেন তাহলে লিখতেন যে পুরুষ সাক্ষাৎ নরক, নারী সেই নরককে দেয়াল দিয়ে ঘিরে

সীমাবদ্ধ করে রাখে। প্রকৃতি আর জীবকে নারীই বিষধরের দংশন থেকে বাঁচায়। কন্যা বেশ রূঢ় গলায় বললে।

রাগে আপেলের মত লাল কন্যার মুখখানা দেখে সজ্জনের মানসিক অবস্থা একেবারে কাহিল। হাতের স্টিক কন্যার কাঁধে রেখে সোহাগের সুরে বলল— মাই ডিয়ার, রাগ করছ কেন? এই স্বাধীন দেশের একজন নাগরিক পুরোনো কালের মতই হুজুরের গোলাম হয়ে থাকতে সম্পূর্ণ রাজী আছে। লোহার বেড়ায় ক্ষুব্ধ বাঘিনী যেন স্টিকের স্পর্শে এক মুহূর্তে পোষা গোরুর মত দীন করুণ ভাবে তার প্রিয়তমের দিকে তাকাচ্ছে। সজ্জন তার কাঁধে হাল্কা স্টিকের টোকা দিয়ে বললে— দেখো পণ্ডিত কন্যাপ্রসাদ, আমরা দুজনেই দুজনের পূরক হয়ে বোঝাবুঝির পালা প্রায় শেষ করে ফেলেছি। ট্রেনের কিছু ঘণ্টার ঠুনকো পরিচয়ের মত সম্পর্ক গড়ে তারপর প্লাটফর্মে নামার সঙ্গেই এর শেষ করার ইচ্ছে আমার নেই। লক্ষ্মৌ পৌঁছে আমরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে ঘরকন্না পেতে বসব। তুমি বুঝতে পেরেছ কিনা জানি না কালকের ঘটনার পর আমার মনের ওপর দিয়ে বেশ একটা ঝড় বয়ে গেছে। আমার সংবেদনশীল মন পেয়েছে আজ তার উচিত পথের সন্ধান— আলোকে উদ্ভাসিত আমাদের চলার পথ। পত্নীর অধিকার হিসেবে তুমি আমার চরিত্রের দুর্বলতাকে শেকড়সুদ্ধ উপড়ে ফেলার চেষ্টা করবে কিন্তু একটা কথা প্লীজ মনে রেখো, স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর মত উপদেশ দিতে আরম্ভ করে দিও না যেন। বিগত দিনের কথা তুললে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চুলচেরা ফাটল ধরার ভয় থাকে। এ-সব কথা সাধারণ লোকেদের জন্য ঠিক আছে কিন্তু আমাদের বিষয় এ-সব যুক্তি খাটে না।

কন্যা মিষ্টি মিহি স্বরে উত্তর দিলে— আমি তোমার লম্বা লম্বা কাহিনী শুনে কি করব? বিগত দিনের ইতিহাস সাক্ষী হয়ে থাকুক। নতুন পরিস্থিতির মধ্যে তোমার চরিত্রের দুর্বলতা আপনা হতেই লোপ পেয়ে যাবে। চলার পথে তুমি নব ইতিহাস নির্মাণ করবে।

—মানুষের স্বভাবে এত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন হওয়া কি সম্ভব?

—কেন সম্ভব নয়? সাধারণ মানুষের চেয়ে তোমার চেতনা-শক্তি ঢের বেশী বিকশিত। বিয়ের পর অন্য স্ত্রীর অভাব জীবনে অনুভব করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি আমারই, কেবল আমারই হয়ে থাকবে।

দুজনে চুপচাপ হেঁটে চলেছে। সামনে পাথরের কারুকার্য করা সুন্দর ছাত দেখা যাচ্ছে। দূরে সাদা বাড়িটার কাছে তাদের ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। এতক্ষণে কন্যার হুঁশ হল যে সজ্জনের কাঁধে সব জিনিসের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে সে বেশ ঝাড়া হাত-পা হয়ে হাঁটছে। সে তাড়াতাড়ি সজ্জনের হাত থেকে কোট আর ক্যামেরা নিয়ে নিল। সজ্জন কন্যার চোখে প্রথমবার দেখতে পেলে সমর্পিতা নারীর মৌন নিমন্ত্রণ।

ছাব্বিশ

ভভূতি স্যাকরার বাড়ির সামনের গলিতে মহাকবি বিরহেশ সিগারেট হাতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। নন্দর নিমন্ত্রণে তিনি আজ এখানে উপস্থিত, মাঝে মাঝে আগমনী সংবাদ দেবার জন্য গলা খ্যাঁকারী দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে ভেতরের দালানে খটরখটর শব্দের সঙ্গে খুট করে সদর দরজার হুড়কো খোলার শব্দ হল। দরজার আড়াল থেকে নন্দর কৃত্রিম কাসির আওয়াজ ভেসে এল। মহাকবি বোর দরজার ফাঁক দিয়ে শরীর ভেতরে গলিয়ে দিতেই ফট করে কপাট বন্ধ হয়ে গেল।

নন্দ বৈঠকখানার দরজা খুলে দিয়ে আলো জ্বালিয়ে বিরহেশকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে। বাইরের দরজায় শেকল লাগিয়ে দিয়ে নন্দ মহাকবির গায়ে গা রগড়ে আড় চোখে তাকে দেখে নিশ্চিত মনে বৈঠকে ফিরে এল। বৈঠকখানার দেয়ালে প্রায় তিন-চার ফুট পর্যন্ত টাইল লাগানো। ফায়ার প্লেসের ওপর সুন্দর ম্যাণ্টলপীস, ফায়ার প্লেসের চারিদিকে জালির কাজ করা আঙুরের গোছার ডিজাইন, ছোট ছোট টিয়া পাখি সেই গোছায় টোকা মারছে। টাইলে রাধাকৃষ্ণ, ওঁ লেখা। সমাধিস্থ গঙ্গাধর শিবের মূর্তি এক কোণে রাখা আছে। বৈঠকে সোফা সেট, দু-চারটে চেয়ার আঁর একটা সেণ্টার টেবিল সাজানো।

নন্দ এসে সেণ্টার টেবিলের পাশে দাঁড়াল। মহাকবি অ্যাশট্রেতে সিগারেট ঝেড়ে চেয়ারে বসতে বসতে নন্দর দিকে চেয়ে মুচকি হাসলে।

—নন্দ বিবি গায়ে গা ঘষে যে আগুন লাগালে, জল ঢালার কাজটা কার জিম্মায়?

—এই যাঃ।

—তোমার মাথার দিব্যি— নন্দ বিবি— ব'লে বিরহেশ আতুর হয়ে নন্দর দিকে এগুতেই সে ছিটকে দুহাত দূরে সরে যেতে যেতে বললে— না না, আমাকে ছুঁয়ে দিও না যেন, এখন আমার গোমতীতে চান করতে যাবার সময়।

—আরে তুমি যদি গোমতীর দিকে যাচ্ছই তা হলে আমার প্রাণেশ্বরীকে এখানে পাঠিয়ে তবে যেও। এই জানুয়ারি মাসের শীতে সকাল চারটেয় বাড়ি থেকে তোমার হুকুম পেয়েই বেরিয়ে পড়েছিলুম। শীতে দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে, এবার কিন্তু উত্তাপ না পেলে জমে হিমখণ্ড হয়ে যাব।

—এটা বেশ্যাবাড়ি না কি? তুমি ভেবেছটা কি? নন্দ বিবি, বিবি বলতে বলতে ঢুকে এলেই হল, আমরা কুটনি ছিনাল না কি?

নন্দর কথার মারপ্যাঁচ বিরহেশের মত লোকের অজানা নয়, তাড়াতাড়ি হাত কচলাতে কচলাতে বললেন— না না, হিঁ হিঁ।

—তোমাদের দুজনের প্রেম দেখে আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। বউদি অষ্টপ্রহর তোমার নামের মালা জপ করছে আর চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে, তাই দয়া করে…

—সে তো বটেই নন্দ দেবী, তুমি আমাদের ত্রাণকর্তা।

—এটা জানতে চাইলে না আমি তোমার ঠিকানা জোগাড় করলাম কি করে?

—তুমি যাত্নু বিগ্গে জানো নিশ্চয়।

—তুমি তো প্রেমের রোগ লাগিয়ে চলে গেলে, এদিকে বউদির অবস্থা সঙ্গীন।

—আমারও সেই অবস্থা নন্দ বিবি, তোমার বউদি আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, আমার সবকিছু···

—একশো টাকা এনেছ?

—নন্দ বিবি, তোমার জন্যে গোলামের প্রাণ হাজির। বাবুগঞ্জ থেকে পায়ে হেঁটে এখানে এসেছি। আজকাল দিনকাল মোটেই ভালো নয়। পয়সার জন্যে খুনখারাপি করতে লোকে দ্বিধা করে না। অন্ধকারে একা একশো টাকা নিয়ে আসতে কেমন যেন··· বিকেলে যেখানে বলবে সেখানে পৌঁছে দেব।

—তুমি তো খুব চালাক লোক দেখতে পাচ্ছি। মজা···

—আরে না না নন্দ বিবি, তোমার জোয়ানীর দিব্যি, তোমার লাল লাল গালের দিব্যি, তোমার বউদির দিব্যি তোমাকে ধোঁকা দেব না। তোমার আমার একদিনের ব্যাপার নয়। এই নাও পঁচিশ টাকা রেখে নাও, একশো টাকা পুরো গুনে আবার দেব। ক্ষিদেয় পাগল বাঘিনীর সামনে যেন মাছির ভোঁ ভোঁ, নাক উঁচিয়ে, ঠোঁট উল্টে নন্দ বললে— রেখে দাও তোমার পঁচিশ টাকা, এখানে লক্ষ টাকার কারবার চলছে। আমার ভাইয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিনেমা হাউস কেনার বুলি দেবার ক্ষমতা রাখে।

কৈলাস নন্দর প্রাণের বান্ধবী। সে তার ব্যবসার সঙ্গিনীও বটে। দুদিন আগে সিনেমা হাউসের গেট-কীপার বিরহেশকে নিয়ে

কৈলাসের বাড়িতেই নন্দর দেখা করিয়ে দিয়েছিল। সিনেমা জগতের সমস্ত খবরাখবর দেওয়ার পর মহাকবি, তাদের সকলকে অভিনেত্রী হবার স্বপ্ন দেখিয়ে দিলে। নন্দ ছল-চাতুরীতে কারুর চেয়ে কম নয়, একশো টাকা বিরহেশের কাছে চাইলে। সেদিন তার সামনে বিরহেশ প্রায় পঞ্চাশ টাকা কৈলাসের চা, সিগারেট আর হুইস্কিতে ওড়াচ্ছে দেখে নন্দর লোভ আরো বেড়ে গেল। যদিও গেট-কীপার তাকে এই কবি বাবুটির বিষয় সাবধান করে দিয়েছিল, তবু নন্দ ভাবলে সে তার নতুন গ্রাহক ভাঙিয়ে নেবার ফন্দি করছে। মাত্র পঁচিশটি টাকা দেখেই বুদ্ধিমতী নন্দ এক লহমায় কবির পকেটের অবস্থা বুঝে নিলে।

—আজ তো বউদির আসা মুশকিল, আমার দাদা কালই রাত্তিরে কলকাতা থেকে ফিরেছে।

—কিন্তু তুমিই তো বলেছিলে আজ···

—তখন কি আর জানতুম যে মনিয়া হুট করে এসে হাজির হবে। সেদিন লিখেছিল যে ফিরতে আট-দশদিন দেরী হতে পারে। মা বাবা সংক্রান্তি স্নান করতে কালই এলাহাবাদ চলে গিয়েছেন।

মহাকবি খপ করে নন্দর পাছুটো জড়িয়ে ধরে বললে— যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করে দাও, নন্দ বিবি। একবার মোহিনীকে আমার কাছে নিয়ে এসো। দূর থেকে দর্শন করে প্রাণ পাখি তাকে কাছে পাবার জন্য ছটফট করছে। মোহিনীকে কাছে পেলে, তাকে ছুই বাহুর বন্ধনে— আরে ছাড়ো, ছাড়ো, কি হচ্ছে? নন্দ নিজেকে মহাকবির বাহুজাল থেকে মুক্ত করতে করতে বললে। মহাকবি নন্দকে জাপটে ধরে ভাববিহ্বল কণ্ঠে বললে— আমার প্রাণেশ্বরীর সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দাও। আমার হৃদয়ের

সুপ্ত অমর গীতি আজ আবার জেগে ওঠার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

—জাহান্নামে যাক তোমার অমর গীতি, ঢের ঢের ধাপ্পাবাজ দেখেছি, আগে আমার টাকা রাখো তারপর অন্য কথা।

—টাকা আমি তোমায় বিকেলে এনে দেব। তুমি একশো চেয়েছিলে আমি দুশো দেব। তোমার জন্যে প্রাণও উৎসর্গ করতে পারি নন্দরানী।

—আমার এসব বাজে কথা মোটেই ভালো লাগে না। ঠাকুরজীর সেবায় দিন কাটাই।

—ভগবান তোমাকে ভক্তিরসে আকণ্ঠ ডুবিয়ে রাখুন, তুমি দয়ার অবতার, এই দেখ আবার তোমার পায়ে হাত···

মহাকবি পায়ে হাত দেবার জন্য হেঁট হতেই বাঁ হাতের সোনার ঘড়ি চক চক করে উঠল। নন্দর চোখে ঘড়ি যাদুমন্ত্রের কাজ করল।

—তুমি বার বার জেদ করে চলেছ। তোমায় আগেও বলেছি যে এ বড় বেইমানী কাজ। আমার মনিয়া জল্লাদের চেয়ে কম নয়, এই যাঃ ঘড়ি খুলে গেছে? নন্দ ঘড়ির ওপর হাত রেখে বললে—তোমার জন্যে চেষ্টা করে দেখি, তারপর ভগবান যা করেন।

ঘড়ি বোরের হাত থেকে নন্দর হাতে হাজির, মহাকবির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মনিয়া তখন গভীর ঘুমে অচৈতন্য। ঘুমন্ত কোলের মেয়েকে নন্দ নিজের কাছে শোয়ালে।

নন্দ, বিরহেশ আর বড়কে বেশীক্ষণ একা থাকার চান্স দিলে না। মনিয়া জেগে উঠলে— এইটুকুই বিরহেশকে বিদেয় করার অব্যর্থ মন্ত্র, কিন্তু ততক্ষণে মহাকবি নন্দর চাল ধরে ফেলেছে। বড়র

হাত ধরে বললে— আরে ইনি মিথ্যে ভয় পাওয়াচ্ছেন, নন্দ বিবি ঘাবড়ো মাত, তোমার একশো টাকা আজই দিয়ে দেব।

—কিসের টাকা? বড় বিস্ফারিত চোখে জিজ্ঞেস করলে।

—কোহিনুরের দাম দিতে হবে না? ইনি আমার ঘড়ি নিয়ে নিয়েছেন। বিরহেশ বড়র দিকে চেয়ে হেসে বললে।

—কেন?

—সেসব কথা ছেড়েই দাও। ঘড়ি যদি ফেরত পাই তা হলে ভালোই হয়, আমি বিকেলে নিশ্চয় টাকা দিয়ে যাব। বড় কাকুতি মিনতি করে নন্দকে বললে— তোমার পায়ে পড়ি, রাজী হয়ে যাও, ইনি মস্ত বড় কবি, তোমার টাকা নিশ্চয় দেবেন। নন্দ রাজী হয়ে গেল। বিরহেশকে তার আর বড়র সঙ্গসুখ দিয়ে অমর গীতি রচনার পুরো সুযোগ সুবিধে দিয়ে দিলে।

সেদিন বিকেলে কিন্তু একশো টাকা পাওয়া গেল না। বড় প্রেমের ছোঁয়া পেয়ে সারাদিন সখী সখী ভাবে বিভোর হয়ে রইল। পরের দিন ভোরবেলা ঠিক সেই সময় মহাকবির আবার আবির্ভাব। আজ সে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে এসেছিল। অনেক বাহানা করলে, পরের দিন অনেক জিনিস আনার আশা দিলে, বড় নন্দের পায়ে তেল দিলে, কিন্তু এ ভবি ভোলবার নয়। নন্দর মন কিছুতেই টলল না।

—নিজেই চলে যাবে, না চেঁচাব এখুনি? নন্দ বাজখাঁই গলায় বিরহেশকে এক তাড়া দিয়ে, বড়কে হুমকি দিয়ে বলল— ওদিকে চলো। বড় ভয় পেয়ে গেল। বোরের কোন বাহানাই কাজে এল না, তাকে যেতেই হল। দরজার কপাট সন্তর্পণে বন্ধ হয়ে গেল।

বড় মনে মনে নন্দর মুণ্ডুপাত করলে। ভয়ে শুকনো বিরহেশের মুখ কল্পনা করতেই তার মন প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠল। দরজায় খিল দিয়ে নন্দ বললে— ও বড়, এ লোকটা ভীষণ জাঁহাবাজ, এ আমি তোমায় বলে দিলুম। আমি এমন জায়গায় তোমার হিসেব-কিতেব ফিট করে দেব যে প্রাণভরে প্রেমসুধাও পান করবে আর মাথা থেকে পা পর্যন্ত সোনায় ঝলমল ঝলমল করবে।

—গয়নাগাঁটিতে আমি লাথি মারি। মানুষ প্রেমের ভিখারী, গয়নাকাপড় দিয়ে নীচরাই প্রেমের তেজারতী করে। বলতে বলতে বড় নন্দর খাটিয়া থেকে মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে নিজের ঘরের বিছানায় শোয়ালে। পালঙ্ক নড়তেই মনিয়ার ঘুমে ব্যাঘাত হল।

—কি হয়েছে ?

—কিছু নয়, নীচে দরজায় খিল দিতে গিয়েছিলুম।

মনিয়া বড়কে জড়িয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। বিরহতপ্ত বড় তখন স্বামীর বাঁধনে অস্বোয়াস্তি অনুভব করছে। নন্দর হাতের পুতুল হয়ে সে ভালো করে নি, নন্দর ভীষণ কূটবুদ্ধি।

নন্দ ভয় পেলে যে বড় আবার তার বিরুদ্ধে মনিয়াকে না লাগায়। একেই মনিয়া আজকাল নন্দর প্রতি একদম বিরূপ হয়ে আছে। বোর তাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেছিল। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বড়র ওপর। নন্দর আজও গোমতী যাওয়া হল না। বাড়িতেই নেয়ে ধুয়ে নিজের ঘরে বসে মনিয়াকে বশ করার চিন্তায় ডুবে রইল।

ঘণ্টা দেড়েক পরে নাইতে ধুতে নীচে নেমে দেখলে সামনেই

মনিয়া লেপের মধ্যে শুয়ে শুয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। নন্দ ভাইয়ের কাছে এসে দাঁড়াতেই মনিয়া বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল—কি চাই?

নন্দ মেঝেতে উবু হয়ে বসে বললে—আজকাল আমি তো তোমার শত্রু হয়ে গেছি, তাই না?

মনিয়া উত্তর দিল না।

—তুমি যে খাঁটি কথা আমায় সেদিন বলেছিলে, আমি চির-দিনের জন্যে গাঁট বেঁধে রেখেছি। সকালবেলা, গোমতী নেয়ে সবে আসছি, নারায়ণ জানেন, বাবু আর আম্মার কথা হয়তো কোনদিন কানে নাও তুলে থাকতে পারি কিন্তু আজ পর্যন্ত তোমার কোন কথার খেলাপ করার সাহসই করি নি। সন্তোর বউ আমায় কতবার ডেকে পাঠালে। তোমার জন্যে কতবার কেঁদে কেঁদে আমাকে ডাকিয়ে পাঠালে কিন্তু তুমি যেদিন থেকে বারণ করে দিয়েছ, সেদিন থেকে বাড়ির চৌকাঠের বাইরে পা পর্যন্ত রাখিনি। আমি পরিষ্কার বলে পাঠালুম আমার ভাইয়ের হুকুমের আগে কারুর কথা আমি শুনব না।

মনিয়া চুপ করে শুনতে শুনতে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে লাগল। নন্দ একটু মুখ টিপে হেসে আবার শুরু করলে—কলকাতা থেকে আমার জন্যে কিছু আনলে না। আজ আমি নালিশ নিয়ে এসেছি তোমার কাছে। বিয়ে হয়ে বোনের কদর একদমই থাকে না, কে পোঁছে? আরে তবু মায়ের পেটের বোন চিরকাল তোমারি শুভাকাঙ্ক্ষী থাকবে।

মনিয়ার রাগ এতক্ষণে জল হয়ে গেছে।

—কি চাই তোমার?

—আমার? সাত সকালে আমার আর কিছু চাই না। তুমি সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, বলতে বলতে পালঙ্কের পায়ার কাছে নজর পড়তেই নন্দ আঁৎকে উঠল। মনিয়া ঝুঁকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলে— ওখানে কি?

—কালো সুতোয় বাঁধা কাগজ— দেখি ভালো করে··· হায় রাম, কেউ গণ্ডাবণ্ডা (গুণতুক) করে গেছে। একে ছুঁয়ে দিও না যেন, আমার মাথার দিব্য রইল— রামোঃ রামোঃ বলতে বলতে নন্দ তাড়াতাড়ি গণ্ডা হাতে নিতেই মনিয়া তার দিকে রাগত ভাবে চেয়ে বললে— তুমিই কিছু কারচুপি করে রেখেছ, ডাইনী সব।

—তুমি আমায় যা ইচ্ছে তাই বলে নাও কিন্তু বাবু আর আম্মার দিব্যি আমি কিছু করিনি। (গণ্ডার সুতো খুলে কাগজ খুলতে খুলতে) রামঃ রামঃ পাঁচ পীরের গণ্ডা।

মনিয়া ঝুঁকে কাগজ দেখলে। বাঘের মত জানোয়ার, মাথায় শিং, তাকে যে রাক্ষস মারছে তার মাথায় এক শিং আর ন্যাজ, বিচ্ছিরি ভয়ংকর ছবি দেখে মনিয়ার মন রাগে বিষিয়ে উঠল। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে নন্দই এসব ষড়যন্ত্রের মূল। রাগে লেপ একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দাঁতে দাঁত পিষতে পিষতে বললে— সত্যিকথা সব বলে দে নন্দ, না হলে খুন করে ফেলব।

তুমি যা ইচ্ছে তাই করো। যে কাজ আমি করিনি, বাজে ভয় পেতে যাব কেন? বাইরে যাই করি-না-কেন, তাই বলে নিজের বাড়িতে কেউ আগুন লাগায়? মা বাপ ভাই সকলেই আমার আপন। যে মেয়েমানুষ নিজের স্বামীর চোখের আড়ালে পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ায়, পথের কাঁটা সরানোর জন্যে

এ তারই চাল।" মনিয়া উৎসুক হয়ে চেঁচালে— কি কথা? সব খুলে বল।

—এমনি এসব সাতেপাঁচে থাকার আমার কি দরকার, তবে যদি কেউ আমার ভাইয়ের প্রাণ নেবার চেষ্টা করে তা হলে আমি নিশ্চয় সব বলে দেব। এ তোমার প্রাণেশ্বরীর কর্ম, যার জন্যে তুমি তোমার বোনকে দুচক্ষে দেখতে পারো না। আজকাল তোমার স্ত্রী পরপুরুষের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। এই তোমার জানলার ওদিকে জেঠীর ঘরে যে ভাড়াটে এসেছেন, তারই ওখানে চিঠি চালাচালি করে। আমি একদিন হঠাৎ দেখে ফেলেছিলুম।

—সত্যি বলছ নন্দ? মনিয়া গলা নামিয়ে বললে। তার চোখেমুখে সন্দেহের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে।

—আমি কেন মিথ্যে বলতে যাব? আমি স্বচক্ষে দেখেছি একজন বড় বড় ঝাঁকড়া চুলওয়ালা লোক আসে, তাকে বউদি থলিতে চিঠি রেখে পাচার করে। তারও চিঠি আসে।

—কোথায় সে চিঠি, মনিয়া গর্জে উঠল।

—এখানে হবে, ওর বাক্স-পেটরা খুলে দেখো। আমি বাবা কোন সাতে-পাঁচে নেই। এ একেবারে পাঁচ পীরের গণ্ডা।

মনিয়া বাক্স-পেটরা খুলে জিনিস তছনছ করে ফেললে। নন্দ চুপচাপ সেখান থেকে পিট্‌টান দিলে। কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে সিল্কের রুমালে বাঁধা চিঠি মনিয়ার হাতে ধরা পড়ল। মনিয়া গজরাতে গজরাতে ঘর থেকে বেরিয়ে চেঁচালে— হারামজাদী, কোথায় গেল?

বড় তখন সিঁড়ির নীচের গোসলখানায় চান করতে ব্যস্ত। নন্দ

ইশারায় দেখিয়ে দিলে। গোসলখানার দরজায় ধাঁই করে এক লাথি মেরে চেঁচালে— খোল, ছিনাল, হারামজাদী। তোর···

বড় ভিজে শাড়ি কোনরকমে গায়ে জড়িয়ে দরজা খুলে দিলে। মনিয়া ক্ষ্যাপা বাঘের মত হুমকি দিয়ে তাকে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল। অকথ্য ভাষায় গালাগাল, লাথি, কিলচড়, বাড়িতে হাঙ্গামা বেঁধে গেল। গলি, পাড়াপড়শী সকলের কানে বড়র চিৎকার আর মনিয়ার গালাগালি পৌঁছে গেল।

নন্দ তার পুজোর ঘরে ঠাকুরজীকে স্নান করাতে ব্যস্ত।

শঙ্কর হাত ধরবার চেষ্টা করতেই মনিয়া বুক চিতিয়ে চেঁচালে— সরে যাও মাঝখান থেকে। এসব তোমার জন্যেই হয়েছে, তুমিই যত সব বদমাইস বাড়িতে ঢোকাও। আজ প্রত্যেককে খুন করে ছাড়ব। হারামজাদী আমার ইজ্জৎ মাটি করে দিলে, শালী মাটি খুঁড়ে পুঁতে দেব, প্রেম করা হচ্ছে।

মনিয়া মারতে মারতে বড়র অবস্থা কাহিল করে দিলে। ভিজে শাড়ি দিয়ে দেহের লজ্জা ঢাকা দায় হয়ে উঠল। হট্টগোল শুনে গলিচলতি লোক জড়ো হয়ে গেল। চারিদিক থেকে 'আরে, আরে, কি হল, যথেষ্ট হয়েছে, আর মেরো না' ইত্যাদি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দুজন মেয়েমানুষকে নন্দ নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বড়র ইতিহাস তাদের রসিয়ে রসিয়ে শোনাচ্ছে।

—হায়, হায়, ঘোর কলিযুগ, গুন্নো পণ্ডিতাইন সব কথা শুনে কপাল চাপড়ে বললে। বন্সোলালা দরজার চৌকাঠে বসে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলে— পণ্ডিতাইন, কি হয়েছে?

কপাল ঠুকে ফোঁস করে নিশ্বেস ফেলে গুন্নো বললে— তোমাকে আর কি বলি ভাইয়া, ঘোর কলিযুগ। এমন কার্তিকের মত

সুন্দর লম্বা চওড়া জোয়ান রোজগারে স্বামী ছেড়ে—আমাদের মনিয়া কারুর চেয়ে কিসে কম? ভগবান করুক কোন ভদ্রঘরের মেয়ে এ বাড়ির বউ হয়ে আসুক, বেচারা তিষ্ঠতে পারবে। এই হারামজাদী ছোট ঘরের মেয়ে, রাজার বাড়িতে থেকেও পরের বাড়ির গু চাটতে যাওয়ার অভ্যেস যায় নি। ঘোর কলিযুগ, হায় হায়! ছি ছিঃ, জাতজন্ম মানসম্ভ্রম কিছু রইল না, এ গলিতে এমন নোংরা কাণ্ড।

—এসব সাহেবীয়ানা চা'ল, পণ্ডিতাইন, আজকাল স্বাধীন দেশের নারী সব। এখন এঁরা ভোটের অধিকারী হয়েছেন, যা ইচ্ছে তাই করবেন। তুমি আমি সব পুরোনো চালের লোক, আমাদের বাপ-ঠাকুর্দার নাক কাটিয়ে এখন চুপচাপ একদিকে বসে থাকার যুগ এসেছে। কালকে নিশ্চয় কোন পার্টি এই ঘটনা নিয়ে প্রচার-পুস্তিকা তৈরী করে এরোপ্লেন থেকে ফেলা শুরু করবে। নাক তো কেটেইছে, কাল থেকে লোকে মুখের উপর থুথু ফেলে যাবে।

—আমি এক এক করে সব ব্যাটাদের স্বর্গের বাতি দেখিয়ে তবে··· মনিয়া উঠোনে দাঁড়িয়ে চেঁচালে।

—আরে ভাইয়া সামলে, সব বড়লোকেদের ব্যাপারে···

সকালের রোদ ধীরে ধীরে দেয়াল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে, তারই সঙ্গে সঙ্গে ভভুতি স্যাকরার বাড়ির সামনে ভিড় জড়ো হচ্ছে। মিস্টার বর্মার বাড়ির আগে পর্যন্ত লোক গিজ গিজ করছে, গলি থেকে বেরুনো মুশকিল। দু-চার মিনিট বিশ্রাম নিয়ে মনিয়া আবার জোর লাথি—কিল-চড়-চাপড় বসিয়ে দিচ্ছে। বড়র সারা শরীর কাদায় মাখামাখি। ভিড়ের মধ্যে অনেকে

টিপ্পুনি কেটে মন্তব্য প্রকাশ করছে, উপদেশামৃত শুরু হয়ে গেছে। নন্দর ঘরের বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত খবরের জন্য সকলেই উৎসুক হয়ে কান পেতে আছে। শেষকালে এ বিষয় সকলেই একমত হল যে পড়শী তারা বর্মা আর সজ্জন মোটেই সুবিধের নয়, তারাই পাড়ায় দুরাচারের আড্ডা খুলে বসেছে। সকলের মন্তব্য শুনতে শুনতে মনিয়ার রক্ত গরম হয়ে গেল।

—আমি হারামজাদী বেশ্যাকে এক মিনিট এ বাড়িতে টিঁকতে দিতে রাজী নই। এখুনি বেরিয়ে চলে যাক তার এয়ারের কাছে। বেরো, বেরো শালী।

মনিয়া বড়কে টানতে টানতে উঠোন, দালান, উঁচু নীচু চৌকাঠের বাইরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে। জ্যান্ত লাশ ধপাস করে বাড়ির বাইরে গিয়ে পড়ল। মার খেতে খেতে সারা শরীরে রক্ত বেরিয়ে এসেছে। বড় তাড়াতাড়ি উঠে কোনমতে শাড়ি টেনে মাথার ঘোমটা দিয়ে হাঁটুতে মুখ লুকিয়ে শ্বশুরের ভিটের দরজায় বসে রইল।

ভিড় বাড়তে লাগল। তাজা গরমাগরম পরচর্চার বিষয়। বউয়ের প্রেমিক একজন কবি, পাশের বড়লোক শিল্পীর বাড়িতে বদমাইসদের আড্ডা জমে, তারই বাড়ির ছাদে এই প্রেমের সূত্রপাত হয়েছে। কন্যা, সজ্জন, এরোপ্লেনের প্রচার-পুস্তিকা সব-কিছু নিয়ে আলোচনা আবার নতুন করে ফেনিয়ে উঠেছে। বড়লোকেদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনের ঘৃণার আগুন বাতাস পেয়ে দ্বিগুণ ভাবে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

মনিয়ার ছোটভাই আর তার বউয়ের, তারা বর্মার হাল ফ্যাশান, পাড়ায় বেঁহায়াপনা কোন চর্চাই বাদ গেল না। ধুলোয়, কাদায়,

মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোনমতে ঢাকা পরিত্যক্তা নারী আজ সমাজের আচরণ-সংহিতার হাড়িকাঠে উপস্থিত, সমাজের সতর্ক প্রহরীদের সামনে আজ সে অপরাধিনী। ভিড়ের সকলেই বর্তমান সমাজের নৈতিক, সামাজিক সমস্যার বিষয় মুখরোচক মন্তব্য করতে করতে যে যার স্কুল কলেজে অফিসের দিকে রওনা হয়ে গেছে।

বড় একা, সম্পূর্ণ একা।

সাতাশ

বড় ভাইয়ের রাগ, গালাগালি, খুন করার হুমকি শুনে নিজের মান বাঁচিয়ে শঙ্করলাল ওপরে চলে গেল। দোতলায় ছোট তখন ভয়ে জড়সড় হয়ে একদিকের থামে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে, বাড়ির পরিস্থিতি দেখে ছোটর মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে আড়ালে দাঁড়িয়ে অবস্থা বোঝার চেষ্টা করতে লাগল।

তারা আর বর্মা দুজনেই পড়শীর খবর জানার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। শেষকালে স্ত্রীর উসকানীতে বর্মা নিজেই ভভুতির ছাদে নামল। হঠাৎ ছোটর নজর ছাদে যেতেই সে স্বামীকে ইশারা করলে। বর্মা ইশারায় দুজনকে কাছে ডেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে— মিস্টার লাল, এবার পুলিসকে খবর দিন। পাড়ার লোকেরা একদম ছোটলোক। এ ব্যাটা মনিয়াকে শিখিয়ে-

পড়িয়ে বেচারী মোহিনীকে প্রাণে শেষ করিয়ে তবে এদের শান্তি।

ছোট ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে ফেললে—হ্যাঁ, ধরিয়ে দাও, না হলে এরা সকলে মিলে দিদিকে শেষ...

—আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু ভাবছি যে পুলিসের এনকোয়ারীতে বেচারা সজ্জন ফেঁসে যাবে.। এমনিতেই পাড়ার লোকেরা কেবল ওকেই নয় সঙ্গে আমাদেরও যা তা বলছে। শঙ্করলাল বললে।

—তাহলে এঁর কি হবে? বাপের বাড়ির কাউকে ..

—বাপের বাড়িতে বেচারীর আপন বলতে কেউ নেই। সৎ ভাই আছে, কিন্তু সেকি আর এ অবস্থায় রাখতে রাজী হবে .. কি বল স্বরূপ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ছোট উত্তর দিলে—পুরুষের একছত্র রাজত্বে অত্যাচারের নমুনা, নিজেরা যা ইচ্ছে তাই করবে কিন্তু স্ত্রী যদি ..

—তাহলে আপনি মিস্টার সজ্জন বর্মাকেই খবর পাঠিয়ে দিন। বর্মা শঙ্করকে বললে।

—উনি এখানে নেই, বাইরে গেছেন।

—বিরহেশ বাবুকে খবর দেয়া উচিত, ভুল যাই হয়ে যাক, উনিই তো মোহিনী দেবীর লাভার।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে নিশ্চয় খবর দেওয়া উচিত—তারা স্বামীর কথায় সায় দিয়ে ছোটকে বললে—স্বরূপ, খুকির বোধহয় খিদে পেয়েছে, কান্নার আওয়াজ আসছে।

—আজ আমাদের এখানে দুধই আসেনি—ছোট উত্তর দিলে।

—আমার বাড়িতে চলো। আচ্ছা শঙ্করবাবু, আপনি এখুনি বিরহেশকে খবর দিন।

—কী মুশকিল, তার ঠিকানা আমার কাছে নেই। হ্যাঁ, মনে এলো, মহিপালের কাছে গেলে হয়তো খোঁজ পাওয়া যেতে পারে, উনি একজন সাহিত্যিক...

—ডু প্লীজ, তাড়াতাড়ি যান। বর্মা বললে।

—চলুন, আপনার ওদিক থেকে বেরিয়ে যাই। আপনার সাইকেলটা...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন।

—আমাদের বাড়ির দরজা দিয়ে বেরুনো ঠিক হবে না।

—হ্যাঁ, ঠিক কথা, আসুন।

সকলেই বর্মার বাড়ি যাবার জন্য ওপরের ছাদে চলে গেল। খুকিকে, ছোট স্বামীর কোলে দিয়ে বললে—তুমি যাও, আমি ঘরে তালা দিয়ে আসছি।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে মহিপাল আর কর্নেল এসে হাজির হল। তখনো দু-চারজন বসে এ ঘটনার রেশ টেনে চলেছে, মনিয়া গম্ভীর হয়ে বৈঠকখানায় বসে সিগারেটে টান দিচ্ছে। নন্দর দরবার তখন ঘর থেকে সরে দালানে পৌঁছে গেছে। বড়র খুকিকে নিয়ে ছোট তারার বাড়িতেই স্বামীর প্রতীক্ষা করছে। বর্মা আজ আর দোকানে গেল না।

বর্মা তার ঘরের দরজার সামনে দিয়ে কর্নেল আর মহিপালকে যেতে দেখলে। শঙ্করলাল তাদের সঙ্গে ছিল না। এরা গাড়িতে এসেছে, কর্নেলের ড্রাইভার সঙ্গে আছে।

ভিড় সরিয়ে মহিপাল আর কর্নেল বড়র কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

অখণ্ড সমাধিমগ্ন যোগীর মত দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে সে যেন পাথর হয়ে গেছে, ভিজে শাড়ি রোদ লেগে গায়েই শুকিয়ে গেছে।

মহিপাল এগিয়ে গিয়ে বড়র মাথায় হাত রেখে বললে— ওঠো বোন, আমার সঙ্গে এসো।

বড় তেমনি পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে রইল। কর্নেল ভিড়ের দিকে চেয়ে এক ধমক দিলে— এখানে আপনারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? এখানে তামাশা দেখতে এসেছেন না কি? গলিতে নতুন গলার আওয়াজ শুনে মনিয়া বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এল। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন রসিক হেসে কর্নেলকে জবাব দিলে— তামাশাই তো হচ্ছে— লায়লা মজনুর প্রেম কাহিনী পুনরাবৃত্তি···

—আপনাদের লজ্জা বলে কিছু নেই? হাসি-ঠাট্টার সময়-অসময় জ্ঞান দেখছি আপনাদের একেবারেই নেই। একজন অসহায় মহিলার দুর্দশা দেখে আপনারা বেশ উপভোগ করছেন, না? আমি আপনাদের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, আপনাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকেন, বচন আর কর্ম দিয়ে আজ পর্যন্ত পাপ করেন নি তিনিই এগিয়ে এসে এই মহিলাটির নিন্দে করতে পারেন। এই মহিলাটি মন্দ কর্মের ভাগী হয়ে দুঃখ পাচ্ছেন কিন্তু আপনাদের মধ্যে যাঁরা সচ্চরিত্র, তাঁরা একটু এগিয়ে এসে যদি দর্শন দেন···

মহিপালের চ্যালেঞ্জ শুনে সকলেই হতবাক্। মনিয়া বারান্দায় বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলে— আপনি কে বাবু?

মহিপাল অপমানিত বোধ করলে; ভ্রূ কুঁচকে বললে— আপনি জিজ্ঞেস করার কে?

—আমি এই মেয়েমানুষটির স্বামী।

—তাহলে এঁকে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে নিয়ে যান।

—আপ…

—আপনি আপনি করার মানেটা কি? তোমার বিবাহিতা স্ত্রীর ওপর হাত তোলার অধিকার তোমায় কে দিলে? চালচলন ঠিক ছিল না, কোর্টে কেস করতে পারতে। আইনকানুন হাতে নিতে গেলে কেন? কর্নেল মনিয়াকে বললে।

—আপনি তাহলে এয়ারদের মধ্যে…

মহিপাল মনিয়ার হাত ধরে এমন জোরে এক টান দিল যে মুখের কথা শেষ না করে সে হঠাৎ আক্রমণের টাল সামলাতে না পেরে সোজা গলিতে লাফিয়ে পড়ল। দরজার নীচে গলিতে নামার ছোট সিঁড়িতে এক হোঁচট খাওয়ার সঙ্গেই গালে মহিপালের কষে এক চড়। মনিয়ার চোখে রক্ত নেমে এল। মহিপাল বাঁহাতটা ধরে ছিল, মনিয়ার ডান হাত উঠতেই সে খপ করে কব্জিটা চেপে ধরল। দু'জনের মধ্যে রীতিমত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল।

কর্নেল ভিড়ের দিকে চেয়ে চেঁচালে— ড্রাইভার, ড্রাইভার…

শিউমঙ্গল ভিড় চিরে বেরিয়ে এল। কর্নেল তাকে জোরে চেঁচিয়ে হুকুম দিলে— লালা জানকীসরণের বাড়ি গিয়ে কোতোয়ালিতে টেলিফোন করে দাও। আমার নাম নিয়ে শুক্লাজীকে বলো যে এখুনি ডেকেছেন।

ভিড়ের মধ্যে কেউ মধ্যস্থতা করার জন্য, কেউ বা বিদ্রোহমার্কা আবার কেউ বা মজা দেখার বাহানায় জড়ো হয়। পুলিসের নাম শুনেই মজা দেখার পাত্ররা সকলেই পরনিন্দা, চর্চা করতে করতে যে যার কেটে পড়ল। মধ্যস্থতা করার পাত্ররা সবাই মিলে

ঝটপট মল্লযুদ্ধের মাঝে হাঁ হাঁ করতে করতে লাফিয়ে পড়ল। বিদ্রোহীমার্কা একজন মুন্সীজী পুলিসের নাম শুনেই কর্নেলকে বললে— হ্যাঁ হ্যাঁ, পুলিস কেন মিলিটারি ডাকুন। আজকাল বড়লোকদের রাজত্ব। শালা পাড়ায় এসে অনাচার ব্যভিচার ছড়াবে আর ওপর থেকে পুলিসের ভয় দেখিয়ে চোখ রাঙাবে।

অন্যজন বললে—আরে আমরা এদের আর এদের পুলিস, সকলকে এখানেই মাটি খুঁড়ে পুঁতে দেব।

মনিয়া উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললে— আমার স্ত্রী, আমি মারব, যে মাঝখানে সাধু সেজে বাঁচাতে আসবে তাকেও ছুঘা বসিয়ে দেব।

—যেতে দাও, যেতে দাও।

—শালা, নেতাগিরি ফলাতে এসেছ এখানে, আমার লক্ষ টাকার ইজ্জত— এই হারামজাদীকে এর এয়ারদের সামনেই— মনিয়া জোরে বড়কে এক লাথি বসিয়ে দিলে। লোকেরা মনিয়াকে আবার জাপটে ধরে শুরু করলে— হাঁ হাঁ আরে যেতে দাও বাবু সায়েব। আরে মনিয়া, কেন শুনছ না। মারধোর করে ফল আছে কিছু? যদি স্ত্রীকে না রাখতে চাও, তাহলে শালীকে দূর করে দাও। বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও শালীকে।

—জাহান্নামে যাক হারামজাদী। মনিয়াকে পাড়াপড়শীরা মিলে ঘরের ভেতর ঠেলে নিয়ে চললে। মহিপাল তার থেকে বেশী শক্তিশালী, তাকে বেশ একচোট দিয়েছে। মনিয়া অপমানে ফোঁস ফোঁস করছে।

লালা জানকীসরণ পুলিস ইন্সপেক্টর আর দুজন সেপাই নিয়ে এসে হাজির হলেন। তাঁকে দেখেই হট্টগোল শান্ত হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বোঝাবার পর মনিয়া জানালে যে তার স্ত্রীকে এরপর বাড়িতে রাখা তার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়, সে যেখানে খুসী যেতে পারে।

মনিয়াকে সকলে মিলে বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালে। লালা জানকীসরণ, কর্নেল আর দু-চারজন মিলে ভিড় সরাবার চেষ্টা করছে। শঙ্করলাল বউদিকে উঠিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল।

দুই আড়াই ঘণ্টা পরে বড় ঘাড় তুললে। দু'চোখ পাথরের মত ভাবলেশহীন।

বড় বর্মার বাড়ি যেতেই ছোট আর তারা দুজনে তাকে জড়িয়ে ধরলে। বড় কিন্তু পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে রইল, মারের চোটে শরীরে জায়গায় জায়গায় কালশিটে পড়ে গেছে। কর্নেল লালা জানকীসরণের বাড়ির দিকে যেতে যেতে বললে—মহিলাটিকে ভীষণভাবে মেরেছে, আমি ডাঃ শীলাকে এখুনি টেলিফোন করে ডেকে পাঠাচ্ছি। ভেতরে কোন আঘাত লাগতে পারে, আসল টাটানি এবার হবে। তাড়াতাড়ি একটু দুধ আর ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দাও।

লালা জানকীসরণের বাড়ি বসে স্থির হল যে মামলার রিপোর্ট কোতোয়ালিতে লেখানো উচিত হবে না। পাড়ার ব্যাপার, ইন্সপেক্টর বেশ কিছু মেরে দেবে, ভভুতি হারামজাদা মোটা আসামী। শঙ্করলালকেও সেখানে ডাকা হল। লালা তাকে একদিকে আলাদা নিয়ে গিয়ে অনেক বোঝালেন। শঙ্করলাল পাঁচশো টাকার চেক লালা জানকীসরণের নামে কেটে দিলে, লালা চুপচাপ নগদ নোট কুর্তার পকেটে রেখে দিলে। মহিলাটির বিষয় এই ঠিক করা হল যে তাকে বিরহেশের কাছে ছেড়ে

আসা উচিত, এক কবির দরজা ছাড়া কোন দরজাই তার জন্যে খোলা নেই।

ডাঃ শীলা তখন এক জরুরি অপারেশনে ব্যস্ত। পেশেণ্টকে তার কাছে নিয়ে আসার কথা বলতেই কর্নেল মহিপালকে জানালে যে সে এখুনি তাকে নিয়ে পৌঁছোবে।

—আমি বোরের খোঁজে যাচ্ছি। মহিপাল বললে।

—বোরের সঙ্গে আমি ভালো করে বোঝাপড়া করে নেব, হারামজাদা আমার কাছে টাকা ধার নিয়েছে, এখুনি কোতোয়ালিতে নিয়ে গিয়ে জুতোপেটা করাব শালাকে।

—বোরের ওখানে আমি যাচ্ছি। ওর বাড়ি খুঁজে বার করা তোমার কর্ম নয়।

মহিপাল নিজে তার স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করে, তাই সে এ সময় শীলার সামনে এ প্রসঙ্গ ওঠার আগেই কেটে পড়ার তালে আছে। বিবাহিতা পত্নী ছেলেমেয়ে সব ছেড়ে সে পরকীয়া প্রেমে অন্ধ। সে সত্যিই শীলাকে ভালোবাসে, তা হলে সে বিরহেশ আর বড়র ভালোবাসাকে কলুষিত কেন মানবে? কিন্তু— মহিপাল সেই 'কিন্তু' থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়। সে শীলার ছায়া থেকে দূরে সরে যেতে চায়। তারা ছায়া যেন আজ তাকেই উপহাস করছে— না না, সে কেবল এক বিবাহিতা স্ত্রীর স্বামী, গৃহস্থ ধর্মই তার একমাত্র ধর্ম— মনে অন্য কোন চিন্তার উদয় হওয়া পাপ। মহিপাল, নিজের সমস্ত চিন্তাকে ভস্ম করে ফেলো, বিগত জীবনের সব-কিছু ভুলে যাও— ভুলে যাও।

নিজের ঘরে শীলা বড়কে বোঝাচ্ছে— যা হয়ে গেছে তা ভুলে যাও, নতুন জীবন আরম্ভ করো।

কিছুক্ষণ পরে মহিপাল বিরহেশকে শীলার বাড়িতে ছেড়ে চলে গেল। কর্নেল, শীলা, এমনকি শঙ্কর আর ছোট পর্যন্ত বিরহেশের সঙ্গে সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ নীতির ব্যবহার করলে। বিরহেশ পরিত্যক্তা নারীর ভার নেবে এই প্রতিজ্ঞা করলে।

বিদায় মুহূর্তে ছোট বড়কে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বুক ভাসালে, শঙ্করের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, কর্নেলের চোখ চকচকিয়ে উঠল কিন্তু বড় শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অবস্থাবিপাকে পড়ে তার চোখের জলও শুকিয়ে গেছে।

বিরহেশ তার হৃদয়হারিনীর হাত ধরে দরজার দিকে এগুলো। নতুন বউয়ের মত মাথা হেঁট করে ধীরে ধীরে যেতে যেতে বড় চৌকাঠের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে ছোট আর শঙ্করলালের দিকে চেয়ে কেঁদে ফেললে— মুন্নাকে (খোকা) আম্মাজী সামলে নেবেন, আমার বিটটীকে (খুকী) তোমরা দেখো। আমার বি-ট-টী-বি-ট-টী বলতে বলতে দাঁত কপাটি লেগে বড় বেহুঁশ হয়ে পড়ল।

সেইদিন রাত্তিরে আটটার সময়ে পাড়ার লোকেরা মিলে সজ্জনের ঘরে হামলা করলে। বড় আর বোরের প্রেমকাণ্ডর জন্য সকলে সজ্জনকে দোষী ঠাওরালে। সকলে বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলতে ব্যস্ত এমনটা যে হবে তারা আগেই জানত। সম্পাদকের নামে চিঠিতে আগেই সকলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল যে সজ্জনের ঘরে দুরাচারের আড্ডা জমবে, ঠিক তাই হয়েছে। মনিয়ার বন্ধু-বান্ধব উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। নেতা শালিগরাম আর জানকীসরণ লোকেদের উসকানী দিচ্ছেন। উত্তেজিত ভিড় এসে সজ্জনের ঘরের তালা ভেঙে ফেললে। সজ্জনের তৈরী পেন্টিং ছিঁড়ে

কুচিকুচি করে ফেললে। রঙের টিউব নিয়ে জুতোর তলায় পিশে দিলে। ছোট একখানা ঘরে প্রায় কুড়িজন লোক ঢুকে পাগলের নাচ আরম্ভ করে দিয়েছে। দেয়ালে তিনখানা পেন্টিং টাঙানো ছিল, একটার ওপর ঠাঁ করে স্টোভ গিয়ে পড়ল, দ্বিতীয়টা চায়ের পেয়ালার মার খেয়ে টুকরো টুকরো হল, তৃতীয়টার ওপর স্টুলের শক্তির পরীক্ষা হল। বিছানার চাদর কুটিকুটি হয়ে চারিদিকে উড়ছে। স্টোভের তেল বিছানার তোষকে আর বালিশে ছিটিয়ে তাতে দেশলাই ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাঙা কাঁচ, ছেঁড়া পেন্টিং আর চাদরের টুকরোতে ঘর ভরে গেল।

আশেপাশের বাড়ির ছাদ, জানলা থেকে লোকেরা এই নেত্য দেখলে, গালাগালি অকথ্য ভাষায় ঠাট্টা সব একসঙ্গে যেন সারা গলিকে ভয়াবহ করে তুলেছে। পাগলের মত ভিড়ের দল গোয়ালঘরের ছোট ফাটক দিয়ে ঢুকছে। যে যেখানে আছে সবাই মজা দেখতে বেরিয়ে ভিড়ের সংখ্যা বাড়াচ্ছে! নীচে ভিড়, আশেপাশের বাড়িতে ভিড়, সজ্জনের ঘরে, ছাদে প্রতিহিংসায় উন্মাদ ভিড়ের হাঙ্গামা, এর মধ্যে হঠাৎ ফট করে জেঠীর ঘরের দরজা খুলল। এক হাতে সিঁদুর নিয়ে, ভাঁটার মত গোল গোল কোটরাগত চোখ বার করে, কালো কালো মুলো মুলো দাঁত কিড়িকিড়ি করে, সাতপুরুষের বাপান্ত করে মন্তর পড়তে পড়তে জেঠী বেরিয়ে এলেন।

জেঠীকে দেখে ভিড়ের মধ্যে অনেকের মনে হাসিঠাট্টা করার ইচ্ছে চাগা দিয়ে উঠল কিন্তু তারা সভয়ে দেখলে জেঠী দুপাশের ভিড়ের ওপর সিন্দূর ছড়াতে ছড়াতে বিড় বিড় করে চলেছেন—ওঁ নমো নারায়ণা শঙ্কর কামরূপ কামাখ্যা সতীর দোহাই, মা

কালীর দোহাই, পাঁচ পীরের দোহাই, শঙ্খিনী, ডাকিনী এসো, শত্রুকে খাও, কালো পাখি চিকচিক করুক, সকলকে নির্বংশ করুক, শত্রুর নাশ—বীভৎসভাবে মন্তর পড়তে পড়তে ভিড় চিরে তীরের মত জেঠী সকলকে স্তম্ভিত করে চলে গেলেন। জেঠীর কুখ্যাত সিঁদুর আর মন্তর পড়া দেখে সকলের বুক ভয়ে দুর দুর করতে লাগল। এবার যে যার পালাবার রাস্তা খুঁজছে। ওপরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে জেঠী চিঁড়েচ্যাপটা হবার জোগাড়। চারিদিক থেকে ঠেলাঠেলি আর কনুয়ের গুঁতো খেয়ে জেঠী রাগের মাথায় এক বুড়োর মুখে দিলেন এক খামচি। জেঠীর নোখের খামচি আর সিঁদুরের ছোঁয়া লাগতেই বুড়ো ভয়ে চিৎকার করে উঠল। চারিদিকে রটে গেল যে জেঠী বুড়োর রক্ত চুষে নিচ্ছেন।

নীচে থেকে সরু সিঁড়ি, ওপরের ছাত আর সজ্জনের ঘর পর্যন্ত জেঠী গলা চিড়ে চেঁচাতে চেঁচাতে সকলকে অভিশাপ দিতে দিতে গেলেন। সিঁড়িতে কেউ জেঠীর থালাটা তাঁর ওপরেই উল্টে দিলে, সিঁদুরে রাঙা জেঠীর মুখ দেখে অনেকের হাত-পা ভয়ে পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল।

কাপুরুষদের ভিড়কে জেঠী কাবু করে ফেললেন। ক্ষর দুষণের বিশাল সেনার সামনে একা রাম আর লক্ষ্মণের বিজয় কাহিনীর আজ পুনরাবৃত্তি হল।

ফিরতি পথে বর্মার বাড়ির সামনেও সকলে মনের বাকী সাধটা মিটিয়ে মুখখিস্তি করে নিলে। সজ্জনের বন্ধ দরজা ঢোলের মত পেটালে। মনিয়ার ঘর কাছেই, তাই উত্তেজিত ভিড়ের সহানুভূতির জোয়ার আবার পুরো বেগে প্রলয়ংকরী মূর্তি ধরে ফিরে এল। এরা সমাজের এক বিশেষ দল, যারা সায়েবীয়ানার বিরুদ্ধে

জেহাদের ডুগডুগি বাজাচ্ছে। শঙ্কর আর ছোট নিজেদের ঘরে ভয়ে কাঠ, মনিয়া মদের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে আছে।

সেদিন জেঠী হ্যারিকেনের আলো নিয়ে প্রায় অর্ধেক রাত্তির পর্যন্ত সজ্জনের ছবির টুকরো বেছে বেছে জড়ো করে রাখলেন।

আটাশ

জেঠী নিজের ঘরে এসে আগে চান করতে ঢুকলেন। পৃথিবীশুদ্ধ সকলকে গালিয়ে হাঁস ছাগল করতে করতে ঠাকুরের পিদ্দিম জ্বালালেন। বেড়ালছানাদের অ্যালুমিনিয়মের বাটিতে দুধ ঢেলে ডাক দিলেন। জেঠীর আওয়াজ কানে আসতেই 'ললিতা' আর 'বিশাখা' ল্যাজ নাড়তে নাড়তে এসে হাজির হল কিন্তু 'কিশনা'র দেখা নেই। জেঠী সারা বাড়ির এমুড়ো ওমুড়ো 'কিশনা কিশনা' করতে করতে ঘুরপাক খেয়ে গেলেন। কিশনার দেখা না পেয়ে জেঠী গালাগালির জপমালা জপতে জপতে ধপাস করে নিজের দোলনার মত খাটিয়াতে শুয়ে পড়লেন। বেড়ালছানা এখন বেশ বড় হয়ে গেছে। এ বাড়ির ছাদ থেকে ও বাড়ির ছাদে লাফাতে লাফাতে তারা এখন পাড়াময় বেরিয়ে বেড়ায়। জেঠীর হয়েছে মুশকিল, তাদের না খাইয়ে তিনি নিজে অন্নজল গ্রহণ করেন না। নিরুপায় হয়ে শুয়ে শুয়ে তিনি বকবক করতে লাগলেন, বেড়ালছানাদের মাকে সাত সতীনের গালাগালি দিলেন— যে কেন সে তাঁর গলায় এ আপদ ঝুলিয়ে গেছে।

জেঠীর মন-মেজাজ এখন মোটেই ভালো নয়। কিশনা দুধ খায়নি, কল্লোমলের নাতির এত বড় লোকশান হয়ে গেল, কাল তাঁর সতীনের নাতির আশীর্বাদের খাওয়াদাওয়া। নন্দ মুখপুড়ি এখনো এসে বলে গেল না ছাই, যে দুটো যন্তর শ্মশানে ঠিক জায়গায় পুঁতে দিয়েছে কিনা— পাড়ার লোকেদের পেছনে লাগার মতই এইসব এলোমেলো চিন্তা জেঠীর মনের শান্তি নষ্ট করে রেখেছে। সজ্জনের ঘরের ভিড়ের ছবি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল, মনে মনে সকলের নামে সর্বনাশের সিঁদুর ফেলতে লাগলেন।

কোতোয়ালিতে রাত একটার ঘণ্টা বাজল। ললিতা বিশাখা ঘরের কোণে শিকার ধরে ফেলেছে। ইঁদুর চুঁ চুঁ করতে করতে প্রাণত্যাগ করলে। বেড়াল বাচ্চারা এখন মস্ত শিকারী। তাদের শিকার করা দেখে জেঠীর সারা শরীর ঘেন্নায় রি রি করে উঠল।

জেঠীর কানে আওয়াজ ভেসে এল। ললিতা বিশাখার মধ্যে কেউ একজন শিকার পায়ে চেপে বসে আছে আর অন্যজন তাকে হাতাবার জন্য ফন্দি ফিকির করছে। একটু পরেই দুজনে মল্লযুদ্ধ আরম্ভ করে খাঁউ খাঁউ খোঁ খোঁ শব্দে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিল। মর, মর সব, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে, রাত্তিরে দু'মিনিট চোখ বুজতে দেবে না, উফ্। জেঠী কয়েকবার ললিতা-বিশাখার ঝগড়া থামাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু এ সময় তিনি বড় ক্লান্ত, শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা। আজ ভিড়ের মধ্যে জেঠী একেবারেই চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সিঁদুর আর মন্তরের প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে প্রত্যেকেই পালাবার রাস্তা খোঁজার সময়ে তাদের জুতো চটি দিয়ে জেঠীর পা বেশ করে মাড়িয়ে দিয়ে গেছে। যদিও

শেষকালে জেঠীর জয়ডঙ্কা বেজেছিল বটে কিন্তু দুর্দশাটাও কিছু কম হয়নি।

জেঠীর কানে যেন কোন মেয়েমানুষের গোঁঙানির আওয়াজ এল। জেঠীর কান খাড়া হতেই গোঙানি বন্ধ হয়ে গেল। মুখের ওপর থেকে লেপ সরিয়ে জেঠী এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন। খুব কাছেই পাড়ার কোন স্ত্রীর প্রসব-পীড়া উঠেছে— কার বাড়ি জানার কৌতূহলে জেঠীর আর শোয়া হল না। জেঠী উঠে বসলেন। তাঁকে বসতে দেখে দুর্বল কিশনা তাড়াতাড়ি তাঁর কোলে এসে বসল। হঠাৎ জেঠীর বুদ্ধি খেলে গেল, তাঁরই ভাড়াটে তারার প্রসব-পীড়া উঠছে নিশ্চয়।

জেঠীর মনের আক্রোশ সুদর্শন চক্রের মত বন বন করে চরকি কাটতে লাগল। রাঁড় মরে গেলেই বাঁচি। ছেলে বিয়োবে নিশ্চয় তাই এত জোরে জোরে কাতরাচ্ছে।

তারার প্রসব-পীড়ার গোঁঙানি শুনে জেঠীর মন তেপান্তরের মাঠ পর্যন্ত চক্কর লাগিয়ে এল। কাল তার সতীনের নাতির আশীর্বাদ, নাচগান, খাওয়া-দাওয়া হবে। শহরের অনেক নিমন্ত্রিত অতিথিদের মাঝে তাঁর সতীন রানীর মত সেজেগুজে বসবে, তার ছেলের বউয়ের অহংকারের চোটে মাটিতে পা পড়বে না। চারদিন পরে বিয়ে, তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই নাতবৌ আবার পটাপট বিয়োতে শুরু করবে— রক্তবীজের ঝাড় সব। তাঁর সতীন বেটি ঠাকুমা হবে আর তাঁর স্বামী রাজা সাহেব— রাজা সাহেবের কথা মনে আসতেই ঘেন্নায় যেন জেঠীর সারা শরীর কুঁকড়ে গেল। ক্রূর আবেশের ঝোঁকে তিনি ছটফটিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিশন এতক্ষণ চোখবুজে কোলে ঘুমুচ্ছিল, হঠাৎ

ঝাঁকুনি খেয়ে সেও জেগে উঠল। তাঁর পেয়ারের কিশনার দিকে নজর দেবার এখন একদম সময় নেই। কানের পাশে প্রসব-পীড়ার গোঙানি সংগীতের মত তার কানের পর্দায় পৌঁছে গেছে, কিন্তু তিনি তখন নন্দর কথাই ভাবছেন— সে এতক্ষণে হয়তো তাঁর সতীনের বাড়িতে আর শ্মশানে যন্তর পুঁতে এসে থাকবে। হে সত্যনারায়ণ স্বামী, কাল সূর্যি ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই বেটির সোহোগের নাতি যেন কাটা কলাগাছের মত ভুঁয়েতে পড়ে। সব আনন্দ নিরানন্দ হয়ে যাবে, চারিদিকে হাহাকার পড়ে যাবে, আবাগীর বেটি সতীন বুক চাপড়ে চাপড়ে ডুকরে কেঁদে উঠবে, তাঁর স্বামী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়বেন। হিংস্র আনন্দের আবেগে জেঠীর পান খাবার ইচ্ছে হল। শিয়রে রাখা হ্যারিকেনের বাতি উঁচু করলেন। হ্যারিকেন পুজোর দালানে রেখে উঠোনে হাত ধুতে নামলেন। তারার প্রসব-বেদনার আওয়াজ এবার একদম কানের কাছেই শুনতে পেলেন, হাত ধোবার জলের কাছেই বন্ধ দরজার ওপারে তারার বাড়ি। জেঠী হাত ধুয়ে দরজায় কান লাগিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। বন্ধ দরজার ওপাশে সরু গলিপথ সোজা চলে গেছে তারার রান্নাঘর পর্যন্ত। তার পরে উঠোন, দালানের পরে তারার শোবার ঘর। এই মুহূর্তে তারার বন্ধ দরজার আর শোবার ঘরের দূরত্ব যেন কমে গেছে। জেঠীর চোখের সামনে তারার চেহারা ভেসে উঠল, ব্যথায় বিকৃত মুখ যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়ে হাজারটা গালাগাল দিতে লাগলেন। জেঠীর ঠোঁটের কোণে ক্রূর হাসি দেখা দিল। তারার পিণ্ডি চটকাতে চটকাতে জেঠী দালানে এসে পানের বাটার কাছে ধপ করে বসে পড়লেন। কিশন, ললিতা, বিশাখা, তিনজনে পানের

বাটার কাছে বসে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে টুকুর টুকুর জেঠীর পান সাজা দেখছে। সাদা গায়ে হলদে কালো ছোপ দেয়া বাচ্চাগুলো বেশ সুন্দর দেখতে হয়েছে। হঠাৎ যেন বাচ্চাদের সৌন্দর্য নতুন চোখে জেঠী দেখলেন। সতীন বেটির নাতি নিয়ে অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না— গর্বে তাঁর বুক ফুলে দশহাত হয়ে থাকে। কেমন ভালোমানুষের মত বসে আছে তিনটিতে মিলে, যখন শিকার ক'রে হত্যা করে তখন···

জেঠী পান ধোবার জন্যে বাটিতে জল নিয়ে বসেছিলেন, বিশাখা তাতে মুখ দিয়ে দিলে। জেঠী আবার বিরক্ত হয়ে ওপরে চলে গেলেন। যখন থেকে বেড়ালছানা এ বাড়িতে এসেছে, তখন থেকে জেঠীর দিনে একশোবার ধর্ম নষ্ট করে ছাড়ছে। সারা বাড়ি নোংরা করে রাখছে। সারাদিন ধুতে ধুতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। ইঁদুর মেরে খেয়েদেয়ে আরাম করবার সময় ফট করে জেঠীর কোল, বৈষ্ণবী জেঠী ঘেন্নায় মুখ বিতিকিচ্ছি করে তাদের ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে দেন। ছানারা বার বার তাঁর আশেপাশে ঘুর ঘুর করতে থাকে। জেদ করে আদর কাড়ানো বেড়ালের স্বভাব দোষ। শেষকালে নিরুপায় হয়ে জেঠী তাদের দূর দূর করতে করতে আবার কোলে তুলে নেন। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে সেই জিভে তারা জেঠীর হাত চাটতে চাটতে কখনো কখনো তাঁর শুকিয়ে আমসি মুখও চেটে নেয়। কিশন, ললিতা, বিশাখা ছুটোছুটি করে খেলতে খেলতে সোজা ঠাকুরের সিংহাসনের ওপর এক লাফ মেরে সব জিনিস ছত্রাকার করে ফেলে। জেঠী তাদের সব উপদ্রব সহ্য করেন। গরগর করতে করতে জেঠী আবার বাটিতে জল নেবার জন্যে উঠলেন। তারার প্রসব-পীড়ার করুণ চিৎকার

জেঠীর মনে তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার প্রথম আর শেষ প্রসব-পীড়ার কথা মনে করিয়ে দিলে। পান সেজে কৃষ্ণার্পণ করে মুখে পুরলেন, এক চিমটি দোক্তা নিয়ে 'জয় শ্রী কৃশন' বলে খেয়ে হাত ধুয়ে ধীরেসুস্থে হ্যারিকেন উঠিয়ে ঠাকুরঘরে গিয়ে ভাঁড়ারের চাবির গোছা বার করলেন।

কৌতূহলের খোঁচা খেয়ে আজ কত বছর পরে জেঠীর বসত-বাড়ির বন্ধ দরজা (তারার দিকের) খুলছে।

* * *

ব্যথা সমানে বেড়ে চলেছে, হাতের কাছে কোন ব্যবস্থা নেই দেখে মিঃ বর্মা ঘাবড়ে পায়চারি করছেন। স্ত্রীর মা বাবা এই শহরেই আছেন কিন্তু কারুর কোন সাহায্যের আশা করাই বৃথা। পাড়ায় সকলেই তাদের প্রেম বিবাহকে সুনজরে দেখতে পারেন নি। তারার কষ্ট দেখে সমাজের কুপ্রথার বিরুদ্ধে বর্মার বিদ্রোহী মন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠছে। স্ত্রীর প্রাণরক্ষার জন্যে সে বিচলিত হয়ে পড়েছে। তারা স্বামীকে ঘর থেকে নড়তে দিতে রাজী নয়, কিন্তু বর্মা কোনমতে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোন ভালো ধাইকে ডেকে আনার জন্য কাপড়চোপড় পরে বাইরে বেরুলো। দালানে এসেই সামনের রান্নাঘরের দালানে পাশের গলিপথে যেখানে কাঠ বোঝাই করা আছে, এক মনুষ্য আকৃতি দেখতে পেলে, হ্যারিকেনের আলো হাতে নিয়ে এক নারীদেহের আকৃতি, সাদা শাড়ি ডাইনীর মত এগিয়ে আসছে। ভূতের কল্পনা মাথায় আসতেই ভয়ে বর্মার হাত-পা ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। এক অস্ফুট আর্তনাদ করে বর্মা কাটা কলাগাছের মত ভয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল।

স্বামীর চিৎকার শুনে তারা ভয়ে আঁৎকে উঠল। এ সময়ে বিছানা থেকে নেমে যাওয়া সম্ভব নয়, ভয়ে তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। গর্ভের জীব যেন নড়েচড়ে মার সঙ্গে সহানুভূতি জানালে। নিরুপায় হয়ে নিজেকে যমরাজের হাতে সমর্পিত করে তারা বেহুঁশ হয়ে গেল।

জেঠী তাড়াতাড়ি উঠোন পেরিয়ে দালানে এলেন, সামনে সোফার কাছে বর্মা বেহুঁশ পড়ে। এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে জেঠী পা চালিয়ে সোজা ভেতরে চলে গেলেন। তারার দুর্দশা দেখে জেঠীর সারা শরীর শিউরে উঠল। পরিস্থিতির সঙ্গে যুঝবার জন্যে তিনি আটঘাট বাঁধতে লাগলেন। একা প্রাণী, দুর্বল শরীর তবু দৃঢ় মনোবলের জন্য জেঠী জগৎ সংসার এক করে ছেড়ে দিতে পারেন।

জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই বর্মা তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে পা বাড়ালে। দৈবী সাহায্যের মতই জেঠীর আবির্ভাব হবে, বর্মা স্বপ্নেও ভাবেনি। জেঠী বর্মাকে জল গরম করার হুকুম দিয়ে ছুরি আনার জন্যে বললেন। বর্মা মুখ বুজে তাঁর আদেশ মেনে চলেছে। রান্নাঘরের দালানে স্টোভ জ্বালার ব্যবস্থা করতে করতে তার কানে 'ওয়াঁ ওয়াঁ' নতুন আগন্তুকের কান্নার স্বর ভেসে এল— পিতৃপ্রেমের শিহরণে তার সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। পত্নীর প্রাণের চিন্তায় স্টোভ জ্বালানো ছেড়ে সে ঘরের দিকে ছুটল। জেঠীর ভয়ে দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে সেখান থেকেই জেঠীকে জিজ্ঞেস করলে— জেঠী, কি হল?

জেঠী রেগেমেগে বললেন— আরে জল গরম করলে কিনা? বাপ হচ্ছে চলছেন!

বর্মা মশাই ঘাবড়ে এক ছুটে সোজা রান্নাঘরে। জেঠীর হঠাৎ আবির্ভাব তার স্বপ্নেরও অতীত। সারা পাড়ার পৃথিবীসুদ্ধ লোকের সর্বনাশের ব্যবস্থা যে জেঠী করেন, তিনিই আজ সঙ্কটমোচন হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। এই নিষ্কাম-সেবাধর্ম, পরের জন্য চিন্তা, আজ জেঠীর মনে সহসা জেগে ওঠার কারণ কি? প্রশ্নের সঙ্গে তার উত্তর রহস্যের ধোঁয়ায় মিলিয়ে গেল। ঘৃণাময়ী জেঠীর রহস্যময়ী করুণাময়ী মূর্তি দেখে বর্মা আজ অবাক।

উনত্রিশ

সজ্জন আর কন্যা দুজনে আজ সকালেই মথুরা থেকে ফিরেছে। স্টেশনে নেমেই সজ্জন কন্যাকে অনেক করে বললে তার বাড়ি যাবার জন্য, কিন্তু কন্যা রাজী হল না। সে সমানে এই যুক্তিই দিলে যে কর্নেলদা রাগ করবেন। সজ্জন বেশী আগ্রহ প্রকাশ করা উচিত মনে করল না। চারদিন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কন্যার সঙ্গে থাকার সুযোগে সে তার স্বভাব বেশ বুঝে নিয়েছে, তার মর্জির বাইরে তাকে দিয়ে কোন কাজ করানো অসম্ভব। কন্যা আর অন্য আধুনিকাদের মধ্যে প্রভেদ আছে, তার মার মতই সে জেদী প্রকৃতির। সে যতই তাকে কাছে পাবার বা তার থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করেছে—কন্যার জেদের সামনে তাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। সেই পরাজয়ের গ্লানি তাকে

বিজয়ের লালসার দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে। মনের এই উত্তেজনাকে চেপে রেখে সে এ সময়ে কন্যার সামনে সভ্য আর সুসংস্কৃত সেজে থাকার প্রয়াস করছে। কন্যার সামনে সে নিজের যে প্রকৃতির পরিচয় দিয়েছে আজ সে তার বর্বরতার কলঙ্ক ধুয়ে মুছে ফেলবে। সে কন্যার হৃদয়ে, তার বিশ্বাস পেতে চায়, তার দেহকে বশে আনার আগে তার হৃদয় অধিকার করতে হবে। কালই যখন কথা হচ্ছিল, সৌন্দর্যকে পিষে ফেলার বর্বর প্রকৃতির লোকেদের আলোচনা যখন সে করছিল, কন্যা তার দিকে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করে বলেছিল— দেখো, নিজের মুখের কথা পরে ভুলে যেয়ো না যেন। সজ্জন আজ নিজের কাছেই নিজে পরাজিত, সেই কথা ভুলে যাওয়ার প্রয়াস করছে। এরপর সে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, কন্যার সঙ্গে সাধারণ ঠাট্টা পর্যন্ত করেনি। ট্রেনে সে কন্যাকে অজন্তা, ইলোরা, আবু, খাজুরাহো, চিদম্বর, মাদুরা ইত্যাদির শিল্পকলার বর্ণনা করলে। দুটো বার্থের একটা ছোট কম্পার্টমেণ্ট পেয়েও সে নিজের আবেগকে সংযত রেখে শিল্পের সৌন্দর্য চর্চা করলে। কৃত্রিমতার আবরণে অনেকক্ষণ নিজেকে ঢেকে রাখার পর সে ক্লান্ত হয়ে ওপরের বার্থে চড়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আজ সকালে স্টেশনে যখন কন্যা তার বাড়ি যেতে রাজী হল না, তখন সে নিজের ক্ষুব্ধ মনে লাগাম লাগিয়ে, শিল্পী-মনের শান্ত পরিচয় দেবার ভাঁড়ামি করার চেষ্টা করেছে।

মথুরা থেকে সজ্জন টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল, স্টেশনে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এসেছে। কন্যাকে ছাড়তে সে কর্নেলের ওষুধের দোকানে গেল। সে সময়ে কর্নেল লালা জানকীসরণের সঙ্গে দোকানের পেছন দিকের ঘরে বসে ছিল। সজ্জনের ঘরের তছনছ অবস্থার

খবর পেয়ে কর্নেল রীতিমত রেগে উঠে লালা জানকীসরণকে মিষ্টি মিষ্টি করে দুনিয়াদারি ভাষায় চিত্রকলা প্রদর্শনীর বিষয়ে জবাব দিয়েছিল। লালা জানকীসরণ থোঁতা মুখ ভোঁতা করে বেরিয়ে যাচ্ছেন— এমন সময়ে সজ্জন আর কন্যা ঘরে ঢুকল।

দুজনকে দেখে কর্নেলের চেহারায় খুসী খুসী ভাব ফুটে উঠল। লালা জানকীসরণের চোখে এক অর্থপূর্ণ কুৎসিত ইঙ্গিত দেখা দিল।

কর্নেল চাকরকে ডাকলে— ও ভোলা, গাড়ি থেকে বিন্নোর জিনিসপত্তর নামিয়ে ওপরে পৌঁছে দাও। লালা জানকীসরণ সজ্জনকে বললেন— আরে মশাই কোথায় গায়েব হয়ে গিয়েছিলে? খবর রাখো, দুদিন পরে— তোমার চিত্রের প্রদর্শনী। আমি এমন বিজ্ঞাপন ছাপিয়েছি যে সারা শহরে সাড়া পড়ে গেছে।

সজ্জনের মুড খারাপ হয়ে গেল, নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিলে— হ্যাঁ মথুরা গিয়েছিলুম, ফেরার সময়ে রাস্তায় এ খবর আমি পেয়েছি যে আপনি সারা শহর তোলপাড় করে ফেলেছেন।

লালা জানকীসরণ লজ্জিত হয়ে আর কথা খুঁজে পেলেন না— আচ্ছা আচ্ছা, তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো, আমাদের দ্বারা যতটা সম্ভব সেবা করেছি। কাল রাত্তিরে বেচারা শালিগরাম গলিতে পড়ে গিয়ে হাড় ভেঙে বসে আছে।

—আরে, কি করে পড়ে গেলেন? সজ্জন সহানুভূতির সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে।

লালা জানকীসরণ মুচকি হেসে বললেন— সকলে বলছে যে তোমার বাড়িউলী জেঠী টোটকা করেছেন।

সজ্জন হেসে ফেললে— কেন? কেন? উনি শালিগরামকে…

—তুমি সবে এসেছ, নেয়ে ধুয়ে আরাম করো, তারপর কর্নেলের মুখেই সব শুনতে পাবে'খন।

—আচ্ছা চলি তা হলে, রাজাসায়েবের বাড়ি একটু ঢুঁ মেরে আসি।

—কেন? খবরটবর ভালো তো?

—আজ আশীর্বাদের খাওয়াদাওয়া।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। সজ্জন বললে।

—আজকাল তোমার মাথার ঠিক থাকে না, কী ব্যাপার? কী ভাবো এত? আচ্ছা ভাই কর্নেল, চলি তা হলে, জয় রামজী কী।

—রাজাসায়েবকে বলে দেবেন যে আমি একটু পরে হাজির হব— সজ্জন লালা জানকীসরণকে বললে।

লালা জানকীসরণের যাওয়ার পর এটা সেটা অনেক কথা হল। কর্নেল কন্যাকে বললে— তোমার মথুরা যাওয়ার পর এখানকার কাজ অনেকটা এগিয়েছে। আজকেই তোমার বাবাকে শ্রীঘরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি, এবার শালিগরামকে এমন ধোলাই দেব যাতে সারাজীবন কর্নেলকে মনে রাখে।

শালিগরামের প্রসঙ্গের সঙ্গেই সজ্জনের ঘরের লুটপাটের খবর পেয়ে সজ্জন আর কন্যা দুজনেই রাগে উত্তেজিত আর উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠল। সজ্জন ঠিক করলে বাড়ি যাবার আগে একবার সে তার ঘরের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখে তবে যাবে।

* * *

নিজের চিত্রশালার ধ্বংসাবশেষ দেখে সজ্জন রাগে দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে উঠল। খুন করা টুকরো টুকরো লাশের মতই

ঘরের অবস্থা, ধ্বংসলীলার পরের দৃশ্যর মতই ভয়াবহ মনে হচ্ছিল। পেন্টিংএর ছেঁড়া এক-আধটা টুকরো এদিক-ওদিক পড়ে আছে। ঘরের এক কোণে ছোট স্টুল আধপোড়া হয়ে ক্যাঙারুর মত দু-পা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জলের সোরাইয়ের টুকরো, ভাঙা কাঁচের টুকরো, পেন্টিংএর ছেঁড়া টুকরো জেঠী এক কোণে জমা করে গিয়েছিলেন। সমস্ত টুকরোর ব্যথা যেন অসংখ্য সুচের মত তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। খোল থেকে বেরিয়ে ভেংচি কাটার মত পড়ে আছে। ঘরের একটা জিনিস আস্ত নেই। সজ্জন, কন্যা আর কর্নেল অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘরের অবস্থা দেখলে, রাগের চোটে সজ্জনের চোখ দিয়ে বারুদের গোলার মত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বেরুচ্ছে।

কন্যা সজ্জনের মৌনতা দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। সজ্জনকে তার উত্তেজনার অগ্নি থেকে বাঁচাবার জন্য সে যেন কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। এই ছোট্ট ঘরটি ছিল তার নতুন-সংসারের প্রবেশকক্ষ, এখানেই তার সজ্জনের সঙ্গে প্রথম আলাপ। 'দৈনিক নবজীবন' অফিসে চাকরি পাবার পর মহাবীরের প্রসাদ নিয়ে সে এই ঘরে এসে সজ্জনের কপালে গোলা সিঁদুরের ফোঁটা লাগিয়ে প্রথমবার তাকে 'তুমি' সম্বোধন করেছিল, সেই-সঙ্গেই তার সংকোচের ব্যবধান আপনা হতেই সরে গিয়েছিল। এই সেদিনের কথা, সামনে সত্যনারায়ণের ছবি রাখা ছিল, মহাকবি বোর ছাদে বসেছিল, ডাঃ শীলা ঘরে বসে চা খাচ্ছিলেন, ওহঃ সুন্দর সাজানো ঘরটার কী দুর্দশা হয়েছে।

—তুমি ঠিকই বলেছিলে, পৃথিবীতে বোধহয় বেশীরভাগ মানুষ সৌন্দর্য থেকে প্রভাবিত হয়ে তাকে রক্ষা করার বদলে ধ্বংস

করাতেই বিচিত্র আনন্দ অনুভব করে। ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে যে মথুরা একবার বর্গীরা এসে লুটপাট করেছিল, যে-লোকেরা তোমার সুন্দর শিল্পের রচনাকে কুটিকুটি করে ছিঁড়েছে তারাও সেই বর্গীদের চেয়ে কম বর্বর নয়। উত্তেজিত হয়ে কন্যা বললে।

—আরে ভাই, আমি তো আগেই বলেছিলাম যে এসব নোংরা পাড়ায় থাকা ভদ্রলোকের কর্ম নয়। এটা ছোটলোকেদের বস্তি, এদের হৃদয়ে সৌন্দর্যের অনুভূতিকে রঙের তুলিকায় অমর করতে এসেছিলে, উচিত শিক্ষা হয়েছে তো? কর্নেলের কথায় শ্লেষ ছিল।

সজ্জন বিদ্রূপের চিমটিটা বরদাস্ত করতে পারলে না— যদি এখানকার লোকেরা ভেবে থাকে ভয় পেয়ে আমি পাড়া ছেড়ে চলে যাব তা হলে এটা তাদের মস্ত ভুল ধারণা। আমি এখানেই থাকব। আমি এই মূর্খদের বর্বরতার সঙ্গে সমানে যুঝে যাব। অসভ্য কোথাকার! এরা অজন্তা-ইলোরার দেশের বাসিন্দা? ইচ্ছে করে এদের মুখে অ্যাসিড ঢেলে দি।

—কি ছেলেমানুষী করছ? এত কঠোর হতে পারবে তুমি? কন্যা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে।

—আমার মতে প্রদর্শনী না হওয়াই ভালো, ক্যান্সেল করে দাও। পাড়ার লোকেরা সকলেই তোমার শত্রু। সেদিন যদি কোন গোলমাল বেধে যায় তা হলে বড়ই মুশকিল হবে। বড় বড় সম্মানিত অতিথিদের সামনে তোমার মাথা তোলা দায় হয়ে উঠবে। কর্নেল তার মতামত প্রকাশ করলে।

—না কর্নেলদা, প্রদর্শনী নিশ্চয় হবে। যা-কিছু হয়েছে মানুষের স্বভাবের দোষ নয়, এটা তার সীমাবদ্ধ জীবনের পরিচয়।

প্রদর্শনীর সাহায্যে যদি এখানকার লোকেদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার হয় তবেই না সজ্জনের এদের মধ্যে থাকতে আসা সফল…। সজ্জন রাগে ফেটে পড়ল— আমি এখানে থাকব। আমি এদের মাথায় পা দিয়ে হাঁটব। এই অসভ্য প্রতিক্রিয়াবাদী শক্তিকে ভয় পেয়ে পালাবার মত কাপুরুষ আমি নই।

ছাদে জেঠীকে পুঁটলী নিয়ে আসতে দেখা গেল। কন্যা হাত জোড় করে নমস্কার জানাল। জেঠী কোন উত্তর না দিয়ে চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকিয়ে সজ্জনের হাতে পুঁটলী দিয়ে বললেন —কন্নোমলের নাতি, এ তোমার ছবির টুকরো। আজ সেই তৈরী করে দেব, সব ঠিকমত জুড়ে নিয়ো।

ক্রোধের জোয়ার আবার মিলিয়ে গেল। জেঠীর স্নেহমমতায় ভরা হৃদয় যেন প্রলয়ের সময় নৌকোর কাজ করলে। সজ্জন পুঁটলী নিয়ে নিল। জেঠী আঙুল মটকে বললেন— যারা যারা তোর লোকশান করেছে, আটদিনের মাথায় সব নির্বংশ হবে। তুই আর এ ঘরে নিজের কোন জিনিস রাখিস না, আমার বাইরের ঘরে বসে কাজ করিস— বলতে বলতে কন্যা আর কর্নেলকে দেখে, তোমরা যাও, এখান থেকে যাও।

কন্যা তখুনি বেরিয়ে গেল। কর্নেল অপমানিত বোধ করলে। সজ্জন কর্নেলের হাত ধীরে টিপতেই, সংকেত পেয়ে সেও বেরিয়ে গেল। জেঠী সজ্জনের কানের কাছে এসে বললেন— দেখ ভাই কন্নোমলের নাতি, তুই এবার বিয়ে থা করে ঘর সংসার পেতে বোস, তোর বউকে একশো তোলা সোনা দেব। এখুনি যে দাঁড়িয়েছিল, এ রাঁড় আবার কোথা থেকে জুটেছে? বেহায়া কোথাকার। পুরুষদের সঙ্গে মাথার কাপড় খুলে ধিঙ্গির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সজ্জন গেলবারের মত ঠাট্টাচ্ছলে মিথ্যে না বলে সোজাসুজি খোলসা করে বললে— জেঠী, এ খুব ভালো মেয়ে, আপনি যদি আমায় ভাড়াটে রাখেন তা হলে এও এখানে আসবে।

জেঠী দুমিনিট সজ্জনের মুখের ভাব বোঝার চেষ্টা করে ধীরে ধীরে বললেন— কলিযুগ, ঘোর কলিযুগ আর কাকে বলে? এ এখানে আসবে, আসুক, বেটি থাকুক নিজের সোহাগের সোয়ামীর সঙ্গে, আমার দিকের দরজা আমি বন্ধ করে দেব। জেঠী সোজা তোপের মুখে বারুদের গোলার মত ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ত্রিশ

রাজাসাহেবের নাতির আশীর্বাদে খুব ধুমধাম, খাওয়াদাওয়া হল। দুই প্রদেশের গভর্নর, তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ, অনেক পুরোনো তালুকদার, কানপুর, কলিকাতার দু-চারজন কোটিপতি সকলেই সমারোহের শোভা বাড়াতে এলেন। খাওয়াদাওয়ার সময়ে মহিপাল বাক-সংযম না রাখতে পারায় দু-একটা অপ্রিয় কথা বলে ফেলল। খাওয়া শেষ হবার পর সজ্জন তাকে বাগানের দিকে নিয়ে গিয়ে বোঝালে— মহিপাল, তুমি খুব ক্লান্ত, তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন, কিছুদিনের জন্য বাইরে কোথাও ঘুরে এসো। কিছুদিন থেকে মহিপালের মনেও এই কথাই ঘুরপাক খাচ্ছে।

—হ্যাঁ ভাই, তুমি ঠিকই বলেছ। ক্লান্তিতে আমার স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে, আমি বেজায় খিটখিটে হয়ে গেছি। কদিন আগে আমার মামাতো ভাইয়ের চিঠি এসেছে, ভাবছি কিছুদিনের জন্য গ্রামে ঘুরে আসি। সংসারের চিন্তা থেকে জবরদস্তির ছুটি নেয়া যাবে। গ্রাম্য জীবনের অনুভূতিকে আবার অনুভব করার সুযোগ পাওয়া যাবে এ কল্পনা মাথায় আসতেই মহিপাল বিদায় নিয়ে চলে গেল। পরিচিত মুখের অভাবে যেন নিজেকে বড় একা মনে হল, সজ্জন চুপচাপ বাড়ি যাবার জন্য বাইরে বেরিয়ে এল। বাইরে বেরোতেই সামনে চিত্রা রাজদানের সঙ্গে দেখা। মরুভূমির মত তার অবিবাহিত জীবনে চিত্রা মাঝে মাঝে তার আকণ্ঠ পিপাসা মিটিয়েছে। বাড়ি ফেরার জন্য সে কোন গাড়ির খোঁজে চারিদিক তাকাচ্ছে। চিত্রা চিরজীবন অবিবাহিতই থেকে গেল, একজনের পত্নী না হয়ে সে অনেকের ভোগের সামগ্রী। বয়সের সঙ্গে ঝরে যাওয়া ফুলের রূপ সৌন্দর্য এখনো বেশ বজায় আছে। কন্যার সঙ্গে চারদিনের সংযমে ভরা সহবাসের পর তার আভিজাত্য, শিল্পীর জেদী প্রবৃত্তি আর ভোগেচ্ছা যেন আবার জেগে উঠেছে, এমন সময়ে তার চিত্রার সঙ্গে দেখা।

সেদিন রাত্তিরে মদের নেশায় সে কন্যাকে উচিত শিক্ষা আর দারুণ আঘাত দেবার জন্য চিত্রাকে বিয়ে করার কথা ভেবেছিল। কন্যাকে নির্মম দণ্ড দেওয়া হবে আর তার নাকের ডগায় সে চিত্রাকে বধূরূপে গ্রহণ করে আদর্শ স্বামী আর পতিতোদ্ধারের আদর্শ উপস্থিত করবে। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে।

দ্বিতীয় দিন ভোরবেলায় রাজাসাহেবের বড় ছেলে নিজে এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেল। রাজা সাহেব, লালা জানকীসরণ,

শালিগরাম তাঁর পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বসে আছেন। রাজা-সাহেবের প্রভাবে আর উপস্থিত দুই ব্যক্তির অনুনয় বিনয়ের সামনে ভদ্রতার খাতিরে সজ্জন তাদের কথা দিলে যে কন্যার বাবার কেসে সে সাহায্য করবে না। কথা দেওয়ার পর নিজেই লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, গত দুদিনের মধ্যে কর্নেল আর কন্যার সঙ্গে দেখা করার সাহস জোগাড় করতে পারে নি। চিত্রা তার বাড়িতেই রয়েছে। ওদিকে কর্নেল আর কন্যা মিলে কেসের ব্যাপার অনেক দূর নিয়ে গেছে, খবরের কাগজে পড়ে সজ্জনের মাথা গরম হয়ে গেল। তিনদিন বাউণ্ডুলের মত হন্যে হয়ে ঘোরাফেরা করার পর চতুর্থ দিন দেওয়ানজীকে কিছু ফার্নিচার, ডেকোরেশনের আর দরকারী জিনিস জেঠীর বাইরের ঘরে পৌঁছে দেবার হুকুম দিলে। দুপুরবেলা নিজেই জেঠীর সঙ্গে দেখা করতে গেল। ললিতা, বিশাখা, কিশনা তিনজনে এক সুতলীতে বাঁধা অথচ ছোটাছুটি করছে। জেঠী সজ্জনকে তাদের ধরে আনতে বললেন। সজ্জন তাদের তিনজনকে থামের সঙ্গে বেঁধে দিলে।

—জেঠী, আমার জিনিস এসে গেছে?

—হ্যাঁ রে, আমি সব জিনিস ঠিকমত রাখিয়ে দিয়েছি। তোর বসবার ঘর আমি শ্বশুরের বৈঠকখানায় করে দিয়েছি। আরে শোন কন্নোমলের নাতি—বিদ্দিন কিশোরীর ছেলের খাওয়ান-দাওয়ানে গিয়েছিলে না কি?

—হ্যাঁ জেঠী।

—কেমন খাওয়ালে? শুনলাম অনেক লোক খেয়েছে?

—না না জেঠী, এই ছ'সাতশো লোক হবে। সজ্জন ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বললে।

—করকমের মিষ্টি তৈরী করিয়েছিল রে ?

—গুণতিতে বেশী ছিল কিন্তু খেতে তেমন সোয়াদ··· কিছুক্ষণ চুপ থেকে জেঠী বললেন— কম্নোমলের নাতি, তুই বিয়ে থা কর। এমন ভিয়েন বসাব যে সতীন রাঁড়ের চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে। তা হলে কথা পাকা করি ? মেয়ে তোকে আগে দেখিয়ে দেব, বড় সুশীল মেয়ে।

সজ্জন বিয়ে সমস্যাকে ফিলহাল মুলতুবী রাখার জন্যে বললে— জেঠী, আমার ঠিকুজিতে লেখা আছে আগামী দুবছরের মধ্যে বিয়ে করলে আমার স্ত্রীর নির্ঘাত বৈধব্য যোগ।

জেঠী হতভম্ব হয়ে—কি বললি ? ঠিকুজি আমি নিজে ভালো করে মিলিয়ে দেখব, যার ভাগ্যে স্বামীর সোহাগ পুরো লেখা— গলা নামিয়ে ধীরে রহস্যজনক ভাবে বললেন— আমার মনের অনেকদিনের সাধ নিজে দাঁড়িয়ে কারুর চারহাত এক করি। সতীন রাঁড় ভাবছে যে ওরই ছেলে আর নাতি আছে। খুব দেমাক হয়েছে। আরে আমি আগে এই ছেলের···

কড়া নাড়ার শব্দে জেঠী দরজা খুলতে চলে গেলেন। সজ্জন দেউড়ির বাইরে গলির দিকে চলে এল। লালা জানকীসরণ বারান্দায় বসে ফলওয়ালার সঙ্গে দর-কষাকষি করছিলেন। তাকে দেখতে পেয়ে বললেন— জেঠীর কোলজোড়া হয়ে বসলে নাকি ?

সজ্জনের ঠাট্টার উত্তর দেবার মুড ছিল না। লালা জানকীসরণকে দেখে সে সংকুচিত হয়ে গেছে। লালাজী বললেন— এসো এসো, বসো দু মিনিট, আরে এসো ভাই।

ভদ্রতার খাতিরে তাকে লালাজীর রোয়াকে উঠতে হল।

—তোমরা ছেলেছোকরার দল আমাদের ভুলেই গেছ, বয়সে যারা তোমাদের শ্রদ্ধেয় তাদের মনে কষ্ট দিতে নেই। আজ সকালের খবরের কাগজ দেখে রাজাসায়েব বিশেষ দুঃখিত। দুপুরে ওঁর টেলিফোন এসেছিল।

—এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না লালাজী, আমি সাতে পাঁচে কিছুতেই নেই।

—কিন্তু কর্নেল…

—কর্নেল এ বিষয়ে আমার মতামত না নিয়েই…

—হাঃ হাঃ হাঃ তা হলে এই ব্যাপার। বাবুমশাই, আমার পঁয়ষট্টি বছর বয়স, তোমার বাবা আমার চেয়ে ছোটই ছিলেন। আমি তোমাকে আর কি বলি? ভগবানের দয়ায় তোমার খ্যাতি আছে, বুদ্ধিমান ছেলে তুমি, বলার মানেটা এই যে জীবনে যা শখটখ করার ইচ্ছে করে নাও কিন্তু বাবা নিজেকে একটু বাঁচিয়ে, ন্যাড়া নেড়ীর কাণ্ড যেন না হয় এই আর কি! যে মেয়ে নিজের বাপের মর্যাদা হাটে বেঁচে দিলে তার কোন ভরসা আছে?

লালার কথা সজ্জনের গায়ে বাজল, কিন্তু সে যেন নিজেকে অপরাধী মনে করল। কন্যার বিরুদ্ধে মন্তব্য শোনার পরও সজ্জনের মন যেন তার প্রতি বিরূপ হতে নারাজ। লালা জানকীসরণ তাকে তাঁর নিজে বড় দুখানা ঘর দেখালেন, ঘরে আলো কম। সজ্জন ইলেকট্রিকওয়ালাকে খবর দেবার জন্য লালাজীকে বললে। পরের দিন সকাল আটটায় আসার কথা দিয়ে সে সোজা জেঠীর বসতবাড়ির দিকে রওনা হল। ঘরে ঢুকতেই কন্যাকে দেখে সজ্জনের চেহারা কঠিন হয়ে এল। সে চুপচাপ দেওয়ালের দিকে মুখ করে আরামচেয়ারে শুয়ে পড়ল।

—রাগ করেছ নাকি? কন্যা জিজ্ঞেস করলে।

— ...

—রাগ করার মত কোন কথাই হয়নি···

—আমার ধড়ে ছুটো মাথা গজায় নি যে আমি আপনার ওপর রাগ করব।

আমি স্বপ্নেও আশা করিনি যে তুমি অন্যায়ের সমর্থন করবে।

—আমি ন্যায়ের সমর্থন করি তাই লোকে আমায় বদনাম দেয়। সজ্জন বিরক্ত হয়ে বললে।

—তা হলে?

—এ ক্ষেত্রে, আমি তোমার অন্যায় দেখছি।

—কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর সজ্জন খুঁজে পেল না। কন্যা বললে— আমি আমার বাবার বিরুদ্ধে অন্যায় করছি? তুমি এটা উচিত মনে করো যে নারী সর্বদাই পায়ের নীচে দলিত হবে?

সজ্জন আত্মসংযম হারিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল— আজ্ঞে না, নারীকে দলিত করার ক্ষমতা কোন পুরুষের আছে? পুরুষেরাই পিষে যাবে···

—তুমি ভালোভাবে বুঝেসুঝে কথা বলো, রাগ করে উত্তেজিত হবার কোন কারণই নেই। আমি তোমাকে কোনরকম ধোঁকা দিয়েছি নাকি? যেদিন আমি প্রথমবার তোমার কাছে এসেছিলাম সেইদিনই সব কথা খোলাখুলিভাবে হয়ে যায় নি?

—এ বিষয়ে আমার কোন নালিশ নেই। আমি এইটুকুই নালিশ জানাচ্ছি যে আমি যখন তোমায় চারদিন থামতে বলেছিলাম, তুমি কেন থামতে পারলে না?

—সজ্জন, আমি জানি তোমার কাছে বড় বড় রাঘব বোয়ালদের সুপারিশ পৌঁচেছে, আমার বাবাকে বাঁচাবার জন্যে নয় কিন্তু শালিগরামের মানরক্ষা করার জন্যে! আমি কেন রাজী হব? শালিগরামের তৈরী ত্তাসের ঘর ভাঙবে কি কংগ্রেসের বদনাম হবে, এ-সবে আমার কী আসে যায় বলতে পারো?

—মিস বনকন্যা, আমি আপনার রাজনৈতিক চাল বেশ ধরতে পেরেছি, এতদিন…

—সজ্জন, কি সত্যি সেটা তুমি ভালোভাবেই জানো। যাকগে আমি এ নিয়ে বেশী তর্ক করতে চাই না।

আমিও বাজে তর্ক করে সময় নষ্ট করতে চাই না— বলে সজ্জন মুখ আবার দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে বসল। কন্যা উঠে এসে সজ্জনের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করলে— আর কথা বলবে না?

—না।

—কতক্ষণ?

—চিরদিনের জন্যে।

—তুমি না-হয় নাই বললে, আমি কিন্তু বলব। বনকন্যার স্পর্শসুখ সজ্জনকে উত্তেজিত করে তুলছে। উত্তেজনার বশে তার মেজাজ আরো খিটখিটে হয়ে গেল। বনকন্যার স্পর্শ শীতল আর পবিত্র। সজ্জনের মনের অপবিত্রতা যেন তাকে ভেংচি কাটছে। পবিত্র অপবিত্রের যুদ্ধের মাঝে সে যেন নিজের হৃদয়ের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছে। নিজের আসল প্রতিচ্ছবিকে দেখে সে যেন কন্যার পবিত্রতাকে অপবিত্রতার মুখোস পরাবার জন্য ব্যস্ত

হয়ে উঠে দাঁড়ালে— এ তোমার মনের কথা নয়, আমার পয়সা, আমার মান, সম্ভ্রম…

—দ্বিতীয় বার তোমার মুখে শুনছি।

—তুমি সদাই বেহায়ার মত শুনতে থাকবে।

রাগে বনকন্যার মুখ লাল হয়ে উঠল কিন্তু যথাসাধ্য নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললে— যেদিন আমার পুরোপুরি বিশ্বাস হবে যে তুমি সত্যিই আমাকে এত ছোট ভাবো সেদিন এ মুখ তোমাকে দেখাতে আর কোনদিন আসব না। বলে বনকন্যা একদিকে সরে দাঁড়ালো।

—ও কল্লোমলের নাতি!

—হ্যাঁ জেঠী, কি বলছ?

—শোন, এই তোর ইনি যে দাঁড়িয়ে আছেন, একে একটু বলে দে যে তারার ননদ হয়ে একটু ষষ্ঠী পুজো করে দেবে। হাড় হাবাতের দল সব— বেজাতের ব্যাপার – ওর জন্যে পিসী কোথায় পাই!

সজ্জন তাড়াতাড়ি স্বাধিকারে কন্যার দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জেঠী।

কন্যা তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে— হ্যাঁ আমি নিশ্চয় পিসী হয়ে পুজো করব জেঠী, কিন্তু আমি বেজাত নয় জেঠী, কন্যা পরিহাসের সুরে বললে।

গলির এক কুকুর ভেতরে ঢুকে এল। ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জেঠীর নজর সেদিকে পড়তেই হ্যাট হ্যাট করতে করতে পেছনে পেছনে ছুটলেন। কুকুর ঘাবড়ে ফটকের দিকে যাবার বদলে দালানের দিকে ছুটল। জেঠী ডুকরে উঠলেন— আরে তোর

সর্বনাশ হোক— ধর ধর আমার ঘরে ঢুকে গেল এখুনি— আমার ললিতা— আমার বিশাখা—

সজ্জন ইতিমধ্যে দালানে ছুটে গিয়ে কুকুর তাড়াচ্ছে। কুকুর সোজা দালান পার হয়ে ফটকের দিকে ছুট দিয়েছে। সজ্জন ফটক বন্ধ করতে গেল। ভারী নকশীদার ফটক বন্ধ করতে করতে বাবা রামজীকে গলি দিয়ে যেতে দেখতে পেলে।

—কি খবর তোমার রাম ভগতওয়া? বাবাজী দন্তবিহীন মুখে হাসলেন। তাঁর চোখে স্নেহ ঝলমলিয়ে উঠল। বাবাজীকে দেখে সজ্জন ঘাবড়ে গেছে, সে যেন চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে। বাবাজী ফটকের মধ্যে ঢুকলেন, পেছনে পেছনে তাঁর মোটা লাঠি আর কমণ্ডলু নিয়ে এক ন্যাড়া, কৌপীনধারী চেলা। সজ্জন ফটক বন্ধ করে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে এল। দালানে জেঠী দাঁড়িয়ে, সামনে সাধু দেখে তখুনি তাঁর পায়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন।

—সুখী থাকো, সুমতি হোক, শান্তি হোক।

—মহারাজ, কোথা থেকে আসা হয়েছে?

—রামজীর বাড়ি থেকে এসেছি, রামভক্তনিয়াঁ, তুইও সেই এক ঠিকানা থেকেই এসেছিস।

—আরে, এ কথা সকলেই জানে মহারাজ, আমি জিজ্ঞেস করছিলুম যে— আপনি পাগলদের চিকিৎসা আর সেবা করেন না?

—হ্যাঁ, আমি পাগলদের চিকিৎসা করি। যেখানে কেউ পাগল হয় সেখানেই আমি তার সেবার জন্যে উপস্থিত থাকি। ঠিক বলছি কিনা রামজী?

সজ্জনের অপরাধী মনে যেন রামজী এক খোঁচা মারলেন। সে মাথা নীচু করে চুপ করে রইল।

—আচ্ছা, আচ্ছা, আপনিই তিনি, আপনার কথা গোকুল-দ্বারেতে শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। কন্নোমলের নাতি আপনাকে আগে থাকতেই চিনত বুঝি?

—আরে ইনি রামজী, ইনি কাকে না চেনেন, কী না জানেন? এঁর থেকে বেশী সত্যকে চেনার জ্ঞান আর কার আছে। সজ্জন মাথা হেঁট করে বসে রইল। বাবাজী কন্যার দিকে নজর পড়তেই জেঠীকে প্রশ্ন করলেন— তোমার মেয়ে বুঝি?

—আমার কেন হতে যাবে, মরণ?

—আরে তোমারি মেয়ে রামভক্তনিয়াঁ, তুমি এর জন্যেই তো একশো তোলা সোনা নিয়ে বসে আছ অথচ একে গালাগাল দিয়ে চলেছ।

—আমি আজ পর্যন্ত কারুর এক কানাকড়ি নিইনি। হ্যাঁ, একশো তোলা সোনা আমি একে (সজ্জনের দিকে চেয়ে) এর বউকে দেব যদি আমার পছন্দমত বিয়ে করে তবে।

—আরে, কুমারীকেই দিয়ে দে রামভক্তনিয়াঁ।

—না বাবাজী!

—পরোপকার হবে গো। যদি চোরে নিয়ে যায় তখন কি করবি?

—আমার বাড়ির চুরির খবর তুমি পেয়েছ বাবাজী?

—তোমার বাড়িতে সত্যিই চুরি হয়ে গেছে রামভক্তনিয়াঁ? আমি তো উদাহরণ দেবার ছলে বলেছিলাম— ব'লে বাবাজী খানিকক্ষণ হো হো করে হেসে নিয়ে বললেন— আচ্ছা তা হলে চুরির পর থেকে কারুকে একশো তোলা দিয়ে দেয়ার কথা মনে আসছে রামভক্তনিয়াঁ?

—হ্যাঁ বাবাজী, আসল কথাই তাই, বলে জেঠী তাঁর অলুক্ষণে চেহারা, ভাঁটার মত চোখ, কালো মুলো মুলো দাঁত বার করে বললেন— আমার আর কে খাবে? মরে ভূত হয়ে আগলাবার ইচ্ছে নেই। ভূত হবে সতীন রাঁড়। (বাঁ হাতের তেলোয় ডান হাতের তেলো ফটাস করে মেরে) আমি সোজা ড্যাং ড্যাং করে পুষ্পক বিমানে বসে স্বর্গে যাব, দেখে নিয়ো।

—হ্যাঁ হ্যাঁ রামভক্তিন তুই নিশ্চয় দুন্দুভি বাজাতে বাজাতে যাবি। তোর জন্যে কৃষ্ণ ভগবান স্বর্গ থেকে স্পেশাল বিমান পাঠাবেন। কৃষ্ণ ভগবান তোর ওপর অতি প্রসন্ন। আমি সেই দিনটা স্পষ্ট দেখছি যেদিন তুই বৈকুণ্ঠে যাবি আর আমি তোর লাঠি নিয়ে পালাব— বাবাজী খিল খিল করে হেসে উঠলেন।

সজ্জনের দিকে বাবাজী ঘুরে তাকালেন। সে নিস্তেজ হয়ে বসে ছিল। বাবাজী বললেন— আজ বিজয়ের দিনে মৌন ব্রত ধারণ করেছ কেন?

—বাবাজী, শোনো, জেঠী বাবাজীকে ইশারায় এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন— মন্তরে কাজ হয় বাবাজী?

—হ্যাঁ, রামভক্তনিয়াঁ, ডাকিনী-যোগিনী যাকে বলো তাকেই···

—বাবাজী, তাহলে আমার সতীনের নাতিনের সর্বনাশ করো, ঠিক আশীর্বাদের লগ্নে যেন কাটা কলাগাছের মত শুয়ে পড়ে।

—তাতে তোমার কী লাভ হবে রামভক্তনিয়াঁ?

—আমার বুকের আগুন ঠাণ্ডা হবে, সতীনের বংশে সন্ধ্যা পিদিম দিতে কেউ থাকবে না। আমার মেয়ে যদি বেঁচে থাকত তা হলে তার বংশ হত। (গলা নামিয়ে) ভগবানের আশীর্বাদে আমার কিছুর অভাব নেই, যদি তুমি আমার মনোবাঞ্ছা

পূর্ণ করে দিতে পারো তাহলে ভগবানের দিব্যি তোমাকেই সব-কিছু দিয়ে যাব। বাস্ একশো তোলা সোনা কন্নোমলের নাতির বউকে…

—আমি তোকে একটা কথা বলি রামভক্তনিয়াঁ, তুই বেশ বড় একটা উৎসব করে দে। এই যে রামজী আর এই তোর সীতা দাঁড়িয়ে…

—এসব বাজে খোশামুদী করার লোক আমি নই মহারাজ। তোমায় সত্যি কথা বলছি, এদের দুজনের যুগল মূর্তি আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। না জাত না ধর্ম। এদের মত একজন আমার ভাড়াটে হয়ে এসেছে। রাঁড় জাতের বাইরে বিলিতী মতে বিয়ে করে ছেলে বিয়োতে এল আমারই বাড়িতে? দুপাতা পটর পটর ইংরেজী বলতেই শিখেছে, সংসার ধর্মর জ্ঞান একেবারেই শূন্যি, আমাকেই ভুগতে হচ্ছে। আমি না থাকলে বাচ্চার ষষ্ঠী পুজোই হত না।

কন্যা আর সজ্জন ঘরে দাঁড়িয়ে, বাবাজীর চেলা হাঁটু মুড়ে উবু হয়ে বসে। জেঠী বলতে লাগলেন—আমি কারুকে ভয় করি না। কন্নোমলের নাতি আমার অসময়ে এসেছিল, তার উপকার আমি কখনো ভুলব না। এর বাবা মা ঠাকুমা সকলকে আমি দেখেছি। শ্বশুর বেঁচে ছিলেন যখন, তখন এদের বাড়ির সঙ্গে আমাদের একেবারে ঘরোয়া ব্যাপার ছিল। তাইতো একে কত করে বলছি এসব ফন্দি ফিকির ছেড়ে আমার পছন্দমত বিয়ে থা কর, সব খরচপত্তর আমি করব, তোকে কিছু ভাবতে হবে না। আমার মনের সাধ, আমার নাতি হত, তার পৈতে দিতুম, দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে থা দিতুম, আমার বাড়িতেও আশীর্বাদের তত্ত্ব

আসত··· বলতে বলতে বোধ হয় একযুগ পরে আজ জেঠীর চোখ ছলছলিয়ে উঠল।

বাবা রামজী বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, বৃদ্ধর চোখে স্নেহের জ্যোতি— রামভক্তিন, তুই সীতারামজীর বিয়ের ব্যবস্থা নিজের হাতে করে ফেল। আমার রামজী আর তোর সীতাজী। খুব ধূমধাম হবে, বাজনা বাজিয়ে বরযাত্রী আসবে। মনের সব সাধ মিটিয়ে নে রামভক্তিন, সীতাজীর চেয়ে ভালো মেয়ে কোথায় পাবি?

জেঠী গম্ভীর হয়ে শুনছিলেন, তাঁর মুখের ভাবে মনে হল যেন তিনি বেশ প্রভাবিত, কিন্তু সহসা চমকে উঠে বললেন— যদি তুমি এই মেয়েকে সীতা সাজিয়ে আমার গলায় ঝোলাতে চাও তা হলে···

—আরে না না রামভক্তিন, সুন্দর মূর্তি এনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তবে আমি আমার ছেলে নিয়ে যাব। তুমি দস্তুরমত তোমার মেয়ের জন্যে আমার কাছে কথা পাকা করতে এসো।

—আমি সীতারামের বিয়ে দেব না।

—কেন ভাই রামভক্তিন?

—না মহারাজ, ধর্ম অধর্মের কথা, আমি রাধাকৃষ্ণের বিয়ে দেব।

—আরে, রাধা যে চিরকুমারী সধবা, রামভক্তনিয়াঁ!

—তা হলে আমি এবারে তাকে বিয়ে দিয়ে পুরোপুরি সধবা করে ছাড়ব, যাক ভালোই হল তুমি এসে গেলে।

—কিন্তু এ মনে কোরো না যে আমি ফালতুই এসে গেছি। আমার রামজীর বিয়েতে চাহিদার ফিরিস্তি বেশ লম্বা, তোমাকে

একটা মেয়েদের স্কুল খুলিয়ে দিতে হবে আর পাগল আশ্রমের জন্যে একখানা ঘর তৈরী করিয়ে দিতে হবে।

—আচ্ছা সব দিতে রাজী আছি, বলে জেঠী বাবাজীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন— চলি এবার, আমার আবার গোকুল-দ্বারে যাবার সময় হয়ে গেল— তারপর কন্যার দিকে চেয়ে— তুই শুনে রাখ, ছেলের ষষ্ঠী পুজোর দিন এসে যাস, পিসীর পাওনা তোকে দেব। তুমিও এসো সেদিন মহারাজ, ব্রাহ্মণ-ভোজন করাব। আজ না-জানি কত বছর পরে আমার শ্বশুরের ভিটেয় বাচ্চার কান্না শোনা গেছে, যারই হোক-না কেন।

বাৎসল্য প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে জেঠী তর তর করে দালান পেরিয়ে নিজের বাড়ি চলে গেলেন। জেঠী চলে যেতেই রামজী সকলের দিকে ভালো করে তাকালেন। তাঁর রুগী পাগল একহাতে মোটা লাঠি আর অন্য হাতে কমণ্ডলু নিয়ে উবু হয়ে বসে থু থু ফেলছে। বাবাজী রোগীর কাছে যেতে যেতে বললেন —কী ব্যাপার রামভগত? পাগল অর্থহীন হাসি হেসে মাথা নেড়ে বললে— কী বাবাজী?

কন্যার দিকে চেয়ে বাবাজী বললেন— একটু জল দিয়ো তো মা— কন্যা ঘরে চারিদিকে সন্ধানী চোখ ফেললে। সজ্জন একটু নড়েচড়ে আবার স্থাণু হয়ে গেল। ঘরের এক কোণে লোহার ফ্রেমে বসানো ঘড়া দেখতে পেয়ে কন্যা তাড়াতাড়ি জল দিতে এগুলো।

—রামজী, আমি ভেবেছিলুম যে আপনি রামজী—হেঁ হেঁ হেঁ কিন্তু আপনি সজ্জন...

বাবাজীর উক্তি শুনে সজ্জন যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল।

একত্রিশ

রাত প্রায় আটটা নাগাদ দোকান থেকে বাড়ি যাবার আগে কর্নেল কন্যার সঙ্গে দেখা করতে গেল। ঘরের দরজা বন্ধ, দরজার ফাঁক দিয়ে টিমটিমে আলো দেখা যাচ্ছে। কর্নেল দরজায় টোকা দিলে।

ভেতরে চেয়ার সরানোর আওয়াজের সঙ্গেই খুট করে দরজার খিল খুলল। কন্যার ধোঁয়াটে মানসিক পরিস্থিতি যেন তার মুখে আভা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। দরজা খুলে দিয়ে কন্যা আবার চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কর্নেল সামনের চেয়ারে মাথা নীচু করে বসে পড়ল।

—বসো বিন্নো।

কন্যা চেয়ারে বসল।

—সজ্জনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—জেঠীর বাড়িতে ওর জিনিসপত্তর ··

—এসে গেছে।

কর্নেল কথার প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে জিজ্ঞেস করলে— খুব রাগ হয়েছে বুঝি? কন্যা কোনমতে চোখের জল সামলে চুপ করে রইল।

কর্নেল বন্ধুর হয়ে সুপারিশ আরম্ভ করলে— রাজাসায়েব ওকে বলেছিলেন বলে ওর কথাটা ভালো লাগে নি— কিন্তু সব ক্ষেত্রে ভদ্রতা বজায় রেখে চলা সম্ভব হয় না, তুমি কিছু চিন্তা কোরো না বিন্নো, দুদিন পরে মাথা ঠাণ্ডা হলে নিজেই এসে বলবে কর্নেল তুমি ভালোই করেছ। আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি কিনা। কর্নেল ফাঁকা হাসি হেসে কন্যার মনোদুঃখ লাঘব করার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

কিছুক্ষণ দুজনে একেবারে চুপ। কর্নেল এক নজর ঘরে বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলে— আজ তুমি রান্নাবান্না চাপাও নি? কন্যা চুপ করে রইল।

—তোমার শরীর যদি ভালো না থাকে, তা হলে আমি এখুনি তোমার খাবার পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি।

—না না কর্নেলদা।

—চিন্তা কোরো না বিন্নো, আমি তোমাকে বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে, একটু মান-অভিমান, কথা-কাটাকাটির পালা তো চলতেই থাকবে। হ্যাঁ একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

—বলুন।

—তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোন ফৈসলা হয়ে গেছে?

* * *

—দেখো বিন্নো, পৃথিবী বড়ই কঠিন জায়গা, আমি তোমাকে আজ স্পষ্ট বলতে চাই মেয়েদের ব্যাপার বড়ই ডেলিকেট। তুমি যতই স্বাধীন হও-না কেন, তবু তুমি সজ্জনকে বিয়ে করতে চাও? আমায় আজ মনের কথা খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দাও।

কন্যা মাথা নীচু করে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটছে।

কর্নেল— তোমাদের মধ্যে এ বিষয় কোন কথা হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—বিয়ের কথা হয়েছে?

—হুঁ।

—কবে? এই হালেই?

কন্যা ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলে।

—তোমাকে সে কী বললে? আমার কাছে কিছু গোপন করার চেষ্টা কোরো না। কবে বিয়ে করবে কিছু বলেছে?

—মথুরাতে ঠিক হয়েছিল যে এখানে এসেই আয়োজন করা হবে।

—তাহলে আয়োজন শুরু করে দেব? বিন্নো, আমি এ বিষয়ে আর বেশী দেরী করা ঠিক মনে করছি না। একবার সজ্জনকে সাত পাকের শেকলে বেঁধে ফেলতে পারলে, আপনা হতেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—আমি কারুর ঘাড়ে বোঝা হয়ে চাপতে চাই না।

—এতে বোঝার কথাই উঠছে না। সজ্জন একেবারে সাধু না হলেও মানুষ হিসেবে খারাপ নয়।

কর্নেল চলে যাবার পর কন্যা দরজা বন্ধ করে নির্জীবের মত বিছানায় শুয়ে পড়ল। সে যেন আজ পরাজিত, সব-কিছুতে সে বাজী হেরে গেছে, এ এক বিচিত্র অনুভূতি। পরের দিন সকালে কর্নেল সজ্জনের বাড়ি গেল। ঘরে চিত্রাকে দেখেই তার টনক নড়ল তবু মুখে কিছু না বলে সে বৈঠকখানায় গিয়ে বসল। সজ্জন আর কর্নেল মুখোমুখি চুপ করে বসে, সামনে গরম চায়ের পেয়ালায় ধোঁয়া উঠছে।

—শোনো ভাই, আহাম্মকী করার একটা বয়স থাকে, আমি তোমার এই আর্টিস্টপনা আর বরদাস্ত করতে পারছি না।

সজ্জন বকুনি খেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল— আমি আর ছেলে-মানুষটি নেই যে…

—তুমি ছেলেমানুষেরও অধম, তুমি একটা আস্ত জানোয়ার, বুঝলে? শালা আর্টিস্ট হয়েছেন, বুদ্ধিজীবী হবার ভান করেন।

—কর্নেল, আমি এসময় খুব সিরিয়াস মুডে আছি।

—আমিও সেই মুডেই আছি। তুমি একদিকে আদর্শবাদী সেজে খবরের কাগজে মহান হয়ে উঠেছ আর অন্যদিকে নিজেকে সংযত করার স্পৃহা তোমার মধ্যে একটুও নেই।

সজ্জন ভ্রূ কুঁচকে চুপ করে রইল। সুকরু একটা প্লেটে সোন হালুয়া নিয়ে টেবিলে রাখতে এল দেখে কর্নেল চেঁচিয়ে উঠল— উঠিয়ে নিয়ে যাও, কিছু চাই না। সুকরু তাড়াতাড়ি প্লেট উঠিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

—একটি লেখাপড়াজানা ভালো মেয়ের সঙ্গে প্রেমের নাটকের অভিনয়, তাকে বধূরূপে গ্রহণ করার কথা দিয়েছ। নারীমুক্তি আন্দোলনের বিষয়ে আমাকে লম্বা লম্বা উপদেশ শোনাতে আসো আর নিজে এক বারবণিতাকে… বাড়িতে রেখেছ?

এক মুহূর্তের জন্য দুজনের চোখাচোখি হল। কর্নেল বললে— এখুনি যদি বিন্নো এসে চিত্রাকে এখানে দেখত তাহলে কী হত বলো তো? বেচারীর মন ভেঙে যেত।

—আমি লোকের চোখের আড়ালে কোন কাজ করতে চাই না।

—খুব সাধু ব্যক্তি তুমি না? পবিত্র-অপবিত্রের, ভালো-মন্দের মধ্যে তফাতটা জানা আছে? তা জানবে কেমন করে? সকলের

চোখে ধুলো দিয়ে বাইরে মহত্ত্বের নাটক করতে আর ঘরের ভেতরে···

—কর্নেল, আমি চিত্রাকে বিয়ে করব। কর্নেলের মাথায় যেন সহসা বজ্রাঘাত হল। এক সেকেণ্ড সজ্জনের মুখের ভাব লক্ষ্য করে বলল— তুমি বিন্নোকে কথা দিয়েছ!

—আমি আমার মতামত পালটে ফেলেছি।

—কেন ?

—এ প্রশ্নের কোন মানেই হয় না।

—মানে নেই কেন? তুমি একটি মেয়েকে কথা দিয়ে···

—শুধু কথাই দিয়েছিলুম, ওর সঙ্গে কোন অভদ্র ব্যবহার করি নি।

—অভদ্র-ব্য-বহার— যেন তুমি আত্মসংযমের জ্যান্ত পুতুল, না? হারামজাদী রাস্তার বেশ্যা মাগী, সমাজের ব্যভিচার যার সর্বাঙ্গে সে তোমার কাম্য হতে পারে! লেখাপড়াজানা ভদ্র মেয়ে তোমার কথায় উঠতে বসতে যাবে কেন? ভালো করে শুনে নাও সজ্জন, বিন্নোর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ার সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যাবে। তুমি তোমার কথার খেলাপ করতে পারো কিন্তু আমি একজন ভদ্রলোক, যাকে একবার বোন বলেছি তাকে কোনদিন আঘাত দিতে পারব না। এরপর আমি কোনদিন তোমার মুখ দর্শন করব না— বলে কর্নেল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল— সুকরু··· একটু বেল টিপে ডাকো তো! ঘন্টির আওয়াজের সঙ্গেই সুকরু ছুটে এল।

—সুকরু, টেলিফোন এদিকে নিয়ে আয়, সোন হালুয়ার প্লেট

এখানে রাখ আর চারটে টোস্ট বেশ করে সেঁকে আন। হুকুম দিয়ে কর্নেল বসে পড়ল।

—আমি আজকে এই মাগীকে বের করে তবে যাব।

—এটা আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—সজ্জন, এটা আমারও ব্যক্তিগত ব্যাপার।

—তুমি আমায় ভাবতে কিছু সময় দাও।

—আমার কাছে আর টাইম নেই।

—সেদিন তুমি রাজাসায়েব, জানকীসরণ আর শালিগরামের সামনে ··

—বিন্নোকে জবরদস্তি রাজী করাবার ভার আমি নিই নি। সে সময় রাজাসায়েবের মান বজায় রাখার প্রশ্ন ছিল।

—রাজাসায়েবের কথা রাখার প্রশ্ন এখন আর নেই নাকি? কন্যার চেয়ে রাজাসায়েবের পোজিশন আমার কাছে অনেক বড় ·· ঢের উঁচু। নাও কথা বলতে বলতে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আবার গরম চা তৈরী করতে বলছি। সজ্জন টেবিলের তলায় লাগানো কল বেলের সুইচ আবার টিপলে।

—রাজাসায়েব কি জানেন সে মেয়ে কেমন? তবে কেন তিনি অন্যায় পক্ষকে সমর্থন করছেন? শালিগরাম রাজাসায়েবের আড়ালে আমার সঙ্গে চালবাজি খেলবে, এ আমি বরদাস্ত করতে পারব না। বিন্নোর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে আর তাড়াতাড়ি হবে, বুঝেছ?

চাকর এসে কেতলী নিয়ে গেল। আর এক চাকর রেকাবিতে সোন হালুয়া রেখে গেল।

—বিয়ে সারাজীবনের···

—তা হলে বেশ ভেবেচিন্তে আগে পা বাড়ানো উচিত ছিল। আমিও ঢের ঢের লোক দেখেছি। এই দশ বছরের মধ্যে তোমার সঙ্গে যে কটা রঙিন প্রজাপতিদের দেখার সুযোগ হয়েছে তাদের মধ্যে একজনকেও 'বোন' বলে সম্বোধন করার প্রবৃত্তি আমার হয় নি। এই মেয়েটিকে প্রথমবার দেখেই আমি খাঁটি সোনা চিনতে পেরেছিলুম।

টোস্ট আর চায়ের কেতলী এল। সজ্জন একটা টোস্ট উঠিয়ে সুকরুকে চা তৈরী করতে বললে। সে কর্নেলের বাক্যবাণের প্রহার থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য আড়াল খুঁজছিল, সে যেন আজ তার সামনে অপরাধী। মথুরায় চারদিন কন্যার সান্নিধ্য জাগিয়ে গেছে তার মনের সুপ্ত বাসনাকে, তাই চিত্রাকে পেয়ে সে যেন কন্যার প্রতি প্রতিশোধ নিতে চায়। কন্যা তার ইচ্ছার বশে নয়, এই তো তার একমাত্র অভিযোগ।

চায়ের পেয়ালা দুজনের সামনে রেখে সুকরু হাত জোর করে একদিকে দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেল তাকে ঘর থেকে যাবার আদেশ দিলে।

—তুমি ওর মধ্যে এমন কী দোষ দেখলে যে হঠাৎ মত পালটে ফেললে?

—বড় জেদী।

—আর তুমি বেশ রসিক, এই না? নিজের দোষ কখনো বিচার করে দেখেছ?

সজ্জনের মুখে আর উত্তর জোগাল না। চাকর এসে চায়ের বাসন উঠিয়ে নিয়ে গেল। সাড়ে সাতটা বাজছে দেখে কর্নেল বললে—এবার চলা যাক, কাপড়চোপড় বদলাবে, না এই পরেই চলবে?

—এই ঠিক আছে। সজ্জন উঠে দাঁড়াল।

—দেখো, এরা আমাদের দুর্নাম রটবার জন্যে কোন-না-কোন ফন্দি ফিকির আঁটতেই থাকবে। তুমি এদের ফাঁদে মোটে পা দিয়ো না বুঝলে? আজ বিন্নোকেও আমি সব বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেব। তুমি একজন মরদ কা বাচ্চা, বুক চিতিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করো, বিন্নোর ওপর যেন কোন আঁচ না আসে।

—কর্নেল, আমাকে সময় দাও।

—কিসের জন্যে সময় চাইছ? একবার যখন এ পথে পা বাড়িয়েছ— আর ফিরে তাকানোর কোন মানে হয় না! তোমার খোশামুদি করছি ভেব না, সত্যিই তোমার স্বভাবের জন্য মহিপালের চেয়ে তোমাকে আমি বেশী শ্রদ্ধা করি।

সজ্জন মাথা হেঁট করে চুপচাপ শুনছে। কর্নেল বেলের সুইচ টিপে চাকরকে ডেকে বললে— সুকরু, মেম সায়েব উঠলে তাকে চা খাইয়ে বলে দিস যে সায়েবের সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না। আজ সায়েব আমার বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করবে। আরে হ্যাঁ, যা বলছিলুম, বাড়ির সব জিনিসের ওপর নজর রেখো, মেয়েমানুষটি যেন কিছু নিয়ে না পালায়।

—জোসেফকে গাড়ি বার করতে বলো। সজ্জন আজ বড় ক্লান্ত, বড় আনমনা। কর্নেলের পিছু পিছু মাথা হেঁট করে সে এমনভাবে যাচ্ছে যেন আজ এক প্রবল বিদ্রোহী নিরস্ত্র হয়ে পুলিসের হাতকড়িতে বন্দী হয়ে চলেছে।

বত্রিশ

সজ্জনের মন-মেজাজ আজ ভালো নেই। শালিগরাম তাঁর প্রচেষ্টায় সফল হয়েছেন। শহরের দৈনিক খবরের কাগজে বড় বড় হরফে খবর বেরিয়েছে এই প্রদর্শনীর আয়োজন ওয়ার্ড কমিটির দিক থেকে করা হয়েছে। শহরের স্বনামধন্য ব্যক্তি লালা জানকীসরণের বাড়িতে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। রাজধানীর খ্যাতনামা শিল্পীদের সহযোগিতার দ্বারা আয়োজনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রদর্শনীর উদ্‌ঘাটন স্বয়ং 'হার এক্সেলেন্সী' করবেন। মধ্যবিত্ত জনজীবনকে উন্নত করাই এই প্রদর্শনীর একমাত্র উদ্দেশ্য। এ পাড়ায় এ ধরনের আয়োজন এই প্রথম, সুপ্রসিদ্ধ নেতা শ্রীশালিগরাম জায়সওয়াল অভূতপূর্ব জনকল্যাণ-চিন্তা ও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। খবরের কাগজ পড়া শেষ করে সজ্জনের রাগে গা জ্বলে গেল। সকাল সকাল কর্নেল তাকে নিস্তেজ করে হতোৎসাহিত করে গেছে, তার ওপর এই খবরে যেন মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা পড়ল।

সজ্জন বেলা বারোটা পর্যন্ত সমস্ত ছবি সংগ্রহ করে লালা জানকীসরণের বাড়িতে নিয়ে গেল। কর্নেল আর কন্যা সেখানে উপস্থিত ছিল না। তাকে দেখেই লালা জানকীসরণ এগিয়ে

এসে কোলাকুলি করে বললেন— ভাই, আমি অনেকক্ষণ থেকে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি।

সজ্জন উত্তর দিলে না। মজুরদের মাথায় ছবির বোঝা দেখে লালাজী তাড়াতাড়ি চাকরদের বোঝা নামাবার হুকুম দিলেন। চাকর গোঁয়ার গোবিন্দের মত ছবির বোঝাকে আক্রমণ করছে দেখে তাড়াতাড়ি সজ্জন এগিয়ে বোঝা নিজেই নামিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করলে। ছবি যথাস্থানে রেখে মজুরদের বিদেয় করিয়ে লালাজী তাঁর নকল দাঁতের পাটি বার করে হাসতে হাসতে বললেন— বড় পরিশ্রম গেছে তোমার সকাল থেকে, এই ব্যাটা শালিগরাম এমন ছোটলোক তোমায় আর কি বলি?

লালা জানকীসরণ মুখ অন্ধকার করে বসে পড়লেন। শালিগরামের বিরুদ্ধে জানকীসরণের মন্তব্য শুনে সজ্জন যেন আকাশ থেকে পড়ল, বিচিত্র সংসারের গতি।

—আমি রাজাসায়েবকেও ফোন করে এ বিষয়ে পরামর্শ নিয়েছি। ছুনিয়াদারির ব্যাপার তুমি ভালোই বোঝো, তোমায় আর কি বোঝাব? আজ যদি কন্নোমল বেঁচে থাকতেন তা হলে রাজাসায়েবের মত তিনিও— আসলে কথাটা হচ্ছে সকালে রাজাসায়েব টেলিফোনে শালিগরামকে বেশ ধমকে দিয়েছেন। আমাকে বললেন সে বড় আহাম্মকীর কাজ করে ফেলেছে। আমি অনেক করে তাঁকে বোঝালুম এ সময় মাথা গরম করা উচিত হবে না— 'হার এক্সেলেন্সী' আসছেন, আয়োজন ভালো-ভাবে মিটে যাক, তারপর দেখা যাবে।

সজ্জন রাগে ফেটে পড়ল— আমি যদি এখুনি সব ছবি উঠিয়ে নিয়ে চলে যাই তাহলে শালিগরামবাবু হাড়ে হাড়ে বুঝবেন যে

কত ধানে কত চাল। আমি যদি সকলের কাছে ঘুরে ঘুরে ব্যবস্থা না করতুম তাহলে এঁকে কে…

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এ কথা একেবারে ষোলো-আনা সত্যি এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

—সে কথা থাক, পাবলিসিটি পাওয়ার ইচ্ছে আমার মোটেই নেই। ভগবানের আশীর্বাদে আমার খ্যাতি যথেষ্ট আছে। শালিগরামকে কেবল এই শহরের লোকেরাই চেনে, সজ্জন বর্মার খ্যাতি দেশ-বিদেশের কাগজে লোকেরা পড়ে।

—আরে বাবাজী, আমি সব বুঝি, তুমি আমার ছেলের মত, তোমার প্রশংসা শুনে আমার বুক ফুলে দশ হাত হয়ে যায়। ভগবানের বিচার, তোমার বাড়িতে আপনার বলতে কেউ রইল না (লালাজী ধুতির কোঁচার কোণ দিয়ে চোখ মুছে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন) বেঁচে থাকো, ভগবান করুন তোমার খ্যাতি দিন দিন ছড়িয়ে পড়ুক। তোমার জন্যেই আজ আমার বাড়িতে হার এক্সেলেন্সী আর বড় বড় নামকরা লোকেদের পায়ের ধুলো পড়বে। যতদিন এ ধড়ে প্রাণ ধুকধুক করছে, তোমার যশোগান গাইতে থাকব, হরি ইচ্ছা— প্রভো।

সহসা শশব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে লালাজী জিজ্ঞেস করলেন—খাওয়াদাওয়া হয়নি নিশ্চয়? আমার বাড়িতে চলো, খাবার একেবারে রেডি আছে।

—আজ্ঞে না, আজ কর্নেলের বাড়ি আমার নেমন্তন্ন, এখনো এল না?

—না, এসে চলে গেছে। কর্নেল আমার ওপর খাপ্পা হয়ে আছে। কর্নেলের সঙ্গে সেই মেয়েটি এসেছিল যার জন্যে

রাজাসায়েবের সঙ্গে তোমার একটু মন-কষাকষি হয়েছিল। একটা কথা বলব কিছু মনে কোরো না যেন, নগীনচন্দ্র তোমার বন্ধু আর আমার পরিচিত কিন্তু ওর ব্যবহার মোটেই ভদ্র নয়। আরে ওর বাবা মোতীচন্দ্রবাবুর সঙ্গে আমার ভালো পরিচয় ছিল। আমি গঙ্গাজল হাতে নিয়ে এ কথা বলতে প্রস্তুত যে তোমার স্বভাব যেমন নম্র, ধীর, সুশীল তোমার বন্ধুদের ঠিক তার উল্টো। কারুকে চিনতে বাকী নেই, তোমার বন্ধু মহিপালকে তখন থেকে চিনি যখন সে আমার জামাইবাবু রূপরতনের সঙ্গে খবরের কাগজ বের করত। বনেদি বংশের কথাই আলাদা, কর্নেলের বাবাই দু-পয়সা রোজগার করেছিল তাই বলে কি আর বড় বংশের ভদ্রতা শিখতে পেরেছে। লক্ষ্মীর কৃপা হলেই কেউ— রাজাসায়েব আর তোমার কথা আলাদা, বংশ-পরম্পরায় লক্ষ্মীর মহিমা চলে আসছে। যাক সে-সব কথা, চলো, খেয়ে নাও।

—আজ্ঞে না, আমি একবার কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে চাই, কোথায় গেল, আপনাকে কিছু বলে গেছে?

লালাজী গম্ভীর হয়ে এক মিনিট মুখ বিকৃতি করে থাকার পর কুঁতিয়ে কাঁতিয়ে উত্তর দিলেন— নগীনচন্দ্র আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেছে যে প্রদর্শনী আমার বাড়িতে হবে না। সে··· সে··· জেঠীর বাড়িতে ব্যবস্থা করছে।

সজ্জন স্তম্ভিত হয়ে গেল। কর্নেলের নতুন ব্যবস্থা শুনে সে আনন্দিত হল কিন্তু পরমুহূর্তেই উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে— আমি এখুনি আসছি।

—আরে শুনে যাও···

—আজ্ঞে, আমি এলুম বলে— সজ্জন তাড়াতাড়ি জেঠীর বাড়ির দিকে রওনা হল।

কন্যা, কর্নেলের তিনজন চাকর, বাবা রামজী আর তাঁর চারজন ষণ্ডামার্কা সুস্থ পাগল উঠোনে বসে ছোট ছোট রঙবেরঙের কাগজের ঝালর তৈরী করে ঝোলাতে ব্যস্ত। জেঠী নন্দর পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন। সকলের চেহারায় বেশ হাসিখুসী ভাব।

—এসো রামজী, দেখো এখানে কেমন আনন্দের হাট বসেছে।

সজ্জনকে দেখেই কন্যার মুখের হাসি সহসা মিলিয়ে গেল।

—আরে ও কম্মোমলের নাতি, অমন হাঁড়ির মত মুখ ফুলিয়ে আছিস কেন? জানকীসরণ মুখপোড়াকে নির্বংশ করে ছাড়ব।

—আরে তোমার কথা তোমার কাছেই রেখে দাও জেঠী, তোমার দ্বারা কারুর কোন অমঙ্গল হয়েছে আজ পর্যন্ত শুনিনি, নন্দ বললে।

—রাঁড়! তুই এ-সবের কী বুঝিস? তোকে দিয়ে যা কাজ করালুম সব উল্টোই হয়ে গেল, পাপের পুঁটলী একটা। হাত লাগাতেই সব ছাই।

—আরে জেঠী তুমি— নন্দ জেঠীর মুখের গালাগালি শুনে অপ্রতিভ হয়ে চুপ মেরে গেল। নন্দকে যুদ্ধক্ষেত্রে নামতে দেখে জেঠী হাত-পা নেড়ে পঞ্চম স্বরে চেঁচিয়ে বললেন— আমাকে মুখনাড়া দিতে আসিস কোন্ সাহসে? আমার সারাটা জীবন এক আঁচে পুড়ে শেষ হয়ে গেল, আমাকে আঙুল দেখাতে পারে এমন লোক এ পৃথিবীতে জন্মায়নি। তুই কালোমুখি নিজে নষ্টা, পৃথিবীসুদ্ধুকে নষ্ট করে…

—রামভক্তনিয়াঁ, শুভ কাজের সময় তীর চালানো কিছুক্ষণ বন্ধ

রাখলে ভালো হয় না? (সজ্জনের দিকে চেয়ে) তুমি যে কাজে হাত দিয়েছিলে তার কী হল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছবি সংগ্রহ করে এনেছি।

—শুনলাম এরা তোমায় নাকি ধোঁকা দিয়েছে? তুমি কিছু চিন্তা কোরো না রামজী, জগৎটাই এইরকম— জেঠী আর নন্দর বাকবিতণ্ডা আবার আরম্ভ হল। নন্দর বিড়বিড় শুনে জেঠীর বুড়ো শরীরে যেন গরম তেলের ছিটে পড়ল— এই হারামজাদী, এত লাফালাফি কিসের? এখুনি হাটে হাঁড়ি ভাঙব নাকি? আমার সঙ্গে লাগতে এলে দু-চারদিনে এমন গতি করে দেব যে গলির কাদা মেখে মেখে ঘুরবি, এই বাবাজীও তোকে ঠিক করতে পারবেন না।

—ধেঁৎ তেরেকী রামভক্তনিয়াঁ, বাবাজী চোখ বার করে নন্দকে দেখলেন— জগৎজেঠীর সঙ্গে লাগতে এসেছ?

সজ্জন এ সময়ে ঠাট্টা-তামাশা করার মুডে নেই। সে জানতে চায় কর্নেল কোথায়? কাকে জিজ্ঞেস করবে? কন্যাকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়? বাবাজীর সামনে কন্যার প্রতি অনুরাগ দেখালে কেমন হয়? কিন্তু অনুরাগ দেখাবার উপায়? আজ তার বাকপটুতার পরীক্ষার দিন না কি? নিজের সমস্ত মনোবল সঞ্চয় করে সে প্রশ্ন করলে—

—কন্যা, কর্নেল কোথায়?

—খাবার ব্যবস্থা করতে গেছেন।

—এঁদের, আমার, সকলকার?

—তুই এখনো অভুক্ত রয়েছিস কল্লোমলের নাতি? আমাকে কেন বলিস নি তুই, চারখানা লুচি ভেজে দিতে কতক্ষণ লাগে?

—না না জেঠী, এখুনি খাবার এলো বলে, আপনি কেন কষ্ট করবেন।

ইতিমধ্যে কর্নেলকে আসতে দেখা গেল। সজ্জন আর কর্নেল দুজনে নিজেদের কথার ঝাঁপি খুলে বসলে।

—আমি রাজাসায়েবকে পরিষ্কার ভাবে বলে এলুম যে প্রদর্শনী লালাজীর বাড়িতে হতেই পারে না তা সে লাটই বলুক আর বেলাটই বলুক। ওরা যদি ফন্দি ফিকির আঁটতে পারে আমরাও তার মুখের মত উত্তর দিতে জানি। আমি কিছু ভুল বলেছি কি? কর্নেল সজ্জনকে জিজ্ঞেস করলে।

—ঠিক বলেছ।

—তুমি এই মুহূর্তে যাও আর গিয়ে সব ছবি উঠিয়ে এখানে নিয়ে এসো। এ জায়গা ওখান থেকে ঢের ভালো— ফার্স্টক্লাস।

ছবি উঠিয়ে নিয়ে যাবার কথা শুনে লালা জানকীসরণ সজ্জনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিলেন। তিনি ভালোভাবে এ কথা জানিয়ে দিলেন যে হার এক্সেলেন্সী দ্বার-উদ্ঘাটন করার পরই ফেরত দেবার প্রশ্ন ভেবে দেখা যেতে পারে। দুই বনেদি বংশের বংশধরদের মধ্যে বেশ খানিকটা কথা-কাটাকাটি হয়ে মন-কষাকষি হয়ে গেল। উফ্ মানুষ এত তাড়াতাড়ি ভোল পালটাতে পারে।

কর্নেল সান্ত্বনা দিয়ে বললে— এখন না-হয় যেতে দাও, বিকেল সাড়ে চারটে বাজতে আর বেশী দেরী নেই। উদ্ঘাটনের সময় হার এক্সেলেন্সীর সামনেই জানকীসরণ আর শালিগরাম— দুজনেরই স্বরূপ খুলে দেব, দুজনেরই অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি করে ছাড়ব। তুমি চুপচাপ শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালকটি হয়ে বসে থাকো, এদের জন্যে আমি একাই একশো।

কর্নেল জেঠীর বাড়ির সামনে কাগজের ঝালর দিয়ে সাজালে। ওদিকে লালা জানকীসরণ গাঁদা ফুলের ডেকোরেশন করতে ব্যস্ত। চৌমাথায় কলের কাছে একটা প্রবেশদ্বার, বাড়ির সামনে একটা, রঙিন বাল্‌বের মালা লালাজীর বাড়ি থেকে নিয়ে চৌমাথা পর্যন্ত ঝালর দিয়ে সাজানো।

সজ্জন ক্রোধের আগুনে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। কর্নেল আরাম-চেয়ারে চোখ বুজে বসে আছে। বাবা রামজী তাঁর চেলাদের নিয়ে চলে গেছেন। কর্নেলের চাকরেরা উঠোনে বসে আছে। কন্যা জেঠীর সঙ্গে তারা বর্মার বাড়ি চলে গেছে।

সাড়ে তিনটে পৌনে চারটের সময় লালা জানকীসরণের চাকর এসে বলল— রাজাসায়েব এসেছেন, আপনাদের ডাকছেন।

—না, ওখানে গিয়ে দরকার নেই। চোখ বন্ধ অবস্থায় কর্নেল উত্তর দিল। চাকর হতভম্ব হয়ে এক সেকেণ্ড হুজনের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললে— তাহলে হুজুর।

—হ্যাঁ হ্যাঁ যাও, বলে দিলাম না তোমায়? আবার কিসের গাঁই গুঁই?

চাকর চলে যাচ্ছে দেখে সজ্জন কর্নেলকে বললে— একটু হয়ে আসি, রাজাসায়েব···

—রাজাটাজা যে যার বাড়িতে, তাই বলে আমাদের মাথা কিনে রেখেছে নাকি? আমার মতে তোমার ওখানে যাওয়া উচিত নয়। ব্যবহারের ভদ্রতাই মানুষের আসল পরিচয়।

—আমি একবার ঘুরে আসি। সজ্জন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—আমি বলছি তুমি যেতে পাবে না। সজ্জন বসে পড়ল।

পাঁচ মিনিট পরে রাজাসায়েবের মেজো ছেলে এসে হাজির—বাবা আপনাদের ডাকছেন।

সজ্জনের সামনে ধর্মসংকট, সে আড় চোখে কর্নেলের মুখের ভাব লক্ষ্য করছে। সামনেই ত্রিভুবনদাশ দাঁড়িয়ে, মহা ফ্যাসাদ, কর্নেল আকার-ইঙ্গিতের ভাষা ব্যবহার করতে না পেরে সোজাসুজি বললে— দেখুন ত্রিভুবনবাবু, এক পক্ষকে সমর্থন করা অন্যায়। শালিগরাম শালাকে পরোয়া করি না, কিন্তু আমাদের সকলের আপসদারীর মধ্যে লালা জানকীসরণ…

—আরে কর্নেল, এ সময় তাঁর মানসম্ভ্রম বাঁচানো দায় হয়ে উঠেছে।

—আমাদেরও মান অপমান আছে।

—সজ্জন তুমি যাও, ত্রিভুবনদাশ সজ্জনের হাত ধরে ওঠালেন, কর্নেল নিজের জেদ বজায় রাখার জন্য গোলমাল না বাধিয়ে চুপ করে রইল। সজ্জন চলে গেল।

হার এক্‌সেলেন্সীর গাড়ি রাস্তায় দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা-সায়েবের নেতৃত্বে দশ-বারো জন গণ্যমান্য ব্যক্তির দল দাঁত বার করে এগুলেন। গলি থেকে জানকীসরণের বাড়ি পর্যন্ত, লাল কার্পেট বিছানো, প্রত্যেক বাড়িতে ঝুড়িভরা ফুল আগেই রাখা হয়েছে। হার এক্‌সেলেন্সীর ওপর পুষ্পবৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। চৌমাথার ফাটক থেকে এমুড়ো ওমুড়ো সুতো দিয়ে বেঁধে ফুলের সাজি ঝুলছে। গলির মুখে প্রবেশ করতেই দু' মুড়োর সুতোয় টান পড়ল, সাজি থেকে মস্ত বড় বড় গাঁদা ফুলের মালা ঝপ করে হার এক্‌সেলেন্সীর গলায় পড়ল। জানকীসরণের বাড়ির সামনে লোকে লোকারণ্য, ডাক্তার, উকিল,

ধনী গণ্যমান্য ব্যক্তি, সরকারী অফিসার, পাড়ার পরিচিত-অপরিচিতর ভিড়। শহরের খ্যাতনামা শিল্পীরা আয়োজনের শোভা হয়ে জ্বল জ্বল করছেন, তাদের পদার্পণে আজ এ পাড়ার বরাত খুলে গেছে। চারদিকে পুলিসের বেশ ভালো ব্যবস্থা। বাবু শালিগরাম আর জানকীসরণ দু'জনেই আশঙ্কিত যে কর্নেল আর কন্যা আয়োজনের মাঝে বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টা না করে। হার এক্‌সেলেন্সী দ্বার উদ্‌ঘাটন করলেন। রাজাসায়েব প্রধান অতিথির প্রশংসার মালা গেঁথে ফেললেন। পাড়ার সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের গুণগান করতে তিনি ভুললেন না। শালিগরামের নেতৃত্বের প্রশংসা করতে করতে সজ্জনের প্রশংসায় দু'চারটে বাক্য বলে দিলেন।

লালা শালিগরামের পায়ের ব্যাণ্ডেজের জন্য উঠে দাঁড়াতে পারছেন না। তিনি ত্রিভঙ্গমুরারি হয়ে কোনমতে বক্তৃতা করলেন। দেশের শিল্পীদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ দেবার সময় তিনি সজ্জনের নামও উচ্চারণ করলেন না। হার এক্‌সেলেন্সী তাঁর বক্তৃতায় দেশের বয়োবৃদ্ধ শিল্পীদের গুণগান করে আর্টের মহিমার বিশদ বর্ণনা দিলেন। বক্তৃতার সময় তিনি তাঁর পাশে বসা দেশবিদেশে খ্যাতিপ্রাপ্ত লক্ষ্ণৌর বৃদ্ধ শিল্পীর উল্লেখ করতে ভুললেন না। হার এক্‌সেলেন্সী আয়োজনের জন্য রাজাসায়েবকে ধন্যবাদ জানিয়ে দরজায় বাঁধা ফুলের ঝালর কাঁচি দিয়ে কেটে দিলেন। তালির শব্দের সঙ্গেই ভিড় ভেতরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই সজ্জন স্তম্ভিত হয়ে গেল। শহরের অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের সামনে মাথা তোলার কথা ভাবতেই তার নিজের মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল। পঞ্চাশ খানা ছবি পাথার সঙ্গে বেঁধে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। একদিকে টেবিলে লাইন করে

মূর্তি রাখা। ঘরে একটাই জিনিস সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল—আলোর বাল্‌ব দিয়ে তৈরী ভারতমাতা, তাঁর হাতে রাষ্ট্রীয় পতাকা সুদর্শন চক্রের মত বন বন করে ঘুরছে। চিত্রকলার দুর্দশা দেখে সজ্জনের চোখ জ্বালা করতে লাগল। তাড়াতাড়ি সে মুখ লুকিয়ে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল। তার চলে যাওয়ার দিকে নজর দেবার সময় এখন কার আছে? সকলেই হাঁ করে হার এক্‌সেলেন্সীকে দেখতেই ব্যস্ত, কর্নেল আর কন্যা ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। হার এক্‌সেলেন্সী এক নজর বুলিয়ে চারিদিকে দেখে নিলেন। রাজাসায়েব, বড় বড় অফিসারেরা সকলেই হার এক্‌সেলেন্সীর পদানুসরণ করলেন। প্রখ্যাত শিল্পীরা তাঁদের আর্টের অপমান সহ্য করতে না পারায় ধীরে ধীরে সেখান থেকে পিট্‌টান দিতে আরম্ভ করেছেন।

সজ্জনের বন্ধু দু-চারজন আর্টিস্ট এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এই নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলে। এ বিষয় তারা একমত যে আজ ভারতমাতা এবং পতাকার ব্যবহার শিখণ্ডী করা হয়েছে। তাদের মধ্যে একজন টিপ্পুনি কাটলে সজ্জন নাকি বড়লোকদের সঙ্গে একজোট হয়ে তাদের এজেণ্ট হিসেবে এদের গলায় ছুরি চালাতে দ্বিধা বোধ করেনি।

কন্যা কাছেই দাঁড়িয়েছিল, সজ্জনের বিষয় রিমার্ক শুনে তার মন-মেজাজ যেন আরো মিইয়ে গেল। কর্নেলকে ধারে কাছে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পাড়ার লোকেরা পাখার সামনে দাঁড়িয়ে ছবির অজানা ভাষাকে বোঝার প্রয়াস করছে। নির্বাক্ চিত্রকলার ভাষা এদের কাছে অর্থহীন। এক যুবক আর্টিস্ট পায়চারি করতে করতে তার মনের তীব্র অসন্তোষের ধোঁয়ার

আভাস দেবার জন্যে লম্বা লম্বা বুলি আওড়ানো শুরু করে দিলে। অন্যজন মন্তব্য প্রকাশ করলেন— তুমি কেন বাজে বক বক করে নিজের এনার্জি নষ্ট করছ? তুমি যদি প্রতিষ্ঠিত নাগরিকদের শ্রেণীভুক্ত হতে তাহলে হয়তো চা জলখাবার কপালে জুটত, এখন সে গুড়ে বালি।

তৃতীয় জন তেলে বেগুনে জ্বলে বললেন— আমাদের গভর্নমেন্ট এদের প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েছে, তা নাহলে এইসব হাত-পা-ভাঙাদের আবার কেউ···

—এরা আমাদের কদর যখন বুঝছে না তখন আমরাও এদের ড্যাম কেয়ার করি। সজ্জন কোথায় গেল?

কন্যা উত্তেজিত হয়ে সকলের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে এগিয়ে এল— এরা সকলে মিলে একজোট হয়ে সজ্জনকে ধাপ্পা দিয়েছে। পেন্টিং আনার পর তাকে একবারটি এ ঘরে ঢুঁ মারতেও দেয়নি। চিত্রকলার প্রদর্শনী এদের বাহানা মাত্র। বড় বড় লোকদের ডেকে নিজেদের পাবলিসিটি করানোই এদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞের মত হেসে তাদের মধ্যে একজন বললে— পাবলিসিটি এ দেশের নেতার একচেটিয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় বড় সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক আর শিল্পীদের ডেকে বড় বড় সভার আয়োজন করা হয় কিন্তু পরের দিন খবরের কাগজে কেবল নেতাদের নাম আর তাদের বক্তৃতাই ওঠে, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক আর শিল্পীদের নামের উল্লেখ করা পর্যন্ত কেউ উচিত মনে করে না।

—আপনারা এদের কাজে সহযোগিতা না করলেই পারেন! ব্যাটাদের সোজা লবডঙ্কা দেখিয়ে দিন। এরা নিজেদের কেউকেটা

মনে করেন। যত নেতা-ফেতার দল— এই লোকগুলিকে অস্পৃশ্য করে সমাজ থেকে বার করে দেওয়া উচিত। যে মানুষ সমাজে থেকে মানবিক ব্যবহার জানে না, তাকে বহিষ্কার করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

—সজ্জন আমাদের বলেছিল যে পাড়ার লোকেদের সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে, প্রত্যেকটি ছবির সঙ্গে শিল্পীর নাম এবং তার ভাবের বিষয় লেখা কার্ড ঝুলবে, সে কি হল?

—হ্যাঁ, প্ল্যান এইরকমই ছিল কিন্তু আমরা কিছু করার সুযোগই পেলাম না। ছবি সংগ্রহ করা পর্যন্ত আদর-আপ্যায়ন তারপরেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিলে। একজন এগিয়ে এসে বললেন— আহা হা এ আপনারা করছেন কি? একটু গলা নামিয়ে কথা বলুন, পাশের ঘরেই সব বড় বড় লোকেরা···

—এমন বড়লোকদের নিকুচি করি। সজ্জনকে ডাকো? কোথায় সে? আমাদের আর্টের অপমান করিয়েছে সে।

—আমরা এর জন্যে অন্য ব্যবস্থা করেছি। এই বাড়ির কাছেই বেশ ভালো জায়গায় আয়োজন করা হয়েছে। আজ যদি এরা ফন্দিফিকির করে সব ছবি না নিয়ে নিত, তা হলে উদ্‌ঘাটন সেইখানেই হত। আমরা ঠিক করেছিলাম যে কোন গরীব মহিলা যে চিকনের শাড়িতে এমব্রয়ডারী করার কাজ করে, তাকে দিয়ে উদ্‌ঘাটন করানো হবে। আপনারা যদি একমত হন তাহলে সব ছবি নামিয়ে ফেলে···

চারিদিক থেকে সমস্বরে আওয়াজ উঠল— নামিয়ে ফেলো, নামিয়ে ফেলো!

আর্টিস্টরা নিজেরাই সকলে মিলে যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার কাজে হাত দিলে। লালা জানকীসরণের দুই ছেলে সেপাই নিয়ে ঘরে ঢুকে গর্জে উঠল— খবরদার, কেউ যেন ছবিতে হাত দেবার চেষ্টা না করে।

জানকীসরণের ছেলের গর্জন শুনে আর্টিস্টের দল যেন হুমকি দিতে গিয়ে দু মিনিট থেমে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। চিত্রকলা প্রদর্শনীর কামরা আর্টের মধুর আবেশে স্নিগ্ধ হওয়ার বদলে বিচিত্র সার্বজনিক কোলাহলের স্থান হয়ে গেছে।

পাশের ঘরে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেওয়ার সময় এই হট্টগোল বাধল। রাজাসায়েবের ভ্রূ কুঁচকে গেল। শালিগরাম জানকীসরণ সকলেই যেন আসন্ন ঝড়ের চিহ্ন দেখতে পেলে। আমন্ত্রিত অতিথিরা কেমন উসখুস করছে।

কন্যা প্রদর্শনীর কামরা থেকে আওয়াজ দিচ্ছে। সকলেই একবাক্যে কন্যার সমর্থন করছে। সকলে সম্মিলিত ঘোষণা করে জানালে যে কাল পর্যন্ত যদি তাদের ছবি নামাতে না দেওয়া হয় তা হলে তারা সংগঠিত হয়ে আক্রমণ করার বিষয় চিন্তা করবে। হ্যাণ্ডবিলের সাহায্যে, খবরের কাগজে ছাপিয়ে এইসব ধনীমানী ব্যক্তিদের মুখে থু থু ফেলার পুরোপুরি ব্যবস্থা করা হবে।

—ডাকো, পুলিসকে ডাকো, কারুকে ডাকো। আমরা আমাদের ছবি নিয়ে তবে নড়ব, তা না হলে আমাদের লাশ এখান থেকে উঠবে।

কন্যার উত্তেজিত কথার মধ্যে কর্নেল তার দুই চাকরের কাঁধে এক বড় মই রেখে হাসতে হাসতে ঢুকল। হার এক্‌সেলেন্সী তখন সকলের কাছে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠছেন। তাঁর সঙ্গে

প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ভিড় চলেছে, মৌচাকের আশেপাশে মৌমাছির ভোঁ ভোঁ। কর্নেল তাড়াতাড়ি জানকীসরণকে ডাক দিয়ে বললে —লালাজী, সেপাইদের বাইরে বার করে দিন, তা না হলে আপনার মান বজায় রাখা মুশকিল হয়ে যাবে, ইলেকশন লড়ার স্বপ্ন আর পুরো হবে না। রাজাসায়েব, লালা জানকীসরণ সকলে রেগেমেগে তার দিকে তাকাতে তাকাতে বেরিয়ে গেলেন। তাদের মতে, কর্নেল আজ ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে রামের সেনায় যোগ দিয়েছে। হৈ-হুল্লোড়ের অনিয়ন্ত্রিত ভিড়কে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টায় কন্যা ব্যস্ত হয়ে আছে। নামাবার সময় একটা ছবিতেও আঁচড় না লাগে, কন্যার সে দিকেও নজর আছে।

সব ছবি নামিয়ে নেওয়া হল। পুলিসে কোনরকম দখল নেবার চেষ্টা করলে না। স্বয়ং আর্টিস্টরা নিজেদের আর্ট কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলেছে।

—ভাইসব, কাল সন্ধের সময় জেঠীর বাড়িতে চিত্রের প্রদর্শনীর উদ্‌ঘাটন হবে। কর্নেল বেশ জোর গলায় ঘোষণা করলে।

প্রদর্শনীর অসফলতার ভারে যেন সজ্জনের ব্যক্তিত্ব পিষে গেছে।

তেত্রিশ

কর্নেলের বাড়িতে রাত তিনটে পর্যন্ত প্রদর্শনীর প্ল্যান তৈরী হল, কন্যাও সেখানে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করেছে। এবিষয়ে সকলে একমত যে উদ্‌ঘাটন আবার করা হোক এবং ভয়েলের শাড়িতে ভালো চিকন কাজ যাঁরা করেন, তাঁদের মধ্যে কোন বিধবা মহিলাকে ডেকে উদ্‌ঘাটন-সমারোহ করালে ভালো হয়।

—আমি আমার চিত্রের প্রদর্শনীর সময় বড় বড় সব নাম বাদ দিয়ে লক্ষ্ণৌর একজন মৃৎশিল্পী শ্রীরেবতীরামকে ডেকে প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন করিয়েছিলুম। ডাঃ রাধাকমল মুখার্জী উদ্‌বোধন ভাষণ দিয়েছিলেন। আর্টিস্ট মদন বললে।

কর্নেল আর কন্যা দুজনেই মদনবাবুর চিন্তাধারার প্রশংসা না করে পারলে না। ইউনিভারসিটির বড় বড় প্রফেসার, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সকলকে ডাকার কথা ভাবা হল কেননা কর্নেল ভালোভাবেই জানে যে জানকীসরণ আর শালিগরাম অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না।

সকলে একের পর এক স্কীম তৈরী করতে ব্যস্ত। কন্যার মন বারবার সজ্জনের দিকে কিন্তু সজ্জন প্ল্যান করায় একদম মত্ত হয়ে রয়েছে। এ-কথা সে-কথা কত কথা, লাউড স্পীকার লাগানো হবে, একটা জেঠীর বাড়ির ভেতর দিকে আর-একটা ফাটকে, বড়

বড় সাহিত্যিক, উকিল, প্রফেসার, জজ, ডাক্তার সকলের ভাষণ শোনার ব্যবস্থা করা হবে। প্রদর্শনীর বিষয় তাদের মতামত জনতাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করবে। মাঝে মাঝে ভজনের রেকর্ডও বাজানো হবে। সহসা কর্নেলের মাথায় এক নতুন বুদ্ধি খেলল।

—বিম্লো, লক্ষ টাকার আইডিয়া মাথায় এসেছে, কাল পরশু আর তরশু তিনদিন প্রদর্শনীর সময় ছেলেমেয়েদের মিষ্টি বিতরণের ব্যবস্থা করা হবে। আরে বড়জোর এক হাজার দোনা রোজ বিলি হবে, পাঁচ-ছশো টাকার চেয়ে বেশী খরচ হবে না। দু'চারজন বুড়োকে মিষ্টি খাওয়ালে কে দেখতে যাচ্ছে? বাচ্চাদের মিষ্টি খাওয়ালে তারা ঘরে ঘরে গুণগান গেয়ে বেড়াবে। আমার মাথায় এই স্কীম— আরে তুমি কি ভাবছ বিম্লো?

—না, কিছু নয়, আপনার স্কীম মন দিয়ে শুনছিলুম। পাঁচ-ছ'হাজার বাচ্চাদের মিষ্টি বিলি করা কম ব্যাপার নয়, এত খরচ···

—শোনো বিম্লো, সজ্জনের কথা ভাববার দরকার নেই, তা হলে আমি কি আর চুপ করে বসে থাকতাম? আমি তোমাকে পুরো দৃশ্য একের পর এক বলে দিতে পারি। প্রদর্শনী থেকে মুখ লুকিয়ে পালিয়ে নবাব পুত্তুর মনে মনে খুব বিরক্ত হয়ে থাকবেন। কিছুক্ষণ বকশীদের পুকুরপাড়ের রাস্তায় র‍্যাশ গাড়ি চালিয়ে সোজা বাড়িতে এসে ব্রেক লাগিয়ে নিজের চাকরদের কোন-না-কোন ছুতো ধরে বকাবকি করে তারপর বেশ খানিকটা টেনে··· অভ্যেসটা ভালো নয়। বিম্লো, এইজন্যেই বেশী বয়স পর্যন্ত আইবুড়ো কার্তিক হয়ে বসে থাকা আমি মোটেই পছন্দ করি না। স্বভাবে অনেক খুঁত এসে যায় তবে মানুষ কেউই পারফেক্ট হয় না, তুমি মন খারাপ কোরো না।

—না না, আমি বলছিলাম যে এত মিষ্টি…

কর্নেল হেসে ফেললে— পাঁচ-ছ'হাজার বাচ্চাদের মিষ্টি খাওয়াব কিন্তু সে আজ নয়, তোমার শুভ বিবাহের দিন। এখন কেবল হাজার দেড়েক সোনা হলেই চলবে।

টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং শোনা গেল। জগৎচন্দ্র হরখচন্দ্র স্যাকরার ফোন। তারা খবর দিলে রাজাসায়েব, কর্নেল আর সজ্জনের ওপর বেজায় খাপ্পা হয়ে আছে। এই কিছুক্ষণ আগে তাঁর বাড়িতে শহরের বাছা বাছা লোকদের বৈঠক হয়েছে। সেখানে শালিগরাম আর জানকীসরণ উপস্থিত ছিলেন। তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তোমরা চরিত্রহীন এবং কোন কম্যুনিস্ট মেয়েকে তোমরা রক্ষিতা রেখেছ। তোমরা কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগা-যোগ স্থাপিত করেছ। কাল যে সময় তোমাদের ওখানে প্রদর্শনীর উদ্‌ঘাটন হবে ঠিক সেই সময়, লালা জানকীসরণের রোয়াকে লাউড স্পীকার লাগিয়ে তোমাদের খারাপ চালচলনের বিষয় জনতাকে জানানো হবে। সেইসঙ্গে কিছুদিন আগে পাড়ায় ঘটিত প্রেমকাণ্ডের বিষয়ে সজ্জনের জবাব তলব করা হবে। রাজাসায়েব নিজে এই প্রস্তাবের সমর্থন করাতে জনতার ভেতরে নিশ্চয় এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। রাজাসায়েব স্বয়ং আগামী কালের সভায় উপস্থিত থাকবেন না কিন্তু তিনি শহরের নামী বড় বড় স্যাকরাদের ফোন করে দিয়েছেন। সমস্ত কথা সুস্থিরে শুনে নিয়ে কর্নেল বললে— দেখুন জগৎচন্দ্রজী, আমাদের মনের কথা এক ভগবানই জানেন, এই মেয়েটিকে নিয়ে যদি আমাদের মনে কোন পাপ থাকে তা হলে যেন দাদা গুরুজীর চরণে মাথা ঠেকানোর আগেই আমার… আমি কুকাজকে ভয় পাই, দুর্নামকে নয়।

কন্যার কাছে সব পরিস্থিতি যেন আয়নার মত পরিষ্কার হয়ে গেল। লজ্জায়, ক্রোধে তার দুকান যেন ঝাঁঝাঁ করছে।

কর্নেল হেসে বললে— ভগবান যা করেন ভালোর জন্যে। আমার মনে হচ্ছে যে এবারে রাজাসায়েবের ঠিকুজিতে নাক-কাটানোর যোগ আছে। এতদিন শালিগরামের পিটপিটুনি বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল, এবার রাজাসায়েবের মুখে চুনকালি মাখিয়ে তবে অন্যকথা। আমরা সাদাসিদে লোক, সর্বদা সোজা পথে যাওয়াই আমাদের অভ্যেস বিন্নো, আমাদের জিৎ অবশ্যম্ভাবী। যেখানে সুঁচ রাখার জায়গা নেই সেখানে এরা কোদাল চালাবার কথা ভাবছে। জানো, আমি এদের কী উত্তর দেব? কাল সকালে তুমি আর তোমার বউদি দুজনে গিয়ে সব বড় বড় বাড়িতে প্রদর্শনীর নিমন্ত্রণ করে এসো··· আঃ, এমন সময় সজ্জন সব মাটি করে দিলে। কাল সকালে টেলিগ্রাম করে মহিপালকে ডেকে পাঠাব। বিন্নো, তুমি আমার নাম দিয়ে ঝটপট করে একটা আর্টিকেল লিখে দাও, আমার মনের···

কন্যা গভীর সিন্ধুতে ডুবে গিয়ে যেন কিনারে আসার জন্যে ছটফটিয়ে মরছে। সজ্জন তার জীবনের অভিশাপ, নিরাধারকে সে কেন আধার মেনে গর্বিত হয়ে ছিল— ওহঃ তার জীবননৌকো মাঝি বিনে কিনারা খুঁজে পাবে কি?

* * *

চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজনের সঙ্গে মেয়েদের হাতের তৈরী সুচের কাজের প্রদর্শনীর সফলতায়, রাজাসায়েব আর জানকীসরণের মাথা কাটা গেল। জনসংঘ, প্রজাসোসালিস্ট, কম্যুনিস্ট ইত্যাদি বিরোধী দলের লোক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যের মশলা

পেল। বনকন্যার বাবার হাজতে যাওয়া, সজ্জন আর কন্যার মথুরায় গিয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করার অদ্ভুত মুখরোচক গল্প, যা হয়তো কন্যা আর সজ্জন নিজেরাই জানে না, বিপক্ষ দলের মুখে শোনা যাচ্ছে। ইলেকশনের খবরের সঙ্গে সজ্জন আর কন্যা দুজনেই উনিশশো বাহান্নর লয়লা-মজনুর খেতাব পেলে। কর্নেলের লাউড স্পীকার রাস্তায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে নিজেদের নীতির বিষয়ে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে— আমরা কেবল নারীজাতির প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করে যাব। আমরা এই ইলেকশনের ধাপ্পাবাজির মধ্যে নিজেদের ব্যালেন্স বজায় রেখে চলতে চাই।

তৃতীয় দিন শালিগরামের প্রচারকার্যে পরিবর্তন দেখা গেল। ওয়ার্ডে তাঁর প্রচারকার্যে নিযুক্ত দুই মিনিস্টারের গাড়ি ঘেরাও করে জনতা তাদের বেশ করে গালাগালি শুনিয়ে দিলে। সকলেই বেশ উত্তেজিত।

শেঠ রূপরতন আর-একজন মিনিস্টার কর্নেল আর সজ্জন, বাবু শালিগরাম, লালা জানকীসরণ সকলের মধ্যে মিটমাট করিয়ে দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন। সজ্জনের মন-মেজাজ বিগড়ে আছে। চিত্র প্রদর্শনী আর মেয়েদের হাতের সুচের কাজের মেলার পরদিন থেকে সেখানে যাওয়া তার বন্ধ। আজকাল সে মুক্ত বিহঙ্গ। এ কয় দিন চিত্রা কঠোর শ্লেষমিশ্রিত বাক্যবাণ দিয়ে তার মনটাকে যেন ঝরঝরে করে ফেলেছে। আত্মগ্লানিতে অভিভূত সে যেন জড় হয়ে গেছে। দুদিন থেকে তার প্রিয় চাকর তার ঘরে ঢোকার সাহস করছে না, কেননা তাদের মনিব আর তাদের কারণ-অকারণে বকছেন না, তাদের কেমন যেন

সব বেসুরো ঠেকছে। চা, সিগারেট, হুইস্কি সব ফরমাইশ বন্ধ। সারাদিন তাদের মনিব পাথরের নিশ্চল মূর্তির মত বসে থাকেন, বড় দেওয়ানজী কর্নেলের দোকানে গিয়ে সব কথা খুলে বলে এল। কর্নেল এদিকে ব্যস্ত থাকায় সজ্জনের সঙ্গে দেখা করার সময় করে উঠতে পারে নি।

—তুমি ঘাবড়ে যেওনা, আমি দু-একদিনে আসব। কর্নেল বললে।

—আর অন্য কিছু চিন্তার কারণ নেই কিন্তু তাঁর টেবিলে…

—আপনি সব সময় ঘরে নজর রাখুন।

—তবু…

—আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান। কার ভাগ্যে কী লেখা আছে… কে জানে? তবে এটুকু আমি বলতে পারি নিজের হাতে নিজের জীবন শেষ করার মত আহম্মক সে নয়।

কর্নেলের গাড়ি কন্যাকে সকাল দশটায় সজ্জনের বাড়ি পৌঁছে দিলে। কন্যা ঘরে ঢুকল। সজ্জন সামনে সোফায় বসে সিগারেট খাচ্ছে। দরজা খোলার শব্দে সামনে কন্যাকে দেখে চমকে উঠল। সহসা যেন চোরের মুখের ওপর সার্চলাইট পড়েছে—তার চমকে ওঠা স্বাভাবিক। হকচকিয়ে সে সিগারেট আঙুলের ফাঁকে লুকিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে হাতের তেলোয় ছ্যাঁকা লাগল। কন্যা সহজভাবে মুচকি হেসে তার কাছে গিয়ে নিজের কোটটা তার কোলে ছুঁড়ে দিয়ে বলল— আজকাল শিল্পীর মনের জোয়ার কোন্‌দিকে বইছে? সে সজ্জনের রুক্ষ চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বললে— এই দেখো, তোমার এসব খামখেয়ালীপনা আর আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে রাজী নই। এবার এসো— আমরা দুজনে দুজনের জন্য কিছু কিছু

ত্যাগ স্বীকার করি! বলো? সন্ধিপত্রে দস্তখত করতে রাজী আছ তো?

সজ্জনের অস্থির মন কন্যার চোখের স্থিরতাকে বুঝে নেবার চেষ্টা করছে। কন্যা সজ্জনের ভয়ভীত, সরল আর জেদী চোখের মধ্যে তার প্রেমের আবেশ দেখার জন্য উৎসুক ভাবে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

—এ তিন-চারদিনে, সত্যি বলছি, তোমাকে এক সেকেণ্ডের জন্য ভুলতে পারিনি কিন্তু কাজের মধ্যে এত ব্যস্ত ছিলাম যে দেখা করা সম্ভব হয় নি। তোমার মুড দেখে প্রথমে আমি আঘাত পেয়েছিলুম কিন্তু তারপর এই মেলা আর সামাজিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুয়ে মিলে যেন আমার জীবনে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করলে। আমাদের উদ্দেশ্য এক, আমরা তারই জন্য সংঘর্ষ চালিয়ে যাব!

বনকন্যা সত্যিই আজ নতুন আবেগে অনুপ্রাণিত। তার মধুর ব্যবহার আর মিষ্টি কথা যেন কুসুমের স্নিগ্ধতায় ভরা। সজ্জনের দেউলে মনের আত্মগ্লানির মুহূর্তকে সে যেন সুবাসিত করে দিতে এসেছে।

—সজ্জন, আজ দুঘণ্টা ফ্রী হয়ে তোমার কাছে থাকব বলে এসেছি। প্রথমে কিছু জলখাবার তৈরী করতে বলি, তারপর খেয়েদেয়ে চলে যাব।

—আনতে বলো।

—না, সেদিন থেকে তোমার চাকরদের কিছু না বলার প্রতিজ্ঞা করেছি।

সজ্জন তাড়াতাড়ি উঠে সুইচ টিপে বললে— আমি তার জন্যে…

দরজা খুলে সঙ্কিত সিংহ কাঁধের গামছা ঠিক করে রাখতে রাখতে ভেতরে ঢুকল।

—ঠাকুর, আজ থেকে এ বাড়ি আমার নয়— এঁর, আর কারুর নয়— বুঝলে?

এতটা বলতে গিয়ে উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীরের স্নায়ুমণ্ডলে টান ধরল, প্রায়শ্চিত্তর নেশায় যেন তার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। হাত তখনো কলবেলের সুইচ টিপে চলছে। নিরুপায় হয়ে চাকর থতমত খেয়ে এদিক-সেদিক দেখছে।

কন্যা হেসে বললে— ঘন্টিকে এবার রেহাই দাও, আর্টিস্ট মশাই।

ইতিমধ্যে ঘন্টির আওয়াজ শুনে ছয়জন চাকর মনিবের সেবায় লাইন লাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। চাকররা সায়েবের মুড দেখে কিছুটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল, যে তাদের সায়েব আগের মানুষ হয়ে গেছেন, তাঁর বাড়ির আসল লক্ষ্মী এবার এতদিনে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। সজ্জন হেসে চাকরদের বললে— যাক, যখন তোমরা এসেই পড়েছ তখন খালি হাতে ফিরে যাবে কেন? তোমাদের বকশিশ দেব। সামনের মাস থেকে তোমাদের মাইনে ডবল করে দেওয়া হবে। এবার থেকে এঁর হুকুম মানতে হবে।

কম্যুনিস্ট কন্যার সামনে চাকরদের লাইন— তার যেন কেমন কেমন লাগছে। সজ্জন মুখটিপে হেসে কন্যাকে বললে— এবার হুকুম দিন।

—যাঃ কী যে তামাশা করছ। অনেক কষ্টে চাকরদের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে কন্যা বললে— এই একটু কিছু জলখাবার নিয়ে আসুন— আর লাঞ্চ ঘণ্টা দেড় দুই পরে।

—জী হুজুর।

—আজ আপনারা যা ইচ্ছে তাই রান্না করুন, আমি দেড়টার সময় যাব, বাস, এইটা একটু মনে রাখবেন। কন্যা কোনমতে উত্তর দিলে।

চাকরের দল ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর যেন দুজনে দুজনকে নতুন করে চিনল। সজ্জন তখনো যেন নিজেকে সামলে নিতে পারছে না, তবু যেন এই মধুর সম্পর্কের স্থিরতার আভাস সে অনুভব করছে। চিত্রার সঙ্গে বিপরীত আচরণে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার আবরণ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। সে এখন নিজেকে অনেক সুস্থ, সুখী মনে করছে।

সেইদিন রাত্রে শেঠ রূপরতন শালিগরাম আর জানকীসরণের সঙ্গে কর্নেল আর সজ্জনের আপসে মিটমাট করার জন্যে তাদের ডেকে পাঠালেন। মেয়েদের মেলার বিবরণ কন্যা সজ্জনকে শোনাচ্ছে, কন্যা আজ আনন্দে গদগদ, নিজের প্রিয়তমের স্বপ্নকে সাকার করে তোলার এক তীব্র অনুভূতি। সজ্জন মন্ত্রমুগ্ধের মত কন্যার নতুন অভিযানের কাহিনী তন্ময় হয়ে শুনছে। যাবার সময় কন্যার মাঝের আঙুলে হীরের আংটি জ্বলজ্বল করছিল। কন্যা চলে যাবার পর সজ্জন অনেকক্ষণ আপনমনে একা বসে বসে চিন্তার জাল বুনে যেতে লাগল, ভাবতে ভাবতে সহসা রামজীর কথা মনে আসতেই তাঁকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে দাঁড়াল।

দুপুরের পড়ন্ত রোদ গোমতীর ধারে ছড়িয়ে পড়েছে। বাবাজীর রুগীরা রেস করছে। বাবাজী ঘাটে দাঁড়িয়ে ওদের রেস দেখছেন।

ঘাটে গিয়ে বাবাজীর সঙ্গে দেখা করতে সজ্জন যেন কেমন কুণ্ঠিত বোধ করছে। বাবাজী তাকে দেখতে পেয়ে দূর থেকে

হাত বাড়িয়ে হেসে উঠলেন। তাঁকে প্রণাম করার আগেই তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

—আপনার দর্শন করে কোটি টাকা প্রাপ্তি হল রামজী। আপনার প্রতীক্ষায় বেশ কয়েকদিন তপস্যা করতে হয়েছে।

আশ্রমের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ আরম্ভ হল, কসরতের পর প্রার্থনা তারপর আয়ুর্বেদের ঔষধ পান। হাতের কাজ শেষ করে বাবাজী নিশ্চিন্ত হয়ে সজ্জনের কাছে বসলেন।

—প্রায়শ্চিত্তের মত দেউলে নেশাকে ধারে কাছে ঘেঁষতে দিও না। দুঃখ করতে নেই, ভাবো যে তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পালা চলছে। বিগত কালের কথা ভেবে চোখের জল ফেলা মূর্খতা, রামজী, যে যাই বলুক, আমি এ পৃথিবীটাকে মায়া বা মিথ্যা মনে করি না। যদি ভগবানের অস্তিত্বকে আমরা মানি, তা হলে তাঁর সৃষ্টিও তাঁরই মত সত্য। যেখানে সত্য ও রূপের মিলন, তাকে উপভোগ করো, অসত্যের সঙ্গে সর্বদাই যুঝে যাও।

—তাই হবে। সজ্জন মনের বিকার থেকে রেহাই পেল, সে যেন চলার পথের কাঁটা সরিয়ে নরম তৃণের সন্ধান পেয়েছে। চিত্রার বিষয় বাবাজী পরামর্শ দিলেন, ওর ভালো দেখে বিয়ে দিয়ে দাও অথবা যদি কাজ করতে চায় কাজ করুক আর ভরণপোষণের খরচা নিতে থাকুক। যদি কাজ করতে রাজী না হয় তা হলে বসিয়ে ভরণপোষণের খরচা দেবার দরকার নেই। আলসে কুঁড়েকে সাহায্য করা মানে অমানুষিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া।

সজ্জন বিকেলে জেঠীর কাছে গেল। বাড়ির ভেতরে মেয়েদের মেলার ব্যবস্থা হয়েছে, তাই বর্মা চেয়ার টেনে দালানে বসে আছে। সজ্জন বর্মার পাশের চেয়ারে বসল। গলিতে ছেলেমেয়ের দল

হট্টগোল করতে করতে আসছে। কন্যা সুচারু ভাবে প্রোগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রদর্শনীতে মেয়েদের হাতে করা সুচের কাজ দেখার মত, অনেক বিক্রিও হয়েছে। মেয়েরা চা-পানের দোকান দিয়েছে। কন্যা এখন অনেক যুবতী হৃদয়ের হিরোইন। দশ-বারোজন মেয়ে এঁটো দোনা এক কোণে ফেলার কাজে ব্যস্ত। চারিদিক দিয়ে ঘেরা, বন্ধ জায়গায় এত লোকের ভিড়, তবু নোংরামির নামগন্ধ নেই, সব পরিষ্কার তকতক করছে। ছোট ছোট মেয়েদের নাচগান আর থিয়েটারের প্রোগ্রাম হচ্ছে। কর্নেল উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করলে যে কয়েক দিনের মধ্যেই অমীনাবাদে এ ধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। যে মেয়েরা সমাজে নিষ্পেষিত হয়ে যাচ্ছে তারা স্বাধীন বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচবে। তাদের জীবনে দেখা দেবে এক নতুন উৎসাহ। ইতিমধ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে সজ্জন বিয়ের লগ্নের বিষয় পরামর্শ করে নিলে। রাত আটটার সময় সকলে এক জায়গায় জড়ো হল, এরমধ্যে প্রত্যেকের জীবনে যেন বেশ খানিকটা পরিবর্তনের ঝড় বয়ে গেছে। রাত্তিরে শেঠ রূপরতনের বাড়িতে কর্নেল, সজ্জন, বাবু শালিগরাম আর একজন মিনিস্টার উপস্থিত ছিলেন। রূপরতন এবারের ইলেকশনে দাঁড়ালেন না। তিনি ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে এক বছরের জন্য আমেরিকায় যাচ্ছেন, নতুন মেশিনের এজেন্সি নিতে চান। এ সময় মধ্যস্থতার নীতি তাঁর বিজনেসের পক্ষে লাভপ্রদ।

—কর্নেল মশাই, আপনাদের কাছে আমি এমনটা আশা করি নি। মিনিস্টার বললেন।

—আরে ইলেকশন দুদিনের মামলা, চক্ষুলজ্জা রাখা উচিত।

—আমরা কোনরকম ওসকানি দেওয়ার কাজ মোটেই করিনি, কিন্তু অন্যরা যদি বিনা কারণেই পেছনে লাগে তাহলে···

—পেছনে লাগা আপনারাই প্রথমে আরম্ভ করলেন, এরোপ্লেন থেকে কাগজ কে ফেলিয়েছিল? শালিগরাম প্রশ্ন করলেন।

—আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে···

—আরে ভাই, তাই যদি করার ছিল, আমরা তো মরে যাই নি। তোমাদের মধ্যে কেউ এসে আমায় বলতে সে কথা, আমি নিজে সব ঠিক করে দিতুম। রূপরতন তাঁর নেতাগিরি ফলালেন।

—আরে ছাড়ুন এসব লম্বা লম্বা কথা। আমি বুক ঠুকে বলতে পারি যে শালিগরাম ইলেকশনের প্যাঁচে ফেলে এক নিরীহ মহিলার প্রাণ···

—এও আমার ঘাড়েই চাপাবে কর্নেল। বাবু শালিগরাম ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—আমি এর মধ্যে নাক গলাতে যাইনি। পুলিস নিজেরাই···

—আর উল্টো রামায়ণ পাঠে দরকারটা কি? আপনাদের মত নেতাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে আমার অভিজ্ঞতাও কারুর চেয়ে কম হয়নি।

—আচ্ছা, থাক সে-সব কথা, মিনিস্টার মশাই কাজু চিবুতে চিবুতে বললেন—এ কথা আপনাদের মনে রাখা উচিত যে কংগ্রেসের ভেতর যতই দোষ থাকুক-না-কেন, এসময় দেশের শাসন ব্যবস্থা এক এই পার্টিই চালাতে পারে, আর অন্য কোন রাষ্ট্রীয় পার্টি নেই। এসময় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কাজ করা মানে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

—হ্যাঁ, তাই আমি বলছি যে নারীর প্রতি অত্যাচার করা মানবতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।

—আপনি তাহলে কম্যুনিস্ট পার্টি···

—আপনি পার্টি-ফার্টির কথা কেন তুলছেন? আমার বউদি বেচারী কোন পার্টির দলাদলির মধ্যেই ছিল না আর আমার বাবা কোনদিন কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন না। তাদের অপরাধের উচিত শাস্তি দেবার কষ্ট আপনি নিজে ঘাড়ে কোনদিনই নিতেন না যদি আমার বাড়িতে···

—আচ্ছা, যাকগে, যা হয়ে গেছে তার পুনরাবৃত্তি করে কোন লাভ নেই।

—লাভ নেই কেন? সব গোলমালের মূলেই···।

—তুমি একেবারে কম্যুনিস্ট হয়ে গেছ কর্নেল।

—তুমি এমন করে বার বার বলছ, যেন এটা একটা গালাগাল, সজ্জন বললে।

—আমি ভেবেছিলুম যে আমাদের সজ্জনবাবু চিত্র তৈরী করতে করতে নিজেই কারুর সামনে চিত্রলিখিত হয়ে গেছেন।

মিনিস্টারের ঠাট্টা শুনে রূপরতন আর শালিগরাম দেঁতো হাসি হাসলেন।

—মিস বনকন্যা, আমি আপনাকে আর আপনার পার্টিকে সাবাসী না দিয়ে পারছি না যে আপনারা আমাদের পুরোনো কর্মঠ বন্ধুদের এত তাড়াতাড়ি নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নিলেন।

—আমি কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বারও নয় আর ওরা আমাকে মাতাহারীর মত এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেননি। কন্যার চেহারা রাগে রক্তিম হয়ে গেল।

মিনিস্টার গম্ভীর হয়ে গেলেন, সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। কর্নেল হেসে বললে— নিন, আরো কিছু বচন শোনার ইচ্ছে থাকে তো বলুন?

—না না, কারুর মনে দুঃখ দেবার আমার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু আমার খারাপ নিশ্চয় লেগেছিল তাই…

—সজ্জন হেসে কন্যার দিকে চেয়ে বললে— আরে আজ মিনিস্টার হয়েছে আমাদের পুরোনো বন্ধু, বেশ করে দু'কথা শুনিয়ে গায়ের ঝাল ঝেড়ে নাও।

শেঠ রূপরতন সুযোগ বুঝে হেঁ হেঁ করে বললেন— আরে সেকি আজকের কথা, কোন যুগ থেকে আমাদের চেনা পরিচয়…

মিনিস্টার হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। বাবু শালিগরাম চেয়ারের পিঠে হাত রেখে সংকেত করতেই মিনিস্টার বললেন— শালিগরাম, সব ঠিক হয়ে গেছে বুঝলে? কর্নেল, আজ তোমার মীনাবাজারে আমাদের কংগ্রেসের পাবলিসিটির জন্য কিছু পোস্টার পাঠিয়ে দেব।

—দেখুন, আমি সিদ্ধান্তের কথা বলছি, পার্টি স্পিরিটে…

মিনিস্টার সজ্জন আর কন্যার দিকে চেয়ে বললেন— আপনারা দুজনেই সর্বার্থসাধক ভাণ্ডার, আপনাদের বিয়ে কবে?

লালা জানকীসরণ আর রূপরতন কাঠফাটা হাসি হাসলে। মিনিস্টার মুখ টিপে হাসলেন। কর্নেল বললে— বাস, আর বেশী দেরী নেই। আপনাদের বাড়িতে খুব শীঘ্রই বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠি পাবেন।

—আচ্ছা, খুব আনন্দের কথা, আমার শুভকামনা জানিয়ে গেলাম। মিনিস্টার সজ্জনের সঙ্গে হাসতে হাসতে শেকহ্যাণ্ড করে বিদায় নিলেন।

চৌত্রিশ

বর্মার বাড়ির দালানে এক লম্বা বেঞ্চি আর ছুটো চেয়ার পাতা। সজ্জন, শঙ্করলাল, বর্মা, কর্নেল আর মহিপাল বসে আছে। বর্মার ছেলের আজ ষষ্ঠী পুজো, সেই উপলক্ষে জেঠী সকলকে নিমন্ত্রণ করে খেতে ডেকেছেন। ভুরিভোজনের পর এক জায়গায় বসে গল্প হচ্ছে। ভেতরে মেয়েদের খাওয়াদাওয়া তখনো শেষ হয়নি। অন্দরমহলে ঢোলকের সঙ্গে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে—

জিয়া জলভুন যায়,
রাজা চলে চাকরিয়া।
সাস কোলায় লোটা নঁনদী কোলায় লুটিয়া,
হায় জিয়া জল ভুনযায়,
হামকো লায় মটুকিয়া।

বালিশে ঠেসান দিয়ে মহিপাল হাঁটুর ওপর অজন্তা রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসের লেটার প্যাডের ওপর গান নোট করে চলেছে।

—সাহিত-টাহিত্য তোমার কর্ম নয়, আজ থেকে ঢোলকের জন্য গান আরম্ভ করে দাও। কর্নেল হেসে বললে।

মহিপাল উত্তর দিলে না দেখে সজ্জন মুচকি হেসে কর্নেলকে

বললে— দেখলে, ইনি তোমার কথার উত্তর পর্যন্ত দেওয়া উচিত মনে করলেন না।

—উত্তর জোগালে তবে তো দেবে! শালার অভ্যেস বদলাবে না। সেদিন দেড়টা টাকা টেলিগ্রামে খরচ করে এঁকে ডেকে পাঠালুম। চারিদিকের অপোজিশন দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলুম যে মহিপাল শিরোমণি এলে হয়তো কোন. সুরাহা হবে, কিন্তু ইনি এসে পর্যন্ত মুখে তালা চাবি এঁটে বসে আছেন।

—আরে মশাই, মামার বাড়ির মিষ্টি ছেড়ে দিয়ে তোমার এই গোলমালের মধ্যে মাথা গলাতে যাবে কেন?

—আজ তা হলে কেন দর্শন দিলে?

—জেঠীর বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে।

—জেঠী তোমাকে আবার কবে নিমন্ত্রণ করতে গেলেন? আমার মুখে শুনে সোজা ছুটে এসেছ, তাই নয়?

—আরে বামুন কখনো ইনভিটেশনের পথ চেয়ে বসে থাকে না··· আহাহাঃ কী সুন্দর গান হচ্ছে।

সকলে অন্দরমহলের নতুন গান কান লাগিয়ে শোনার চেষ্টা করছে। মহিপালের কাগজ-পেন্সিল নিয়ে গান লেখার মুদ্রা দেখে কর্নেল হেসে বললে— আচ্ছা, ঢের হয়েছে, এবার তোমার এই ভণিতা শেষ করে সোজা হয়ে ভদ্রভাবে বসো। কর্নেল মহিপালের হাত থেকে কাগজে টান দিতেই— আরে, কি হচ্ছে? আমার দরকারী কাগজ— বলতে বলতে মহিপাল কাগজ ভাঁজ করার ভান করলে।

—যাই বলো-না কেন ভাই, আমাদের জেঠী এক বিচিত্র ক্যারেক্টারর্প সজ্জন সিগারেট ধরালে।

—আরে মশাই, ছেলে হয়ে পর্যন্ত জেঠী আমাদের নাকে দম দিয়ে ছেড়েছেন। তাঁর উপকারের বোঝা মাথায় নিয়ে চুপ করে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই, না ওগরাতে পাচ্ছি আর না গিলতে পাচ্ছি, বিচিত্র পরিস্থিতিতে ফেঁসে গেছি আমরা।

—কেন, কেন, কি হল? কর্নেল হেসে জিজ্ঞাসু চোখে বর্মার মুখের দিকে তাকাল।

—প্রত্যেকদিন আমাকে আর আমার স্ত্রীকে ম্লেচ্ছ, বিধর্মী, না-জানি কত কি বলে গালাগালি করেন, আমাদের একেবারে হেনস্তার নজরে দেখেন অথচ খোকার জন্যে দিনরাত প্রাণপাত করছেন। আঁতুড়ের দেখাশোনার ভার সব তিনি নিজের জিম্মায় নিয়েছেন। নানারকম পাক, বাদাম, ঘি, সব আমার স্ত্রীকে খাওয়াচ্ছেন। তাঁর মতে এসব খেলে মায়ের বুকে দুধ হবে, বাচ্চার পেট ভালো করে ভরবে। সকলে হেসে উঠল। ভেতর থেকে ঢোলকে গানের আওয়াজ আসছে— বচ্চামেরী ঝীগুর সে ডর গইরে।

জেঠীর বসতবাড়ি আজ গুলজার। তারার রান্নাঘরের পাশের দালানে ভিয়েনের বড় মাটির উনুন তৈরী হয়েছে। অন্য দালানে ঢোলক বাজিয়ে পাড়ার মেয়েরা গান ধরেছে। গোকুলদ্বারের মুখিয়া, কীর্তনিয়া সকলে সেখানে বসে শুনছে। মেয়েরা থালায় মিষ্টি সাজিয়ে বাইরের ঘরে রেখে রেখে আসছে। ব্রাহ্মণ ভোজন আর জ্ঞাতি-ভোজন দুই সারা হয়ে গেছে। জেঠী আজ গুণে একশো এক বামুন খাইয়েছেন। জ্ঞাতি কুটুম্ব, চেনা অচেনা কেউ বাদ যায়নি, সতীনকে পর্যন্ত খবর পাঠিয়েছিলেন। এ সময় মেয়েরা খেতে বসেছে। সকলেই জেঠীর ষষ্ঠীর খাওয়ানোর মুখরোচক আলোচনায় মশগুল। নন্দ যেহেতু জেঠীর প্রতি

আজকাল বিরূপ তাই গলা নামিয়ে আশেপাশের মেয়েদের মধ্যে নিন্দেমন্দ করছে।

ছোট বউ আর কন্যা তারার ঘরে আছে। কন্যা আজ প্রথম তারার সঙ্গে এতক্ষণ বসে কথা বলার সুযোগ পেয়েছে। ছোটর সঙ্গে আজ তার প্রথম দেখা। ছোট আর তারা দুজনে বড় বউয়ের কথা মনে করে খানিক চোখের জল ফেললে। আজ যদি সে উপস্থিত থাকত তাহলে কতই-না আনন্দ করত। বড়র বিষয় কন্যা আজই সব কথা ভালোভাবে জানতে পারল। ছোট বললে শঙ্করলাল বিরহেশের বাড়ি গিয়ে বড়র সঙ্গে দেখা করে এসেছে, সে ভীষণ মনমরা হয়ে থাকে। বিরহেশ তাকে দু' মিনিটের বেশী শঙ্করলালের সঙ্গে কথা বলতে দেয়নি। আগে কত গলায়-গলায় ছিল আর এখন মুখ সোজা করে কথা বলা ছেড়ে ভবিষ্যতে বড়র সঙ্গে দেখা না করতে আসার হুমকি দিয়েছে। বিরহেশের বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ। একখানা ঘর, সাইজ বড় হলে কি হবে একেবারে ভগ্নস্তূপের নমুনা। তারই একপাশে সুতলি দিয়ে পর্দা টাঙনোর ব্যবস্থা। পর্দার কাপড় চিরকুটে ময়লা আর ছেঁড়া। যখন শঙ্করলাল সেখানে গিয়েছিল তখন তার ঘরে দু'তিনজন বাউণ্ডুলে ছোকরা বসে মদ খাচ্ছিল। বিরহেশ তাদের সঙ্গে এক গেলাসে চুমুক দিতে দিতে নোংরা ঠাট্টাতামাশা করে হাসছিল। কন্যা এসব শুনে দুঃখিত হল, আজকের সমাজে নারী হয়ে জন্ম নেওয়াই এক অভিশাপ, বড়র অন্ধকারে ঢাকা ভবিষ্যৎ সে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। মর্মান্তিক পীড়া সহ্য করতে করতে একদিন তার প্রাণপাখি কঙ্কালসার দেহত্যাগ করে উড়ে চলে যাবে। কন্যা তার স্বর্গীয়া বউদির কথা ভেবে দুঃখে

অভিভূত হয়ে পড়ল। স্ত্রী আর পুরুষ সচরাচর একে অন্যের মানসম্মান রক্ষা করে চলে না, স্ত্রী আর্থিক দিক দিয়ে পুরুষের আশ্রিতা, তার নিজস্ব স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ অভাব। এদেশের মেয়েরা সর্বদাই এই দুঃখের বোঝা বয়ে চলেছে। সীতা আর দ্রৌপদীর মত দেবীরাও এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাননি।

তিন-চারজন মেয়ে মিলে ঢোলক বাজিয়ে তন্ময় হয়ে গান গাইছে। প্রত্যেকের গলা বেসুরো। সামনের চারটে ভাঙা দাঁতের পাশে দোক্তায় কালো মাড়ি আর দাঁতের সারির মধ্যিখান থেকে এক অদ্ভুত ধুতু ধুতু শব্দ বার করে গাইছে, পাড়ার পঞ্চান্ন বছরের সুরমিলি, তার তানের সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্যি! নিজের সামনে তখন সে যুবতী সরবতীকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনতেই রাজী নয়। সরবতী আজকাল পাড়ার হিরোইন। সে এ পাড়ার কানা এক পয়সা-ওয়ালার সাদী-করে-আনা সাত নম্বরের স্ত্রী। বরকে সে একদম তোয়াক্কা করে না। বাড়িতে খোলাখুলি দিনরাত তার এয়ার-দলের যাতায়াত চলতে থাকে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সোনা দিয়ে ঢাকা। গানবাজনার শখ আছে তাই বড় বড় ঘরের অন্দরমহলে তার যাওয়া-আসা আছে। বিগতযৌবনা ধরা-সুন্দরী সুরমিলি তাকে হিংসের চোখে দেখে। কিশন সিংহের ছেলের বউ মঞ্জিরা বাজাতে বাজাতে পান খাচ্ছে আর দুই সুন্দরীর গানের মল্লযুদ্ধ দেখে মুচকি মুচকি হাসছে। কিশন সিংহের ছেলের বউ নারদমুনি হিসেবে এ পাড়ায় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। ঝগড়া বাধাতে সে অদ্বিতীয়, তার জুড়ি এ তল্লাটে মেলা ভার, সঙ্গে একটা গুণও আছে, মন-কষাকষি সৃষ্টি করার সে বিরুদ্ধে। আজ প্রায় চল্লিশ বছর এ পাড়ায় সে আছে, এক দু'বছর কম

করে সে প্রায় এত বছর ধরে বৈধব্য জীবন যাপন করছে।
অনেকে চাপা গলায় দুর্নাম রটায় এক প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতজীর সঙ্গে তার নাকি অনেক দিনের সম্পর্ক। পছাহী ক্ষত্রিয় আর আগরওয়ালাদের সামাজিক আচার-বিচার সব তার কণ্ঠস্থ। পরামর্শদাত্রী হিসেবে সুখ্যাতি আছে, মুখ মিষ্টি আর ঠাট্টা-তামাশায় বড়র চেয়ে বড়কে ধুয়ে দেবার বিদ্যে জানে। গোকুলদ্বারের ভিতরিয়াজী নিজের বিশাল ভুঁড়ি আর লম্বা দাড়ি দুলিয়ে হাত নাচিয়ে সরবতী আর সুরমিলিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন— আ মলো যা রাঁড়, তোমরা গানও ভালো করে গাইতে জানো না, আমি ছোটবেলায় এমন গান গাইতুম যে একেবারে মণ্ডলীসুদ্ধ লোক ভাবে বিভোর হয়ে উঠত।

—তাহলে রাঁড়, তুমি এ রূপ ধরে বসে আছ কেন? দশ হাত দাড়ি নিয়ে এসেছেন আমাদের গানে ত্রুটি খুঁজতে— সরবতী মিহি সুরে বললে।

ভিতরিয়াজী সরবতীর সোনার আর রুপোর ঝলমলানি দেখে মুগ্ধ হয়ে হার মানার পাত্র নয়— ওমনি গরম তেলে যেন জলের ছিটে পড়ল— আরে তোমার গলার আওয়াজ ঠিক যেন রেলের সিটি।

আশেপাশের মেয়েরা সকলে খিলখিল করে হেসে উঠল। কিশন সিংহের ছেলের বউ বললে— ভিতরিয়াজী তোমার পায়ে পড়ি, সভার মধ্যিখানে এমন করে বোলো না, এখুনি এর এয়ারদের কানে কথা গেলেই তারা তখুনি তিড়বিড়িয়ে···

—আমি না একে ভয় পাই আর না এর এয়ারদের কেয়ার করি। না ভালো গান জানে আর না সুর করে গাইতে পারে, একেবারে মাটি···

—নাও, সারা পাড়ায় সরবতীর গানের নামডাক আছে আর ইনি বলছেন গাইতে জানে না। কিশন সিং-এর ছেলের বউ চোখ নাচিয়ে বললে।

সরবতীর নিন্দে শুনে সুরমিলি সুন্দরী পারলৌকিক সন্তোষ পেলে। ভিতরিয়াজীকে ওসকানি দেবার জন্যে বললে— আমাদের ভিতরিয়াজীর গান গোকুলদ্বারে অনেক শুনেছি, কী ভালো গলা আহা হা···

—আরে সেখানে কেবল ভজন গাই আর এখানে, নিয়ে আয় ঢোলক, আমায় দে, বলে ভিতরিয়াজী ঢোলকের মত গোল পেট নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সরবতীর হাত থেকে ঢোলক নিয়ে বললেন— আরে যা যা, দেখো, ঢোলক বাজিয়ে গান করা আমার কাছে শেখো। চলো, সুরমিলি আরম্ভ করে দাও।

ভিতরিয়াজীর ঢোলক বাজানো দেখে এ বিষয়ে তাঁর যে দখল আছে এটা সকলেই মনে মনে মানতে বাধ্য হল। ভিড়কে মন্ত্রমুগ্ধ করে বাহবা লোটবার বিদ্যে তাঁর বেশ জানা আছে। হাতপা মটকে তিনি আরম্ভ করলেন— (আরে এ এ)

দুনিয়া মে পৈদা হুয়ে দুঃখসুখ উঠানে কে লিয়ে।
মেরে দিল মে এয়সী আবে সৈর বাগো কী করুঁ,
লে চলো জালিম মুঝে সৈর করানে কে লিয়ে।
মেরে দিল মে এয়সী আবে সৈর তালোঁ কী করুঁ,
লে চলে জালিম মুঝে কপড়ে ধুলানে কে লিয়ে।

বাইরে বসে মহিপাল হো হো শব্দে হেসে উঠল। মহিপালের হঠাৎ দমকা হাসি শুনে বাকী সকলে চমকে উঠল। শঙ্করলাল আর কর্নেল তখন তন্ময় হয়ে সজ্জনের মথুরা, বৃন্দাবন যাত্রার

বর্ণনা শুনছে এমন সময় কাঠ-ফাটানো হাসি যেন তাদের কেমন কেমন ঠেকল।

—এ কোন নতুন বুদ্ধিজীবী স্টাইল নাকি? কর্নেল রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করলে।

মহিপাল পায়ের তলায় হাত বোলাতে বোলাতে উত্তর দিলে—এ গান নিশ্চয় কোন গেরস্থ ঘরের গৃহিণীর রচনা। বেচারী অন্ধকার ঘরে বসে সারাদিন সংসারের কাজকর্ম করে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, এমন সময় এক নবযুবতী নায়িকা কল্পনাতে তার প্রেমিকের সঙ্গে পুকুরের ধারে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। হনিমুন করতে গিয়ে আর কিছু জুটল না তো কাপড়ই কাচা আরম্ভ করে দিলে··· হা হা হা আমাদের সমাজের নারীমনের সজীব চিত্রণ।

—শোনো। বনকন্যা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছে। সজ্জনের শিরায় শিরায় যেন প্রেমের স্রোত বয়ে গেল, সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

—জেঠীর কাছে কত কি পাওনা হল?

—এখন কোথায় কর্নেলদা, বিকেলে ষষ্ঠী পুজো। গলা নামিয়ে সজ্জনকে— খোকার পিসী হয়েছি, প্রেজেন্ট দিতে হবে যে?

—আজকেই চাই। তারা নিজের দিক থেকে আমায় দেবার জন্যে দামী বেনারসী আনিয়েছে।

—কি বলো কর্নেল, বিয়ের আগে স্বামী-স্ত্রী গলা নামিয়ে কানে কানে কথা কয়, লক্ষণ তো ভালো নয়— মহিপালের কথায় সকলে হেসে উঠল। কন্যার চোখে লজ্জার ছায়া পড়ল। সজ্জন হাসতে হাসতে বললে— কথায় আছে না যে সব মিয়াঁবিবি রাজী তো কেঁয়া করেগা কাজী, আমাদের দেখে তোমাদের হিংসে

হচ্ছে না কি ? আবার হাসির ঢেউ উঠল। কন্যা আনন্দে বিভোর, তার চাউনিতে আছে গর্ব, আছে প্রেমের মাদকতা। সে চাউনি দেখে কর্নেল বেশ আনন্দিত কিন্তু মহিপালের বুকে যেন ঈর্ষা ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।

সজ্জন গলা নামিয়ে কন্যাকে জিজ্ঞেস করলে— যা কিছু আনতে হবে বলে দাও, এখুনি বাজার থেকে এনে দিচ্ছি।

স্বামীস্ত্রীর মধ্যে লোকলৌকিকতার পরামর্শ এ যেন এক নতুন অনুভূতি। সজ্জনের অসাড় দেহে যেন এক নতুন প্রেরণার সঞ্চার হল। সাদাসিদে মানুষের স্বভাবের সৌন্দর্য এমনিভাবেই বুঝি ধরা পড়ে।

স্বামীস্ত্রীর এক মধুর সম্পর্ক, তবে কেন কন্যা মুখ ফুটে কিছু বলতে গিয়ে সংকুচিত হয়ে যায় ? স্বরূপ আর তারার মুখে— আমাদের ইনি, আমাদের উনি, শুনতে কন্যার বড় ভালো লাগে। এই নতুন মধুর সম্পর্কের অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে সে আজ তার ইচ্ছা জানাতে সজ্জনের কাছে যাবার সাহস করেছে। সবার চেয়ে দামী প্রেজেণ্ট দেবার কথাটা সে যেন কিছুতেই জিভের ডগায় আনতে পারছে না। সে এখন একজন লক্ষপতির বাগদত্তা পত্নী।

সজ্জনকে ভালোবেসে সমাজের সামনে তার পত্নীর মর্যাদা পাবার বাসনা তার হয়েছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে অভাব-অনটনের মধ্যে এতদিন জীবন কাটাবার পর আজ তার জীবনে এসেছে নতুন উল্লাস, সে সবার সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। সর্পে রজ্জুভ্রম না হয়ে যায় বলে সে সদাই মনের গোপন রহস্য মনেই ধামাচাপা দেয়ার শিক্ষা পেয়ে এসেছে। সজ্জনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তার গলা শুকিয়ে

এল, কোন রকমে গলা ভিজিয়ে আমতা আমতা করে বললে—কী আর চাই? এরা আমার জন্মে দামী শাড়ি কিনেছে। স্বরূপ খোকার জন্মে সোনার ঝুমঝুমি এনেছে··· বুঝেসুঝে যা ভালো মনে করো, না-হয় কর্নেলদার সঙ্গে পরামর্শ করে নাও।

বলেই কন্যা তখুনি ভেতরে চলে গেল। ভেতরে ঢোলকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মহিপাল বর্মার সঙ্গে ষষ্ঠী পুজোর বিষয় আলোচনা করতে ব্যস্ত। আমাদের হিন্দুদের মধ্যে ষোলোটি মাতৃরূপের কল্পনা আছে, ষষ্ঠী তাঁদের মধ্যে একজন।

সজ্জনের মনে চিন্তাধারার প্রবাহ চলেছে, পরিস্থিতির বিপাকে পড়ে আজ তাকে বর্মার মত মধ্যবিত্ত ঘরের সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক স্থাপিত করতে হচ্ছে। তার বাগদত্তা হিসেবেই তারা কন্যার জন্মে দামী শাড়ি কিনেছে কিন্তু সে যদি দামী প্রেজেন্ট দেয় তাহলে এদের মত ছাপোষা মানুষের পক্ষে তাকে ভালোভাবে গ্রহণ করা কি সম্ভব হবে? সেই নিয়ে নানা টিপ্পনি কেটে তারা কথাকে ফেনাবার চেষ্টা করবে। তাদের ঘর অনুযায়ী প্রেজেন্ট দেওয়াই ঠিক হবে।

—ষষ্ঠী পুজোর দিনে আমাদের ঘরে বিধাতা ভাগ্যলিপি লেখেন, কাউকে রাজা আর কাউকে ফকির করেন। কেউ বদমাইশ আর কেউ সাধু। অনেক সময় দশচক্রে ভগবান ভূত হয়ে যায়। সাত্ত্বিক ব্যক্তি অবস্থা-বিপাকে পড়ে দুর্নামের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে ঘোরে। মহিপাল কথা বলতে বলতে উদাস হয়ে গেল।

—আর?

—সত্যি, ভাগ্যের লেখা কে মেটাতে পারে? কর্নেল বললে।

—তুমি ভাগ্য মানো মহিপাল?

—না মেনেও মানতে বাধ্য হয়েছি।

—যদি ভাগ্য মানো তাহলে শিক্ষা অশিক্ষা, গরীব বড়লোকের বিভেদ···

—এর জন্য পুঁজিবাদীদের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চাও না কি?

—হ্যাঁ।

—সজ্জন, নতুন চেতনার উদয় হয় নতুন অভিজ্ঞতা দিয়ে। অনুভূতিকে প্রমাণ করার জন্য ব্যক্তিকে যা করতে বা সহ্য করতে হয়, তাই তার ভাগ্য, তার ভাগ্যের সঙ্গে সমাজের দায়িত্ব জড়ানো —বলতে বলতে মহিপালের স্বর গম্ভীর হয়ে এল— পূর্বজন্মের ফলভোগ এ জন্মে করতে হবে, কেউ তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না— মহিপালের গলায় যেন শব্দ আসতে আসতে বাধা পেল। মানুষের ভাগ্যচক্রের অবিরাম গতির রহস্য অতি নির্মম, বড়ই মর্মান্তিক।

গত দুদিন থেকে সজ্জনের মনে হয়েছে মহিপাল যেন কোন প্রায়শ্চিত্তের আগুনে জ্বলছে, গভীর অবসাদে তার ব্যক্তিত্ব যেন মিইয়ে পড়েছে। তার মনোবেদনার কারণ জানার সুযোগ হয়নি। কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী বন্ধুর দুঃখের ভারকে লাঘব করার ইচ্ছে তার মনে জাগেনি, উপরন্তু সে যেন সুখীই হয়েছে।

সজ্জন জোরে হেসে বললে— কোন গভীর অপরাধের খোঁচা খেয়ে মনের ঘা চড় চড় করছে না কি?

মহিপাল যেন সহসা ধরা পড়ে গেছে, তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে, গলার স্বর যথাসাধ্য স্বাভাবিক করে দেঁতো হাসি হেসে বললে— আমার মত কুটিল কুচক্রী··· কোন পাপের কথা তোমায় বলি?

মহিপালের উত্তর যেন সজ্জনের বুকে শেলের মত বাজল, সেও কত পাপী, কেউ যদি তাকে এই প্রশ্ন করে তাহলে? নিজেকে পাপ স্বীকারের বেদীতে দাঁড় করানোর মত, সজ্জন গভীর আবেগে বললে— আমি পাপী, বন্ধু, আমি পাপী, তোমার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আসছে জন্মে আমার কপালে না জানি কত দুর্ভোগ লেখা আছে!

—আমরা প্রত্যেকেই পাপী, সকলে যে যার কর্মফল ভোগ করছে। কর্নেল বললে।

—হ্যালো, ডাঃ শীলা কন্যার সঙ্গে দালানে এসে দাঁড়াতেই সামনে মহিপালকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। মহিপাল থতমত খেয়ে যেন পাথরের মত নিশ্চল হয়ে গেল। এক মহিপাল ছাড়া বাকী সকলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কন্যা সজ্জনকে আড় চোখে দেখে নিয়ে চোখ পাকিয়ে বললে— এখনো তুমি যাওনি?

—এই যে, এখুনি যাচ্ছি।

মহিপালকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে শীলা কন্যার দিকে তাকিয়ে ঠাট্টাচ্ছলে বললে— বেশ করেছ! দুর্জনকে বেশ কড়া শাসনে রাখো, এইবার জব্দ হবেন।

—আরে বাবা, আমাকে চটিপেটা করুন, আজকাল আপনাদেরই রাজত্ব। সজ্জন হেসে বললে।

—বলেছেন ঠিক কিন্তু পুরুষের জাত যা বেহায়া, আমাদের কমজোর চটির তলা ছিঁড়ে যাবে কিন্তু এদের লজ্জা বলে···

সকলে একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। মিঃ বর্মা চেয়ারের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে যেতে ডাঃ শীলাকে বললে— আসুন

আসুন বসুন। লোক বেশী আর বসার জায়গা কম দেখে বর্মা বললে— কি আর বলব, আজকাল মেয়েদের রাজত্ব…

—আমি যাচ্ছি। মাথা হেঁট করে মহিপাল বললে।

—কেন? বসো, বসো-না, ডাঃ শীলার স্বরে আগ্রহ, চোখের চাউনিতে করুণ মিনতি। যেদিন কর্নেল মহিপালকে শীলার বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল, তার পরে আজ তাদের প্রথম দেখা।

মহিপাল অসহায়, করুণভাবে শীলার মুখের দিকে তাকিয়ে, পর মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে বললে— না, আমাকে যেতেই হবে।

—দাঁড়াও আমি যাচ্ছি, কর্নেল, এদিকে শোনো, সজ্জন বললে।

—আমি আসার সঙ্গেই আপনারা উঠে পড়লেন যে— বেদনা-মিশ্রিত হাসি হেসে শীলা বললে।

—না না, কর্নেলকে তোমার চাপরাশী হিসেবে ডিউটিতে বসিয়ে যাচ্ছি আর আমি এখুনি ফিরে আসব। আজকাল স্বাধীন পাখি খাঁচায় ধরা দিয়েছে। সজ্জন স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কন্যার দিকে তাকাল।

—পুরুষেরা মেয়েদের হয় অধীনে রাখবে নাহয় নিজেরা গোলামি করবে। স্বামীরা তাদের দাপটে স্ত্রীকে সদাই তটস্থ রাখতে চায়। সমানে সমান ভাবটা যেন এরা কিছুতেই মানতে রাজী নয়। কন্যার চোখে প্রেম-মিশ্রিত মিষ্টি চাউনি ফুটে উঠল।

কন্যার প্রেম পবিত্র, নির্মল স্নিগ্ধ, সজ্জন কেন তার মত গুণের অধিকারী হতে পারছে না। কন্যার নির্মল প্রেমের সঙ্গে তার কলুষিত প্রেমের সঙ্গমে তার প্রেমও নির্মল হতে পারে না?

* * *

সজ্জন আর মহিপাল পাশাপাশি । দুজনের মনে গভীর চিন্তা।

—আমি ভীষণ নীচ··· কন্যার মত সচ্চরিত্র মেয়ের যোগ্য আমি নই··· কিন্তু আমি নিজের কলুষিত হৃদয়ের সঙ্গে যুঝে চলব, আমি পবিত্র হবার চেষ্টা করব। সজ্জনের মন কন্যার নির্মল সিন্ধুতে ডুবে নির্মল হয়ে গেছে।

—আমি অতি তুচ্ছ— আমার জীবনে ধিক্··· হে ভোলা! শিব মহারাজ, আত্মগ্লানিতে ভরা মহিপালের বুক যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

গলিতে ইলেকশনের আলোচনা সরগরম। জনসংঘ আর কংগ্রেসের টক্কর। দুপুরের পর উড়ো খবর শোনা গেল যে, কিষান-মজদুর-প্রজাপার্টির প্রতিনিধির অবস্থা একেবারেই কাহিল। বিভিন্ন পার্টির ইলেকশন চিহ্নর বিষয় সকলেই মন্তব্য প্রকাশ করে বিজ্ঞের মত মাথা নাড়ছে।

পঁয়ত্রিশ

গলি থেকে বেরিয়ে দুজনে চৌমাথার মোড়ে এসে পৌঁছাল। চৌক আজ লোকে লোকারণ্য। লাউড স্পীকারের আওয়াজের চোটে কান ঝালাপালা, আশেপাশের লোকের টেঁকা দায় হয়ে উঠেছে। ভিক্টোরিয়া পার্কের দু'পাশে চায়ের দোকানে সারি সারি চেয়ার মানুষে ভর্তি। ভিক্টোরিয়া পার্কে আজ ভোটের ব্যবস্থা হয়েছে। পুলিস, ফাইল বগলদাবা করা অফিসার, গাড়ি, জনতার ভিড়,

হৈ চৈ হট্টগোল। ইলেকশনের গোলমালে গাড়ি পার্ক করে ছেড়ে দেওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয় তাই আজ সজ্জন ড্রাইভার সঙ্গে নিয়ে এসেছে। চারিদিকে ইলেকশনের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে কিন্তু হাতের পায়ের কেরামতি দেখা যাচ্ছে না, শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা খুব ভালো বলতে হবে। গাড়ির কাছে এসে ড্রাইভারকে না পেয়ে সজ্জনের মন-মেজাজ খারাপ, মহিপাল বোঝালে— আরে যেতে দাও। রাগ করছ কেন? মেলা-ঠ্যালার দিন, কতক্ষণ একা গাড়িতে মুখ বুজে বসে থাকত? আশেপাশেই দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চয়, এসো ততক্ষণ পান খাওয়া যাক, কতদিন হয়ে গেল ভালো একখিলি পান মুখে পড়েনি।

সজ্জন ড্রাইভারের কথাই ভাবছে। কন্যা প্রতীক্ষা করবে। চারটের পর জেঠীর ওদিকে যাওয়া অসম্ভব, মেলা আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পর মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে কন্যাকে ডেকে পাঠানো মুশকিল ব্যাপার। কন্যার প্রতি তার অনুরাগ হঠাৎ যেন আবার জিয়োন কাঠির ছোঁয়া পেয়ে চনমনে হয়ে উঠেছে। সময়মত এসে চিত্রা তাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছে তাই সে কৃতজ্ঞ কিন্তু চিত্রা কি তার যোগ্য? চিত্রা রক্ষিতা হতে পারে কিন্তু পত্নী হবার যোগ্যতা তার কোথায়? কন্যার তুলনায় চিত্রা? চিত্রা কোনদিনই কন্যা হতে পারে না। অবিবাহিত জীবনের অনিয়মিত জীবন-যাত্রার পর আজ সে বড় ক্লান্ত, আজ পর্যন্ত সংসারের দায়িত্বের ভার থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সে কেবলই পালিয়ে বেড়িয়েছে, বনের স্বাধীন হাতীর মত সে গলায় শেকল পরানোর বিরুদ্ধে। ব্রজের মাটিতে, কন্যার সান্নিধ্যে, তাকে প্রেমপাশে আবদ্ধ করে সে তাকে বাসনার আগুনে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল

কি? কন্যার পবিত্র প্রেমের এই কি প্রতিদান? তাকে বাসনার পিচ্ছিল পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা বিফল হবার পর থেকেই সে যেন কেমন বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। মনের সুপ্ত বাসনা চিত্রার বাতাস লেগে আবার আগুনের শিখা হয়ে জ্বলে উঠেছিল। তবু কেন চিত্রার সহবাস নৈতিক মানদণ্ডে তার কাছে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে? চিত্রার সান্নিধ্যে সে পেয়েছে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা, কেবল জৈবিক উত্তাপের স্পর্শ। আজ তার সে সাধ গেছে চুকে, আসল মুক্তার সন্ধান সে পেয়েছে। কন্যা তার অসংযমের জীবনে সভ্য, সুসংস্কৃত সংযমের ছোঁয়া দিয়েছে। তার দাম্ভিক স্বভাবে সে এনেছে তার স্নেহশীতল অনুভূতির ছোঁয়া, সে তার মনের বিকারকে দূর করেছে, সে জানিয়ে দিয়েছে যে সে তার গৃহকর্ত্রী, তার ঘরের লক্ষ্মী। তার স্মৃতি, তার স্পর্শ, তার দর্শন— সজ্জনের মনের বিকার দূরে সরিয়ে দিয়েছে। কন্যার আত্মত্যাগ তাকে মুগ্ধ করেছে। এই সময় ড্রাইভারের অনুপস্থিতি তার যেন ভালো লাগল না, তবু এখন তার রাগ অনেকটা পড়ে এসেছে। সত্যিই তো, বেচারা ড্রাইভার একা মুখ বুজে কতক্ষণ গাড়িতে বসে ঢুলত? সে বেচারাও রক্তমাংসের তৈরী মানুষ।

অন্যমনস্ক সজ্জনকে মহিপাল হাত ধরে টেনে সচেতন করে তুলল— এসো এসো, সাতপাকের আগেই এই অবস্থা তা হলে পরে কি হবে? এখন থেকেই দাসানুদাস হবার প্র্যাক্‌টিস— আমাদের মত লোকেরা ভালো স্ত্রীর অধীনে থাকলেই সুখী থাকবে— তাই নয় কি?

জমনা পানওয়ালার দোকানে তারা পানের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে, হ্যাঁ, প্রতীক্ষাই বটে, গ্রাহকের ভিড় যা, বাপ্‌স্। লাল মহারাজের

সিদ্ধির দোকানে ইলেকশনের গরমাগরম খবর শুনে পান মুখে দিয়ে সজ্জন বললে— এসো, যাওয়া যাক।

মহিপাল এক সেকেণ্ড কিছু ভাবলে, সজ্জন তারপর বললে— তুমি যাও, আমি এখানেই একটু পায়চারি করব, বেশ ভালো লাগছে।

—তোমার কোন কাজ ছিল না?

—না না, এমনি তোমার সঙ্গে চলে এলাম। আচ্ছা, এবার তুমি যাও। তোমার ড্রাইভার কোথায়?

সজ্জন তার মুখের ভাব ধরে ফেলার চেষ্টা করতে করতে বললে— না যদি এসে থাকে, তা হলে বাসে চেপে বসব।

সজ্জন চলে গেল। মহিপাল পার্কের দিকে পা বাড়াল। ইলেকশন ছাড়া কারুর মুখে অন্য কোন কথাই নেই। বৃদ্ধ, রুগী, পঙ্গু সকলে ভোট দিতে আসছে। মেয়েদের মধ্যে খুব উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। দেশের ইতিহাসে তারা প্রথমবার ভোট দেওয়ার অধিকার পেয়েছে, অনেকে নিজেদের পছন্দমত ভোট দিচ্ছে, অনেকে দিচ্ছে স্বামীর ইচ্ছেমত লোককে। এক ভদ্রলোক বার বার তাঁর গিন্নীকে জনসংঘের প্রদীপে চিহ্ন দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন, অথচ গিন্নী কংগ্রেসের বলদজোড়ার মহিমায় প্রভাবিত, দুজনে এই নিয়ে বেশ ঝগড়া বেধে গেছে। আশেপাশের লোকেরা গৃহযুদ্ধের মজা দেখছে আর হাসছে। রেগেমেগে শেষকালে ভদ্রলোকের গিন্নী গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন— দেখো, আজ জীবনে প্রথম ভোট দিতে এসেছি, যাকে খুসী তাকে দেব, তুমি নাক গলাবার কে? এবারে মুখ চালালে কিন্তু ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৃষভ-দীপক পালা নাটকীয় সংঘাতের কাছা-

কাছি পৌঁছাবে এমন সময় পুলিসের সেপাই এসে স্বামী মশাইয়ের কনুই ধরে বললে— ভোটস্থানে প্রচার করা অপরাধ।

বারবনিতার দল সেজে গুজে ভোট দিতে এসেছে। স্বাধীনতার কীর্তনে মশগুল সভ্যসমাজের গালে যেন এই দল ঠাস করে কষে এক চড় দিলে। প্রশ্ন— বাবার নাম? উত্তর—টাকা। আবার প্রশ্ন: স্বামীর নাম, উত্তর: টাকা। এদের মধ্যে একজন চঞ্চল বাইশ-তেইশ বছরের বাইজী নথ নাড়া দিয়ে বলল— না না, এই ইনি আমাদের ভোট দেওয়াতে নিয়ে এসেছেন তাই ফিলহাল ইনি সম্পর্কে আমাদের স্বামী। সকলে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল।

ইলেকশনের হৈ হুল্লোড়, মেছোবাজারের জীবন্ত ছবি দেখতে মহিপালের মন্দ লাগছে না। দেশের গণতন্ত্র প্রণালীতে, প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটাধিকার দিয়ে গড়া আমাদের এই ডেমোক্রাটিক শাসনতন্ত্র দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়তে হয়। প্রাচীন ভারতে সামন্ত শাসনতন্ত্রে কোন স্ত্রী, কারীগর, ব্যবসায়ী, শূদ্র— কারুর কোন অধিকারের প্রশ্নই ছিল না। জনতাকে শাসন করার একমাত্র অধিকার ছিল সামন্ত ক্ষত্রিয়দের হাতে। আজকের প্রগতিশীল সমাজের বহু আলোচিত ইলেকশন প্রণালী যেন বড়ই অর্থহীন হৈ-হল্লা। হঠাৎ কলকতার শেয়ার মার্কেটের ভেতরের কোলাহলের কথা মহিপালের মনে পড়ল, শেয়ার বাজারের হাঙ্গামা আর গণতন্ত্রের সার্বভৌমিক ইলেকশন লড়ার একই টেকনিক। আমাদের বিধান কেবল লক্ষ্মী আর চেয়ার হস্তগত করার বিদ্যেই আমাদের শেখায়। আমাদের প্রাচীন দেশের গৌরবময় ইতিহাসের পাতা খুলে আমরা গর্বে বুক চিতিয়ে হাঁটি, অথচ আজকের

সমাজের সভ্য সুশিক্ষিত জনসেবকরা এ অন্যায় চোখ বুজে কেন সহ্য করে যাচ্ছে? হুল্লোড়বাজি করে বুদ্ধি বিকশিত হতে পারে না। তবে? দুর্নীতি ও সংকীর্ণ স্বার্থের উলঙ্গ নৃত্য, ক্রূর চালাকি, সব মিলে আজ সভ্য মানুষ দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পাগলের মত নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারছে।

চিন্তাধারার প্রবাহে যেন হঠাৎ বাধা পড়ল, নিজের অজান্তেই জিভ দাঁতের মাঝে চেপে গেছে— উহুঃ। সভ্যতা, সংস্কৃতি, আদর্শ, ন্যায়, সৌন্দর্য, সত্য মানবতা ইত্যাদি শব্দকে যে সাহিত্যিক নিত্য নতুন পরিভাষায় সাজিয়ে প্রস্তুত করেছে, আজ সে আত্মগ্লানির আগুনে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। তার মানসিক জড়তা আজ তাকে উপহাসাস্পদ করে ছেড়েছে।

না না, আমার মানসিক দেউলেপনাকে আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে রাজী নই— আমাকে আমার পরিস্থিতির সঙ্গে যুঝতেই হবে। শকুন্তলার বিয়ে, দেনা-পাওনা, লোক-লৌকিকতার জন্য অনেক খরচ তাকে করতেই হবে। যদিও সে জানে খোলামকুচির মত পয়সা ওড়ানো খারাপ, বিয়েতে যা কিছু খরচ সব বাজে, অর্থহীন তবু তাকে সামাজিক ব্যবস্থার সামনে মাথা হেঁট করতেই হবে। একা একশো হয়ে বর্তমান ব্যবস্থাকে পাল্টে ফেলতে পারবে না, একা মহিপাল শুক্ল কত কি করবে? কল্যাণী বেচারীকে সে কতদিন এমনভাবে দাবিয়ে রাখবে? শকুন্তলার বিয়েতে জাঁকজমক করার তার বিশেষ ইচ্ছে, এই সুযোগে সে তার উদার মনের পরিচয় দিতে চায়। আজকাল ননদের মেয়ের বিয়ে দেবার কথা কোন্ বাড়ির স্ত্রী ভাবে? বাস্ এ মাসে শকুন্তলার যোগ্য বর খুঁজে তার বিয়ে দিয়ে ফেলবে। একটা

বোঝা ঘাড় থেকে নাবিয়ে তারপর আবার ভাবা যাবে, নিজেরও তো ছেলেমেয়ে আছে। তাদের শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার ভার তার একারই ঘাড়ে। নিজের কর্তব্য থেকে বিমুখ হওয়া উচিত নয়।

বর্তমান জীবনযাত্রা জটিল থেকে জটিলতর হয়ে চলেছে। এরজন্যে দায়ী কে? আমাদের সমাজের কুরীতি, সমাজের সঙ্গেই জড়িত রয়েছে ব্যক্তির জীবন। সমাজ আর ব্যক্তি দুজনে একই নাগরদোলায় বসে ঘুরপাক খাচ্ছে। আজকের সমাজের পঙ্গু ব্যক্তিত্ব নিজেই নিজের আদর্শকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে কেন? মনের রেণুতে রেণুতে যে আদর্শবাদ তা সমাজের চাপে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ধিক্— মহিপাল যেন এক যন্ত্রচালিত মানুষ, তার সম্পূর্ণ অস্তিত্ব আজ মিথ্যে হয়ে গেছে। তার অন্তর্দৃষ্টি আজ সংকুচিত। শূন্য দৃষ্টিতে চোখ মেলে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে মহিপাল একেবারে রাস্তার মধ্যিখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। কানের কাছে হর্ন শুনে সে চমকে উঠল—

—আরে পণ্ডিতমশাই তুমি এখানে? রূপরতন গাড়ি থেকে গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে— আসবে? তোমার সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল।

—চলা যাক্, ইলেকশনে আমার কোন বিশেষ ইণ্টারেস্ট নেই, এমনিই ঘুরতে ঘুরতে মজা দেখতে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। গাড়িতে যেতে যেতে মহিপাল প্রশ্ন করলে— এবারে তুমি ইলেকশনে দাঁড়ালে না?

—সত্যি বলব? বেনের ছেলে আগে ব্যবসা তারপর অন্য কথা। মহিপালের মনে বিগত দিনের ছবি ভেসে উঠল— এই

সেই রূপরতন, কত লম্বা লম্বা সমাজবাদী কথা বলে লোক ঠকাত, সমাজসেবার ভাঁওতা দিয়ে তাকে বোকা বানিয়ে রেখেছিল। হঠাৎ মহিপালের কাঁধে হাত রেখে রূপরতন বললে— মন্ত্রীপদ পাবার কোন আশা নেই, আমার চেয়ে অনেক বড় বড় সব ইলেকশন লড়ছেন। উপমন্ত্রী পদের নিলামে আমি আর এগুলাম না। তুমি তো জানো এসব আমার সহ্য হয় না। এ ছাড়া আজকাল মাগ্যির দিন, বিজনেসে সময় না দিতে পারলে শেষকালে দু'মুঠো জোটানো মুশকিল হয়ে পড়বে।

—আরে তোমার মত লক্ষপতি মাগ্যিগণ্ডার কথা ভাবে? হাঃ হাঃ…

—হাঃ হাঃ হাঃ, জলপ্লাবন যখন আসে তখন সে বড় ছোট সকলকেই টানে। সেইজন্যে সব সময় সাবধান থাকতে হয়।

—তুমি রাজনীতির কচকচানি থেকে দূরে চলে এসে ভালোই করেছ।

—না, একেবারে গঙ্গাস্নান করিনি, যাক সে-সব কথা। একটা প্রোপোজাল আছে, তোমার নতুন বই সব আমায় দিয়ে দাও, আমি তোমার পুরোনো বইয়ের কপিরাইট তোমায় ফেরত দিয়ে রয়েলটী বেসিসে নিয়ে নেব। কুড়ি পারসেণ্ট দেব, বলো রাজী?

মহিপাল ভাবতে লাগল, রূপরতন নতুন পজিশনের স্কীম তৈরী করে এনেছে তাই আমায় লোভ দেখাচ্ছে… এই সুযোগ ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। গলা নাবিয়ে মহিপাল বললে— হ্যাঁ, আমার তো তাতে লাভই তবে ভবিষ্যতে সতর্ক…

—যা হয়ে গেছে তা ভুলে যাও। সত্যি কথা বলতে কি তুমি তখন তোমার স্বপ্নকে সাকার করার নতুন উৎসাহ নিয়ে এ লাইনে

ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে। তোমার আমার বন্ধুত্বে কোনদিন আঁচড় লাগেনি, আজও আমি তোমার সেই রূপরতন, সেই ভালোবাসা, সেই ওঠা-বসা···

—বলার দরকার নেই, ব্যবহারেই সব বোঝা যায়। আমার বইয়ের দরুন আগাম টাকা কত দেবে?

—কটা বই?

—আমার তিনখানা বইয়ের নতুন এডিশন বেরোয়নি, প্রকাশক মশাই দেউলে হয়ে বসে আছেন। যাক আজকাল এক নতুন উপন্যাস···

—তিন-চার হাজার যা বলবে দিয়ে দেব।

—আর আমার পুরোনো বই?

—বাঃ পণ্ডিত মশাই দেখছি ইদানীং বেশ চালাক চতুর হয়ে গেছেন।

—জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক কিছু শিখিয়ে···

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের বনবে ভালো। যা ইচ্ছে হয় বলো, পেয়ে যাবে।

—নতুন কোন সাপ্তাহিক বার করবে না কি?

—হ্যাঁ, বার করতেও পারি। তোমাকে দেখেই প্রেরণা পাচ্ছি। এবারে প্রকাশক হয়ে এ দিকটাতেই বেশী নজর দেব ভাবছি। এ লাইনে আমি এক নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করতে চাই, ভারতীয় ভাষার উপন্যাসে পেঙ্গুইন সীরীজ বের করব, পাবলিসিটি আমেরিকান স্টাইলে হবে। ভারতের প্রত্যেক বড় শহরে মহিপাল শুক্লের উপন্যাস নিয়ে— আই মীন যে লেখকদের বই আমি প্রকাশিত করব— সাহিত্যিক গোষ্ঠীতে আলোচনা হবে, পেপার্স

পড়া হবে, প্রত্যেক স্কুল, কলেজ, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, খবরের কাগজে সব জায়গায় তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে। আমার বিশ্বাস এর আগে হিন্দী বইয়ের বিক্রির বাজারে এ ধরনের এক্‌সপেরিমেন্ট কেউ করেনি।

গাড়ি শেঠজীর বাঙলো বাড়ির পোর্টিকোতে এসে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে মহিপালের মনের অবসাদ মেঘ হয়ে উড়ে গেছে, নতুন প্রপোজলের সঙ্গে জড়িত তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কল্পনায় সে মশগুল।

শেঠজীর লাইব্রেরিতে বসে দুঘণ্টা ধরে এই নিয়ে আলাপ-আলোচনা হল। মহিপাল বললে— আমার এক কাজ করে দেবে?

আমি একটা গলার হার বেচতে চাই।

—সোনার?

—না, নবরত্নের জড়োয়া কাজ করা।

—কোথায় পেলে?

—মায়ের হার— বেশ ভারী।

—কেন বিক্রি করছ?

—ভাগ্নীর বিয়ে দিতে হবে।

—কত খরচ করবে?

—এই পনেরো হাজার।

—বড় বেশী হবে না? তোমার নিজের ছেলেমেয়ে আছে··· মামার বাড়ির সাহায্য···

—কল্যাণী আর গট্টুকে নিয়ে যেদিন সে বাড়ি থেকে চলে এসেছি, আজ পর্যন্ত এক পয়সার সাহায্য হাত পেতে নিইনি। জমিদারি শেষ হয়ে গেছে। তাদের অবস্থাই এখন পড়তির দিকে, পরশু আবার সেখানে ডাকাতি হয়ে গেছে।

—তাই না কি?

—হ্যাঁ, আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম। আমার হাতে একজন ডাকাত মারা পড়ল।

—আচ্ছা!

—সে আর বলতে, ডাকাতের গল্প অনেক শুনেছিলাম, সেদিন প্রত্যক্ষ দর্শন করে নিলাম।

—তোমার মামাবাড়ির কারুর···

—হ্যাঁ, এক চাকর গুলি খেয়ে সেখানেই ঠাণ্ডা হয়ে গেল, অন্য একজনের অবস্থা ভালো নয়, হয়তো কাল পর্যন্ত হেঁচকি তুলবে। দুজনের মামুলী চোট লেগেছে।

—কত লোকসান হল?

—দেড় লক্ষ টাকার গয়নাগাঁটি নিয়ে গেছে, বেশ বড় লোকসান হয়ে গেল।

—হ্যাঁ তা তো বটেই।

—আমি এইজন্যে বেশী চিন্তিত।

—কেন?

—আরে সেই হারের কথা···

—হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়ে এসো, দেখে নেব··· ডাকাতের সংগঠন, সে যুগের কম্যুনিজম। পয়সাওয়ালাদের লুটে নিয়ে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া।

—আমি এর মধ্যে সামন্তবাদের আভাস পাচ্ছি, ডাকাতেরা বলশালী হবার পর রাজা হয়ে বসত।

—তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পার মত নগর রাজ্যকে নষ্ট করে

সামন্তরা জনতাকে এক নতুন আহ্বান জানিয়েছিল, পৃথিবীতে সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ো, লাঙল যার জমি তার, সামন্ত কেবল তার রক্ষক তাই সে চাষার কাছ থেকে আনাজের ছয় ভাগের এক ভাগ আদায় করে নেয়, বাকী যা রইল সে চাষীর লাভ। ধীরে ধীরে চাষারা স্বতন্ত্র হয়ে উপার্জন করা আরম্ভ করে দিলে, প্রগতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় লেখা হল।

আমার মনে হয় যে ইতিহাসের তথ্যকে তুমি ইচ্ছেমত দুমড়ে মুচড়ে এক নতুন থিয়োরি…

—না, সে কথা নয়, ভারতের ইতিহাসের পর্যালোচনা করার পরই তার দুর্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মহেনজোদারো আর হরপ্পার ঐতিহাসিক অন্বেষণ কেবল কৌতূহল তৃপ্ত করার জন্য হয় নি। আমাদের অনেক বৈদিক পৌরাণিক কাহিনীকে নিরর্থক প্রতিপাদিত করেছে আমাদের সভ্যতা বিকাশের পরিকল্পনা। যেমন 'পুরন্দর' শব্দকে নিয়ে নাড়াচাড়া করলে বুঝতে পারবে এই শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে সেই যুগের প্রতীক। নগর রাজ্যের শাসক সামন্তদের শত্রু ছিলেন কেননা তাঁরা বাণিজ্য করতেন। আর্য সামন্তরা মিলে চাষের ব্যবস্থায় আনলে আমূল পরিবর্তন। ছোট ছোট কারিগর যারা বড় মহাজনদের আশ্রিত ছিল, তারা চাষ আবাদ করে ক্রমশ স্বাধীন হয়ে গেল। 'উত্তম খেতী মধ্যম বান' শ্লোগান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সামাজিক গঠনে পরিবর্তন দেখা দিল।

—বেশ লাগছে শুনতে, আচ্ছা চা টা কিছু খাবে?

—না, আমি বাড়ি যাব।

—ড্রিঙ্ক করে স্ত্রীর কাছে যেতে ভয় করছে বুঝি? হাঃ হাঃ

এইখানে থেকে যাও, তোমার শ্রীমতীকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি তাঁর কর্তা এখানে।

—একবার বাড়ি ঘুরে আসি, হারটা নিয়ে আসব। দামী জিনিস বাড়িতে রাখা···

—কেন? তোমার স্ত্রীর কাছেই রাখা আছে নিশ্চয়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ ওর কাছেই রাখা আছে, তবু যখন থেকে ডাকাতি হয়েছে তখন থেকে···

তুমি সেই ভীতু বামুনই রয়ে গেলে। ডাকাত সোজা তোমার বাড়ি হামলা করতে আসবে না।

মহিপাল লজ্জা পেয়ে দেঁতো হাসি হেসে বললে—না না, একবার ঘুরে আসি। আচ্ছা, আজ তোমার কাছেই থেকে যাই, বাড়িতে বলে চলে আসব।

রূপরতন কলবেল টিপলেন। চাপরাশী এসে হুকুমের জন্য দাঁড়াল।

—গাড়ি গ্যারেজ থেকে বের করতে বলো।

ছত্রিশ

দোলের আগের দিন বিকেলে, সজ্জন পেন্‌টিং করার পর ক্লান্ত হয়ে পেছনের বারান্দায় বসে চা খাচ্ছে। হঠাৎ পুরোনো দরওয়ান এসে খবর দিলে হুজুরের শাশুড়ী ঠাকরুন এসেছেন, সঙ্গে হুজুরের শালা মশাই আর একজন মহিলাও এসেছেন। নতুন সম্পর্কের

ঘোষণা শুনে সজ্জন যেন চমকে উঠল, এ কথা ঠিক যে বিয়ে করলেই আত্মীয়তার পরিধি বাড়ে কিন্তু তাই বলে একেবারে হঠাৎ ঘাড়ে এসে হাজির?

স্বর্গীয় রায়বাহাদুর লালা কন্নোমলের আর্টিস্ট নাতি আর নিজের জামাইয়ের বৈঠকখানা বেশ ভালো করে দেখছেন— বাবু জগদম্বা সহায়ের পত্নী। তিনি তাঁর নিজের পেটের মেয়ের ভাগ্যকে ঈর্ষা না করে যেন পারছেন না। তাঁর পাশেই ছেলের হতভাগিনী বউ কাঠের পুতুলের মত বসে, সামনের সোফায় শালা মশাই হাঁটু মুড়ে বাবু হয়ে, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা লাগিয়ে ধ্যানমগ্ন বসে আছেন।

সজ্জন বড়লোকী চালে ঘরে ঢুকলে। শাশুড়ীকে দেখলে, লম্বা দোহারা চেহারা, বয়সকালে নিশ্চয় সুশ্রী ছিলেন, পান দোক্তার কালিমায় ঠোঁট কালো হয়ে গেছে, চোখের কোণে একগাদা পিচুটি। দূর থেকে দর্শন করলেই বোঝা যায় যে তিনি বেশ কয়েকদিন থেকে জলের ঘটি গায়ে ঢালার কষ্ট করেননি। দ্বিতীয় মহিলাটি যদিও পর্দানশীন নয় তবু যেন কেমন চাপাচুপি ভাব, তার শ্যামবর্ণ চেহারায় দুটি চোখের চাউনি বড়ই করুণ, দুঃখে তার শ্যামবর্ণ মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেছে। শালা মশাইকে দেখেই তার যেন কেমন কেমন লাগল, মনে মনে না হেসে পারলে না। সজ্জনকে দেখে তার শাশুড়ী আর শালাজ ঝটপট দাঁড়িয়ে উঠলেন। শাশুড়ীর ছেলের ধ্যানভঙ্গ হল, চোখ খুলে ঘাড় নীচু করে একটু হাঁটু নাড়িয়ে তিনি ধ্যানাবস্থিত মুদ্রায় বসে এমনভাবে ভগ্নিপতির দিকে তাকালেন যেন শিব তাঁর তৃতীয় নেত্র খুলে ভস্ম করে দেবেন।

সজ্জন বিনয়ের অবতার হয়ে হাত জোড় করতেই শাশুড়ী ঠাকরুন হাত তুলে অঢেল আশীর্বাদ ঢেলে দিলেন।

—আমার মেয়ে নন্হী (খুকী) পূর্বজন্মে অনেক পুণ্যি করেছিল বাছা, তাই এজন্মে তোমার মত ঘর বর পেয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি আমরা তোমার মত ধনীমানী ব্যক্তির পায়ের ধুলোও নয়। বলতে বলতে শাশুড়ী ঠাকরুন কোমরে গোঁজা রুমাল-বাঁধা আংটি বের করে সজ্জনের দিকে হাত বাড়িয়ে—এই…

—এ আবার কি?

—এটা নিতেই হবে। আচার-বিচার মেনে বিয়ে করলে কত কী হত—দেনাপাওনা, আশীর্বাদ, গায়ে হলুদ—তুমি বাছা আমাদের কানাকড়িও খরচ হতে দাওনি—শাশুড়ী ঠাকরুনের পিচুটি ভরা চোখে বাৎসল্য রস ঝিলিক মারলে। জামাইয়ের ডান হাতের দামী পান্নার আংটির পাশে সস্তার পাতলা টিলেঢালা আংটি আঙুলে গলিয়ে দিয়ে আশীর্বাদের ঝুড়ির বাদবাকী সবটুকু উজাড় করে দিলেন। শাশুড়ীর ব্যবহার তার মোটেই ভালো লাগল না। মাতৃস্নেহের নাটক তিনি ভালোই করলেন, কিন্তু জামাতাকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না।

—হরি ওম্ ব, শালা সায়েব সমাধিভঙ্গ করে চারিদিকে তাকিয়ে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিটমিটে চোখে ভগ্নিপতিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। রোগা পাণ্ডুবর্ণ দুঃখী শালাজ বেচারী মাথা নীচু করে জড়সড় হয়ে বসে আছে।

—নন্হা (খোকা), ভগ্নিপতির মুখমিষ্টি করাও, এমন করে দেখছ কি? (সজ্জনকে) ছোটবোন তো. বড় ভালোবাসে। আমার

মেয়েও দাদা বলতে অজ্ঞান। কি আর বলি তোমাকে বাছা, ভগবানের মার দুনিয়ার বার···

বাইরে পোর্টিকোতে গাড়ি এসে দাঁড়াল, দরজা খোলার আওয়াজ শোনা গেল। সজ্জন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলে, চোখেমুখে খুসী উপচে উঠল, দরজার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাল। চিকনের শাড়ি, হাল্কা পেস্তা রঙের সাদা গরম ব্লাউজের ওপর হাল্কা চকলেট রঙের শাল, পায়ে সরু পট্টির চটি পরে কন্যা সত্যিই মোহিনীরূপে দেখা দিল।

মাস্টার জগদম্বাসহায়ের স্ত্রী আজ কতদিন বাদে তাঁর সন্তানকে দেখলেন। চাল-চলন হাবভাব, সব যেন বদলে গেছে কিন্তু বাড়ির লোকদের দেখে তাকে শিশুর মত খুসীতে লাফিয়ে উঠতে দেখে তিনি যেন তাঁর মেয়ের স্বভাবের বিষয় খানিকটা আশ্বস্ত হলেন। খুকী তার মায়ের হাজার দুর্ব্যবহারের পরও সেই খুকীই রয়েছে। মা, মায়ের চেয়ে বেশী পাণ্ডুবর্ণ উদাস পাথরের মূর্তি বউদিকে দেখে কন্যার চোখে যে আনন্দমিশ্রিত অশ্রু চিকচিক করে উঠেছে, সেই দৃশ্য সজ্জনের মানসপটে যেন বড় মর্মান্তিক চিত্র এঁকে দিলে। রক্তের সম্পর্ক যতই কঠিন ততই হয়তো সহজ। কত ভঙ্গুর তার টান অথচ কত মজবুত। কন্যার দাদা সোফায় যথাবৎ বসে আছেন, মাঝখানে এক-আধবার আধখোলা চোখে তিনি দেখার চেষ্টা করলেন, আম্মা আর ননহীর মিলন দৃশ্য, এই অসার সংসারের মায়াকে বেশীক্ষণ না দেখে তিনি আবার ধ্যানে লীন হয়ে গেলেন।

কন্যা বউদিকে জড়িয়ে ধরল। মার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বললে। দাদাকে প্রণাম করলে কিন্তু তিনি নিশ্চল, সমাধিমুদ্রায় তাঁর ভ্রূ এমন কোঁচকানো যেন একটি শূন্যি মানে একেবারে গোল, যেন কার্টুনের ছবি!

—এ শালা সত্যিই গালাগালের আসল ব্র্যাণ্ড শালা— সজ্জন আপন মনেই ঠাট্টা করে হাসল।

সজ্জনের শাশুড়ী মেয়ের গলায় মটর মালা পরাচ্ছেন, সে দৃশ্যে আন্তরিকতা আর পবিত্রতার সম্পূর্ণ অভাব।

—হরি ওম্‌, বজরঙ্গবলি, শালা সায়েব সমাধি থেকে জাগলেন। গোল গোল চোখ মটরের দানার মতই স্থির নয়। আম্মা বললেন— আরে নন্‌হা, বোনের বাড়ি বেড়াতে এসে চুপচাপ বসে···

—হ্যাঁ, মিস্টার সজ্জন বর্মা, আপনার মহলে বসে ধূমপান করা যায়? বিড়ি ধরাতে পারি কি?

—দাদা, কি যা-তা বলছ? বিড়ি ধরাতে হয় ধরিয়ে নাও, কন্যা ভাইকে সচেতন করার জন্যে বললে।

সজ্জন তার গাউন থেকে সিগারেট কেস আর লাইটার বের করে শালার দিকে বাড়ালে। শালা বাহাদুর বললেন, উঁহুঃ আপনার বাড়ির জলস্পর্শ করতে মানা।

সজ্জন সিগারেট কেস পকেটে রেখে নিয়ে কন্যাকে বললে—আমি তাহলে চলি ডার্লিং, আমার একটু কাজ আছে, তুমি মাকে···

—বাছা, তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল। সজ্জন যেতে যেতে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। বনকন্যা ঝট করে স্বামীর মুখের ভাব বোঝার চেষ্টা করলে, মুড ভালোই মনে হচ্ছে। শাশুড়ী জামাইকে তার পাশে বসার আগ্রহ প্রকাশ করলেন কিন্তু সজ্জন মাথা নেড়ে বললে— আমার পায়চারি করা অভ্যেস। মাস্টার জগদম্বাসহায়ের স্ত্রী কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতেই শালা সায়েব তাঁর ভগ্নীকে ডাকলেন— নন্‌হী।

—হ্যাঁ।

—আজ আমার এখানে আসার কারণটা বুঝতে পেরেছ? কাল রাত্তিরে শঙ্করের সঙ্গে এই নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ তর্কাতর্কী হয়ে গেল। সে বললে যে বোনের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া আমার কর্তব্য, আমি বললুম যে আমি কখনো সেদিক মাড়াব না। এই কথার ওপর আমাদের মধ্যে জেদাজেদী হয়ে গেল। শেষকালে বেগতিক দেখে আমার আলীগঞ্জের হনুমান মন্দিরের হনুমানজী সাক্ষাৎ এসে মিটমাট করিয়ে দিলেন।

সকলে তার দিকে স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে আছে। কন্যার মা মেয়ের সঙ্গে দুটো প্রাণের কথা কয়ে নেবার জন্য আতুর কিন্তু নন্‌হা মশাই কথা শেষ করার পাত্র নন।

—হ্যাঁ জানো নন্‌হী, আগের থেকে আমি এখন অনেক উঁচু দরের ভক্ত, সিদ্ধি এসে গেছে হাতে, আমি যদি ইচ্ছে করি তাহলে এই মুহূর্তে তোমার বাড়ির সাজসজ্জা আমার বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি কিন্তু না থাক, মায়ামোহের চক্করে পড়ে কোন লাভ নেই। যেদিন আমার কাছে সিদ্ধি দেবী এসেছিলেন সেদিন তিনি কানে কানে বলে গিয়েছিলেন যে যদি আমার মনস্কমানা প্রবল হয়, তাহলে প্রতিদিন এক হাজার টাকার করকরে নোট বালিশের তলা থেকে পাব। আমার জায়গায় যদি মা হতেন তাহলে ঠিক লোভের ফাঁদে পা দিয়ে বসে থাকতেন কিন্তু আমার গুরু বজরঙ্গবলী কানে কানে বলে গেছেন— বিষ্ণুসহায়, মায়ার ফাঁদে পা বাড়িও না, তার চক্করে পড়ে বৃথাই জীবন নষ্ট হবে, আমি তোমাকে ভগবানের দর্শন করিয়ে···

—নন্‌হে, কি বাজে বকবক করছ? একটু কিছু কাণ্ডজ্ঞান— কন্যার মা বললেন।

—তুমিই যখন তখন বাজে কথা বলতে থাক, তুমি আমার সিদ্ধিকে অবিশ্বাসের চোখে দেখ? সজ্জনের শালা বাহাদুর তার মায়ের দিকে চেয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন। বউয়ের পাণ্ডুবর্ণ চেহারা ভয়ে শুকিয়ে গেছে— আম্মা, বলে দিন আপনি বিশ্বাস করেন, বউ দয়ার ভিক্ষা চাইলে। নন্‌হে মশাই দাঁতে দাঁত চেপে মায়ের দিকে এগুচ্ছেন দেখে সজ্জন তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে বললে— চুপ করে বসে থাকুন এখানে।

ভগ্নিপতির রুদ্রমূর্তি দেখে শালা মশাইয়ের পুরুষত্ব শান্ত হয়ে গেল, মুখের মধ্যেই ধীরে ধীরে বকবক করা শুরু করলেন— আমাকে বিড়ি খেতে দেবে না। আমি শঙ্করলালকে গিয়ে বলছি এখুনি, আমার গুরু তোমাকে দেখে নেবেন। দাঁতে দাঁত পিষে ফোঁস ফোঁস করে তিনি নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন।

মাস্টার জগদম্বাসহায়ের ধর্মপত্নী নিজের মেয়েকে সম্বোধন করে বললেন— সেদিনকার পর থেকে এর এই অবস্থা হয়েছে। মিনিটে মিনিটে উৎপাত করে মেরে ফেলল। আমরা যে কীভাবে দিন কাটাচ্ছি এক ভগবানই জানেন। সংসারের হাড়ির হাল তোমায় আর কত শোনাব··· (সজ্জনকে) এমন মানুষের সঙ্গে এক ছাদের তলায় বাস করা চাট্টিখানি কথা নয়। প্রত্যেকের সংসারেই জোড়াতালির ব্যাপার আছে, আমি একা কি কসুর করেছি বলতে পারো? তুমিই ন্যায় বিচার করো বাছা আমার।

—এসব কথা এখন থাক আম্মা। কন্যা যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে মাকে বললে।

বিষ্ণুসহায় (নন্‌হাবাবু) হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে থপ করে টেবিলে রাখা মিষ্টির হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, মা কন্যার কথার উত্তর

দিতে গিয়ে ছেলের কাণ্ড দেখে ধমক দিয়ে উঠলেন— নন্‌হা, মাথায় কি একেবারেই গোবর পোরা? ছোট বোনের বাড়ির…

—সব মায়া, মিথ্যা, চুপ করো— বলে বিষ্ণুসহায় একসঙ্গে পাঁচ-ছয়টা মিষ্টির টুকরো মুখে পুরে দিলেন।

সজ্জনের শাশুড়ী করুণ দৃষ্টিতে জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন— এই অবস্থা— এর জন্যে আমরা ত্বদণ্ড শান্তিতে চোখবুজে ঘুমুতে পারি না, বাড়ির কোন কাজ এর জ্বালায় করার জো নেই। রান্নাঘরে ঢুকে রান্না করা খাবার লাথি মেরে ফেলে ছত্রাকার করে দেয়, কখনো বাড়া ভাত বাইরে কুকুরকে খাইয়ে আসে… তোমাকে আর কি বলি বাছা, পেটের ছেলের হাতে মার খেয়ে খেয়ে হাড়ে হাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে। প্রাণ কোনগতিকে শরীরে আটকে আছে এই পর্যন্ত। নন্‌হী তুই নিজের বাবাকে জেলখানায় পাঠিয়েছিস, এবার ভাইকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে আমার জন্যে একটু বিষ কিনে এনে দে, তাহলে— আম্মার গলা বন্ধ হয়ে এল, চোখের জল গড়িয়ে পড়ল, শাড়ির আঁচল দিয়ে মোছার সঙ্গেই কিছুটা পিচুটি বেরিয়ে যেতে, চোখ পরিষ্কার হয়ে গেছে। কন্যার কাঁধে হাত রেখে সজ্জন গলা নামিয়ে বললে— এঁকে বাবাজীর কাছে পাঠিয়ে দেব?

কন্যা মনের বেদনা আর অনিশ্চয়তার সর্পিল পথের কথা ভেবে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে— আম্মাকে জিজ্ঞেস করে দেখো।

কথাটা আম্মার কানে যেতেই তিনি তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন— ভিমরতি হয়ে গেছে, বাড়িতে কেউ পুরুষ নেই তাই বাঘ হয়ে… হঠাৎ তিনি জামায়ের পায়ে মাথা খুঁড়তে লাগলেন। সজ্জন হকচকিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি শাশুড়ীর হাত ধরে বললে— একি? একি? উঠুন।

—বাছা, আমার হাতের নোয়ার দিব্যি, ওঁকে ছাড়িয়ে এনে দাও। ভগবান তোমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন, তিনি আমার জীবনের একমাত্র আশা ভরসা, তাঁর জন্যে কত দুঃখই না সয়েছি।

—বাবা আইনের হাতে বন্দী, আমরা এতে কিছুই করতে পারি না।

—আমি তোমাকে কিছু করতে বলিনি নন্‌হী। যার জোর পেয়ে তুমি বাপকে জেলখানায় পাঠালে, সে তখন আমার কেউ ছিল না বটে তবে আজ সে আমার জামাই, পুত্রস্থানীয়, তার ওপর আমারও অধিকার আছে, আমি তার মাতৃস্থানীয়া।

রাগে কন্যার চেহারা লাল হয়ে উঠল। কন্যার ক্রোধ দেখে সজ্জন নিজেকে সংযত করে যথাসাধ্য সহানুভূতির স্বরে শাশুড়ীকে বোঝাল— আপনার অধিকার নিশ্চয় আছে, আমি ষোলো-আনা স্বীকার করছি, কিন্তু এ বিষয় কিছু না করলে ভালোই করতেন, আমার হাতে সত্যিই কিছু নেই। কোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে কেস চলছে।

—সকলে বলছে তুমি তাঁকে জামীনে খালাস করাতে পারো, তোমার সব জায়গায় চেনাশোনা…

স্বামীর দিকে চেয়ে বনকন্যা মাকে বললে— তোমার পায়ে পড়ি, আর যা দরকার হয় বলো কিন্তু কোন অন্যায় কাজ এঁকে করতে বোলো না।

—যদি একবার ভুল হয়…

—বাবা ভুল করেননি, অপরাধ করেছেন, মা।

—অপরাধ? রাগে গলা পঞ্চম স্বরে চড়িয়ে মা বললেন— এসব তোর কাকীমার কীর্তি, তাকে ধরিয়ে দিতে পারিস না?

হারামজাদী যেমনি সারা জীবন আমাকে জ্যান্তে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেয়েছে (ডুকরে কেঁদে) আমার পাথর চাপা কপাল, হে ভগবান —যেমন কুকাজ করেছে তেমন দগ্ধে দগ্ধে মরে হারামজাদী, গায়ে পোকা পড়ুক।

—জল, শাশুড়ীর গলা শুকিয়ে কাঠ, তাড়াতাড়ি সজ্জন কলবেল টিপে চাকরকে জল আনতে বলল। শালা বাহাদুর এক হাতে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে অন্য হাতে গলার মালিশ করছেন, তার এই মুদ্রা দেখে সজ্জনের যেন মাথা কাটা যাচ্ছে, দরজার পরদার ওপাশে বাড়ির চাকরেরা সকলেই তার শ্বশুরবাড়ির এই অদ্ভুত জীবদের দেখে টিটকিরী মারছে হয়তো। নোংরা শাড়ি পরা শাশুড়ী পাগল শালা— উফ্ এরা কন্যার মা ভাই, এদের সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রাখতেই হবে কেননা কন্যা তার স্ত্রী। কন্যা আর তার দুজনের মান সম্মান সব চুলোয় গেল। অভাব অনটনে মানুষ কন্যা, তবু সে কত ধীর, স্থির, নম্র। বড়লোকের চাকরেরা মনিবের চেয়ে বেশী শকুনির নজর রাখে, তারা পর্যন্ত কোন দিন কন্যার ব্যবহারে কোন ত্রুটি বার করতে পারেনি। আজ মা আর ভাই এসে কন্যার এতদিনের প্রভাবকে এক মিনিটে ভেস্তে দিলে।

চাকর ঘটিতে জল রেখে গেল। নন্‌হা বাবুর এখনো এক হাতে হাঁড়ি, অন্য হাতে জলের ঘটি নিয়ে ঢকঢক করে বেশ খানিকটা জল খেয়ে তৃপ্ত হয়ে জোরে এক ঢেঁকুর তুলে বললেন— জয় বজরঙ্গবলি (ভগ্নিপতির দিকে চেয়ে) আপনি সাধনা-টাধনা করেন না কি ?

প্রশ্ন শুনে সজ্জন থতমত খেয়ে গেল। চাকর তখনো ঘরে দাঁড়িয়ে, তার সামনে উত্তর দেওয়াটা ঠিক হবে না ভেবে কন্যাকে

ডেকে আলাদা একদিকে নিয়ে গিয়ে বললে— কন্যা, দয়া করে এদের হাত থেকে আমায় বাঁচাও, যদি কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করতে হয় তো বলো এখুনি…

বাইরে পোর্টিকোতে গাড়ি এসে থামল। সজ্জনের শরীর যেন আনচান করে উঠল, যদি বাইরের কেউ হয় তাহলে এই শালাকে দেখার পর সে কি ভাববে! চাকর এসে খবর দিল— ডাক্তার মেমসায়েব এসেছেন, হুজুর।

—সজ্জন কন্যার দিকে তাকিয়ে—শীলা এসেছে, যাও তুমি ওকে…

—তুমি এগিয়ে গিয়ে— আমি এখুনি এদের বিদেয় করে দিচ্ছি। সজ্জন বারান্দায় বেরিয়ে দাঁড়াল।

—হ্যালো, ডাঃ শীলার স্বরে যেন কত ক্লান্তি।

—হ্যালো শীলা, রুগীদের ছেড়ে আজ অসময় এখানে যে বড়?

—জ্যাপলিং রোডে এক রুগীকে দেখতে এসেছিলাম, ভাবলুম এক মিনিট দাঁড়িয়ে তোমার খবরাখবর নিয়ে যাই।

—এসো, ওপরে গিয়ে বসা যাক।

—না, বাইরে এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

পোর্টিকোর বাইরে ফুলের কেয়ারীর পাশ দুজনে চুপচাপ হাঁটছে। বাগানে ঢুকতেই সুন্দর লতাপাতা দিয়ে ছাওয়া বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরী আর্চের কাছ পর্যন্ত এসে শীলা যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল— দুর্জন— করুণ দৃষ্টিতে বড় মর্মান্তিক আর্তনাদের মত শোনাল— তোমার বন্ধুটি কি আমার সঙ্গে আর কোনদিনই দেখা করবে না? সজ্জনের মনের কোণে কোথায় যেন অব্যক্ত যন্ত্রণা আবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠল— তোমার সঙ্গে ইদানীং দেখা হয়নি?

—ক মাস হয়ে গেল, সেই জেঠীর বাড়িতে খাওয়ানো-দাওয়ানোর দিন দেখা হয়েছিল, বাস্, ইট ওয়াজ ইন জানুয়ারি, বোধহয় 25 তারিখ ছিল।

—কোন বিশেষ কথাবার্তা হয়েছিল?

—কি আর বলব? ওর স্ত্রীর প্রতি আমার কোন নালিশই নেই তবে এ কথা ঠিক মহিপালের মত জিনিয়াসকে সে চিনতে পারলে না। ইদানীং ওর চেহারা কেমন খারাপ হয়ে গেছে। কালকে দূর থেকে দেখলুম, অমীনাবাদের রাস্তায়— আর যেন সহ্য করতে পারছি না— বলতে বলতে শীলার স্বর বুজে এল, ব্যাগ খুলে রুমাল বার করলে।

শীলার কাঁধে হাত রেখে সজ্জন তাকে সান্ত্বনা দিলে— ডোণ্ট বী ফুলিশ শীলা, আমি জানি মহিপাল তোমায় কত ভালোবাসে, তোমাকে ছাড়া তার জীবন শুকনো মরুভূমি যেখানে আছে কেবল জীবনান্ত তৃষ্ণা।

—আমি মিসেস শুক্লার অধিকারের অংশীদার হতে চাই না কিন্তু আমি ফীল করি তার স্বামীর ওপর আমার কিছুটা অধিকার আছে বৈকি।

সজ্জন গভীর চিন্তায় ডুবে গেল, একদিকে পরিণীতা স্ত্রী আর অন্যদিকে প্রণয়িনী, অধিকারের গোলকধাঁধার মধ্যে দুটি পাখি ডুকরে কেঁদে মরছে। প্রেম কি শাস্ত্রের বাঁধাধরা নিয়মের দাস? প্রেমের কণা সঞ্চয় করে কেউ যদি তার প্রিয়তমকে পৃথিবীর সমস্ত বাধা ঠেলে দিয়ে পেতে চায় তাহলে? হঠাৎ তার শাশুড়ীর কথা মনে এল, যিনি এখুনি তাঁর স্বামী আর ছোট জায়ের প্রেমকাণ্ডর বর্ণনা করছিলেন কিন্তু এ প্রেম তার মত কলুষিত,

ঘৃণিত নয়। যত নির্মমই হোক-না-কেন তবু এ যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা...

—তুমি ওকে নিশ্চয় বোলো। শীলা বললে।

—আমি ওকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। আমি কাল সকালেই তার কাছে যাব।

—এ নিয়ে কারুকে কিছু বলার দরকার নেই, তোমার স্ত্রীকেও কিছু বোলো না, বুঝলে?

—না না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো. তুমিও এ নিয়ে বেশী ফীল কোরো না, কেমন?

—আচ্ছা, তোমার ওয়াইফ কেমন আছে? সজ্জন উভয়সংকটের মধ্যে পড়ল।

কন্যা ভেতরে আছে জানতে পারলে হয়তো এখুনি শীলা গটগট করে তার সাথে দেখা করতে বাড়ির ভেতরে চলে যাবে। বিচিত্র শালা আর অদ্ভুত শাশুড়ীর কথা ভাবতেই তার বুকটা যেন কেঁপে উঠল।

—তুমি ভাবছ কেন শীলা, তুমি তো জানো মহিপাল একজন বড় আর্টিস্ট আর স্কলার কিন্তু বড় অস্থির প্রকৃতির। আমি তোমায় কথা দিচ্ছি তাকে নিশ্চয় তোমার কাছে নিয়ে আসব।

—ওর শালার বিয়েতে কেউ আমাদের বিষয় পাঁচজনের মধ্যে কিছু বলছিল। ওর ওয়াইফ সেই নিয়ে বাড়িতে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দেয়, সে সময় দুদিন মহিপাল আমার কাছেই ছিল।

—আচ্ছা! আমি এ-সবের কিছু জানি না।

তুমি তখন মথুরা গিয়েছিলে। তোমায় সংকেত দিয়ে দিলাম যাতে দেখা হলে ভালোভাবে তাকে হ্যাণ্ডেল করতে পারবে।

আচ্ছা তাহলে চলি, এবার ছ'পা এগিয়ে শুকনো গলাকে কোনমতে ঢোক গিলে ভিজিয়ে বললে— মহিপাল বড় ভালো মানুষ, ইদানীং যেন বড় বেশী চালাক হবার চেষ্টা করছে। জবরদস্তি একটা মিথ্যে ভড়ংয়ের আবরণ গায়ে দিয়ে কতদিন ঘুরতে পারবে? আমার কি মনে হয় জানো? বেশীদিন এই আবরণের মধ্যে থাকলে তার দম বন্ধ হয়ে আসবে, সহ্য করতে না পেরে আর-একটা নতুন কিছু না বাধিয়ে বসে থাকে।

সজ্জন পোর্টিকোর দিকে এগুতে এগুতে সান্ত্বনা দিয়ে বললে— শীলা, মহিপাল আমাদের একটুও বদলায়নি, সেই মাটির মানুষই আছে। কালকে হ্যাঁ কালই তো এখানে সে সকালবেলাই এসে হাজির হয়েছিল— আর তুমি বললে বিশ্বাস করবে না রাত দশটা পর্যন্ত আমরা বসে বসে কথা বলছিলুম। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ, জাতির ব্যাপার, আর্য অনার্যর সভ্যতা, তার মধ্যে সেই পুরোনো উৎসাহ দেখতে পেলাম। সে বক্তা ছিল তার আমি শ্রোতা। কতক্ষণ একনাগাড়ে অনর্গল বকে যাবার পরও সে ক্লান্তি অনুভব করেনি।

—আজকাল কিছু লিখছে?

—আমার মনে হয় আজকাল সময়াভাবে লেখা বন্ধ। আমি তোমার কথার অর্থ বেশ বুঝতে পারছি শীলা, মহিপালের স্বাস্থ্য ভালোই আছে। আমি নিজেই কখনো কখনো মাসখানেক পরে তুলি ধরি— এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

—আচ্ছা তা হলে চলি।

সজ্জন শীলাকে গাড়িতে চড়িয়ে ফিরে এসে যা দেখলে, তার মাথা একেবারে বোঁ করে ঘুরে গেল। বৈঠকখানার গালচের

ওপর মিষ্টির হাঁড়ি টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে আর কন্যার কানের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কন্যার বউদি নিজের আঁচল দিয়ে ননদের গাল পরিষ্কার করে দিচ্ছে, আম্মা দাঁড়িয়ে দেখছেন আর শালা মশাই সমাধি মুদ্রায় বসে আছেন।

জামাইয়ের চেহারা দেখা মাত্র শাশুড়ী মেয়ের জন্যে বিচলিত হয়ে পড়লেন— দেখো দিকিন বাছা, আমার কপালের গেরো— তুমি একে পাগলা গারদেই পাঠিয়ে দাও। অনেক উপকার করেছ, আর-একটা উপকার করে দাও, শান্তিতে মরতে পারি যাতে।

ইরানী গালচের দুরবস্থা দেখে শালা সায়েবকে কষে বেশ দুঘা বসিয়ে দেবার কথা সজ্জনের মনে এল। ভাঙা মাটির বাসনের সঙ্গে মানুষের মৃত্যুর যোগাযোগের অলক্ষুণে কথা তার মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারছে। শাশুড়ীকে উত্তর না দিয়ে কন্যাকে বললে— কন্যা, মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে, এবার ভেতরে যাও।

—তা বাছা, তোমার দরবারে আমাদের প্রার্থনা তাহলে মঞ্জুর হল না?

—আজ্ঞে না, অন্যায় কাজে আমি কাউকে সাহায্য করি না। কন্যা, যাও।

—বউদিকে আমি নিজের কাছে রেখে নিচ্ছি আম্মা, পরে পৌঁছে দিয়ে আসব।

—না না ঢের হয়েছে, আমাদের মত পাপী তাপী ঘরের মানুষ তোমার মহলে থাকলে সব অশুদ্ধ হয়ে যাবে না? নন্‌হে চল, ওঠ, পেটের মেয়ে যখন পর হয়ে গেল তখন কাকে আর দোষ দিই! যে মেয়ে নিজের বাপকে গারদে পাঠাতে পারে তার কাছে আশা করে আসাই ভুল হয়েছে। যাবার সময় একটা

কথা বলে দিচ্ছি, অতি বাড় বেড়োনা, ঝড়েতে মুড়াবে, কাল যদি তোমার সোয়ামী কিছু ভুল করে তখন…। কন্যার সংযমের বাঁধ এবারে ভেঙে গেল।

—এঁর মত মানুষ ভুলেও কারুর ভাল বই মন্দ করবে না বুঝলে? এঁর এ ধরনের ভুল কখনো হতেই পারে না। এঁর মত মানুষ পৃথিবীতে কটা…

—থাক্, থাক্ ঢের হয়েছে— চুপ করো কন্যা, ভেতরে যাও। সজ্জন চাকরকে ডাকার জন্য সুইচ টিপল।

—রামগুলাম, এঁদের জন্য টাঙ্গা ডেকে নিয়ে এসো আর ঘরের জঞ্জাল পরিষ্কার করে ফেলো।

সজ্জ:নের মুড একেবারে খারাপ, এ সময় সে জনসাধারণের দুঃখ বা মানসিক বিকার থেকে অনেক দূরে তার নিজস্ব সীমাবদ্ধ সামাজিক স্তরের কথা ভাবছে। সে কন্যার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে, রামগুলামকে সেখানেই থাকার আদেশ দিয়ে গেল।

বাইরে গ্যালারী থেকে এক চাকর বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দিলে যাতে দুই চাকরে মিলে পাগলের ওপর কড়া নজর রাখতে পারবে, আবার না কোন কীর্তি করে রাখে।

এই ঘটনার পর উচ্ছ্বসিত আবেগে ভেঙে পড়ল, কন্যা, একরাশ বোবা কান্না যেন বুকে জমাট বেঁধেছে। সজ্জন তার সায়েবীআনা ন্যাকরা দেখাতে গিয়ে ধমক খেলে। স্বামীর সোহাগ-সন্তুষ্ট কন্যা তার প্রিয়তমের মন থেকে এই বিচিত্র ঘটনার দাগ মুছে ফেলতে চায়। প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে কন্যা এদিক সেদিকের অনেক কথা তুললে— সেলাই বোনা শিখতে আসে যে মেয়েরা তাদের টুকিটাকি

গল্পগুচ্ছ, আরো কত অসংখ্য বৈচিত্র্যহীন ঘটনার বর্ণনার যেগুলো সাধারণতঃ মনে থাকার কথা নয়, তবু ঘুরে ফিরে সেই বিকেলের প্রসঙ্গই যেন দুজনের বাকশক্তি রুদ্ধ করে দিয়ে যাচ্ছে।

কন্যা মনে মনে আত্মবিশ্লেষণ করছে— চিন্তার মাঝে সে যেন সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। বাবাকে তাঁর অপরাধের জন্য দণ্ডিত করতে সাহায্য করে সে কি কোন অন্যায় কাজ করে ফেলেছে? একই প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে তার মানসিক শান্তি নষ্ট করছে, সে কি সত্যিই অপরাধী? তার কাছে সেলাই বোনা যারা শিখতে আসে, তাছাড়া শিক্ষিত মহিলা, যাদের সমাজসেবায় বিশেষ রুচি আছে সকলেই একবাক্যে বলে কন্যা বড় অধার্মিক— অভারতীয় কাজ করে ফেলেছে। বাবার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস করা মানেই কি পাপ? আজ মাও বেশ স্পষ্ট করে তাই শুনিয়ে গেলেন। সজ্জন যখন বাইরে ডাঃ শীলার সঙ্গে কথা বলছিল তখন ভেতরে তার মা তাকে শাসাচ্ছিলেন, বড়লোকের খেয়াল আজ চোখে ভালো লেগেছে কাল যদি ভালো না লাগে তখন পুরোনো আবর্জনার মত লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে। নিজের ঘরের বিয়েতে বনিবনা হয় না— এ তো বেজাতের বিলিতি বিয়ে, এর ভরসা নেই। প্রথমে কন্যা মার কথা গায়ে মাখল না কিন্তু যখন তিনি ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে গেলেন, তখন সে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেছিল, তার মা আজ তাঁরই সন্তানের স্বামীভাগ্য আর ঐশ্বর্য দেখে হিংসে করছেন। মায়ের সংকীর্ণ মনোবৃত্তির কথা ভাবতেই রাগে সে নিজের ঠোঁট নিজেই বেশ জোরে কামড়ে ফেললে।

চিন্তার খরস্রোতা নদী বয়ে চলেছে, দাদা মিষ্টির মাটির হাঁড়ি সোজা তার মুখে ছুঁড়ে মেরেছিল। তার ভাগ্যি ভালো যে মুখে

না লেগে চেয়ালের হাড়ে জোরে লাগার পর কানের পাশ দিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে সেটা ফেটে চুরমার হয়ে গেল। গাল রক্তারক্তি হয়ে গেছে, জীবনে এই প্রথম সে দাদার হাতে মার খেল। মা বাবা কাকীমার হাতের মার খেতে সে অভ্যস্ত, বিধবা কাকী প্রায়ই তাকে পিটিয়ে তাঁর গায়ের ঝাল মেটাতেন। কাকীমার হাত ওঠাবার সঙ্গেই বাড়িতে কুরুক্ষেত্র আরম্ভ হয়েছিল, মেয়ের দিক হয়ে বলতে গিয়ে বাবার হাতে আম্মার কম দুর্গতি হয়নি, চেলা কাঠের মারে পিঠে কালশিটে পড়ে গিয়েছিল। জন্মেস্তক সে তার বাড়িতে মেয়েদের ওপর হাত তোলার রেওয়াজ দেখেছে, যখন মায়ের গ্রহ অনুকূল ছিল তখন কাকীমা ছড়ির মার খেতে খেতে আধমরা হয়ে কাতরাতেন, তারপর কাকীমার গ্রহ প্রবল হতেই আম্মার সেই হাল হল। তার অভাগী বউদিও মার খাচ্ছে তার স্বামীর হাতে। কন্যার স্বর্গীয়া খুড়তুতো ভাইয়ের বউ, মৃত্যুর এক বছর আগে পর্যন্ত, যখন থেকে কন্যার মার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সে তার বাবার পশুবৃত্তির কবলে পড়েছিল, খুড়শ্বশুর খুড়শাশুড়ী সকলে মিলে তাকে বেদম মার দিত। আজ বিবাহিতা শ্রীমতী বনকন্যা দাদার হাতে মার খেয়ে সেই ঘটনাকে মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে। (দাদাকে সে ভীষণ ভালোবাসে) কিন্তু এই সুযোগে সে বাপের বাড়ির মার খাওয়ার ইতিহাস মনে করছে।

দামী কাঠের কাজ করা পালঙ্কের ওপর ডানলপের তোষক পাতা বিছানায় কন্যা আরাম করছে। এত বড় ঘর, ঐশ্বর্য, চাকর-বাকর, মান সম্মান সব আছে কিন্তু তার নিজের বিগত জীবনের কালিমার কথা ভাবলেই সে যেন আঁৎকে ওঠে, উফ্ লজ্জায় তার

মাথা কাটা যাচ্ছে। স্বামী স্ত্রী দুজনের মনে একই সিন্ধু-মন্থন চলছে। তাদের ভালোবাসার অস্তিত্বটা আপনজনের গরমিলে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে না তো?

—পরিবারের বন্ধন এক অদ্ভুত ডোরে বাঁধা, কেবল গাঁঠের পর গাঁঠ জুড়েই চলে। কন্যা বললে।

—কেবল ভাবুক আর ভদ্র লোকেদের সম্বন্ধেই এ কথা খাটে—বলতে বলতে সজ্জন পালঙ্কের পাশে রাখা চেয়ারে বসে পাদুটো পালঙ্কের ওপর তুলে দিলে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু মা-বাপ-ভাই-বোন এসব সম্বন্ধ কখনোই নাকচ করতে পারা যায় না। ধরে নাও যদি কাল আমাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি অন্য মেয়েকে বাহুডোরে ধরা দাও তা হলে…

—বলে ফেলো। যা ইচ্ছে বলে যাও, তোমার মিষ্টি ছুরির মত কথা শুনতে মন্দ লাগছে না। কন্যা হেসে ফেললে— আমি কেবল উপমা দিচ্ছিলাম এরকম হতেও তো পারে? আজ চার চক্ষুর মিলন, কাল বিয়ে, পরশু ডাইভোর্স, এর পরে তারা জীবনে কখনো তাদের সম্পর্কের কথা ভুলতে পারবে?

—আমার মতে তা কখনোই সম্ভব নয়। মহাকবি বায়রনের ডাইভোর্সের পর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম গভীর থেকে গভীরতর হয়েছিল— কিন্তু এর মধ্যে আমার কথাটা উঠছে কেন?

—তুমি ঠাট্টা তামাশা একদম বোঝো না, তার মানে তোমার মনের কোণে চোর লুকিয়ে আছে না কি?

—হে প্রণয়িনী, ঠিক এই কথাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? সজ্জন অভিনয়ের মুদ্রায় হাসতে হাসতে বললে। কন্যা মুখ টিপে হাসল— এর মানে আমার মনে চোর আছে বলছ?

—হ্যাঁ ম্যাডাম, ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড···

—আমার মাথায় পাখির বাসা নেই যে অনর্গল কিচির মিচির করেই যাব, এবার···

—বলুন।

—তুমি যখন ডাঃ শীলার সঙ্গে কথা বলছিলে তখন আম্মা আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন। তাঁর কথা ভেবে এখনো হাসি পাচ্ছে, বলে কন্যা জবরদস্তি ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে আনার চেষ্টা করলে।

পরিত্যক্ত শিশুর মনোভাব বুঝতে সজ্জনের দেরী লাগল না, কন্যার মন শিশুর মতই সরল, তাকে দেখে সত্যিই মায়া হয়। সুশীল, কর্মনিপুণা, সরল গিন্নীর গালে হাত বুলিয়ে আদর করে সজ্জন বললে— কন্যা, জীবনের চলার পথে যে-কোন মোড়ে তুমি আমার পরীক্ষা নিয়ে দেখতে পারো। তোমার স্বামীর চরিত্রে অনেক দুর্বলতা থাকতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে মস্ত বড় একটা গুণও আছে। সাগরের ঢেউয়ের মত ভাসতে ভাসতে যেদিন আমি এক জায়গায় ধরা দিয়ে স্থাণু হয়ে যাব, সেদিন এই নিশ্চল পাথরকে সরায় কার বাপের সাধ্যি!

কন্যার চোখে আত্মবিশ্বাসের জ্যোতি দপ করে জ্বলে উঠল, মনের মধ্যে অজস্র ভালোবাসার কুঁড়ি বসন্তের দোলা লেগে ফুটছে, সত্যিই সে আজ কত ভাগ্যবতী!

সাঁইত্রিশ

দোলের পরদিন সজ্জনের বাড়ি খাওয়ার নেমন্তন্ন, বাবাজী আর তাঁর সুস্থ রুগীরা সকলেই নিমন্ত্রিত। চার ঘণ্টার জন্য একটা বাস ভাড়া করা হয়েছে, বাবাজী আর তাঁর মণ্ডলী তাতে চেপে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে এলেন। সজ্জনের সাজানো গোছানো বিরাট অট্টালিকায় বাবাজী সাক্ষাৎ শিবের মত পদার্পণ করলেন। মার ঠাকুরঘরে সকলের বসার ব্যবস্থা, কন্যা রান্নাঘরে ব্যস্ত আছে। সজ্জন আজ বিশেষ হাসিখুসী মুডে আছে, মা মারা যাবার পর আজ এ বাড়িতে প্রথম উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এ বেলা বাবাজী খাবেন—ওবেলা মহিপাল আর কর্নেল সপরিবারে আসবে। বাড়ির প্রত্যেক চাকরকে এক এক টাকা বখশিশ, মিষ্টি, ধুতি, জামা আর বাসন্তী রঙের পাগড়ি দেওয়া হবে।

আজ ভোরবেলা থেকে কন্যার দম ফেলার সময় নেই, চাকর-বাকর ছুটোছুটি করছে। আজকের হাড়ভাঙা খাটুনির পর কালকের ছুটির ঘোষণা কন্যা আগেই করে দিয়েছে।

মন্দির ফুল দিয়ে সাজানো, ঠাকুরের বিগ্রহে দোলের রঙ ছিটিয়ে নতুন বস্ত্র পরানো হয়েছে। রুপোর দুটি বড় বড় বাটিতে রঙ গুলে বিগ্রহের সামনে রাখা, সঙ্গে দুটো ছোট ছোট পিচকিরিও আছে। মায়ের ছবিতে বড় বড় ফুলের মালা গেঁথে টাঙানো।

বাবাজী সজ্জনের প্রসন্ন মুখ দেখে বললেন— কি রামজী, এমন সুখ এর আগে কখনো ভোগ করেছিল?

—না বাবাজী।

—গৃহস্থ আশ্রম বাকী আশ্রমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

—তা কি করে হতে পারে বাবাজী? আমার মতে সাধু-সন্ন্যাসীর জীবন সব থেকে সুখী।

সন্ন্যাসী জীবনের এক অদ্ভুত সুখ, এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই কিন্তু দেশকালকে দেখার পর আমার মতে পরম জ্ঞানের আনন্দে একা লীন হয়ে থেকে কি লাভ? কর্মযোগেই বাস্তব আনন্দ আর গৃহস্থ আশ্রম কর্মযোগের প্রধান কর্মভূমি, কি বলো রামজী?

—কিন্তু সংসার কর্মই সমস্ত দুঃখের কারণ, গৃহস্থ ধর্মেই মানুষ একে অন্যের প্রতি অত্যাচার করে, নানা পাপ কাজ করে।

—আর এই আশ্রমেই সে পুণ্যিও অর্জন করে, করতে পারে। গৃহস্থ না হলে পৃথিবীর রূপ কেমন কেমন হয়ে যাবে না? আমার মতো সবাই লাঙ্গট কষে যদি বেরিয়ে পড়ে তাহলে সৃষ্টি চলবে কেমন করে?

—না চললেও কোন ক্ষতি নেই বাবাজী, চলেই বা কি মাথামুণ্ডু হচ্ছে? অ্যাটম বোমা, হাইড্রজেন বোমা নানা বোমা দিনরাত তৈরী হচ্ছে। ভবিষ্যতে মানুষ আরো কত মানুষমারা কল তৈরী করবে। ছারপোকার মত মরার জন্যে সৃষ্টি বাড়িয়ে কিছু লাভ আছে কি? বাবা রামজী হাসলেন— ভগবান মানো? সজ্জন প্রশ্ন শুনে প্রথমটা হকচকিয়ে গেল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিলে— মহারাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। সেদিন মথুরায় গিয়ে ভগবান কৃষ্ণর বাল্যভূমি দেখার পর মনে হল

মানুষের মধ্যেই ভগবানের বাস। আমাদের দেশে রাম কৃষ্ণ ইত্যাদি যত অবতার হয়েছেন সকলেই মানুষ রূপেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

—ঠিক বলেছ রামজী, আমিও তাই মানি। ভগবান কেবলমাত্র মানুষেই নয় বরং প্রত্যেক জীবের মধ্যে সমান রূপে অবস্থান করছেন। হ্যাঁ, এ কথা বলা যেতে পারে যে মানুষের মধ্যেই চেতনা আছে। ব্যাসদেব বলে গেছেন মানুষই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তা হলে মানুষের মত মহান জাতি শেষকালে আত্মঘাতী হয়ে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? এ বিষয় ভাবাও কষ্টকর, বেদনাদায়ক, রাম সর্বব্যাপী— তাঁর ওপর আস্থা রাখাই মঙ্গল।

সজ্জনের মনে কৌতূহল জেগে উঠল কিন্তু প্রশ্ন করতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকল। আত্মহোমের অনেক কথা যেন গলার কাছ পর্যন্ত এসে রুখে গেছে। বাবা রামজীর ছোট ছোট চোখে জ্ঞানের দীপ্তি জ্বলে উঠছে— অভ্যাসবশতঃ আমিও জীবমাত্রের মধ্যে ভগবানের দর্শন করে থাকি কিন্তু পরম রূপের দর্শন আজ পর্যন্ত আমার কপালে সম্ভব হয়নি। যারা সে জ্ঞানচক্ষু দিয়ে দর্শন করেছে, তারা বলে রামজী পরম সিদ্ধরূপে প্রত্যেক জীবের মধ্যে দিয়ে দর্শন দিয়ে থাকেন। আমি তাদের মতামতকে শ্রদ্ধা করি, বাকী যা সত্যি তা অনুভবেরও বাইরে। ভগবানের দর্শন যদি পাই ভালো, না পাই ভালো, নিষ্কাম সেবাই পরম আনন্দের মূল স্রোত। ভগবানকে জীবের মধ্যে বিচরণ করতে দেখে আনন্দ পাই, পরমানন্দ আর আত্মসন্তুষ্টি।

—আর বাবাজী আপনি এখানে বসে বসে সকলের মনের খবর রাখেন, ভবিষ্যৎ বলেন···

বাবাজী খিল খিল করে হেসে উঠলেন।

—রূপকথার মত রহস্য এতে কিছুই নেই রামজী। যার জুতোয় পেরেক ফোটে সেই তার যন্ত্রণা বোঝে। অনুভব দিয়ে সব-কিছু প্রমাণ করা অসম্ভব। আর অনুভব প্রাপ্তি হয় সাধনার মধ্যে। এ পৃথিবীতে মানুষের উপভোগের জন্য সব পদার্থই আছে কিন্তু কর্মবীর মানুষই তাকে ভোগ করে।

বাবাজীর দর্শনশাস্ত্র শুনে সজ্জন দার্শনিকের মত চিন্তা করতে লাগল। এই রহস্যময় দর্শনশাস্ত্রের প্রধান উৎসধারা তা হলে এতই সহজ? বাবাজীর মত সাধনা করা সম্ভব, সে কেমন ধারা সাধনা? সে নিজে করে দেখতে পারে না।

—কেন করতে পারবে না রামজী? মানুষের শব্দকোষে 'অসম্ভব' শব্দ লেখা নেই, তার পক্ষে সবই সম্ভব, ইচ্ছে করলেই সব-কিছু করা যায়।

—ইচ্ছা করলেই তার পক্ষে সাধনা করা সম্ভব— ভাবাবেগে সজ্জনের মন নতুন স্ফূর্তি, আনন্দের তন্ময়তায় ভরে উঠল।

—হ্যাঁ, সব-কিছু পাওয়া যায় কিন্তু তার জন্যে চাই মনোবল, যে মানুষের মধ্যে সংযম আর ধৈর্য নেই, সে সাধক হতে পারে না।

—কিন্তু আমার বিশ্বাস যে আমি করতে পারব।

—তা হলে ঠিক আছে, নিজের বিশ্বাসকে কর্মযোগের কষ্টিপাথরে কষে যাচাই করে দেখলেই বুঝতে পারবে।

—আমাকে কী করতে হবে?

—সেবা।

—কার?

—রামের, রাম যিনি পৃথিবীর অণুতে অণুতে ব্যাপ্ত আছেন, তোমাকে তোমার…

—বাবাজী, ক্ষমা করুন, এখানে আমার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হচ্ছে, আমি ভগবানের দাস হতে যাব কেন?

—ঠিক আছে, বাৎসল্য ভাবে পূজা করো, সখাভাবে, আত্মভাবে তাকে পাবার চেষ্টা করো। যেভাবেই তুমি পুজো করো-না কেন, দাস তোমাকে হতেই হবে। মা তার শিশুর সেবা করে, বন্ধু বন্ধুর সেবা করে, মানুষ স্বয়ং তার নিজের শরীরের সেবা করে। সেবা কোন ছোট ব্যাপার না কি রামজী? মনে আছে এর আগেও তুমি এ প্রশ্ন আমায় করেছিলে।

সজ্জন লজ্জিত হয়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, অতিবুদ্ধির সামনে অনেক সময় কর্তব্যবুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়।

—নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবায় কোন দোষ নেই রামজী, বুদ্ধি ভগবান রামের মানুষকে দেওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। আমি রামজী মুখ্যুশুখ্যু মানুষ, লেখাপড়া কিছু জানি না, হ্যাঁ, নিজের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে সঞ্চিত বিচারধারা থেকেই নানা কর্ম করে থাকি। তুমি অনেক লেখাপড়া করেছ, শুনেছি বড় বড় বিদ্বানের সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পেয়েছ। কেমন বড় বড় বিশাল মন্দির, ভবন, মূর্তি, বিজ্ঞানের জাদুকরী সব নিজের কল্পনাশক্তির সাহায্যে পৃথিবীর সামনে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছ। তোমার মধ্যে নিহিত সেই শক্তি উপাসনা করো, তাতেই লীন হয়ে যাও।

—বড় কঠিন মনে হয়।

—হ্যাঁ, কঠিন আমারো মনে হয়—তুমি রামজী এত সুন্দর ভব্য ছবি তৈরী করো, আমরা পারি না। তুমি এত কঠিন কাজ কি করে কর রামজী?

শ্রদ্ধার আবেগে সজ্জন তাড়াতাড়ি বাবাজীর পায়ের ধুলো মাথায়

ঠেকালে। বাবাজী যেন স্নেহের প্রতিমূর্তি, তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন— গীতায় ভগবান বলেছেন যে অভ্যাসে যোগ হয় অর্থাৎ কর্মের কুশলতাই বাস্তবিক যোগ, যতই মন বচন কর্ম দিয়ে কোন বিশেষ কাজে লীন হয়ে থাকবে ততই তাতে কুশল হয়ে যাবে।

—বড় কঠিন কাজ মহারাজ। মায়া মোহ বিকারের বন্ধন পদে পদে এসে পায়ে জড়িয়ে যায়, সংসারে গৃহস্থধর্মের পালন করে···

—রামজী, এ একজন অজ্ঞানীর মতামত, বৈজ্ঞানিকের নয়। আমায় বলতে পারো যে এই বোমা তৈরী করে যারা, তারা কি কোন সঘন বনের গুহায় গিয়ে বসবাস করে? সমাজের মধ্যে থেকে সাধনা দিয়েই তারা বিজ্ঞানকে প্রমাণিত করছে।

—কিন্তু বিজ্ঞানের সংহার পক্ষকেও তারা প্রমাণিত করেছে।

—ঠিক আছে, তুমি নির্মাণ করো। যার চেতনা বিরাট রূপ ধারণ করবে, বিজয়লক্ষ্মী তার গলায় বরমাল্য ঝুলিয়ে দেবেন। সৃষ্টিতে প্রতিমুহূর্তে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলেছে, এর আবরণেই লুকিয়ে আছে মানব-বিকাশের রহস্য। আমার মতে গৃহস্থ আশ্রমে থেকেই সাধনা সম্ভব।

কন্যা এল। তাকে দেখে বাবাজী বললেন— কী ব্যাপার রামভক্তনিয়াঁ, লক্ষ্মীর কৃপার সুখ ভোগ করছ?

কন্যা লজ্জায় মাথা হেঁট করে মুচকি হাসি হেসে উত্তর দিলে— হ্যাঁ বাবাজী, কিন্তু ততটাই ভোগ করছি যতটা আমার দ্বারায় সম্ভব।

—কেন? এই দেখো, কী সুন্দর বিরাট অট্টালিকা তোমার, এত চাকরবাকর, তোমার কিসের অভাব? আরামে পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে কেবল হুকুম চালালেই যথেষ্ট।

বাবাজীর কথামৃত শুনে স্বামী-স্ত্রীর মনে খাঁটি সোনার স্ফুরণ দেখা দিল। সজ্জন হাতজোড় করে বাবাজীকে বললে— দেহরূপী মহলের ভেতরে আসল লক্ষ্মীর নিবাস, সে সুখের কল্পনাই আমাদের অগোচর···

—সুখদুঃখ মনের ভাব ছাড়া আর কিছুই নয়, রামজী। যাতে সুখের অনুভব হয় সেই লক্ষ্মী। অঞ্জলি ভরে পান করো সেই আত্মার মহত্ত্ব, দেখতে পাবে তার জ্যোতি, এই জ্যোতিই প্রাতঃকালের সূর্যের মত নিজের তেজ দিয়ে পুরো পৃথিবীটাকে প্রকাশমান করে তুলবে।

সজ্জন লক্ষ্মীর নতুন রূপের বর্ণনা শুনে চকিত হয়ে বাবাজীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

—বাঙলাদেশে রামজী, রামকৃষ্ণ পরমহংস মহারাজ ছিলেন, তিনি একহাতে সোনা আর অন্য হাতে পাথরের নুড়ি নিয়ে নিজের মনে সমভাবে স্থিত করে দিতেন, তার কারণ কী ছিল? কেননা তিনি অনন্ত শ্রী দিয়ে বিভূষিত ছিলেন। রাজা জনক ছিলেন, তাঁর চাকরবাকর, সৈন্য সামন্ত, মহল ঐশ্বর্য কোন কিছুর অভাব ছিল না। ভগবান রামের শ্বশুর, জগদম্বার বাবা, গৃহস্থ, রাজা, তবু তিনি মোহমুক্ত ছিলেন কেন? কেননা তিনি অনন্ত শ্রী দিয়ে বিভূষিত ছিলেন।

—আপনার কথা শুনতে বেশ ভালোই লাগছে বাবাজী, কিন্তু বোঝা একটু কঠিন। আমরা যে পরিস্থিতিতে বাস করি তার প্রভাব কি পড়ে না? আমি নিজেকে দিয়ে বলতে পারি, এত বছর পর্যন্ত দারিদ্র্যর সঙ্গে যুদ্ধ করে এসেছি, পয়সাওয়ালাদের ঘৃণার চোখে দেখেছি কিন্তু আজ লক্ষ্মীর বরদহস্ত মাথার ওপর

দেখে এক অদ্ভুত আনন্দ পাচ্ছি। বৈভব বিলাসের এক বিশেষ আনন্দ আছে। সাধু সংযমী ব্যক্তির কাছে যদি বৈভব আসে, সেও ধীরে ধীরে এই আনন্দে মগ্ন হয়ে যায়। আমার নিজস্ব নৈতিক আর সামাজিক মান্যতা হয়তো আমাকে সামলে···

—হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ রামভক্তনিয়াঁ, এই নিয়ম-সংযম, আচার-বিচারের মধ্যে বাস্তবিক শ্রী খুঁজে পাবে। এখন তোমার কাছে বেশী ধন নেই তাই তুমি নিজের তুলনায় বেশী ধনী ব্যক্তি, লক্ষপতি, ক্রোড়পতিকে দেখে প্রভাবিত। তোমায় এক কিংবদন্তি শোনাই। রাজা জনক বিদেহী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সব ঋষি-মুনিরা ভাবলেন যে আমরা বনের ফলমূল খেয়ে তপস্যা করছি অথচ বেদেহী রাজা হয়ে আমাদের পদবী পেয়ে গেলেন। এক মহাত্মা একদিন রেগেমেগে সোজা রাজা জনকের রাজদরবারে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি রাজাকে প্রশ্ন করলেন যে এত রাজ ঐশ্বর্য ভোগ করেও তুমি বিদেহী কি করে হলে? ভগবানের পাদপদ্মে তোমার মনস্থির হয় কি করে? মহাত্মা তৎক্ষণাৎ প্রশ্নের উত্তর চাইলেন, নতুবা তিনি রাজার সব ভাঁড়ামি প্রজাদের মাঝে প্রচার করার ভয় দেখালেন। রাজা জনক আগ্রহ প্রকাশ করলেন—মহারাজ, আগে আপনি বিশ্রাম করুন, ভোজন করুন তারপর বসে কথা বলা যাবে। মহাত্মার খুব আদর-অভ্যর্থনা হল। যখন তিনি স্নান ধ্যান থেকে নিবৃত্ত হলেন তখন রাজা তাঁকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন। ইতিমধ্যে রাজা এক চাল খেললেন, যেখানে মহাত্মার খাবার আসন পাতা হয়েছিল, ঠিক তাঁর মাথার ওপর পাতলা সুতো দিয়ে তলোয়ার বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন। মহাত্মাজীর প্রাণ-পাখি খাঁচাছাড়া। খেতে বসে তাঁর সমস্ত মন জুড়ে সে

একই তলোয়ার ছাড়া দ্বিতীয় চিন্তা নেই। খেতে খেতে রাজা প্রশ্ন করলেন— মহারাজ, কঢ়ী (বেসমের বড়া আর দই দিয়ে তৈরী) কেমন রান্না হয়েছে? নাড়ুর আস্বাদ কেমন? উত্তরে মহাত্মা কেবল হুঁ হুঁ করে সেরে দিলেন। যখন জনক মহারাজ আবার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন তখন মহাত্মা প্রাণের কথা খুলে রাজাকে বললেন— সত্যি কথা যদি জিজ্ঞেস করেন মহারাজ, মন একনিষ্ঠ করে আমি খেতে পারিনি, সর্বক্ষণ মাথার ওপর ঝোলানো তলোয়ারের চিন্তায় খাবারের আস্বাদ বুঝতেই পারিনি। রাজা হেসে বললেন— এইতো সেই রহস্য, মন যেখানে একনিষ্ঠ করা যায় সেখানেই থাকে।

দুই চুম্বক পাথরের আকর্ষণে বাঁধা সজ্জন বিস্ময়ে স্তব্ধ। তার শিরায় শিরায় যেন সেই আকর্ষণ শক্তি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কন্যা বাবাজীকে ভোজন করাতে নিয়ে গেল, সে চুপচাপ তার অনুগমন করল।

বাবাজী আগেই আদেশ দিয়েছিলেন যে তাঁর জন্য আলাদা রান্না করার ব্যবস্থা না হয়, তিনি সকলের সঙ্গে ভোজ গ্রহণ করবেন। আজ দোলের দিন তাই লঙ্কা, গরম মশলা না দিয়ে পাতলা তরকারী আর পায়েস খাবার অনুমতি বাবাজী সকলকে দিয়েছিলেন। আসনে বসে বাবাজী স্বামীস্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন— ব্রাহ্মণ সাধুকে ভোজন করাতে হলে দক্ষিণা দিতে হয় জানো? বলো তো রামভক্তনিয়াঁ, তোমরা আমায় কী দক্ষিণা দেবে?

—আজ্ঞা করুন। ভাববিহ্বল কণ্ঠে সজ্জন উত্তর দিলে।

—নিজের এই বৈভব আমাকে দান করবে রামজী?

—মনে এইরূপ বাসনা আছে বাবাজী তবে বলতে পারছি না যে শেষ পর্যন্ত দৃঢ় থাকতে পারব কিনা। কিছুদিন ভাবতে সময় দিন।

—তাহলে ততদিন থালা এইভাবে সাজানো…। কন্যা সজ্জনের মুখের ভাব লক্ষ্য করল, তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যথা।

—রামজী, হয় তুমি নিজের সংকল্পে দৃঢ় হয়ে থাকো আর তা না হলে পৃথিবীর বাকী লোকের মতই চরকিবাজী খাও। ভাবনা-চিন্তেয় কতদিন কাটাবে? কেবল ভাবনাচিন্তের জালে জড়িয়ে পড়ে ত্রিশঙ্কুর অবস্থা হয়ে যাবে না?

—আপনি সকলের কাছে এই দক্ষিণাই চান নাকি? সজ্জন জিজ্ঞেস করলে।

—এর উত্তর শুনে তোমার কি লাভ হবে? ভেবে নাও আজ প্রথমবার তোমার ঐশ্বর্য দেখে লক্ষ্মী পাবার লোভ সামলাতে পারিনি।

—আমি আজীবন অভাব-অনটনেই মানুষ, বৈভবের অভাবে আমার কোন কষ্ট হবে না। কন্যা তার স্বামীকে উত্তর দেওয়ার হাত থেকে রেহাই দিলে।

—তাহলে আমারও কোন কষ্ট হবে না বাবাজী, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য। অনেক সুখভোগ করেছি, এবার অন্তরের শ্রী চাই। আপনি ভোজন গ্রহণ করুন। পরশু কাছারি খুললেই আমি সব-কিছু আপনার নামে লেখাপড়া করে দেব।

—কোন্ কাছারিতে? বাবাজী খিল খিল করে হেসে উঠলেন। আমার লেখাপড়া এই মুহূর্তে হয়ে গেছে, এ ধন আর তোমার নয়। আজ থেকে তুমি কেবল খাজাঞ্চি, কাজের বদলে মাস মাইনে পাবে।

—ঠিক আছে, তাই হবে, আজ থেকে সম্পত্তির ওপর আমার কোন দাবি রইল না।

—হ্যাঁ, এই মুহূর্ত থেকে তুমি স্থির হবে, তুমি তোমার কর্তা হতে চেয়েছিলে না? প্রতি মুহূর্তের সাধনা তোমায় সেই পথেই নিয়ে যাবে। তুমি কর্তা হয়ে বসে বিষয় ভোগ করবে, এর মধ্যেই পাবে জ্ঞান ধর্মের মহিমা। দোলের হাসিখুসীতে ভরা উৎসব তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ হয়ে গেল। এতদিন তার অস্থির মন সাংসারিক সুখের তরঙ্গে ভেসে বেড়াচ্ছিল, আজ সে সাধনার জগতে প্রবেশ করল। পৃথিবীতে সবাই কোন-না-কোন মানসিক রোগে, চারিত্রিক দুর্বলতায় ভুগছে. আজ সে অসীমের সন্ধান পেয়েছে। এতদিন এই অন্ধের ভিড়ে সেও তাদের মতই হাতড়ে হাতড়ে পথ খুঁজে বেড়িয়েছে। এবার তার চোখে জ্বলে উঠেছে আত্মজ্ঞানের জ্যোতি।

আটত্রিশ

প্রায় দু'ঘণ্টা হল, বাবাজীর খাওয়াদাওয়ার পাট শেষ হয়ে গেছে। পোর্টিকোর বাইরে তাঁর বাস দাঁড়িয়ে। সজ্জন আর কন্যা দু'জনে বাবাজীকে বাস পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। সজ্জন সোজা ওপরের ঘরে চলে গেল। কন্যার এখনো ঘর সংসারের অনেক কাজ বাকী, চাকরবাকরদের খাইয়ে, ভাঁড়ার বন্ধ করে তবে তার ছুটি।

চাকরদের পরিবেশন করে খাইয়ে বখশিশ দেওয়ার পর তাদের

বিশ্রাম করার জন্য দু'ঘণ্টার ছুটি দিয়ে দিলে। ঠাকুরঘরের পুজোর বাসনকোসন মেজে ঘষে ঝকঝকে করে সাজিয়ে রেখে কিছুক্ষণ কন্যা একদৃষ্টে শাশুড়ীর ছবির দিকে তাকিয়ে রইল। বিগ্রহের সামনে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে, পলতেটা একটু উঁচু করে, ধূপবাতির ছাই ঝেড়ে আবার সোজা করে গুঁজে দিলে। ঠাকুরঘরের ঝাড় ফানুসের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের ছাদে আর দেয়ালে সব সেকালের চিত্র আঁকা। শূন্যদৃষ্টিতে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে ধীরে ঠাকুরঘরের কপাট বন্ধ করে বেরিয়ে এল। বাইরের রোয়াকে এসে এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে লন পার করে রান্নাঘরের সামনের বারান্দা দিয়ে ক্লান্ত পায়ে, অন্যমনস্ক মনে, ওপরের সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালে।

এ বাড়ির প্রত্যেকটা ঘরে দামী আসবাবপত্তরের ভিড়। স্টুডিও ছাড়া (যেখানে সজ্জন বসে আছে) বাদবাকী ঘরগুলোয় সে একাই ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। কখনো এদিক, কখনো সেদিক দাঁড়াচ্ছে, কখনো পুরোনো ফার্নিচার বা মূর্তির ধুলো ফটফট করে পরিষ্কার করছে, সে যেন তার মনের গভীরতাকে মাপকাঠি দিয়ে মাপার চেষ্টা করছে। এ বাড়ির প্রত্যেকটা জিনিস তার, সে এখানকার গৃহস্বামিনী। আজ থেকে পাঁচ-ছয় মাস আগে পর্যন্ত সে কোনদিন ঐ রাজ-ঐশ্বর্যের কল্পনা স্বপ্নেও করেনি। বাপের বাড়িতে তার আশেপাশের আবহাওয়ায় যেন সর্বদাই আসন্ন ঝড়ের ইঙ্গিত থাকত, তাই সে কোনদিনই প্রাণ ভরে মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে পারেনি। আর্থিক অভাব-অনটনের মধ্যে সে মানুষ হয়েছে। মনের অসন্তুষ্টিকে চেপে রাখার জন্যে কখনো সাহিত্য-সাধনা, কখনো স্টেজে অভিনয় করার পর শেষকালে রাজনীতির

ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। বিলাসিতার বিষয় তার কেতাবী জ্ঞান আছে কিন্তু রাজরাজড়াদের বৈভব স্বচক্ষে দেখার সুযোগ এর আগে কখনো পায়নি। সে সর্বদাই বড়লোকদের ঘৃণার চেখে দেখেছে, প্রত্যেক কথায় তাদের বাক্যবাণ দিয়ে শরাহত করতে পারলেই সে যেন সন্তুষ্ট হত। সজ্জনকে স্বামীরূপে পাবার পর যেন সব কেমন ওলটপালট হয়ে গেল, এখানকার ঐশ্বর্যে তার চোখে যেন ধাঁধার সৃষ্টি করেছে। বিয়ের পর সজ্জন তার হাতেই সমস্ত রাজপাটের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। নতুন জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা পুরোপুরি উপভোগ করার জন্যে একদিন সে বউরানী সেজে শাশুড়ী, দিদিশাশুড়ীর সব গয়না পরে সেজেগুজে পোর্ট্রেটের মডেল হয়ে বসেছিল, এ যেন তার জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা! আপাদমস্তক প্রায় আশী হাজারের জড়োয়া গয়না দিয়ে মোড়া সে যেন এক জীবন্ত মমি। ক্রমশ সব যেন তার ধাতে সয়ে গেছে, আর ভারী গহনা পরে তার দমবন্ধ হয়ে আসে না। যখন সব-কিছু সাধারণভাবে ভোগ করার মত মানসিক স্থিতি হল, এমন সময় ত্যাগের ছুরি এসে তাকে বিঁধল। ভাগ্যের বিচিত্র বিড়ম্বনা! অনেক বিচার বিশ্লেষণ করেও সে এই ত্যাগের বিরোধিতা কিছুতেই করতে পারল না, তবু যেন কোথায় সব গরমিল হয়ে যাচ্ছে। ত্যাগের কথা ভাবতেই তার সুখী মন উদাস হয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে এক অব্যক্ত পীড়ায় বুকটা যেন মুচড়ে উঠছে। যদিও বাবা রামজী তাঁর সঙ্গে এ বাড়ির কুটোটিও নিয়ে গেলেন না তবু তার মনে হচ্ছে যেন সব বিকিয়ে গেছে, যা ছিল সব হারিয়ে গেছে, এখন মৌচাক খালি।

নতুন জীবনের নব উল্লাস যেন ত্যাগের কুয়াশায় ঢাকা পড়ে

গেছে। ক্ষণিক আধ্যাত্মিক গরিমা গৃহস্থ ধর্মের পালনে সাহায্য করলেও করতে পারে কিন্তু তাই বলে গৃহস্থ থেকে সব-কিছু ত্যাগ করা কি সম্ভব? এ ঘরসংসার আমার, আমি সুখী, সৌভাগ্যবতী, নিজের গৃহস্থ জীবনকে ভালোভাবে উপভোগ করতে চাই।

এতক্ষণে মনের অবসাদ অনেকটা হাল্কা হয়েছে। উঠে শোবার ঘরে এল। সজ্জন ঘরে নেই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে সে যেন চমকে উঠল। লাবণ্য কোথায় গেল? দেহের লাবণ্যের কাঁচাসোনা যেন সহসা ত্যাগের কষ্টিপাথরে ঝুটো হয়ে গেছে। নিজের এই ফ্যাকাসে শুকনো চেহারা নিয়ে সে সজ্জনের সামনে দাঁড়াবে কি করে? তাড়াতাড়ি সাবান দিয়ে ভালো করে মুখ ধুয়ে, ক্রীম পাউডার মেখে সিঁদুরের টিপ পরলে। চুল ঠিক করে ওয়ার্ডরোব খুলে, নীল রঙের ব্যাঙ্গালোর শাড়ি বার করে তারপর হীরের সেটের বাক্স খুললে। কানে টপস্, নাকে নাকছাবি, গলায় হার, ডানহাতে চুড়ি, বাঁ হাতে হীরে বাঁধানো জড়োয়া ঘড়ি। সজ্জনের কেনা হীরের সেট সে আজ প্রথমবার পরছে। আয়নায় তার প্রতিচ্ছবি এবার যেন বড় ভালো দেখাচ্ছে, নতুন সাজসজ্জায় তার রূপ ফেটে পড়ছে।

সজ্জন নিজের স্টুডিওতে বসে ছবি আঁকছে, সামনে কন্যাকে দেখে সে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে বললে—হ্যালো। আনন্দমিশ্রিত আবেগে সে কন্যাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে দেখে কন্যা মিষ্টি হেসে বললে— নজর দিচ্ছ নাকি?

—সে পালা সাঙ্গ হয়ে গেছে, এখন তোমাকে ভরপুর চোখে দেখে তৃষ্ণা মেটানোর পালা আরম্ভ হয়েছে।

—আমি ভাবলুম, তুমি বলবে যে এত শখ করে কিনে আনা

সেট— কন্যা গম্ভীর হল, ত্যাগের আগে একবার গ্রহণ করার বাসনা জেগে উঠল।

আদর করে কন্যার গালে টোকা মেরে সজ্জন বলল— আমি এতক্ষণ এ বিষয় নিয়েই চিন্তা করছিলুম, উত্তর খুঁজে পেয়েছি। কন্যা তার মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করল।

—দেখো কন্যা, অভাব হয় মনোবলকে দৃঢ় করে নতুবা তাকে শেষ করে ছাড়ে। আমার মনে হয় অভাবের মধ্যে থেকে মনোবল দৃঢ় করার ক্ষমতা আমাদের দুজনের আছে। আমার মনের কোণে ছাই চাপা অতৃপ্তির আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। আমার কথার হেঁয়ালি হয়তো তুমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছ না। নতুন নতুন বিয়ের পর প্রত্যেক দম্পতির মনে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। আমার একান্ত ইচ্ছে তোমায় নিয়ে অনেক দূর দূর পর্যন্ত ঘুরে আসি, পৃথিবীটাকে ভালোভাবে দেখে তার সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করি। আমার মনের এই বাসনাকে দাবিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে বিশেষ কঠিন হবে না কিন্তু এরপর আমি হারিয়ে ফেলব আমার মানসিক শান্তি, অতৃপ্ত মনের ছটফটানির যন্ত্রণা বড়ই কষ্টদায়ক।

সজ্জনের চিন্তাধারার আভাস পেয়ে কন্যার চোখে প্রেমের ঝিলিক দেখা দিল। তার প্রেমের বর্ণালী ডানা যেন আজ স্বামীসোহাগের সোনালী আভায় ভরে গেছে। তার চাউনিতে মাদকতা আর উচ্ছ্বাস কিন্তু তার মধ্যে কামনার উত্তাপের বদলে ভোরের ঝিরঝিরে হাওয়ার তৃপ্তি আছে।

—বেড়াতে আমারও ভালো লাগে, কন্যা বললে।

—হ্যাঁ কন্যা। আজ হতে নিজের খরচ কম করতে আরম্ভ করব

কিন্তু মানুষ অভ্যাসের দাস— হঠাৎ অভ্যাস ধরা বা ছাড়া দুয়েতেই হয় দেহের পীড়া, তাই আমি সহসা ত্যাগের ঝুলি কাঁধে নিতে নারাজ। তুমি ভেবো না আমি ধাপ্পা দেওয়ার জন্যে বলছি, সত্যিই আমি নিজেকে গণ্ডির মধ্যে বেঁধে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করব। হ্যাঁ, এটা ঠিক নিজের বংশধরের সুখের ব্যবস্থা করার ফিকিরে আমি পূর্বপুরুষের সম্পত্তি হাতাতে চাই না, আমি এটা অনুচিত মনে করি। আমার হাতে এসময় মোটামুটি আটলক্ষ টাকার সম্পত্তি আছে। আমার বাবা প্রায় আট-দশ লক্ষ টাকা নিজের বিলাসিতার পেছনে খোলামকুচির মত উড়িয়ে গেছেন। প্রায় চার-পাঁচ লক্ষ টাকা কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের সময় শুভার্থীর দল লুটেপুটে খেয়েছে। যাকগে সে-সব কথা, আমার হাতে যা আছে তার থেকে অর্ধেক দিয়ে আমি একটা ট্রাস্ট সমাজ-কল্যাণ কাজের জন্য তৈরী করে দেব।

কন্যা উৎসাহিত হয়ে উঠল— তুমি আমার মনের কথা বুঝে ঠিক ব্যবস্থা করে ফেলেছ। দেখো সজ্জন, তোমার কাছে আমি প্রাণ খুলে সব কথা বলতে পারি। আজ আমি স্বীকার করছি আমাদের মনের মিলের মাঝখানে সোনা-রুপোর কল্পনা কোনদিনই আমার মনে আসেনি। তোমাকে স্বামীরূপে পাওয়ার কল্পনার সঙ্গে এ বাড়ির ঐশ্বর্য জড়িত ছিল না, কিন্তু গৃহস্বামিনী হয়ে আসার স্বপ্ন আমি যে না দেখেছি তা নয়। বধূরূপে এ বাড়িতে পা দেওয়ার পর আমি নিজেই এই বৈভবের জালে জড়িয়ে পড়লাম— তোমার প্রেম, তোমার ব্যবহারই হয়তো এরজন্যে বেশী দায়ী… আমি যেন ঠিক তোমায় বোঝাতে পারছি না, কিন্তু দয়া করে তুমি যেন আমায় ভুল বুঝো না।

—আমি ঠিকই বুঝছি।

—আজ বাবাজীর প্রস্তাবে আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইনি, আমি জানি ত্যাগ আমার পক্ষে অতি সহজ কিন্তু একা এতক্ষণ ধরে— বলতে বলতে কন্যার গলা বন্ধ হয়ে এল, অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটার চেষ্টা করতে লাগল।

সজ্জন হো হো করে হেসে উঠল। সেই হাসিতে কন্যার চমক ভাঙলো, অসময় হাসি শুনে তার মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সজ্জন তাকে দু'বাহুর বন্ধনে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে আদর করে তার কচি লালচে ঠোঁটে চুম্বনের উপহার দিয়ে বললে— একেবারে ছেলেমানুষ— তাইতো তোমায় এত ভালোবাসি।

সজ্জন দাঁড়িয়ে উঠে আলস্যি ছাড়লে। নিজের অসম্পূর্ণ ছবির দিকে তাকিয়ে বললে— এ ধরনের কথাবার্তা সাদাসিদে মানুষের পক্ষে জীবন মরণের প্রশ্ন হয়ে যায়। সাধারণ প্র্যাকৃটিকাল মানুষের সামনে এসব কথা বললে তারা আমাদের নিয়ে গিয়ে সোজা পাগলা গারদে পুরে দিয়ে আসবে, হোঃ হোঃ হোঃ। বলবে, সত্যযুগের সাধু কলিযুগে অবতার হয়ে জন্মেছেন··· এসো।

কন্যা উঠে দাঁড়িয়ে বলল— আজ জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা হল, পয়সাকড়ির মোহ সহজে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

—এ পৃথিবীতে আমি এমন সব কিপটে লোক দেখেছি যে তারা সারা জীবন পয়সাকে বুকে আঁকড়ে রইল কিন্তু তা উপভোগ করল না। তারা সারা জীবন ভালো খাওয়াপরার জন্যে হাপিত্যেশ করে শেষকালে রুগী হয়ে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারায়। এমন লোকের পয়সা কারুর কাজেই লাগে না।

—এরাই মরে গিয়ে শুনেছি সাপ হয়ে সেই রক্ষিত ধনের ওপর ফণা উঁচিয়ে পাহারা দিতে থাকে। কন্যা হেসে বললে। দুজনে শোবার ঘরে ঢুকল। সজ্জন বালিশে ঠেসান দিয়ে বসে বললে—সাপের কথা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও আমি তা বিশ্বাস করি, যদিও এখনো পর্যন্ত যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারিনি। আমাদের বাড়িতেও সাপের জোড়া ছিল।

—কোথায়?

—ঠাকুর ঘরে।

—ঠা-কু-র-ঘরে!

—হ্যাঁ, ওর নীচে গুপ্তঘর আছে। কখনো এ নিয়ে কথা হয়নি তাই তোমাকে বলতে বা দেখাতে ভুলে গেছি। বাবার মৃত্যুর পর সেটা ওপর থেকে ভরাট করে বন্ধ করে দিয়েছি। আমি নিজেই আজ পর্যন্ত কখনো সেখানে যাইনি। খুব ছোটবেলায় একবার সেই ঘর খুলতে দেখেছিলাম, আবছা আবছা মনে আছে।

—ওখানে সাপ ছিল?

—হ্যাঁ, বাবা তাদের মেরে ফেললেন। তার পরই কয়েক মাসের মধ্যে তিনি নিজেই মারা গেলেন। আমাদের বাড়িতে সকলেরই বিশ্বাস সাপেদের ওপর হাত ওঠাবার ফল তিনি পেলেন। মা আমাকে বলতেন আমার প্রপিতামহ যখন এ বাড়ি তৈরী করেন, তখন সোনার বটলেইতে (গামলার মতো গোল মুখের বাসন) করে সাপের জোড়া এ বাড়িতে আনা হয়েছিল। প্রপিতামহ সেকালে বিলেত ঘুরে এসেছিলেন। ফিরে এসে প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী হননি, প্রগতিশীল ব্যক্তি ছিলেন, তবু এই সাপের জোড়াটি সম্বন্ধে তাঁর দুর্বলতা ছিল। শোনা কথা যে আমার পূর্বপুরুষ রঘুমল

এবং তাঁর স্ত্রী এ জন্মে জোড়া হয়ে মায়া আগলে বসে আছেন। তিনিই নবাব সআদত আলি যাঁর সঙ্গে দিল্লী থেকে লক্ষ্ণৌ এসেছিলেন।

—তারপর কি হল?

—তিনি কাপড়ের মস্ত কারবার করতেন। তিনি খুব চালাক চতুর ছিলেন তাই নবাবকে বেশ হাতে রেখেছিলেন। এখানে আসার পর লক্ষ্মীর কৃপায় তাঁর ভাণ্ডার ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল। মৃত্যুর পর তিনি স্ত্রীকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন যে গিনির যে বড় হাণ্ডার ওপর আমি বসে আছি তার আশেপাশের চারটে হাণ্ডাতে (বড় গোলমুখো হাঁড়ি) যেন কেউ হাত না দেয়। যদি কখনো আমাদের পরিবার আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয় তখন প্রতিদিন এক বাটি আসরফী এর মধ্যে থেকে বার করে নিতে দেব আর এক বাটি দুধ এখানে আমার জন্যে রেখে দিও।

—তারপর?

—তারপর আর কি? তাঁর আদেশমত সব ব্যবস্থা হল।

—তার মানে স্বপ্নে দেখার পর সত্যিই সাপ···

—হ্যাঁ, কিছুদিন পরেই তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন, তখন লোকেরা গিয়ে সে জোড়া স্বচক্ষে দেখছিল।

—সেই আসরফীতে কেউ হাত দেয়নি?

—না। হয়তো দরকারই হয়নি। রঘুমলজীর পর আমাদের বংশে ধন দৌলত সমানে বেড়েছে, কখনো কমেনি। আমার পূর্বপুরুষেরা খুব চালাক-চতুর আর প্র্যাক্‌টিকাল ছিলেন। দরবারে তাঁদের ইজ্জত ছিল। আশেপাশের হাওয়ার দিশা দেখে তাঁরা সেইদিকেই ঝুঁকে পড়তেন, ব্যবসা করে বড় শেঠ হলেন তারপর

বড় তালুকদার। হ্যাঁ আমার প্রপিতামহ, যিনি এই বাড়ি তৈরী করিয়েছিলেন, গৃহপ্রবেশের সময় কানে শোনা কথাকে যাচাই করে নেওয়ার জন্যে তিনি একদিন এক হাণ্ডার মধ্যে থেকে কিছু আসরফী বার করে সেই সময় আলাদা রেখে দিয়েছিলেন। সেই রাত্তিরে তিনি স্বপ্নে আদেশ পেলেন আসরফী হাণ্ডার মধ্যে না রাখলে তাঁর ছেলে-বউকে কালের গ্রাস হতে হবে। তিনি তারপর দিনই সেই আসরফী নিয়ে গিয়ে যথাস্থানে রেখে দিয়েছিলেন। আমার ঠাকুর্দা জ্যান্তে কখনো তাকে ছোঁবার চেষ্টা করেননি। ভাগ্যের পরিহাস, তিনি বেশ কম বয়সেই মারা গেলেন আর সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে চলে গেল। বাবা প্রাপ্ত-বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত অনেক সম্পত্তি সকলে লুটেপুটে খেল। তারপর বাবা প্রাপ্তবয়স্ক হলেন, তাঁকে বিলেত পাঠানো হল। বিলেত-ফেরত হয়ে আসার পর তাঁর ভোলই পালটে গেল। উচ্ছৃঙ্খল জীবনের নেশার ঘোরে একদিন তিনি সেই সাপের জোড়াকে মেরে ফেললেন। তার কিছুদিন পরেই তিনি মারা গেলেন। মা বলতেন পূর্বপুরুষের অভিশাপে এমনটা ঘটল।

—আর সেই আসরফীর হাণ্ডা?

—বাবা সব গালিয়ে ফেলেছিলেন।

—গুপ্তঘরে এখন কী আছে?

—জানি না।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কন্যা বলল— সাপেরা রক্ষিত ধন পাহারা দিয়ে তার ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে থাকত, এ গল্প আমি এর আগেও শুনেছি কিন্তু বিশ্বাস করিনি।

—আমিও বিশ্বাস করতে পারিনি কিন্তু মা নিজে দেখেছিলেন।

সাপের জোড়ার সঙ্গে আমাদের বাড়ির ইতিহাস জড়িয়ে আছে···, বিচিত্র ব্যাপার!

—সত্যি কথাই, এ দেশ বিচিত্র ব্যাপারে ভর্তি, বড় বেশী পরস্পরবিরোধী ভাবধারার মধ্যে আমরা জীবন কাটাই। এক দিকে তর্ক, জ্ঞান, দর্শন, গণতন্ত্র ইত্যাদির মত কঠিন ভাব আর অন্যদিকে সাপ, যোগী, জেঠীর জাদুমন্ত্র, এ-সব অন্ধবিশ্বাস ছাড়া আর কি?

—কিন্তু কন্যা, বিশ্বাস না করে উপায় নেই। আমাদের বাবাজীকে দেখো-না, এঁর আত্মিক শক্তিকে অবিশ্বাস করা কি সম্ভব? কন্যা বিছানায় কনুইয়ের ভরে মাথা রেখে এলিয়ে পড়ল।

সজ্জন বলল— মোহ আর ত্যাগ ··

—সাপ আর যোগী— দুজনেই ··

—দুজনেই সীমা ছাড়িয়ে গেছে। দুজনেই অতি প্রাচীন পরম্পরার মধ্যে চলছে। ভারত সেই মহেঞ্জোদারো আর হরপ্পার যুগ থেকে বৈভব সংগ্রহ ও তাকে উপভোগ করা জানে। তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সেই ভোগকে এক মুহূর্তে ত্যাগ করে সাধনার পথে বেরিয়ে পড়াও সে যুগ থেকে সমান্তরাল ভাবে চলে এসেছে।

—মেম সাহেব! বাইরে চাকর সাড়া দিল।

—ভেতরে এসো শীতল! কন্যা উঠে বসল।

—চা নিয়ে আসব হুজুর?

—নিয়ে এসো— সজ্জন উত্তর দিলে। চাকর চলে গেল।

—একটু পরেই চা জলখাবার ট্রেতে সাজিয়ে চাকর নিয়ে এল। সজ্জন আর বনকন্যা আজ যেন নিজেদের মনের গোলকধাঁধায় নিজেরাই ধাঁধা দিয়ে বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সজ্জন চুপচাপ

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। কন্যার হাতের চা ঠাণ্ডা জল হয়ে গেছে।

—সজ্জন, যদি আজ আমরা আদর্শের সিঁড়ির প্রথম সোপানে চড়তে গিয়ে পা ফসকে পড়ে যাই তাহলে আত্মগ্লানির আর সীমা থাকবে না। খেয়েদেয়ে আনন্দ করে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ফুরফুরিয়ে বেড়ানো মানে বিলাসিতার বিষকে আকণ্ঠ পান করা।

—ভেবে দেখো কন্যা, বাবা রামজী আমাদের এক কঠিন প্রশ্নের মধ্যে ফেলে গেছেন। এর উত্তর পাবার জন্যে আমাদের কোন-না-কোন সুদৃঢ় পন্থা অবলম্বন করতেই হবে। ভোগ আর সাধনা, একটাকে বাছতেই হবে।

—বেছে নিয়েছি। আমরা গৃহস্থ, ভোগ আর ত্যাগের সংযুক্ত জীবনই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত।

উনচল্লিশ

দো দো দোল।

কালো লাল নীল হলদে রঙ মুখে মেখে, হাতে পায়ে রঙবেরঙের ছোপ লাগিয়ে, চিত্রবিচিত্র ছেঁড়া জামাকাপড় পরে এক জোকার গাধার পিঠে বসে যাচ্ছে। তার পেছনে টিনের কানেস্তারা বাজাতে বাজাতে, পচা টমেটো ফচফচ করে লোকের মুখে মারতে মারতে, কালো রঙ লোকদের মুখে মাখতে মাখতে দোলের জুলুম

মহিপালের বাড়ির সামনে দিয়ে হৈ হল্লা করতে করতে বেরিয়েছে। দোলের হাঙ্গামায় সারা গলি সরগরম। সামনে শিবালয়ের পাশ দিয়ে সাইকেল প্যাডেল মেরে সজ্জনের চাকর এদিকেই আসছে। বিরাট জুলুস আর হৈ চৈ দেখে সে তাড়াতাড়ি সাইকেল থেকে নেমে একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাঘের মুখের সামনে যেন অজান্তেই শিকার এসে ধরা দিয়েছে, ভিড় সজ্জনের চাকরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছিদ্দ বেশ হুঁশিয়ার আর মজবুত, তাড়াতাড়ি দু'হাতে সাইকেল উঠিয়ে ঢালের মত নিজের সামনে তুলে ধরে সে গর্জে উঠল, খবরদার, সাইকেল নিয়ে তোমাদের ঘাড়ে চাপব মনে থাকে যেন। দু'তিনটেকে একেবারে পিষে দেব তারপর তোমরা যত ইচ্ছে নাচন কোদন করো গে যাও।

দোলের নন্দদুলালেরা গজরানি শুনে ঠাণ্ডা। নিরীহকে পেলেই এঁরা বেশী লম্ফঝম্ফ করে থাকেন। এবার এঁরা হাড়ে হাড়ে টের পেলেন যে শিকারও বাঘের মতই চোখ রাঙাচ্ছে, ব্যাপারটা সুবিধের নয়। ছিদ্দ চোখ বড় বড় করে রোয়াকের দেয়াল ঘেঁষে সাইকেল হাতে নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেছোকরার দল হিপ হিপ হুর্‌রে চেঁচাচ্ছে, হাত-পা মটকে ভেংচি কাটছে, যত রাজ্যের অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে, পিচকিরি আর জলের ফোয়ারা দিয়ে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে মারছে। পচাবস্তা দিয়ে ফুটবল খেলার প্র্যাকটিস হচ্ছে, তাদের মাথা লক্ষ্য করে সাইকেলের মার-প্যাঁচ দেখাবার কথা ভেবে ছিদ্দু যেই এগুলো, ওমনি তার চোখে ফস ফস করে পিচকিরির বর্ষা এসে তাকে প্রায় কানা করে ছাড়লে। বাপস্, এমন রঙ খেলা সে বাপের জন্মে দেখেনি, কি বেয়াড়া লোকজন। জুলুস বেরিয়ে

গেল। ছিদ্দুর হাতে ঝিঁঝিঁ ধরে গেছে, সাইকেল সমেত হাতটা কাটা গাছের মত নীচে এসে পড়ল। হঠাৎ আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো আর সাইকেলের অস্থি পাঁজর স্বস্থানে ফিট রাখার চিন্তা, দুই মিলিয়ে সে নিশ্চল পাথরের মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তারপর ধপাস্ করে গলিতে বসে পড়ল।

মহিপাল নিজের ছাদ থেকে এ দৃশ্য দেখছে। গত কয়েকদিন থেকে আর বিশেষ করে আজ এ ধরনের দৃশ্য সে কয়েকবার দেখেছে। রোয়াকের সামনে তার পাড়ার ছেলেরা দোল খেলছে, তাদের সে বেশ ডাঁটে রাখে কিন্তু ভিন্ন পাড়ার ছেলেরা তার আওতার বাইরে। দোলের পরের দিন আধাবয়সী লোকেরা ঘরের কোণে বসে থাকে বটে কিন্তু উঠতি বয়সের ছেলেরা সেদিন বেশী হৈ হুল্লোড় করে। দোলেতে রঙ খেলা, আপসের গালাগালি, সব-কিছু যেন মন্দ লাগে না। দোলের এই কটা দিন সমাজের নিয়ম-কানুন ভঙ্গ হয়ে যায়, ছোট বড় সব এক রঙে রঙীন হয়। বড় বড় ঘরের যুবকরাও এই দিনে ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে, ভূতের মত মুখে রঙ মেখে রাস্তায় নেচে বেড়ায়। গলি ঘুঁজি, দেয়ালে, দরজায়, কুকুর, গোরু, ষাঁড়, গাধা, ছাগলের পাল সব রঙীন হয়ে যায়। গলির এবড়োখেবড়ো জমি, দেয়াল আর লোকের মুখের অশ্লীল গালাগালি সব মিলিয়ে ব্রহ্মানন্দের সহোদর রূপকে তারা যেন এক পোঁচ কালি মাখিয়ে আনন্দ পাচ্ছে, দোলের এই রূপ মহিপালের মোটেই ভালো লাগে না। সুখের দিনে গালাগালি কেন স্থান পাবে? কেন পুরুষ নিজেকে আর নারী জাতিকে এভাবে অপমানিত করে? দোল আনন্দের উৎসব, তাতে পরস্পরকে গালাগাল দিয়ে মানুষ আনন্দ পায় কেন? তবে কি সারাটা

বছর সে কৃত্রিমতার সোনালি ঘোমটা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখে? এ কয়েকদিন সুযোগ পেয়ে সে নিজমূর্তি ধরে বিষ উদ্‌গীরণ করে?

সজ্জনের চাকর খবর দিতে এল— সায়েব বিকেল ছটায় আসতে বলেছিলেন কিন্তু আপনারা চারটের সময় এলে ভালো হয়। সবাই মিলে নৌকোতে বেড়াতে যাওয়ার প্রোগ্রাম হয়েছে।

মহিপাল হেসে বলল— তোমার সায়েবকে বোলো যে আমরা সাহজনফ রোডে থাকি না, গলির মধ্যে থাকি। সায়েবকে একবার তোমার এই শ্রীমুখখানি দেখিয়ে দিয়ে বোলো যে উনি আমাদেরও এই দুর্গতি দেখতে চান নাকি?

চাকর লজ্জা খেয়ে হেসে ফেলল। মহিপাল তাকে কর্নেলের বাড়ি যেতে মানা করল। শকুন্তলাকে ডেকে মহিপাল তাকে বোঝালো ছিদ্দর জামাকাপড় ভিজে জবজব করছে, ওকে তার একটা শুকনো জামা আর ধুতি দিয়ে দিতে। সে কাপড়চোপড় ছেড়ে মিষ্টিটিষ্টি খেয়ে তবে যাবে। ভিড়ের সামনে তার বাহাদুরী দেখে মহিপাল ছিদ্দকে দু'টাকা বখশিশও দিলে। অপ্রত্যাশিত লাভে ছিদ্দ বেজায় খুসী। মহিপাল ওপরে চলে গেল।

মহিপালের বাড়িতে ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যেখানে-সেখানে বৈভবের দীপ্তি ছড়িয়ে আছে। ঘর থেকে লেখার জিনিস-পত্তর, টেবিল চেয়ার, স্টুল সব গায়েব। তার জায়গায় আর্ট স্কুলের তৈরী সাঁচী শিল্পের ডিজাইন দেওয়া সোফা, তক্তপোষে সেখানকারই ছাপা চাদর, পর্দা, অ্যাশ্‌ট্রে, টেবিল ল্যাম্প, রেকাবি। বুদ্ধের মূর্তি, সব সাজসরঞ্জাম তার সাহিত্যিক বৈঠকখানাকে একেবারেই ওলটপালট করে দিয়েছে। লেখাপড়ার হিসেব কিতেব এখান থেকে উঠিয়ে ছোট দালানের পাশের কাঠের পার্টিশন দিয়ে

তৈরী একখানা ছোট চিলেকোঠায় পোঁছে দেওয়া হয়েছে। কাঠের ঘর এখনো পুরোপুরি তৈরী হয়নি, তাই ছুতোরের থলে আর কাঠ এক কোণে রাখা আছে। ওপরের ঘরে বিশেষ পরিবর্তন হয়নি তবু তার মধ্যে নতুনত্বের ছোঁয়া দেখা যাচ্ছে। দোলের উৎসবে পরার জন্য বাড়ির সকলের নতুন দামী মচমচে লোফার শু, মেয়েদের নতুন ডিজাইনের স্যাণ্ডেল, বাড়ির সকলের পায়ের চটি থেকে নিয়ে মাথা পর্যন্ত ধোপদস্তুর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এ বাড়ির দৈনন্দিন জীবনধারায় কোথাও নতুন পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের পুরোনো চেহারা বদলে গেছে।

মহিপাল ছাদে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গলির দোলের আনন্দমেলা দেখে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

কল্যাণীর আজ দম ফেলার সময় নেই। নানা রকমারী মিষ্টি তৈরী করতে সে ব্যস্ত। কাল হবু বেয়াইয়ের বাড়ি মিষ্টি পাঠাতে হবে। কল্যাণী আর মহিপালের বাড়িতে ঐ প্রথম কাজ, বিয়ের সম্বন্ধ তারা নিজেরা ঠিক করেছে তায় আবার ভাগ্নীর। কল্যাণী তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সাতগুষ্টি লোককে একবার দেখাতে চায় সে কত বড়লোক, তার মন কতটা উদার। তার স্বামী এত বড় লেখক যে কুড়ি হাজারের মত মোটা চেক আসে তার নামে, কেবল একখানা বই থেকে তার এত আয়! কল্যাণীর মুখে আজ সে চাঁচাছোলা কথার বাঁধুনি নেই, আজ সে স্বামীর গর্বে গর্বিতা গৃহস্বামিনী। নাকে হীরের নাকছাবি, কানে মুক্তোর দুল, গলায় সোনার চিক, কোমরে সোনার পেটী, হাতে কাঁচের চুড়ির সঙ্গে সোনার ডায়মণ্ডকাটা তাগা, পায়ে বিছিয়া (পায়ের বড় আঙুলের পাশের আঙুলে রুপোর আংটি পরেন সধবারা)। স্বামী দেবতার

বিশেষ আগ্রহে পায়ে ঘুঙুর দেয়া মল উঠেছে। কল্যাণী লক্ষ্ণৌয়ের বাজপেয়ী বামুন-পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ করেছে শকুন্তলার। জামাই সচিবালয়ে দুশো চল্লিশ টাকা মাইনের কেরানী। বড় ভাই জঙ্গলের ঠিকা নেন, জামাইয়ের ছোট ভাই এম. এ. পড়ছে, শাশুড়ী ননদের বালাই নেই। জামাই বাবাজী একান্নবর্তী পরিবারে থেকেও স্বাধীন। এক বাড়িতে সব ভাইরা মিলে থাকেন, একই উনোনে সকলের রান্না হয় কিন্তু খাইখরচ বউদির হাতে দিতে হয়। বাড়ির খরচ খরচার হিসেব কিতেবের বিষয় কোন গোলমাল নেই, বনিবনা ভালো আছে। ভগবানের আশীর্বাদে শকুন্তলা ভালো ঘরবরে গেছে। যে দেখবে বা শুনবে, সেই মামা-মামীর প্রশংসা না করে পারবে না। জামাই খুব ভালো, কেবল দশ হাজার নগদেই রাজী হয়ে গেছে, তাছাড়া দশ হাজার নগদ দেওয়া যে-সে লোকের কর্ম নয়। বড়লোক না হলে এত ক্ষমতা কার আছে? মহিপাল রান্নাঘরের পিঁড়িতে বসে আছে। নানা রকমের সাজানো মিষ্টির থালা আর গয়না পরে সাজাগোজা কল্যাণীকে দেখে তার চোখ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। মহিপালের ভাবনা চলছে, কর্তা আর পিতা, সন্তোষ আর দম্ভ দুই বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে যেন সে এক মূক দর্শক। কড়ার গরম ঘিয়ে পেরাকী ছাড়তে ছাড়তে স্বামীকে দেখে কল্যাণী ডান হাতের কনুই দিয়ে মাথার কাপড় একটু টান দিয়ে বললে— কে এসেছিল?

—সাহজনফ রোডের বড় বাড়ি থেকে নবাব খাঁজাখাঁ সজ্জনের চাপরাশি এসেছিল।

—কী হুকুম করেছেন তিনি? নেমন্তন্ন ক্যান্সেল না কি?

—না না ডবল ডবল। চারটের সময় নৌকা করে বেড়ানো

তারপর ফুচকা, দইবড়ার প্রোগ্রাম, রাত্তিরে ভূরিভোজনের পর এলফিন্টনে 'সংসার' বায়স্কোপ দেখার প্রোগ্রাম করা হয়েছে।

—সংসার আবার দেখার মত বায়স্কোপ না কি? রাজ্যশ্রী মুখ বেঁকিয়ে বললে— বোর হয়ে যাবে বাবা তুমি, পপুলর আপীল আছে এই পর্যন্ত বাস্। এত নামকরা আর্টিস্টের বউ কাকীমা, নিজে এত প্রগতিশীল তবু···

—কাকীমার কোন দোষ নেই, তোমার মা আর কর্নেলের পছন্দ।

—এর থেকে ভালো হত যদি আমরা 'বাহার' দেখতাম।

—যেমনি নাগনাথ তেমনি সাপনাথ— প্রভেদ কিছুই নেই। 'বাহারে' এমন কী মর্ডান ব্যাপার দেখিয়েছে? মহিপাল মেয়েকে আদর করে ধমক দিলে— আজকাল যতসব আনন্যাচারেল বাজে পচা সব বই তৈরী হচ্ছে। আমার মনে হয় 'সংসার' এ-সবের চাইতে ভালোই হবে।

রাজ্যশ্রী মাথা হেঁট করে থালা থেকে পেরাকী তুলে বড় টিনের কৌটায় ভরতে গিয়ে অন্যমনস্ক হওয়ায় দু'তিনখানা মেঝেতে পড়ে গেল। ঝারি দিয়ে পেরাকী বার করে পাশের উনুনে চড়ানো রসের কড়ায় ফেলতে গিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা মেয়ের দিকে নজর পড়তেই বিরক্তির আগুন যেন কল্যাণীর কথায় ঝরে পড়ল— সিনেমার গল্প পেলে আর কিছু চাই না তোমাদের, এ গল্প পরে করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? ঘর-সংসারের কাজে একদম মন নেই এই রজ্জোর।

—পড়ে গেল মা— বলে রজ্জো তাড়াতাড়ি মেঝের পেরাকী উঠিয়ে কৌটোয় রেখে দিলে।

—এই দেখো, এই দেখো, আক্কেলখানা একবার দেখো, মেঝে থেকে উঠিয়ে…

—তাতে কী হয়েছে মা? ধোয়া পোঁছা মেঝে।

—রজ্জো, এখান থেকে দয়া করে তুমি বিদেয় হও, তোমার কাজ আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। কল্যাণীর মুখের কথা শেষ হবার আগেই রাজ্যশ্রী ধম্ করে মেঝেতে থালা রেখে দিয়ে দুম দাম পা ফেলে চলে গেল। মা-মেয়ের বাক্‌যুদ্ধে মহিপাল একেবারে চুপ হয়ে বসে আছে। রজ্জো চলে যাবার পর গলা নামিয়ে কল্যাণীকে বলল—তোমার ধর্ম আচার বিচার সব একেবারে সেকেলে, এযুগে তোমার এসব মানছে কে?

—আমার ভারি বয়েই গেছে, আমি তাই বলে নিজের কুলমর্যাদা ছাড়তে যাব কোন্ দুঃখে?

—'না না, ছেড়ো না আবার' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহিপাল ঠাট্টাচ্ছলে বললে—তোমার এই ধর্মকর্ম, আচার-বিচারের চোটে আমার অবস্থা নাজেহাল হয়ে যাচ্ছে পণ্ডিত মশাই—বলতে বলতে সহসা যেন অজ্ঞাত বেদনায় তার মুখের রেখা আরো সুস্পষ্ট ভাবে দেখা দিল, চোখ বুজে এল। ক্ষণিকের জন্য যেন আশেপাশের পরিবেশ ভুলে সে এক গভীর চিন্তাধারায় ডুবে গেল।

—তোমার ধর্মকর্ম জ্ঞানের পায়ে কোটি কোটি নমস্কার। ছেলেপুলেরা সব তোমার অভ্যেস দেখে দেখে শিখছে। তবে হ্যাঁ আমার শকুন্তলা বড় ভাল বুঝদার মেয়ে, যা আচার-বিচার মানার শিক্ষা দিয়েছি সব…

—হাঃ হাঃ হাঃ, তোমার সামনে ভয়ে শকুন্তলা পাকা ব্রাহ্মণী সেজে থাকে। ওর শ্বশুর বাড়িতে কিন্তু আমার ধর্মই সকলে

মানে, খাঁটি বাজপেয়ী কিন্তু তোমার মতো তারাও বামুন নয়—হাঃ হাঃ।

—না হলেই বা, আমার এসবে মাথা ঘামাবার দরকারটা কি? আরে কথায় আছে না আর সে রামও নেই আর সে অযোধ্যাও নেই। শাস্ত্রে লেখা আছে কলিযুগে আচার-বিচার কেউ মানবে না, সব ম্লেচ্ছ হবে। উমাশঙ্কর তোমার মত সব-কিছু খায় দায় নাকি? মহিপাল গম্ভীর হয়ে গেল— না না, উমাশঙ্কর বড় সৎ ছেলে। আমি কারুর মুখে ওর বিষয়ে ভালো ছাড়া মন্দ শুনি না। হোটেলে বসে খায়টায় এ খবর আমি পেয়েছি।

—তাহলে শিবশঙ্করের বাড়িতে···

—হ্যাঁ, তোমার মত পুরোপুরি না হলেও অর্ধেক ব্রাহ্মণী তো বটে। হাঃ হাঃ। সেদিন শিবশঙ্করকে নিজের কাছে বসিয়ে আমি খুঁটিয়ে সব কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, মেয়েপক্ষের দায়িত্ব কতবড়। আমি নিজে ভুক্তভোগী কিনা তাই ছেলেমেয়ের বিয়ে এমন ঘরে দেব যেখানে তোমার মত পাকা ধার্মিক তাদের বাড়িতে নেই, রোজ তা হলে সাপে নেউলে হতে থাকবে আর মনের শান্তি নষ্ট।

—দিও না অমন জায়গায় বিয়ে, আমায় কথা শোনাচ্ছ কি? আমি বিয়েতে দুটো জিনিস দেখি, স্বগোত্র আর লোক ভালো। আমার ইচ্ছে বড়কু (বড় খোকা) আর রজ্জোর বিয়ে তাড়াতাড়ি সেরে ফেলি, আমিও একবার দেখিয়ে দেব একা গট্টুই বড়লোক নয়। এই কাজের সময় ভগবান মুখ রক্ষে করেছেন। দশ হাজারের খাঁই মেটানো সোজা কথা নয়। সেদিন জয়কিশোরের বাড়ি মুন্নুরের মার সঙ্গে দেখা···

স্ত্রীর মুখরোচক গল্প মহিপাল মন দিয়ে শুনছে। কল্যাণী আজ

বেশ উঁচু গলায় কথা বলছে। মুন্নরের মা একবার বিদ্রূপের চিমটি কেটে বাড়ির কথা ফাঁস করার জন্যে তাকে বলেছিল যে মহিপাল বড়লোক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু পকেটে ঠন ঠন বাবাজী। ভালো ঘরের কে এই হা ঘরে সম্বন্ধ করবে? কল্যাণীর মুখে সে কথা শুনে মহিপালের কাটা ঘা খোঁচা খেয়ে যেন আবার টনটন করে উঠেছিল। সেই মুন্নরের মার কথা আজ আবার কল্যাণী তুলেছে, মহিপাল উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল— কি বললে মুন্নরের মা?

—সে আর কোন্ মুখে কথা বলবে? আমি নিজেই কথা তুলে শুনিয়ে দিলাম যে অন্যদের বড়লোকোমি লুটের আর বেইমানীর পয়সা আর আমাদের ঘর-সংসার ধর্ম আর তপস্যার তেজে টিঁকে আছে। আমাদের ব্যাঙ্কের খাতায় লক্ষ দু'লক্ষ টাকা নেই বটে কিন্তু যখন যেমন দরকার ভগবান ঠিক পূর্ণ করে দেন। দশ হাজার এই শকুন্তলাকে দিলাম— বলতে বলতে উত্তেজনার আবেগে কল্যাণীর নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এক মিনিট গলা ভিজিয়ে নেবার জন্য সে চুপ করল। পেরাকী সব ভাজা হয়ে গেছে, কাছেই রাখা গামছা দিয়ে ধরে কড়া নামিয়ে মেঝেতে রেখে ঘাম মুছে নিয়ে পিঁড়িতে বসে বিশ্রাম করতে লাগল। মহিপালের ঔৎসুক্য জেগে উঠেছে। আত্মপ্রশংসা আর আত্মপ্রচার, দুই মানুষের চরিত্রের দুর্বলতা।

—তারপর মুন্নরের মা আর কী বললে? ওখানে আর কে কে ছিল?

—সকলেই ছিল। ভাজা পেরাকীর থালা কাছে টেনে রসে ফেলার ব্যবস্থা করতে করতে কল্যাণী বলল—জয়কিশোরের মা

ছিলেন, ওর বউদি, জয়কিশোরের স্ত্রী— কিন্তু আমি কারুর পরোয়া করি না, কারুর খাই না পরি যে তাদের তাঁবে থাকব? আমার মত ভাগ্য এরা পাবে কোথায়? এতদিন এদের ফটফটানি শুনে এসেছি কিন্তু কপাল মন্দ বলে উত্তর দিতে পারিনি। ভগবান এখন দিন দিয়েছেন, এদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব। আমি মিষ্টি মিষ্টি করে শুনিয়ে দিয়েছি যে অন্যদের মানসম্মান, বাড়ি ঘরদোর, বাবুআনির লটবহরের লীলাখেলা দু'দিনেই সাঙ্গ হবে, কিন্তু আমার বাড়ির মর্যাদায় আঁচ লাগবে না, যত দিন যাবে ততই মানসম্মান বৃদ্ধি পাবে। শহরে তোমাদের জ্ঞাতিদের বড় বড় ডাক্তার-উকিলরাই চেনে, কিন্তু আমার এঁর নাম দেশবিদেশের লোকেরাও জানে। বড় বড় অফিসারেরা আমার এঁকে চেনে, এঁর লেখা বই পড়ে। আমার বাড়ির লোকের সঙ্গে অন্যদের তুলনা? বলতে বলতে কল্যাণী ঝারা করে পেরাকী উঠিয়ে রসে ফেললে।

কল্যাণীর মুখের প্রত্যেকটি কথা যেন মহিপাল গিলছে— আরে দূর পাগলি, নিজের মুখে এসব কথা বলতে নেই।

—কেন বলব না? কল্যাণীর নড়াচড়ার সঙ্গে গয়নার সুমধুর ঝঙ্কার মহিপালের কানে গেল। আরে এতদিন পরে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। হে ঈশ্বর, তোমার আয় যদি এইভাবে সমানে আসতে থাকে আর আমার ছেলেরা মোটা টাকা বিয়েতে নিয়ে আসে তাহলে দু'বছরের মধ্যে বাড়ি গাড়ি সব দাঁড় করিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি।

মহিপালের স্বপ্নাতুর চোখে বৈভবের নেশার ছোঁয়া লেগেছে। স্বামীর হাত ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে কল্যাণী— আরে কী করছ?

ছেলেমানুষি কোরো না··· আমাকে ছুঁয়ে দিও না··· আরে আরে কেউ এসে পড়বে।

সত্যিই বলার সঙ্গেই শকুন্তলা রান্নাঘরে ঢুকল। মহিপাল দাঁড়িয়ে হাত-পা সোজা করে আড়ামোড়া ভেঙে আলিস্যি দূর করার বাহানা করে, তারপর শকুন্তলার মাথায় চাঁটি মেরে আদর করে বললে— কী রে? তুই শ্বশুর বাড়ির জন্যে মিষ্টি তৈরী করছিস না যে বড়? শকুন্তলা লজ্জা পেয়ে মুচকি হেসে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে মহিপাল জিজ্ঞেস করলে— সজ্জনের চাকর চলে গেছে?

—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।

—তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে নাও, বুঝলে? আজকে দোলের দিন— মহিপাল ছাদে উঠে গেল। শিবালয়ের রোয়াকে জলের ইঁদারার পাড়ে বসে রঙ মেখে পাঁচ-সাতজন ছেলে বসে হাসি-মস্করা করছে। একটি ছেলে জোরে হাসতে হাসতে বন্ধুদের শোনাচ্ছে কেমন করে সে তার দু'তিনজন বন্ধু সঙ্গে নিয়ে গলিতে মালীনকে ঘেরাও করেছিল, কেমন সে ভয় পেয়ে থর থর করে কাঁপছিল, বেশ মজা হল, পরে তারা মালীনকে কেমন করে খুসী করলে ইত্যাদি। সকলে মিলে হো হো করে হাসছে। বালিশে ঠেসান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় মহিপালের কানে কথার সঙ্গে হাসির আওয়াজ ভেসে এল, বিশ্রী নোংরা কথাবার্তা আজকের উৎসবের দিনে যেন বড় বেমানান শোনাচ্ছে। দোলের উৎসব যদিও মদনের পর্ব কেননা ফাগুন মাসে বসন্তের ছোঁয়ার সঙ্গে কামরসের সম্বন্ধ আছে।

সহসা শীলার চেহারা তার মনের রোশনদানের ফাঁক দিয়ে সে

দেখতে পেল। মহিপালের নাকে যেন তীব্র সুগন্ধি ভরে গেল। তার শান্ত সমাহিত মনে যেন হঠাৎ সুপ্ত কামনার ঝড় উঠল। আজ দোলের দিনে শীলার সান্নিধ্য থেকে সে অনেক দূরে। শীলাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। নৈতিকতার উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মনের সংকল্পের মধ্যে আবার শীলা কেন প্রবেশ করছে? শীলা আজ নিশ্চয় কত উদাস হয়ে বসে আছে। শীলার সঙ্গে জীবনের যে কটা বছর, মাস, দিন আর ঘণ্টা কাটিয়েছে, তারাই আজ আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের মত তার জীবনাকাশকে শান্তি দেবার চেষ্টা করছে। শীলা একজন নামী ডাক্তার, শহরের প্রতিষ্ঠিত মহিলা। দেশের একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক হিসেবে মহিপাল শুক্লের নাম প্রদেশের বড় বড় উৎসবের আমন্ত্রিত অতিথিদের লিস্টে নেই কিন্তু ডাঃ শীলা স্থইং সমাজের সবচেয়ে উঁচু সোসাইটিতে নিমন্ত্রণ পেয়ে থাকে। শীলার কাছে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা আছে। স্বাধীন ব্যক্তিত্ব তবু কত বিনয়ী, কত ঠাণ্ডা মেজাজের। শীলা তাকে সম্মান করে। শীলা নিজের মিষ্টি কথা আর ব্যবহারে তার শুষ্ক মরুভূমির মত জীবনে আনন্দের সঞ্চার করেছে। বিজ্ঞানের পরিধির ভেতরে থেকে যারা সেই নিয়ে নাড়াচাড়া করে, তারা বেশীর ভাগ সাহিত্য আর আর্টের প্রতি উদাসীন থাকে, কিন্তু শীলা ঠিক তার উলটো। যদি কখনো অজান্তে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে ওমনি শীলা সতর্ক হয়ে উঠেছে, তাকে ব্যথা দেবার কোন কারণই শীলা যেন সহ্য করতে পারে না। সেই শীলাকে আজ সে ব্যথা দিয়ে চোরের মত ঘরের কোণে বসে আছে?

মহিপালের সুখী গৃহস্থালিতে শীলার বেদনার ঝড় বয়ে গিয়ে

সব যেন কেমন ওলটপালট হয়ে গেল, তাকে একবারটি দেখার জন্য মহিপালের মন আঁকুপাঁকু করে উঠল। একবার তার বাড়ি গিয়ে তার সঙ্গে দোল খেললে তার দোল রসময় হয়ে যাবে। সে নিশ্চয় যাবে, কেন যাবে না? পদে পদে সমাজের ভয়ে কতদিন সে মুখ লুকিয়ে চোরের মত ঘুরে বেড়াবে? সমাজের সুতীক্ষ্ণ নজরের আড়ালে থেকেও এ প্রেম সম্বন্ধ জিইয়ে রাখা সম্ভব। এতদিন সে বিশেষ সতর্ক হয়ে চলাফেরা করেনি তাই লোকের মুখে কথাটা রটে গিয়েছিল। মহিপাল শীলার সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবতেই তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে দাঁড়াল। বাইরে দোতলার ছাদে বাচ্চারা খেলা করছে। কল্যাণীকে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রান্নাঘরের বারান্দা দিয়ে ঘরে যেতে দেখা গেল। তাকে দেখেই মহিপালের এতক্ষণ ধরে তৈরী পরিকল্পনা মুহূর্তে ভেস্তে গেল। না না, শকুন্তলার বিয়ে দিতে হবে, বাড়িতে বউ আসবে। আমি এখন আর একা নই, স্বাধীন নই। আমাকে আমার মনের সমস্ত কামনা বাসনা ত্যাগ করতেই হবে।

এই স্বেচ্ছাবন্ধন মেনে নিয়ে মহিপালের মন ভীষণ ছটফট করছে বুদ্ধি-বিবেচনার কষ্টিপাথরে যখন সে নিজের দেউলে মনকে যাচাই করলে, পরিণাম দেখে সে নিজেই নির্বাক হয়ে গেল— তার মধ্যে দেখা দিল ভাবহীন বিরাট শূন্যতা, সেখানে সে নিজে, কল্যাণী, শীলা— কেউ নেই, আছে কেবল পাথর চাপা দেওয়া তার অনুভূতির স্রোত, বাকী সবটাই ফাঁকা ফাঁকা বিরাট শূন্যতা।

চল্লিশ

ডাঃ শীলা ব্যালজাকের জীবনী পড়ছে। আবছুল এসে চায়ের ট্রলি পালঙ্কের কাছ ঘেঁষে লাগিয়ে চলে গেল। কার্ডের নিশান লাগিয়ে বই বন্ধ করে শীলা তার পাশের সাইড টেবিলে রেখে দিলে। তাকে বড় কাস্ত দেখাচ্ছে, চোখেমুখে নেমে এসেছে অবসাদের ক্লান্তি। বিছানা থেকে উঠে চা খেতেও যেন তার অরুচি। কোনমতে সে আড়মোড়া ভেঙে বিছানায় উঠে বসল, জোজেফ এসে টীকোজীটা নামিয়ে একপাশে রেখে চা তৈরী করে মালকিনকে দিতে ব্যস্ত।

—যাও জোজেফ, আমি নিজেই তৈরী করে নেব'খন।

আবছুল তাড়াতাড়ি কেতলীর হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিয়ে বলল—রাত্তিরে কী রান্না হবে মেমসায়েব? বাইরের কেউ আসছেন না তো?

—না, হাই তুলে শীলা মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, যা ইচ্ছে, দেখে শুনে রেঁধে ফেলো।

আবছুল চলে গেল। শীলা কোনমতে অসাড় হাতটা সোজা করে চা তৈরী করতে লাগল।

মহিপাল তার জীবন থেকে সরে যেতেই যেন তাকে রিক্ততার বাহু গ্রাস করে ফেলেছে। আটত্রিশ বছরের শীলার স্বাস্থ্যের

উজ্জ্বলতা যেন বড় মলিন আর বিবর্ণ, আজ যেন হঠাৎ বার্ধ্যকের সীমায় এসে গেছে। তার জীবনবীণার ঝঙ্কারে যেন সহসা ছন্দপতন হয়েছে, সব যেন কেমন বেসুরো ঠেকছে তার কাছে। এত পয়সা, প্রভাব-প্রতিপত্তি সব-কিছু অর্জিত করার পর আজ সে বড় অসহায়, নিরুপায়, বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে মরছে আজ ডাঃ শীলা। তার অটুট মনোবল আছে, সারা জীবনটা ধরে সে চালিয়ে গেছে অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম, তবেই না আজ সে এই প্রতিষ্ঠার অধিকারিণী হতে পেরেছে! আজ সে মনোবল মহিপালের বিয়োগে যেন দু'টুকরো হয়ে দুমড়ে যাচ্ছে। শীলার সমস্ত আমোদ-আহ্লাদ যেন নিমেষে কান্নার সুরে পালটে গেছে। ইদানীং সে বাইরে যাওয়া-আসা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে, কেবল রুগী দেখে বাড়ি ফিরে আসে। সেদিন অনেকদিন পরে একটা ভালো হিন্দী সিনেমা দেখে এল, মনটা একটু হাল্কা করার বৃথা চেষ্টা। সজ্জন, বনকন্যা প্রায় মাঝে মাঝে এসে ঘুরেটুরে যায়, তা না হলে তার একা জীবনের সঙ্গী কতকগুলো বইয়ের গাদা আর রেডিও।

জন্মের পর থেকেই সে দেখেছে অভাব আর অনটন। উত্তর প্রদেশে প্রায় নিরানব্বই পারসেণ্ট খৃস্টানেরা গরীব। সে যখন ছোট, সে সময় ইউরোপীয় মিশনারীদের কাছেই খৃস্টানরা চাকরী পেত। শীলার বাবা পশ্চিম ইউ-পী-র এক ছোট মফস্বলের মিশনারী স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। মাও পড়াতেন। ছয় ভাইবোনের মধ্যে শীলা তৃতীয় সন্তান, অতি কষ্টে সংসার চলত। শীলা এই পরিবেশের প্রতি জানালে তার বিদ্রোহ। জেদ করে সে এটা-সেটাতে পয়সা খরচ করত, বাচ্চা বয়স থেকেই পরিবারের হাতটান দেখে সে গোমরাতে থাকত।

লেখাপড়ায়, বাদ-বিবাদ প্রতিযোগিতায় সে সব সময়ই উচ্চস্থান অধিকার করত, তাই বোধহয় তার স্বভাবে একটু যেন অহংকারের ছোঁয়া আছে। স্কুলের প্রান্তীয় ডিবেটে সে এলাহাবাদে দু'বার প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। বাড়িতে অসম্মান আর ঝগড়াঝাঁটি, বাইরে সম্মান, দুয়ে মিলিয়ে ডাঃ শীলার মনে সদাই চিন্তা চলত। সে-সময় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের অগ্নিশিখার প্রভাবও তার চরিত্রে ছাপ রেখে গেছে। খৃস্টান সমাজে যাদের গায়ের রঙ পাকা, নির্ভেজাল ভারতীয় খৃস্টান সমাজে তারা তখনকার দিনে নিজেদের বিলিতি সায়েবদের মাসতুতো ভাই মনে করে গর্বে বুক দশহাত করে চলত। ওদিকে বিলিতি সায়েবদের কথা দূরে থাক্, ট্যাসেরা পর্যন্ত তাদের পুছতো না। এত অপমানের পরও তাদের অহংকারে মাটিতে পা পড়ত না। বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের জোয়ার এই সমাজের মনে জাগিয়ে দিলে এক নতুন চেতনা।

দুবেলা দু'মুঠো অন্ন জোটাবার জন্য তারা ইউরোপীয় সংস্থানে চাকরী করতে বাধ্য, অথচ সেই উগ্র রাষ্ট্রীয় চেতনার অভিব্যক্তির ভাষা না খুঁজে পেয়ে তারা বিষণ্ণ। এর ফলে নিজেদের সমাজেও তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। হিন্দু ধর্মের মধ্যে যত ছোট জাত, তারা সকলেই খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত। মুসলমানদের ভেতরেও এই ধর্মের প্রভাব দেখা দিল। ধর্ম পরিবর্তনের সঙ্গে কিন্তু মনের সংস্কার বদলানো সম্ভব হল না, হিন্দু খৃস্টান তার ছেলেমেয়ের জন্য হিন্দু খৃস্টানের বাড়িই খুঁজত। সামাজিক সংগঠনে ধর্ম পরিবর্তনের পরও সেই উঁচুনীচুর প্রভেদ থেকে গেল। মুসলমান খৃস্টানেরাও তাদের নিয়মকানুনের মধ্যে আবদ্ধ জীবন যাপন করত, অমুকদিন অমুক দিকে যাওয়া নিষেধ, মেয়ের বাড়ির জলস্পর্শ

করা পাপ, রান্নাঘরে প্রবেশ নিষেধ, সকড়ি, বিয়েতে পণ দেওয়া-নেওয়া, সমস্ত হিন্দু ধর্মের প্রচলিত আচারবিচার নিয়মকানুন মেনে চলত এই নতুন খৃস্টান সমাজ। তারা বাচ্চাদের নাম রাখার সময় হিন্দুস্থানী নামই পছন্দ করত, তাই শীলার বাবা মিস্টার সিংহ হলেন সুইং, রামবলী হলেন বেম্বুল্ল, বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন ব্যানার্জী। অনেক বাড়িতে নামকরণ নিয়ে যুদ্ধও বেধে গেল। এই ছোঁয়া শীলার বাড়িতেও লাগল, তার দুই ভাইয়ের নাম ভিসেণ্ট রাম আর সেমুএল রাম, বাবা স্বসীহ সুইং, আর তৃতীয় ভাই পূর্ণ বিদেশী নাম ধারণ করল স্মিথ ব্রাইট।

শীলা যখন পড়ত, তখন প্রথম খৃস্টান ধর্মে ভারতীয়করণ দেখা দিল। পিয়ানোর জায়গায় তবলা আর হারমোনিয়মের আমদানী হল। বিলিতি ভজনের জায়গায় লাইট শাস্ত্রীয় সুরের ভজন আর ধার্মিক গজল গাওয়া আরম্ভ হল। সলীবের সামনে ভজনের সময় আরতির প্রদীপ ঘোরানো, আমীন আমীন অথবা পীস পীস এর জায়গায় শান্তি শান্তি বলার প্রথা আরম্ভ হল। অনেকে এর বিরোধিতা করলে, ফলে খৃস্টান বিদ্যার্থী সংঘ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।

শীলা ছোটবেলা থেকেই নির্ভীক আর বিদ্রোহিনী, তার এই প্রকৃতির জন্যেই সে প্রতিজ্ঞা করলে যে পাস করার পর বিলিতি মিশনারীদের গোলামি সে কখনো করবে না। তার স্কলারশিপ বন্ধ হয়ে গেল, বাড়ির আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠল। এত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়েও সে কারুর সামনে মাথা নোয়াতে রাজী হয়নি, প্রবল ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সে একদিন ডাক্তারী পাস করে ফেলল। বাড়ির পরিবেশ থেকে দূরে সরে যাবার জন্য সে

তাড়াতাড়ি সরকারী ডাক্তার হিসেবে চাকরী নিলে। ভাগ্য, পরিশ্রম আর স্বভাব সব মিলিয়ে শীলা ক্রমশ উন্নতি করতে লাগল। উনিশশো সাঁইত্রিশ সালে লক্ষ্ণৌয়ের কিং জর্জ হাসপাতালে চান্স পেল। এখানে আসার সঙ্গেই তার ভাগ্য খুলে গেল। গত চোদ্দ-পনেরো বছরের মধ্যে ডাঃ শীলা সুইং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর সমৃদ্ধ হয়ে নিজের প্র্যাক্‌টিসে বেশ পসার জমিয়ে বসেছে। বয়স-কালে নিজের ধর্মের একজন নবযুবকের সঙ্গে তার প্রেম হয়। পল ভারতীয় সংস্কৃতি ভালোবাসত, দু'জনে একসঙ্গে ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য আর ইতিহাস পড়ত। প্রবল উৎসাহে তারা একাগ্র মনে বড় বড় বই পড়ে তার আলোচনায় তন্ময় হয়ে যেত। হঠাৎ পলের কলেরা হল, চারদিনের মধ্যে সব-কিছু শেষ হয়ে গেল। তারপর দু'জন যুবক তার জীবনে এল, কিন্তু তারা বন্ধুত্বের পরিধিতেই থেকে গেল। এতকাল পরে মহিপালই তার শূন্য জীবনের রিক্ততা পূর্ণ করতে পেরেছে। সুন্দর, বলিষ্ঠ, সহৃদয় সাহিত্যিক, লেখাপড়ায় ঝোঁক, আত্মাভিমানী আর বিদ্রোহী ব্যক্তিত্বের মহিপাল শীলার মুকুটমণি। তাকে সে নিজের দেহ, মন, সব-কিছু বিশুদ্ধ ভারতীয় নারীর মতই সমর্পণ করেছে। সে প্রাণভরে তার প্রিয়তমকে আর্থিক সংকট থেকে মুক্ত করতে চায় অথচ মহিপাল হাত পেতে কিছু গ্রহণ করতে নারাজ। মহিপালের এই পৌরুষের সামনে শীলা শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। আজ একা বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে মহিপালের বাড়ির কথাই তার মনে হচ্ছে। কল্যাণী আর তার ছেলেমেয়ে, সত্যিই সে বাচ্চাদের ভালোবাসে কেননা তারা মহিপালের বংশধর। ভুলেও কোনদিন তাদের অশুভ কামনা মনের কোণে উঁকি মারে

না। কল্যাণীর সঙ্গে তার দূরত্ব একভাবেই বজায় থেকেছে। কল্যাণীর মত লেখাপড়া না-জানা সাদাসিদে নিরীহ মেয়েমানুষ যে কখনোই তার পথের কাঁটা হতে পারে না, এ বিশ্বাস তার আছে। খিটখিটে, জেদী আর ছুঁচিবাইগ্রস্ত স্ত্রীর কবলে পড়ে মহিপালের মন-মেজাজ ইদানীং বেশ খিচড়ে থাকে। শীলা তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মন-মেজাজ ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু মহিপালকে তার পরিবার থেকে আলাদা করে একান্ত নিজের করে পাওয়ার তৃষ্ণা তার মনে কোনদিনই আসেনি। কল্যাণীর ভাইয়ের বিয়েতে যেদিন মহিপাল আর শীলার সম্পর্ক নিয়ে কানাঘুষো হতে হতে বিস্ফোরণ হল, সেদিন কল্যাণী তার স্বামীর জীবনে অন্য মেয়ের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা করলে। যারা আজ তার মহিপালকে তার জীবন থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে, সে সেই পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির বিপক্ষে। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ব্যালজাকের উপন্যাস পড়তে পড়তে মহিপালের কথা ভেবে সে যেন কেমন আনমনা হয়ে গেল, নরম পালকের মত মৃদু ভালোবাসার স্পর্শটুকু থেকে আজ সে বঞ্চিত। ম্যাডাম ডী বর্নী আর ব্যালজাকের প্রেম বর্ণনা পড়ছিল, এক জায়গায় লেখা আছে যে মান অভিমান, গৃহকলহ, গ্রাম্য জীবনের স্থূল ইঙ্গিত— কেউ তাকে তার প্রিয়তমার প্রতি তার তীব্র ও প্রচণ্ড ভালোবাসাকে বাধা দিতে পারেনি। বইয়ে লেখা এ কয়েকটা লাইন যেন তার চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। আজ দোলের দিন, একলা ঘরে সে বসে আছে, ভবিষ্যতে তাকে একাই জীবননৌকো চালিয়ে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে হবে। শীলা সাধারণ মেয়েমানুষ নয়, একজন ডাক্তার, তার প্রতিষ্ঠা আছে, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, গাড়ি বাড়ি ·· তবু এই কি

সব? নর-নারীর জীবনে সুখের জিনিস বলতে কি এই-সবই বোঝায়? মহিপালকে ঘিরে তার অনুরাগে ভরা মন আজ বিষণ্ণ, বিষাদগ্রস্ত মনে স্মৃতিনির্ভর অতীত আর বর্তমানের রিক্ততা, সব ভেবে সে যেন পাগল হতে বসেছে। একটা অসহ্য যন্ত্রণা তার বুকের মধ্যে গুমরে উঠছে। শীলার মনের স্মৃতিদর্পণে মহিপালের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠল, সুন্দর বলিষ্ঠ দেহে প্রেমের উত্তাপ, তার দিকে তাকিয়ে সে হাসছে। তাকে দেখে আনন্দের আবেগে শিহরিত হয়ে উঠল তার দেহ, তার সতৃষ্ণ নয়নের পিপাসা বুঝি শান্ত হল।

—কী ব্যাপার, একা বসে বসে চা খাওয়া হচ্ছে—বনকন্যার গলার আওয়াজে যেন শীলা হঠাৎ ঘুম ভেঙে চমকে উঠল। বনকন্যা আর সজ্জন দরজায় দাঁড়িয়ে। কন্যা আজ দামী গয়না, শাড়ি পরে এসেছে। তার এই পরিবর্তন শীলার চোখ এড়ালো না। সাজগোজ করে বধূবেশে তাকে আজ বেশ দেখাচ্ছে। হঠাৎ তাকে দেখে ডাঃ শীলার মনে ভারতীয় এয়োস্ত্রীর কল্পনা যেন সাকার হয়ে উঠল। মহিপালের মত পুরুষের কথা ভাবতে ভাবতে তার চিন্তাধারা আটকাল এয়োস্ত্রীর সৌভাগ্য কল্পনায়। এয়োস্ত্রীর মুখের সৌন্দর্যের উপমা খোঁজা কঠিন। এক মুহূর্তের জন্যে শীলার মনে হল, সেও যদি কন্যার মত এয়োস্ত্রী হত।

—ইনি আজকাল একা থাকতেই ভালোবাসেন, বড়লোক কিনা? সোশাল হবার অভিনয় করে চটপট হাত ঘুরিয়ে কৃত্রিম আক্রোশের ভান করে শীলা বললে—ওহঃ তু-র্জন! হাউ ব্রুট ইউ আর। কন্যা, তুমি তোমার এই স্বামী নামধারী জীবটির কথা একেবারে বিশ্বাস কোরো না। আজকাল এত রুগীর লাইন যে…

—এটা কেন স্বীকার করছ না আজকাল ডাক্তার নিজেই রুগী হয়ে বসে আছেন? সজ্জনের প্রশ্নের উত্তরে শীলা নিরুত্তর, যেন আচমকা দমকা হাওয়ার মতই কঠিন সত্য নগ্ন রূপে সকলের সামনে ধরা দিয়েছে।

চাকর চা দিয়ে গেল। গল্পগুজব হতে লাগল। শীলা তাদের খবরাখবর জিজ্ঞেস করল। বড়র আর কোন খবর পাইনি, কন্যা বললে। আমি কিছুদিন আগে হজরতগঞ্জে তাকে বোরের সঙ্গে দেখেছিলাম। একজন তাগড়া মত জোয়ান সঙ্গে ছিল। মেক-আপের মধ্যে ঢাকা তার আসল চেহারার মর্মভেদী চাউনি তার ট্র্যাজিক অবস্থার কাহিনী মূক ভাষায় জানিয়ে গেল।

—অনেক সময় আমি ভাবি সমাজ সৃষ্টি না হলেই হয়তো মানুষের ভালো হত! এই সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান আর এডুকেশনের লম্বা লম্বা কথা আজ মানুষ আওড়াচ্ছে, এসব কৃত্রিম আবরণের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার দরকার কিছু আছে কি? আমার মতে মানুষ স্বতন্ত্র হয়ে বেশী ভালোভাবে বাঁচতে পারত। গয়নার লোভে নিজেকে সোনা দিয়ে ঢেকে আজ মানুষের প্রকৃতিদত্ত সৌন্দর্য বিকৃত হয়েছে। তার ভার বয়ে বেড়াতে বেড়াতে আজ সে বড় ক্লান্ত। শীলার শ্লেষমিশ্রিত স্বর বড় করুণ শোনালো।

কন্যা চুপচাপ শুনছে। শীলার মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব সজ্জন বুঝতে পেরেছে, সে জানে বেদনাভারে শীলার মন আজ ভারাক্রান্ত। ত্যাগ করা সত্যিই কঠিন। বাবা রামজীর কথা শুনে সে কি এক কথায় সম্পত্তির মোহ ত্যাগ করতে পেরেছে? না, এ অসম্ভব। সে নিজের ঐশ্বর্যের অংশীদাররূপে অন্যের কল্পনা করতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ ত্যাগের কল্পনা সত্যিই বড় যন্ত্রণাদায়ক। শীলা আর

মহিপালের দুঃখের বোঝা হাল্কা করার উপায় ভাবতেই হবে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারের হাতল ধরে বলল— ডাক্তার, এদিকে এসো, কথা আছে তোমার সঙ্গে। কন্যা, আমি এখুনি আসছি। ঘরের এক কোণে নিয়ে গিয়ে শীলাকে বলল— আজ বিকেলে আমার বাড়িতে ছোট একটা পার্টির আয়োজন করেছি, তোমাকে ডাকার ইচ্ছে ছিল কিন্তু— কর্নেল আর মহিপালের স্ত্রীও আসবে, ওদের ডাকতেই হল, কন্যার বাড়িতে প্রথম দোল··· শোনো, তুমি মহিপালের সঙ্গে দেখা করতে চাও?

—তাকে জিজ্ঞেস করেছ? সে কি চায়? শীলার চোখে বিরাট শূন্যতা।

—আমি তাকে এ বিষয় কিছু জিজ্ঞেস করিনি কিন্তু মহিপাল তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে, তোমার মন কি বলে?

শীলার গাল বেয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ল।

শীলার কাঁধে হাত রেখে সজ্জন বলল— তুমি সাড়ে সাতটার সময় আমার বাড়ি এসে যেও শীলা। তুমি যে সেখানে যাবে, এ কথা কাকপক্ষীতেও জানতে পারবে না। তোমার শুকনো চেহারা দেখে অবধি আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। আমার ওখানে মহিপালকে পেয়ে তুমি ফিরে পাবে তোমার অধরের হাসি, দোলের আনন্দমেলা সার্থক হবে, নয় কি?

সজ্জনের প্ল্যান শুনে শীলার চোখের জল শুকিয়ে গেল, শিশুর মত সে মনের মত মণ্ডা মেঠাইয়ের কথা শুনে খুসী। কতদিন পরে আজ সে তার মহিপালকে দেখতে পাবে।

একচল্লিশ

কন্যা, কল্যাণী আর কর্নেলের স্ত্রী, সকলে এক জায়গায় বসে গল্পগুজব করছে। কল্যাণী এ বাড়িতে অন্নগ্রহণ করবে না, একটু মিষ্টি মুখে দেবে এই পর্যন্ত।

—এসব আচার-বিচার আর কতদিন চালিয়ে যাবে দিদি? এবার কিন্তু বাজে লোকদেখানো ব্যাপার ছেড়ে দিলেই ভালো করতেন, কন্যা বললে।

—আরে, এতখানি বয়স পেরিয়ে গেল, এ বয়সে ধর্মকর্ম নিয়ম কি আর ছাড়া যায়? কল্যাণী মুরুব্বীয়ানা চালে উত্তর দিলে।

—আজ সব রান্না ঠাকুর করেছে, আপনার কথা ভেবে আমি আজ রান্নাঘরে পা দিইনি। বউদিকে দেখুন, ইনিও আচার-বিচার মেনে চলেন কিন্তু আজ···

—আমার ধর্মকর্ম সব ছেলেরা ছাড়িয়ে দিয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সূর্যি ডোবার আগেই খেয়ে নিতুম। আমাদের জৈন ধর্মের তাই নিয়ম। এখন কী আর করি, ইনি আর ছেলেরা মিলে আমার নিয়ম ভঙ্গ করে দিয়েছে, এরা খেলে তবে তো খাব। কর্নেলের স্ত্রী সাফাই গাইলে।

—মেয়েরা যদি নিজেদের ধর্মে অটল থাকে তা হলে পুরুষেরাও মানতে বাধ্য হয় বৈকি, আমার বাড়িতে কি কম মুশকিল? কিন্তু

নিজের বাড়িতে ম্লেচ্ছপনা হতে দিই না, আমরা কুলীন ব্রাহ্মণ। কল্যাণীর মুখে এ কথা শুনে কর্নেলের স্ত্রী গায়ের ঝাল ঝাড়ল— সবাই নিজেদের জাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমাদের জৈন ধর্মের মত শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে? আমাদের কথকতায় বলে কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিজেদের ধর্ম ছেড়ে মহাবীর ভগবানের শরণাগত হয়েছে, কেননা তাঁর ধর্ম ব্রাহ্মণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

কন্যা বিব্রত হয়ে পড়ল— কি মুশকিল, ধর্মের শ্রেষ্ঠতার বিচারে আজকের দোলের সন্ধ্যাটাকে মাটি না করে ছাড়েন এরা, তাড়াতাড়ি সে বললে— আরে বউদি, এসব কথা থাক্। এই উঁচু-নীচু, জাত-পাঁত এসব মিথ্যে, কি বল রাজ্যশ্রী, তোমার কী মত শকুন্তলা?

শকুন্তলা মুখ টিপে হাসল। রাজ্যশ্রী উত্তর দিল— আমাদের বাবাও এসব মানেন না, আমরাও মানি না কাকীমা। এসব সেকেলে কথা।

কন্যা জোরে হেসে কল্যাণীকে বলল— শুনলেন দিদি? কল্যাণী নাক সিঁটকে বললে— আরে এদের কথা রোজই শুনছি, উচ্ছন্নে গেছে সব, কান ঝালাপালা হয়ে গেল বাপু্। এদের কথায় কোন তথ্য আছে নাকি? ভগবানের তৈরী জাতধর্ম, উঁচু নীচু, এসবের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সোজা কথা নয়।

রাজ্যশ্রী তার প্রগতিশীল কাকীমার সামনে মাকে ছোট করার উৎসাহে হেসে বললে— ভগবান কেবল ভারতবর্ষকেই নিজে হাতে তৈরী করেছিলেন আর বাকী দেশ···

—চুপ কর রজ্জো, বেশী বকর বকর করা আমি মোটেই পছন্দ করি না— কল্যাণী তারপর কর্নেলের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললে— যাই বলুন-না-কেন ভাই, নিজেদের ধর্মকর্ম ছেড়ে দেওয়াটা উচিত নয়।

—হ্যাঁ ভাই, সে যা বলেছ, কিন্তু পুরুষের কথা মেনে চলাই স্ত্রীর সব চেয়ে বড় ধর্ম। প্রত্যেক ঘরে ঘরে এখন নতুন যুগের বাতাস বইছে, কতদিন আর নিজেকে বাঁচিয়ে রেখে চলা সম্ভব? তা ছাড়া স্বামীকে দুঃখ দিয়ে যদি ধর্মকর্ম মানতে হয়, তা হলে আমি এর বিরুদ্ধে, সত্যি বলছি।

—কাকীমা, আমাদের যিনি আপন কাকীমা, তাকে যদি দেখেন তো···

—আমি দেখেছি, ভালো করে চিনি।

—তিনি এমন নয়। তাঁর বাড়িতে আমাদের বাড়ির মত ছোঁয়াছুঁয়ি একদম নেই। আমি তাই মাকে বলেছিলুম যে যখন আমরা বাঙলো বাড়ি কিনব তখনও কি এইভাবেই থাকব?

মেয়ের কথা শুনে উৎসুক হয়ে কর্নেলের স্ত্রী কল্যাণীকে জিজ্ঞেস করলে— বাড়িটাড়ি কিনছ নাকি?

মেয়ের কথা শুনে তাকে ঝাঁটাপেটা করতে ইচ্ছে হচ্ছিল কল্যাণীর, কিন্তু হঠাৎ এরমধ্যে বাড়ি কেনার কথা উঠতেই ঝট করে তার রাগ পড়ে গেল— আরে কোথায় ভাই, বাড়িটাড়ির কথা হতেই থাকে, তবে আগে শকুন্তলার বিয়েটা সেরে নি, তারপর ঝাড়া হাত-পা হয়ে তখন নিজেদের মাথা গোঁজার কথা ভাবব।

—শুনেছি শকুন্তলার বিয়েতে অনেক দেওয়া-থোওয়া করছ?

—অনেক আর কি ভাই, হ্যাঁ নিজের পোজিশন-মত করতেই হবে। আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়ে যেমন আমাদের নাম চতুর্দিকে সকলেই জানে তেমনি ব্যবস্থাও করতে হবে। পনেরো-কুড়ি হাজারের কম খরচ হবে না। আমাদের এখানে ভাই খাঁই অনেক।

—কিন্তু ভাই, এত খরচ হবে কোথা থেকে? আমাদের গুরুজী বেচারা···

—কথাটা কল্যাণীর শুনতে মোটেই ভালো লাগল না, হাতের মুক্তোর বালা ঠিক করতে করতে বললে— ভগবান সবাইকে দেন, আমাদের বাড়িতে ব্যাঙ্ক নেই তো কি হয়েছে? এঁর কলমে এমন শক্তি আছে যে এক মিনিটে চেক এসে যায় কয়েক হাজারের। ধর্মকে ছেড়ে এবার দুজনের পয়সার মহিমার বর্ণনা শুনতে শুনতে মেয়েরা বোর হয়ে গেছে, রজ্জো ইশারায় শকুন্তলাকে ডেকে পিট্‌টান দেবার কথা ভাবতেই— কোথায় যাচ্ছ রজ্জো?

—কোথাও নয় মা, এই একটু বাগানে বেড়িয়ে দেখে আসি।

—বাইরে যাচ্ছ যদি তা হলে তোমার বাবাকে বলো যে অনেক দেরী হয়েছে, বাড়ি যাবার সময় হয়ে গেল, না-হয় আমাদের বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা···

—আরে, এত তাড়া কিসের? আজ তো সিনেমা যাওয়ার প্রোগ্রাম আছে।

—না না, সিনেমা-টিনেমা আমি যাব না। বাড়ি গিয়ে কাল সকালে বেয়াই বাড়ি মিষ্টি পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। এবার একটু পরেই আমি উঠব···

মার কথায় কান না দিয়ে রাজ্যশ্রী আর শকুন্তলা সজ্জনের মহলের মত বিরাট বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। রাজ্যশ্রী যেন হঠাৎ স্বর্গলোকে এসে উপস্থিত হয়েছে, এখানকার প্রতিটি বস্তু তার কাছে সুন্দর। সে অবস্থাপন্ন বাপের মেয়ে, তার উঠতি বয়সের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কুঁড়ি অকালেই সংসারের আর্থিক

অস্বচ্ছন্দতার গরম হাওয়া লেগে শুকিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ পয়সার ঝনঝনানি শুনে সে যেন আবার তাজা হয়ে উঠছে। চোখের দু' পাতায় তার লেগে আছে নবযৌবনের স্বপ্নের ছোঁয়া, শকুন্তলার বিয়ে ঠিক হবার পর থেকে যেন তার স্বপ্নে রঙীন ইন্দ্রধনুকের পরশ লেগেছে। উঠতে বসতে সে এখন নিজেকে হিরোইন ভাবছে, তার সন্ধানী চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে নিজের হিরোকে। কন্যা-কাকীমা আর সজ্জনকাকার ঠাটবাটের সাম্রাজ্যে বিচরণ করতে করতে সে তার স্বপ্নের খোরাক পেয়ে তৃপ্ত, সে মুগ্ধ হয়ে শকুন্তলাকে বলল— কাকীমার খুব বরাত জোর, না রে? এ তো বাড়ি নয় যেন রাজপ্রাসাদ।

—তুই নিজের জন্যে এমনি একটা রাজপুত্তর আর রাজপ্রাসাদ জোগাড় কর।

—আমাকে জিজ্ঞেস করলে তো? তুই আমাকে ভেবেছিস কি? রজ্জো চোখ পাকিয়ে,— আমি তোমার মত বোবা সেজে মাকে সন্তুষ্ট রাখতে রাজী নই বুঝলে? সামনের বড় আয়নাটায় নিজের প্রতিচ্ছবি একবার ভালো করে দেখার সময় তার শকুন্তলার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

শকুন্তলাকে মুখ টিপে ভারিক্কি ভাবে হাসতে দেখে রাজ্যশ্রীর রাগে গা জ্বলে গেল, সে যদিও বয়সে শকুন্তলার চেয়ে তিন বছরের ছোট, কিন্তু তাদের ভাবসাব সমবয়সীয় মত। কার্পেট পাতা সিঁড়ি দিয়ে নামতে শকুন্তলাকে এক কনুইয়ের ধাক্কা মেরে চোখ পাকিয়ে রাজ্যশ্রী বললে— হাসছ কেন?

—খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে 'ওয়াণ্টেড কলম' ছাপিয়ে দে যে, 'লক্ষপতি স্বামী চাই রাজকন্যার'।

—আমি না ছাপিয়েই পেয়ে যাব, তোমার দরকার হয় তো ছাপাওগে যাও।

—আমার লক্ষপতি স্বামীতে শ্রদ্ধাভক্তি নেই। সিঁড়ির নীচে বাঁদিকের ছোট ঘর থেকে বনকন্যা বেরিয়ে এসে, সামনেই এদের চোরের মত চারিদিকে তাকাতে দেখে বললে, কোথায় যাচ্ছ?

—না কিছু নয়, এই একটু বাগানে— রাজ্যশ্রী তাড়াতাড়ি গলার স্বরকে যথাসাধ্য নম্র করে উত্তর দিলে। বনকন্যা ওদের সঙ্গেই এগুলো।

নীচে বৈঠকখানায় সজ্জন, কর্নেল আর মহিপাল বসে আছে। মহিপাল আজ অবস্থাপন্ন ঘরের কর্তা হিসেবে বসে— পায়ে দামী চটি, মিহি কোঁচানো ধুতি, সিল্কের জামা, জ্যাকেট, ফিবরলিউবা ঘড়ি, শেফর্স-এর সোনালী পেন, হাতে পোখরাজের আংটি। সে বেশ গর্বের সঙ্গে কর্নেল আর সজ্জনকে তার আয়ের ফিরিস্তি বোঝাতে ব্যস্ত।

বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত করে কর্নেল বললে— বাবুর ভাগ্য একেবারে খুলে গেছে। কিন্তু হঠাৎ আচমকা এত রয়েলটী এলো কোথা থেকে? কোথায় সারা বছরে সাড়ে তিন হাজার টাকায় টানাটানির সংসার চলত আর কোথায় টপ করে রাতারাতি রাঘব বোয়াল হয়ে গেলে।

—আমার একখানা বই পাঞ্জাব ইউনিভারসিটির কোর্স বই হয়ে গেছে। মহিপাল চোখ নাচিয়ে বিজ্ঞের মত একপাশে ঘাড় কাত করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লে।

—তাহলে এই উপলক্ষ্যে খাওয়াদাওয়ার নেমন্তন্ন কবে? সজ্জন জিজ্ঞেস করলে।

—যেদিন বলবে, আচ্ছা কাল বিকেলে কপুরে…

মহিপালের কথার উত্তর কর্নেল দিল— কপুরে কেন? বাড়িতে নয় কেন?

—বাড়িতে শীলাকে ডাকা সম্ভব নয় তাই। সজ্জন নিজের মনের আশঙ্কা বলে ফেললে।

—শীলাকে আমি এখনিই ডাকছি না, তা ছাড়া সেখানে হুইস্কি পাওয়া যায় বলেই আমি সাজেস্ট করছিলাম।

শীলার নাম উচ্চারিত হতেই মহিপালের চোখেমুখের ক্লান্তির ছায়া সজ্জনের চোখ এড়াল না। শীলার প্রতি মহিপালের কঠোর ব্যবহার একেবারেই অনুচিত। সে শীলার জীবন থেকে সরে যেতে চায়, যাক, কিন্তু তাই বলে তাকে এমন করে দগ্ধে মারার মানে? মহিপালের এই ব্যবহারে একটা কথা বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সে নিজের মন থেকে শীলার স্মৃতি মুছে ফেলায় অসমর্থ, তাই পরিস্থিতিবশতঃ নির্মম হয়ে পড়েছে। সজ্জন তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে এ জটিল তথ্যকে বুঝতে শিখেছে। মহিপালের এই নির্মম কঠোরতার কারণটা কি? এ বিষয় বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে তাদের সম্বন্ধ অবৈধ তবু শীলা লোক হিসেবে বড় ভালো, বেচারী বড় দুঃখী, দয়ার পাত্র সে।

—কেন? শীলাকে ডাকবে না কেন। মহিপাল নিরুত্তর হয়ে বসে রইল। কর্নেল গরম হয়ে বলল— দেখো সজ্জন, এরমধ্যে ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে গেছে। তুমি বোধহয় এসবের কিছুই জানো না, কেননা তখন তুমি মথুরা গিয়েছিলে।

—আমি জানি। কর্নেল আর মহিপাল দুজনেই সজ্জনের উত্তর শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল। তারা অনুমান করে

নিলে ইতিমধ্যে শীলার সঙ্গে সজ্জনের নিশ্চয় দেখাসাক্ষাৎ হয়ে থাকবে।

—দুজনের মধ্যে একজনকে মুখ বুজে সব সহ্য করতেই হবে। কর্নেল যেন তর্কের যুক্তি খুঁজে পেল।

—সে কথা আলাদা, কিন্তু শীলার সঙ্গে বন্ধুত্ব, মনুষ্যতার সম্পর্ক রাখা অন্যায় নয়।

—আমি আমার সতী সাধ্বী স্ত্রীকে দুঃখ দিয়ে গৃহকলহের সৃষ্টি করতে চাই না।

—তুমি এই সস্তা কথার আড়ালে শীলাকে অপমানিত করবার চেষ্টা করছ।

মহিপালের ভ্রূ কোঁচকালো, সজ্জন সে দিকে লক্ষ্য না করে উত্তেজিত হয়ে বলল—আমি এক স্ত্রীর প্রতি অনুগত থাকা সমর্থন করি। নিজের ভবিষ্যৎ জীবনে আমি কোন আঁচ লাগাতে দেব না কিন্তু তাই বলে বিগত জীবনের দায়িত্বকে আমি অস্বীকার করতে নারাজ।

—তুমি নিজের দায়িত্বের নাম করে নিজের প্রেমিকাদের সঙ্গে লীলাখেলা করে বেড়াবে, অথচ এক স্ত্রীতে অনুগত এ কথা জোর গলায় বলে যাবে··· হুঁ··· কোন প্রোফেসার বোস— ব্যানার্জী— চ্যাটার্জী তোমার বাড়িতে ভূরিভোজন করে গিয়ে এক লম্বা আর্টিকল লিখবে সজ্জনমশাই বিবাহের পর কেমন গৃহস্থ জীবন যাপন করছেন— উফ্ জাস্ট লাইক ইউ।

কন্যা দরজায় দাঁড়িয়ে এদের কথাবার্তা শুনছিল। তার মনে অসংখ্য প্রশ্ন, আশঙ্কা একের পর এক ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। শীলা আর মহিপালের গোপন সম্বন্ধকে সে কোনদিনই ভালো

নজরে দেখেনি, তার নারীত্বের অসীম ধৈর্য যেন প্রতিপদে প্রতিবাদ জানিয়েছে। শীলার ব্যক্তিত্বে সে প্রভাবিত, সে একথাও ভালোভাবে বোঝে যে কল্যাণী মহিপালের অনুপযুক্ত, তা ছাড়া সজ্জনের বিশেষ আগ্রহ দেখে সে এই অনৈতিক সম্বন্ধকে মুখ বুজে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে। সজ্জনের দেওয়া সময় অনুসারে শীলা এসে উপস্থিত, তারই লেখা স্লিপ পেয়ে ভেতর বাড়ি থেকে কন্যা উঠে এসে শীলাকে দাদাশ্বশুরের সীক্রেট রুমে বসিয়ে সজ্জনকে খবরটা দিতে যাচ্ছে।

রাজ্যশ্রী আর শকুন্তলা বাইরে চলে গেল, কন্যা দরজায় দাঁড়িয়ে এদের কথা শুনছিল। মহিপালের কথা শুনে তার মনের নারীত্ব জেগে উঠেছিল, সেও নিজের আর সজ্জনের মাঝে কোন মহিলার ছায়া পর্যন্ত পড়তে দিতে চায় না। শীলার কথা ভাবতেই তার চোখেমুখে প্রশ্নের ধূসর রেখা দেখা দিল। মহিপাল শীলার সঙ্গে দেখা করা পছন্দ করবে? উত্তর খুঁজে না পেয়ে তার বুকটা আশঙ্কায় কেমন যেন ধড়াস ধড়াস করে উঠল। সোয়ামীদয়াল চাকর বাইরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। বাড়িতে অতিথি অথচ সে চুপচাপ একদিকে দাঁড়িয়ে আছে, চাকররাই বা কি ভাববে? তাকে দেখেই কন্যা তাড়াতাড়ি চুরির দায়ে ধরা পড়ার মত পা চালিয়ে বেরিয়ে গেল। তাকে বাইরের বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এক মিনিটের জন্য পিন ড্রপ সাইলেন্স হয়ে গেল।

—বিন্নো, তুমি ভেতর থেকে উঠে এলে…

—কেন দাদা?

—কিছু মিষ্টিটিষ্টি আনতে বলো, মিষ্টি বিনে সিদ্ধি জমছে না গুরুমশাইয়ের।

কন্যা মুচকি হেসে মহিপালের মুখ রাখার জন্যে বললে— আজ আপনারা সকলেই দোল খেলছেন, তা হলে একা শুক্রমশাইকে কেন বদনাম দিচ্ছেন?

সজ্জন লালচে চোখ কন্যার দিকে ঘুরিয়ে বললে— তোমার ভয়ে আমি তো হাতই দিই না, এই মহিপাল জোর জবরদস্তি করে আমায় খাইয়ে দিলে।

—আচ্ছা শোনো তো। বাইরে এসো, কাজ আছে। শীলা এসেছে শুনে সজ্জনের মুখখানা থমথমে হয়ে গেল।

—আজকের দিনে তোমার ডাক্তারকে ডাকা উচিত হয়নি, না বুঝেসুঝে কি যে গোল পাকিয়ে···

—আমি মহিপালকে নিয়ে এখুনি আসছি। আমি তাকে ভালো করে চিনি, শীলার সামনে যেতেই সে দীন দুনিয়া সব ভুলে যাবে— বলতে বলতে সজ্জন ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল। কন্যা অন্দরমহলের দিকে পা বাড়াল, মহিপালের সামনে সজ্জনের সঙ্গে সঙ্গে শীলার দূতী হয়ে হাঁটায় তার যেন কেমন বাধো বাধো ঠেকছে।

সজ্জন মহিপালকে সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ির নীচের ঘরে ঢুকল। ঘরের ভেতর আলমারীর ডিজাইনের মস্ত দরজা— ঠাকুরদাদার সীক্রেট রুম। শীলা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। মহিপালকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে সজ্জন চলে গেল।

মহিপালকে দেখে শীলা ফিকে হাসি হেসে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মহিপালের মুখখানা রক্তহীন পাংশু হয়ে গেছে।

—হোলী মুবারক!

মহিপালের ভীষণ প্রতিজ্ঞা যেন মিনিটে টলে উঠল। পাগলের

মত নিরর্থক হো হো করে হেসে বললে— আজ···আজ আমরা এখানে···

শীলা চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাল। মহিপাল হঠাৎ যেন চনমনিয়ে উঠল।

—এই তলঘরটার নীচে আর-একটা তলঘর হতে পারে কিনা?

কথার মানে বুঝতে না পেরে শীলা অপ্রস্তুতের মত তাকালো।

—বুঝতে পারলে না? চুরি করার জন্য আমাদের পাতালে যাওয়াই উচিত। এখানে কেউ দেখে ফেলতে পারে।

—এতদিন তোমাকে না দেখে···

কঠোর স্বরে মহিপাল বললে— চুরি করা আমি মোটেই পছন্দ করি না। যদি কখনো তোমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হয় তা হলে সোজা তোমার বাড়িতেই যাব, যেমন আগে যেতুম।

—আমি কখনো তোমায় আসতে বারণ করেছি?

—না, তা করোনি, কিন্তু এখন আমি আর সে আমি নেই। আচ্ছা, আমি যাই তা হলে।

—শোনো, তুমি সমাজের চোখ রাঙানির ভয়ে আমাকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছ, না নিজে থেকেই দূরে সরে যাচ্ছ?

মহিপাল কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত এক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে মাথা হেঁট করে উত্তর দিলে— আর এসব কথা আমার মনে ঠাঁই পাবে না। মহিপাল যাচ্ছে দেখে শীলা তার কাঁধে হাত রেখে— তুমি তোমার পরিবারের সুখশান্তির বেদীতে আমায় বলি দেবে ঠিক করেছ, ভালোই করেছ। তুমি ভালো করেই জানো আমি কল্যাণীকে সম্মান করি, তোমার সংসারে সুখশান্তি নষ্ট করে বা তোমার দুর্নাম রটিয়ে আমি শান্তি পেতে পারি না। মহিপাল

দেওয়ালের দিকে মুখ করে বললে— সব-কিছু বোঝার পরও এখানে কেন এলে?

—তোমায় দেখার লোভ সামলাতে না পেরে। এক সেকেণ্ড বসো, বসো-না।

মহিপাল যেন এক দুর্নিবার আকর্ষণের টানে চেয়ারে বসে পড়ল। দুজনে মুখোমুখি চেয়ারে বসে। ঘরটায় দিনের বেলাও বেশ অন্ধকার, ছোট ছোট দুটি রোশদান ছাড়া বাতাস আসার আর কোন ব্যবস্থা নেই। ঘরের মেঝে বেশ স্যাঁতসেঁতে, দেয়ালের আইভরি রঙে জায়গায় জায়গায় ছোপ ধরেছে। যেখানে দুজনে বসে আছে তার বাঁ দিকে কাঠের রেলিং ঘেরা জায়গায় লোহার দুটো বড় বড় সিন্দুক আর দুটো গোদরেজের আলমারী রাখা। কাঠের দরজায় পুরোনো বিলিতী তালা আটকানো। মহিপাল চারদিকে ভালোভাবে নজর বুলিয়ে নিচ্ছে। শীলার সান্নিধ্যে এতদিন যে প্রীতি ও অনুরাগ সে অনুভব করেছে আজ যেন তাই বিষময় হয়ে উঠেছে।

—আমাদের বয়স হয়েছে মহিপাল, মাথায় পাকা চুল দেখা দিয়েছে, এই সামনের জুন মাসে আটত্রিশের কোঠা পেরিয়ে ঊনচল্লিশের কোঠায় পা দেব। আজ আমাদের জীবন পাকা অট্টালিকার মতই সুদৃঢ়, এটা তুমি কেন বুঝেও বুঝতে চাও না। এক-একটা ইঁটের পর ইঁট, পাথরের পর পাথর জুড়ে গেছে। আর নয় ডার্লিং, যা কিছু তৈরী হয়ে গেছে তাকে ধূলিসাৎ কোরো না। মহিপাল মাথা হেঁট করে শুনছে।

—পাপ পুণ্য আমি মানি কিন্তু এত বছর ধরে এই পাপ আমাদের জীবনে পুণ্য হয়ে গেছে··· বলো তুমি কেন চুপ করে বসে আছ?

মহিপাল চুপ, অসীম শূন্যতা তার চোখে, এক মুহূর্ত চুপ করে শীলা তাকে দেখল। মহিপালকে সে কথার জালে আটকাতে চায়, কিন্তু মালায় গাঁথার ফুল যেন শেষ হয়ে গেছে, সে আজ বোবা। তার বাক্‌শক্তির উৎস ছিল তার ভালোবাসা, সেই উৎস আজ হারিয়ে গেছে। শীলার চোখ আজ বড় করুণ, তেল ফুরিয়ে আসা বাতির মতই টিমটিম করছে। মহিপাল তেমনি নিশ্চল হয়ে বসে রইল।

একটা অব্যক্ত বেদনার ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ফেলে শীলা জোর করে হাসার চেষ্টা করে বললে— পৃথিবীর অনেক বড় লেখকের জীবনের সঙ্গে এরকম দুর্নাম জড়িয়ে গেলেও সাহিত্যে তাঁরা অমর হয়ে আছেন। তুমি একাই ইতিহাসে দুর্নাম কিনবে না, বুঝলে?

মহিপাল উঠে চলে গেল তবু শীলা তাকে পিছু ডাকলে না, আজ তার সব শক্তি যেন নিঃশেষিত।

শীলা স্থাণুর মত বসে রইল। সে সহসা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না, মহিপালের কথার অর্থ সে ভালো করে বুঝতে পারেনি। মহিপাল দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে এক পা ভেতরে, এক পা বাইরে। শীলা দাঁড়িয়ে উঠে তার দিকে এগুলো। শীলাকে তার কাছে এগিয়ে আসতে দেখে মহিপাল তার দিকে চোখ না ফিরিয়ে পারল না। শীলার চোখের দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, আরো কাছে, শীলা তার আরো পাশে এসে গেছে। অপলক দৃষ্টিতে সে দেখছে তার প্রিয়তমকে, তার চোখের দৃষ্টিতে যে অনুরাগ, আত্মবিশ্বাস তাকে সে জেদের বশে দূরে সরিয়ে ফেলতে চাইছে। শীলা কাছে আসতেই মহিপালের কঠোর প্রতিজ্ঞা টলে উঠল। শীলা নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা

যেন হারিয়ে ফেলেছে, মহিপালকে সে চুম্বকের মত আকর্ষণ করছে।

মহিপালের মত সৌন্দর্যপ্রিয় লেখক আজ প্রথমবার প্রেমের তন্ময়তার মধ্যে সুন্দর রূপকে দর্শন করেছে। শীলার চোখের দৃষ্টিতে তার অটল প্রেম তাকে বারবার প্রশ্ন করছে, তুমি কি এই তন্ময়তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে? তুমি এতে ডুবে যেতে বাধ্য!

শীলা মহিপালের সামনে, তার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। কেবল দুজনের নিঃশ্বাসের শব্দ সেই নীরবতাকে ভঙ্গ করছে। তার দুই বাহু যেন সমাজের সব বাধা ঠেলে মহিপালকে বরমাল্য পরিয়ে দেওয়ার জন্য উৎসুক, তাকে সে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। ধীরে ধীরে তার বাঁধন যেন দৃঢ় হয়ে যাচ্ছে। চৌকাঠের বাইরে বাড়ানো পা ভেতরে আনতেই স্প্রিংয়ের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

কয়েক জোড়া পায়ের শব্দে মহিপালের স্বপ্ন যেন আচমকা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, এতক্ষণে তার হুঁশ হল। দরজার বাইরে কর্নেল আর তার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে ঠাকুরঘরের দিকে যাচ্ছে দেখে তার কল্যাণীর কথা মনে পড়ল। সমাজ, শকুন্তলার বিয়ে, আত্মীয়স্বজন, পদমর্যাদা সব-কিছু যেন এক মুহূর্তের মধ্যে তার মনের মধ্যে তোলপাড় করে উঠল। মহিপাল তার বাসনাকে কবর দেওয়ার চেষ্টা করছে। সে এখন সেয়ানা কাক। মুখ ঘুরিয়ে শীলার হাত সরিয়ে বললে— যা হয়ে গেছে তাকে ভুলে যাও শীলা, ভুলতে তোমাকে হবেই। আমাদের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা না হলে হয়তো আমরা বন্ধু হয়ে থাকতে পারতাম, কিন্তু আজ আর তাও সম্ভব নয়।

শীলাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মহিপালের হেঁয়ালিভরা কথার

অর্থ বোঝার চেষ্টা করছে। সে হাত সরিয়ে নিয়েছে কিন্তু এখনো সে নিজের শরীরে তার স্পর্শ অনুভব করছে। শীলার মাথা তার প্রিয়তমের বুকে, সিঁথির দু'পাশে চার-পাঁচটা পাকা চুলের ঠিক ওপরে মহিপালের শেফার্স পেনের সোনালী ঢাকনা চকচক করছে। শীলার সিঁথিতে সোনালী রঙের চকচকানি যেন মহিপালের শিরায় শিরায় মদিরার নেশা জাগিয়ে তুলছে। তার আত্মম্ভরিতা আজ সন্তুষ্ট। পৃথিবীতে কত হাজার লোক আছে যারা কোন নারীর প্রেমের জন্য অষ্টপ্রহর চোখের পাতা বোজে না। অথচ মহিপাল একজন লোক যার কাছে আজ এক প্রতিষ্ঠিত নারী তার সব-কিছু লুটিয়ে দিতে আতুর। সে কত অপার বৈভবের মালিক। ব্যাঙ্কের হিসেব আছে, সিল্কের জামা, সিল্কের জ্যাকেট আর এই দামী পেন··· এ সমস্ত চুরির। যদি আজ তার মুখোস খুলে যায় তা হলে সুপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক মহিপাল মুখ লুকোবার জায়গা খুঁজে পাবে না। শীলার কাছে অনেক পয়সা, মহিপালের ধন বৈভব শীলার দান ভেবে লোকে হাসবে না তো? এই নিয়ে লোকে তার দুর্নাম রটাবে না তো? এই চিন্তার ভারে তার শরীর ধীরে ধীরে হিম হয়ে গেল। সে নিষ্ক্রিয়, নিস্পন্দ, নপুংসকের মত মানসিক কুণ্ঠায় যেন অসাড় হয়ে গেছে। হঠাৎ সে সচেতন হয়ে উঠল, কঠোর হয়ে বলল— ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার চেষ্টা কোরো না। মহিপাল ছিটকে শীলার কাছ থেকে দূরে সরে বাইরে যেতে যেতে তাকে সাবধান করতে ভুলল না।

—বাইরে কল্যাণী আছে, আর সকলে আছে, দেখেশুনে এসো।

কর্নেল আর সজ্জন কোন প্রসঙ্গ নিয়ে হাসাহাসি করছে, মহিপালকে দেখেই হঠাৎ সব চুপচাপ হয়ে গেল।

আয়া জানকী এসে কন্যাকে শীলার খবর দিয়ে গেল। ঠাকুর ঘরে, পুরোনো অন্দরমহল দেখে তিনজন বন্ধুপত্নী গল্প করতে করতে ফিরছে। কল্যাণী এবার সোজা বাড়ি যাবার তোড়জোড় করছে, কন্যার কোলে কল্যাণীর কোলের মেয়ে ঘুমুচ্ছে। কন্যা জানকীকে একপাশে নিয়ে গিয়ে বললে— আমরা যখন বাইরে বেরিয়ে যাব তখন ডাক্তারকে এনে আমার ওপরের ঘরে বসাবে, আমি এখুনি মিসেস শুক্লকে গাড়িতে বসিয়ে আসছি।

কল্যাণী কর্নেলের স্ত্রীর প্রস্তাব বিবেচনা করছে, কন্যা তাকে বলছে যে শকুন্তলার বিয়ে এই বাড়িতে হলে কেমন হয়। নিজেদের বাড়ি থাকতে ভাড়াটে বাড়ি খোঁজ করার কোন মানে হয় না। প্রস্তাব শুনে কল্যাণীর ভালোই লাগল। ওদের বাড়ি বড় ছোট এ-বিষয়ে সকলেই একমত, বড় বাড়ি দেখে শকুন্তলার বিয়ের ব্যবস্থা হবে, কিন্তু বাঙলো বাড়ির প্রস্তাব তার বেশী রুচিকর মনে হল। বাঙলো বাড়ির রোয়াব দেখায় তার ছোট জা, এবার মুখের মত হবে, আত্মীয়স্বজন সব এখানে আসবে। এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে কল্যাণী কর্নেলের স্ত্রীকে বললে—এ বাড়িতে বিয়ে হলে ও বাড়িটা একেবারে খালি থাকবে। দেখি ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করে, তারপর পাকাপাকি জানাব। কন্যা উৎসাহের সঙ্গে বললে— হ্যাঁ হ্যাঁ পরামর্শ করে নিন, আমিও ওঁকে বলব। শকুন্তলা কেবল আপনারই নয়, আমাদের সবার মেয়ে, সবাই মিলেমিশে বিয়ে দেব ভাই।

কল্যাণী আনন্দে গদগদ হয়ে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা আর বলতে, আগে তোমার তারপর আমার অধিকার, বন্ধুদের মধ্যে ভেদাভেদ কিসের? আমার উনি প্রায়ই বলেন যে আমার

মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়ে সজ্জন আর কর্নেল আমার বেশী আপনার।

সুন্দর পোর্টিকোতে শ্রীমতী কল্যাণীর জন্য গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

বেয়াল্লিশ

ডাঃ শীলা ওপরে যায়নি, কল্যাণীর যাওয়ার প্রতীক্ষায় লবীতে দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেলের স্ত্রীর সঙ্গে কন্যা ভেতরে ঢুকল, সামনে এক কোণায় রাখা মূর্তির দিকে অপলকভাবে চেয়ে থাকা শীলার দিকে তার নজর পড়ল। মহিপাল আর শীলাকে নিয়ে আজ কন্যার মনের হিসেবের খাতায় কোথায় যেন গরমিল দেখা দিয়েছে। কল্যাণীর মাথার সিঁদুরের মর্যাদা রাখা কন্যার কর্তব্য, তার চোখের আড়ালে শীলাকে লুকিয়ে রাখা কি ভালো হয়েছে? নৈতিকতার মাপকাঠিতে মেপে দেখতে গেলেই যেন তার বুকটা ছ্যাঁত করে উঠছে, কাজটা ভালো হয়নি। কন্যা তার বাপের বাড়িতে অবৈধ সম্বন্ধ দেখেছে, তাই তাকে সে কলুষিত মনে করে ঘৃণার চোখে দেখে। শীলাকে তবে কেন সে ঘৃণা করতে পারছে না?

—হ্যালো ডাক্তার। শীলা মুখ ঘোরাল। কর্নেলের স্ত্রী তাকে দেখেই চমকে উঠল—আরে ডাক্তার সায়েব, আপনি কবে এলেন?

—এই একটু আগে, শীলার কান্তিহীন মুখে হাসির আভাসটুকু বড় করুণ দেখাল।

—আপনাকে দেখলেই আমার মনটা খুসীতে ভরে ওঠে—কন্যার দিকে তাকিয়ে কর্নেলের স্ত্রী বললে—এঁর মত স্বভাব আমি খুব কম লোকেরই দেখেছি ভাই। আপনি অনেকদিন আমাদের ওদিকে ঢুঁ মারেননি ডাক্তার সায়েব। আমার বাড়ির খাস্তা নিমকী ইনি খুব পছন্দ করেন।

ডাঃ শীলার মুখের ভাব দেখেই কন্যা আন্দাজ করে নিল নিশ্চয় দুজনের মধ্যে ঝড় বয়ে গেছে। শীলার মন হাল্কা করার জন্য ঠাট্টা করে কন্যা বলল—একদিন সকলকে নেমন্তন্ন করে ডাকুন বউদি, ডাক্তার সায়েবের ছুতো করে আমরাও পাত পেতে খেয়ে আসব।

কর্নেলের স্ত্রী চোখ নাচিয়ে—শুনলেন ডাক্তারমশাই, আদরের ননদিনীর আবদার দেখলেন? সবতাতেই আগে নিজের ভাগটা বসিয়ে তবে অন্যের কথা।

কথা শেষ হতে যন্ত্রচালিতের মত শীলা কাষ্ঠহাসি হাসল। কন্যা নিজের উদার মনের পরিচয় দিলে—আসুন, বউদি, ওপরে চলুন।

কর্নেলের স্ত্রীর স্মৃতিশক্তি হঠাৎ যেন চনমনে হয়ে উঠল, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে শীলাকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে—কন্যা, আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। পৌনে আটটা বাজল, থালা সাজিয়ে রাখার বন্দোবস্ত করি।

—হ্যাঁ বউদি, সেই ভালো—কন্যার মনের ভার যেন হাল্কা হয়ে গেল, বউদির বুদ্ধির দৌড় দেখে সে যেন তাকে শ্রদ্ধা না করে পারলে না।

—বৈঠকখানায় গিয়ে বসতে কোন আপত্তি আছে নাকি?

—এবার বাড়ি যাব।

—দাঁড়াও, সজ্জনকে ডেকে আনি। তুমি ততক্ষণ আপিস ঘরেই বসো।

শীলার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই মহিপাল যেন কেমন ছিন্নপত্রের মত নিস্তেজ হয়ে গেছে। তার সহজ স্বভাব যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। কর্নেলের সঙ্গেও তার এই নিয়ে বেশ বচসা হয়ে গেল। কর্নেলের বচসায় সে বিশেষ মাথা ঘামালো না কিন্তু শীলার কাছ থেকে আসতেই সজ্জনের কথা শুনে তার মাথায় রাগ চেপে গেছে, দুই নৌকায় একসঙ্গে পা রেখে চলা তার অভ্যাস নয়। এতদিন নিজের অজ্ঞানতার অন্ধকারে জীবনের বহুমূল্য সময় সে অকারণেই নষ্ট করেছে।

শীলার ভালোবাসাকে সে অস্বীকার করতে পারছে না, তবু তাকে ত্যাগ করছে কেন? তার পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে নীতিগত এক সিদ্ধান্ত— ব্যক্তিগত ভালোবাসাকে প্রশ্রয় দিলে সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যাবে।

মহিপালের এই জোরদার তর্কে খানিকক্ষণ হাবুডুবু খেয়ে শেষকালে সজ্জন নিরুপায় হয়ে মৌনব্রত ধারণ করতে বাধ্য হল, কিন্তু মহিপালের প্রতি তার ক্রোধ আর আক্রোশের মাত্রা যেন অনেক বেশী বেড়ে গেল। ইতিমধ্যে মনে মনে সে মহিপালের বিরুদ্ধে নালিশের এক লম্বা ফিরিস্তি তৈরী করে ফেলেছে। মহিপাল সর্বদাই তার দাম্ভিক প্রকৃতিকে দ্বন্দ্বে আহ্বান জানিয়ে এসেছে। সে নিজের জ্ঞান আর তর্কের সাহায্যে সজ্জনকে বার বার ছোট করার চেষ্টা করেছে। তার তর্কের সামনে বেশীর ভাগই সজ্জনকে হার মেনে নিতে হয়, কিন্তু এ কথা সে ভালো-

ভাবেই জানে যে মহিপাল যত লম্বা লম্বা কথা কেবল তর্কের খাতিরে বলে, ভেতরটা একেবারে ফাঁপা, সে নিজের কথা দিয়ে মনের রিক্ততাকে ধামাচাপা দিতে চায়।

মহিপালেরও সজ্জনের বিরুদ্ধে ঠিক একই নালিশ। বচসার পরে মৌনতার নিস্তব্ধতা যেন বড় ভীষণ মনে হচ্ছে। দোলের দিন বিকেলে আমোদ করার জন্যে তিন বন্ধুতে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে কিন্তু শীলার প্রসঙ্গ আসায় সে গুড়ে বালি হয়ে গেছে। কথার প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য কর্নেল অন্য কথা ভাবছিল এমন সময় কন্যা ঢুকল।

—কি ভাই বিন্নো, খাবার ব্যাপার কতদূর ভাই?

—বাস্ সব একেবারে রেডী, বউদি থালা সাজাচ্ছেন— সজ্জনের দিকে চেয়ে— এক সেকেণ্ড এদিকে শোনো তো।

সজ্জন আর কন্যা শীলাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেল।

—শীলা, তোমায় আজকে ডেকে এনে আমি বড় ভুল করেছি, মহিপাল যে এমন ধারা ব্যবহার করবে আমি আশাই করিনি। সজ্জন বললে।

শীলা উত্তর দিল না। তার নির্বিকার চেহারা যেন পাথরের মতই নিশ্চল হয়ে গেছে।

—না না কন্যা, তুমি গুলমহম্মদকে ডাকো, ডাক্তারকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি চলে যাবে।

কন্যা দালানের দিকে গেল। গাড়ির পাশে সজ্জন আর শীলা দাঁড়িয়ে আছে। পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় বাগানের গাছপালা, সবুজ সবুজ বাগানের ঘাস কার্পেটের মত দেখতে বড় সুন্দর লাগছে। শীলার দুঃখ দেখে সজ্জনের মনে সহানুভূতির জোয়ার

উথলে উঠল, তার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে— বি ব্রেভ, চাইল্ড! হাত থেমে গেল, গলার স্বর গম্ভীর মনে হল— অতি কটু সত্য অনেক সময় দু'ধারী তলোয়ারের মতই আঘাত করে। মহিপাল সাহিত্যিক হয়েও এই বেদনাকে চিনতে পারল না, কেবল ন্যায়ের দোহাই দিয়ে চলে গেল। কি বলে আর তোমায় সান্ত্বনা দেব— কিছু বুঝতে পারছি না।

—পুরুষ নারীহৃদয়কে পাথরের মত মনে করে। নিজের ভালোবাসা দিয়ে সেই পাথর কেটে অজন্তা-ইলোরার মত সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, তারপর তাকে বাঘ-ভালুকের বস্তিতে একা ছেড়ে দিয়ে চলে যায়··· নারী পাথর হতে পারে, কিন্তু তার নিজের হাতে আঁকা সেই সৌন্দর্যকে সে কেন ভুলে যেতে চায়? এর উত্তর আমি খুঁজে পাইনি, হয়তো কোনদিন পাব না! সজ্জনের সহানুভূতি পেয়ে শীলার করুণ চেহারায় স্নিগ্ধভাব দেখা দিল। অন্ধকারে তার চোখে যেন আত্মবিশ্বাসের প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলছিল।

শীলাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে ফেরার সময় সজ্জনের মন বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। শীলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা মহিপালের জন্যই। শীলার স্বভাবে পশ্চিমী সভ্যতা আর ভারতীয় নারীর অপূর্ব সমন্বয়, সে ঝরনার মত মুক্ত, প্রবাহিত অথচ ঝরনার মতই সে তার স্রোতের সঙ্গে একপ্রাণ হয়ে জড়িত একটি নারী। শীলার ব্যক্তিত্ব সর্বদা সকলের মনে তার প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগায়।

গাড়ি ফটকের বাইরে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সজ্জন আর কন্যা দুজনে ফিরছে। পোর্টিকো পর্যন্ত এসে হঠাৎ সজ্জন কন্যার

হাতখানা নিজের হাতে নিলে, সেই মুহূর্তে দুই হাতের আঙুল পরস্পরের কাছে ধরা দিয়ে ভালোবাসার উত্তাপকে নতুন করে অনুভব করলে।

বৈঠকখানার দরজা পর্যন্ত এসে সজ্জন তার হাতখানা বুকের কাছে চেপে ধরে বললে—পরের চিন্তায় আজকে আমাদের বিকেলটাই মাটি হয়ে গেল, এদের না ডাকলেই ভালো করতুম।

কন্যার আরক্তিম মুখে স্বামী-সোহাগের লালসা দেখা দিলে। পরস্পরের হাতের বাঁধন যেন ঢিলে হয়েও আঁকড়ে আছে, কেউ আর কারো থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না।

—যাচ্ছি—কন্যা মাথা নীচু করে সলজ্জ হাসি হেসে বললে। তার হাতখানা জোরে চেপে ধরে সজ্জন বলল—তোমার মনে আমার বিষয় কোন সন্দেহ নেই তো?

প্রশ্ন শুনে কন্যা আচমকা শিউরে উঠল, মহিপালের চিন্তায় তার আশঙ্কিত মন যেন জোরে এক ঝাঁকুনি পেয়ে দুলে উঠল।

সজ্জন হাতটা চেপেই বললে—দায়িত্বজ্ঞান আমার যথেষ্ট আছে তবু সময় সময় আমি জেদী শিশুর মতই বেকুব হয়ে পড়ি। আমি যেন নিজের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। তোমার শক্তিতে যেন আমার বিশ্বাস থাকে—আমি যেন কোনদিন মহিপালের মত না হয়ে যাই, কখনো নয়।

মিষ্টি হেসে কন্যা উত্তর দিলে—তোমার শিশুসুলভ জেদী স্বভাবের পরিচয় মথুরায় গিয়ে পেয়েছিলাম। ঘাবড়িয়ো না, আমি সর্বদাই সচেতন থাকার চেষ্টা করব।

চারি চক্ষুর মিলন হল, কন্যার মুখে মুচকি হাসি, সজ্জনের মুখে শিশুসুলভ সরলতা, কন্যা আজ প্রেমবিহ্বল, তার চোখে প্রেমের

জ্যোতির ঝলমলানি। পবিত্র প্রেমে স্নান করার পর সজ্জনের প্রেম আজ স্বচ্ছ সুন্দর, তার মনে এক নতুন আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে।

যেতে যেতে কন্যা বলে— আমি খাবার দিচ্ছি, তোমরা সকলে ওপরে এসে যাও।

তেতাল্লিশ

রাত্তিরে দেরীতে শুয়ে সকালে বেশ দেরীতে চোখ খুলল। সজ্জনের ভোরবেলা বেড়াতে যাওয়া হল না, চা খেতেও প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে টেবিলে বসল। আজ দু'জনে অনেক জায়গায় 'দোল মিলন' করতে যাবে। স্বামী স্ত্রী আগেই প্রোগ্রাম ঠিক করেছে যে তারা বেলা বারোটায় নিশ্চয় ফিরে আসবে। দু'জনে মিলে পাখির মত ড্রাইভ করে কানপুর যাবে, দুপুরের খাওয়া ওখানেই খাবে।

কন্যার প্রতীক্ষায় বসে সজ্জন রোজউডের সুন্দর খাবারটেবিলে বসে আঙুলের টোকা মেরে তবলা বাজাচ্ছে। কন্যা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে জলখাবার তৈরী করাচ্ছে। কাল রাত্তিরে শীলা আর মহিপাল প্রসঙ্গ নিয়ে অনেকক্ষণ চর্চা করার পর যেন তাদের শান্ত নিস্তব্ধ জীবনে নতুন করে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে।

দু'মিনিট্ টেবিল বাজানোর পর আবার খবরের কাগজ টেনে

নিয়ে পাতা ওলটাতে শুরু করতেই চাকর এসে খবর দিল বাবাজী এসেছেন। রোমান্টিক মুডের মাঝে বাবাজীর প্রবেশ, সে যেন খবরটা শুনে বিশেষ সুখী হতে পারল না। তাঁকে ওপরে নিয়ে আসার জন্যে চাকরকে হুকুম দিলে। বাবাজীর অলৌকিক মনের কথা জেনে নেওয়া কি করে সম্ভব, যত সে এ বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করেছে ততই তার মনের শ্রদ্ধার পাত্র কানায় কানায় ভরে উঠছে। জনহিতকর কাজে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করার কথা কাল তুপুরে বাবাজী বলেছিলেন, তখন থেকেই সজ্জনের মনে সংকোচ দেখা দিয়েছে। লোকহিতের জন্য ত্যাগের মহিমার কথা ভাবতে তার বড় ভালো লাগে, কিন্তু নিজেকে ত্যাগ করতে হবে ভেবে তার অতৃপ্ত ইচ্ছা সংকুচিত হয়ে পড়েছে। বাবাজী আসার খবরে তাই সে একটু বিব্রত বোধ করছে।

ওপরের অতিথিকক্ষে বাবাজীকে বসানো হল। সজ্জন সবিনয়ে কথা আরম্ভ করল— আমরা চা খাব, আপনার তুধ আনতে বলব ?

—না রামজী, আপনারা চা খান, যদি বলেন তা হলে আমিও সেখানে গিয়ে আপনাদের কাছেই বসি। সময় নষ্ট করে কি হবে ?

—আসুন আসুন, বাস এই একটু···

—কি রামজী ?

—আমরা ডিম ওমলেট···

বাবাজী হেসে উঠলেন— খান, আপনার ডিম আমার মুখে টপ করে চলে যাবে না।

কন্যা আসতেই বাবাজী কথা আরম্ভ করলেন।

—রামজী, এক নারীর জন্যে ন্যায় ভিক্ষা করতে আপনারা এত বড় আন্দোলন করলেন, এরোপ্লেন পর্যন্ত উড়িয়ে দিলেন, এবার নারীজাতির উদ্ধারের কাজে আপনারা আমায় সাহায্য করতে পারবেন?

কন্যা বলল— আজ্ঞা করুন, কি করতে হবে?

—কাল দুপুরে আমার আশ্রমে এক বিচিত্র পাগলী এসেছে রামজী। সে সকলের সামনে উগ্র মূর্তি ধরে ছিল, কিন্তু একান্তে তার সঙ্গে কথা বলে জানলুম যে তার মাথার কলকব্জা সব ঠিক আছে, সে পাগলী নয়।

—তারপর? স্বামী-স্ত্রীর স্বরে কৌতূহলের ভাব।

—সে অত্যাচারিতা পীড়িতা রামজী। মণ্ডলে অনেক অত্যাচার সহ্য করে তার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, তবে এতটা হয়নি, যতটা সে ভান করে। মণ্ডলের লোকেরা তাকে আমার কাছে ছেড়ে গেছে। তারা কি আর সাধে ছেড়েছে, তাদের পাপ তাকে এখানে ছেড়ে গেছে। সেখানে অনেক মেয়েরা অত্যাচার সহ্য করছে।

কন্যার ফর্সা মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে। সজ্জনের মুখে উত্তেজনার চেয়ে বেশী আছে কৌতূহল।

বাবাজী সমস্ত কাহিনী আদ্যোপান্ত শোনালেন। সেই পাগলীটি বামুনের মেয়ে, তার মা এক বড়লোকের বাড়ি মহারাজিন (রাঁধুনী) ছিল। মেয়েটির লেখাপড়ায় মাথা আছে দেখে মায়ের মনিব তাকে সাহায্য করতেন। পরে তাঁরই ছেলের সঙ্গে মেয়েটির ভালোবাসা হয়ে গেল। ইতিমধ্যে মেয়েটির মা মারা গেছে। ধনী ব্যক্তির সুপুত্র বংশধর একজন নিরীহ,

মাতৃহীনা গরীব মেয়ের অন্ধকার জীবনে আলোর প্রকাশ দেখালেন বটে কিন্তু তাতে স্নেহের মাত্রা এতই কম যে প্রদীপ টিমটিম করতে করতে দপ করে নিভে গেল। মা-বাবার অনুশাসনের চাপে ছেলেটি মেয়েটিকে ত্যাগ করতে বাধ্য হল এবং তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা মহিলা মণ্ডলে করা হল। বিখ্যাত লেখক প্রেমচন্দ আর ভারতের অন্য ভাষার বড় বড় সাহিত্যিকেরা অনেকবার এই মহিলাশ্রমের ব্যভিচারের বিষয় লিখেছেন। এক ভদ্রলোক প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর ধরে অবৈতনিক সেক্রেটারি আর সর্বেসর্বা হয়ে বসে আছে। আশ্রমের পরিচালন সমিতির সঙ্গে শহরের বড় বড় ধনী ও নামী ব্যক্তি জড়িত আছে, তাই সরকার থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার সময় তাদের কোনরকম বেগ পেতে হয়নি। প্রতিবছর মহিলা সেবা মণ্ডলের বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, এরমধ্যে কম-সে-কম দশজন বিধবা অথবা পরিত্যক্তা দুঃখী স্ত্রীর পুনর্বিবাহের উল্লেখ বেশ আড়ম্বরের সঙ্গে করা হয়। স্ত্রী পেতে ইচ্ছুক পুরুষকে পাঁচ-সাতশো টাকা মণ্ডলের চাঁদার খাতায় জমা করতে হয়, তাকে রীতিমত রসিদ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। বিবাহে ইচ্ছুক স্ত্রী-পুরুষ দুজনে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিয়ের কাগজে সই করে। এত সুন্দর ব্যবস্থার কথা শোনা বা দেখার পর আশ্রমের বিষয় সন্দেহ করার প্রশ্নই ওঠে না। এইভাবে ঘেরা দুর্ভেদ্য পাঁচিলের ভেতরে, সেক্রেটারি, পরিচালক সমিতির সদস্যরা, তাদের বন্ধু আর পুলিসের লোকেদের জন্য ব্যভিচারের কারবার চলছে। মণ্ডলের এজেন্টরা স্টেশনে আর মেলায় হারিয়ে যাওয়া মেয়েদের ফুসলে ফাসলে মণ্ডলে নিয়ে আসে। সাম্প্রদায়িক গোলমালের সময় অনেক মুসলমান মেয়েদের গায়েব করিয়ে

তারপর তাদের এখানে এনে শুদ্ধ করে নিয়ে পরম পবিত্র কার্যের ফিরিস্তি বাড়ানো হয়েছে। আগে বেশীর ভাগ গাঁয়ের মেয়ে বা শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাই এখানে যেত কিন্তু দেশ বিভাগের পর অপহৃত মহিলাদের রক্ষা করার ভার মণ্ডলের কাঁধে এসে পড়তেই মধ্যবিত্ত দুঃখী বিধবারাও খুঁজে খুঁজে এই ঠিকানায় ভরতি হওয়া শুরু করে দিয়েছে। মণ্ডলের এক আলাদা বাড়িতে সেলাই, বোনা, হাতের কাজ শেখানোর ক্লাস আছে। এই বাহানায় বাইরের অনেক মেয়ের এখানে যাতায়াতের সুযোগ হয়েছে। ওদের মজুরীর পয়সা দেয়া হয়, এইভাবে শিক্ষালয়ের পবিত্র নামের সাহায্যে সার্বজনিক পাপাচার চলছে।

এই পাগল মেয়েটি আগে এই ক্লাসে ছিল, সেখানে পাড়ার এবং মণ্ডলের অন্য মেয়েদের কারচুপি ভরা কথার প্রলোভনে পা দিয়ে, মণ্ডলের সেক্রেটারি মহাশয়ের মিষ্টি ভদ্র ব্যবহারে সে অনেকটা নিজের দুঃখ ভুলে আশ্বস্ত হয়েছিল। কিছুদিন পরেই পর্দা ফাঁস হয়ে গেল। প্রায় দু'বছরের কঠিন সংঘর্ষের পর সে নিজেকে পাগল সাব্যস্ত করতে পেরে সেখান থেকে বাইরে বেরিয়ে বেঁচেছে। সে এখন পুরুষমাত্রকেই ঘৃণা আর ভয়ের চোখে দেখে। গত দু'বছরে পুরুষের হাতে অত্যাচার সহ্য করার পর পুরুষরাই আজ তার চোখে ঘৃণিত। তার পবিত্র নিষ্কলঙ্ক মন পুরুষের কপট জালে ফেঁসে নানা অপমান আর ব্যভিচার সহ্য করে যেন ভেঙে খান খান হয়ে গেছে। বাবাজীর কথা শুনে কন্যার মাথা গরম হয়ে গেল— এই দুরাচারের কারবার শেষ করতেই হবে, এখুনি পুলিসে রিপোর্ট লিখিয়ে এদের সকলকে ধরিয়ে দাও, ওগো শুনছ, তুমি এখুনি যাও, যা হয়

একটা কিছু করো— এই পাপের শেষ না হলে আমার শান্তি নেই।

—কিন্তু আগে প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে মা। এই মেয়েটি মানসিক অসুস্থ হতে পারে, সে যতটা বলেছে তার মধ্যে অনেকাংশ মিথ্যে হতে পারে।

এ শহরে এ ধরনের কারবার অনেক জায়গায় চলে, এর বিষয় আমি আগেও শুনেছি।

—এ কথা ঠিক রামজী, কিন্তু সত্যকে সবার সামনে প্রকট করতে হলে প্রমাণ চাই আর এই মেয়েটি প্রমাণ দিতে পারবে না।

—আপনি এত শক্তিশালী যে অন্যের মনের গোপন রহস্য বুঝে নিতে পারেন, আপনার কি মত ?

—রামজী, আমার মতের সঙ্গে নিজের মতের যোগাযোগ করতে যেয়ো না। তুমি সত্যকে তার যথার্থ রূপে অনুভব করার চেষ্টা করো।

—কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সেটা অনুভব করার উপায় আমাদের কাছে কি আছে ?

—বিচার-বিবেচনা করো।

—এ ধরনের ব্যভিচারের জায়গা অনেক আছে, আমি পুলিসের অফিসারদের সাহায্যে সমস্ত··· এখুনি কর্নেলকে ফোন করছি।

—কর্নেলদাকে ফোন করে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি।

—দাঁড়াও মা, আগে ভালোভাবে ভেবে নাও। রামজী বলেছেন যে পুলিসের বড় অফিসারদের দিয়ে পর্দা ফাঁস করাবেন, কিন্তু ছোট অফিসারেরা যারা নিজেরা ভোগ-বিলাসের জন্য সেখানে যায়, তারা খবর পেয়ে যদি সব পাপ দৃশ্য গায়েব করে ফেলে তা হলে তুমি কি করবে রামজী ?

সজ্জন স্তব্ধ, কন্যা খাঁচায় পোরা পাখির মত বিকল হয়ে বললে— মেয়েদের ওপর এত অত্যাচার তবু তারা বিবশ, জগৎ জানছে তাদের কাহিনী তবু তারা··· না, আমি প্রমাণ সংগ্রহ করব। আমি এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য লড়ব।

বাবাজী হেসে বললেন— কি করে করবে মা? এইটাই মূল প্রশ্ন।

—আমি সেখানে নিজে গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলব।

—মণ্ডলের ব্যবস্থাপক যদি তোমাকে তাদের সঙ্গে দেখা না করতে দেয়, তা হলে?

—এটা সার্বজনিক সংস্থা বাবাজী, আমি যেতে পারি, দেখতে পারি।

বাবাজী হাসলেন— চোর দিনের আলোয় চুরি করে না মা। তার সন্ধান তুমি কি করে পাবে?

প্রশ্নের উত্তর দিতে কন্যাকে বেগ পেতে হল— আচ্ছা, ধরুন আমি একজন সমাজসেবিকা হয়ে যদি সেখানে যাই, কিছুদিন সেখানে নিয়মিতভাবে মেলামেশা করি, তা হলে সেখানকার মেয়েরা নিজে মুখেই সব উগরে দেবে।

—উপায় বেশ ভালো ভেবেছ মা কিন্তু এ নিয়ে একটু চিন্তা করে দেখতে হবে। একবার এরোপ্লেনের আন্দোলনে সক্রিয় হবার পর তোমার নাম কারো অজানা নয়। একদিকে মণ্ডলের কর্মকর্তারা যদি তোমায় মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ দেন আর অন্যদিকে মেয়েদের তোমার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন, তা হলে তুমি কি করবে?

সজ্জন বললে— আর-একটা কথা, সত্যের সন্ধানে অসত্যের আশ্রয় নেওয়া কি উচিত হবে?

—অনুচিত কেন হবে রামজী?

—নিশ্চয় অনুচিত, মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে সত্যের সন্ধান অসম্ভব।

—ঠিক কথা রামজী, কিন্তু একটু গভীরভাবে বিচার করে দেখো যে এর মধ্যে মিথ্যের অংশ কতটা আছে? তুমি যে কাজে হাত দিচ্ছ সেটা সর্বজনহিতায়, তার জন্যে সত্যমিথ্যের জেরা করা কি ঠিক হবে?

—বুঝলাম না বাবাজী।

—আচ্ছা আমার এক সমস্যা সমাধান করো রামজী। ধরো, এক চোর চুরি করে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, তুমি তাকে দেখলে, পেছনে পুলিসও আসছে। পুলিস যদি তোমায় প্রশ্ন করে তুমি চোর দেখেছ? তুমি তা হলে কি বলবে?

—যা সত্যি তাই বলব, হ্যাঁ দেখেছি।

—ঠিক আছে, ধরো যে সেই চোরের বাড়িতে তার ছেলের অসুখ, ওষুধের পয়সা নেই, ছেলের প্রাণ বাঁচানোর মোহ বড়ই প্রবল। তুমি সেই চোরের পারিবারিক পরিস্থিতিটা ভালো করেই জানো। তুমি তাকে চুরির মাল নিয়ে বাড়িতে ঢুকতে দেখেছ তারপর পুলিসে তোমার কাছে জানতে চাইছে যে তুমি চোরকে দেখেছ কি না? এই পরিস্থিতির মধ্যে তোমার উত্তরটা কি হবে, রামজী?

—চোরকে আমি নিজের চোখে দেখেছি সে কথা অস্বীকার করা কি করে সম্ভব? তবে সেই ব্যক্তির পরিস্থিতি ভেবে দেখার পর আমি চোরকে সাজা দেওয়াব আর বাচ্চার জীবন রক্ষার জন্য আর্থিক সাহায্য করব।

—ধরো, তার সাহায্যের ব্যবস্থা করাও তোমার পক্ষে অসম্ভব তা হলে কি হবে?

—আমি মিথ্যে বলতে বাধ্য হব। পুলিসের হাত থেকে তাকে বাঁচানো আমার দৃষ্টিতে পুণ্যের কাজ, পাপ নয়। কন্যা জোর গলায় মন্তব্য করল।

—আমি এই পরস্পর-বিরোধী তর্ককে এত সহজে মেনে নিতে পারছি না! সজ্জনের মুখে কেমন যেন বিষণ্ণতা মাখানো, তার চোখের চাউনিতে শূন্যতা। কন্যা বেশ উত্তেজিত গলায় বলল —তুমি এত বাজে তর্ক কেন করছ? এটা কাজের সময়।

—আমার তর্ককে বাজে বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা কোরো না কন্যা, বাবাজী সকলের মনের খবর রাখেন, তিনি সাক্ষী দেবেন।

—একটা কথা ভেবে দেখেছ কি? তোমার মনে এই যে চিন্তা চলছে রামজী, তার কারণটা কি?

—আমি ঠিক বুঝলাম না।

—তোমার স্ত্রী এমন পাপালয়ে প্রবেশ করে এ কথাটা তোমার কাছে মোটেই রুচিকর নয়। আমার কথা স্বীকার করছ, না প্রতিবাদ করবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার অনুমানই ঠিক।

—ধরো, তোমার স্ত্রী না হয়ে যদি অন্য কোন মহিলা এ ধরনের সাহস করে, তা হলে তুমি তার প্রশংসা করবে কিনা?

—প্রশংসা আমি এরও করব কিন্তু কেমন যেন ভয় করছে, গুণ্ডাদের মাঝখানে এমন ভাবে···

—এতগুলো অবলা নারী গুণ্ডাদের উৎপীড়নের শিকার হয়ে কাঁদছে, তারা কি আমাদের মতই রক্তমাংসে গড়া মানুষ নয়? আমি নিশ্চয় এদের ভাঁড়ামির হাঁড়ি হাটে ভেঙে সব কাণ্ডকারখানা জনতার চোখের সামনে তুলে ধরব। আমি বাপের বাড়িতে যে

অত্যাচার দেখেছি, তা আজও আমার মনে সেই অত্যাচারের প্রতিবাদ করার জ্বালা জাগিয়ে তোলে। এমন সময় তোমার দার্শনিকের মত কথাবার্তা বলা সাজে না সজ্জন। তোমার সেই মনোবল আজ কোথায়, যা নিয়ে তুমি আমার কুমারী অবস্থায় সাহায্য করার কথা প্রায়ই বলতে?

কন্যা অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, চা জলখাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বাবাজী শান্ত স্বরে বললেন—নিছক উত্তেজনার কোন মানে হয় না মা, কাজের মধ্যেও দর্শনের কথা ভাবার সময় বা মানসিক স্থিতি থাকা অত্যন্ত দরকার, এ না হলে কাজ সফল হয় না। তোমার স্বামীর আশঙ্কা ষোলো আনা ঠিক। আমি কেবল তাঁকে পরিস্থিতির কথা এইজন্যে বুঝিয়ে দিলাম যাতে তিনি কোন ভুল পথে চালিত না হয়ে পড়েন··· হ্যাঁ রামজী, এবার তোমার প্রশ্নের উত্তর শোনো। মিথ্যে বলা আমাদের লক্ষ্য নয়, কিন্তু যখন তার সম্বন্ধ ব্যাপক সত্যের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়বে তখনই তাকে আমরা অস্ত্রের মত ব্যবহার করব এটা সমাজের নীতি। যেখানে ছ'চারটে মিথ্যে বললে পরোপকার করা সম্ভব সেখানে সেটা সত্য, পুণ্য। ব্যাস মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন যে পরোপকার পুণ্য আর পরপীড়ন পাপ, আমার মতে ঠিকই বলেছেন।

—তা হলে হিংসা করাও অনেকক্ষেত্রে পুণ্য? সজ্জন প্রশ্ন করলে।

—গীতার এই আদেশ আমি উচিত মনে করি। উদ্দেশ্য যদি মহান হয় তা হলে ত্যাগের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখলে দেখবে যে অনেক ক্ষেত্রে হিংসা পুণ্য হয়ে গেছে।

—গান্ধীজী সমানেই এর বিরোধিতা করেছেন।

—না তো। কাপুরুষের অহিংসার চেয়ে তিনি হিংসাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। জীবের রক্ষা করাই তাঁর মহান উদ্দেশ্য। যদি তোমাকে প্রাণে মেরে ফেলার সংকল্প কেউ করে, তখন তার সঙ্গে লড়াই করা উচিত। এই মেয়েদের কারবারিদের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করতে হবে রামজী।

—এই সেবা মণ্ডলটা কোথায়? আমি আজকেই সেখানে যাব।

—হ্যাঁ, আজ তোমরা দুজনেই সেখানে যাও। আমার নাম করলেই তোমাদের সেখানে যাওয়ার কারণ আপনা হতেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। একশো দুশো টাকা সাহায্যের নাম করে ছুঁড়ে দিয়ো, তারপর পরিস্থিতি দেখে ব্যবস্থা ভাবা যাবে।

কন্যার চোখের সামনে তার দুঃখী বউদির চেহারা ভেসে উঠল—আগুনে ঝলসানো মাংসের টুকরো, বিকৃত ঠোঁট, নাক, চোখের কোটর, মাথার চুল। চোখের জল গালে উপচে পড়তেই কন্যা যেন হুঁশ ফিরে পেল।

আজ সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নতুন ভাবে তার জীবনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার পথে সে পা বাড়িয়েছে।

চুয়াল্লিশ

প্রিয় মহাশয়,

শ্রীমান বাবা রামজী আশ্রমের উন্মাদগ্রস্তদের সেবা এবং সাহায্যের কাজে আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সেবারত আছি। আপনাদের মহিলা সেবা মণ্ডলের বিষয় আমি সেখানেই শুনেছি। আমি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত যে আপনারা নারীজাতির কল্যাণ সাধনের ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন। এ ধরনের সমাজ-কল্যাণ-কাজে আমার বিশেষ রুচি আছে তাই মণ্ডলের সাহায্যে সামান্য একশো টাকার চেক পাঠাচ্ছি। যদি আপনারা গ্রহণ করেন তা হলে আমরা বিশেষ সুখী হব।

ভবদীয়া
বনকন্যা বর্মা

চিঠির সঙ্গে চেক দেখে মহিলা সেবা মণ্ডলের অবৈতনিক সেক্রেটারি মহাশয় খুব খুসী, ধন্যবাদ দেবার জন্যে তিনি সশরীরে দম্পতির বাড়ি উপস্থিত হলেন। শ্রীসজ্জন ও শ্রীমতী বনকন্যার নারীজাতির প্রতি সহানুভূতির তিনি শতকণ্ঠে গুণগান করলেন। কন্যা আশ্রম দেখতে চায় শুনে তিনি গদগদ হয়ে উঠলেন। পরের দিন বেলা দুটোর সময় স্বয়ং এসে তিনি কন্যাকে নিয়ে যাবেন, ঠিক হল।

অত্যন্ত ঘিঞ্জি বাজার, ছ'পাশে গম চালের বস্তার ডাঁই, জনবহুল সরু রাস্তা যেখানে হাঁটাচলা দায়, পিঠে গম চালের বস্তা নিয়ে ছ'দিক থেকে মজুরদের লাইন যাতায়াত করছে। হাড় জিরজিরে মোষের গাড়ির মধ্যে আনাজের বস্তা পিঠে নিয়ে উটেরা সমস্ত ভিড়ের মধ্যে যেন নিজেদের আলাদা অস্তিত্ব জাহির করতে ব্যস্ত। সুতি পাঞ্জাবী, জ্যাকেট, সাদা গান্ধী টুপি মাথায় কাঁধে গামছা ফেলে, হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, পায়ে চামড়ার মচমচে জুতো পরা লোকজনে বাজার সরগরম। গম চালের সোঁদা গন্ধে বাজার ভুরভুর করছে। ঠেলা, ট্রাক, সাইকেল, এক্কা, রিক্শা, গোরু, বলদ আর বাজার করতে ব্যস্ত মানুষের ভিড়ের মধ্যে জায়গা করতে করতে সর্পিল গতিতে সজ্জনের গাড়ি যাচ্ছে। সেক্রেটারি মহাশয় আঙুল দিয়ে বাঁ পাশের ছাদের দিকে ইশারা করে বললেন—"আমি তিনটে ছাদেই বড় বড় সাইনবোর্ড লাগাবার ব্যবস্থা এইজন্যে করেছি, প্রথমতঃ জনতার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় আর দ্বিতীয়তঃ খোলা ছাদের একটা আবরু হয়ে যায়। আমি পর্দার বিষয় ভীষণ সজাগ মিসেস সজ্জন। নারীজাতির চরিত্র রক্ষা করাই আমাদের মণ্ডলের প্রধান ধর্ম এবং উদ্দেশ্য। বাইশ বছর ধরে এই সেবাকার্যে নিজেকে অর্পিত করেছি। এতদিনের আমার অভিজ্ঞতা যে চাঁদে কলঙ্ক হতে পারে কিন্তু আমাদের সেবা মণ্ডলের চন্দ্রমুখীরা নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক।

আনাজের বাজার থেকে গাড়ি বেরিয়ে বাঁ দিকের রাস্তায় এল, সামনে জেনারেল মার্চেন্টদের ছোট মত এক বাজার, গলি পার হতেই বাঁ দিকের দোকানের সামনে সাইনবোর্ড ঝোলানো 'শ্রীমতী সুন্দর বিবি দাতব্য ঔষধালয়', তার পাশের বাড়িতে 'ক্রেওস

ট্রেডিং করপোরেশন', তার পাশে দর্জির দোকান আর তারপর দেখা দিল সেই বিখ্যাত সাইনবোর্ড 'মহিলা সেবা মণ্ডল'। হলদে রঙের সাইনবোর্ড দিয়ে ঢাকা বাড়ি। ফাটকের ওপরে মণ্ডলের নাম, বাঁদিকের সাইনবোর্ডে মণ্ডলের মহত্তম আদর্শের উদ্দেশ্যাবলী টাঙানো, দেয়ালে বড় বড় হরফে লেখা 'যত্র পূজ্যতে নারী তত্র রমন্তে দেবতা।'

ভেতরে আপিস ঘর। বুড়ো মুন্সীর কাছে এক মহিলা বসে আছেন। গায়ের রঙ মাঝামাঝি, হাত আর মুখ ছোট ছোট অসংখ্য তিলে ভর্তি, কাজল টানা চোখের ওপরে সোনালী ফ্রেমের চশমা আঁটা, কটা চুল, খয়েরী রঙের ছোট ছোট দাঁত, ধপধপে সাদা খাদি মণ্ডিত মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে দেঁতো হাসি হেসে হাত জোড় করে নমস্কার জানালেন। কপালের মাঝখানে লাল টিপ আর সিঁথির সিন্দূর, দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ইনি সধবা, বাকী পরিচয়টা করিয়ে দিলেন সেক্রেটারি মহাশয়— ইনি শ্রীমতী ধনবন্তী দেবী শাস্ত্রানী, প্রভাকর, রাজবৈদ্যা, আমাদের পাড়ায় এঁর সুন্দর দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। আমাদের মণ্ডলের ইনিই প্রাণ, এঁরই সাহায্যে আমরা এখানে আয়ুর্বেদ ক্লাস খুলেছি।

মণ্ডলের স্থায়ী মহিলা বাসিন্দার মধ্যে আটজনকে সাদা শাড়ি পরিয়ে অতিথিদের সামনে পেশ করা হল। তাদের বয়স আঠারো থেকে নিয়ে পঁয়ত্রিশের মাঝামাঝি। বেশীর ভাগ সকলেই শ্যামবর্ণ, কেউ এক পোঁচ বেশী আর কেউ এক পোঁচ কম, এই যা তফাত। দেখতে শুনতে মোটামুটি সকলেই মন্দ নয়। তবে একজনকেও সুন্দরী বলা চলে না। সেক্রেটারির আদেশ-মত তারা কিছু ভজন আর শ্লোক শোনালো। কন্যা আর সজ্জনকে সেলাই, বোনা, সুচের কাজ, সংগীত, নৃত্য, আয়ুর্বেদ ও ধর্ম-শিক্ষার ক্লাস

দেখানো হল। দিনের বেলা আশেপাশের বাড়ির প্রৌঢ়ারাও এখানে হাতের কাজ শিখতে আসেন, তাঁদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। তাঁদের কাজ হিসেবে মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে। নৃত্য আর সংগীত যারা শেখে তাদের মজুরি দেওয়া হয় না। ধর্মশিক্ষার ক্লাসেরও সেই ব্যবস্থা। আয়ুর্বেদ আর ধর্মের ক্লাসের জন্য জায়গার অভাব তাই এই ক্লাস সুন্দর বিবির আয়ুর্বেদ ঔষধালয়ের বাড়িতেই খোলা হয়েছে, শ্রীমতী ধনবন্তী দেবীর উদারতার কথা সেক্রেটারি আবার শোনালেন।

মণ্ডলের সুচারু ব্যবস্থা দেখে কন্যা আর সজ্জন তুজনেই প্রভাবিত, এই সুব্যবস্থিত পরিষ্কার জায়গায় কোথাও কলুষতার সন্ধান পাওয়া গেল না, যার খোঁজে তারা এখানে এসেছিল। নানাভাবে মণ্ডলের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কন্যা ফিরছে— হয় এই পাগলী মিথ্যে বলছে আর নাহয় এই সংস্থার ব্যাপার সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে··· কি সাংঘাতিক জায়গা। এর সঙ্গে সাহসী ব্যক্তিই যোঝাবার ক্ষমতা রাখে।

স্বচক্ষে সেবা মণ্ডলের কাজ নিরীক্ষণ করার পর তুজনের মধ্যে এ বিষয়ে আর আলোচনা হয়নি। মাঝে মাঝে মন্ত্রী মহাশয় কন্যার কাছে এসে সাহায্য নিয়ে যান, তার সঙ্গে ধনবন্তী দেবীও মাঝে মাঝে সজ্জনের সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

বাবাজীকে মণ্ডলের বিষয় সব-কিছু জানাবার পর সজ্জন বললে— আপনার পাগলী যেসব সংকেত দিয়েছিল সেখানে তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল না। বাবাজী উত্তর দিলেন— রামজী, আমার মন বলছে যে সেখানে নিশ্চয় কোন বড় জাল বিছানো আছে। পাগলীর কথায় কল্পনার অংশ বেশী নেই।

বাবাজী এক আনাজের আড়তদারের নাম বললেন, যে তার ভাইঝিকে জোর-জবরদস্তি নিজের কব্জায় রেখেছে। মণ্ডলে তাকে সেলাইয়ের কাজ শিখতে পাঠানো হয়, সেইসঙ্গে তাকে নারকীয় যন্ত্রণাও ভোগ করতে হচ্ছে। সেই পাগলী বলেছে যে তাকে ধর্মের ক্লাসে বসিয়ে প্রথমে বোঝানো হয়েছিল গৃহস্থ ধর্মই নারীর সবচেয়ে বড় ধর্ম, স্ত্রীও পুরুষের মত বিবাহ আর ত্যাগ করতে পারে। তাদের বলা হল মণ্ডল এ কাজে তাদের সাহায্য করার জন্য বিশুদ্ধ আর্য প্রথা অনুসারে তাদের প্রেম করার সুযোগ দিয়ে স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করবে। বেচারী অসহায় পাগলী তাদের ধোঁয়া মেলানো কথার ফাঁদে পা দিয়ে ফেলল। একদিন তাকে মণ্ডলের পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় করানো হল। সে ঘর বেশ সুরুচিপূর্ণভাবে সাজানো, দেয়ালে একপাশে রাধাকৃষ্ণের ছবি ঝুলছে। সেই ছবির সামনে যুবক আর পাগলী, দুজনকে প্রতিজ্ঞা করানো হল তারা নিজেদের গোপন রহস্য তৃতীয় ব্যক্তির কানে ওঠাবে না। পাগলী স্বেচ্ছায় সেই বিশ্বাসে তার প্রিয়তমকে নিজের সর্বস্ব সমর্পিত করে দিলে। এইভাবে আট-দশ দিন লীলাখেলা ভালোই চলল। হঠাৎ তারপর তার যাওয়া-আসা বন্ধ হয়ে গেল। একদিন যখন তাকে আবার সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হল তখন সে দেখলে সেখানে অন্য লোক, আবার সেই রাধাকৃষ্ণর সামনে প্রতিজ্ঞা— পাগলী রেগে গিয়ে এই ভাঁড়ামির বিরোধিতা করল। সে স্পষ্টভাবেই জানাল বারবনিতার জীবন যাপন করতে সে মোটেই প্রস্তুত নয়। ফলে বলপ্রয়োগ করার সঙ্গেই সে জোরে চিৎকার করে উঠল। সেইদিন থেকে তাকে মণ্ডলের নীচের ঘরে বন্দী করে রাখা হল। বন্দী অবস্থায় তাকে অনেক

উৎপীড়ন, ব্যভিচার সহ্য করতে হয়েছে। সেখানে পুলিসের লোকেরাও মজা মারতে আসতেন। এইভাবে পাগলী গুপ্ত রোগের শিকার হয়েছে। যে মেয়েরা পরিচালকদের কথামত উঠতে বসতে নারাজ তাদের সোজা নিয়ে গিয়ে মণ্ডলের নীচের দুটো বড় হলঘরে বন্দী করে দেওয়া হয়। সেখানে অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী অজস্র অশ্রুধারায় বয়ে যায়, বাইরের জগতের কেউ তা জানতে পারে না। তাদের অন্তরাত্মাকে পিষে ফেলা হয়। যারা মণ্ডলের সধবা কুমারীদের ওপর অত্যাচার করার অধিকার রাখে, এমনি করে হিংসা, লোভ, অত্যাচারের সামনে ধীরে ধীরে প্রত্যেকেই হাল ছেড়ে দিয়ে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। এদেরই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিয়ের নাটক করে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ধনবন্তী দেবী রাজবৈদ্যা আর কিত্তোর পিসী, দুজন মিলে মণ্ডলের মহিলাদের জন্য দণ্ড-পুরস্কারের বিধান রচনা করেছেন। ধনবন্তীর বিষয় খোঁজ নিয়ে সজ্জন জানতে পারল তিনি সেক্রেটারির চেয়ে বেশী অত্যাচারী। সেক্রেটারি আর রাজবৈদ্যা এই মৌচাকের রাজা-রানী। বৈদ্যার বৃদ্ধ স্বামী বেচারা দুবেলা দু'মুঠো খেয়ে এক কোণে পড়ে থাকে।

মণ্ডলের বিষয় অনেক কিছু জানার পর সজ্জন বিচলিত হয়ে উঠল। কোন-না-কোন উপায়ে তাকে এই রহস্যোদ্ঘাটন করতেই হবে। কর্নেলকে এ বিষয় জিজ্ঞেস করতেই সে মন্তব্য করল—এর দুর্নাম আমি আগেও শুনেছি। সেক্রেটারিটি ভীষণ ধাপ্পাবাজ লোক, তবে আমার মনে হয় তুমি এ-সব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করলে ভালো করতে।

সজ্জন কিন্তু প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়, সে নিজের মনের কথা কন্যাকেও

খুলে বলল না। কন্যার নামে দুবার পঁচিশ পঁচিশ টাকার মনি-অর্ডার পাঠিয়ে দিলে। সেক্রেটারি মহাশয় এই দানী দম্পতির সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। তিনি এখন প্রায়ই যাতায়াত করেন। একবার কন্যাকে লেকচার দেওয়াতে নিয়ে গেলেন। একদিন বিকেলে যে সময় কন্যা জেঠীর বাড়ির স্কুলে পড়াতে যায়— সজ্জন সেক্রেটারি মহাশয়কে কন্যার নাম করে ডেকে পাঠালো। তিনি আসতেই সে তার নিজের ঘরে, যেখানে সব সরঞ্জাম আগে থাকতেই ছিল, ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল— কী ব্যাপার, আজ কিছু কাজ আছে না কি?

সেক্রেটারি বলল— কাল দুপুরে দেবীজীর আদেশ পেলাম তিনি আজ আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।

—তিনি বোধহয় বাড়িতে নেই, বসুন, আসছে হয়তো। নিন গেলাস ধরুন, খানটান তো?

—হেঁ হেঁ হেঁ। আমি পান দোক্তা ছাড়া আর কোন নেশা-ভাঙ করি না।

—আরে ছাড়ুন মশাই··· জ্যান্ত স্বর্গে বাস করছেন অথচ সুরাপান করায় আপত্তি?

কিছুক্ষণ একথা-সেকথার পর সজ্জন তার, বাক্‌চাতুরীর জালে সেক্রেটারি মহাশয়কে জড়িয়ে ফেললে। সে তাঁকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলে তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা নেই, সমাজ-কল্যাণের নাটক সে কেবল কন্যার নামে করে। সজ্জন তার নিজের বিষয় অনেক ছোট-বড় প্রেমের কাহিনী বানিয়ে বানিয়ে শুনিয়ে দিলে। জেঠীর বাড়ির একখানা ঘর কেবল সে নিজের বাসনা পূর্তির জন্যই ভাড়া নিয়ে তাকে স্টুডিওর নাম দিয়েছে, তা

ছাড়া সজ্জন গুপ্ত আনন্দপ্রাপ্তির জন্য টাকা ঢালতে ভালোবাসে শুনে সেক্রেটারি মহাশয়ের চোখ ছানাবড়া।

সজ্জনের কথা শোনার পরদিন থেকেই সেক্রেটারি মহাশয় কন্যার চেয়ে বেশী সজ্জনের কাছে, বাইরের ঘরে যাতায়াত বাড়িয়ে দিলেন।

একদিন ধনবন্তী রাজবৈদ্যা সজ্জনকে তাঁর বাড়িতে দুপুরের খাওয়ার নিমন্ত্রণ পাঠালেন। নিমন্ত্রণ পেয়ে সজ্জন এক মিনিট চিন্তা করল, তারপর বেরিয়ে পড়ল। সেখানে যেতেই তার চোখের সামনে সব-কিছু জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। শ্রীমতী সুন্দর বিবি দাতব্য চিকিৎসালয় আর মহিলা সেবা মণ্ডলের মাঝখানে ফ্রেণ্ডস ট্রেডিং করপোরেশনের ইমারতের আপিস ঘর আসলে পুরুষের আসা-যাওয়ার সুবিধাজনক রাস্তা। ফ্রেণ্ডস ট্রেডিং করপোরেশন শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে সংযুক্ত একটি সংস্থা। মণ্ডলের ধনী সঞ্চালকের কিছু কর্মচারী সেখানে কাজ করে, শেয়ারের কারবারের নামে সেখানে দিনরাত পুরুষের যাতায়াত চলতে থাকে। সজ্জন এই রাস্তা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। নীচের উঠোন প্রায় খালি, ওপরে চিলেকোঠার পরই খোলা ছাদ রয়েছে। সামনে তিনটে দরজা দেওয়া ঘর, সেটার ভেতরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মত তিন ভাগে পার্টিশন দিয়ে ঘেরা। সুন্দর বিবি দাতব্য চিকিৎসালয় ফ্রেণ্ডস ট্রেডিং আর মহিলা সেবা মণ্ডল সব দেয়ালের মধ্যে মধ্যে দরজা দিয়ে একসূত্রে বাঁধা একটি ইমারতের মত হয়ে গেছে। শ্রীমতী ধনবন্তী দেবী সজ্জনকে এমন-একটা ঘরে নিয়ে গেলেন যেখান থেকে সেলাই বোনায় ব্যস্ত মেয়েদের সে ভালোভাবে দেখতে পারে। একটু পরেই রাজবৈদ্যা নিজে উপস্থিত হলেন।

তাকে দেয়ালের এক ঘুলঘুলি থেকে অন্য ঘুলঘুলির কাছে নিয়ে যাওয়া হল, সামনে আট-দশজন কুটনি মেয়ে বসে চা খাচ্ছে। গ্রাহকদের এই সময় ঘুলঘুলি থেকে চুপচাপ মাল দেখানো হয়। গ্রাহক যাকে পছন্দ করে, তাকে তার সেবায় পৌঁছে দেওয়া হয়। সজ্জন চুপচাপ দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনতে লাগল, ঘর-গেরস্থর গল্প, স্বামী আত্মীয়-স্বজনের কথা, নোংরা হাসিঠাট্টা সবই চলছে সেখানে, ধনবন্তী দেবী তার প্রায় গায়ে পড়া হয়ে তাকে মহিলাদের কুলজি বোঝাচ্ছেন, দু'তিন জনের বিষয় জানালেন যে তাদের স্বামী বুড়ো অক্ষম, একজনের দারিদ্র্যের বর্ণনা করে মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন— কত বেচারাদের দু'মুঠো দুবেলা অন্নর সংস্থান এখান থেকেই করা হয়। আমরা এদের দেহ মন ধন সবেরই ক্ষিদে মেটাবার ব্যবস্থা করি, আমার মতে এটা পুণ্যের কাজ।

সজ্জন ধনবন্তী দেবীর কথা শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গেল। সেদিন সে কোন 'অপ্সরা'কে তার সেবা করার অবসর দিল না।

সজ্জন তিন-চারদিন ধরে রোজই সেখানে যাতায়াত করল। এই কদিন তাকে ধনবন্তী দেবীর আকর্ষণের কষ্টও সহ্য করতে হল। তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রায় আড়াইশো টাকা খরচ করে ঘড়ি কিনে দিলে।

এই কয়েকদিনের মধ্যে সজ্জন তার ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। গূঢ় রহস্যের আবরণ ভেদ করে সে আজ নিজের ব্যক্তিত্বকে সহজভাবে বুঝতে শিখেছে। কয়েক মাস আগে যদি সে এ ধরনের ব্যভিচারের আড্ডায় আসার সুযোগ পেত তাহলে হয়তো নিজের চরিত্রের দুর্বলতায় নিজেই

শিকার হয়ে যেত। আজ পর্যন্ত নিজের মনকে সংযত রাখার জন্য সবরকম নোংরামির নিন্দা সে করে এসেছে। তবু মনের মোড়ক খুলে দেখার পর সে বুঝেছে তার চরিত্রের দুর্বলতা, সে নিজেই এই পথের সহজ আকর্ষণে আকৃষ্ট। আজ কন্যার সঙ্গে বিবাহের বন্ধনে বাঁধার পর সে যেন এক নতুন মানুষ। নতুন আত্মবিশ্বাসের ফলে তার মনের সমস্ত বিকার চিত্তের অতল তলে তলিয়ে গেছে। কন্যা তার সামনে এক নতুন আদর্শ নিয়ে এসে তার জীবনকে সাধারণ ধরাতল থেকে উঠিয়ে অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছে। তার স্বর্গীয়া মাকে যে সম্মান সে দিয়েছে, আজ কন্যার মত স্ত্রীকে পেয়ে সমগ্র নারীজাতিকে সে সম্মানের চোখে দেখার শিক্ষা পেয়েছে। কন্যাকে সম্মান দিতে পারাই তার জীবনের মস্ত লাভ। সে আজ তার অশুভ বুদ্ধিকে প্রত্যাখ্যান করতে সমর্থ হয়েছে। নিজের বিগত জীবনের অনুভূতি আর মণ্ডলের অভিজ্ঞতার দৃশ্য দুই মিলিয়ে সে এ বিষয় অনেক ভাবনা চিন্তে করার পর বুঝতে পেরেছে কেন মেয়েরা এই ঘৃণিত পঙ্কিল পথে পা বাড়ায়। শৌখীন বড়লোকেরা এবং তাদের পত্নীরা দুজনেই এসব জায়গায় এসে পরস্পরকে প্রতারণা করে। অসহায় বিধবারা আসে নানা প্রলোভনের চক্করে পড়ে। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় বিধবাদের সিঁথির সিন্দুর মোছার সঙ্গেই তাদের ধন ও জন থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়। বিধবারা ধর্মচর্চার ছুতো করে সেলাই বোনার মজুরি আদায় করে নিয়ে যায়। নীচু মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলার যারা এখানে আসে, তাদের বেশীর ভাগেরই স্বপ্ন অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। বাপের বাড়িতে কুমারী বেলায় তারা ভেবেছে বিয়ের জল পড়তেই স্বামীর পয়সায়

মৌজ মারবে, কিন্তু ভাগ্যে লিখন সবার সমান হয় না। বেশীর ভাগ মেয়ে স্বামীর আর্থিক অনটনের মধ্যে বাঁধা পড়ে দিনরাত ছটফটিয়ে মরছে। অষ্টপ্রহর বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি আর অতৃপ্তির ধোঁয়ায় নিঃশ্বাস নেওয়া, এই তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। সিনেমার আধুনিক প্রভাবে প্রভাবিত তাদের দুর্বল মনে এক নতুন স্বপ্ন মাথা তোলে, স্বপ্নের রাজকুমারের মতই নতুন হিরোর মধুর স্পর্শের ছোঁয়া পাওয়ার জন্যে আরম্ভ হয় আকুলি-বিকুলি। তারা এমন নায়ক খুঁজে বেড়ায় যারা তাদের স্বামীর স্বভাবের ঠিক বিপরীত, আর্থিক অবস্থাও অনেক ভালো। তাদের স্বপ্নের নায়ক তাদের সৌন্দর্য আর গুণের তারিফ করবে, দুনিয়ার সুখ তাদের পদতলে এনে হাজির করতে পারবে। সংগীত আর নৃত্যের ক্লাসে এই ধরনের মেয়েদের ভুলিয়ে ভালিয়ে আনা হয় যাদের মধ্যে ব্যবহারিক জীবনের অনুভব নেই অথচ আছে যৌন জীবনের প্রতি প্রচণ্ড কৌতূহল। এদের মধ্যে অনেক অবিবাহিত বয়স্ক কুমারীরাও আসে, যাদের পয়সার অভাবে বিয়ে হয়নি। একবার এই পঙ্কিলতায় ফেঁসে যাবার পর নারীর চরিত্রে পরিবর্তন দেখা দেয়। ষড়যন্ত্র আর ভেদাভেদের আবহাওয়ার মধ্যে ধীরে ধীরে আপনা হতেই সংঘবদ্ধতার অনুশাসন দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। এই অনুশাসনের ছায়ায় এতগুলি মেয়ে পরস্পরের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। তখন তারা সেই স্পিরিট নিয়ে কাজ আরম্ভ করে, নিজেদের দল বাড়ানোর জন্যে তারা তখন সরল, অসহায় মেয়েকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এই নরকে টেনে নিয়ে আসে। যে মেয়েদের মন দুর্বল, তারা সারা জীবনে আর কখনো মুক্তির আলো-বাতাস পায় না, নারকীয় জীবনেই তারা শেষ নিঃশ্বাস

পর্যন্ত মাথা খুঁড়ে এক অব্যক্ত মানসিক জ্বালায় জ্বলে পুড়ে প্রাণ দেয়।

সামাজিকতা, মান-সম্মান, সচ্চরিত্রতা, কৌলীন্য এসব যেন কাঁচা সোনার ঝলমলানি, সজ্জনের দৃষ্টিতে এসব নোংরা নর্দমার আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সমাজের স্বরচিত এই অনুশাসন মহিলা সেবা মণ্ডলের সাইনবোর্ডের মতই অর্থহীন। চিত্রা রাজদান থেকে শুরু করে ধনবন্তী দেবী পর্যন্ত সকলেই এই সামাজিক সচ্চরিত্রতার প্রতীক— সর্বত্র নারীরূপে বারবনিতার দর্শনই হয়েছে। বারবনিতাদের কোঠায় যুগ যুগ ধরে দ্রৌপদীর মতই কত অসহায় নারীকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে, তবে আজ এই মণ্ডলের নারীরাই বা কেন অস্পৃশ্যর মত দূরে থাকবে? কী অপরাধ করেছে তারা? বাইরে ধর্মের কলমা লাগিয়ে যারা এই জঘন্য গুপ্ত কারবার চালাচ্ছে তাদের মুখোস কেন খোলা যাবে না? সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিরা অন্যের সম্মান নিয়ে খেলা করবে কোন্ অধিকারে? তার যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে, সমাজের এই কলুষতায় ভরা দর্পণ সবার সামনে রাখা কি উচিত হবে? ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না তো? সমাজের ভয়ে যারা লুকিয়ে পাপাচরণ করছে তাদের হয়তো চক্ষুলজ্জার আর বালাই থাকবে না।

যদিও কর্নেল তাকে এসব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করার আদেশ দিয়েছিল, কিন্তু বাবাজীর প্রেরণা আর পুলিসের সাহায্য নিয়ে, সে এই ব্যভিচারের আড্ডাকে শেষ করার প্রতিজ্ঞা করে কর্নেলকে সব বিস্তারিতভাবে বললে। পরের দুঃখ-কষ্ট কর্নেল একদম বরদাস্ত করতে পারে না, তার মনটা বড়ই সরল। কর্নেল আর

সজ্জন দুজনে মিলে পুলিস অফিসারদের সঙ্গে এই নিয়ে যোগাযোগ করার কথা চিন্তা করলে। কর্নেল প্রায়ই পুলিস অফিসারদের বাড়িতে পালা-পার্বণে উপহার পাঠায়, তাদের সঙ্গে ওঠাবসা আছে।

—কর্নেল, তুমি পুলিস সুপারিণ্টেনডেণ্টের সঙ্গে দেখা করো, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

—আমার মনে হয় সোজা মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করো। তুমি হয়তো জানো না অনেক কেসে পুলিস অফিসারেরাই মিলে থাকে। আমি তোমাকে একটা ঘটনা বলছি, আলীগড়ে মেয়েদের ব্যবসা করার সেণ্টার আছে। পাঁচজন ডেপুটি সুপারিণ্টেনডেণ্ট আর একজন এস. পি. এর মধ্যে সামিল ছিল। ইউ. পি. সি. আই. ডি. এই কেসটা ধরেছিল।

—গবর্নমেণ্ট কি করলে?

—সকলের চাকরী শেষ, কেবল সুপারিণ্টেনডেণ্টকে বরখাস্ত করা হয়নি, তাকে ইস্তফা দিতে বলা হয়েছিল। সজ্জন তার মুখের কথা লুফে নিয়ে বললে—দেখো ভাই, আমার মতে মিনিস্টারের চক্করে না পড়ে পুলিস অফিসারদের দিয়ে কাজ হাঁসিল করাটাই বেশী ভালো হবে। এ কথা আমি মানতে রাজী নই সব অফিসারেরাই খারাপ, কিছু ভালোও নিশ্চয় আছে। তাদেরও নিজেদের প্রেস্টিজ জ্ঞান আছে তো?

—হ্যাঁ, কিন্তু ভালো লোকের নিতান্তই অভাব, পুলিসের কাজ-কর্মই এই ধরনের। মানুষ এ লাইনে গিয়ে একেবারে উদ্দেশ্যের মাথা চর্বিত চর্বণ করে রাক্ষস হয়ে দেখা দেয়।

—তবু আমার মতে সোজা এম. পি.র কাছে চলো। প্রত্যেক কাজে ওপরওয়ালাদের নিয়ে চলার নীতিটা ভুল, বিশেষ করে

এমন কাজে সকলের শুভবুদ্ধি নিয়ে তবেই আমাদের এগুনো উচিত হবে।

কন্যা এসবের কিছুই জানল না।

আজ ধনবন্তী দেবী প্রভাকর, একজন মহান আর্টিস্টকে বিশেষ উপহার দেওয়ার কথা তার কানে তুলে দিয়েছেন, সাধারণ সুলভ জিনিসের সঙ্গে নাকি সে উপহারের তুলনা হয় না। তা ছাড়া আজ মণ্ডলের অন্য স্ত্রী-পুরুষের যুগলমূর্তি দেখাবার কথাও বলছেন। সজ্জনের লেখাপড়া, আর্টিস্ট হওয়া এবং তার সঙ্গে ধনী হওয়াটা ধনবন্তীর পক্ষে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু। বাক্-চাতুরীতে পটু মেয়েমানুষটিকে সজ্জন তার সান্নিধ্য থেকে দেড় হাত দূরে রেখেই চলে তবু তাকে মাঝে মাঝে ভালো খাওয়ানোর কথা তার পুরোনো পাপী মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারে কেন? ধনবন্তী দেবী একদিন সেক্রেটারি মহাশয়ের সঙ্গে সজ্জনের বিশাল রাজপুরী দেখতে এসেছিলেন। পুরোনো আমলের সাজানো বড়লোকের বসতবাড়ি তিনি অনেক দেখেছেন কিন্তু এমন সুরুচিপূর্ণ ভাবে সাজানো, সুন্দর মূর্তি, জিনিস, সুন্দর ছবি, দেশবিদেশের কিউরিও তাঁর চোখে ধাঁধা ধরিয়ে দিয়েছে। ধনবন্তী দেবী যেন নিজের অজান্তেই সজ্জনের ষড়যন্ত্রের প্রধান সহনায়িকার পার্ট করতে প্রস্তুত হচ্ছেন।

সজ্জন আজ অন্যদিনের চেয়ে একটু আগেই এসে গিয়েছে। তার বসার ব্যবস্থা আজ ধনবন্তী দেবীর খাস কামরায়। সেখানে তাকে বসিয়ে তিনি চলে গেলেন।

সজ্জন একা বসে নানা এলোমেলো চিন্তা করে চলেছে। আজ এক বিশেষ পরিস্থিতি, চারিদিকে গুপ্ত পুলিসের জাল বিছানো

রয়েছে। নিশ্চিত সময় সজ্জনের সংকেত পেলেই তারা এই নরকের রহস্যোদ্‌ঘাটন করবে। সেক্রেটারি আর ধনবন্তী দুজনেই সজ্জনকে তাদের বিশেষ বন্ধু ভেবে তাদের গোপন রহস্য ফাঁস করে ফেলেছে, আজ তারা দেখবে সেই বন্ধুর আসল রূপ। আজ তাই সে ধনবন্তীর সঙ্গে চক্ষুলজ্জার খাতিরে ভালো ভাবে কথা বলতে পারেনি।

তার ঘরের সামনে ধর্মের ক্লাস চলছে। সেক্রেটারি মহাশয় স্বয়ং ভাগবত পাঠ শোনাতে ব্যস্ত— ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চীর-হরণ লীলার সুন্দর দৃষ্টান্ত, বাঁশি বাজাতে বাজাতে গোপীদের কাপড়-চোপড় নিয়ে তিনি কদম্বের গাছে উঠে গেলেন। গোপীরা জলে দাঁড়িয়ে আছে নগ্ন হয়ে…

ধনবন্তী দেবী এসে সময় কাটাবার জন্য ছোট দু-তিনখানা বই তার হাতে ধরিয়ে জানিয়ে গেলেন একটু পরেই তাকে 'স্বর্গীয় দৃশ্য' দেখানো হবে। বইয়ের প্রতিটি পাতা বোমার মতই বিস্ফোরক সামগ্রীতে ভরা, কামক্রীড়ার নগ্ন চিত্র। দেশবিদেশের টুরে নানা হোটেলে আগেও এ ধরনের বই দেখার সুযোগ হয়েছে। সে আজ পর্যন্ত ইংরেজী ভাষায় এ ধরনের বই দেখেছে, কিন্তু হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত এই অশ্লীল সাহিত্য যেন তার মাতৃভাষাকে অপমানিত করার এক বিরাট ষড়যন্ত্র। হিন্দী ভাষায় বই দেখে সে কেন আঘাত পেল, এর উত্তর যেন সে নিজেই খুঁজে পাচ্ছে না। বই বন্ধ করে সে পাশের টেবিলে রেখে দিলে, কেননা দু' পাতা পড়েই তার মাথার রগ দুটো যেন দপ দপ করছে।

ধর্মের ক্লাস থেকে সেক্রেটারি মহাশয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

তিনি প্রেমে বিহ্বল হয়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চীর-হরণ লীলা কাহিনী বর্ণনা করছেন। সজ্জন রাগে ফেটে পড়ল। ব্যাস মুনি যখন ভাগবতে চীর-হরণ অধ্যায় লিখেছিলেন তখন তাঁর উদ্দেশ্য কি এই ছিল, উদ্দেশ্য সামনে রেখে আজ এই লোকটি সেই অধ্যায় পাঠ করছেন?

সর্বদা কৃষ্ণকে ভোগবিলাসী রূপেই চিত্রিত করার কারণটা কি? তাই যদি সত্যি হত তা হলে আজ কয়েকশো বছর পরেও অসংখ্য মন্দিরে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পুজো করা হত না। কৃষ্ণ, গোপী আর সমস্ত ব্রজের প্রতি তার একটা ব্যক্তিগত আকর্ষণ আছে। মথুরা, বৃন্দাবন যাত্রার পর থেকেই সে যেন এই পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে বড় বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছে। কৃষ্ণরূপ তার মনে কল্যাণকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত। ব্যাস, জয়দেব আর অন্য কবিরা কেন আত্মা আর পরমাত্মার মাঝে এই গোপনীয় সম্বন্ধকে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন? জগন্নাথপুরী আর খাজুরাহোর কণ্ডরিয়া মহাদেবের মন্দিরে সার্বজনিক পূজার জায়গায় কামশাস্ত্রের বিভিন্ন ভঙ্গির মূর্তি কেন স্থাপিত করা হয়েছে? এই গোপন অশ্লীল বই কেন আইনের মারপ্যাঁচে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে? যদি এই বই পড়া আইন হিসেবে নিষিদ্ধ তাহলে সেই ধারানুসারে এই মূর্তিগুলিকেও নষ্ট করে দেওয়া হয়নি কেন? হাজার বারোশো বছরের ভেতরে মূর্তি নষ্ট করে মন্দিরকে ধ্বংস করার কথা কারুরই মাথায় না আসার কারণটা কি? পুরী এবং খাজুরাহোর মূর্তিগুলিকে যখন সজ্জন দেখেছিল, তখন দেয়ালে অঙ্কিত বিষয় তার মনকে নাড়াচাড়া যে একেবারেই করেনি সে কথা বলা যায় না, তবু তার মধ্যে নিহিত

সৌন্দর্যকে দেখেই সে বেশী প্রভাবিত হয়েছিল। এত সুন্দর আর সজীব মূর্তি সত্যিই দেখার জিনিস— সজ্জন ভাবলে, যাক, আমার টেস্ট অন্যদের থেকে একটু আলাদা, কিন্তু সাধারণ মানুষ এই শিল্পের সজীবতাকে প্রাণভরে প্রশংসা করতে পারবে কি? মা বাবা ছেলেমেয়ে, সদাচারী পবিত্র মানুষেরাও সেখানে যায়, তাদের সামনে এই চীর-হরণ, রাধাকৃষ্ণ গোপীকৃষ্ণের বিলাসচিত্র রীতিমত গানবাজনার আসরে পেশ করা হয় এর কারণটা কি? মহিপালও তাকে বলেছে এবং সে নিজে পড়েছে যে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে, কাম সম্বন্ধের বর্ণনা বড় খোলাখুলিভাবে রসিয়ে লেখা আছে। এর কারণটা কি? আমাদের নৈতিক বুদ্ধি কাম সম্বন্ধের চর্চা করাটাকেও অস্পৃশ্যের মত দূরে সরিয়ে রাখতে চায় অথচ তার আকর্ষণকেও অস্বীকার করা হয় না, তা হলে এই দুই বিন্দুর মাঝে সত্য কোথায় লুকিয়ে আছে? নরনারীর শারীরিক সম্বন্ধটা সত্য অথচ এই শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধটাকে নিয়ে দৈনন্দিন জীবনের সামাজিক ব্যবস্থার নাগরদোলায় হঠাৎ এত ঝাঁকুনির প্রয়োজন হয় কেন? প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধি তাকে সহজভাবে স্বীকার করতে গিয়ে সংকুচিত হয়ে যায় কেন? একই মুখে আমরা ভালোমন্দ দুই পক্ষেরই সমর্থন করি কেন? কেবল ভারতই নয়, সম্পূর্ণ বিশ্বে মানুষের সঙ্গে যেন এই নিয়ে চলেছে এক নাটক যার পূর্ণচ্ছেদ হয়তো কোনদিনই হবে না। এই সমস্যা হয়তো আর্থিক বা রাজনৈতিক সমস্যার মত জ্বলন্ত সমস্যা না হতে পারে কিন্তু নরনারীর কাম-সম্বন্ধীয় সমস্যা অনেক রাজনৈতিক আর আর্থিক সমস্যার পটভূমি রূপে আমাদের সামনে আসে না কি?

বাঙলা দেশে যে সময় অকাল পড়েছিল সে সময় সজ্জন সেখানে গিয়েছিল। সে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিল যে দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকা থেকে মেয়েদের কিনে এনে কলিকাতায় বাবুদের সেবায় তাদের পাচার করা হয়েছিল। সে সময় অনেক রিক্‌শাওয়ালা পর্যন্ত নিজের রিকশার ঘণ্টি, ঠুনঠুন বাবু ঠুনঠুন বাবু বলে বাজিয়ে রসিক পথিকদের সংকেত দেবার কাজ করত। দুনিয়ার সামনে ঘোমটা খুলে যারা বারবনিতার পেশা নিয়েছে তাদের ছাড়া ঘোমটার মধ্যে যেসব ইজ্জতের কারবার চলত, কেউ কি তার খোঁজ করেছে? এই ঠুনঠুনের পেছনে আর্থিক সমস্যাই প্রধান কারণ নয় কি? ইতিহাসে অনেক ঘটনা এর আগেও ঘটেছে যেখানে নরনারীর কাম সম্বন্ধকে রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় প্রকটরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতের কূটনীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করায় সে যুগের বিষকন্যারাই ছিল রাজাদের প্রধান অস্ত্র, নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করায় এদেরই প্রয়োগ করা হত। সুন্দরী মেয়েদের বাছাই করার পর তাদের ছোটবেলা থেকেই বিষ চাটানো আরম্ভ করে দেওয়া হত, ক্রমশ বয়সের সঙ্গে তারা বিষকন্যা হয়ে যেত। নাচ গান দিয়ে পুরুষকে ভোলাবার শিক্ষা তাদের দেওয়া হত। এই বিষকন্যার অধরসুধা পান করলে বা তার দেহ উপভোগ করলেই সে পুরুষের মৃত্যু নিশ্চিত। মহান কূটনীতিজ্ঞ চাণক্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বিষকন্যা তৈরী করার মহত্তম উদ্দেশ্যের বিষয় উল্লেখ করেছেন। নরনারীর কাম সম্বন্ধকে রাজনীতির পঙ্কিলতায় টেনে আনার এই দুঃসাহসের কারণ কি? সম্পূর্ণ রাজনীতি আর অর্থনীতি পেটের ক্ষুধা আর কাম সম্বন্ধের সীমায় বাঁধা নয় কি? তবে কেন এত বড়

সমস্যাকে নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করা হয় না? উনিশ শো তেত্রিশ সালে বাঙালীরা যেমন পেটের ক্ষিদেয় খোলা রাস্তাঘাটে ঘোমটার আড়ালে, কোটি কোটি লোকের প্রতীকরূপে জগতের সামনে নিজেকে জাহির করতে বাধ্য হয়েছে, ক্ষুধায় জীর্ণ শীর্ণ শরীর শেষ পর্যন্ত যারা কোনমতে টেনেছে, তারাই সেই শহীদ যারা এ দেশের রাজনীতি আর অর্থনীতির পর্দা ফাঁস করে তার আসল রূপ সকলের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। যাঁরা মহত্তম আদর্শের ফাঁকা বুলির জোরে পশ্চিমী সভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ করছিলেন, তাঁদের এই বুভুক্ষ শহীদেরা দিয়ে গেছে এক নতুন চ্যালেঞ্জ।

বর্তমান বিশ্বের আধুনিক অর্থনীতি—নারীর ইজ্জত নিয়ে খোলাখুলি তামাশা দেখাবার সভ্যতা আর সংস্কৃতির প্রলয়ংকর দুর্ভিক্ষ প্রস্তুত করছে না? যেদিন পৃথিবীতে কোন্ কোণে এ ধরনের দৃশ্য উপস্থিত হবে, সেইদিন সারা পৃথিবীটাই আত্মঘাতী হয়ে শেষ হয়ে যাবে।

চিন্তার রাজ্যে সজ্জনের মনে যেন আত্মজ্বালার বহ্নিশিখা জ্বলছে। হঠাৎ ধনবন্তীর উচ্চহাসি শুনে তার ধ্যান ভঙ্গ হল।

ছোট ছোট বেড়ালচোখে কামুকতার নগ্ন ইঙ্গিত— কার ধ্যানে ডুবে আছেন বিশ্বামিত্র মুনি? আপনার মেনকা আপনার সামনে উপস্থিত।

সজ্জন তড়বড়িয়ে উৎসুক প্রেমিকের অভিনয় করার চেষ্টা করলে, কিন্তু তার গম্ভীর অবচেতন মনের হাত থেকে এত তাড়াতাড়ি রেহাই পাওয়া কি সম্ভব?

সামনের ঘরে সেক্রেটারি মহাশয়ের গোপীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় আলোচনা

চলছে। ধনবন্তী দেবী ঘরের বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে পাশের আর এক দরজায় আস্তে করে টোকা দিলেন। টোকার ইঙ্গিতের সঙ্গে পুলিসের ঘেরাওয়ের কথা মনে আসতেই সজ্জন মনে মনে হাসলে। কিন্তু পরমুহূর্তেই ধনবন্তীর সামনে সে যেন নিজেই অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে নিলে।

দরজা ভেতর দিক থেকে খুলল। ধনবন্তী কামুক ইঙ্গিতের সঙ্গে ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক খেলিয়ে তাকে আমন্ত্রণ জানালেন। কুণ্ঠায় সজ্জন যেন অতিরিক্ত কুণ্ঠিত হয়ে গেল। ধনবন্তীর কামভরা দৃষ্টি, বাঁকা হাসির সুড়সুড়ি আর শাড়ির ভাঁজের মধ্যে এক বিশেষ মাদকতা আছে তবে স্কচ্ বা শ্যাম্পেনের নয়।

ভেতরে ছোট ঘরে অন্ধকার। যে দরজা দিয়ে সে ঢুকল ঠিক তার সামনেই আর একটা বন্ধ দরজা। রাস্তার দিকের দেয়ালে তৈরী ছোট রোশনদার দিয়ে হাল্কা আলোর রশ্মি ঘরে আসছে। বাক্স-পেটরা, কানেস্তারার পাশে সাদা চাদর পাতা বিছানার পাশে তন্বী সুন্দরী দাঁড়িয়ে আছে। সজ্জনের সংকুচিত, লজ্জিত দৃষ্টি ইচ্ছে করে হটকারিতাবশতঃ এক মুহূর্ত তার মুখের দিকে চেয়ে আবার মেঝের চটা ওঠা নক্শা দেখতে লাগল।

ধনবন্তী দেবী লাইটের সুইচ টিপলেন। চারিদিকে কাম-সৌন্দর্যের আলো জ্বলে উঠল। দুটি অপরিচিত হরিণের মত চোখের পলক লজ্জায় আধবোজা ভাবে তাকে দেখলে। চিকনের শাড়ি ব্লাউজ পরা, রোগা পাতলা সুগঠিত দেহ, লম্বা বাঁশির মত নাক, পান খাওয়া পাতলা ঠোঁটে খয়েরের রেখা, ছুঁচোলো চিবুক আর গোলাপ ফুলের মত রঙ, বয়স তিরিশ-বত্রিশের মাঝামাঝি হবে। তাঁর নাকে, কানে আর গলায় মুক্তো ঝলমল করছে।

বাঁদিকের আঁচল ফেলা শাড়ির সঙ্গে তার ছুই হাত লুকোচুরি খেলায় ব্যস্ত, বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল মুড়ে দাঁড়াবার ভঙ্গিমা দেখেই তার শিল্পীমন ভাবুক হয়ে উঠল। তার ভঙ্গিমায়, তার দেহের প্রতিটি ভাঁজে যেন আছে অদ্ভুত কমনীয়তা। সত্যিই তাকে সুন্দরী বলা চলে, তাকে এক নজর দেখলেই বোঝা যায় যে সে কোন ভালো সম্ভ্রান্ত পরিবারের, তার পালন পোষণ বেশীর ভাগ পর্দার আড়ালেই হয়েছে কেননা তার চেহারায় আছে অ্যারিস্টোক্রাটিক মহিলার ছাপ।

যুবতীর চেহারার দিকে এক দৃষ্টি দেখার পর সজ্জনের হাত আপনা হতেই জোড় হয়ে গেল। ফর্সা লম্বা লম্বা আঙুল, নখে লাল পালিশ দেয়া হাত আঁচলের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রতি উত্তরে হাত জোড় করার সঙ্গেই সম্মোহনী হাসির ঝিলিক দেখা গেল, সে হাসি যত সজীব ততই আকর্ষক।

ধনবন্তী ছুজনকার দিকে চেয়ে গোপন ইঙ্গিতে মুচকি হাসির সঙ্গেই শায়রী করলেন— উল্‌ফত কা যব মজা হৈ কি দোনা হোঁ বেকরার— হাঃ হাঃ হাঃ— আসুন আসুন আর্টিস্ট মশাই, এবার একটু এঁর আর্টও দেখুন।

ধনবন্তী তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে বিছানার ওপর বসালে। রাজবৈদ্যার দেহের জ্বরের মত উত্তাপের স্পর্শ আর নোংরা ঠাট্টা শুনতে সজ্জনের একটুও ভালো লাগল না। সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলে, বাইরে গার্ড তার সংকেতের প্রতীক্ষায় তৈরী দাঁড়িয়ে আছে।

সময়ের গতি যেন ধনুকের তীরের মত বনবনিয়ে দ্রুতভাবে চলেছে। এক ঘৃণিত ষড়যন্ত্রের পর্দাফাঁস করার জন্য স্বয়ং ষড়যন্ত্রকারী

প্রেমীর অভিনয় করছে এক কুলীন গুপ্ত ব্যভিচারিনী সুন্দরীর সঙ্গে, ধনবন্তী চলে যাওয়ার পর অন্তর্দ্বন্দ্বের পীড়ায় কষ্ট পাচ্ছে সজ্জন— এ কোন্ পাপ কিনলাম আমি? মুহূর্তে কত সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের ইজ্জত আবরু সব ধুলোয় মিশে যাবে। তাদের বাড়ির পুরুষদের সামনে তাদের কী দশা হবে? এদের বাকী জীবন নরক হয়ে যাবে। এ আমি কি করলাম? কাজটা ভালো হয়নি। নিজেকে বার বার দোষ দিয়ে সে যেন তার পূর্বচেতনার দ্বারায় পরিচালিত হচ্ছিল। আজ সে এক সামাজিক মুখোসের আবরণ ভেদ করে রহস্যোদ্‌ঘাটন করছে, কাজটা মন্দ নয়। যদি সকলেই তার মত ভাবতে শুরু করে তাহলে সমাজে পরিবর্তন আনবে কে? সিদ্ধান্তের জন্য অনেকবার নির্মোহ হতে হয়।

সামনে বসা যুবতী নানারকম প্রেমের কথার বাঁধুনী দিয়ে তার মনপবনের ভাঁড় উল্টো দিশায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। অন্যমনস্ক ভাবে তাকেও মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে, কিন্তু তার জিভ যেন শুকিয়ে তালুতে চিপকে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ধনবন্তী দেবী এসে চা আর মিষ্টির রেকাবি রেখে গেলেন। এই মহিলাটি একজন নামকরা ঠিকেদার আর লোহার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিকের পত্নী। স্বামীর নাম, বাড়ির ঠিকানা ইত্যাদি জিজ্ঞেস করায় সে মুচকি হেসে উত্তর দিলে— টিয়া আর মৈনার গল্প শুনেছেন কখনো? একজন একদিশা থেকে আর অন্যজন আর-এক দিশা থেকে উড়ে এল, দুজনে এসে একই গাছের ডালে বসল, দুজনে বন্ধুত্ব হল। ব্যাস্, এই পর্যন্তই যথেষ্ট।

কথা প্রসঙ্গে মহিলাটি স্বীকার করলে যে স্বামীর সঙ্গে তার মনের মিল নেই। পত্নী শৌখীন কবিতা শায়রী পছন্দ করেন—

মানে রীতিমত রোম্যান্টিক। যদিও ক্লাসিক সাহিত্যের প্রতি তার বিশেষ রুচি নেই তবু তার স্বভাবটা বেশ রসিক, তার স্বামী খাঁটি ব্যবসাদার, তার নজরে স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ কেবল দেহভোগ মাত্র। যুবতীটি কামেচ্ছায় পীড়িত নয় কিন্তু তার জীবনে এমন সঙ্গীর অভাব যে হাবভাবের সরসতা দিয়ে তার রসিক মনকে মজিয়ে রাখতে পারে।

মহিলাটি তার স্বামীকে ঘৃণা করে, তাই সে পরপুরুষকে দেহ সমর্পিত করে পায় প্রতিশোধের গুপ্ত সান্ত্বনা। সজ্জন সহসা তাকে প্রশ্ন করলে যে বিয়ের আগে তার কোন পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল কিনা? যুবতীটি মাথা নেড়ে হ্যাঁ উত্তর দিতেই সে যেন কেমন চমকে উঠল। মহিলাটি আরো জানাল যে ধনবন্তী তার বাড়িতে একবার চিকিৎসা করতে এসেছিল, সেই থেকে তাদের পরিচয়, এখন সে তার পরম বন্ধু। সজ্জনের অন্য প্রশ্নের উত্তরে সে স্বীকার করলে যে পরপুরুষদের সঙ্গে সে নিঃসংকোচে মেলামেশা করে, যদি পুরুষ এ পথে যেতে পারে তাহলে মেয়েরাই বা যাবে না কেন? দুজনের পথ একই তবে সমাজে নারীর স্থান ক্ষণভঙ্গুর তাই সে তার সম্বন্ধকে সমাজের আড়ালে রেখে গুপ্তভাবে চালিয়ে যেতে চায়।

যুবতীটি আকর্ষক হলেও সে সে দুরাচারিনী, কথার সম্মোহনী বিদ্যার অধিকারিনী হয়েও সে কুটিল, সহজ স্বভাবের জন্য সে সহানুভূতির পাত্র তাই সজ্জন তার কোন অনিষ্ট করতে চায় না। সজ্জন তার মনের কথা যুবতীটিকে খুলে বলতেই সে আঁৎকে উঠল। সজ্জন তাকে আশ্বাসন দিলে যে যদি সে তার কথামত চুপচাপ এখান থেকে বেরিয়ে যায় তা হলে সে তার কোন অপকার করবে

না। এ বিষয় স্পষ্ট তাগিদ দিলে যে সে যেন ধনবন্তীকে কোন রহস্যের খবরাখবর দেবার চেষ্টা না করে।

যুবতীর চলে যাওয়ার প্রায় পনেরো মিনিটের মধ্যে আশেপাশের বাড়িতে হৈ-হুল্লোর শোনা গেল, রাস্তা-চলতি লোকের ভিড় বাড়তে লাগল। পরদিন খবরের কাগজে মহিলা সেবামণ্ডলের হাটে হাঁড়ি ভাঙার খবর প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হল। শিল্পজগতে সজ্জন বর্মার নাম হয়তো এত লোকে জানত না কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে শিল্পী মিঃ বর্মার নাম রাতারাতি প্রসিদ্ধ হয়ে গেল।

সজ্জ:নের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শহরের ছেলেছোকরার দল রাতারাতি হিরো হবার লোভে এ ধরনের ব্যভিচারের ছোঁ ঘাঁ পেলেই লাফাতে আরম্ভ করলে। জনতার আয়নায় নতুন করে এইসব সংস্থানের নাম ঝকঝকিয়ে দেখা দিল।

গোরুর নামে রামলীলা, ভজন-মণ্ডলীর নামে অনেক সামাজিক ট্রাস্টের অনৈতিক কারবার, সমাজের নিত্যনিয়মিত ক্ষতস্থান যেন আবার নতুন করে দগদগে হয়ে উঠছে। মসজিদ, শিবালয়, কীর্তন, সত্যনারায়ণের কথকতা, মিলাদশরীফ, ভজন, আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা পারিবারিক পরিস্থিতি, এক লহমায় যেন এসবের ওপর থেকে তার আস্থা চলে গেল। যে আস্থার ওপর আমাদের জীবন মরণ নির্ভর করছে, সে যে কত নির্জীব, আজ বিচারশীল ব্যক্তিরা যেন তৃতীয় জ্ঞানচক্ষু দিয়ে তাকে নতুনভাবে দেখতে ও বুঝতে শিখলেন।

পঁয়তাল্লিশ

মহাবীর মন্দিরের পাশের রোয়াকে বসে লালা মুকুন্দীমল তরকারী-ওয়ালার সঙ্গে দরদস্তুর করতে ব্যস্ত, মাঝে মাঝে হুকোতে এক টান দিয়ে নিচ্ছেন। মন্দিরের দরজার পাশেই, এক পালোয়ান ব্রাহ্মণ আসনপিঁড়ি হয়ে বসে রামচরিতমানস পাঠ করছেন।

নায়ি চরন সিরু কহকর যোরী।
নাথ মোহী কছু নাহিন খোরী॥
অতিশয় প্রবল দেব তব মায়া।
ছুটই রাম করহু যো দায়া॥

—এই ব্যাটা, পাড়ায় মাথা গলানো বন্ধ হয়ে যাবে, শালা আমার সঙ্গে হুজ্জত করতে আসছে। লালা মুকুন্দীমল সব্জী-ওয়ালার কাছে স্বরূপ প্রকাশ করলেন।

—বাজারদর থেকে কম কি করে দেব লালা? আপনি বুঝদার বুড়োমানুষ হয়ে খামকা মুখ খারাপ করছেন।

—দেখো হারামজাদা, আমার সঙ্গে সমানে সমান হয়ে মুখ চালাচ্ছে। নীচু জাতের কথাই আলাদা। এ সুকরু। আরে হারিয়া। এর ঝুড়িটা উঠিয়ে, নালায় ফেলে আয় দিকিন।

বিষয় বসয় সুন নর মুনি স্বামী।
মৈ পামর পশু কপি অতি কামী॥

নারী নয়ন সর যাহিনা লাগা।
ঘোর ক্রোধতম নিশি যো জাগা॥
লোভ পাশ যেহী গরন বঁধায়া।
সে নর তুম সমান রঘুরায়া॥

রামায়ণী ব্রাহ্মণ, লালা মুকুন্দীমল আর সব্জীওয়ালার মধ্যে ঘটিত লঙ্কাকাণ্ডর পরোয়া না করে আপন মনে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে মহাকবি তুলসীদাসের মধুর বর্ণনায় ডুব দিয়ে রামায়ণ পাঠ করে চলেছেন। মেয়েদের দল এসে হনুমানজীর বিগ্রহে ফুল আর শিবজীর মাথায় জল ঢেলে স্তুতিবন্দনার শ্লোক গেয়ে তারপর কারুর বাড়ির বউয়ের প্রতি অত্যাচার আর কারুর বাড়ির মেয়ের কলঙ্ক-কাহিনী আলোচনা করে যে যার বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে। বাবু রাধেশ্যাম মাঝের আঙুলে সিগারেট মুঠো করে নিয়ে কষে টান দিয়ে খবরের কাগজ হাতে করে এলেন। লালা জানকীসরণের মুনীম কুঞ্জীলাল বগলে খাতা গুঁজে হন হন করে যেতে যেতে, সামনেই মুকুন্দীমলের হুঁকো দেখে লোভ সামলাতে না পেরে, দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে মনের সুখে টান মেরে নিলেন। চেঁচামেচি করে লালা মুকুন্দীমলের গলা শুকিয়ে কাঠ, খক খক করে কাশতে কাশতে বললেন— বাজারে দু'পয়সা সের শাক কেউ কিনছে না পচে যাচ্ছে, আমি একআনা সের বলে কী দোষটা করেছি? পাড়ায় আর আগের মত একতা নেই তা না হলে এখুনি এক জোট হয়ে ব্যাটার পাড়ায় ঢোকা বন্ধ করিয়ে তবে ছাড়তুম।

সজ্জনকে গলিতে ঢুকতে দেখে রাধেশ্যাম উৎসাহের সঙ্গে বললেন— আসুন, আসুন, আজকাল চারিদিকে আপনার সুখ্যাতি

ছড়িয়ে পড়েছে মশাই। হাঃ হাঃ হাঃ, মহিলা মণ্ডলের ব্যাপারটা আপনার জন্যেই ফাঁস হল, বসুন বসুন।

—আরে কন্নোমলের নাতি এসেছে?

—আজ্ঞে নমস্কার, সজ্জন রোয়াকে বসার আগে লালা মুকুন্দীমলকে নমস্কার করলে।

—সুখে থাকো, তুমি খুব নাম করছ।

সজ্জন প্রশংসার ভারে নুয়ে পড়ল। কুঞ্জীলাল মুনীম মশাই গোয়েন্দার মত সুতীক্ষ্ণ নজরে সজ্জনকে দেখে নিয়ে লালাজীকে বললেন— সেই ব্যাপারে আমার একটি পরিচিত ছেলেও আটকা পড়েছে। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, ভদ্রলোক, পুলিসকে অনেক টাকাই চাটালে তবু এখনো পর্যন্ত···

—কে? কে? কার ছেলে ফেঁসেছে?

—আরে মংগতু আড়তিয়ার। যে সময় পুলিস এসেছিল, ছেলেটি ওখানেই ছিল।

—আচ্ছা? যেমন কর্ম তেমনি ফল— বলে বাবু রাধেশ্যাম মুঠোয় পোরা সিগারেটে ছোট একটা টান মারলেন।

—ফট করে মন্তব্য করতে তো আর ট্যাঁক থেকে কিছু খসাতে হয় না, যার ইজ্জত যায় সেই বোঝে। কী লালা, মিথ্যে বলেছি কিছু? কুঞ্জীলাল মুনীম লালা মুকুন্দীমলের সমর্থন পাবার জন্যে চোখ নাচালেন।

—হ্যাঁ ভাই, নিজের ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে প্রত্যেকেই দৌড়ঝাঁপ যত পারে করে। ইজ্জত বড় ঠুনকো জিনিস ভাই। আরে ও শুকরুয়া ব্যাটাচ্ছেলে, চারটে পান দিয়ে যা।

রোয়াকের ডানদিকে নিজের বাড়ির দরজার দিকে চেয়ে হুকুম-

নামা জারী করে লালা মুকুন্দীমল আবার গুড়ুক গুড়ুক শব্দে তন্ময় হয়ে গেলেন।

সজ্জন বললে— ইজ্জতের কথাই হচ্ছে লালাজী, সেখানে কেবল একজনেরই নয়, গোটা সমাজের ইজ্জতের প্রশ্ন ছিল।

—আপনি খাঁটি কথা বলেছেন বাবুমশাই— বাবু রাধেশ্যাম বললেন— যারা সমাজের ইজ্জতকে ডোবাবার চেষ্টা করছে—

—আরে, সবই সমাজের ইজ্জত, তুমি বাবা রাধেশ্যাম এ-সবের কী বোঝো? এই সেদিন তোমায় জন্মাতে দেখেছি, শালা, আমার চুল সাদা হয়ে গেল এইসব দেখতে দেখতে— কুঞ্জীলাল মুনীম বললেন— যদি অনুমতি করো তাহলে তোমার পাড়ার বড় বড় ঘরের ইজ্জত-আবরুর কথা ফাঁস করে দেব নাকি? আমি এই ভেবে মুখ সেলাই করে বসে থাকি যে এসব পরের কেচ্ছা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি ভালো কথা নয়। কাছা খুললে সবারই এক অবস্থা। কার কার কথা শুনবে?

—ইজ্জত আর রইল কোথায় ভাই কুঞ্জীলাল? আজকাল সকলেই নাক কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই পনেরো-কুড়ি বছর আগে পর্যন্ত, খুব গরীব হলেও, ক্ষিদে পেলে একঘটি জল ঢক ঢক করে খেয়ে চুপ করে শুয়ে থাকত, মরে গেলেও মুখ ফুটে নিজের পরম আত্মীয়ের সামনে মুখ ফুটে কিছু বলত না। তুমিই বলো— সত্যি কিনা?

—সত্যি কথা লালা।

—আর এখনকার দিনকাল দেখো। লক্ষপতি হোক আর গরীব হোক, সকলেই পরের সামনে বলতে ব্যস্ত যে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী, সংসার অচল হয়ে আছে। এতেই বোঝা যায় ইজ্জত

আবরু বলে কিছু আর রইল না। নিজের ঘোমটা খুলে বাজারে খেমটা নাচাই আজকালকার ফ্যাশন ভাই, তুমি আমি আর কি করব? মুকুন্দীলাল হুঁকোয় টান দিলেন।

কুঞ্জীলাল মুনীম নিজের বাইরের কাজকর্ম কিছুক্ষণের জন্যে মুলতুবি করে দিয়ে এক লাফে রোয়াকে উঠে ভালোভাবে বাবু হয়ে বসলেন—তখন সস্তার দিন ছিল লালা। গরীবী বরদাস্ত করার ক্ষমতা ছিল, ইজ্জতের ভয় ছিল। আরে আমার ছোটবেলায় মনে আছে টাকায় পনেরো সের গম, আঠারো কুড়ি পঁচিশ সের পর্যন্ত ডাল, দেড় সের ঘি, টাকায় ষোলো সের দুধ—তুমিই বলো, স্বর্গ ছিল কিনা? এখন কাগজে বেরিয়েছে যত মেয়েমানুষ ধরা পড়েছে সকলেই পেটের দায়ে এ পথে পা বাড়িয়েছে। সব দেখেশুনে এবার তুমিই বলো গরীবী বড় না ইজ্জত বড়?

বাবু রাধেশ্যাম মুখচোখ নাচিয়ে বললেন—আপনার কথা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না। আপনার বলার অর্থটা কি? ইজ্জতকে প্রাধান্য দিচ্ছেন না গরীবীকে?

—আমি কেবল ইজ্জতের কথাই বলছিলাম। যেসব অসহায় গরীব মেয়েরা, পেটের জন্যে দু'পয়সা মজুরি কামিয়ে নিয়ে আসত তাদের ঘোমটা খুলিয়ে ধরিয়ে দেওয়াটা কি ইজ্জতের কাজ হল? কুঞ্জীলালের কথায় সজ্জন এবার সোজা চোখ তুলে মুনীমজীকে এক নজর দেখলে।

—বাবু রাধেশ্যাম, উত্তেজনার আবেশে সমাজের এইসব পাপের হাঁড়ি ফাটানো দরকার। এসব বড়লোকেদের নোংরামি। আপনার লক্ষপতি আড়তিয়ার আদুরে ছেলে ধরা পড়েছেন তাই আপনার গায়ে ফোস্কা পড়ছে। আরে আমি জানি এই বড়লোকেরাই

নিজের সুখ আর স্বার্থের খাতিরে জঘন্যতম কাজ করতে পারে। নারী জাতিকে ছাড়বে না, গোরুকে ছাড়বে না, রামলীলা এমনকি শালা মড়ার কাপড় পর্যন্ত ছাড়বে না। এরাই সমাজকে লুটেপুটে ঝাঁঝরা করে ছেড়েছে। এরা রাক্ষসের চেয়ে কিছু কম নয়। মুনীমজী এদের চাকরী করে সংসার চালান— দুমুঠো অন্নের জন্যে তাই ইনি নিজের মানসম্মান সব বেচে খেয়েছেন।—বড়লোকদের সমালোচনা করে আর মুনীমজীদের মত লোকের কাজকারবার দেখে বাবু রাধেশ্যামের রাগের মাত্রা বেড়ে গেল। ইতিমধ্যে তাঁর হাতের সিগারেটের মুখে বেশ কিছুটা ছাই জমেছে, একটু বাকী আছে। বাবু রাধেশ্যাম মুঠো নেড়ে ছাই ঝেড়ে, সিগারেটের মায়া ত্যাগ করার আগে প্রাণভরে একটান মেরে ছুঁড়ে দিলেন।

সামনের গলি দিয়ে মহিপাল এদিকেই আসছে। কুঞ্জীলাল মুনীম রাধেশ্যামের গরম লেকচার হজম করতে না পেরে তাড়াতাড়ি বগলে খাতা গুঁজে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। লালা মুকুন্দীমল ঝটপট তাঁর কাঁধ ধরে কানে কানে বললেন— কার সঙ্গে কথা বলছ কুঞ্জীলাল? আজকাল কম্যুনিস্টদের রাজত্ব, দাঁড়াও, পান খেয়ে যাও। আরে এই ব্যাটাচ্ছেলে সুকরুয়া, এখনো পান দিয়ে যাসনি। আর ছিলিমটা সাজিয়ে দিয়ে যা।

পুরোনো দিনের স্মৃতি মন্থন আরম্ভ হল, কারুর ছেলে, কারুর ভাই, বুড়ো জোয়ান কেউই বাদ গেল না। গত দশ-বারো বছরের সামাজিক বিকাশের জলজ্যান্ত ছবি আঁকার চেষ্টা করা হল। এদের সপ্তকাণ্ড রামায়ণ গান হচ্ছে, এদিকে কথক কখন রামায়ণ পাঠ করে চলে গেছেন কারুর খেয়ালই নেই। ইতিমধ্যে কথকতা শুনে যে কজন রাস্তা-চলতি লোক প্রণাম করতে এসেছিল তাদের

মধ্যে অনেকে রোয়াকে বসে মুখরোচক জব্বর গল্প তন্ময় হয়ে শুনতে ব্যস্ত। পুরোনো দিনের কথা আবার নতুন করে গেঁজালে এক অদ্ভুত নেশার সৃষ্টি করে। নিমের কাঠি থেকে টুথ ব্রাশ, টুথ পাউডার আর পেস্ট, সকালের চা জলখাবারে জিলিপি থেকে মাখন টোস্ট, পরিধানে পাগড়ী, আচকান, মাথার ওড়না, জালির গায়ের কাপড়, চোগা চাপকান থেকে আরম্ভ করে আপটুডেট সাহেবী পোশাক পর্যন্ত কোন আলোচনাই বাদ গেল না।

ইতিমধ্যে সূর্যি ঠাকুর রোয়াক ছাড়িয়ে দেয়ালে আলো ছড়াচ্ছেন। সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে মজলিশ বরখাস্ত হল। মহিপাল রোয়াক থেকে উঠে বজরঙ্গবলীকে হাতজোড় করে শ্রীগুরুচরণ সরোজ রজ ইত্যাদি পাঠ করে, ভোলে মৃত্যুঞ্জয় হর হর উচ্চারণ করে সজ্জনের কাছে গেল। সজ্জন চিন্তিত হয়ে বসে আছে, চোখের দৃষ্টিতে শূন্যতা। মহিপাল সেই চাউনির উত্তর খুঁজে না পেয়ে একটু ফিকে হাসি হাসলে। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে সজ্জন বললে—বারোটা চল্লিশ হয়ে গেল। আমি এদিকে জেঠীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম, এখানে মজার মজার কথায় এমন ফেঁসে গেলুম যে ঘড়ির দিকে তাকাতেই ভুলে গেছি। যাক সময় ভালোই কাটল।

—হ্যাঁ, অনেকদিন পরে এসব কথা শুনতে ভালোই লাগল। সামনে দিয়ে গোরু যাচ্ছে, গায়ে তার দোলের রঙ ছিটানো। তাকে দেখে সজ্জনের চিন্তাধারায় বাধা পড়ল।

—তুমি সকাল সকাল এদিকে কী মনে করে?

—তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

—আমি জেঠীর বাড়ি যাচ্ছি। যদি তোমার কোন কাজ না

থাকে তা হলে এসো। মহিপাল দোনোমোনো করে বললে-না তুমি যাও, আজ তা হলে আমি চলি, কেমন?

সজ্জন তার মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললে— এসো-না, জেঠী ডেকেছেন, দেখা করে তারপর যেখানে বলবে যাওয়া যাবে।

মহিপাল রাজী হয়ে গেল। দুজনে গোয়ালঘরের ছোট ফাটকটির দিকে এগুলো। জেঠীর এই বিরাট বসতবাড়ির একখানা ঘর ভাড়া করে থাকার কথা সজ্জনের মনে পড়ল। শরণার্থীদের ষড়যন্ত্র, জেঠীর জাদু মন্তরের আটার পুতুল জ্বালানো, চোরদের হাতে পড়ে জেঠীর দুর্গতি, কন্যার আসা, বড় আর বোরের রোমান্স, ··· হঠাৎ সজ্জন প্রশ্ন করলে— আজকাল মহাকবি বোর কোথায় আছেন? অনেক দিন হল দেখা হয়নি।

—ইদানীং আমার সঙ্গেও দেখা হয়নি। বড় বাজে লোকটা।

—ওর মত সংসারে আরো কত আছে। চরিত্রের দুর্বলতাকে আর আমি আগের মত হেয় দৃষ্টিতে দেখি না। এই রোগ সারা সমাজে ছড়িয়ে আছে।

—দুর্বলতা কেন? শক্তিও সমাজব্যাপী নয় কি? সজ্জন জেঠীর দরজার কড়া নাড়লে।

মহিপাল কথার মাঝখানেই চুপ করে গেল। ভেতর থেকে জেঠীর আওয়াজ ভেসে এল।

—আরে এ সময় কে আবাগীর ব্যাটা?

—গালাগাল বিনে জেঠী কথাই বলেন না— মুচকি হেসে মহিপাল বললে।

সজ্জন দরজার সন্ধিস্থলে মুখ রেখে জোরে চেঁচালে— আমি জেঠী, সজ্জন।

—দুর্জন কেন বললে না ব্যাটা ?

—সে কেবল শীলাই বলে।

শীলার নাম শুনেই মহিপালের মুখ যেন হঠাৎ কালো হয়ে গেল। খিল খোলার শব্দ হল, কন্যা দরজা খুলে দাঁড়াল। মহিপালকে নমস্কার করে স্বামীর দিকে প্রসন্নভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কোথায় ছিলে এতক্ষণ, এত দেরী হল যে ?

—এখানেই রকে বসে ছিলাম।

—দাবা খেলছিল, ধরে বেঁধে এনেছি— মহিপাল হেসে বললে।

কন্যা হেসে উত্তর দিলে— তার মানে আপনিও সেখানে খেলতে গিয়েছিলেন।

—হেরে গেছে, তাই তো নালিশ জানাতে এসেছে। সজ্জন ভারিক্কি চালে বললে।

—বাবাজী এসেছেন— কন্যা বললে।

—কোথায় ?

—ওপরে। কন্যা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যেতে লাগল। ওপরে চৈত্র মাসের চনচনে রোদ, জেঠী রোদে পিঠ দিয়ে বসে, কৌপীনধারী কৃষ্ণবর্ণ সুগঠিত দেহের বাবাজী পা মুড়ে বসে আছেন। বাবাজী তাদের অভ্যর্থনা জানালেন। সজ্জন হেঁট হয়ে জেঠীর পায়ের ধুলো নিলে— কি রে, কোথায় ছিলি এতদিন ?

—জেঠী— এই একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

—এমন কী রাজকাজ করছিলি শুনি যে এখানে আসার ফুরসত পেতিস না ? তোর বউয়ের কাছে তোর খোঁজখবর পেয়ে তাই মনটা ঠাণ্ডা হত, তা না হলে…

—না না রামভক্তনিয়াঁ, আমি সাক্ষী তোমার বউয়ের মত ছেলেও একটা বড় কাজে হাত দিয়েছিল।

—আমার বউ হতে যাবে কেন?

—আরে কি আশ্চর্য, ছেলে যদি তোমার হয় তাহলে বউ কার হবে?

—আমি এই কন্নোমলের নাতিকে বলেছিলাম যে নাতবৌকে একশো তোলা সোনা দিয়ে মুখ দেখব, কত ভালো ভালো নিজেদের স্বঘরের মেয়ে দেখালাম…

—রামভক্তনিয়াঁ, তুমি যাই বলো, ছেলে যখন তোমার তাহলে বউও তোমারই। কত ফর্সা সুন্দর কেমন ভালো স্বভাব, বাড়িতে মন দিয়ে পতিসেবা করে, এখানে এসে তোমার সেবা করে, স্কুল চালায়, খারাপটা কী দেখলে রামভক্তনিয়াঁ? এর ওপর অপ্রসন্ন কেন তুমি? জেঠী এক নজর কন্যাকে দেখে মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন— হুঁ, ভালো তো বটে, তবে শুরুতে আমায় মিথ্যে বললে কেন যে আমাদের স্বঘর— সজ্জন হেসে বললে— জেঠী, যশোদার ভয়ে কৃষ্ণও মিথ্যে বলেছিলেন।

বনকন্যা আর বাবাজী, দুজনে হেসে উঠল। মহিপাল মুখ টিপে হাসলে, জেঠীও কালো মুলো মুলো দাঁত বার করে হাসলেন।

—আর এবার মা রামভক্তনিয়াঁ, তুমি একে কিছু বলতে পারবে না। তুমি যশোদা মা আর এ তোমার কানা কেষ্ট। আর তা হলে বউকে বকা চলবে না, তারও সাতখুন মাপ করে দাও।

—আরে মাপ করে দিলুম। এই পোড়ারমুখীকে যতই মন থেকে দূরে রাখব ভাবি, এমন সেবা করে যে কি বলব?

—তাহলে তুমি তোমার একশো তোলা একে দিয়ে ফেলো-না।

জেঠী উত্তর দিলেন না। মহিপালের দিকে চেয়ে সজ্জনকে প্রশ্ন করলেন— এ আবার কে?

—ইনি প্রকাণ্ড পণ্ডিত জেঠী। বাবাজী বললেন— ইনি নামী বিদ্বান রামভক্তনিয়াঁ।

জেঠী তাড়াতাড়ি মেঝেয় মাথা ঠুকে প্রণাম করে বললেন— আমার সৌভাগ্য যে ইনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন। এখানেই থাকেন, না বাইরে থেকে এসেছেন?

—এখানেই থাকেন জেঠী, ইনি অনেক বই লিখেছেন। কন্যা উৎসাহের সঙ্গে মহিপালের পরিচয় দিলে।

—তাহলে ইনি পুজো-আচ্চাও করেন নিশ্চয়?

– হ্যাঁ জেঠী, তবে বাড়িতেই পুজো-আচ্চা করেন— সজ্জন বললে— বাইরে বিয়ে-থা ইনি করান না।

—আমি এমন পণ্ডিত খুঁজছি যে আমার ভগবানের বেশ ভালো করে বিয়ে-থা করিয়ে দিতে পারবে, কি বল বাবাজী? না-হয় কারুকে কাশী থেকে ডেকে পাঠাও, খরচ-খরচা আমি দেব।

—ঠিক আছে, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে রামভক্তনিয়াঁ।

—হ্যাঁ, বিয়ে খুব ধুমধাম করে হওয়া উচিত বাবাজী। আমার সতীনের নাতি হারামজাদার বিয়েতে যদি এত ধুমধাম তা হলে আমার ভগবানের বিয়েতে তার চেয়ে দ্বিগুণ বেশী শোভা হবে নাই বা কেন? কন্নোমলের নাতি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছে। আর মাত্র কটা দিন হাতে আছে, কাল বৈশাখ মাসের প্রথম দিন, পূর্ণিমার দিন বিয়ের লগ্ন, এখনো কোন জিনিস জোগাড় করা হয়নি।

—আরে রামভক্তনিয়াঁ, তুমি কেন ভাবছ? ছেলেকে পণ দেবার সময় একটা আশ্রম তৈরী করে দিয়ো, বাস।

—জেঠী আশীর্বাদে কী দেবেন? কন্যা প্রশ্ন করলে।

মহিপাল বললে— আজকাল অনেক জিনিস দেওয়ার রেওয়াজ, রেডিও, সোফাসেট, ঘড়ি···

—রামভক্তনিয়াঁ এসব তুমি আমাকে দেবে? তার মানে কৃষ্ণ ভগবানের বিয়ে দিয়ে তুমি আমায় কোট প্যাণ্ট পরাবে? বাবাজীর কথা শুনে সকলে হেসে উঠল।

জেঠী বললেন— তাই তো আজ ডেকেছি। আশীর্বাদের থালা সাজাতে হবে, মিষ্টি মেওয়া ফল সব আনতে হবে।

—আচ্ছা, সেসব আমরা ঘাটে বিলিয়ে দেব। বাকী নগদ তুমি দিয়ে দিয়ো। তাই দিয়ে আশ্রমের জমি কিনব। আশীর্বাদে জমি আর বিয়েতে আশ্রম তৈরীর খরচা।

বিবাহের সব ব্যবস্থা ভাবা হল। মহিপালের তাড়া আছে তাই সজ্জনকেও উঠতে হল। কন্যা চলে গেল, তার স্কুল এখনো চলছে। কন্যার সাহায্য করতে দুজন মহিলা আসতে আরম্ভ করেছেন, তাঁরা সেলাই বোনা, সুচের কাজ, জরীর কাজ শেখান। কন্যার স্কুলে অনেক মেয়ে আসা আরম্ভ করেছে। জেঠীর বসতবাড়িতে সজ্জনের স্টুডিওর ঘরটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, ইদানীং অনেকদিন হল সে আর কোন ছবিতে হাত দেয়নি, একটু-আধটু যা তুলি চালিয়েছে সে নিজের বাড়িতে। আজ তুলি হাতে নেয়ার শখ হতেই মহিপাল তাকে সজাগ করে দিলে— এখানে মেয়েদের হুল্লোড় হবে।

—এসো রামজী, আমার এখানে এসো। বাবাজী কন্যার

পাঠশালা দেখে ফিরছিলেন এমন সময় তাদের কথা শুনতে পেয়ে তিনি তাদের ডাকলেন।

—এসো-না রামজী, সিদ্ধি খাওয়া যাবে। মহিপাল দোনোমোনো করতে লাগল।

সজ্জন হেসে বলল—আমাদের কিন্তু এখনো পেটে কিছু পড়েনি বাবাজী।

—হ্যাঁ আমিও বাড়ি থেকে জলখাবার খেয়ে বেরিয়েছিলুম।

—তা হলে আজ ফলাহার করো। রাস্তায় সব জিনিস কেনা যাবে. ফলও নিয়ে নেব, আড়াই তিনটের সময় আমাদের ওখানে ঘাটে পণ্ডিতাইন দুধ গরম করে, সকলে এক এক গেলাস দুধ খেয়ে নেবেন। কি ভাবছ রামজী? বাবাজী মহিপালের পিঠে হাত রেখে প্রশ্ন করে বললেন—মানেটা এই যে আজ যখন আপনারা দুজনেই দৈবক্রমে মিলিত হয়েছেন, তখন এক জায়গায় বসে পরামর্শ করা যাক। এত টাকা যে পাওয়া যাবে তার উচিত ব্যবস্থার বিষয় ভাবতে হবে তো?

মহিপাল নিরুত্তর হয়ে বসে রইল।

ছেচল্লিশ

বাবাজীর আশ্রম থেকে সকলে তাড়াতাড়ি ফিরে এল। মহিপালের তাড়া আছে, কাপুর হোটেলে বসে কিছু পান করার আগ্রহ শুনে সজ্জন প্রথমটা দোনোমোনো করলে। ইদানীং সজ্জন মদিরার আকর্ষণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করে কিন্তু মহিপালের আগ্রহ দেখে সে সঙ্গে যেতে রাজী হল।

মহিপাল বললে—হঠাৎ লোকে একটা জিনিস ছেড়ে দিতে পারে কখনো?

—কেন? তুমি নিজেই একজন আদর্শবাদী লেখক, গ্রহণ আর ত্যাগের মহিমার উপদেশ তুমিই কতবার দিয়েছ। সজ্জনের কটাক্ষ মহিপালের ভালো লাগল না, কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললে—ভাবা সহজ কিন্তু করতে যাওয়াই মুশকিল। তোমার নিজের কী মনে হয়? সজ্জন গম্ভীর হয়—হ্যাঁ আর না দুই।

—সে কি করে সম্ভব?

—আমার মনে হয় আমার আত্মসচেতন বুদ্ধি তোমার চেয়ে প্রখর, একবার একটার বিষয় দৃঢ় নিশ্চয় করে নেবার পর তাকে বজায় রেখে চলার চেষ্টা করি।

—তাহলে একটা প্রশ্নের জবাব দাও, যে মহত্তম উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তুমি এ পাড়ায় এসেছিলে, তোমার আত্মসচেতন বুদ্ধির দ্বারা কতদূর এগুতে পারলে?

সজ্জন চুপ করে রইল, গাড়ি নিজের গতিতে চলেছে। সজ্জন বললে— আরে ভাই, রোমান্সে তলিয়ে গেলাম, না হলে অনেক কিছু করতে পারতুম।

—রোমান্সে কেন তলিয়ে গেলে?

—আমার জীবনের রিক্ততা···

—তা আমার জীবনেও আছে, তাই আমি বার বার যেন হেরে যাই। মহিপাল দীর্ঘশ্বাস ফেললে। কাপুর হোটেলে পৌঁছে ম্যানেজারকে বলে ওপরের একটা ঘরে বসার ব্যবস্থা করা হল।

মহিপাল বললে— আজ সকাল থেকেই আমার মনটা বড়ই উদ্‌বিগ্ন হয়ে আছে।

—কেন?

—আমার জীবনের সন্ধে হয়ে এসেছে।

—দূর পাগল নাকি, স্বপ্নটপ্ন দেখেছ বোধহয়।

—হ্যাঁ।

—তাই মনটা ভালো নেই?

—হ্যাঁ।

—স্বপ্ন, দেউলে মনের তৈরী ছাড়া আর কিছুই নয়।

—আমার কি মনে হয় জানো? স্বপ্নের মধ্যে লুকিয়ে থাকে সংকেত, আমার দেউলে মনের হাতে আজ যেন আমি বিকিয়ে গেছি, জীবনযুদ্ধে আজ আমি পরাস্ত, ক্লান্ত।

—কি স্বপ্ন দেখেছিলে?

—স্বপ্ন— আমি দেখলাম এক সরু নোংরা গলি, ছেঁড়া নোংরা কাপড়ের টুকরো চারিদিকে ছড়ানো, ভাঙা মাটির বাসন, ঘায়ের

রক্তপুঁজে ভরা তুলো আর কাপড়ের ব্যাণ্ডেজে ভরা গলির মধ্যে দিয়ে আমি চলেছি।

—আর তোমার সঙ্গে?

—কেউ নয়, আমি একা।

—তারপর?

—হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেলুম। গলি থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় দাঁড়াবার সে যে ব্যাকুলতা তার বর্ণনা করা বড়ই কঠিন, সে এক নতুন চেতনা।

—তারপর?

—তারপর আমি এক নদীর ধারে পোঁছে গেলাম, একটি নৌকো যাচ্ছে, তাতে অনেক লোক। তারা সকলে আমায় ডাকছে। নৌকো কিনারে আসতেই আমি উঠে বসলুম। তাদের মধ্যে অনেকেই চেনা মুখ।

—তারপর?

—একটু পরেই ভরাডুবি, নৌকো উল্টে গেল। সকলে সাঁতরে পার হবার চেষ্টা করছে, মন্দিরের চুড়ো, বড় বড় অট্টালিকা, ধ্বংসস্তূপের প্রতিচ্ছবি সবুজ জলের মধ্যে চক চক করছে। সেই ধ্বংসস্তূপ যেন আমাকে তার চুম্বক শক্তি দিয়ে টানছে।

—তারপর?

—আমি নিজের সঙ্গে অনেককেই নিয়ে চললুম, একটু পরেই কিন্তু আর কারুকে দেখতে পেলাম না, এতগুলো লোক যেন নিমেষের মধ্যে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেল। নদীর তলায় এক ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে মোটা শেকল দিয়ে বাঁধা অবস্থায় আমি পড়ে

আছি, অনেক হাত-পা চালাচ্ছি কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ, শেকলের হাত থেকে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারছি না।

—তোমার মনের আত্মদাহ মহিপাল, এই নোংরামি আর ধ্বংসস্তূপ সব তারই প্রতীক। একে ভালোভাবে এনালাইজ করে দেখো। মৃত্যুর প্রশ্নই উঠছে না।

মহিপাল চুপ করে রইল। সজ্জন কফি শেষ করে সিগারেট ধরিয়ে সিগারেট কেস মহিপালকে দিল। হুইস্কির নেশায় কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সজ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মহিপাল বললে—তোমাকে একটা কথা বলে ফেললে আমার মনটা হাল্কা হয়ে যাবে,··· আমি··· তোমাকে ঈর্ষা করি।

—সজ্জন মুখ টিপে হাসল।

—আর-একটা কথা বলব? আমি তোমাকে স্নেহও করি।

—আর কর্নেলকে?

—কর্নেল দেবতুল্য মানুষ। তার চেতনাশক্তি বেশী বিকশিত না হতে পারে তবু পরোপকারে প্রাণ দিতেও সে দ্বিধা করে না। আমার একটা কথা আরো শুনবে সজ্জন? জীবনযুদ্ধে কোনদিনই হার স্বীকার কোরো না।

—জীবনে হার চলতেই থাকে, তার ওপর নিজের কণ্ট্রোল রাখা সম্ভব নাকি? পরিস্থিতির অধীনে পড়ে অনেক কিছুই সম্ভব হয়ে যায়।

—সে যাই হোক। ক্লান্ত হয়ে যাওয়াই সবচেয়ে বড় হার, আমি তারই বিষয় বলতে চাইছি। তুমি জীবনে যে মিশন নিয়ে এগিয়ে চলেছ তাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার ভার তোমারই।

অন্তরঙ্গ বন্ধুর উপদেশ শুনে সজ্জন ভাবুক হয়ে বললে— তুমি যদি আমার পাশে থাকো, কণ্টকাকীর্ণ পথও সহজ হয়ে যাবে।

—আমি আজ নিজের পরিধির মধ্যে নিজেই আবদ্ধ হয়ে গেছি, আমার হৃদয়-কমলটি যেন অকালেই অন্ধকার গুহায় বন্ধ হয়ে আলো বাতাস বিনে শুকিয়ে গেছে। আজ হতে দশ-পনেরো বছর আগে, যৌবনে মনে কতই-না আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল, ভেবেছিলুম হয়তো একদিন সারা পৃথিবীটাকেই বদলে ফেলব— কিন্তু আজ— আজ আমি বড় ক্লান্ত। জীবনরসের উৎসস্থানই আজ মরুভূমিতে পরিণত হয়ে গেছে। যে মানুষ নিজেকেই বদলাতে পারল না, পৃথিবীটাকে বদলাবার ক্ষমতা তার কোথায়?

—এসব কথা ছাড়ো এখন, হ্যাঁ আজ সকালে কেন এসেছিলে বললে না তো?

—এমনি, বললাম যে, একা মনের সঙ্গী খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। একবার ভাবলুম কর্নেলের বাড়ি যাই, তারপর ভাবলুম যে সে এসব কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝবে না। তারপর ভাবলুম— ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলে মহিপাল চুপ করে গেল।

—তুমি নিজের আর শীলার প্রতি অন্যায় করছ মহিপাল। তোমার এই ফ্রাস্ট্রেশন সেইদিন থেকেই আরম্ভ হয়েছে যেদিন তুমি শীলার সঙ্গ ত্যাগ করার সংকল্প করেছ।

—সে কথা যেতে দাও সজ্জন··· মহিপাল সোজা হয়ে বসল। গেলাসের স্কচের রঙে তার পরাজিত ব্যক্তিত্ব যেন আধার খুঁজে পেল।

—তোমার ভাগ্নীর বিয়ে কবে ঠিক হল?

—আষাঢ় মাসে, অমাবস্যার পরে নবমীর দিন।

—কন্যা আর বউদি দুজনে ঠিক করেছে, বিয়ে আমার বাড়িতে হবে।

—হুঁ।

—কাল রাত্তিরেই বসে আমরা সব প্ল্যান করছিলুম। বরযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা রাজাসায়েবের ওখানেই করা যাবে। আমি শুনেছি যে তোমাদের ওদিকের বরযাত্রীরা বড় বেয়াড়া হয়, নানারকম ন্যাকরা করে।

—করতে দাও ব্যাটাদের! মহিপাল একবারে এক ঢোকে অর্ধেক গেলাস খালি করে ফেলল।

—আরে, তুমি ভাবছ কেন? আদর-অভ্যর্থনার চোটে একেবারে ফ্ল্যাট করে দেব তোমার বেয়াইদের, কিন্তু ছেলেটি, শুনেছি বেশ হাল ফ্যাশানের ··

—হুঁ।

—তবু বেয়াড়াপনা হবেই।

—বলতে পারি না।

—আচ্ছা মহিপাল, একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছ? আজ সকাল থেকে একের পর এক যা কিছু এখন পর্যন্ত কানে গেছে, কি মনে হয় তোমার? সমাজ প্রগতির পথে এগিয়েছে? প্রতিক্রিয়াবাদীরা পেছু হটে গেছে অথচ এত কিছু হবার পরও এই প্রতিক্রিয়াবাদীরাই আজ পর্যন্ত আমাদের মাথায় চেপে বসে আছে। এসবের কারণ কি?

মহিপাল চুপচাপ বসে আছে, উত্তরের প্রতীক্ষায় সজ্জন যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, নিরাশ হয়ে মাথা হেঁট করে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে দেখতে লাগল।

—তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি সজ্জন, কিন্তু যদি সত্যি মনের কথা জিজ্ঞেস করো তাহলে আমি বলব সে উত্তর দেবার অধিকারী আমি নই।

—কেন?

—কারণ, আমি নিজে সে পথে চলতে পারিনি।

—তাহলে, তুমি ভাবছ কি?

—বলা বাহুল্য, আমার জীবনের শেষ অধ্যায় এসে গেছে, আর মিথ্যে বলা সাজে না। আমার অবচেতন মনে মিথ্যার ভাণ্ডার যতটা রয়েছে তাকে উপুড় করে দিতে পারলেই শান্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত তা করতে পারছি না, সত্যি বলার দম্ভ করা বাজে ভাঁড়ামি ছাড়া আর কিছুই হবে না।

সজ্জনের কথায় বিরক্তির ঝাঁঝ— পাগল হয়েছ মহিপাল, নিজের সঙ্গে সবার মাথা খারাপ করার কোন মানে আছে? স্বপ্নকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করতে তোমার লজ্জা বোধ হচ্ছে না? তুমি না লেখাপড়াজানা সাহিত্যিক? মেনে নিলুম তুমি জীবনে একটা সত্যের পালন করতে পারলে না কিন্তু তাই বলে অন্যদের শক্তি দেওয়ার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেললে নাকি?

—আমার শক্তি কোথায় যে দান করব? তুমি মোহম্মদ আর সেই বাচ্চার গল্প শুনেছ যে গুড় খেত? যতদিন পর্যন্ত মোহম্মদ নিজে গুড় খাচ্ছে সে বাচ্চাকে গুড় না খাওয়ার উপদেশ দিতে পারে না··· যাক সে কথা, এখানে পরিস্থিতিই অন্য, তুমি নিজেই গুড় খাও না।

—হেঁয়ালি ছাড়ো মহিপাল।

—হেঁয়ালির কথা নয়, সহজ কথা, এত হাজার বছরের ঘোর

পরিশ্রমের পরও আমরা ভারতের জনজীবন থেকে অন্যায় অবিচার দূর করতে পারিনি। তোমার সমাজকল্যাণের স্ফুলিঙ্গ সমাজের অণুতে অণুতে ব্যাপ্ত হয়নি, কেবল তোমার একার হৃদয়ে তার জ্যোতি পরিব্যাপ্ত।

সজ্জন হতাশ হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসল। মহিপাল যেন ভাগ্যের হাতে কাঠের পুতুলের মত নেশায় চুর হয়ে বসে আছে। হঠাৎ জাতিভেদের কথা মনে আসতেই মহিপাল যেন অবসাদের হাত থেকে মুক্তি পেলে—আমার এ কথা বলার অর্থ এই যে ভারতবর্ষের জটিল 'জাতিভেদ' প্রথা আমাদের জনজীবনের প্রতিটি শিরাকে জারিয়ে রেখেছে, যতদিন এই রোগটির বীজাণু আমাদের রক্তকণায় আছে, মানবসমাজের উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

—এবার জাতিভেদের ভিত্তিতে ভাঙন ধরেছে।

—সিভিল লাইনে, গলি পাড়ায় নয়। একশোর মধ্যে চারটে কেস হলে তাকে পরিবর্তন বলা যায় না।

—কিন্তু আগের মত তীব্র বিরোধ আর দেখা যায় না। জেঠী পর্যন্ত কন্যার আর মিসেস বর্মার প্রতি সদয় ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। কন্যাকে তিনি বড় ভালোবাসেন, যদিও তাকে তাঁর খাবার জলের ঘড়ায় হাত দিতে দেন না।

—জেঠী তাঁর খাবারদাবার আলাদা করে রাখেন, তোমার স্ত্রী বা বর্মাপত্নীর প্রতি তাঁর ব্যবহারেই আমাদের সমাজের প্রকৃত রূপ দর্শন হয়। তুমি, বর্মা আর তোমাদের ধর্মপত্নীরা যদি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করতে, তাহলে মরে গেলেও জেঠী তোমাদের প্রতি সদয় হতেন না। সে সময় জাতের বাইরে বিয়ে করার কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবত না। সেকালে সামাজিক

নিষ্ঠার মানদণ্ড বড়ই কঠিন ছিল। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত জেঠী অকল্যাণ কামনা ক'রে আটার পুতুল মন্ত্রঃপূত করতেন, এটা সেই কঠোর সামাজিক নিষ্ঠারই পরিণাম। আজ সমাজ-সংগঠনে অনেক পরিবর্তন হয়েছে তাই তারা তোমাদের মত দম্পতিকে মুখ বুজে সহ্য করছে, যদিও তোমাদের সিদ্ধান্তকে তারা আজও স্বীকার করতে রাজী নয়।

—এই নতুন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে নতুন সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে কী করা উচিত?

—এক প্রবল শক্তিশালী আন্দোলনের মাধ্যমে তা করা সম্ভব। এমন আন্দোলন যার স্রোতের সামনে জাতিবন্ধনের শেকল আপনা হতেই ঝনঝনিয়ে খুলে পড়বে। এই আন্দোলন করার আগে আমাদের জাতিভেদের ইতিহাস ভালোভাবে অধ্যয়ন করে নিতে হবে। আমাদের সমাজের পতনের কারণ ভালোভাবে বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারবে যে এই জাতিভেদের শক্তি একদিন আমাদের জাতীয় মনোবল দৃঢ় করেছিল, তারপর সময়ের স্রোতে সেই মনোবলই দুর্বলতার লক্ষণ হয়ে দেখা দিল।

সজ্জন গম্ভীর ভাবে বসে আছে। মহিপাল নিজের গেলাসে চুমুক দিয়ে কাবাবের টুকরো উঠিয়ে মুখে দিল। হঠাৎ যেন দুজনেরই একসঙ্গে মৌনভঙ্গ করার ইচ্ছে হল, মহিপাল কিছু বলতে গিয়ে সজ্জনকে দেখে থেমে গেল।

—কি হল সজ্জন, যা বলার বলো।

—আমি নিজের জীবন সমাজ-কল্যাণের কাজে অর্পিত করব ভাবছি, আমি এই সমাজকে বদলে ফেলতে চাই। সজ্জনের চেহারায় দৃঢ়তার ছাপ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল—হ্যাঁ মহিপাল, তুমি কিছু বলছিলে?

—অ্যাঁ? ওহো— মহিপাল হাসল,— রূপরতন আমায় মোটর দেবে বলেছে, ভাবছি শকুন্তলার বিয়ের পরই নেব তা না হলে গাড়ি দেখে বরপক্ষ ফর্দের তালিকা বাড়িয়ে দেবে।

* * *

একটু পরেই পহিপাল আর সজ্জন যে যার বাড়ির দিকে রওনা হল। আজ মহিপাল একা থাকার মুডে, পায়ে হাঁটাই ঠিক করলে। হোটেলের বারান্দায় সজ্জনের ছোট ফোর্ড গাড়ি দাঁড়িয়ে। সজ্জন সহজভাবে তাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবার কথা বলতেই মহিপালের চোখ আরোই কপালে উঠে গেল। কল্পনায় যেন চোখের সামনে ফোর্ডের জায়গায় তার নিজের— মহিপাল শুক্লার ফিয়েট দাঁড়িয়ে আছে। রূপরতন তাকে বলেছিল, গুরু, তুমি একজন মহান লেখক, খালি পায়ে হাঁটা তোমায় মানায় না। আট-দশ হাজারের সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মোটর কেনা তার পক্ষে সম্ভব নয়, অথচ রূপরতনের সামনে হাত পাততে তার আত্মমর্যাদায় বাধে। কথায় কথায় রূপরতন জানালে সে তার ছোট গাড়িটা আড়াই তিন হাজারে বেচে দিতে রাজী আছে। মহিপালের চিত্ত, প্রস্তাবটা শোনামাত্রই চঞ্চল হয়ে উঠল। বাড়ি গিয়ে কল্যাণীর সঙ্গে পরামর্শ করলে। মোটরের নাম শুনেই বড়, ছোট, রজ্জো, তপ্প আর তাদের মমতাময়ী মা, সকলেই এক পায়ে নেচে উঠল। মহিপাল ধাপ্পা মারলে রূপরতন তার বইয়ের আগাম রয়েলটী হিসেবে গাড়ি দিচ্ছে। তীর যথাস্থানে গিয়ে বিঁধল, বাড়ির সকলেই গাড়ি চাপার স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল। বড় ছেলে ড্রাইভিং শেখার প্ল্যান করছে, কল্যাণী মাসিক তেল-

জলের হিসেব করতে ব্যস্ত। মহিপাল বললে রূপরতনের প্রকাশন বিভাগে দিনে দু'ঘণ্টা কাজ করার বদলে সে গাড়ির খরচটা অ্যালাউন্স হিসেবে আদায় করে নেবে। ব্যাস, সব হিসেব কিতেব পাকা, আর কিছু ভাবতে হবে না। ছেলেমেয়েরা বায়নাক্কা আরম্ভ করলে কিন্তু শকুন্তলার বিয়ের আগে গাড়ি চাপার কথাটা কল্যাণীর মনঃপূত হল না। বরপক্ষের দেনা-পাওনার ফিরিস্তির অঙ্কে যোগের সংখ্যা বাড়ার ভয়ে সদাই মাথার ওপর খাঁড়া উঁচিয়ে আছে। মহিপালের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল, ভেবেচিন্তে, একা রিক্‌শা করে যাওয়াই ঠিক করলে। নেশার ঘোরে মনে হল যেন হজরতগঞ্জের সমস্ত সান্ধ্য বৈভবের সে একাই মালিক, সবটাই তার নিজস্ব সম্পত্তি। প্লাজা সিনেমা আর তার লম্বা ছাদের ওপারে প্রিন্স সিনেমা পর্যন্ত অসংখ্য নরনারীর অবাধ গতিবিধি চলেছে, সুন্দর সাজানো দোকানের বারান্দায় সাজগোজ করা মেয়েদের ভিড়, বাস, কার, সাইকেল আর রিক্‌শার লাইন যেন তার নেশার আবেশে বুজে আসা চোখে এক অপূর্ব মায়ালোকের সৃষ্টি করেছে। এক পানের দোকানে দাঁড়িয়ে ভালো বাঙলা পানের ফরমাশ করলে, সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই কিনে পকেটে রাখলে, দোকানের আয়নায় নিজের শ্রীমুখখানা ভালোভাবে দেখে নিয়ে এক খালি রিক্‌শাকে আওয়াজ দিয়ে ডাকলে। রিক্‌শা-ওয়ালা থমকে গিয়ে এক নজর মহিপালকে দেখে এগিয়ে গেল। মহিপালের অহংবৃত্তি আহত হল। রিক্‌শাওয়ালাকে ধরে চাবুক পেটা করবার ইচ্ছে তার মনে জেগে উঠল। নেশার ঘোরে পায়ে হাঁটা কষ্টকর, তাছাড়া মহান সাহিত্যিকের পক্ষে অপমান-জনকও। একজন মামুলী রিক্‌শাওয়ালার হাতে অপমানিত হয়ে

তার উত্তেজনার টিমটিমে লণ্ঠন যেন আবার তেল পেয়ে দপ করে জ্বলে উঠেছে। এখুনি ছুটে গিয়ে রূপরতনের মোটরটা কিনে ফেললে কেমন হয়? ফলের দোকান পর্যন্ত যেতে সামনেই এক খালি রিক্‌শা দেখতে পেয়ে হাঁক দিলে— খালি আছে, খালি? না বাবু। সওয়ারী হওয়ার ইচ্ছা তীব্র হয়ে উঠল। রিক্‌শাওয়ালাকে ধরে বেশ দুঘা দেবার কথা মনে এল, কিন্তু সেটা করা যে অন্যায় সে বিষয় তার জ্ঞান বেশ টনটনে আছে। এদিক-সেদিক সময় কাটিয়ে ঘোরার প্রোগ্রাম মাঝপথেই স্থগিত হয়ে গেল। এখন তার সামনে একই উদ্দেশ্য— রূপরতনের গাড়িটা কিনতেই হবে।

গায়ের কাপড় জড়িয়ে আধশোয়া অবস্থায় মহিপাল টাঙ্গায় বসে আছে। তার পাশ দিয়ে গাড়ি হুশ হুশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাদের দেখে আর সে উত্তেজিত হয়ে উঠছে না— তারা আজ সকলেই তার বড় আপন— পরমআত্মীয়র মত মনে হচ্ছে। এই রাস্তায় একদিন গাড়ির মেলার মধ্যে তার গাড়িও ভিড় চিরে এঁকেবেঁকে সরীসৃপের মতই ছুটে যাবে। ওই যে সামনে ছোট একটি গাড়িতে দুজনে বসে মনের আনন্দে, হ্যাঁ, স্বামী স্ত্রী দুজনে যাচ্ছে, তাদের মত একদিন সেও কল্যাণীকে পাশে বসিয়ে··· না না, তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাওয়ার কোন মানেই হয় না, আনন্দের জায়গায় নিরানন্দ। একেবারে সেকেলে ব্যাপার। তার পাশে শীলার মত স্ত্রী শোভা পায়, শীলার কথা মনে হতেই যেন তার চোখ জ্বালা করতে লাগল। শীলার কোন অপরাধ হয়নি, বরং সেদিন সজ্জনের বাড়িতে সে কতই-না মিনতি করেছিল। তার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করাটা খুব অন্যায় হয়েছে।

শীলার সঙ্গে সম্বন্ধের সঙ্গে তার মনের কোণে লুকিয়ে থাকা আশঙ্কা যেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, তাহলে সকলে বলবে এসব বৈভব শীলার দেওয়া— তার দান। মহিপাল বিচলিত হয়ে উঠল। রূপরতনের সঙ্গে কাজ করলে তাকে কেউ দোষী ঠাওরাবে না, তার অর্জিত বৈভবকে কেউ শঙ্কার চোখে দেখবে না। পৃথিবীতে অনেকেই, ব্যবহারিক জীবনে, এ ধরনের আর্থিক গাঁটছড়া বেঁধে কাজ চালায় কিন্তু মেয়েমানুষের পয়সায় মজা মারার প্রবৃত্তি তার নেই। এই ভেবেই সে শীলাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। টাঙ্গা শান্ত রাস্তায় ছুটে চলেছে। শীলার প্রসঙ্গ মনে হওয়ার সঙ্গেই যেন মহিপালের সুপ্ত বিবেকবুদ্ধি আবার ধারালো হয়ে উঠল, প্রেমের চেয়ে লৌকিক বৈভবকে প্রাধান্য দেওয়া কি উচিত? এটা অন্যায় নয়? বাড়ি গাড়ি চাকরবাকর আর নানা আর্থিক বৈভবের মাঝে শারীরিক সুখ আর ঠাটবাট নিশ্চয় আছে তবে জীবনের মহত্তম আদর্শের মূল্য সে-সবের চেয়ে অনেক বেশী। নিজের যৌবনে মহিপাল অনেকবার আদর্শের জন্য আর্থিক বৈভবকে এক কথায় লাথি মেরেছে। আদর্শের জন্যই সে মামার বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল। রূপরতনের সঙ্গে বন্ধুত্ব রইল না, ভাইয়ের বিয়েতে দেনা-পাওনার কথা তোলেনি, ভাইয়ের উন্নতির জন্যে কল্যাণীর গায়ের গহনা খুলে বেচে দিতেও সে আপত্তি করেনি। সেই মহিপাল আজ নিজের আদর্শ ত্যাগ করছে সেই আর্থিক বৈভবের মোহে অন্ধ হয়ে? তার এতদিনের সঞ্চিত বিত্ত আজ এত খেলো হয়ে বিকিয়ে যাবে? আজ প্রায় মাসখানেকের ওপর হল সে এক অক্ষর লিখতে পারেনি। কেবল নিজের আশেপাশে, সারা বাড়িতে দামী জিনিস সাজিয়ে, সারাদিন লক্ষ্মীর

অর্চনায় কাটিয়েছে। তার উপন্যাস যেটা আরম্ভ করার সময় সে ভেবেছিল এইটেই হবে তার অনুপম রচনা, আজ অসম্পূর্ণ ভাবে পড়ে আছে। কতবার ভেবেছে যে সে এবার লিখতে বসবে, কিন্তু লেখার নামেই তার কল্পনাশক্তি যেন তুলোর মতই বাতাসের সঙ্গে উড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে। কিছুদিন থেকে তার এই মানসিক পরিস্থিতি চলছে, আর অন্যদিকে সজ্জন ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। হালে সজ্জনের সুখ্যাতি চতুর্দিকে সুগন্ধের মত ছড়িয়ে পড়েছে, সে তার তুলনায় কিছুই নয়। মহিপাল তাকে ঈর্ষা করে কিন্তু মনের এই বিকার ভ্রান্তি ছাড়া আর কি! প্রগতিশীল সমাজে ঈর্ষাগ্রস্ত বিরোধকে কেউ প্রাধান্য দিতে রাজী নয়। সে সজ্জনের সামাজিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে যা বিষ বমন করেছে তাতে তর্কের অবকাশ আছে তবু সেটা অনুচিত।

মহিপালের মনে চিন্তার মিছিল চলেছে। মহিপাল লিখেছে এ ধরনের সামজিক ব্যভিচারের উদ্‌ঘাটন করলেই সমাজের আর্বজনার ওপর ঢাকা ওড়না এক লহমায় উড়ে যাবে, সবার সামনে বেরিয়ে আসবে তার বিকৃত রূপ। মহিপাল ভালোভাবেই জানে এ সময় সমাজকল্যাণকর কাজে সজ্জন এগিয়ে এসেছে বাবাজীর প্রেরণায়। কন্যা তার সৃজনশক্তির সাহায্যে সজ্জনের অপূর্ণ জীবনকে পূর্ণতা প্রদান করেছে। আজ সজ্জনের প্রত্যেক কথার মধ্যে আদর্শের প্রতি দৃঢ় আস্থারই আভাস সে পেয়েছে। যেখানে কোন আদর্শকে দৃঢ়নিশ্চয়ভাবে মেনে চলা হয় সেখানে বিধ্বংসকারী প্রবৃত্তির মাথা তোলার প্রশ্নই ওঠে না। মহিপালের আত্মসচেতন মন আত্মগ্লানিতে ভরে উঠল। সে কোন্

পথের পথিক? সে দিগ্‌ভ্রান্তের মত দিশেহারা কেন? চোখের সামনে অন্ধকার, হে ভগবান! বর্তমান পরিবর্তনশীল দেশ, কাল আর সমাজ কি চায়? মোটরের মালিক মহিপালকে, না লেখক মহিপাল শুক্লাকে? গোঁসাই তুলসীদাস যদি এই মায়া-মোহের চক্করে ফেঁসে যেতেন তাহলে আজ তাঁকে শ্রদ্ধা অর্ঘ্য কে দিত? আকবর বাদশাহর মনসবদারী পেয়েও তুলসী কৌপীনের কথাই বার বার উচ্চারণ করে গেছেন। মহিপাল তার জীবনের দুর্বল মুহূর্তে, দুঃখ আর অক্ষমতার জ্বালায় এই লাইনটির কথাই ভেবেছে। তার জীবনের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সে ফিরে পেয়েছে তার হারিয়ে যাওয়া আত্মবল—

তিন গাঁঠ কৌপীন মে বিনভী বিন লোন।

তুলসী মন সন্তোষ যো ইন্দ্র বাপুরো কৌন॥

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মহিপাল স্বগত স্বরে দু'লাইন আওড়ালে। তার সুখান্বেষী মন আজ ক্লান্ত, তার বিগত জীবনের এই স্মৃতিটুকু কেবল শোকপ্রস্তাবের মতই যেন তার মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে। তুলসীদাস অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে গেছেন, বহির্জগতের প্রভুত্ব ও আধিপত্যের জালে জড়িয়ে পড়া মন তার অন্তরের মধুছন্দের মধুরতাকে অনুভব করতে পারে না। নিজের কর্তৃত্বের জাল প্রাণপণে বুনে যাচ্ছে, সে জালে জড়িয়ে পড়ছে কে? ফট করে তার ব্যাঙ্কের খাতায় জমা আটত্রিশ হাজার টাকার কথা মনে এল। সে রূপরতনের সঙ্গে মোটর কেনার কথা পাকা করতে যাচ্ছিল, ড্যাম সমাজ, ড্যাম সিদ্ধান্ত। ধার করে ঘি খাও। সব সিদ্ধান্তের মধ্যে চার্বাকের এই সিদ্ধান্তই সর্বশ্রেষ্ঠ।

তার পঙ্গু দেহমন যেন জবাব দিয়ে দিয়েছে, সে আর হাঁটতে

পারবে না। এবার একটা গাড়ি না হলে সে অচল হয়ে যাবে। তার ছোট একটি গাড়ি না হলে সে অচল হয়ে যাবে। তার ছোট একটি বাংলো মত বাড়িও চাই। এই বৈভবপূর্ণ পৃথিবীতে তার সব-কিছু লাগবে— তিন গাঁট কৌপীন বেঁধে অমরত্ব পাবার মত নির্লোভ মন চাই-ই-না। যুক্তিবাদী লেখক মহিপাল শুক্লার বিবেকবুদ্ধির আজ মৃত্যু হল। মহিপাল আজ মৃত, ভাবতেই তার মন বোবা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

উতরাইতে নেমে ডান দিকে টাঙ্গা রূপরত্তনের বাড়ির গেটে ঢুকল।

সাতচল্লিশ

জেঠীর বাড়িতে রাধামাধবের বিয়ের ধুমধাম। বাবা রামজীর কৃষ্ণ ভগবান বর সেজে জেঠীর বাড়ির ছাদনাতলায় দাঁড়াতে আসছেন! গলিতে গলিতে পাড়ায় পাড়ায় এই নতুন উৎসব আয়োজনের মুখরোচক রসালাপ হচ্ছে। মিইয়ে পড়া পাড়ায় যেন নতুন স্ফূর্তি দেখা দিয়েছে। এ খবরও ছড়িয়ে পড়েছে যে জেঠী প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করছেন। ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা, সদাই মুখ ব্যাজার করা জেঠী, যাঁর আশেপাশে গালাগালি, অভিশম্পাত আর জাদুমন্ত্রের পেটরার মায়াজাল ছড়িয়ে আছে, তিনি পঞ্চাশ হাজারের সম্পত্তি খোলামকুচির মত খরচ করছেন শুনে অনেক

লোভী মনের প্যালপিটেশন হঠাৎ বেড়ে গেছে। কেমন ভাবে, কি বাহানায় কিছু টাকা হস্তগত করে নেওয়া যেতে পারে, এর স্কীম তৈরী হতে লাগল। সেখানে কিন্তু কারুরই কোন চাল সফল হল না, টাকাপয়সার সব ব্যবস্থা সজ্জনের মুঠোয়। ভেতরের কাজকর্ম সব জেঠী আর তাঁর সমবয়স্কা দু'তিনজন বৃদ্ধা মহিলা মিলে সামলাচ্ছেন; কন্যা, তারা আর ছোটর রান্নাঘরের আর ভাঁড়ারের কাজে হাত দেওয়া বারণ, কেননা তারা ম্লেচ্ছ, তবু হিসেব কিতেব, জিনিসের তদারক করার ভার জেঠী কন্যাকেই দিয়েছেন।

জেঠীর পূর্বপুরুষের বসতবাড়ি আজ কাজেকর্মে মুখর হয়ে উঠেছে। ভিয়েন বসেছে, ময়রা মণ মণ মিষ্টি তৈরী করে পরাতে রাখছে। বরযাত্রীদের নমস্কারী দেওয়া ঠিক হয়েছে, ধুতির থানের পর থান কাপড়ের দোকান থেকে এসে ভাঁড়ার ঘরে ডাঁই করে রাখার ব্যবস্থা, কন্যার হাতে ভাঁড়ারের চাবি, জিনিসপত্তর যথাস্থানে রেখে তালা বন্ধ করে চাবি জেঠীর হাতে দেওয়ার আদেশ হয়েছে। জেঠী তাঁর সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে ঝেঁটিয়ে নিমন্ত্রণ করে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর সতীনের বাড়িও লোক পাঠিয়েছেন। রাজা-সায়েব কন্যাদান করবেন, জেঠী সজ্জনের মারফত প্রস্তাবটা পাঠালেন। তার উত্তরে রাজাসায়েব বলে পাঠিয়েছেন যে তিনি আর সাংসারিক মায়ামোহে জড়িয়ে পড়তে চান না, তিনি যেহেতু মায়ামোহ ত্যাগ করেছেন অতএব লৌকিক কাজকর্মে যোগদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। জেঠী নিজে রাধার বিয়ে দিতে চান, তাঁর অনেক দিনের মনের সাধ। যদি আজ তাঁর নিজের পেটের মেয়ে বেঁচে থাকত তাহলে তিনি রাজাসায়েবের নামে কন্যাদান

করতেন। নিজের মেয়ে নাইবা হল, রাধাও তো মেয়েরই মতো। ভুবনমোহিনী মহামায়াকে কন্যা ভেবে দান করার মত বড় পুণ্য আর কি আছে? কিন্তু রাজাসাহেব তাঁর প্রস্তাবে কান দিলেন না। স্বামী বিনে একা স্ত্রী কন্যদান করবে কি করে, শাস্ত্রীয় নিয়মে বাঁধা জেঠী ফোঁস করে উঠলেন— না আস্নুকগে যাক ব্যাটা, আমার কোন কাজে কি আসবে? আমার কপাল জোরে আজ পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাচ্ছে, কোটিপতি হয়েছে, আমার সতীন আবাগীর কথা কানে তুলে আমায় এমন এমন দুঃখ দিচ্ছে, আমার মত সতীর অভিসম্পাতে··· হঠাৎ জেঠীর গলায় যেন গুলির মত কিছু আটকে গেল— ভয়ংকর অভিসম্পাত দিতে গিয়ে ক্রোধের আবেশে উত্তেজিত জেঠীর চোখে জল গড়িয়ে পড়ল, আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে তিনি কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ইদানীং রাজাসায়েব তাঁর নিজের প্রস্তর মূর্তি তৈরী করাচ্ছেন। সাদা দুধের মত মারবেল পাথরের ডাঁই বাগানের একপাশে রাখা আছে, বাগানের মধ্যিখানের ফোয়ারা ভেঙে সেখানে উঁচু বিরাট বেদীর মত তৈরী করা হবে, তার আশেপাশে চার কোণে চারটে থাম থাকবে। রাজাসায়েবের আন্তরিক ইচ্ছে এই বেদীর ওপর তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক। এরপর এই জায়গায় মারবলের গম্বুজাকার মণ্ডপ তৈরী হয়ে সেখানে রাজাসাহেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। সব নকশা তৈরী হয়ে গেছে। রাজাসায়েবের উইলে তার খরচ-খরচা বাবদ হিসেব কিতেবও লেখা হয়ে গেছে। পার্থিব দেহ থেকে প্রকৃতির বন্ধন খোলার পরও নিজের মহিমাকে অমর করে যাওয়ার অনলস প্রয়াস। পরপারে যাওয়ার সময়ও তিনি সর্বসাধারণের শ্মশানঘাটে যেতে নারাজ, তাই এই বিশেষ ব্যবস্থা।

আশীর্বাদের দিন অনেক লোকজন, চারিদিকে জমজমাট। লালা মুকুন্দীমলের বাড়ির পাশে উঁচু খোলা জায়গায় আয়োজন করা হয়েছে। জেঠীর বিশেষ আগ্রহ তাঁর সতীনের নাতির আশীর্বাদের ঘটার চেয়ে যেন কোন মাত্রায় কম না হয়, বরং এককাঠি বেশী ঘটা হওয়া উচিত। সজ্জন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সাজসজ্জার ব্যবস্থা করিয়েছে। উঁচু জায়গার চারিদিকে চাটাই দিয়ে ঘেরা। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের গোপুরম স্টাইলের তিনটে ফাটক তৈরী করা হয়েছে। ভেতরের সাজসজ্জা দেখলে চক্ষুস্থির, ভগবানের মণ্ডপ দেখলে মনে হচ্ছে যেন সম্পূর্ণ ব্রজমণ্ডপ উঠিয়ে এখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক পাশে বৃন্দাবনের মন্দির আর ঘাটের মডেল, তার পাশেই প্রাচীন মথুরার মডেল রাখা। অন্য পাশে গোকুল, নন্দগাঁ আর বরসানা দেখানো হয়েছে। এর পেছনেই গোবর্ধন পর্বত, তাতে কোথাও বা মানসী গঙ্গা, কোথাও রাধাকুণ্ড, কোথাও কুসুম সরোবরের দৃশ্য। মাঝখানে গোবর্ধনের ওপর বিরাট উঁচু সুন্দর মণ্ডপ তৈরী করে তারমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান প্রতিষ্ঠিত করানো হয়েছে। আচার্য শ্রীধর মহাপাত্র সজ্জনকে রাজী করিয়ে রাধাকৃষ্ণের স্বর্ণপ্রতিমা গড়িয়েছেন। কৃষ্ণ ভগবান এখানে বিরাজমান, রাধা জেঠীর বাড়িতে। ইলেকট্রিকের আলোয় পেখম মেলে ময়ূরের নাচ, হরিণ, বাঁদর, মাঠে চরছে গোরুর দল, মথুরা বৃন্দাবনের আশপাশ দিয়ে যমুনার কলকলানি, পাহাড় থেকে ঝরনার দৃশ্য সত্যিই মনোরম।

ঝাঁকি দেখতে হাজার হাজার লোক ভিড় করে ফেলল। আশীর্বাদ সমারোহের পর অখণ্ড কীর্তন আরম্ভ হল। শহরের ছোট বড় সব কীর্তনমণ্ডলীরাই আজ এখানে আমন্ত্রিত। ভিড়ের ঠেলায় চারদেওয়ারীর রক্ষার জন্য পুলিসের সাহায্য নিতে হল।

বাবাজী বেয়াই সেজে বসে আছেন, তাঁর সঙ্গে ঘাটের পাণ্ডা, গোমতীর ধারে যারা বসে অনেক অন্ধ, নুলো, ফকীর, বৈরাগী, সন্ন্যাসী মগ্ন হয়ে বসে পান চিবুচ্ছে, সবাই আজ একদিনের রাজত্বে রাজা। সকলের কপালে কেসরিয়া চন্দন, গলায় ফুলের মালা। জেঠীর বাড়ি থেকে আশীর্বাদের তত্ত্ব এল— তিরিশ থালা মিষ্টি, দশ থালা শুকনো মেওয়া, দশটা থালে ফল সাজানো, বরের জন্য জড়োয়া হার আর আংটি, কাপড় আর এক হাজার নগদ। ভগবানের আশীর্বাদ-সমারোহ সম্পন্ন হল।

এবার বিবাহের তোড়জোড়, মেয়েপক্ষ থেকে মৌলীতে (লাল সুতোর পৈতের মত) বাঁধা, 'লগ্নের' সঙ্গে পান, মিষ্টি ফল আর নগদও এল। এবার গায়েহলুদের পালা, বরকনের গায়ে তেল-হলুদ হল। বিয়ের দিন লোক গিজগিজ করছে— দূর দূর পর্যন্ত মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছু দেখার উপায় নেই। জেঠীর বাড়িতে ঢোকা মুশকিল, সুচ রাখার জায়গা নেই। পুলিস ব্যাণ্ড, সানাই, মিলিটারী ব্যাণ্ড, নানা দৃশ্য দিয়ে সাজানো কাঠের তখতা, কোনটায় গঙ্গা, কোনটায় যশোদার দরজায় কৃষ্ণ-দর্শনের লালসায় শিব দাঁড়িয়ে, কোনটায় মাখনচুরির লীলা, প্রত্যেকটি দৃশ্য নয়নাভিরাম। মথুরা থেকে কারিগর ডাকিয়ে এসব দৃশ্য তৈরী করানো হয়েছে। হংস-বিমান আকারে আলো দিয়ে সাজানো মোটর গাড়িতে বর আসছেন। একটু দূরে দূরে লোকেরা ভগবানের আরতির সঙ্গে জেঠীর যশোগানও গাইছে। গলিতে ঢুকে ভগবান মোটর থেকে নেমে গঙ্গা-যমুনা তাঞ্জামের ওপর বসলেন, অনেক বাড়ির দোতলা তিনতলা থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল। এ গলিতে এমন বিয়ে এর আগে কেউ কখনো দেখেনি, সকলের চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে।

জেঠীর বাড়িতে এত সোরগোল যে কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড়। মেয়েরা এধার ওধার ছুটোছুটি করে কাজ করছে, এদের মধ্যে গোকুলদ্বারের দাড়িওয়ালা কীর্তনীয়া, ভিতরীয়াজীকেও দেখা যাচ্ছে। তিনি মেয়েদের মাঝখানে হাত-পা মটকে, চোখ নাচিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কন্যা, তারা আর ছোট বউ সকলেই ব্যস্ত। জেঠীর বুড়ো শুকনো হাড়ে যেন হঠাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শক্তি দেখা দিয়েছে, বড় বড় ভারী পরাত হাতে নিয়ে তিনি জাদুর কাঠির মত ঘণ্টার কাজ মিনিটে সারছেন। জেঠী ঠাকুরঘরের আলসেতে রাখা চাঙ্গারী নামাতে গেলেন, ওমনি পাশের আলসে থেকে বেড়াল লাফ মারতেই তিনি মুখ বিকৃতি করলেন— আ মলো যা, তুই এখানে বন্ধ হয়েছিলি ?

জেঠীর কিশনচাঁদ কোন্ ফাঁকে ঠাকুরঘরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মুক্তির আনন্দে জেঠীর পায়ে মাথা ঘষে মিউ মিউ করে তাঁর পোষ্যপুত্র কিশান তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। এক পা বাড়ানো জেঠীর মুশকিল হয়ে গেল, কেবল পায়ে পায়ে জড়িয়ে পড়ছে। চাঙ্গারী নিয়ে চৌকাঠ পেরুতেই তাঁর ন্যাওটা কিশনচাঁদ মিউ মিউ করে বেরিয়ে এল। সামনেই ভিতরীয়াজীকে দেখে জেঠী বললেন— এই ভিতরীয়াজী, একটু দুধ চেয়ে নিয়ে এসো তো। এ ব্যাটা কিশুন আমার পেছু ছাড়বে না। কাজকর্মের সময়··· মর মর। আরে এখন পর্যন্ত আনলে না কেউ।

কীর্তনীয়া জেঠীর দেওয়া ধপধপে সাদা ধুতি আর বগলবন্দী পরে ধড়মড় করে এসে উপস্থিত হলেন। বড় বড় চোখে কিশুনকে দেখে, ভক্তিসিন্ধুতে ডুব দিতে দিতে বললেন— আরে জেঠী, তোমার কিশান কানাই একেবারে ষোলো আনা সাচ্চা।

আজ আমার ভাগ্য ভালো যে যশোদা আর ভগবানের দর্শন একসঙ্গেই হয়ে গেল। ভক্তির আবেশে কীর্তনীয়া সোজা জেঠীর পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করতে গিয়ে প্রায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছেন দেখে জেঠী চোখ পাকিয়ে বললেন— আ মলো যা মিন্সে। ...কীর্তনীয়া, ঠিক কাজের সময় তোমার ভক্তিভাব দেখা দিয়েছে কেন? মেয়ের বিয়ে দিতে বসে আচ্ছা মুশকিলে পড়েছি যা হোক, সরো সামনে থেকে। নাও, একে কোলে করে এখানে বসে থাকো, দুধ এলে খাইয়ে দিয়ো।

বিবাহবাসরে পাড়ার অনেক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বসে আছেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, লালা মুকুন্দীমল, বাবুগুলাবচন্দ, লালে দালাল, ভভূতি স্যাকরা, বর্মা, রাধেশ্যাম, লালা জানকীসরণ, মহিপাল, কর্নেল, শেঠ রূপরতন, জেঠীর সতীনের বড় ছেলে গিরিধর দাস ইত্যাদি। গিরিধর দাসের নজর বাবা রামজীর দিকে। তিনি লোকমুখে খবর পেয়েছেন যে সাধু কুড়ি হাজার টাকা পেয়েছে, সেই শুনে পর্যন্ত সাধুর দিকে তাকালেই ঘেন্নায় তাঁর চেহারাটা কুঁচকে যাচ্ছে।

—জানকীসরণ, চেনো নাকি সাধুটিকে?

—পাগলছাগলের চিকিৎসা করেন।

—কুড়ি হাজার টাকা নিয়ে কি করবে?

লালা জানকীসরণ মুচকি হেসে উত্তর দিলেন— বুড়ো বয়সে বাবাজীর কপাল খুলে গেছে, এবার কৌপীন ছেড়ে রেশমি গেরুয়া ধরবেন, মঠ তৈরী করাবেন, মনের আনন্দে মালপো খাবেন— কি বলো? তোমার গায়ে ফোস্কা পড়ছে বুঝি?

লালা গিরিধর দাস লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট করলেন, দু'মিনিট

চুপ করে থেকে বললেন— কতবার বাবাকে বলেছি বড়মার হাত-খরচা কমিয়ে দিতে, গোটা তিরিশ টাকার বেশী ওর দরকারটাই…

—আরে, সে তো বাড়ি ভাড়াতেই উঠে আসে। লালা জানকী-সরণ মন্তব্য করলেন।

—বাবা শোনেন না তা আমি আর কি করব? এই দেখুন-না, জলের মত আমাদের টাকা খরচ হচ্ছে। কথায় আছে না যে যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই— দুনিয়ার লোক এসে সব মজা মারছে। এসব ওই সজ্জনের কারসাজী, বড়মাকে বশ করে নিয়েছে। হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জনসমাগমের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন লালা গিরিধর দাস।

জানকীসরণ বললেন— পাড়ার লোকেরা যেদিন এই ছোঁড়ার ঘরে হামলা করেছিল সেদিন দেখতে জেঠীর ভয়ংকর মূর্তি, জলন্ত উনুনের কাঠ নিয়ে সকলকে মারতে ছুটেছিলেন। সকলকে মন্ত্রের জোরে ফুঁ মেরে উড়িয়ে দেবার ব্যবস্থাও করেছিলেন… আমি বলি কি, এই সজ্জন তোমার বড়মার বাড়িঘর সব হাতিয়ে নেবে মনে হচ্ছে।

—আরে, এর অবস্থা আজকাল আর আগের মত নেই। জমিদারি চলে গেল, বিজনেস করতে পারে না, আর্টিস্ট মানুষ কিনা? সাড়ে তিন লক্ষর সম্পত্তি আছে, তারই ভাড়া খাচ্ছে। তাছাড়া কিছু নগদ, গয়নাগাঁটি, কিছু কিউরিও জিনিস। সব মিলিয়ে এখন ছ'সাত লক্ষর মালিক। আমাদের বসতবাড়ির দিকে চোখ দিলেই কুড়ি-পঁচিশটা মোকদ্দমায় ফাঁসিয়ে দেব, দশ বছরের মধ্যে সোনার চাঁদ ফুটপাথে বসে কিউরিওর জিনিস বেচবেন। গিরিধর দাসের চোখে প্রতিশোধের আগুন জলে উঠল।

জানকীসরণ বললেন— না ভাই, এতদূর পর্যন্ত জল গড়াবে না। ছেলেটি এমনিতে আসল মাল, আজকাল নেতা হয়েছে, চারদিনেই পাওয়ারফুল হয়ে যাবে। তোমার বসতবাড়ির দিকে নজর দেওয়ার মত মন ওর নয়।

—আরে, তাকাবে নিশ্চয়, ওর স্ত্রী এখানে স্কুল খুলেছে। আপনাদের সকলের মুখে চুনকালি দিয়ে একজিবিশনও করেছিল। এখন এই বাবাজীর ফাঁদে ফেলেছে। দেখে নেবেন, এই মুখমিষ্টি লোকটি এখানে বসে বসে সকলকে বেইজ্জত করে তবে ছাড়বে।

মহিপাল আর কর্নেল, একটু দূরে বসে কথায় মশগুল আছে। মহিপাল রূপরতনের ছোট মোটর কিনে ফেলেছে। আজ প্রথম সে নিজের গাড়ি করে এসেছে। মহিপাল আর কর্নেল সেই নিয়ে আলোচনা করছে। সজ্জন কাজকর্মের মধ্যে ডুবে আছে।

কনেকে বিদায় করার সময়, গাঁটছড়া বেঁধে বরবউ বিদেয় হবে। মেয়েরা গান গাইছে। ধুমধামে ভরা বিবাহের হট্টগোলে ব্যস্ত জেঠী যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন। রাধার মূর্তি উঠিয়ে হাতে নিলেন, মেয়ে আজ মায়ের আঁচল ছেড়ে যাচ্ছে— ছোট মেয়ে— যাচ্ছে— যা— জেঠী মূর্তিটিকে বুকে চেপে ধরতেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। কোলাহল শুরু হয়ে গেল— জল পাখা নিয়ে ছুটোছুটি। বাবাজী, কন্যা, সজ্জন জেঠীর সেবা করছে। জেঠীর হুঁশ ফিরে এল, হাড়কখানায় জোর দিয়ে উঠে বসলেন। বাইরে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে, রথে বরবধূর সিংহাসন রাখা হল। শাঁখ ঘণ্টা করতাল বেজে উঠল, রাধাকৃষ্ণের জয় শব্দে গলির বাতাস গমগমিয়ে উঠল। আজ বোন পরের বাড়ি যাচ্ছে তাই যাবার আগে ভাইদের কপালে ফোঁটা দিয়ে যাবার ব্যবস্থা জেঠী করেছেন।

সব থেকে আগে জেঠীর পুরুতমশাইকে দিয়ে সজ্জনের কপালে ফোঁটা দেওয়ালেন, তারপর নিজের কিছু আত্মীয়স্বজনদের। রথ চলল। মেয়েদের গান শোনা যাচ্ছে। জেঠী রথের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন, চোখের কোণে জল চিক চিক করে উঠল তার পরেই কান্নার আবেগে ভেঙে পড়ে আবার মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

গলিতে সাদা ঘোড়া দিয়ে সাজানো রথে বর-বধূ চলেছে, সঙ্গে অপার জনতার ভিড়, অপার উৎসাহ, কৌতূহল আর শ্রদ্ধার জোয়ার।

*　　*　　*

জেঠীর বাড়ির বিয়ের ধুমধাম সব সময়ের সঙ্গে ফিকে হয়ে গেছে। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকার জিনিস জেঠী দিয়েছেন বাবাজীকে, সে-সব কর্নেলের কাছে জমা আছে। একদিন জেঠীর বাড়িতে বসে বাবা রামজী, সজ্জন, কর্নেল আর কন্যা এই টাকার সদ্‌ব্যবহারের বিষয় পরামর্শ করছে। বিয়ের আগে ঠিক হয়েছিল যে জেঠীর কাছে থেকে পাওনা টাকা দিয়ে বাবাজীর আশ্রমের জন্য পাকা বাড়ি তৈরী করে মেয়েদের পাপাচারের হাত থেকে উদ্ধার করা হবে, তাদের সুচারুরূপে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এখন বাবাজীর মত পালটে গেছে— আর আমরা শহরের মধ্যে থাকতে ইচ্ছুক নই রামজী। আমরা গ্রামে গিয়ে দীনদুঃখীর সেবা করব। আমাদের এমন গ্রামে যাওয়া উচিত যেখানে যাতায়াতের ব্যবস্থার অভাবে তাদের কাছে কোন কিছু সাহায্য পাঠানো অসম্ভব। আমরা সেখানে রুগীদের, পাগলদের সেবাও করব আর এমন স্কুল খুলব যেখানে গ্রামে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া

হবে। সজ্জন বললে— তার মানে আপনি সব স্কীম ফেল করিয়ে দিতে চান?

—আমার জন্যে কেন ফেল হবে রামজী? পয়সার অভাব নেই এখানে, আপনারা নিজেরাই কারুর সাহায্য না নিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা চালাতে পারেন। সজ্জন বাবাজীর কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল।

—আপনার উপদেশমত আমি টাকাপয়সার মোহ থেকে অনেকটা নিজেকে দূরে সরিয়ে এনেছে তবে সমস্ত সম্পত্তি দান করে দেওয়ার মত মনোবল এখনো পাইনি।

—আপনি খুসী মনে কত পর্যন্ত দান করতে পারবেন?

—তিন লক্ষ।

—কর্নেল আর কন্যা সজ্জনের মুখের দিকে চাইলে।

—অনেক অনেক। এত দিয়ে আপনারা অনেক কিছু আয়োজন করে ফেলতে পারবেন।

—কিন্তু করবটা কি? দীনদুঃখীকে বসিয়ে খাওয়ানোর জন্যে তিন লক্ষ?

—বসিয়ে খাওয়ানো আমাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রামজী। ডিউটি করো আর পেট ভরে খাও, এরজন্যে হাত-পা চালাতে হবে।

—এ ধরনের কাজকর্মের ব্যবস্থা করা কঠিন হবে বাবাজী, ক্ষমা করবেন। কর্নেল বিনয়ের সঙ্গে নিজের মতামত জানালেন।

—আরম্ভতে কোন কাজেই হাত দেওয়া সহজ হয় না, অভ্যাসের দ্বারাই ক্রমশ সরল হয়ে যায়।

—সেটা ঠিক বলেছেন বাবাজী, তবে সংসারের অবস্থাও দেখুন, আশ্রম-টাশ্রমে আর কারুর বিশ্বাস নেই। সকলেই সুখের পূজারী। কর্নেল উত্তর দিলে।

—তাহলে আলসে কুঁড়েদের পয়সা দেওয়া যেতে পারে না রামজী। যে কাজ করবে সেই পয়সা পাবে। আপনারা এমনি আশ্রম খুলুন। যদি লোকেদের এ কথা মনঃপূত না হয় তাহলে কো-অপারেটিভ বলুন, কম্পানি নাম দিন— যা হয় নাম দিয়ে চালাতে পারেন। আমরা কাজ চাই, নাম যা হয় হলেই হল। দেখুন, এই মেয়েটি ধীরে ধীরে পাড়ায় কেমন স্কুল জমিয়ে তুলেছে। আপনি এ ধরনের অনেক পাঠশালা খুলে দিন। মেয়েদের, প্রৌঢ়াদের দশ রকমের হাতের কাজ শেখানো আর তাদের হাতের কাজ বাজারে বেচবার ব্যবস্থা করান। আমরা গ্রামেও এই কাজই করব রামজী। নির্ধন জনতার হাতে ধন যাওয়া চাই। শহর আর গ্রাম ছু'জায়গায় এই একই প্রকারের অভাব দেখা যায়। এই দুজনের অভাব পূর্ণ করে তাদের সমান আর্থিক স্তরে আনা আমাদের কর্তব্য।

—কিন্তু এখন যেন সব-কিছু অসম্ভব মনে হচ্ছে। কন্যা বললে— শহরে আকর্ষণ আছে, এখানে জনজীবনের দৈনন্দিন আবশ্যকতার তালিকাও অনেক বৃহৎ তাই পয়সার চাহিদাও অনেক বেশী।

—আবশ্যকতার চেয়ে আকর্ষণই বেশী মা। যাক, আমি এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না। গ্রামের জন্য কুড়ি-পঁচিশ হাজার আর শহরের জন্য তিন লক্ষর ব্যবস্থা হয়েই গেছে। এই তিন লক্ষ দিয়ে যদি আপনারা কুটিরশিল্প আরম্ভ করেন তাহলে শহরের পুরুষেরা বেইমানদের ফাঁসিকাঠে ঝোলার হাত থেকে রেহাই পাবে, আর মেয়েদের নৈতিক স্তর উঁচু করে দিতে পারলে মস্ত কাজ হয়ে যাবে রামজী। শেষে একটা কথা, যেটা সর্বদাই মনে রাখবে, একবার সংগঠিত হয়ে চললেই সমাজের সবাই তোমাদের পায়ে

পা মিলিয়ে চলতে আরম্ভ করে দেবে। যেদিকে বাতাস বইবে সে দিকে সকলের মুখ আপনা হতেই ঘুরে যাবে।

একান্তে বসে রামজী সজ্জনকে বললেন— আপনার কাছে প্রার্থনা আছে রামজী।

—আজ্ঞা করুন, আপনি আমার গুরু।

—তাহলে দক্ষিণা চাইব?

সজ্জন হকচকিয়ে গেল। বাবাজী তার মাথায় স্নেহভরে হাত বুলিয়ে হেসে বললেন— এইজন্যেই প্রার্থনা করি ·· পূর্ণ ব্রহ্মচর্য পালন না করতে পারো তবু সংযম রক্ষা করে চলার চেষ্টা করো। নিজে জলভরা মেঘ হয়ে সুনিবিড় বাসনায় টলমলে মন নিয়ে শ্রাবণের ধারার জন্য আকুল হওয়ার কোন মানে হয় না। জীবনে যে মহোত্তম আদর্শ নিয়ে কাজ আরম্ভ করেছ, তাকে সম্পূর্ণ করার জন্য শক্তি সঞ্চয় করো। সজ্জন মাথা হেঁট করে বললে— চেষ্টা করব।

—রামজী, খাঁটি সমাজবাদী সর্বদাই পরোপকারের জন্যই প্রাণ-ধারণ করে, পরের জন্য প্রাণদান করতে প্রস্তুত থাকে।

—এই পথেই সময়ের গতির সঙ্গে পা ফেলে চলব। আপনি সেই পথে আমার বিশ্বাস এনেছেন বলে সজ্জন হেঁট হয়ে বাবাজীকে পরম শ্রদ্ধায় প্রণাম করলে।

আটচল্লিশ

সজ্জন ক্রমশ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তিন লক্ষ টাকার ট্র্যাস্ট তৈরী করে দিলে, তার রেজিস্ট্রীও হয়ে গেল। কর্নেল, বনকন্যা, চীফ কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ, এক প্রমুখ সরকারী অফিসার আর সজ্জন—এ কয়েকজনে তার মেম্বর। নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী সর্বপ্রথমে সজ্জন সহকারী ব্যাঙ্কের স্থাপনা করলে। তার প্ল্যান হিসেবে শহরের প্রত্যেক ওয়ার্ডে তার নিজস্ব ব্যাঙ্ক হওয়া উচিত, যেখানে স্থানীয় টাকা-পয়সা থাকবে এবং সেখানকার সার্বজনীন কল্যাণের জন্য কেন্দ্র খোলা হবে। সজ্জনের মুনীম মশাই আর একজন অবসরপ্রাপ্ত ম্যানেজার এই কাজে নিযুক্ত হলেন।

যেদিন এই ব্যাঙ্ক স্থাপনার জন্য সজ্জন ওয়ার্ডের ধনী ব্যক্তি, ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্য কর্মঠ কর্মীদের সভা ডাকলে সেদিন থেকেই লালা জানকীসরণ খোলাখুলি ভাবে তার বিরোধিতা করতে আরম্ভ করে দিলেন। অন্য কয়েকজন সুদখোর মহাজনও এর বিরুদ্ধে। সহকারী ব্যাঙ্কের সাহায্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিরা ধারদেনার দায় থেকে মুক্তি পাবে। বর্তমানে শহরের প্রায় শতকরা পঁচাশি জন লোক মহাজনদের কাছে ঋণী হয়ে আছে। বিয়েথাওয়া,

পৈতে, অন্নপ্রাশন, রোগ শোক মানুষের নিশ্বাসের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে, এ-সবের জন্য চাই পয়সা। নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকেরা ধারের বদলে বন্ধক রাখে সোনা, এইভাবে বেশীর ভাগ বাড়ির সোনাই মহাজনের সেফে চলে যায়, সেখান থেকে আর কোন-দিনই তারা ফেরত পায় না! ঋণের ভারে নুয়ে পড়া নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার কোন গতিকে ক্লান্ত নিরাশ পা টেনে টেনে দিনগত পাপক্ষয় করছে। ঋণের বোঝা, মহাজনের তাগাদা আর জীবনের লোক-লৌকিকতার চক্করে ফেঁসে সমাজের মন-মেজাজ খিঁচড়ে রয়েছে, বেহায়ার মত নালিশ করাই তার হাতের শেষ অস্ত্র। এই ঘানির চক্কর থেকে সজ্জন তাদের মুক্ত করতে চায়। বনকন্যা সভায় বেশ উত্তেজিত হয়ে 'গরম স্পীচ' ঝেড়ে ফেললে, সঙ্গে সঙ্গে শহরের 'গণ্যমান্য ব্যক্তিরা' উঠে চলে গেলেন।

এই সভার দরুন সজ্জনের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা সহজ হল। সে নিজে একজন ধনী সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে, তিন লক্ষ টাকা দান করেছে অতএব জনসাধারণের মধ্যে তার প্রভাব এখন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। লেখাপড়া জানা লোকেরা ছোট ছোট সহকারী ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখা খোলার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী। সজ্জনের ইচ্ছে যে এই ছোট ছোট স্থানীয় শাখাদের একসূত্রে বেঁধে ফেললে বড় উদ্যোগের জন্য প্ল্যান করা যেতে পারে। সরকারের দিক থেকে মহাজনদের ব্যবসা বেআইনি ঘোষিত করে সমস্ত জায়গায় যদি কুটীর উদ্যোগের স্কীম চালানো হয় তাহলে দুঃখ আর হতাশার মধ্যে বেঁচে থাকা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিরা পাবে এক নতুন আশার সন্ধান, নতুনভাবে তাদের জীবনযাত্রা আরম্ভ হবে।

'ওয়ার্ড সহকারী ব্যাঙ্কের' আন্দোলন আরম্ভ হয়ে গেল। প্রত্যেক লোককে, যাদের ধার চাই, ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিচ্ছে। এর বদলে তাদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে, এইভাবে সৎপথে থেকে সৎ উপায়ে তাদের ঋণমুক্ত হবার অবসর দেওয়া হচ্ছে, অনেকেই এই নতুন সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে। এই ব্যাঙ্কের সাহায্যে সজ্জন হ্যাণ্ডলুমের কারখানা, রবারের খেলনা আর বেলুন তৈরীর কারখানা, নতুন ডিজাইনের কাপড় প্রিণ্ট করা, চিকনের কাজ ইত্যাদি কাজ আরম্ভ করালো, যাতে এই কাজ যারা জানে তারা মজুরি পেতে পারে। জেঠীর বসতবাড়িতে বা তাদের নিজের বাড়িতেও মেয়েদের হাতের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা করা হল।

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার, বাজারের ছুটির দিনে ভারতের ইতিহাস এবং সংস্কৃতির লেকচারের প্ল্যান করা হয়েছে। তু'মাস ধরে সজ্জন আর কন্তা দিনরাত ব্যস্ত, খাবার নাইবার সময় করে উঠতে পারছে না। তারা তুজনেই সামাজিক জীবনের সঙ্গে এক বিচিত্র সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। সমাজ-কল্যাণ-কাজের বিষয় তাদের প্রত্যেক পরিকল্পনাই যেন উনুনে চড়া আধসেদ্ধ ডালের মত হাঁড়িতে সেদ্ধ হচ্ছে। রাস্তায় বেরুলেই ভিড়ের মধ্যে তারা পায় বিচিত্র অভ্যর্থনা, নানারকম টীকা টিপ্পনীর সঙ্গে মাখানো দগ্ধ হৃদয়ের ভালোবাসা— সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। আজ যেন সজ্জন তার মনের করুণার পাত্র জনগণের মধ্যে উপুড় করে দিতে চায়, এরমধ্যে সে পাচ্ছে এক অপূর্ব আনন্দ, এক নতুন উৎসাহ। তার মনে হয় যেন লোকেরা তাকে শ্রদ্ধার নজরে দেখছে, এই কল্পনার সঙ্গেই তার মনের করুণার পাত্র যেন গলা পর্যন্ত ভরে ওঠে। করুণা চায় প্রতিদান, তাই শ্রদ্ধার ঝরে পড়া ফুল দেখলেই সে

পুলকিত হয়ে উঠছে। কাজ বেড়ে যেতেই সজ্জনের ছেলেমানুষী উৎসাহ আস্তে আস্তে ঢিমে হয়ে এল। আর যেন তার এ সবের জন্য সময় বার করাই মুশকিল হচ্ছে।

এদিকে জেঠীর দিন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। মহিপালের ভাগ্নীর বিয়ের সময় প্রায় যায় যায় অবস্থা, সজ্জন বা কন্যা দুজনের মধ্যে একজন তাঁর কাছে বসে থাকা জরুরি হয়ে পড়ল। সজ্জনের ব্যস্ততার বাহানা নিয়ে মহিপাল যেন ফেটে পড়ল। কর্নেলের কাছে নালিশ জানালে যে, সজ্জন কর্নেলের মত বন্ধু হয়ে সাহায্য করতে পারে না, যে মানুষ বন্ধুর সাহায্য করতে পারছে না সে সমাজ-কল্যাণের কাজ কি করে করতে পারে? কল্যাণীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে শকুন্তলার বিয়ে রূপরতনের বাড়ি থেকে করার ব্যবস্থা করলে। শেঠ রূপরতন আর লালা জানকীসরণের ইশারা পেয়ে সে সজ্জনের নতুন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ছোট একটি পুস্তিকা লিখে খুব বিষ বমন করলে। সে লিখলে সজ্জন বর্মা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু কিন্তু সার্বজনিক কল্যাণ-কাজে যেখানে সম্পূর্ণ সমাজের ভালো-মন্দের প্রশ্ন, সেখানে তার বিরুদ্ধে জনতাকে সতর্ক করাই আমার পরম ধর্ম। সেটাই সত্যিকারের মানবতার সেবা। সজ্জনের সহকারী ব্যাঙ্ক এক নতুন চাল ছাড়া আর কিছুই নয়, এর সাহায্যে সে হামেশার জন্য জনতাকে তার গোলাম তৈরী করতে চায়। পুরোনো সুদখোরের দল কেবল আঙুলে গোনা ব্যক্তিদের গিলে ফেলত কিন্তু এই নতুন স্কীমের দ্বারা সজ্জন সম্পূর্ণ সমাজকেই গিলে হজম করে ফেলবে। ভারতীয় সংস্কৃতির বিষয় সজ্জনের জ্ঞান একেবারেই সুপারফ্লুয়াস, মহিপালের কাছেই সে এ বিষয় একটু-আধটু শুনেছে এই পর্যন্ত। এই স্বল্প জ্ঞানের ভাণ্ডার নিয়ে সে

ভারতের সুস্থ সামাজিক পরম্পরার মূলে কুঠারাঘাত করতে চাইছে। যদি এ সময় সকলে একজোট হয়ে প্রতিবাদ না করা হয় তাহলে কুটীর উদ্যোগরূপী বীজ খুব শীঘ্রই পল্লবিত হয়ে উঠবে। সজ্জনের পরিকল্পনা পুতনাবধের সমানই প্রভাব বিস্তার করবে।

জনতার ভেতরে পুস্তিকা বিতরণ করা হল। লালা জানকীসরণের বাড়ির কাছে খোলা উঁচু জায়গায়, যেখানে কয়েক মাস আগে কৃষ্ণভগবানের ঝাঁকি সাজানো হয়েছিল, আজ সেখানে সার্বজনীন সভার আয়োজন করা হয়েছে, অন্যদের সঙ্গে মহিপালেরও ভাষণ হল।

মহিপালের এই ব্যবহারে সজ্জন মনে মনে দুঃখ পেলে। তার নিজের মনের আত্মবিশ্লেষণ শক্তি যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। মহিপাল যদিও তর্কের পাহাড় তৈরী করেছে তবু এই পরিকল্পনার মধ্যে তার নিজস্ব ব্যক্তিগত অহং লুকিয়ে নেই তো? যদি তাই হয়, তাহলে তার পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়া অসম্ভব। তার আত্মসচেতন মন দৈনন্দিন দিনলিপির সমানে বিশ্লেষণ করতে লাগল। আত্মাভিমানের মাত্রা তার স্বভাবে বেশী, তাই তার কর্মকাণ্ডের ব্যাঘাতের কল্পনায় তার ভাবুক মন ছটফটিয়ে ওঠে। মহিপালের যুক্তির পাহাড়কে সে ভেঙে দেবার শক্তি সঞ্চয় করছে, ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে দমন করে সে মহান উদ্দেশ্যের প্রদীপটিকে চিত্তশুদ্ধির তেলের দ্বারা প্রজ্বলিত রাখবে।

শঙ্করলাল, বর্মা এবং আরো কয়েকজন সজ্জনের পথের সঙ্গী, এই ব্যাপারে অনেকেই তার কাছে যাতায়াত করছে। তার কাজকর্মের সক্রিয়তা দেখে জনতার সহানুভূতি ক্রমশ বেড়ে চলেছে। লালা জানকীসরণ, মহিপাল শুক্লা ইত্যাদি সজ্জনের

নিন্দে করছে শুনে অনেক ভক্তের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল। জায়গায় জায়গায় এই নিয়ে আলোচনা হতে লাগল। প্রত্যেকে যে যার বুদ্ধি খাটিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করছে, কেউ সজ্জনের পক্ষে আর কেউ লালা জানকীসরণের পক্ষে। সজ্জনের ভক্তের দল তাড়াতাড়ি অন্য পক্ষের থোঁতা মুখ ভোঁতা করার জন্যে সভা করে 'গরম লেকচারের' ডোজ খাইয়ে দেবার প্ল্যান আরম্ভ করে দিলে।

সজ্জন এ বিষয় অনেক ভাবলে। সেইদিনই তার বাড়ি দেখতে যাবার কথা, পাড়ায় একটা হাসপাতাল দরকার। সেদিন একজন সজ্জনকে আইডিয়া দিলে যে এ ধরনের ধর্মার্থ হাসপাতাল বেনারসে আছে, সেখানে হোমিওপ্যাথী, আয়ুর্বেদ আর এলোপ্যাথী ছাড়া প্রসূতিগৃহের ব্যবস্থাও আছে। এই ধরনের আরোগ্য-লাভের ব্যবস্থা তার মাথায়ও এল কিন্তু উপযুক্ত জায়গার অভাবে স্কীম কিছুদিন কোল্ড স্টোরেজে পড়েছিল, হঠাৎ একটি বড় বাড়ির বিক্রির খবর পেয়ে সজ্জন সেটাকে কিনে হাসপাতাল করার প্ল্যান চালু করার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠল।

বেশ ভালো পাকা বাড়ি। বাড়ির মালিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লক্ষপতি হয়েছিলেন। তিনি নিজের ঠাটবাটেই খোলামকুচির মত সব পয়সা উড়িয়ে দিলেন। ওয়ার্ডের সমকক্ষ বড়লোকেদের সঙ্গে ওঠাবসা, তাদের খরচের খাতার সঙ্গে নিজের খাতা মেলানো, এই করে নিজের অর্জিত টাকাপয়সা শেষ করে ফেললেন। এর ফলে শহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি একজন হলেন বটে কিন্তু একবার জীবনযাপনের মান পরিবর্তন করে আর তাকে গোটাতে পারলেন না। ধারের বোঝায় একদিন হাটে হাঁড়ি ভেঙে গেল, আজ দেনার দায়ে মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে

আছে। ধার শোধ করার আগেই দেউলে হয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি নিজের সমস্ত সম্পত্তি জলের দরে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেচছেন। গয়না, সোনা-রুপোর বাসন, মোটর বাঘ্‌ঘী— সব বের করে ক্যাশ করে নিচ্ছেন।

সজ্জনের পুরোনো দেওয়ানজী নিজে বাড়ি দেখে এসেছেন। দেরী করলে এমন সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয় আছে। মিটিং করে মহিপালকে জব্দ করার চেয়ে এই বিল্ডিং কেনার দিকে মন দেওয়া বেশী দরকারী। এই হাসপাতাল যদি সে করিয়ে দিতে পারে তাহলে মহিপালের বিষ বমনের বদলে তাকে অমৃতের পাত্রের দ্বারা উত্তর দেওয়া হবে— মৌন অথচ স্বয়ং বিচ্ছুরিত উপহার।

পাল্টা মিটিংএর তাগাদা-করনেওয়ালাদের বার বার একই ধরনের জবাব দিতে গিয়ে সজ্জনের মনে হল, তার নিজের জবাবে সত্যিই কি তার আস্থা আছে? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ নিজের কথার আড়ালে নিজেকেই ঢাকবার চেষ্টা করে। ক্রমশ সেইটেই স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়। সুন্দর যুক্তির আড়ালে কলুষতার কালিমা লুকিয়ে থাকে না কি? সজ্জন সত্যিই জনকল্যাণের জন্যই দিনরাত এত কষ্ট করছে? এর প্রতিদানে সে কি তার নিজস্ব যশোকামনা করছে না? জনকল্যাণের কাজে শিল্পসাধনার চেয়ে বেশী রাতারাতি প্রসিদ্ধি লাভ করার সুযোগ পাওয়া যায়, এইটাই কি তার কাম্য নয়?

প্রশ্নের জালে সে জড়িয়ে পড়ল। সমাজকল্যাণ আর যন্ত্রপাতি এই দুয়ে মিলিয়ে আরম্ভ হল তার ভাবনা চিন্তা। অনায়াসে সে যেন পরিস্থিতির দাস হয়ে পড়েছে, শিল্পসাধনার পথ ছেড়ে দিয়ে

পূর্বপুরুষের রক্ষিত ধনকে খরচ করে সে প্রসিদ্ধ হবার চেষ্টা করেছে। ভারতীয় সমাজের প্রগতির যে মূল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য এই গলিতে ঘর ভাড়া করেছিল, সেটা তার আন্তরিক মনের ব্যথাই ছিল। জনসাধারণের মাঝখানে থেকে তাদের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্যেই সে এসেছিল। অ্যাডভেঞ্চার করার প্রকৃতি তাকে টেনে নিয়ে এসেছিল কি? যদিও আজ পর্যন্ত সে জনতার নিকট সম্পর্কে আসতে পারেনি, তবে তাদের জন্য তার হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়ে উঠেছে। এই কারণেই তার সমাজকল্যাণের কাজে বিশুদ্ধ লোক-কল্যাণকারী উদ্দেশ্য না থাকলেও একেবারেই যশোলিপ্সার সংজ্ঞা দিয়ে তাকে হেনস্তা করা চলে না। কাজেকর্মের মধ্যে অনেক সময় যশোগানের কথা তার মনেই থাকে না।··· মহিপালের জন্য তবে তার মনে এই ভাব কেন? পাল্টা মিটিংয়ের কথা শুনলে কেন সে একেবারে মানা না করে গাঁই গুঁই করে তাকে টলাবার চেষ্টা করে?

মন-মন্দিরের পাপ-স্বীকার-বেদীতে আজ আত্মসমালোচক সজ্জনের মন নিজেকে যাচাই করে নিচ্ছে।

উনপঞ্চাশ

বাড়ি কুড়ি হাজারে কেনা হল। হাসপাতালে সব সামগ্রী জোগাড় হওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষায় হাত কোলে করে বসে থাকতে সজ্জন রাজী ছিল না। একজন ডাক্তার, লেডী ডাক্তার, বৈদ্য, হাকীম আর হোমিওপ্যাথী ডাক্তার নিযুক্ত করা ছাড়া শহরের বিখ্যাত লেডী ডাক্তার শীলা স্থইংকে সপ্তাহে দু'বার বিশেষভাবে পরামর্শদাতা হিসেবে আমন্ত্রিত করা হল। এই আমন্ত্রণ স্বীকার করে শীলা নিজের অর্ধেক প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মোহ ত্যাগ করে রোজ বিকেলে হাসপাতালে বসবে কথা দিল। সজ্জন আর কন্যা দুজনেই খুব খুসী। প্রসূতিগৃহে আর ডিস্‌পেন্সরীর জিনিস কর্নেলের মারফত কেনার ব্যবস্থা হয়েছে।

চারিদিকে ডাঃ শীলার ত্যাগের কাহিনী ছড়াতে লাগল। শহরের খবরের কাগজে খবর ছাপা হল। জনসাধারণ হয়তো বুঝলে যে এই কীর্তি প্রচারের মধ্যে সজ্জনের ব্যক্তিগত স্বার্থের এক কণাও থাকতে পারে না, কিন্তু প্রচার করার সময় মহিপালের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাই সজ্জনকে সমানে উসকেছে, সে তাকে ছোট করতে চায়, সে তাকে এইভাবে জব্দ করবে। মহিপাল সত্যিই ক্ষেপে উঠল। সে ভাবলে যে শীলা তার বিরুদ্ধ ক্যাম্পে যোগ দিয়ে তাকে বদনাম দেবার চেষ্টা করছে, এইভাবে লোকের

মনে মহিপাল-শীলা প্রেমকাহিনী নতুন করে তাজা হয়ে উঠবে। সজ্জনের প্রতি ঘৃণায় তার মনটা ভরে উঠল। চাণক্যের মতই রাগে তার মনের প্রতিজ্ঞার শিখা অসংখ্য বার খুলল। মামার বাড়ির সামন্তী রক্ত যেন আবার তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হতে লাগল। সে সজ্জনকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারে, তাকে মাটিতে পুঁতে শিকারী কুকুর ছেড়ে দিতে পারে। তাকে মাটিতে পুঁতে লাথি দিয়ে ঠোকর মারবে, গাছে উল্টো টাঙিয়ে নীচে থেকে ধুনো দেবে, তার সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে দেবে— ঘৃণার আবেশে তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠছে। সে সজ্জনের সর্বনাশ করে তবে দম নেবে। শীলার প্রতিও তার মনে তীব্র ক্রোধের আগুন ভাঁটির মত জ্বলছে। সে কেন সজ্জনের কাছে গেছে? এই কি তার প্রেম?

বাড়িতে বিয়ের সোরগোল আরম্ভ হয়ে গেছে। শকুন্তলার পিতৃকুলের সকলে, মহিপালের দ্বিতীয় বোন, তার ছেলেমেয়ে সকলেই বিয়েতে এসেছে। শেঠ রূপরতন তার বিরাট বাড়ির এক দিকটা তাদের জন্য খালি করে দিয়েছেন, এইখানেই বিয়ে হবে। বিয়ের সব জিনিসপত্তর এনে এখানেই রাখা হচ্ছে। পরিবারের সকলেই বিয়ের ব্যস্ততায় মশগুল কেবল একা মহিপালই ঈর্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছে। কি করে সজ্জনের বিরাট লোকসান করবে, ভাবতেই তার মাথার ঘিলু শুকিয়ে যাচ্ছে, কোন উপায় ভেবে না পেয়ে তার মন-মেজাজ বেজায় খিঁচড়ে আছে। সকাল থেকে মোটর নিয়ে বেরোনো, কখনো রাজাসায়েবের বাড়ি, কখনো রূপরতন, আবার কখনো উপমন্ত্রী আর মন্ত্রীদের বাংলোয়, হাকিম আমলা সেখানে গিয়ে দু'দণ্ড বসেছে সেখানেই সজ্জনের

নিন্দে করে তবে জলস্পর্শ করছে। সে রটাচ্ছে যে সজ্জন তার কম্যুনিস্ট পত্নীর কথায় ওঠে বসে, তারই শেখানিতে সে সকলকে কম্যুনিস্ট করার মতলবে আছে। রাত্তির বেলা তার বাড়িতে রীতিমত কম্যুনিস্ট নেতাদের সভা হয়। প্রতিহিংসায় পাগল মহিপালকে যেন পাগলা কুকুরে কামড়েছে, সজ্জন আর কন্যাকে চরিত্রহীন বলতেও তার জিভে আটকাল না। স্বামীর ভোগ-বিলাসের সামগ্রী হিসেবে মেয়ে সাপ্লাই করার কাজ কন্যা তার স্কুলের দ্বারা করে, এই তার আসল 'মহান' উদ্দেশ্য। নিজের কথার সঙ্গে প্রমাণের অভাব পূর্ণ করার জন্য সে কথার পিঠে প্রায়ই জানিয়ে দিত যে অমুক ব্যাপার সে স্বচক্ষে দেখেছে বা সজ্জন তাকে বলছে। সজ্জনের পরিকল্পনার সঙ্গে বাবাজীর যোগ-সাজশের বিরাট যড়যন্ত্রের প্রতি জনসাধারণকে সচেতন করার বিষয় উপদেশ ঝেড়ে সে মনের ঝাল মেটাচ্ছে। নিজের শরীরের ক্ষিদে তেষ্টা সব বিসর্জন দিয়ে মহিপাল দিনরাত হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগল। বিয়ের মত এত বড় কাজ বাড়িতে তবু সে সজ্জনের বিরুদ্ধে প্রচারের কাজের সামনে নিজের পারিবারিক দায়িত্ব পর্যন্ত ভুলে গেল!

রাজাসায়েবকেও সে এর মধ্যে জড়াবার চেষ্টা করলে। তাঁর জীবনী লিখে তাঁকে অমর করে দেওয়ার লোভ দেখালে। নিজের অগাধ পাণ্ডিত্য আর দর্শনজ্ঞানের প্রভাবে তাঁকে প্রভাবিত করার প্রয়াস করলে। তাঁর পূর্বপুরুষের বসতবাড়ি থেকে কন্যার স্কুল বন্ধ করিয়ে দিয়ে সেখানে বেদ, গীতা, ভাগবত, পুরাণ ইত্যাদি পাঠের পরামর্শ দিলে— যাতে ভারতীয়দের সুপ্ত ধর্মনিষ্ঠা জেগে ওঠে আর তারা সজ্জনের মত কম্যুনিস্টের প্রভাব থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার

মনোবল ফিরে পায়। লালা জানকীসরণকে বোঝালে যে রাজা-সায়েবের সঙ্গে মিলে মিশে এমন একটি সংস্থা স্থাপন করা তার উচিত যার প্রধান উদ্দেশ্য হবে সজ্জনের কারবারের হাঁড়ি হাটের মধ্যে ভাঙা। মহিপাল লালা জানকীসরণকে আতঙ্কিত করার জন্যে এতদূর পর্যন্ত কথা বানালে যে সজ্জন এখানকার প্রত্যেক বাড়িতে দু'একটা করে তার নিজস্ব গোয়েন্দা মোতায়েন করেছে, এবার তাদের পরিবারের ইজ্জত আবরু বাঁচানো দায় হয়ে উঠবে।

এক সপ্তাহ ধরে ছুটোছুটি করার ফল হল। শেঠ রূপরতনের বাড়িতেও মহিপালের আনাগোনা অতএব এখানেও মহিপাল সজ্জনবিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে সে শেঠ রূপরতনের মনের সুপ্ত বাসনাকে কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে ফেনিয়ে ফুলিয়ে তুলেছে। এক মহান আন্দোলন চালিয়ে সে শেঠ রূপরতনকে কেবিনেটে মন্ত্রী হওয়ার রাস্তা খুলে দেবে— এই মহামন্ত্র কানে যেতেই শেঠজী সক্রিয় হয়ে উঠলেন। দশজন বড় মহাজন মিলে সহকারী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অগ্রসর হবেন। তাঁদের সহকারী ব্যাঙ্কের দ্বারা কুটীর উদ্যোগের মস্ত কারবার চালানো হবে। মহিপাল এই পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরী করবে। চারিদিকে ধার্মিক চেতনাকে জাগিয়ে তোলা হবে, কোথাও কীর্তন, কোথাও মহাত্মার প্রবচন, কোথাও ইতিহাস পুরাণ— এইভাবে চতুর্দিকে ভারতীয়তার প্রসার করা হবে। এই পরিকল্পনার শুভারম্ভে এক বিরাট বিশ্বশান্তি যজ্ঞের আয়োজন করা হবে যাতে লোকেদের ধার্মিক নিষ্ঠা জাগ্রত হয়ে ওঠে। রাজাসায়েব আর শেঠ রূপরতনের শ্রীমুখে উচ্চারিত সমস্ত আদেশ মহিপাল রাতারাতি লিপিবদ্ধ করে ফেললে।

দু'দিন পরে ভিক্টোরিয়া পার্কের মোড়ের চৌমাথায় এক বিরাট সার্বজনীন সভার ঘোষণা করা হল। স্বয়ং রাজাসায়েব সভাপতি হবেন এবং জনকল্যাণের কাজে শহরের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা মিলে যে মহান পরিকল্পনা তৈরী করেছেন, সে বিষয় ভাষণ দেবেন।

জেঠীর আজকাল ভীষণ অসুখ, তিনি একেবারেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। মৃত্যুর পর সতীনের ছেলেদের হাতে সদ্‌গতির আশা নেই অতএব জ্যান্তে তিনি নিজের শ্রাদ্ধ নিজের চোখের সামনেই করিয়ে ফেলতে চান। শ্রাদ্ধের সমস্ত ভার সজ্জন আর কন্যার ঘাড়ে, ইদানীং তারা জেঠীর ছেলে-বউয়ের মত একান্ত আপনজন।

একদিন জেঠী কল্লোমলের নাতবৌকে একশো তোলা সোনার গয়না গড়িয়ে পরিয়ে দিয়ে বললেন— হারামজাদী, বেজাত হলে কী আর হবে, একবার যখন বউ হয়ে এসেছিস তখন নে, আমার সেবা তুই করলি, শেষ সময় তুই আমায় দেখলি। এত কিছুর পরও কন্যার হাতের ছোঁয়া জল খেতে তাঁর ভীষণ আপত্তি, জাত ধর্ম চলে যাওয়ার আতঙ্ক। বিলিতি ওষুধ তিনি কিছুতেই গলাধঃকরণ করলেন না। সজ্জনের দুজন চাকর সর্বদাই জেঠীর সেবায় নিযুক্ত রয়েছে। রাত্তিরে সজ্জন অথবা কন্যা, দু'জনের মধ্যে একজন জেঠীর শিয়রের কাছে বসে ডিউটি দিচ্ছে। জেঠীর যা কিছু দান পুণ্য করার ইচ্ছে, তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

যেদিন বিকেলে রাজাসায়েবের সভা, সেইদিনই জেঠীর বাড়িতে তেরো দিনের দিন শ্রাদ্ধের ব্রাহ্মণ ভোজন। সজ্জন আর কন্যা দু'জনেই ভীষণ ব্যস্ত, এক মিনিট মাথা চুলকোবার ফুরসত নেই। কর্নেল তাদের কাজে সমানে সাহায্য করছে। সজ্জন আর

মহিপালের মধ্যে আজকাল যা দলাদলি আরম্ভ হয়েছে, সে সব দেখে কর্নেলের মন বড়ই বিক্ষুব্ধ, তবু পরিস্থিতি বুঝে সে মৌনব্রত ধারণ করে দু'দিকের কাজ সামলে যাচ্ছে। কল্যাণীর বাড়িতে সমানে যাতায়াত করা, দরকারী জিনিসপত্তরের বিষয় জিজ্ঞেসাবাদ করা, কোথায় দু' পয়সার সাশ্রয় হবে সে বিষয় পরামর্শ দেওয়া এসব কর্নেল নিজে হতেই করছে। মহিপালের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ হয় কিন্তু সজ্জনের নাম সে ইচ্ছে করেই উচ্চারণ করে না। দেখা হলেই মহিপাল জেনেশুনে সজ্জনের কথা তুলে কর্নেলকে ওসকানি দেবার চেষ্টা করে। একদিন কর্নেল পরিষ্কার বলেই দিলে— দেখো ভাই, এটা তোমাদের দু'জনের আপসের ব্যাপার, দুই বিদ্বানে যুদ্ধ— সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। ভবিষ্যতে এ নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে এসো না। সজ্জন নিজেও কর্নেলের সঙ্গে এ নিয়ে চর্চা করা পছন্দ করে না। মহিপাল কর্নেলের অনেক পুরোনো বন্ধু, সজ্জন আর কর্নেলের ভাব মহিপালই করিয়ে দিয়েছিল।

সেদিন ভিক্টোরিয়া পার্কের সভায় মহিপাল সমস্ত শালীনতার সীমা অতিক্রম করে গেল। সজ্জন আর নিজের অনেক দিনের বন্ধুত্বের কথা তুলে বললে— সজ্জন ভীষণ স্বার্থপর আর উচ্চাভিলাষী। নিজের পয়সার জোরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে পার্টি খাইয়ে খোশামুদী করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সে শুধু তুলি আর রঙের আর্টিস্টই নয়, একজন সুশিক্ষিত ধাপ্পাবাজও বটে। নিজের ভাষণে মহেনজোদারো, শিব আর বেদ, সম্পূর্ণ ইতিহাস, সমাজ শাস্ত্রর ব্যাখ্যা এক ঘণ্টা পর্যন্ত যেন সজ্জনের নিন্দার পুঁথিমালা হিসেবেই ব্যবহার করলে। বাকচাতুরীর

মায়াজালে জনতাকে মুগ্ধ করে দিলে, সজ্জনের বিরুদ্ধে বিষবমন চালু রইল। আজকের সন্ধ্যার এই স্টেজ, এই আয়োজিত সভা তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম বিজয়, সে সজ্জনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছে। সজ্জন যদি তার পূর্বপুরুষের লক্ষ্মীর কৃপায় মহাপুরুষ হতে পারে তখন মহিপালই বা কেন হবে না? সেও পরের ধনে দিব্যি রাতারাতি মহাপুরুষ হবে, বন্ধুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। মহিপাল তার নিজের 'মহাপুরুষত্বের' মদিরার নেশায় সজ্জনের বিরুদ্ধে অনেক বেআইনী কথাও বলে ফেললে।

সজ্জনের ভক্তের দলে আতঙ্ক আর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়ে গেল। এক বিরাট শক্তি, বড়লোক আর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সম্মিলিত শক্তি—হাঙ্গরের মত এই ছোট জনকল্যাণের পরিকল্পনাটিকে গিলে ফেলতে চায়। মহিপালের এই ছোটলোকোমীর কথা শুনে সজ্জন আর কন্যা দুজনেই আঘাত পেলে। ডাঃ শীলা কেঁদে ফেললে। সজ্জন এ-সমস্ত ব্যাপার উকিলের হাতে দেওয়াই উচিত মনে করলে। তৃতীয় দিনই মহিপালের নামে কাছারীর রেজেস্ট্রী নোটিশ এসে হাজির। কর্নেল সে সময় মহিপালের কাছেই মানে শেঠ রূপরতনের বাড়িতেই বসে ছিল। মহিপাল নোটিশ পড়েই রাগে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল 'দেখে নেব' 'বোঝাপড়া করে তবে ছাড়ব' ইত্যাদি বলতে বলতে খানিক্ষণ বেশ হাত-পা ছুঁড়লে।

কর্নেল বললে—দেখো মহিপাল, আমি পাবলিক নই, যাকে লেকচার দিয়ে মুগ্ধ করে ফেলবে ভাবছ। এখানে মেয়ের বিয়ে, তাই আমি মুখে তালাচাবি মেরে চুপ করে আছি, তবু আজ না বলে পারিছি না যে মামলা-মোকদ্দমা করা একদমই উচিত

হবে না। যদি তুমি মামলা হেরে যাও তাহলে জেলে যেতে হবে। তোমার এই বড়লোক বন্ধুরা তখন সব যে যার পিট্‌টান দেবে। কেউ তোমায় সাহায্য করতে আসবে না, যদি আমার কথা সত্যি না হয় তাহলে বাজি হারতে রাজী আছি। মহিপাল কল্যাণী আর কর্নেলের সামনে নিজের সত্যের ঢাক পিটোতে আরম্ভ করলে। সজ্জনের চরিত্রদোষের বিস্তারিত বিবরণ দিলে। কর্নেল রাগে ফেটে পড়ল— দেখো মহিপাল, তুমি নিজে একেবারে সাধু নও। পরের মুখে চুনকালি দেবার চেষ্টায় নিজের মুখই কালো হবে। হাতের ঢিল ছুঁড়ে দিলে আর ফেরে না। একটা কথা ভালো করে শুনে রাখো যে যদি সজ্জন আমায় তার হয়ে সাক্ষী দিতে ডাকে তাহলে আমি নিশ্চয় যাব। আমার যতদূর মনে হয়, ডাক্তারও তোমার বিরুদ্ধে যাবে, তার যাওয়াও উচিত।

—যাও, সকলে মিলে যাও— মহিপাল গর্জে উঠল, রাগের মাথায় চেয়ার উঠিয়ে জোরে মাটিতে ফেললে। চেয়ারের একটা হাতা ভেঙে গেল। এই চেয়ার ভিক্টোরিয়া যুগের কারুকার্য করা ভালো কাঠের তৈরী। হঠাৎ মহিপালের খেয়াল হল যে সে শেঠ রূপরতনের লোকসান করে ফেলেছে। এই লোকসানের পর মহিপালের রাগটা নেমে এল, সে এখন খালি বিড়বিড় করতে লাগল।

কর্নেলের সামনে কল্যাণী অনেক অনুনয় বিনয় করে বললে— এঁর মাথার ঠিক নেই। আপনি সজ্জন ভাইকে বোঝান, এই বাচ্চাদের মুখের দিকে সে যেন একবারটি তাকায়।

কর্নেল, কন্যা আর সজ্জনের মধ্যে এই নিয়ে কথা হল, সজ্জন মামলা ফেরত নিতে নারাজ— দেখো কর্নেল, এটা আমার ব্যক্তিগত

মামলা নয়, আমার ট্রাস্টের নামে এসব আরম্ভ করা হয়েছে। যদি আমি এ সময় মুখ বন্ধ রাখি, তাহলে আমার ট্রাস্টের লোকসান হবে। ট্রাস্ট রক্ষার জন্যে মহিপালকে সাজা দিয়ে ছাড়ব। আমার দিক থেকে তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে। আমাদের দুজনের মধ্যে যা-কিছু দুর্বলতা দেখেছ, সমস্ত খুলে বোলো। আমি তোমার কাছে বন্ধুত্বের ভালোবাসা নয়, ন্যায় ভিক্ষা করছি। —ব'লে সজ্জন উঠে চলে গেল।

সভার রিপোর্ট জেঠীর রোগশয্যা পর্যন্ত পৌঁছে গেল। শ্রীরাধেশ্যামের বিয়ে আর নিজের শ্রাদ্ধ করার বাহানায় দান-পুণ্যের প্রতাপে জেঠীর রোগশয্যার পাশে রীতিমত দরবার জড়ো হতে লেগেছে। গোকুলদ্বারের পুজারী ভিতরিয়া, জলঘড়িয়া, কীর্তনিয়া, সরস্বতী দাদী, খন্না বহুরিয়া, নন্দ, নন্দর মা, তারা, ছোট বউ, পাড়ার আর বাদবাকী বুড়ি হাবড়া সব জেঠীর কাছে আনাগোনা করছে। জ্বরে জেঠীর গা পুড়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে ভুল বকছেন। একটু জ্ঞান হলেই চারপাশে নজর বুলিয়ে দেখে নিচ্ছেন। মাঝে মাঝে তাদের কথায় মাথা নেড়ে হ্যাঁ না উত্তর দিচ্ছেন। জেঠীর কানে খবর এল যে রাজাসায়েব কম্পানি বাগানে সভা ডেকে সেখানে সজ্জনকে অনেক গালাগাল করেছেন, তিনি ও জানকীসরণ মিলে বাইরে পুরুষদের বৈঠকখানা থেকে সজ্জনকে বের করে দিয়ে নিজেরা স্কুল চালাবেন। জ্বরের ঘোরে দুর্বল জেঠী কথাটা শুনেই একেবারে রেগে উঠলেন। তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত বিষে ভরা জিভ যেন লক লক করে উঠল, সরু দুর্বল হাতে উত্তেজনায় মুঠো বেঁধে গেল। গলার শির ফুলে দড়ির মত টেনে ধরল, ক্রোধে চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল। জেঠী তাঁর

সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে স্বামীকে অভিসম্পাত দিলেন। উত্তেজনার আবেগে তাঁর স্বাস্থ্যে বিপরীত প্রভাব হল, তিনি আবার বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

সেদিন বিকেলে জেঠী নন্দকে তাঁর কাছে থাকতে বললেন। কন্যা তিন ঘণ্টার জন্য জেঠীর কাছে তারাকে বসিয়ে ডাঃ শীলার সঙ্গে পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে মহিলা ও বাচ্চাদের স্বাস্থ্য নিরীক্ষণে গেছে। জেঠী তারাকে একটু দূরে বসার নির্দেশ দিয়ে নন্দর সঙ্গে ধীরে ধীরে কিছু কানে কানে বললেন। নন্দর চেহারায় গম্ভীর দায়িত্ব আর রহস্যময় ভাব ফুটে উঠল। সাঁঝের প্রদীপ জ্বলার সঙ্গেই জেঠী বাচ্চা নিয়ে তারাকে বাড়ি যাবার জন্যে বললেন। তারা জেঠীর সেবা করবে, সে যেতে রাজী হল না। জেঠীর চেহেরায় বিরক্তির চিহ্ন দেখা দিল, মুখের রেখায় ভাঁজ পড়ল, বেশী বকাঝকা করার ক্ষমতা তাঁর নেই। নন্দ তারাকে বোঝালে— দেখো, ইনি যা বলছেন তাই করো। আমি তো এঁর কাছে রয়েছি। তারা বাচ্চা কোলে করে বাড়ি চলে গেল। বাচ্চাকে যেতে দেখে জেঠী তাঁর দুর্বল হাত নাড়িয়ে তাকে কাছে ডাকলেন। জেঠীর চোখে বাৎসল্যের শান্তি দেখা দিল। তারা বাচ্চাকে নিয়ে জেঠীর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ল। বাচ্চা তার ছোট নরম হাত জেঠীর গরম হাতের ওপর রাখলে, জেঠী তার গালে, হাতে পায়ে হাত বুলিয়ে চুমু খেলেন। তাঁর রুগ্ণ চেহারায় ফিকে হাসি দেখা দিল, তিনি ইশারায় তারাকে চলে যেতে বললেন। তারা যাবার পর নন্দ দরজায় খিল দিয়ে এল। জেঠী তাঁর বালিশের তলা থেকে ছোট একটি পুঁটলি বের করার আদেশ দিলেন, নন্দ পুঁটলি খুলে দশ দশ টাকার ছখানা নোট

বার করে জেঠীকে দেখিয়ে আঁচলের গেরোয় বেঁধে নিলে। নন্দ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বললে— আমি গায়ের কাপড়টা জড়িয়ে এখুনি আসছি জেঠী। ছোটকে এখানে তোমার কাছে বসিয়ে যাচ্ছি। তোমার বউরানী এলে তাকে ফিরিয়ে দেবে'খন। ছোট ও ছোট, হ্যাঁ আমি এখুনি এই এলুম ব'লে।

কন্যা প্রায় আটটা নাগাদ জেঠীর বাড়ি পৌঁছোল। ছোট বউ সেখানে বসে আছে। জেঠী হালেই একটু চোখ বুজেছেন। উপন্যাস থেকে চোখ তুলে ছোট কন্যাকে জেঠীর স্বাস্থ্যের বিষয় খবর দেওয়ার সঙ্গে নন্দর দেওয়া হুকুমটাও শুনিয়ে দিলে।

কন্যা জিজ্ঞেস করলে— কেন, কি ব্যাপার? ছোট মুখ মচকে বললে— নন্দ দিদি আর জেঠী মিলে কারুর ওপর ম্যাজিক ট্যাজিক করছেন, তাই একলা থাকতে চান।

—এসব কী যা-তা হচ্ছে? আমি জেঠীকে এমন অবস্থায়, কোন বাহানায় শরীরকে কষ্ট দিতে দেব না। আমি এখান থেকে নড়বই না।

কিছুক্ষণ দুজনে বসে অনেক কথাবার্তা হল। জেঠীর ঘুম ভাঙল। কন্যা তাড়াতাড়ি উঠে জেঠীর কপালে হাত রাখলে, শরীর কেমন আছে জিজ্ঞেস করলে। জেঠী তার কনুই ধরে সস্নেহে বললেন— ভালো আছি। বউ তুমি যাও।

—জেঠী, তোমায় একলা ছেড়ে আমি কিছুতেই যাব না, উনি জানতে পারলে আমায় আর আস্ত রাখবেন না।

—আমার দিব্যি, তুমি যাও। তিনি চাকরদেরও সঙ্গে নিয়ে যাবার আদেশ করলেন।

কন্যার কোন কথাই জেঠী মানলেন না। জেঠীর কাছ থেকে

চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। জেঠীর সঙ্গে তর্ক করা অসম্ভব, এমন অবস্থায় আরোই মুশকিল। কন্যা ছোটকে জরুরী আদেশ দিয়ে চাকরদের নিয়ে অনিচ্ছায় চলে গেল।

রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা পৌনে বারোটা নাগাদ নন্দ উঠোনে সব জিনিস সাজিয়ে রাখলে— এক বোতল মদ, চারটে শুয়োরের বাচ্চা, মাটির হাঁড়ি, আটার পুতুল, আটার চৌমুখী পিদিম, তামাকের একটা পাতা, গাঁজা ইত্যাদি। জেঠী আজ নিজের স্বামীর ওপর মারণমন্ত্র চালাবার আয়োজন করছেন। প্রারম্ভিক বিধি করার পর হাঁড়িকে মন্ত্রঃপূত করে বেঁধে আসার জন্য জেঠী নন্দকে পাঠালেন।

জেঠী আবার জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান মত হয়ে গেলেন। কথার উত্তর না পেয়ে নন্দ হ্যারিকেন এনে তাঁর মুখের কাছে ধরে কানে কানে বললে— জেঠী ও জেঠী।

জেঠী চোখ মেলে তাকালেন। পাথরের মত নিশ্চল চোখের চাউনি, বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন— কি বলছিস?

—সব সাজিয়ে রেখে দিয়েছি।

—সাজিয়ে দিয়েছিস? জেঠী নিজের চেতনা ফিরে পেলেন— জর্জর শরীরে শক্তির সঞ্চার হল, ওঠার চেষ্টা করতে করতে বললেন— আমাকে একটু ওখান পর্যন্ত নিয়ে চল তো মা।

—আরে, তুমি ওখান পর্যন্ত যাবে কি করে জেঠী? আমায় আজ মন্তরটা শিখিয়ে দাও। নন্দ আগ্রহ করলে।

জেঠীর ঠোঁটে ফেনা জমে শুকিয়ে রয়েছে, মুখের অজস্র রেখায় ফিকে হাসির ভাঁজ পড়ল— কালো মুলো দাঁত চক চক করে উঠল— মন্তর কি আর এমনি দেয়া যায়? দুর্বল শরীরে জেঠী

এইটুকু কথা বলতে গিয়েই হাঁপিয়ে পড়লেন— শ্মশানে··· গি··· য়ে··· দিতে হয়··· মন্তর··· তেলীর লাশের··· কাছে, তুই আমায় নিয়ে চল। জেঠীর শরীরে নতুন স্ফূর্তি জেগে উঠল।

নন্দ ওঁকে উঠোনে নিয়ে এল। জেঠী হাত পা ধুলেন। হাঁড়িতে সামগ্রী রেখে মন্ত্র পড়া আরম্ভ করলেন। নিজের স্বামীর মরণমন্ত্রে তাঁর নাম মুখে উচ্চারণ করা চাই। জেঠী সংস্কারবশতঃ এক সেকেণ্ড চুপ করে গেলেন, পরমুহূর্তেই শরীরের সমস্ত শক্তি আর মনোবল সংগ্রহ করে খুব জোরে, ফট করে রাজাসায়েবের নাম উচ্চারণ করে আটার পুতুলের ওপর চৌমুখো প্রদীপ রেখে তাঁকে মারার আদেশ দিলেন। ক্ষণিকের তরে যেন জেঠীর পাথরের মত নিশ্চল চোখের মণি চৌমুখো পিদিমের মতই জ্বলে উঠল। নন্দ ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল। শুয়োরের বাচ্চারা উঠোনে বাঁধা অবস্থায় প্রাণপণে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। এদের মন্ত্রের নিয়ম অনুসারে এখানে রাখা দরকার। যদি অন্যপক্ষ প্রবল হয় আর তার ওঝা ডবলমন্ত্র পড়ে যদি ফেরত চাল দেয়, তাহলে মন্ত্র যে চালিয়েছে তার প্রাণহানি হবার আশঙ্কা থাকে না, শুয়োরের বাচ্চাদের রক্ত খেয়ে সে সন্তুষ্ট হয়ে যায়।

হঠাৎ জেঠী জোরে চিৎকার করে উঠলেন না, না না···

—কি হল জেঠী, বলে নন্দ জেঠীকে সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

—সর, ছুরি নিয়ে আয়—ব'লে জেঠী তাকে এক ধমক দিয়ে তাড়াতাড়ি মন্ত্র পড়তে লাগলেন। দেড় মাসের জ্বরে জর্জরিত জেঠীর ইচ্ছাশক্তি এই মুহূর্তে তাঁর রোগের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। জোরে মন্ত্র পড়তে পড়তে জেঠী চেঁচাতে লাগলেন— ফিরে আয়, আমার ওপর ফিরে আয়, আয়। নন্দ ছুরি নিয়ে এল। জেঠী

আবেশের বশীভূত হয়ে ভীষণ জোরে ছুরি নিজের বাঁ হাতের তেলোয় মারলেন। হাঁড়ির ওপর জেঠীর হাতের রক্ত টপ টপ করে চুয়ে পড়ল।

জেঠী জ্বরের ঘোরে বিড়বিড় করছেন। গলার স্বর যেন মিইয়ে এল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তিনি পড়ে যেতেই হাঁড়ি উলটে গেল। সমস্ত সামগ্রী চারিদিকে মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। নন্দ ভয় পেয়ে জেঠীকে সেই অবস্থায় ফেলে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল।

পরের দিন থেকেই জেঠীর সান্নিপাত হল, অনর্গল ভুল বকতে লাগলেন। প্রলাপের মাঝখানে এ কথাও কানে এল— মরার সময় আর কারুর খারাপ চিন্তা করব না। সেই দিনই জেঠীর অবস্থা খারাপ হয়ে গেল, প্রায় যায় যায় অবস্থা। সেদিন সকালে সজ্জন বাবাজীর সঙ্গে দেখা করতে গ্রামে গিয়েছে। জ্বরের ঘোরে জেঠী বার বার সজ্জনের নাম করে ডাকছিলেন।

পঞ্চাশ

সজ্জন বাবাজীর সঙ্গে দেখা করতে গ্রামে যাচ্ছে। তার মনের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী বিচারধারার সংঘর্ষ চলেছে। কর্নেল তাকে অনেকবার অনুরোধ করেছে মহিপালের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা না চালাতে, কিন্তু সে তার কথায় কান দেয়নি। সে তাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে এটা তার ব্যক্তিগত মামলা নয়,

এর সঙ্গে জড়িত আছে অনেকের আর্থিক আর নৈতিক লোকসান, অতএব এটা আদর্শের জন্য লড়াই। সজ্জন আর তার সংস্থা, দুটোকে পৃথক ভাবা অন্যায়। তার নিরর্থক অপমান করা মানে এমন একটি সংস্থাকে বদনাম দেওয়া, যার উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণ-সাধন। কর্নেল কন্যাকেও রাজী করিয়েছিল কিন্তু সে তার কথাও শোনেনি।

—এটা আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়। আমি আদর্শের জন্য লড়াই করছি। যে বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে আমাকে লড়তে হচ্ছে, আমি তাকেই প্রাধান্য দিচ্ছি, নিজেকে নয়। কন্যা বললে— এও তো হতে পারে যে পরিস্থিতি ছাড়াও মহিপালের প্রতি তোমার মনে ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে। এও তো সম্ভব তোমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু মহিপালের প্রতি, কোন পুরোনো ঈর্ষার ভাব…

—এ কথা আমায় জিজ্ঞেস করলে পারতে বিম্মো। আসলে এই ব্যাপারটা একেবারেই আর্টিস্ট কোয়ালিটির হয়ে গেছে। দুজনে যখন থেকে বন্ধুত্ব হয়েছে তখন থেকেই আড়াআড়ি— আমি জানি তাই বলছি— হাত শূন্যে উঠিয়ে আঙুল মটকে, চোখের মণি নাচিয়ে কর্নেল একটা অস্পষ্ট সংকেত করার চেষ্টা করলে। পরমুহূর্তে ভাবলে সজ্জনের ভাবুক মনে আঘাত না লাগে, ফট করে নকল হাসি হেসে বললে— দেখো ভাই, কিছু মনে কোরো না যেন, যদি পারো তাহলে একখানা রুটি বেশী খেয়ো। বাহঃ বিম্মো, তোমার ব্যারিস্টার হওয়া উচিত ছিল, ব্যারিস্টার তুমি যা পয়েণ্ট ধরেছ, বাপস্, বেঁচে থাকো, পাকা মাথায় সিঁদুর পরো। আমি ন্যায় চাই, বাস্।

সজ্জন মাথা হেঁট করে চুপচাপ শুনছে। কন্যার দিকে এক নজর দেখে নিয়ে কর্নেলকে বললে— আমি তোমার কথার সাইকোলজিক্যাল প্রভাব থেকে অনেক দূরে কর্নেল, আমার ওপর কোন প্রভাবই পড়েনি। কন্যার প্রশ্নের উত্তরে— আমি এই বলব— মহিপাল যেন সর্বদাই আমার মনে সজারুর কাঁটার মতই বিঁধে আছে। কর্নেলের সঙ্গে যত সহজভাবে মেলামেশা করতে পারি, ওর সঙ্গে যেন ঠিক মনের মিল হয় না। আমি তোমার আর কর্নেলের গা ছুঁয়ে বলছি— আমি মহিপালকে স্নেহ করি। ও বুদ্ধিজীবী নয় বটে, কিন্তু বড় ভাবুক। লেখাপড়া যত করে, ভাবেও তত। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ওর স্বভাবে সিন্ধুর গভীরতা নেই, আছে পাহাড়ী ঝরনার বেগ। তার স্বভাবে মিথ্যে অভিমান আর দম্ভ, দুটোই যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

কর্নেল বললে— এ কথা তোমার ষোলো আনা ঠিক। আমি মানছি মনুষ্যতা আর ভদ্রতার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে মহিপালের তুলনা করা মানে সুয্যিকে পিদিম দেখানো। মহিপালের মন বড় ছোট, খেলো কথাই ভাবে আর বলে। কিন্তু দেখো ভাই সজ্জন, মহিপাল তো আমাদের পুরোনো প্রাণের এয়ার। ব্যাটাচ্ছেলে একেবারেই নিরেট, তা আর কি করা যাবে বলো? আমি তোমাকে মিথ্যে বলছি না বিন্নো, মহিপাল আজ বেশ একটা হোমড়াচোমড়া গোছের হত যদি নিজের স্বভাবের দরুন ভবিষ্যৎ নষ্ট না করত। আজকাল হঠাৎ পাথর-চাপা কপাল খুলে গেছে।

—হ্যাঁ, আর্থিক অবস্থা আজকাল ওর বেশ স্বচ্ছল, চল্লিশ হাজার রয়েলটী পেয়েছেন। যাক ভালোই হল, তবে এত বড় লেখক হয়ে তিনি কাজটা ভালো করেননি— কন্যা বললে।

—খারাপ, আরে আমি বলছি একেবারেই খারাপ কাজ করেছে। তোমাকে কে বললে যে সে চল্লিশ হাজার রয়েলটী পেয়েছে? কুড়ি হাজার পেয়েছে তার মধ্যে দশ হাজার বিয়েতে নগদ দিয়ে ফেলেছে। লোকাল বরযাত্রী, দু'দিন থাকবে, তার মানে একেবারে রয়েল অভ্যর্থনার খরচের ফিরিস্তি তৈরী হবে। সব মিলিয়ে তিন-চার হাজার টাকা বিয়েতে আরো খরচ হবে। তার মানে চৌদ্দ হাজার ফুরিয়ে গেল, বাকী বাড়ির সকলের গয়না, কাপড়, জুতো, মোজা, ফার্নিচার ইত্যাদিতে আড়াই তিন হাজার আন্দাজ লাগবে। কল্যাণীর গায়ে দু'তিনটে বেশ দামী গয়না দেখলুম, আর মোটরও কিনেছে, তার দরুন রূপরতনকে দাম চোকাতে হবে। এইভাবে যা এল সব বেরিয়ে গেল—হিসেব সাফ। খুব তাড়াতাড়িই কোনদিন মোটর বিক্রি করতে হবে, তাই তো আমি বলছিলাম যে মহিপাল বড় বেহিসেবী।

সজ্জন গম্ভীরভাবে বললে—এখানে আমি তোমার মতে সায় দিতে পারছি না কর্নেল। এ কাজটা মহিপালের বেহিসেবী বুদ্ধি করাচ্ছে না, সে অনেক ভেবেচিন্তে স্পিরিটেড মুডে কাজ করেছে। তার নিজের অভাব-অনটনের সংসার, এই নিয়ে সে সর্বদাই আমাকে ঈর্ষা করে এসেছে। এবার মহাজনদের বিরোধের সময় তার হাতে আপনা হতেই এই সুযোগ এসে ধরা দিয়েছে।

—আমি তোমাকে সত্যি বলছি কর্নেল, মহিপালের চরিত্র আগের চেয়ে অনেক নীচে নেমে গেছে। শীলার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কল্যাণীর প্রতি অনুরক্ত হওয়ার পেছনেও কোন রহস্য আছে।

—না-না—এ তো আমার চোখে দেখা সজ্জন। ওর শালার বিয়েতে বরযাত্রীদের মধ্যে যখন শীলাকে নিয়ে কুৎসা রটালো

তখন মহিপালের বাড়িতে এই নিয়ে খুব হাঙ্গামা হয়েছিল। সে বাড়ি ছেড়ে শীলার কাছে থাকতে চলে গিয়েছিল তারপর কল্যাণী আমার কাছে এল, আমি শীলার বাড়ি গিয়ে তাকে নিয়ে এলুম। আমার কাছে কিছুই লুকোনো নেই— এরপরেই মহিপালের ভাগ্য খুলে গেল— কুড়ি হাজারের চেক পেল। শেঠ রূপরতনের প্রকাশন অফিসে অ্যাডভাইজার হয়ে গেছে— মহিপাল আজকাল সব কাজেরই হোতা।

—তাই তো বলছিলাম যে…

—মহিপালের মোটর কখনোই বিক্রি হবে না, বরং সে এর থেকে বড় মোটর কিনবে, হয়তো নতুনও কিনতে পারে, নৈনীতালে বাড়ি করবে।

—তুমি অদ্বিতীয় হবার চেষ্টা করছ রামজী, কী, ঠিক বলছি না? হঠাৎ যেন সজ্জনের কানে বাবাজীর আওয়াজ ভেসে এল। বাবাজী ঘরে নেই অথচ যেন কাছে থেকেই কথা বললেন। সজ্জনের মন কেমন যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠল। বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে ফেঁসে গেছে সজ্জন, হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করলে— তোমরা কিছু শুনলে? কোন আওয়াজ?

—আওয়াজ? কন্যা প্রশ্ন করলে।

—আমার বোধহয় মতিভ্রম হয়েছে, সজ্জন প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে বললে।

সেইদিনই বাবাজীর সঙ্গে গ্রামে গিয়ে দেখার করার কথা তার মনে এল। মহিপালের ওপর মানহানির মোকদ্দমা চালানো বা না চালানোর ফৈসলা তাঁর কাছে গিয়ে করবে।

পরের দিন ভোরবেলাই সজ্জন বাবাজীর সঙ্গে দেখা করার

জন্য এক বন্ধুর জীপ নিয়ে রওনা হল। কন্যা তাড়াতাড়ি নিজের ড্রাইভারকে জীপের পেছনে গাড়ি নিয়ে পাঠিয়ে দিলে। গাড়ি পাঠিয়ে কন্যা জেঠীর বাড়ি ঢুকতেই সামনে উঠোনে শুয়োরের বাচ্চাদের দেখে থমকে গেল।

জেঠী বিছানায় বেঁহুশ হয়ে পড়ে আছেন, গা তপ্ত বালুর মত গরম। তারা, বর্মা আর নন্দর মা সেবা করছে। জেঠী মাঝে মাঝে উঠে এদিক সেদিক ছুটছেন, আশেপাশের লোককে চড় চাপড় মারছেন। তিনজনে তার একার সঙ্গে পেরে উঠছে না। বদ্যি মশাই নাড়ী দেখে জানালেন জেঠীর অন্তিম সময় অতি নিকটে, আর দু-তিন ঘণ্টার বেশী নয়। উনি মকরধ্বজের মাত্রা খাওয়ালেন আর হাতে পায়ের তেলোয় জায়ফল পিষে মালিশ করতে বললেন। কন্যার মাথায় চারিদিকের চিন্তা ঘুরছে। আজই শকুন্তলার বিয়ের বরযাত্রী আসছে। কর্নেল আজ সেখানেই ব্যস্ত আছে। বনকন্যা অনেক ভেবেচিন্তে তাকে ডাকতে না পাঠানোই উচিত মনে করল। বর্মাকে নিজের বাড়ি পাঠিয়ে টেলিফোন করে দেওয়ানজীকে ডেকে পাঠালে। ইতিমধ্যে শঙ্কর আর ছোট, দুজনেই এল। নন্দ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জেঠীকে দিয়ে টোটকা করাতে গিয়ে তাঁকে অহেতুক কষ্ট দিয়েছে, নন্দর মা কন্যার কাছে নিজের মেয়ের বিরুদ্ধে নালিশ জানালে, শঙ্করলালও তার বোনের কুকর্মের জন্য লজ্জিত, সে কন্যার সামনে এই নিয়ে খেদ প্রকাশ করলে। রাজাসায়েবের ওখানে কন্যা খবরটা পাঠিয়ে দিলে।

গলিতে দূর দূর পর্যন্ত 'টোটকী জেঠীর' স্বর্গবাসের খবর বিদ্যুতের মত ছড়িয়ে পড়ল। পাড়ার সকলেই খবর পেয়ে এক

এক করে জেঠীর দরজার সামনে জমা হচ্ছে। টোটকার জিনিস-পত্তর সরিয়ে ফেলে কন্যা আগেই সব ধুয়ে পরিষ্কার করিয়ে দিয়েছে। জেঠীর শেষ সময় তাঁর নামের সঙ্গে এ প্রসঙ্গ জুড়ে লোকে কথা বানাবে, এটা কন্যা মোটেই চায় না। এই সময় সজ্জন নেই, একা কন্যা ঘাবড়ে গেছে। লোকেরা বললে যে বিমান তৈরী হবে, জেঠী বাদ্যি বাজিয়ে টাকাপয়সা দান করতে করতে গঙ্গায় যাবেন। কন্যা দেওয়ানজীকে জরুরী খরচখরচার ব্যবস্থা করার জন্য আগেই বলে দিয়েছে। লালা জানকীসরণ একবার দরজা পর্যন্ত এলেন, সজ্জনের বিষয় জিজ্ঞেস করে, দুজনকেই সেখানে না পেয়ে চলে গেলেন।

জনতার মুখে জেঠীর ধন্য ধন্য হচ্ছে। ইদানীং তাঁর সমাজ-কল্যাণমূলক কাজের সকলেই শতমুখে প্রশংসা করেছে। গঙ্গা দশহরার দিন জেঠীর শেষ নিশ্বাস পড়ল এ কথা জেঠীর ড্যাং ড্যাং করে স্বর্গে যাওয়ার প্রমাণ হিসেবে আলোচিত হল।

সজ্জন ফিরে এল। এসেই জেঠীর মৃত্যুসংবাদ পেতেই সে ভয়ানক মুষড়ে পড়ল। জেঠী তার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। উঠোনে জেঠী, নাইয়ে ধুইয়ে লাল ওড়না দিয়ে ঢাকা হয়েছে। সজ্জনকে জেঠীর মুখ দেখানো হল। জেঠী এয়োস্ত্রী গেছেন, মাথায় টিকলী, নাকে নথ, কানে বালা— সজ্জন জেঠীকে কখনো সেজেগুজে এর আগে দেখেনি, এ যেন তার কাছে জেঠীর নতুন রূপ। তাঁর মুখ শান্ত, জীবনের সমস্ত সংঘর্ষের মধ্যে কোঁচকানো তাঁর মুখের রেখা আজ শান্তি পেয়ে যেন মিলিয়ে গেছে। জেঠীর মাথায় হাত রেখে সজ্জন ছোট

বাচ্চার মত ডুকরে কেঁদে উঠল। কন্যা, তারা আর বর্মার চোখের জল অবিরামভাবে পড়ে চলেছে।

দুপুর পেরিয়ে গেল, তখন অনেক ডাকাডাকি আর ফোনের পর রাজাসায়েবের বড় সুপুত্র এলেন। ততক্ষণে জেঠীর দরজায়, ফাটকে, গলিতে বাইরে পর্যন্ত তিল রাখার জায়গা নেই, লোকে লোকারণ্য। ঘণ্টা-শাঁখ হুলুধ্বনির সঙ্গে জেঠীর বিমান উঠল। ব্যাণ্ড বাজতে লাগল। পাড়ার দুটি ছেলে বিমানের ওপর ময়ূরপুচ্ছের চামর দিয়ে বাতাস করছে। সজ্জনের দেওয়ানজী হাত উঁচু করে পয়সা ছুঁড়লেন, ঝুলি বিছিয়ে ভিখিরির দল মাটিতে পয়সা পড়ার সঙ্গেই উঠিয়ে নেবার জন্যে হাতাহাতি করছে। পুরুষদের কপালে লাল আবীর। জেঠীর বিমান হাল্কা ফুলের মত লোকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সারা জীবন জেঠীর পেছনে লেগে তাঁর গালাগালি শুনে যারা হেসে কুটিপাটি হত তারাই ছোট থেকে নিয়ে বুড়ো পর্যন্ত আজ অন্তিম যাত্রায় তাঁর সঙ্গে চলেছে। আজ জেঠীর লাঠির ভয় নেই, জেঠী আজ তাদের কাঁধে চেপে চলেছেন। আজ তাদের অন্তর-মনে জেঠী, মুখে জেঠী, জেঠী জেঠী। গলি পেরিয়ে সদর রাস্তায় আসতেই সজ্জনের দেওয়ানজী সোনা-রুপোর ফুল ছড়াতে আরম্ভ করলেন। রাজাসাহেবের বড় ছেলেও লোকলজ্জার খাতিরে দশ টাকার চেঞ্জ আনিয়ে বিলি করে দিলে।

বিকেলে কেউ গিয়ে কর্নেলকে খবরটা দিলে। এ খবরও পেলে যে মৃতদেহ কানপুর গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কর্নেল খবর পেয়ে দুঃখিত হল কিন্তু মহিপালকে কিছু বললে না। বিকেলে বরযাত্রীদের অভ্যর্থনা এবং স্ত্রী-আচারের ব্যবস্থা মহিপাল করেছে। সারা শহরের বেশীর ভাগ লোককে নিমন্ত্রণপত্র বিলি করা হল

কিন্তু সজ্জন আর কন্যা বাদ গেল। কর্নেলের ওপর আপনজনের অধিকার কায়েম করার খাতিরে সে আজ তাকে সকাল থেকেই ডেকে পাঠিয়েছে। তার হাতের কাছে কোন কাজ না থাকায় সে বসে বসে বিয়েবাড়ির হৈ চৈ সাজসজ্জা দেখছিল। বরযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা কার্লটন হোটেলে পাঁচখানা ঘর নিয়ে করা হয়েছিল। বরযাত্রী আসতেই কালোমরিচের গুঁড়ো ঠাণ্ডা জলে মেশানো সরবত পাঠানো হল। সারাদিন ধরে জলখাবার, ফল, মিষ্টি এবং আরো নানারকম খাবার জিনিস সরবরাহ হতে লাগল। সন্ধে সাতটায় তাদের রীতিমত আহারের ব্যবস্থা, নাপিত কন্যাপক্ষের দিক থেকে বরযাত্রীদের নিমন্ত্রণ করতে গেল। শেঠ রূপরতনের বিরাট লনে প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত নাগরিকদের মধ্যে দুজন মন্ত্রী উপস্থিত আছেন। মহিপাল খুব খুশী, সবাইকে হেসে হেসে শোনাচ্ছে যে যদি নৈনীতালের সীজন না হত, তাহলে স্বয়ং পন্তজী আর গভর্নর মোদী নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসতেন।

বরযাত্রী বাড়ির কাছে এসে পড়েছেন, খবর পেয়ে অভ্যর্থনার জন্য সকলে এগিয়ে রাস্তায় দাঁড়াল। লক্ষ্ণৌয়ের বাজপেয়ী আর বালার শুক্লা এক পা এগিয়ে প্রথামুসারে নিজেদের জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলেন, বরপক্ষ এক পা বাড়ালেন, মেয়েপক্ষ যথাস্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন, যে যার উঁচু নাকের মর্যাদা রাখতে শশব্যস্ত। বরপক্ষতে বেশী ভিড়, বরযাত্রীর মধ্যে অনেকে নামকরা লোক এসেছেন কিন্তু কনেপক্ষর এ বিষয় নাক এক কাঠি উঁচু, তাদের দিকে বড় বড় ধনী মানী, অফিসর ডাক্তার, সাহিত্যিক আর মিনিস্টার উপস্থিত আছে। বরপক্ষ তবু নিজেদের দর নামতে

দিলেন না, যথাস্থানে নাক উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এইভাবে ভেবে ভেবে এক এক পা করে এগিয়ে শেষকালে মহিপাল আর বেয়াই জয়পালের কোলাকুলির নিয়ম রক্ষার সঙ্গে উভয়পক্ষের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে পরিচয় আর কোলাকুলির পর্ব শেষ হল।

পার্টির ব্যবস্থা কর্নেল খুব ভালোভাবে করেছে। অতিথিদের বিদায় করার পর কর্নেল যাবার জন্য মহিপালের কাছে ছুটি চাইলে। মহিপালের অনেক পীড়াপীড়ির পর সে কোনমতে ছোট এক টুকরো বরফি মুখে ফেললে, তার গলা দিয়ে যেন কিছু নামছে না। মহিপাল আর সজ্জনের মধ্যে মনোমালিন্যর জন্য কর্নেলের মনমেজাজ ভালো নেই। মহিপালের ব্যবহারে সে সত্যিই দুঃখিত। ফিরতি পথে কর্নেল সজ্জনের বাড়ি খোঁজ নিলে, কন্যার সঙ্গে দেখা হল। সারাদিন না আসার কারণ কর্নেল তাকে জানালে। কন্যার মুখে শুনলে যে মুখাগ্নির সময় রাজাসায়েবের বড় ছেলে আদেশ দিয়ে সজ্জনকে পেছনে সরিয়ে দিয়েছিলেন! এই আচরণে সজ্জন বেশ দুঃখ পেয়েছে। এরপরে সে মৃতদেহের সঙ্গে কানপুর যেতে চায়নি, পরে কন্যার অনেক বলাকওয়ায় তবে গেছে।

শুনে কর্নেল হাসলে— এই মুখাগ্নির ব্যাপার রাজাসায়েবের বড় ছেলের কানুনী টোটকা, মুখাগ্নি দিয়ে সজ্জন তাঁর বাদবাকী সম্পত্তি হাতিয়ে না নেয়, তাই এইভাবে রাস্তা পরিষ্কার করে নিলেন।

—কী নীচ মানুষ এরা, সর্বদাই পয়সার দিকেই নজর— ব'লে কন্যা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

একান্ন

জেঠীর দাহ সংস্কারের পরদিনই সজ্জন রাজাসায়েবের উকিলের নোটিশ পেলে। তাঁর বসতবাড়ি খালি করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে সজ্জন আর কন্যা দুজনেই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এ ধরনের আশঙ্কা মনে আগেই ছিল, কিন্তু এত ভালো চালু স্কুলটাকে উঠিয়ে সে কোথায় নিয়ে যাবে? হাসপাতালের জন্য কেনা বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তা করলে, প্রসূতি-গৃহের জন্য জায়গা কম হবে। সজ্জন ভেবেচিন্তে ঠিক করলে সে নিজে রাজাসায়েবের কাছে গিয়ে বসতবাড়ি ভাড়া নেওয়ার কথাটা তুলে দেখবে। কন্যা মানা করলে কেননা তার মতে রাজাসায়েব কখনোই এ প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী হবেন না। হলও ঠিক তাই। রাজাসাহেব অত্যন্ত নিকট আত্মীয়ের মত, খবরটবর জিজ্ঞেস করার পর বললেন— ভাই দেখো, আমি সব মায়া মোহ ছেড়ে বসে আছি। শেষ সময় হরিনামের মালাই এখন আমার একমাত্র সম্পত্তি, তুমি এ বিষয় আমার ভইয়ার (বড়ছেলে) সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারো, আজকাল ওই সব-কিছু দেখাশোনা করে।

ভইয়া সাহেব তাকে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিলেন— আমাদের পূর্বপুরুষের ভিটে, সেখানে হিন্দুধর্মের কবর খোঁড়া হতে পারে

না লালা সজ্জনমলজী। বড়মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর সেখানে থাকার অধিকার ছিল, এখন বাবা সেখানে ঠাকুমার নামে বৈদিক পাঠশালা খুলবেন ঠিক করেছেন।

সজ্জন চুপ করে রইল। দু' মিনিট পরে অন্য কথাটা তুললে, অন্তত এক মাসের সময় চাইল। ভইয়া সাহেব মিষ্টি করে বললেন— আমার কথায় ভুল বুঝো না ভাই সজ্জনমল। একমাস কেন দু'মাস পরে খালি করো, আমার তোমার পূর্বপুরুষদের মধ্যে কত ভাবসাব যাতায়াত ছিল। তবে এখন ব্যাপারটা একটু অন্যরকম হয়ে গেছে, তোমার কায়স্থ স্ত্রীর জন্য পাবলিক তোমাদের বিরুদ্ধে। ওখানে যে আর-একজন ভাড়াটে আছে, তাকেও আমি খালি করতে বলব, তারও তো কায়স্থ স্ত্রী কিনা।

ভইয়াসাহেবের কথা শুনে সজ্জনের মাথা গরম হয়ে গেল, তবু নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললে— পাবলিক কতখানি আমাদের বিরুদ্ধে সে-সব চর্চা ছাড়ুন। এ ধরনের অসবর্ণ বিয়ে নিশ্চয় হবে, আগের চেয়ে বেশী সংখ্যায় হবে। আপনার একটা কেন, দশটা বৈদিক পাঠশালাও রুখতে পারবে না।

ভইয়াসাহেব ধর্মের আবেশে, চোখ গোল গোল করে পাকিয়ে বললেন— বড় বড় সিকন্দর, বাবর আর ইংরেজরা আমাদের লক্ষ কোটি বছরের পুরনো পবিত্র হিন্দু ধর্মকে এক ইঞ্চি নড়াতে পারলে না— তুমি…

—আমরা নয়, সময় চক্র নিজেই ঘুরবে। আমরা হিন্দুস্থানে ধর্মকে বিন্দুমাত্র ধাক্কা দেবার চেষ্টা করছি না— তবে হ্যাঁ, মিথ্যে ভড়ংকে আমরা ধাক্কা দিয়ে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেবার সংকল্প করেছি।

—তুমি আমাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছ, সজ্জন, তাহলে আমিও তোমার চ্যালেঞ্জ মঞ্জুর করছি। বুভুক্ষের দলকে কতদিন খাওয়াবে? এখানে এদের সংখ্যাই তো বেশী।

—এরাই তোমায় গিলে ফেলবে একদিন।

ভইয়াসাহেব জোরে হেসে উঠলেন—সজ্জন, ধাইয়ের কাছে পেট ঢাকা দেওয়ার বৃথা চেষ্টা কোরো না। বুভুক্ষুদের টাকা নিয়ে তুমি যা বিজনেস করছ, তার খবর আমি রাখি। বন্ধুত্বের খাতিরে একটা পরামর্শ দিচ্ছি—তোমার এই স্কীম একেবারে জমিদারি ধরনের, ব্যবসাদারের মত নয়। তুমি যে রাজনীতির ভেলকীবাজি খেলছ, আমরা দশজনে মিলে তাকে দুদিনে কবর খুঁড়ে পুঁতে দেব—(হেসে) তোমার সাত আট দশ লক্ষ টাকা দু' দিনের মধ্যে মিনিটে বারুদের গোলার মত উড়ে যাবে। আমাদের গায়ে হাত দিতে আসা এত সোজা কথা নয়। আমরা ধর্মের খাতায় চাঁদার হার বাড়িয়ে দেব—এই বাহানায় ইন্‌কাম ট্যাক্স, সুপার ট্যাক্সের হাত থেকে মুক্তি পাব।

সজ্জন হেসে উত্তর দিলে—যাক, উত্তম কথা, এই বাহানা নিয়ে তোমরা জনতার কল্যাণের কাজে এগিয়ে আসবে সেই যথেষ্ট। তবে এটা মনে রেখো যে আমার দশ লক্ষর সঙ্গেই তোমাদের কোটি টাকাও ডুবে যাবে। এ বিষয় আলোচনা করা মানে বাজে সময় নষ্ট, নিজের চোখের সামনেই সব দেখতে পাবে— ব'লে সজ্জন উঠে দাঁড়াল। যেতে যেতে দু' মিনিট দাঁড়িয়ে বললে— তোমার নোটিশের জবাব আইনতঃ পাবে। তবে এটা আমি বলে যাচ্ছি যে অন্য জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত আমি বাড়ি খালি করব না। হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি পারি, অন্য জায়গা

দেখে নেব। ভইয়াসাহেব গর্জে উঠলেন— বাড়ি পনেরো দিনের মধ্যে খালি হওয়া চাই সজ্জনমল।

—চেষ্টা করব। সজ্জন সংযত হয়ে উত্তর দিলে। ভইয়াসাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন— চেষ্টা করব মানে? তাহলে তিনদিনেও খালি করতে পারো।

—চেষ্টা করব।

ভইয়াসাহেব রীতিমত উত্তেজিত হয়ে এগিয়ে এলেন— পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধ কেন খারাপ করতে চাইছ? এই যদি ভেবে থাকো, তাহলে পরে নালিশ করতে এসো না যে আপসে হাঙ্গামা বাধানো কেন।

সজ্জন যেতে যেতে আবার ফিরে এল— আমি তোমায় কথা দিচ্ছি যে এর মধ্যে কোন রাজনীতি নেই, এটা একটা সামাজিক ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়।

—এই তো তোমার আসল রাজনীতি। তাই যদি হয় তাহলে এক কাজ করো, ব্যাঙ্কের আইডিয়া ছেড়ে দাও আর বাদবাকী প্রয়োগ করতে থাকো। একটু-আধটু যা নতুনত্ব করতে চাও, করো, বাস্ কিন্তু পাড়ায় মুসলমান, খৃস্টানের সঙ্গে বিয়েথাওয়ার রেওয়াজ চালু করিয়ে দিয়ো না যেন, বাকী জাতের বন্ধন না মেনে ম্যারেজ হতে দাও। বাবা বেঁচে থাকতে আমি খোলাখুলি নয় তবে চুপচাপ তোমার ঐ কাজে সাহায্য করব। দশজন আরো প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সাহায্য···

ভইয়াসাহেব বেশ কিছুক্ষণ গরম গরম লেকচার ঝাড়লেন, এটা করিয়ে দেব, সেটা করিয়ে দেব। সজ্জন শান্তভাবে সব-কিছু শুনে নিয়ে বললে— যদি ব্যাঙ্কই বন্ধ করে দেব,

তাহলে সমাজকল্যাণ কাজের জন্য টাকা আসবে কোথা থেকে ?

—ভাই, ছোট স্কেলে করো। কিছু চাঁদার ব্যবস্থা আমি করে দেব।

—চাঁদার টাকা দিয়ে তুমি জনতার আত্মশক্তির বিকাশকে দুর্বল করে দিতে চাও? আচ্ছা, এক কাজ করতে পারো, তোমরা তুমি বা লালা জানকীসরণ আর অন্য মহাজনেরা যারা পাড়ায় সহকারী ব্যাঙ্ক খোলার বিরুদ্ধে— সকলে মিলে আমাদের সহকারী পুঁজির সঙ্গে নিজেদের পুঁজি বিনিয়োগ করো, উচিত মুনাফা পাবে।

—আমরা রাজি আছি তবে এক শর্তে, শেয়ার এক টাকারই হোক-না-কেন, যার কাছে কম সে কম পাঁচশো শেয়ার থাকবে সেই বোর্ড অফ ডিরেক্টরস ··

—আপনি পাবলিককে সাহায্য করার নামে প্রাইভেট কারবার চালাতে চান? কারবার চালান কিন্তু সার্বজনিক ক্ষেত্রে ডিরেক্টরস বোর্ডে আসার অধিকারী একটাকার শেয়ার-হোলডারেরও আছে। ডিরেক্টর হিসেবে আমরা চাই সত্যিকার ভালো কর্মী, যাদের সমাজসেবার কাজে রুচি আছে।

ভইয়াসাহেব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে হেসে বললেন— বিনাশ-কালে বিপরীত বুদ্ধি, যাক— বাড়ি তিনদিনে খালি করে দিতে হবে সজ্জনমলজী।

ভইয়াসাহেব যাবার জন্যে উসখুস করে উঠলেন। তার নামের সঙ্গে বার বার মল আর লালা জুড়ে কথা বলা সজ্জনের মোটেই ভালো লাগল না, যদিও এই তার পুরোনাম তবু ভইয়াসাহেবের লাটসাহেবী চালে উচ্চারণ করাটা যেন সে সহ্য করতে পারছে না।

—আপনাকে কতবার বলছি চেষ্টা করব। যতদিন পর্যন্ত অন্য জায়গা না পাই, জেঠীর বাড়ি থেকে আমায় বার করে কার সাধ্যি?

রাজাসায়েবের বাড়ি থেকে ফিরে এসে সজ্জন ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। কন্যার স্কুল সরানো খুব বড় একটা সমস্যা নয়, আসল সমস্যা বিরোধী পক্ষকে নিয়ে, তারা তার এতদিনের স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়। তার চেয়ে অনেক বেশী সংগঠিত পুঁজি তার বিরুদ্ধে কাজ করছে। যদিও জনতার মধ্যে সে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে তবু এখনো তাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে আপন করে নিতে পারেনি। এত বিরাট জনশক্তিকে বশে আনা সহজ কথা নয়। যদি তারা বিপক্ষ দলের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে তাকে বেকুব বানিয়ে যায়, তাহলে? সে কী করতে পারবে তাদের বিরুদ্ধে? জনতার মধ্যে সজ্জনের পরিকল্পনার প্রচার এখনো পুরোপুরিভাবে হয়নি, বিপক্ষ দলেরা এ সময় গভীর দাঁও মারবে। এ ছাড়া মহাজনেরা তাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য রাজনৈতিক পার্টিদেরও দলে নেবে। এই পরিস্থিতিতে সজ্জন তার পরিকল্পনাকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করবে। জনতা তাদের অধিকারের বিষয় সচেতন হোক—এই সজ্জনের একান্ত কামনা··· তবে জনতার বিশ্বাস অর্জন করার উপায়? তাদের বিশ্বাস অর্জিত করার জন্য কি করা উচিত?

—সহজ উপায় আমি বলছি রামজী, গোমতীর ধারে এসে দেখা করো।

—নিজের ঘরে বসে আবার সজ্জন বাবাজীর গলার স্বর স্পষ্ট শুনতে পেল। সে আশ্চর্য হয়ে এদিক-সেদিক তাকালে, তার মনে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হল, তার মতিভ্রম হয়ে যায়নি তো? আমার

নিজের মনই আমায় এভাবে সান্ত্বনা দিচ্ছে না তো? গোমতীর ধারে দেখা করতে গেলেই সব আপনা হতে স্পষ্ট হয়ে যাবে, ড্রাইভারকে গাড়ি বার করার হুকুম দিলে।

সত্যি সত্যি, শিবালয়ের বারান্দায় বাবাজী শুয়ে আছেন, সজ্জনকে দেখে বললেন— আসুন রামজী, অনেক প্রতীক্ষার পর এলেন।

—আমি পরশু আপনার এখানে আসছিলুম···

—হ্যাঁ, রামভক্তনিয়াঁ বেচারী মারা গেছে। আমার অনেক উপকার করে গেছে রামজী, গ্রামে এমন সুন্দর আশ্রম তৈরী হয়েছে, পাঠশালা, ব্যায়ামাগার সব সুচারুরূপে চলেছে রামজী। আজ এখানে একটা বিশেষ দরকারী কাজের জন্য এসেছি, আমায় ট্র্যাক্টর কিনিয়ে দাও।

—আপনি যা আদেশ করবেন, সব পালন করব তবে আমার একটা দ্বন্দ্ব মিটিয়ে দিন। বাবাজী হাসলেন, কিসের দ্বন্দ্ব রামজী? তোমার কাছে একটা টেলিফোন আছে, একটা আমার কাছে আছে— বলে হো হো করে হেসে উঠলেন।

—এ কি করে সম্ভব?

—সাধনার দ্বারা।

—তার মানে?

—আত্মসংযম আর ধ্যান।

—একাগ্রচিত্ত হওয়া যায়?

—সতত চিন্তন করলেই হওয়া যায়।

—চঞ্চল মনকে কখনো একই চিন্তাধারায় নিবিষ্ট রাখা কি সম্ভব?

—মন যেখানে যেখানে যাবে, সেখানেই সমাধি হতে পারে। নিজের ইচ্ছাকে বিশ্লেষণ করে দেখো, কোথায় তার বাস্তবিক রসের উৎস, নিশ্চয় সন্ধান পাবে। সমাজকল্যাণের কাজে সম্পত্তি দান করার সময় তুমি বিচলিত হয়ে পড়েছিলে, তারপরে শাস্ত জ্ঞানের আলোয় শ্রদ্ধাবিষ্ট তোমার হৃদয়টি জানতে পারলে যে মায়া মোহের চেয়ে ইচ্ছাশক্তি প্রবল। এখন তোমার আর জনতার মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তুমি যেখানে চাইবে, সেখানেই তোমার চিত্ত একাগ্র হবে।

—আমি জনজীবনের স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে যেতে চাই।

—তাই হবে রামজী।

—আপনি তাই আশীর্বাদ করুন। কিন্তু আপনার রহস্যময় ব্যক্তিত্বের বিষয় আমার প্রশ্নের উত্তর এখনো পাইনি।

বাবা রামজী হাঁটু মুড়ে ভালোভাবে বাবু হয়ে বসলেন— রামজী, রহস্য আমার মধ্যে নেই, রহস্য আছে সেই বিরাটের মধ্যে। আমি সর্বদাই সেই সহজ আত্মজ্ঞানকেই আত্মসচেতনতার দ্বারা ছন্দ প্রদান করছি, তোমার মনে অদ্বিতীয় হবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়ে উঠেছে। অপরা প্রকৃতিকে প্রত্যাখ্যান যদি না করতে পারো, তাহলে বিরাটের বাস্তবিক রূপের দর্শন কি করে পাবে?

সজ্জন মাথা নিচু করে গম্ভীর হয়ে রইল। বাবাজী বললেন— আমার গুরু আমাকে সেবার মন্ত্র দিয়েছিলেন, বলেছিলেন সবার মধ্যে আমার রূপ দেখবে, তাদের সেবা করবে। লেখাপড়া জানি না রামজী। হ্যাঁ, নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর উপদেশের মালা হাতে নিয়ে কর্মক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছি। সেবার পথে মনকে একাগ্র করে নিজের সূক্ষ্ম আর প্রকৃত শক্তির দর্শন পেয়ে গেলুম। যদি

ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়, তাহলে বায়ুরূপ ধারণ করে সব জায়গায় বিচরণ করা যায়। এখনো সে শক্তির দর্শন হয়নি, প্রভুর যদি ইচ্ছা হয় তাহলে হয়ে যাবে, অন্যথা চিন্তা করার কিছু নেই। আমি কেবল নিষ্কাম সেবাব্রত নিয়ে সেই আধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাধনার রহস্যভেদ করার চেষ্টায় লীন হয়ে আছি, এই চলার পথে যা অভিজ্ঞতা লাভ করব, সেই জ্ঞান লাভই হবে আমার পাথেয়, আর আমার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সজ্জন বললে— আমার মাথায় কিছুই ঢুকল না, এখনো সব যেন রহস্যই মনে হচ্ছে, কুয়াশায় ঢাকা।

—ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে রামজী। একবার তোমার ব্যবহারিক জীবনযাত্রার সঙ্গে যখন এই অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়বে তখন এ পথ বড়ই সহজ আর সুগম মনে হবে। একবার বসে গভীর চিন্তা করে দেখো, নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করা তোমার রুচি এবং অরুচির বিষয়, তারপর সেই অনুযায়ী নিজের দুই প্রকৃতির অভিব্যক্তির তারতম্য করার চেষ্টা করো। তাহলেই বুঝতে পারবে যে তোমার পরিবার, সমাজ, ভৌতিক আর আধ্যাত্মিক জীবনের মূলমন্ত্র কি। একবার মূলমন্ত্রের জ্ঞানলাভ করার পর সমস্ত ইচ্ছাশক্তির বিকাশ আপনা হতেই সম্ভব হবে। এরপর প্রতিটি মুহূর্তের ক্রিয়াকলাপ তোমার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা চালিত হবে। তুমি যখন নিজের সূক্ষ্ম আর প্রকৃত শক্তির পরিচয় পাবে, তখন আপনা হতেই রহস্যের পর্দা তোমার চোখের সামনে থেকে সরে যাবে। অনুভবের পথ বড়ই সহজ রামজী, কেবল অভ্যাস করলেই সম্ভব হয়।

সজ্জন এক বিচিত্র স্বপ্নলোকে বিচরণ করছে— সচেতন আর

নিদ্রিত দুই অবস্থার মাঝখানে সে যেন ঘুরপাক খাচ্ছে, তার জীবনযন্ত্রটি যেন অনুচ্চারিত সুরে বেঁধে একতান বাজিয়ে চলেছে।

মহিপালের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করার মানসিক জেদ আর ভইয়াসাহেব, লালা জানকীসরণ, রূপরতন ইত্যাদির সংগঠিত বিরোধ যেন তার ইচ্ছাশক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই হবার জন্য উন্মুক্ত হয়ে রয়েছে। কন্যার কথাই ঠিক, তার মনে ঈর্ষার ভাব সক্রিয়রূপে কাজ করে চলেছে। সে অদ্বিতীয় হবার চেষ্টা করছে··· তবে তার এই কামনা করা কি উচিত? না না, তার মত মহামূর্খ আর কে আছে? ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের কথা ভাবা অন্যায়। বিশ্বজগতের স্বামী প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে উদারভাবে জীবন ছড়িয়ে দিয়েছেন, প্রকৃতি আর প্রাণীর জীবনের সুরের সঙ্গেই একাকার হয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আত্মানন্দের শাশ্বত স্বর। এই ঈর্ষা দ্বেষ সব মানসিক বিকার··· তবে অন্যের মিথ্যের ফাঁসিকাঠ যখন এসে তার গলা চেপে ধরবে তখন সে কি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে? সাধারণ মানুষের দোষগুণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া কি এতই সহজ? বাবাজীর সঙ্গে দেখা করার পর সজ্জন যেন তার অতৃপ্ত মনে তৃপ্তির সন্ধান পেলে। শেঠ রূপরতনের বাড়ি রাস্তায় পড়ল, সমস্ত বাড়ি নববধূর সাজে সজ্জিত, মহিপাল, হ্যাঁ মহিপালের ভাগ্নীর বিয়ে— ছুটে গিয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানাবে না কি? নিমন্ত্রণ? নিমন্ত্রণ পত্র নাইবা এল, সে ঈর্ষার ভাব কেন আনবে? মহিপাল তার কতদিনের বন্ধু— সে এ কথাটা মনে করে যদি ভেবে দেখে তাহলে? ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললে। হঠাৎ মনে এল যে বরকনের জন্য উপহার কেনা হয়নি— খালি হাতে যাওয়া ভালো দেখায় না— ড্রাইভারকে হজরতগঞ্জের

দিকে গাড়ি নিয়ে যেতে বললে। গাড়িতে বসে বসে তার মনে হল যে উপহার নিয়ে গেলে মহিপাল হয়তো মনে করবে যে সে নিজের পয়সার গরম দেখাতে এসেছে। ড্রাইভারকে গাড়ি ব্যাক করতে বললে, ড্রাইভার জানতে চাইলে যে গাড়ি এবার শেঠ রূপরতনের বাড়ি যাবে, না নিজের বাড়ি? সজ্জন কিছুই স্থির করে উঠতে পারছে না, এ অবস্থায় তার মহিপালের কাছে যাওয়া কি ঠিক হবে? অপমানিত হবার ভয়ে তার মন সংকুচিত হয়ে উঠল।

গাড়ি তার নিজের বাড়ির ফাটকের কাছে আসতেই সে ড্রাইভারকে বললে— রূপরতনের বাড়ি চলো।

মহিপালের ওখানে তখন বাসি বিয়ের খাওয়াদাওয়া চলছে। মহিপাল আর জয়পাল বরের মামাদের দধি মধু মিশ্রিত সরবত একে অন্যের বুকে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে কোলাকুলি (মিলনী) করছে, এই কোলাকুলির সময় মহিপালের মনে বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে। বরের মামাদের জন্য বিয়ের আনন্দ যেন ফিকে হয়ে গেছে। মামারা যখন থেকে মেয়েপক্ষের বাড়ি পা দিয়েছেন, তখন থেকেই বৈশবাড়া গ্রামের জেদাজেদীর পালা আরম্ভ করে মেয়েপক্ষকে নাজেহাল করে ছেড়েছেন। কাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সমানে মহিপালকে অপমানিত করার চেষ্টা করেছেন। অসময় বেয়াড়া ধরনের ফাইফরমাশ করে বরের মামার দল তাদের অবস্থা কাহিল করে দিয়েছে। ছেলের বড় মামা, মহিপালের মামা বাড়ির সম্পর্কে আত্মীয়। তিনি সেজন্যে বার বার দাদামশাই ও মামার আশ্রিত মহিপালের জীবনের পাতাকে সকলের সামনে খুলে ধরার চেষ্টায় ত্রুটি করছেন না।

—তোমার মা বাপের বাড়ি থেকে যা মাল মেরে নিয়ে গিয়েছিল সেসব বার করো, বড় বড় প্রতিষ্ঠিত বড়লোক, মন্ত্রীদের সঙ্গে পর্যন্ত যখন দহরম মহরম তখন আমাদের অমুক অমুক ফরমাশ পুরো করায় অসুবিধেটা কি হচ্ছে? কাল থেকে মুখ বুজে তাকে যা অপমান সহ্য করতে হয়েছে, এর আগে কখনো সে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি।

ডাক্তার জয়পাল, স্বর্গীয়া মার বিষয় টীকাটিপ্পুনি শুনে প্রায় মামাদের ওপর মারমুখী হয়ে উঠেছে, মহিপালই তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা রাখছে, অহেতুক কথা বাড়িয়ে হাঙ্গামা বাধিয়ে লাভ কি!

মিলনীর সময় সজ্জনের আসার খবর মহিপালের কানে এল। খবর পেতেই তার হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল, সে ইচ্ছে করেই সজ্জন আর কন্যাকে বিয়েতে ডাকেনি। যে খবর দিতে এসেছিল সে বলে গেল যে সজ্জন রূপরতনের ঘরে বসে আছে আর কর্নেলও সেখানে আছে।

রূপরতন সজ্জনের আদর-অভ্যর্থনায় ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলেন। এদিক-সেদিক শশব্যস্ত হয়ে খানিক ঘোরার পর চেয়ারে বসে বললেন—আমাদের ভারতবর্ষে যতদিন জাতিভেদের ব্যামো থাকবে ততদিন সুস্থ সমাজের গঠন করা অসম্ভব। আমাদের মাতৃভূমি কত হাজার হাজার বছর ধরে বাইরের শক্তি দ্বারা নির্মমভাবে পদদলিত হয়ে এসেছে—তাই আমি এখন বেশ সিরিয়াসলি ভাবা শুরু করেছি যে সমাজবাদের চর্চা করা আজকাল ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে, গরীবদের ধাপ্পা দেওয়ার উত্তম পন্থা আবিষ্কার হয়েছে। সত্যি কথা বলতে এই বিলিতি সিদ্ধান্তে

বিশ্বাস করা মানে নেহাতই বোকামি করা। বয়সকালে আমিও পাকা সোশালিস্ট ছিলুম কিন্তু চুলে পাক ধরার সঙ্গেই বুঝতে পেরেছি যে ভারতবাসীর জন্য এ পথ তো নয়, তারপর ভবিষ্যতের গর্ভে যা আছে তা এক ওপরওলা ছাড়া কেউই জানে না।

সজ্জনের মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, রূপরতনের কথা যেন বড় রূঢ়, তবে তার খারাপ লাগা কি উচিত? রূপরতন তার মতই এমন সমাজে বাস করতে চায় যেখানে প্রাণী মাত্রই সমান, অনুচিত অসামঞ্জস্য যেখানে স্থান পাবে না। যদি তাদের ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়, তাহলে একদিন এ ধরনের সংগঠিত সমাজ-শক্তির বিকাশ নিশ্চয় হবে যেখানে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে ভেদাভেদ থাকবে না। এ ধরনের বিরোধ হয়তো তার ইচ্ছাশক্তির পরীক্ষা নেবার জন্যই আসছে।

—আচ্ছা রূপরতনজী, আপনাদের কথা শুনে আমি রাগ করি না। আপনার কথা যে আমি মেনে নিলাম তা নয় কিন্তু তার বিরুদ্ধে নিজের সামান্য শক্তি নিয়ে অহিংস পন্থায় যুঝে যাব।

—ও বাবা, তুমি একেবারে গান্ধীজী হয়ে গেলে নাকি? রূপরতন হেসে বিদ্রূপ করলে। সজ্জন মুচকে হেসে বললে—গান্ধীজী ভারতবাসী ছিলেন, আমিও সেই মাটিরই একজন মানুষ, তাই তাঁর পদাঙ্কানুসরণ করার প্রয়াস করছি।

—তা আজ পর্যন্ত বিলিতি ছিলে নাকি?

—বিলিতিও বলতে পারেন আর হাওয়ায় উড়ছিলুমও বলতে পারেন। এতদিন গোলকধাঁধার মধ্যেই চক্কর কেটেছি।

মহিপাল ঘরে ঢুকল, চোখেমুখে অবসাদের ঘন মেঘ, ক্লান্তভাবে সোফায় ধপ করে বসে পড়ল।

সজ্জন বললে— আমি তোমায় শুভকামনা জানাতে এলাম।

—ধন্যবাদ। আমি তোমার উকিলের নোটিশের প্রতীক্ষায় ছিলাম। শুনলাম যে তুমি নাকি আমার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা করবে।

সজ্জন শান্তিস্বরে উত্তর দিলে— ভেবেছিলাম, তারপর দেখলুম যে আমার মনে এখনো ঈর্ষার কণা বাকী আছে। সেই কারণে হয়তো আমি সর্বদাই নিজেই নিজের মানহানি করছি। নিজের মনের কাছারিতে যেদিন জিতে যাব সেদিন আমি···। কর্নেলের চোখেমুখে শিশুসুলভ সরল হাসি ফুটে উঠল— আরে সজ্জন, তুমি একজন মহান ব্যক্তি এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। আমি মহিপালের সামনেই বলছি তোমার মত উদার মন ওর নয়, হতেই পারে না।

মহিপাল যেন নিজের চোখে নিজেই গুটিয়ে যেতে লাগল, তার সংকীর্ণ মনের ছটফটানি বেড়ে চলল. ভদ্রতার মুখোশ পরে সে এতক্ষণ বেয়াইদের সামনে কোন গতিকে জিভে লাগাম দিয়ে ঘুরছিল, এবার একেবারেই ফেটে পড়ল— অনেক উদার মনের পরিচয় আজ পর্যন্ত পেয়েছি, এঁর কথা ছেড়েই দাও। বড় বড় কোটিপতিদের দেখেছি, আমার সামনে কেউ মুখ খোলার সাহস করে না। আদর্শের কড়িকাঠ গোনায় আমার সঙ্গে কেউ পেরে উঠবে ভেবেছ? একধার থেকে সকলকে ধুয়ে দিতে পারি। আমি কারুর চোখ রাঙানি বা পয়সাকে ভয় পাই না। কারুর পরোয়া আমি করি না। কাল থেকে আজ পর্যন্ত হাজার হাজার টাকা জলের মত খরচ করে ফেলেছি।

—হ্যাঁ ভাই, পরের পয়সা হাতে এলে খোলামকুচির মত ওড়াতে সকলেই পারে। শেঠ রূপরতন বিরক্তির সঙ্গে বললেন।

বেয়াইদের কাছে এতক্ষণ অপমানিত হবার পর হঠাৎ সজ্জনকে সামনে পেয়ে তার মনের প্রতিহিংসা বোধ একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেল। শেঠ রূপরতনের মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। মহিপাল বড়লোকদের সঙ্গে রেস করতে চায়। মহিপালের অহংকার দেখে রূপরতন আশ্চর্য হয়ে গেলেন, তিনি নিজে তাকে কত সাহায্য করেছেন, গয়না বিক্রি করার সময় তিনি নিজের হাতে চল্লিশ হাজার তাকে দিয়েছেন, বিয়ের জন্য নিজের বাড়ি দিলেন— তবু এ লোকটা এত অকৃতজ্ঞ যে তাঁরই সামনে পয়সার গুমর দেখিয়ে লম্বা লম্বা কথা হাঁকছে। শেঠ রূপরতন এবারে রাম চিমটি কাটলেন— মামার বাড়িতে ডাকাত পড়ল, মহিপাল শুরু যেতেই তারা পালিয়ে গেল। মহিপাল ডাকাতের প্রাণ নিলেন আর ডাকাতের মাথায় দোষের বোঝা চাপিয়ে, লুটের মাল চুরি করে নিজে ধন্না শেঠ হয়ে বসলেন।

কর্নেল আর সজ্জন চোখ চাওয়াচাওয়ি করলে। মহিপাল পাগলের মত গর্জে উঠল— আমায় অপমান করতে এসেছ? আমি তোমার রক্ত শুষে নেব।

শেঠ রূপরতন হেসে বললেন— হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন শুষবে না, ঠাটবাটওয়ালা বড়লোক যে। একটু অপেক্ষা করো, তোমার মামাতো ভাইকে এখানে ডেকে পাঠাই, আমি তাকে সেই গলার হার, যেটা তুমি তোমার মার হার বলো, দেখিয়ে তোমার বন্ধুদের সামনে জিজ্ঞেস করব— হার কার? শেঠ রূপরতন ইলেকট্রিকের ঘন্টি টিপলেন। সজ্জন চেয়ার থেকে উঠে রূপরতনের সামনে হাতজোড় করে বললে— এমনভাবে বেইজ্জতি করবেন না আপনি, মহিপাল আমাদের সকলেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু। কর্নেলও

ইনিয়ে বিনিয়ে সেই কথাই বোঝালো। মহিপাল পাষাণ-মূর্তির মত মাথা হেঁট করে বসে রইল। রূপরতন এক নজর মহিপালকে দেখে নিয়ে বললেন— এখন কোথায় গেল সব ঠাট-বাট? পৃথিবী-সুদ্ধ মানুষকে আদর্শ শেখাতে বেরিয়েছেন অথচ নিজের কীর্তি-কলাপ…

সজ্জন তাড়াতাড়ি বললে— হবে হয়তো, যেতে দিন, যেতে দিন।

—আরে, যেতে তো দেবই। এর বুক ফুলিয়ে লেকচার দেয়া দেখে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। চুরির কথা এইজন্যে ফাঁস হল যে এর মামাতো ভাই আমার সঙ্গে এককালে স্কুলে পড়ত। সেই আমায় সব খোলাখুলিভাবে বললে। বিয়েতে এসেছে এঁর এখানে, পরশু এমনি কথায় কথায় গয়নাগাঁটি আর ডাকাতির কথা উঠল। আমি ভাবলুম মহিপালের মার হারও তো সেই বাড়িরই, তাই তাঁকে মহিপালের বন্ধকী গয়না দেখিয়ে দিলুম। দেখতেই সে আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করলে— আপনি এসব কোথায় পেলেন? এই গয়না আমাদের ডাকাতিতে খোয়া গিয়েছিল। তখুনি আমি জেনে গেলুম যে ডাকাতির বাহানায় মহিপালই চুরি করে এনেছে। যাক, ওদের সামনে আমি গোলমাল কথা বানিয়ে বলে দিলাম কিন্তু আজ এঁর আদর্শের ফটফটানি শুনে আর চুপ থাকতে পারলুম না। চোর কোথাকার— অকৃতজ্ঞ, চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছে… থু থু! বড় ব্রাহ্মণের ব্যাটা আদর্শবাদী, বিদ্বান, লেখক হয়েছেন। চুরির পয়সা জলের মত খরচ করে ঘাড় শক্ত করে সেই আবার শোনাতে আসে কোন্ মুখে? আমরা জন্মেস্তক বড়লোক, আমাদের সঙ্গে রেস করতে আসা? ধন্না শেঠ কোথাকার।

অপমানে, ক্ষোভে, অভিমানে, গ্লানিতে মহিপালের মন ভরে উঠল। চারিদিকে যেন সকলেই আঙুলের সংকেতে তাকে চোর ঠাওরাচ্ছে— সত্যি সে কারুকে মুখ দেখাবে কি করে? চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা ফাটকের বাইরে চলে গেল। সকলের ভৎর্সনা শুনতে আর সে পারছে না। তার সমস্ত লেখাপড়া, চিন্তা, লেখা, আদর্শ আর সিদ্ধান্ত, সবই এক লহমায় ব্যর্থ হয়ে গেছে। পয়সার লোভে সে আজ চোর। যে রহস্যকে বুকে পাথরচাপা দিয়ে সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল— আজ এই মুহূর্তে আপনা হতেই তার পাপের হাঁড়ি ফেটে গেল। চলচ্চিত্রের মত সব যেন এক এক করে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই নিশুতি রাত্তিরে দাদামশাইয়ের মহলে ডাকাত পড়ল। কত নির্ভীক আর সাহসী হয়ে সে একাই ডাকাতের দলের সঙ্গে যুঝল। তার বন্দুকের নিশানায় যে ডাকাত আহত হল, তাকে কাছ থেকে দেখার লোভে সে যখন তার কাছে গেল— তখনই গয়না ভরা বাক্স তার থলেতে দেখতে পেল··· আর··· সেই দেখেই তার লোভী মনে পাপের উদয় হল। গয়নার বাক্স উঠিয়ে সেই থলের মধ্যে ভালো করে রেখে দিলে। কাকপক্ষীতেও জানতে পারল না, কেউ তাকে সন্দেহ করবে না। সকলে ভাবলে যে ডাকাতেই গয়না নিয়ে গেছে। ডাকাত মেরে মহিপাল হিরো হয়ে গেল। সেদিনের হিরো আজ বন্ধুদের সামনে চোর। আর সজ্জনের সামনে সে কোন্ মুখে বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারবে? রূপরতনের সঙ্গে আর সে সমানে সমানভাবে চোখ মেলাতে পারবে না। কর্নেলের মত ব্যক্তি, কল্যাণী, বাচ্চারা, সকলে যখন জানতে পারবে তখন চোর হয়ে যাবে— বাড়িতে থাকার যোগ্য সে আর থাকবে না।

মাথা হেঁট হয়ে রয়েছে, পা এগিয়ে চলেছে। মহিপালের মন যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠেছে— এ আমি কী করলুম— এ কী করলুম। সে সর্বদাই পয়সাকে হাতের ময়লার মতই অগ্রাহ্য করে এসেছে, অভাব-অনটনের মধ্যেও সে কোনদিন পয়সার সামনে মাথা নত করেনি— তাই হয়তো ধনাভাবের সামনে তার দুঃখে জর্জরিত মন ক্রমশ পরাস্ত হয়ে গেছে— তবেই সে চুরি করার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পেরেছে। বিয়েথাওয়া, বাচ্চার মুণ্ডন (মাথা ন্যাড়া করার উৎসব), পৈতে, বাচ্চাদের পড়া, লোকলৌকিকতা, কল্যাণীর জেদ— সব মিলিয়ে ক্রমশ সে আদর্শের মানদণ্ড থেকে নীচে নেমে এল। সারা জীবনের সাধনা এক লহমায় লোভে নষ্ট হয়ে গেল ? ভোলে ভূতনাথ আর তোমার নাম উচ্চারণ করলে জিভে ফোসকা পড়ে যাবে— এ আমি কী করলুম ? খুব অন্যায় কাজ করেছি।

বস্তি থেকে দূরে নির্জন রাস্তায় একা মহিপাল চলেছে। সিকন্দরাবাদ পেরিয়ে কাঠের পুল পেরুলো, নিশাতগঞ্জের বস্তির মধ্যে দিয়ে না গিয়ে সে গোমতীর দিকে এগিয়ে চলছে— এগিয়ে চলেছে।

সেদিন সারারাত মহিপালের খোঁজখবর পাওয়া গেল না, সেই যে রূপরতনের বাড়ি থেকে বেরুল, তারপর আর ফেরেনি। সবার ভাবনাচিন্তের অন্ত নেই, কেন হঠাৎ সে কাউকে কিছু না বলে উধাও হয়ে গেল ? কল্যাণী সারাক্ষণ দরজায় কান লাগিয়ে বসে আছে, কোথাও একটু খুট করে শব্দ হচ্ছে আর সে ধড়ফড়িয়ে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। বেচারী একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। বিয়ের হট্টগোল চলছে। সকাল থেকে জলখাবারের তৃতীয় রাউণ্ড শেষ হতে না হতেই আবার দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পাট আরম্ভ

হয়ে গেল। বরযাত্রী যাবার সময় হয়ে এল, প্রত্যেকের হাতে দক্ষিণা রাখার পর্ব শেষ হল, এই সময় প্রায় সকলেই মহিপালের বিষয় জানার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। মেয়ের বিদায় পালা বউই করুন, উপস্থিত সকলের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে কিন্তু কল্যাণীর চোখে এক ফোঁটা জল নেই। পাথরের প্রতিমার মত নিশ্চল হয়ে বসে আছে, মাঝে মাঝে এদিক ওদিক দেখছে। সারাদিন যন্ত্রচালিতের মত বিয়ের কাজ সামলেছে, এখন আর ছুটোছুটি করতে হবে না, কল্যাণীর হাতে অঢেল সময়— এতক্ষণ মহিপালের পায়ের শব্দ শোনার জন্য সে উৎকীর্ণ ছিল কিন্তু এবার কি হবে? ঘরে বাইরে চারিদিকে মহিপালকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। শকুন্তলার বিদায়বেলায় হঠাৎ কন্যা এসে পড়ল। তার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে, হাত ধরে আলাদা একপাশে নিয়ে গিয়ে, চাপা অথচ দৃঢ়স্বরে কল্যাণী জিজ্ঞেস করলে— কোন খবর পেলে?

—শকুন্তলার জন্য উপহার এনেছি ব'লে কন্যা কল্যাণীর পাশ কাটিয়ে ভেতরে চলে গেল। শকুন্তলা কন্যামামীমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলে। কর্নেল, সজ্জন, কর্নেলের স্ত্রী আর কন্যা সকলেই উপহার নিয়ে এসেছে। যদিও এটা উপহার দেওয়ার সময় নয় কিন্তু তবু মৃত মামার বন্ধুরা এই সময় উপযুক্ত দামী উপহার দিয়ে শুভকামনা জানাচ্ছে— সেই দামী উপহার যা জোগাড় করার জন্য তার মামাকে জীবনের বাজি সম্পূর্ণভাবে হেরে যেতে হল, প্রাণের মূল্য দিয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। দামী ফার্নিচার, থান থান রেশমী কাপড়, জড়োয়া গয়না, নতুন মোটর— অঢেল জিনিস যত কিনতে পারলে, মামার দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুতে মিলে

কিনে চার ট্রাক বোঝাই করে দিলে। সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের জিনিসপত্র। কর্নেলের ড্রাইভার নতুন গাড়ি নিয়ে এসেছে। গাড়ি ফুল দিয়ে সাজানো, বর বউ সেই গাড়িতে বসে গেল। মহিপালের বন্ধুদের অঢেল দেওয়া এখন আলোচনার বিষয়।

বরযাত্রী চলে যাবার পর যেন সব উৎসাহ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কন্যা কল্যাণীর সঙ্গে ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে কথা বলছে, ছেলেমেয়েরা সকলেই দরজার বাইরে উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাল দুপুর থেকে বাবা রহস্যময়ভাবে উধাও হয়ে গেছেন, তাদের বিচিত্র মনের দশা, তারা কেবল বড়দের মুখের দিকে প্রশ্নসূচকভাবে তাকাচ্ছে। ইতিমধ্যে ডাক্তার জয়পাল এসে নিজের গিন্নিকে আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে গুজুর গুজুর ফুস্থুর ফুস্থুর করলে। কারুর কাছেই কোন খবর না পেয়ে বাচ্চাদের অবস্থা বড় করুণ হয়ে গেছে। গিন্নির সঙ্গে কথা বলে জয়পাল তপ্পুর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে—তোমার মা কোথায়? ভয়ে বেচারা সিঁটিয়ে আছে, কোনমতে বন্ধ ঘরের দিকে আঙুলের সংকেত দিয়ে বোঝালো তপ্পু। ডাক্তার দরজায় ঘা দিলে, কন্যা দরজা খুললে, কল্যাণী দেওরকে দেখে মাথার কাপড় ঠিক করে নিয়ে কাঁচের চুড়ি চেপে ভেঙে ফেললে, তার চোখে এখনো এক ফোঁটা জল নেই। জয়পাল কেঁদে বললে—বউদি, দাদা এ কি করে ফেললে? তারপর সেখানেই মেঝেতে বসে ফোঁপাতে লাগল, কন্যার চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রুধারা বয়ে চলেছে। কন্যা রাজ্যশ্রীকে বুকে জড়িয়ে চেপে ধরল, বড় ছেলে কাকাকে প্রশ্ন করলে, বাবার কি হয়েছে? জয়পাল উত্তরে আরো জোরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

সকলের কান্নাকাটি, ভাবধারা দেখে তারা বুঝে নিলে যে মহিপাল —কারুর বাবা, কারুর স্বামী, কারুর ভাই, বোনপো—আজ আর বেঁচে নেই।

আজ সকালে নিয়মমত কর্নেল বিয়েবাড়িতে না গিয়ে সোজা সজ্জনের কাছে গেল। দুই বন্ধুতে একা বসে অনেক কথা হল। মহিপালের মতিবুদ্ধির বিষয় আলোচনা হল। সজ্জন কথায় কথায় দু-একবার বললে মহিপাল লোকলজ্জার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কিছু করে না বসে, কিন্তু কর্নেল তার আশঙ্কাকে নির্মূল করার চেষ্টা করলে। কর্নেলের মতে, বিয়ে শেষ না হওয়া পর্যন্ত মহিপাল কিছু করতে পারে না, করবে না। কেবল চক্ষুলজ্জার খাতিরেই সে আজ বরযাত্রীদের এড়িয়ে চলার চেষ্টায় কোথাও চলে গিয়ে থাকবে। হ্যাঁ, এ-কথা ঠিক যে হয়তো বিয়ের পর্ব শেষ হলেই সে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করবে। বিকেলে বরযাত্রীদের বিদেয় করে দেওয়ার পর তাদের এখন মহিপালকে নজরে নজরে রাখা উচিত।

বনকন্যা কর্নেলের আসার একটু পরেই নিজের কাজে বেরিয়ে গেল। প্রায় এগারোটা সাড়ে এগারোটা নাগাদ এক দৈনিক কাগজের সম্পাদকের ফোন এল। তাকে তখুনি খবরের কাগজের অফিসে আসার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সজ্জনকে দেখে সম্পাদকমশাই একখানা চিঠি তার হাতে ধরিয়ে দিলেন। হাতের লেখা মহিপালের, কোন স্কুলের ছেলের অঙ্কখাতা থেকে কাগজ ছিঁড়ে পেন্সিল দিয়ে লেখা চিঠি—

সম্পাদক মহাশয়,

এই আমার শেষ রচনা, চিঠির মাধ্যমে লেখা। এ যখন ছাপা হবে, তখন আমি আর ইহলোকে থাকব না। আমার একান্ত অনুরোধ যে আমার এই চিঠিকে নিজের কাগজে যথাশীঘ্র ছাপাবেন। একজন মৃত ব্যক্তির ইচ্ছা আপনি নিশ্চয় পূর্ণ করবেন। আমি সর্বজনসমক্ষে আমার অপরাধ স্বীকার করছি, এক লহমার লোভ আমার সমস্ত জীবনটাকে কলুষিত করে ফেলেছে, আজ আমি চোর। আমি আমার মামাতো ভাইয়ের বাড়িতে, যেখানে আমি লালিত-পালিত হয়েছি, ডাকাত পড়ার সময় উপস্থিত ছিলাম। এক ডাকাতকে মেরে ফেলে আমি তার লুটের মাল চুরি করি, সে-সমস্ত গয়না আমার মামাবাড়ির পূর্বপুরুষদের ছিল। আমি তাড়াতাড়ি গয়নার থলেটা নিয়ে পাশেই রাখা চুনের গাদায় লুকিয়ে রেখেছিলাম। দুজন ডাকাত পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে কিছু নগদ আর গয়না ছিল। আমার লুকিয়ে রাখা গয়নার অপরাধের বোঝা সহজেই সে দুজন ডাকাতের ঘাড়েই চাপানো হল। এই চুরি করার সময় আমার অন্তরাত্মা একবার জোড়ে কেঁপে উঠেছিল, কিন্তু আর্থিক অনটনের শেকলে বাঁধা আমার ব্যক্তিত্ব সহজেই পরাজয় স্বীকার করে নিলে। ভাগ্নীর বিয়ের সমস্যা চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমার স্ত্রী সমাজের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে চায়, তার এই জেদের মধ্যে আমাদের সমাজের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের ধ্বনি আমি শুনতে পেলাম। তাছাড়া আমি নিজেও মা-বাপ মরা ভাগ্নীর বিয়ে বেশ জাঁকজমক করে দেব ভেবেছিলুম। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটা কাজ ঠাটবাটে করার ইচ্ছে মনের মধ্যে প্রবলভাবে জেগে উঠেছিল। তালুকদারী

আবহাওয়ায় ছোটবেলায় মানুষ হয়েছি, তাই হয়তো আমার সংস্কারও রাজসিক হয়ে গেছে। কয়েক বছর থেকে ভীষণ আর্থিক অভাব-অনটন চলছে, সেই থেকেই আমার মনে দারুণ অতৃপ্তির হীনভাব স্থান নিয়েছে। আমার মনের এই প্রবৃত্তি সুযোগ পেতেই আমার গলা চেপে ধরল। আমি ভাবলুম যে ভাগ্নীর বিয়ের জন্য ভগবান ছাপ্পর ফেঁড়ে আমার ধন দিয়েছেন। এরা কোটিপতি, এত গয়না চলে যাওয়ার পরও এদের মানসম্মানে কোন ধাক্কা লাগবে না। এই মাল হাতিয়ে নিতে পারলে আমার ভাগ্নীর বিয়ে ভালোভাবেই হয়ে যাবে।

আজ নিজের এই দেউলে যুক্তির ফাঁকা আওয়াজ আমার কানে কর্কশ ঢোলের মত বেজে চলেছে। চুরি করার সঙ্গেই আমি কাপুরুষ হয়ে গেলাম আর কাপুরুষ নিজেকে যতই বিদ্রোহী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করুক-না-কেন, সে নিতান্তই দুর্বল ব্যক্তি। আমি আমার মিথ্যে যুক্তিকে তর্কের আবরণ দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করলাম।

যে সামাজিক ব্যবস্থা আমার মত সচেতন ব্যক্তিত্বকে অভাব-অনটনের হাতে শেষ করলে, সেই ব্যবস্থাই অচেতনাবস্থায় সংস্কারের জালে জড়ানো মানুষকে পতনের গর্তে ফেলে দেয়। যাদের ভয়াবহ খবর আপনারা প্রায়ই খবরের কাগজে পড়েন বা শোনেন।

নিজের কলুষিত কাপুরুষ ব্যক্তিত্ব নিয়ে সমাজের সামনে দাঁড়াবার ইচ্ছে আর আমার নেই, তাই আজ স্বেচ্ছায় গোমতীর জলে ডুবে প্রাণ দিচ্ছি। দ্বিতীয় অপরাধটাও স্বীকার করছি, আমার পরম বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ সুযোগ্য শিল্পী শ্রীযুক্ত সজ্জনের সম্পত্তি

দান করা দেখে ঈর্ষার বশীভূত হয়ে আমি তার সমাজ-কল্যাণ কাজের বিরোধিতা করেছিলুম। যে পরিকল্পনা আমার সমস্ত জীবনের স্বপ্ন ছিল, তাকেই আমি উপড়ে ফেলার চেষ্টা করেছি। আমরা সংকীর্ণ মনোবৃত্তির এই জঘন্য অপরাধ কলঙ্কের কালিতে ডুবে গেছে। আমার এই দ্বিতীয় অপরাধকে আমি প্রথম অপরাধের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দিচ্ছি, কেননা সত্য যত নির্মমই হোক, তাকে মেনে নেওয়াই ধর্ম।

অধম

মহিপাল শুক্ল

চিঠির নীচে, কয়েকটা অপ্রাসঙ্গিক কথা লেখা আছে: মানুষ মানুষ যেন থাকে, তার ব্যক্তিগত চিন্তনের মধ্যে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থাকা দরকার—আমি একা তবু বহুজনের মাঝে ঘুরছি— দুঃখ সুখ, শান্তি, অশান্তি, ইত্যাদি ব্যক্তিগত অনুভব সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে জড়িত আছে— অতএব আমাদের মানতে হবে যে সমাজ এক, ব্যক্তি অনেক। সূর্য চন্দ্র পৃথিবী সব একই আছে যদিও বিভিন্ন পদার্থ দিয়ে তৈরী।

প্রথমবার চিঠি পড়ে সজ্জন হতভম্ব হয়ে গেল, দ্বিতীয়বার পড়তেই তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল, চিঠি হাত থেকে নীচে পড়ে গেল। টেবিলে মাথা রেখে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কর্নেলকে খবর পাঠানো হল। ডাক্তার জয়পালকে ডেকে খবর জানানো হল, পুলিসকেও বলা হল। গোমতীর ধারে ধারে কুরিয়া ঘাট থেকে বাঁধ পর্যন্ত খোঁজ করা হল, যদি মহিপালের

কাপড়চোপড় পাওয়া যায়, কিন্তু সব পরিশ্রমই পণ্ড হল। কোথা থেকে মহিপাল কাগজ পেন্সিল জোগাড় করে, কোন্ সময় সম্পাদকের ডাকবাক্সে চুপচাপ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, কবে কোথায় গিয়ে প্রাণ দিয়েছে কে জানে! সব রহস্যের উত্তর বুকের মধ্যে চেপে রেখে সে চলে গেছে— কে দেবে এর উত্তর?

বাহান্ন

মহিপালের অকালমৃত্যুর খবর কর্নেল, সজ্জন, কল্যাণী, শীলা আর কন্যা সকলকে যেন এক জোর ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে। তাদের মনের কোঠায় মহিপালের স্মৃতি, যেন মহিপাল এখুনি তাদের কাছে এসে দাঁড়াবে, এখুনি তাদের ডাক দেবে! বার বার তার মুখখানা ভেসে উঠছে— অদ্ভুত একটা শূন্যতার রাজ্যে চক্কর কেটে চলেছে তাদের মনের অব্যক্ত বেদনা। এদের জীবন থেকে মহিপালের ছায়া আজ সরে গেছে, জীবনের দিনলিপিতে বাধা পড়ে গেছে। একটা সুপরিচিত স্পর্শ, গলার স্বর, দোষেগুণে ভরা একজন বন্ধু আত্মীয় এক মুহূর্তের মধ্যে 'আছে' থেকে 'ছিল' হয়ে গেল।

জন্ম মৃত্যু প্রকৃতির নিয়ম। জীবনমৃত্যুর নাগরদোলা সদাই এক গতিতে চলতে থাকবে। সময়ের চক্রে মানুষের শোকের মাত্রা কমতে থাকে। মহিপালের জীবন অধ্যায়ের খাতায় সময়ের

ঘর এত শীঘ্র শূন্য হয়ে যাবে, এটা কেউই আশা করেনি। রোগশয্যায় শুয়ে, ওষুধবিষুধ খেয়ে যদি মারা যেত বা আয়ু ভোগ করে বৃদ্ধাবস্থায় শেষ নিশ্বাস ফেলত, তাহলে কারুর দুঃখ করার থাকত না। মহিপালের মত বুদ্ধিমান লেখক একটা লোভের ফাঁদে পা দিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হল, এ এমন কটুসত্য যাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। মহিপালের মত পরিস্থিতির মধ্যে যদি সজ্জনকে জীবন কাটাতে হত, তাহলে হয়তো তাকেও এইভাবেই প্রাণ হারাতে হত। সজ্জন বিচার-ধারার ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে চলেছে, এমন কোন উপায় ভাবা উচিত যাতে নিজের আত্মবিশ্বাস আর মনোবল হারিয়ে মানুষকে পাথরে মাথা ঠুকে মরতে না হয়।

জীবনদর্শনের সেই চিরাচরিত প্রশ্ন আবার সজ্জনের মনে আজ উদয় হল। যে দেশে কর্মযোগের সিদ্ধান্ত আছে, বেদ, উপনিষদ, সাহিত্য, শাস্ত্র, ব্যাস আর বাল্মীকির মত যুগপ্রবর্তক মহর্ষি হয়েছেন, এত রসজ্ঞানের অঢেল ভাণ্ডার, অজন্তা, ইলোরা, কোণার্ক দক্ষিণ ভারত— সম্পূর্ণ ভারতে ব্যাপ্ত অনুপম শিল্প ছড়িয়ে আছে, সুনীতি আছে— যে দেশের ইতিহাস এত মহিমামণ্ডিত সেই দেশের মানুষ কেন জড়তা আর নোংরামির মধ্যে থাকা পছন্দ করে, তারাই আত্মহত্যা কেন করে? মহিপাল আর ভারত, দুইজনেই জ্ঞান আর অজ্ঞানের ক্ষেত্রে একই ধরাতলে নেমে গেছে।

মহিপালের দুর্বিষহ স্মৃতির বোঝা যেন সজ্জন আর বয়ে বেড়াতে পারছে না, ক্লান্ত চোখের জ্বালা আর সহ্য হয় না, তাকে ভুলে যাবার জন্য তাকে মৌন ব্রতের সাহায্যে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। সে আর কন্যা, দুজনে মিলে জনতার দুঃখ মোচনের জন্যে

বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে লাগল। দারিদ্র্যের মহামারীতে পীড়িত ভারতবাসী আজ বড় দুর্বল, বড় অশক্ত, সময়ের সঙ্গে পা ফেলে চলায় নিতান্তই অসমর্থ।

—এর কারণ কি?

আমাদের দেশ বিভিন্ন বিচারধারার আর সামাজিক রীতিনীতির এক মস্ত চিড়িয়াখানা। কত হাজার শতাব্দীর জীবনযাপনের মানদণ্ড, লোকলৌকিকতা আর মান্যতা, যেটা আজকের বিজ্ঞানের যুগে একেবারেই অচল, আমাদের সমাজ অন্ধের মত তাকে আঁকড়ে ধরে আছে। প্রত্যেক যুগে যা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, যত ঐতিহাসিক প্রভাবে তারা প্রভাবিত হয়েছে সেসব আজও আমাদের মাথায় খাঁড়ার মতই ঝুলছে। আমরা তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছি কই? আমাদের বাড়িতে, গলিতে ছাইমেখে চিমটে-হাতে-করা সাধু, বৈরাগী, ফকীর, চণ্ডীপাঠে ব্যস্ত পুরুতমশাই, বিয়ে মুণ্ডন, পৈতে থেকে আরম্ভ করে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করতে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ, কথকতায় মগ্ন পণ্ডিত, ভূতের ওঝা, শনির দালাল যারা দানের পাত্র হাতে নিয়ে ঘোরে, টোটকা, দেনা-পাওনা, জাতিভেদ, তেত্রিশ কোটি দেবতা— সব বাজে মাথা খারাপ করার সামগ্রী ছাড়া কিছু নয়। অন্ধবিশ্বাসের হাতে পড়ে মানুষ দুর্বল হয়ে শেষে তার অর্জিত আত্মবিশ্বাসকে পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। বিজ্ঞানের প্রগতির যুগে এই সামাজিক সংগঠনের অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে পড়েছে। দেবদেবীদের সঙ্গে জড়িত তাদের ব্যক্তিত্বকে মুক্ত করতে হবে। আদিকাল থেকেই দেশের মহান দেবতা ধরিত্রী মাতাকেই মানা হয়েছে। ভগবান ফাঁকা আকাশের মধ্যে বসবাস করেন না, এই বিরাট সত্যের আবিষ্কার এদেশে অনেক

আগেই হয়ে গেছে। এখানে তারা প্রত্যেক জীবনের মধ্যে তাঁর দর্শন করেছে, মানুষের পরমশক্তিকে তারা নিকট থেকে চিনতে শিখেছে। এদেশ জ্ঞান আর ধর্মকেই দর্শনের মূল উৎসরূপে স্বীকার করেছে। পরলোকের চিন্তায়, মৃত্যুভয়ে সদাই সশঙ্কিত প্রাণ, জীবনদর্শনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই পরলোকের জীবনদর্শনকে সময় থাকতে ব্যবহারিক জীবনযাত্রা থেকে গুটিয়ে বেঁধে ছেঁদে মিউজিয়মে সাজিয়ে রাখা উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন নিজের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ভগবান বা তেত্রিশ কোটি দেবতাকে বিশ্বাস করা ভুল, আত্মবিশ্বাসই নতুন যুগের প্রধান ধর্ম।

আমাদের বর্তমান জনজীবনে ব্যাপ্ত অন্ধবিশ্বাসের আর একটা কারণ হচ্ছে— রাজনৈতিক দলাদলি। রাজনীতি যাদের হাতে তারা সমাজের পণ্ডিত আর ওঝাদের মতই সেয়ানা। বর্তমান রাজনীতিতে প্রগতিশীল শক্তির একান্তই অভাব। রাজনীতি কেবল মারপ্যাঁচ খেলার আখড়া, জনকল্যাণের আদর্শ সেখানে কেবল কেতাবী বুলি, ব্যক্তিগত অহংকারের জন্য রাজনীতি খেলোয়াড়দের বুদ্ধি, চালাকি আর কার্যকুশলতা আজ বিপথগামী হয়ে গেছে। বর্তমান রাজনীতির জন্ম সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে হয়েছে। এই কারণেই উভয় শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ চলেছে। সাম্রাজ্যবাদ যে-কোন রূপেই হোক-না-কেন কল্যাণকারী নয়। জাতিবাদ, ধর্মবাদ, রাষ্ট্রবাদ— দেশের পুরোনো এবং নতুন ইতিহাস এ বিষয়ের সাক্ষী হয়ে আছে।

আজ এদেশে কংগ্রেস, সোশালিস্ট, কম্যুনিস্ট, জনসংঘ, হিন্দু-মহাসভা ইত্যাদি যতগুলি রাজনৈতিক পার্টি আছে বেশীর ভাগ একে অন্যের চেয়ে বেইমান চালবাজ আর জালবাজ। দাম্ভিক

আর তুচ্ছ হীন প্রবৃত্তির দ্বারা অনুশাসিত আদর্শ আর সিদ্ধান্তের আড়াল নিয়ে জনতাকে ভুল পথে চালিত করাই এদের মহান উদ্দেশ্য। এদের সংঘর্ষ কেবল ব্যক্তিগত, আদর্শের নয়। এ দেশের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তি ভারতীয় পরম্পরাকে কেবল পুরানো দিনের সম্পত্তি ছাড়া আর কোন মূল্য দিতে রাজী নয়। তথাকথিত প্রগতিশীল শক্তিরা এখনো নিজের দেশের আসল পদ্ধতি ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেনি, তাদের প্রগতিশীলতার বিষয় তাদের জ্ঞান খুবই অল্প, তারা তাই সমস্ত প্রগতিশীল আদর্শের জন্মদায়িনী হিসেবে বিদেশের পুজো করাই শিখেছে। সেই বিদেশী আদর্শকে তারা আমাদের ঘাড়ে কোনরকমে চাপিয়ে দিতে চায়।

জনজীবনে অন্ধবিশ্বাস আর ভ্রান্তির শেকল কষে বাঁধা রয়েছে। এ হেন অবস্থায় বুদ্ধিজীবী কি করে এক কোণে মুখবুজে বসে থাকতে পারে? নিজের দেশকে কি আমরা ভালোবাসি না? দেশের ঐতিহ্য ও শক্তিকে আজ আমরা উপেক্ষার নজরে দেখি কেন?

মহিপাল প্রায়ই শোনাত যে বাঙলা দেশে যখন আকাল পড়েছিল, সেই অনটন সহ্য করতে করতে সেখানে মানুষের চেতনা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তারা নিজের নাম, এমনকি নিজেকেও ভুলে গিয়েছিল। আজ আমাদেরও ঠিক সেই দশা হয়েছে। ভারতবাসী আজ ভুলে গেছে যে সে ভারতীয়, সে কংগ্রেসী, সোশালিস্ট, জনসংঘী, কম্যুনিস্ট, অকালী, সে যশসিদ্ধ কবি, শিল্পী, নেতা, ডাক্তার, ব্যারিস্টার, অফিসার বা সমাজে 'কেউকেটা' একজন, কিন্তু বেশীভাগ ভারতীয় নয়— মানুষ? না। এরা প্রায় সারাদিন দেশ আর মানবতার বুলি কপচাতে থাকে অথচ নিজেরাই তাদের

দেশের বিষয় জানে না। তাদের দেশ মানবতার মর্মকে কি সুন্দরভাবে বুঝেছে। এ সময় এমন মনে হচ্ছে যে এদেশে, পৃথিবীতে কেবল ব্যক্তি আছে, সমাজ নেই। ব্যক্তি কেবল তার নিজস্ব সীমার মধ্যেই থাকে, চিন্তা করে আর কর্ম করে। প্রত্যেক মানুষ যেন আলাদা আলাদা দ্বীপে বসবাস করছে।

এটাই কি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক? না।

বর্তমান সমাজের মানুষ কোথাও-না-কোথাও অবশ্য অনুভব করে যে সে ভুল পথে চলেছে। তাই সে নিজের ভুল স্বীকার না করে অন্যের ভুলের দিকে শ্যেন চক্ষে চেয়ে থাকে। এই নিয়ে বাড়ে হাঙ্গামা, হয়ে যায় হুজ্জৎ, আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের এই স্বভাব বড়ই অপ্রাকৃতিক।

মানুষের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হওয়া চাই। জনজীবনে তাদের আস্থার একান্তই প্রয়োজন। পরের সুখদুঃখকে আপনার ভাবতে হবে। মতভেদ হতে পারে কেননা মতভেদের দ্ব[illegible] সুস্থ সমন্বয়ের বিকাশ হয় কিন্তু শর্ত এই যে সুখদুঃখে মানু[illegible] সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যেন অটুট থাকে— যেমন বিন্দুর পর বিন্দু মালার মত গাঁথা আর সিন্ধুর মাঝেই লুকিয়ে আছে বিন্দুর অস্তিত্ব।

সজ্জন আর কন্যা, দুজনেই সমাজকল্যাণের এক মহৎ আদর্শ নিয়ে ছোট এক পরিধির মধ্যে সৌন্দর্য আর সেবায় কর্মরত হয়ে পড়েছে। স্বামী স্ত্রী দুজনেই তাদের আস্থার প্রতি দৃঢ় হয়ে নিস্তরঙ্গভাবে কাজ করে চলবে। ব্যক্তির সামাজিক চেতনা নি[illegible] একদিন জাগ্রত হবে, সেইদিন মানস আকাশে ফুটে উ[illegible] ভোরের শান্ত আলো।